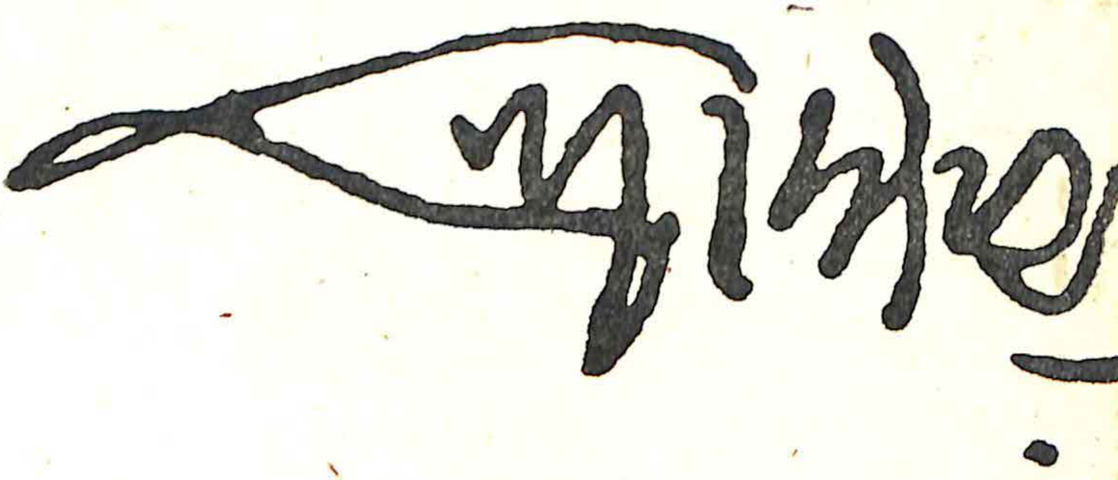
করুণাসাগর
বিদ্যাসাগর

করুণাসাগর বিদ্যাসাগর



করুণাসাগর বিদ্যাসাগর

ইন্দ্র মিত্র

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৬৯

দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুন ১৯৭৩

দাম : ৩০·০০ টাকা

নিবেদন

'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর'-এর উপকরণ সংগ্রহ বিষয়ে বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে আমি অকৃপণ সাহায্য পেয়েছি।

কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : উৎকল সাহিত্য সমাজ; গুরুদাস ইনস্টিট্যুট; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা ও রাজস্ব দপ্তর; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ; বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরি; বিদ্যাসাগর কলেজ; বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়; ভারতের রাষ্ট্রীয় অভিলেখাগার; ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়; শ্রীরামপুর কলেজ; সংস্কৃত কলেজ। এবং কয়েকজন ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : ডঃ গোপিকামোহন ভট্টাচার্য; শ্রীনিখিল সরকার; ডঃ নীলমণি মুখোপাধ্যায়; ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত; ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত; শ্রীরাধাপ্রসাদ গুপ্ত; শ্রীশঙ্খ ঘোষ; ডঃ শিশিরকুমার দাশ; শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করে দিয়েছেন শ্রীদেবকুমার বসু।

সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে আমার ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি।

'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ-কালে বহু পাঠক-পাঠিকা আমাকে অনুগ্রহ করে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। সকল পাঠক-পাঠিকার কাছে আমি নিরন্তর অনুরূপ অনুগ্রহ ভিক্ষা করি। কির্মধিকমিতি ২৬-সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ সাল।

ইন্দ্রমিত্র

আমার পরমারাধ্য পিতামহদেব
স্বর্গত কালীপ্রসন্ন গুহের
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

"... not only Vidyasagara but Karunasagara also."

মাইকেল মধুসূদন



এক

হুগলী জেলার কোন এক গণ্ডগ্রামের একটা স্কুলে বিদ্যাসাগর আসবেন। গ্রামসুদ্ধ মেয়ে-পুরুষ ভেঙে পড়ল, সকলেই বিদ্যাসাগরকে একবার দেখতে চায়।

সময় পার হয়ে গেল, বিদ্যাসাগর এসে পৌঁছলেন না। মাথার উপর রোদের তেজ বেড়ে উঠল, তবু ভিড় কমে না। বিদ্যাসাগরকে একবার চোখে দেখতে হবে।

হঠাৎ শোনা গেল, বিদ্যাসাগর আসছেন, বিদ্যাসাগর এসেছেন।

একজন বৃদ্ধা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ গা, বিদ্দেসাগর কই?

একজন ভদ্রলোক সামনেই বিদ্যাসাগরকে দেখিয়ে বললেন—এই যে বিদ্যাসাগর মশায়।

বৃদ্ধা অবাক হয়ে খানিকক্ষণ বিদ্যাসাগরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—আ আমার পোড়া কপাল! এই মোটা চাদর গায়ে উড়ে বেয়ারা দেখবার জন্যে রোদে ভাজা-ভাজা হলুম! না আছে গাড়ি, না আছে ঘড়ি, না আছে চোগা-চাপকান![১]

সত্যি কথা। গাড়ি-ঘোড়া কিংবা চোগা-চাপকানের জাঁকজমক নেই বিদ্যাসাগরের। সামান্য পোষাক-আষাক তাঁর। নিজের খাবার বেলায় যেমন-তেমন হলেই হল, নিজের পরবার বেলায় ধুতি-চাদর-চটি। কিন্তু কাউকে দেবার সময় বিদ্যাসাগর বাজার থেকে বেছে আনেন ভালো কাপড়, ভালো খাবার।

গোলদীঘির দক্ষিণধারে একটা দোতলার বারান্দা থেকে একজন ভদ্রলোক একদিন দেখতে পেলেন, ফুটপাথে বসে একটি মেয়ে একখানা কাগজ হাতে নিয়ে চুপচাপ কাঁদছে। মেয়েটিকে ডাকিয়ে আনলেন ভদ্রলোক। জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কাঁদছ কেন?

মেয়েটি বলল—আমার মা-বাপ কেউ নেই। আমি বেথুন স্কুলে পড়ি। একজন দয়ালু ব্রাহ্ম ভদ্রলোক আমাকে খেতে-পরতে দিচ্ছিলেন। আরেকজন দয়ালু ভদ্রলোক আমার পড়াশোনার খরচ দিচ্ছিলেন। আমার দুর্ভাগ্য, ওই দুজন ভদ্রলোকই মারা গেছেন। লেখাপড়া করা তো দূরের কথা, আমার খাওয়া-পরার উপায় নেই, আশ্রয় নেই। আজ তিনদিন অবধি একখানা দরখাস্ত নিয়ে সাহায্যের জন্য বড়োমানুষদের দরজায়-দরজায় ঘুরেছি, কোথাও কিছু সুফল হল না।

কোনো বড়োমানুষ কিছু বলেননি?

অনেক বড়োমানুষের সঙ্গে দেখাই করতে পারেনি মেয়েটি। দারোয়ানের হাতে দরখাস্ত পাঠিয়েছে, দারোয়ান এসে দরখাস্তখানা ফেরত দিয়ে বলেছে—এখানে কিছু হবে না, অন্য জায়গায় যাও।

দু-একজন বড়োমানুষ অবশ্যি দেখা করেছেন। দু-একটি হিতোপদেশ দিয়েছেন, আর-কিছু দেননি, আর-কিছু দেবার কথা বলেননি। কেউ-কেউ এমন কথা বলেছেন যা না বলাই ভালো।

মেয়েটি কাঁদতে লাগল।

এই ভদ্রলোক বললেন—মা, কেঁদো না। বোধ করি সারাদিন তুমি কিছু খাওনি। আমি কিছু খাবার আনিয়ে দিই, তুমি খাও। তারপর, আমি যেখানে যেতে বলি, সেখানে একবার গিয়ে দ্যাখো।

কাঁদতে-কাঁদতে মেয়েটি বলল—আমি কিছু খাব না। আপনি বলুন, কোথায় যাব। আমি কিন্তু আর কোনো বড়োমানুষের বাড়িতে যাব না।

—সে কি কথা! মা, তুমি তো কোনো যথার্থ বড়োমানুষের বাড়িতে যাওনি। আমি যাঁর কাছে যেতে বলব, তিনি যথার্থ বড়োমানুষ। তুমি একবার যাও দেখি।

—কে তিনি? বলুন।

—তুমি একবার বিদ্যাসাগরের কাছে যাও।

—তিনিও তো বড়োমানুষ!

—হ্যাঁ, তিনিই বড়োমানুষ। তুমি একবার বৃন্দাবন মল্লিকের লেনে তাঁর বাড়িতে যাও, তাঁর সঙ্গে দেখা করো। যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে না পারো, অন্তত তোমার দরখাস্তখানা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিও। তুমি অনেক কষ্ট করেছ, আমার কথায় এই কষ্টটুকুও করো। একবার বিদ্যাসাগরের কাছে যাও।

মেয়েটি বলল—আচ্ছা, আপনার কথা আমি নিশ্চয়ই শুনব। কিন্তু কোনো বড়োমানুষের বাড়িতে যেতে আর আমার ইচ্ছে করে না। তবে আপনি যখন বলছেন, আমি যাচ্ছি।

মেয়েটি গেল বিদ্যাসাগরের কাছে, একজন যথার্থ বড়োমানুষের কাছে। বড়োমানুষের কাছে গিয়ে একমুহূর্তে মেয়েটিও বড়ো হয়ে গেল। সত্যি-সত্যি বড়ো।

বিদ্যাসাগরের কাছে সরাসরি গিয়ে হাজির হয়নি মেয়েটি। দরখাস্তখানা পাঠিয়ে দিয়েছে, অপেক্ষা করে থেকেছে। একটু পরেই বিদ্যাসাগর ডেকে পাঠিয়েছেন মেয়েটিকে।

মেয়েটির মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে বিদ্যাসাগর বললেন—আজ থেকে তুমি আমার মা, আমি তোমার ছেলে। মা, তোমার খাওয়া-পরা লেখাপড়া ইত্যাদির খরচ চালাব আমি।

বিদ্যাসাগর জোর করে মেয়েটিকে অনেক ভালো-ভালো জিনিস খাওয়ালেন। নতুন কাপড় দিলেন, নতুন বই দিলেন, কয়েকটি টাকা দিলেন। যে-সংসারে এতকাল ছিল মেয়েটি, সেখানেই থাকতে বলে দিলেন। হ্যাঁ, সেই সংসারকেও মাঝে-মাঝে সাহায্য করবেন বিদ্যাসাগর। সেই বাড়িতে দেবার জন্য বিদ্যাসাগর নিজের হাতে একখানা চিঠি লিখে দিয়েছেন। শেষে একখানা গাড়িতে, সঙ্গে লোক দিয়ে, মেয়েটিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মেয়েটি মনে-মনে বুঝেছে, সত্যি-সত্যি বড়োমানুষ কাকে বলে।[২]

বরিশালের একজন লোক কলকাতায় দু-জন বড়োমানুষকে দেখতে এসেছেন। একজনের নাম বলা যাবে না, আরেকজন বিদ্যাসাগর।

প্রথম বড়োমানুষের জন্য কয়েকদিন দরবার করা গেল কিন্তু তাঁর দেখা পাওয়া গেল না। তৃতীয় কি চতুর্থ দিন ওই বড়োমানুষের বাড়িতে বরিশালের লোকটি বারংবার খাবার জল চাইলেন, কিন্তু পেলেন না। রাগে কাঁপতে-কাঁপতে তিনি বিদ্যাসাগরের বাড়িতে এলেন।

বিদ্যাসাগর তখন আহারান্তে খালিগায়ে একটি হুঁকো হাতে দরজায়

দাঁড়িয়ে আছেন। বরিশালের লোকটি বিদ্যাসাগরকে চেনেন না, বিরক্তমুখে তিনি বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞেস করলেন—বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা হবে?

লোকটির চোখমুখ দেখে বিদ্যাসাগর অনুমান করলেন কোথাও কোনো গোলমাল আছে। বললেন—হ্যাঁ, দেখা হবে বৈকি, আপনি বসুন।

—হবে বৈকির কর্ম নয়, একজনকে সেরে এলুম, একেও সেরে চলে যাই, হয় তো হোক।

লোকটির তামাক খাওয়া অভ্যাস আছে কিনা জেনে নিলেন বিদ্যাসাগর। জেনে তামাক দিতে বললেন।

তামাক খেতে-খেতে লোকটির মেজাজ একটু নরম হল। বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—আহারাদি হয়েছে কি?

—আর আহারে কাজ নেই, তুমি একবার ডেকে দাও, দেখে চলে যাই।

বিদ্যাসাগর বললেন—আহারাদি না হয়ে থাকে তো এখনই যোগাড় হতে পারে!

ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগরের ইঙ্গিতে জলযোগের যোগাড় হয়েছে। জলযোগের পর তামাক খেতে-খেতে লোকটি বললেন—একবার ডেকে দিলে এঁকেও দেখে চলে যাই, আর এমন দুষ্কর্ম করব না।

অনেক পীড়াপীড়ি করে লোকটির মুখে সমস্ত ঘটনা শুনলেন বিদ্যাসাগর। লোকটির পীড়াপীড়িতে, আর গোপন করলেন না, নিজের পরিচয় দিলেন।

চোখের পলকে লোকটির ভাবভঙ্গি অন্যরকম হয়ে গেল। তিনি বিদ্যাসাগরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—আ-মি-আ-মি-আ-প-না-কে-আপ-নাকে।

বিদ্যাসাগর বললেন—আপনার কোনো দোষ নেই। যা হয়েছে তাতে মনের অবস্থা ওইরকমই হয়ে থাকে, এতে কোনো দোষ নেই।[৩]

রজনীকান্ত গুপ্ত লিখেছেন: "একদা তিনি (বিদ্যাসাগর) উপস্থিত প্রবন্ধ-লেখককে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"আমি এক দিন ইডেন সাহেবের (ইডেন সাহেব তখন গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারি বা অন্য কোনও উচ্চপদে নিয়োজিত ছিলেন) সহিত বসিয়া আলাপ করিতেছিলাম। এমন সময়ে অন্য এক ব্যক্তি সাহেবের দর্শনার্থী হইয়া, আপনার নাম লিখিয়া পাঠাইলেন। সাহেব চাপরাসীকে বলিলেন—"বাবুকে বল, এখন ফুরসুথ নাই।" ইডেন সাহেবের কথা শুনিয়া, আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না, তখনই সাহেবকে বলিলাম, "আপনি আমার সহিত বসিয়া, বাজে কথায় সময়ক্ষেপ করিতেছেন, ইহাতে আপনার ফুরসুথ আছে। আর এ ব্যক্তি অবশ্য কোনও প্রয়োজনের অনুরোধে আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত দেখা করিতে আপনার ফুরসুথ নাই! আমি সামান্য গরীব মানুষ; পাল্কীভাড়া করিয়া আসিয়াছি। এ ব্যক্তি যদি গরীব হয়, তাহা হইলে বেচারীর গাড়ীভাড়া দণ্ড হইবে; আর এক দিন আসিলে গাড়ীভাড়া দিতে হইবে।" ইডেন সাহেব তখন ঈষৎ হাসিয়া দর্শনার্থী ভদ্রলোকটীকে আসিতে বলিলেন। মহাপুরুষের এইরূপ উদারতা, এইরূপ সমদর্শিতা এবং এইরূপ অহংকারশূন্যতা ছিল।"[৪]

বিদ্যাসাগরের দয়া-দাক্ষিণ্যের তুলনা নেই। আর্তের সেবার জন্য হাত বাড়িয়ে আছেন তিনি। কাউকে বিপন্ন দেখলেই বিদ্যাসাগর ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। লোকের দুঃখ দূর করার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই। পরের দুঃখে বিদ্যা-সাগরের চোখে জল এসে পড়ে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখেছেন : "বিদ্যাসাগরের এই রোদনপ্রবণতা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ।...বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মত কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। রোদন ব্যাপার বড়ই গর্হিত কর্ম; বিজ্ঞের নিকট ও বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব; এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যত্ব।...বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব এই যে, তিনি আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে তৃণের অপেক্ষাও হেয় জ্ঞান করিতেন; কিন্তু পরের জন্য রোদন না করিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না।"[২]

বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় লিখিত হয়েছে : "ইনি (বিদ্যাসাগর) বলেন,—দরিদ্রের দুঃখ কয়জন দেখিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ের ব্যথা কয়জন বুঝিয়াছে!" বাস্তবিক দরিদ্রের দরিদ্রতা ও বিধবার দুঃখ দেখিলে নয়নজলে ইহাঁর বক্ষ ভাসিয়া যায়, দুঃখীর দুঃখ যখন কাহারও নিকট বর্ণনা করেন, তখনও অশ্রু প্লাবিত হয়। এই ছত্র কেহ অতিরঞ্জিত মনে করিও না। ইহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। মুক্তকণ্ঠে বলিতে কি, এমন হৃদয়বান্ পুরুষ বঙ্গদেশে অতি বিরল। ইনি সামান্য রাখাল হইতে অতিবড় রাজা, সকলেরই বন্ধু। যে কেহ হউক, আপনার বিপদ বিদ্যাসাগরকে জানাইলে ইনি অর্থ দ্বারা, পরিশ্রম দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা, অপর লোকের সাহায্য দ্বারা, অথবা যে কোন উপায়ে হউক, সাধ্য মতে সেই ব্যক্তির উপকার করিয়া থাকেন।"[৩]

চন্দননগরে বিদ্যাসাগর একদিন দেখলেন, একটি পাগল ছেলে কেবল হাসছে। যা হয়ে থাকে সচরাচর, রাস্তার লোকজন সেই পাগল ছেলেটিকে নিয়ে প্রচন্ড হাসাহাসি করছে। বিদ্যাসাগরের চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়তে লাগল, বুক ভেসে গেল তাঁর। পাগল ছেলেটিকে কলকাতায় নিয়ে এলেন তিনি। নিজের বাড়িতে এনে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।[৭]

বিদ্যাসাগর একদিন একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে বললেন—দ্যাখো, কলুটোলার অমুক গলির অমুক নম্বর বাড়িতে একজন মান্দ্রাজী ভদ্রলোক থাকেন। টাকার অভাবে খুব কষ্ট পাচ্ছেন তিনি। তুমি গিয়ে সব খোঁজ-খবর নিয়ে এস।

সেই বিশ্বস্ত কর্মচারী বেরিয়ে পড়ল। কলুটোলার সেই ঠিকানায় প্রথমেই দেখা হল বাড়ির কর্তার সঙ্গে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল মান্দ্রাজী ভদ্রলোকের কথা।

বাড়ির কর্তা বললেন—হ্যাঁ, আমার এই বাড়ির নিচের তলার ঘরে তিনি সপরিবারে আছেন। তাঁর কাছে আমার তিরিশ টাকা পাওনা, ছ-মাসের বাড়িভাড়া। ভাড়া শোধ করে তাঁকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছি, কিন্তু কিছুই দিতে পারছেন না তিনি। কি করি, পয়সার অভাবে উনি আজ দু-তিনদিন সপরিবারে উপোস করে আছেন।

বাড়ির কর্তার কাছে কিছু খবর পাওয়া গেল। এবার তাহলে সেই মান্দ্রাজী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে আরো কিছু খোঁজ-খবর নিতে হয়। সেইরকমই তো বলে দিয়েছেন বিদ্যাসাগর।

পাঁচটি মেয়ে আর দুটি ছেলেকে নিয়ে মান্দ্রাজী ভদ্রলোক তখন সামান্য একটা দরমার উপর বসে আছেন।

একটু আলাপ করা গেল মান্দ্রাজী ভদ্রলোকের সঙ্গে। মান্দ্রাজী ভদ্রলোক কি ঘুণাক্ষরেও জানেন, নতুন আলাপ-করতে-আসা এই মানুষটি কার কাছ থেকে এসেছেন? জানেন না। কেমন করে জানবেন।

মান্দ্রাজী ভদ্রলোক বললেন—শুনুন, এই কলকাতা শহরে অনেক বড়-লোকের কাছে আমার কষ্ট জানিয়েছিলাম। কিন্তু একটি কানাকড়ি দিয়েও কেউ আমাকে সাহায্য করেনি। শেষকালে একজন ভদ্রলোক আমাকে একখানা পোষ্টকার্ড দিলেন। ফাঁকা পোষ্টকার্ড নয়, পোষ্টকার্ডে কী সব লিখে-টিখে দিলেন। আমাকে বললেন, 'এই শহরে এক পরম দয়ালু বিদ্যাসাগর আছেন। তাঁর কাছে তোমার দুরবস্থার কথা লিখে দিলাম, চিঠিখানা ডাকে দিয়ে এস'। দিয়েছি। এখন আমার অদৃষ্ট।

যথাসময়ে সব খবর পেলেন বিদ্যাসাগর। সেই অচেনা-অজানা মান্দ্রাজীর দুঃখে চোখের জল ফেলতে-ফেলতে তাঁকে টাকা পাঠালেন, কাপড়-চোপড় পাঠালেন। শেষপর্যন্ত তাঁদের মান্দ্রাজে ফিরে যাবার খরচ দিলেন।[৮]

আরেকটি ঘটনা।

মান্দ্রাজ থেকে দুটি ভদ্রঘরের ছেলে বাড়ি ছেড়ে বোম্বাই চলে গিয়েছে। কেন? না, খ্রীষ্টান হবে। বোম্বাই থেকে মিশনারিরা ওদের কলকাতায় নিয়ে এলেন। আর কলকাতায় এসেই, কেন কে জানে, আবার ওদের মত বদলে গেল। না, খ্রীষ্টান হবে না।

খ্রীষ্টান হবে বলে মিশনারিদের কাছ থেকে কিছু কিছু টাকা-পয়সা পাওয়া যাচ্ছিল। এবার তা বন্ধ হয়ে গেল।

হঠাৎ যে ওরা বাড়িতে ফিরে যাবে, সে-উপায়ও নেই। খ্রীষ্টান হবে বলে বাড়ি ছেড়ে এসেছে, কোন মুখে হঠাৎ গিয়ে বাড়িতে উঠবে?

হাতে পয়সা-কড়ি নেই একেবারে। নিরুপায় হয়ে অতএব ওরা ভিক্ষে করতে আরম্ভ করল। কয়েকজন বড়ো-বড়ো বাবুকে গিয়ে ধরল।

নগদ কিছু পাওয়া গেল না। খাতায় সই করে দিলেন বাবুরা। অর্থাৎ, দেবেন। কেউ একটাকা, কেউ দু-টাকা। অন্তত চোদ্দ-পনেরো টাকা দরকার, সেখানে সাকুল্যে গোটাদশেক টাকার জন্যে সই-সাবুদ যোগাড় হল।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। টাকা আর হাতে আসে না। ঐ গোটাদশেক টাকারও কোনো পাত্তা নেই। কেবল খাতা-কলমেই আছে। মাসখানেক ধরে দরজায়-দরজায় ঘোরাঘুরিই সার হল ওদের।

এই অবস্থায় ওরা একদিন বিদ্যাসাগরের কাছে এল।

সব শুনলেন বিদ্যাসাগর।

যে-মুহূর্তে শুনলেন কয়েকজন বাবু গোটাকয়েক টাকার অঙ্ক খাতায় সই করে ওদের মাসখানেক ঘুরিয়েছে কিন্তু হাতে কিছুই দেয়নি, সেই মুহূর্তে বিদ্যাসাগর রাগে-দুঃখে খাতাখানা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। বললেন—তোমরা গিয়ে পড়াশোনা করো। প্রত্যেক মাসের দোসরা কি তেসরা চোদ্দটি টাকা আর দু-জোড়া কাপড় তোমাদের বাসায় যাবে।

যতদিন কলকাতায় ছিল ওরা, ততদিন পেয়েছে। বিদ্যাসাগর যা বলেছেন, মাসে-মাসে নির্ভুল সাহায্য এসেছে।[৯]

সেদিন পড়ার ঘরে বসে আছেন বিদ্যাসাগর। একজন ফিরিঙ্গী মেমসাহেব এলেন। বৃদ্ধা। খ্রীষ্টান। একখানা দরখাস্ত নিয়ে এসেছেন। দরখাস্তখানা বিদ্যাসাগরের হাতে দিলেন।

দরখাস্তখানা পড়ে বিদ্যাসাগর বলতে লাগলেন—কেন আপনি অযথা আমার কাছে এসেছেন। আমার আপন জাতের মধ্যেই অজস্র দুঃস্থ আছে। তাদেরই বিস্তর সাহায্য দরকার। আপনি তো আপনার নিজের জাতের লোক-

জনের কাছে...

বলতে-বলতে থেমে গেলেন বিদ্যাসাগর। মেমসাহেবের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন—আহা, আপনি হাঁপাচ্ছেন! দরখাস্তখানা আপনি তো নিচের থেকেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারতেন। উপরে উঠে আসা আপনার উচিত হয়নি। কাউকে ডাকব? আপনাকে একটু হাওয়া করবে?

না, হাওয়া করতে হবে না, কাউকে ডাকতে হবে না। হাতের ইশারায় মেমসাহেব বারণ করলেন। আর একটিও কথা না বলে বিদ্যাসাগর মেম-সাহেবকে কয়েকটি টাকা দিলেন। না দিয়ে থাকতে পারলেন না।[১০]

একজন বন্ধুর সঙ্গে বিদ্যাসাগর হেদুয়ার কাছে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ চোখে পড়ল, একজন ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান সেরে কাঁদতে-কাঁদতে যাচ্ছেন।

বিদ্যাসাগর ডাকলেন সেই ব্রাহ্মণকে। জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কাঁদছেন কেন?

মোটা চাদর গায়ে, চটি জুতো পায়ে কে-না-কে জিজ্ঞেস করছে ঠিক নেই. উত্তর দিয়ে লাভ কি। ব্রাহ্মণ চুপ করে রইলেন।

কিন্তু বিদ্যাসাগর কিছুতেই ছাড়েন না। অগত্যা ব্রাহ্মণ বললেন—আমি একজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সে-টাকা শোধ করার উপায় নেই। পাওনাদার আদালতে আমার নামে নালিশ করেছে।

—মোকদ্দমা কবে?

—পরশু।

মোকদ্দমার নম্বর, ব্রাহ্মণের নাম-ঠিকানা—কথায়-কথায় সব খবর জেনে নিলেন বিদ্যাসাগর।

ব্রাহ্মণ চলে যাবার পর বিদ্যাসাগর সঙ্গের বন্ধুটিকে ওই মোকদ্দমার খোঁজ-খবর নিতে বলে দিলেন। খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল, সুদে-আসলে ব্রাহ্মণের দেনা প্রায় আড়াই হাজার টাকা।

ব্রাহ্মণের দেনার সমস্ত টাকা আদালতে জমা করে দিলেন বিদ্যাসাগর। আদালতের উকিল-আমলাকে বলে দিলেন—আমার নাম যেন ওই ব্রাহ্মণ জানতে না পারে।[১১]

কাকে বিদ্যাসাগর কখন কি দিচ্ছেন, সহজে জানার উপায় নেই। দু-জনকে একসময়ে আসতে বলতেন না কখনো। কেউ হয়তো একটায় এসে একখানা বই নিয়ে গেল। তারপর দুটোর সময় একজন এসে পাঁচটি টাকা নিয়ে গেল। তিনটের সময় এসে আরেকজন একখানা চাদর নিয়ে গেল। সব যোগাড় আছে। দানের কথা যেন জানাজানি না হয়। সকলকে বারণ করে দিতেন বিদ্যাসাগর। বলে দিতেন—কাউকে কিছু বলো না।

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন: "বিদ্যাসাগর যাঁদের মাসিক সাহায্য করিতেন তাঁদের নিকট মাসের ১ম দিন টাকা পাঠাইয়া দিতেন। পাছে টাকা লইতে আসিয়া তাঁহাদের কষ্ট হয় সেইজন্যই ঐরূপ ব্যবস্থা করিতেন।... লাইব্রেরী ঘরের পার্শ্বস্থ তাঁহার বসিবার ঘরের এক Sloping table -এর মধ্যে মোড়ক করিয়া টাকা থাকিত। মোড়কের উপর লিখা থাকিত কাহার জন্য। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই এইরূপ করুণা ও নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।"[১২]

বিদ্যাসাগর তখন ফরাসডাঙায়।

নদীর পাড়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেদিন, চোখে পড়ল, একটি স্ত্রীলোকের কোলে একটি ছেলে, ছেলেটির পা-দুখানা সমান নয়। এমন হল

কেন? খোঁজ-খবর নিয়ে জানলেন, আগে পা-দ্‌ুখানা একরকমই ছিল, বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে একখানা পা ক্ষয় হতে-হতে এই অবস্থায় এসেছে।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—চিকিৎসা হয়েছে কিছ্‌ু? কে আছে ছেলেটির?

মা-বাপ আছে। যতদ্‌ূর সাধ্য, তারা করেছে। এই ছেলের পায়ের জন্য, বলতে গেলে, তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে। আর-কিছ্‌ু করার উপায় নেই তাদের।

সর্বস্বান্ত হয়েও মা-বাপ ছেলেটিকে স্‌ুস্থ করে তুলতে পারেনি!

আর স্থির থাকতে পারলেন না বিদ্যাসাগর। ছেলেটির বাপের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন। কথাবার্তা বলে ব্‌ুঝলেন, বাপ যথাসাধ্য খরচ করেছে, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

বিদ্যাসাগর বল্‌লেন—ওকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ভালো ডাক্তার দেখালে ভালো হত।

খরচ-পত্র আছে না তাতে? ছেলেটির বাপ বিদ্যাসাগরকে চেনে না। ভাবল, মোটা চাদর পরা এই বিশ্রী চেহারার ভদ্রলোকটি বেশ তো বিজ্ঞের মতো উপদেশ দিচ্ছে। লোকটা পাগল নাকি! বলে কিনা, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ভালো ডাক্তার দেখালে ভালো হত!

আরেকবার ছেলেটির পা ভালো করে দেখলেন বিদ্যাসাগর। বললেন—আমার বোধ হয়, মেডিক্যাল কলেজে দেখালে কিছ্‌ু-না-কিছ্‌ু উপকার হত।

ছেলেটির বাপ বলল—কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখানো আমার সাধ্যের বাইরে।

বিদ্যাসাগর বললেন—আচ্ছা, কেউ যদি কলকাতায় যাওয়া-আসা, সেখানের থাকা-খাওয়া, অষ্‌ুধ-পথ্য, ডাক্তার-বদ্যির খরচ দেয়, তাহলে কি ছেলেটিকে নিয়ে কলকাতায় যেতে পারো?

দ্‌ুনিয়ায় কে অযথা অত সব খরচপত্র করতে যাবে? এসব কথা বলে লাভ কি। ছেলেটির বাপ চুপ করে রইল।

লোকজন আসছে আস্তে-আস্তে। ভিড় হচ্ছে। ভিড় বাড়ছে যখন, চলে যাওয়াই ভালো। ছেলের বাপকে নিজের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বিদ্যাসাগর তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

ওই বাড়িতে কেউ বিদ্যাসাগরকে চিনতে পারেনি। পাড়ার একজন ভদ্রলোক সব খবর শ্‌ুনে বললেন—তোমরা কেউ চিনতে পারোনি, বিদ্যাসাগর এসেছিলেন। তিনি ছাড়া এমন কথা আর কার ম্‌ুখ থেকে বেরতে পারে?

সন্ধ্যার সময় ছেলের বাপ দেখা করতে এল বিদ্যাসাগরের সঙ্গে।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—কি ঠিক করলে?

ছেলেটির বাপ হাতজোড় করে ক্ষমা চাইল। বলল—আজ আমার দরজায় আপনার পায়ের ধ্‌ুলো পড়েছিল। না জেনে আমি আপনাকে অবজ্ঞা করেছি, আগে আমার সে-অপরাধ ক্ষমা কর্‌ুন, তারপর অন্য কথা।

বিদ্যাসাগর বললেন—তুমি আমাকে অবজ্ঞা করোনি, তোমার কোনো অপরাধ হয়নি। এবার বলো, কি ঠিক করলে?

—আপনি যেমন বলবেন, তেমনি হবে।

বিদ্যাসাগর বললেন—তবে তুমি কলকাতা যাবার যোগাড় করো। সেখানে কিছ্‌ুদিন থাকতে হবে। আর কবে যেতে পারবে, তা আমাকে বলে যাবে, আমি গিয়ে সব ব্যবস্থা করে দিয়ে আসব।

ছেলেটির বাপ বলল—আজ্ঞে, কলকাতায় থাকতে হবে? তাহলে তো অনেক টাকা খরচ হবে। এত টাকা...

বিদ্যাসাগর বললেন—তাতে তোমার কি? সে-ভাবনা তোমার কেন?

ছেলেটির চিকিৎসা ইত্যাদিতে চার-পাঁচশ টাকা খরচ করলেন বিদ্যাসাগর।[১৩]

ফরাসডাঙায় একদিন একটি অন্ধ মুসলমান ভিক্ষুক স্ত্রীর হাত ধরে ভিক্ষায় বেরিয়েছে। সারা শহর ঘুরেছে, কিন্তু কিছুই পায়নি। শেষপর্যন্ত সে এল বিদ্যাসাগরের কাছে।

ভিক্ষুকের মুখে তার ইতিবৃত্ত শুনলেন বিদ্যাসাগর। কয়েকটি পয়সা দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন—তোর কী খেতে ইচ্ছা হয়?

ভিক্ষুকটি বলল—অনেকদিন লুচি আর দই খাইনি। লুচি আর দই খেতে ইচ্ছা হয়।

তখনি মেয়েকে দিয়ে লুচি ভাজালেন বিদ্যাসাগর। ভিক্ষুকটি আর তার স্ত্রী পেট ভরে লুচি খেল। তারপর ওদের দুটো টাকা দিলেন বিদ্যাসাগর। বললেন—প্রত্যেক রোববার এসে লুচি খেয়ে যাস।

তাছাড়া, কথা দিলেন, ঘরভাড়া বাবদ ওদের মাসে-মাসে আট আনা করে দেবেন।[১৪]

কালীচরণ ঘোষের সঙ্গে কুন্তী নামে একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে। সেই বিয়ের ঘটকালি করেছেন বিদ্যাসাগর।

কিছুকাল পর একটি দুঃখের ঘটনা হল। অকালে একটি ছেলে মারা গেল কুন্তীর। শোকে পাগল হয়ে গেল কুন্তী। পাগল হয়ে একবার গোঁ ধরে বসল—বিদ্যাসাগর খাইয়ে না দিলে খাব না।

আর-কেউ খাওয়াতে গেলে কুন্তী মুখ বন্ধ করে থাকে। মুখে কণামাত্র খাবার তোলে না।

খবর পেলেন বিদ্যাসাগর। বললেন—তা আর কি হবে, মেয়েটা কি না খেয়ে মারা যাবে, আমি দু-বেলা গিয়ে খাইয়ে আসব।

কেবল কথার কথা নয়, সত্যি-সত্যি এসেছেন। নানা কাজের মধ্যেও সময় করে, একদিন-দুদিন নয়, দিনের পর দিন এসেছেন। কয়েক মাস দুবেলা এসে কুন্তীকে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছেন বিদ্যাসাগর।[১৫]

বিদ্যাসাগরের একটা সাংঘাতিক কারবঙ্কল হয়েছে। কাটাতে হবে। ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষ কেটে দেবেন।

পাশীবাগানের মল্লিকদের বিষয়-সম্পত্তির শালিসীর ভার পড়েছে বিদ্যাসাগরের হাতে। দীননাথ মল্লিকের সঙ্গে শালিসী সম্পর্কে বিদ্যাসাগর কথা বলছেন, এদিকে ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষ সেই কারবঙ্কল পটলচেরা করে পুঁজ-রক্ত বের করে বেঁধে দিয়ে বসে আছেন। বিদ্যাসাগর একবিন্দু নড়াচাড়া করেননি, 'উঃ-আঃ' করেননি, তামাক খেতে খেতে আলাপ করতে করতে কারবঙ্কল কাটানো হয়ে গেল, কেউ টের পাননি।

তারপর দীননাথ মল্লিক বললেন—তবে ডাক্তারবাবুর কাজটা হয়ে যাক না, আর বিলম্ব কেন?

তখন জানা গেল ডাক্তারবাবুর কাজ হয়ে গেছে।[১৬]

লালবিহারী মিত্রের ডিস্পেনসারিতে আলমারি থেকে একদিন একটা লোহার কর্কপ্রেসার বিদ্যাসাগরের পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর পড়েছে। ফলে

বিদ্যাসাগরকে মাসখানেক শয্যাগত থাকতে হয়েছে। কিন্তু কর্কপ্রেসার যখন পায়ে পড়েছে বিদ্যাসাগর তখন মুখের বিকৃত ভাব প্রকাশ করেননি।[১৭]

অন্যের কষ্টে বিদ্যাসাগর ব্যাকুল হয়েছেন। কিন্তু নিজের কষ্ট নিঃশব্দে সহ্য করেছেন।

আপন জীবদ্দশাতেই 'বিদ্রোহী' আখ্যায় সম্মানিত হয়েছেন বিদ্যাসাগর। ১২৯০ সালের আষাঢ়ে 'প্রবাহে' প্রকাশিত 'উনবিংশ শতাব্দীর দুঃখ' নামক রচনায় জনৈক লেখক ব্যক্ত করেছেন : "মহাত্মা বিদ্যাসাগর বঙ্গীয় সমাজের সর্বপ্রধান বিদ্রোহী। মহাত্মা রামমোহন রায় প্রথম বিদ্রোহী, তৎপরেই বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্রোহিশব্দে উল্লেখযোগ্য।..."

উত্তরকালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "His (বিদ্যাসাগরের) is an honoured name in Bengal and will, I think, occupy, next to Raja Ram Mohun Roy, the proudest place in our history. I knew him well and admired his great personality, his wonderful strength of purpose, the breadth and liberality of his views, and his deep and burning sympathy for the helpless and the poor."[১৮]

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন নিবেদিতাকে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলেছেন—উত্তর ভারতে আমার বয়সের এমন একজন লোকও নেই যার উপর তাঁর প্রভাব পড়েনি।[১৯]

যেখানে প্রশংসা, সেখানেই নিন্দা। নিন্দিতও হয়েছেন বিদ্যাসাগর।

কী একটা স্টেশনে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে একজন পণ্ডিতমশায়ের দেখা। পণ্ডিতমশাই কস্মিনকালেও বিদ্যাসাগরকে স্বচক্ষে দেখেননি, বিদ্যাসাগরকে তিনি একবিন্দু চেনেন না।

কিন্তু তর্ক করতে-করতে পণ্ডিতমশায় বললেন—বিদ্যাসাগর হ্যাটকোট পরে, হোটেলে খায়। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

বিদ্যাসাগর সহাস্যে বললেন—বিদ্যাসাগরকে চেনো তাহলে?

—চিনি না? বিলক্ষণ চিনি। কতবার দেখেছি।[২০]

পণ্ডিতমশাই নির্ঘাত মিথ্যে বলেছেন। আর বিদ্যাসাগর কী জীবনে মিথ্যে বলেননি? বলেছেন বৈকি। কিন্তু সে আরেকরকম মিথ্যে।

মিথ্যেবাদী বিদ্যাসাগরের নামে একটা কাহিনী আছে।

একটা পাড়াগাঁয়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন বিদ্যাসাগর। একটা বাড়ি থেকে একজন মেয়ের খুব কান্না শুনলেন। হয়েছে কী? জিজ্ঞেস করলেন একজন লোককে। শুনলেন—মেয়েটির স্বামী মারা গেছে। গহনাপত্র বিক্রী করে সর্বস্ব খরচ করে মেয়েটি স্বামীর চিকিৎসা করিয়েছে। এখন স্বামীর অভাবে তার কি দুর্দশা হবে বুঝতেই পারছেন।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—ওই স্বামীর কী নাম বলতে পারো?

—রাম।

বিদ্যাসাগর তখনি 'রামদাদা, রামদাদা, বাড়ি আছ' বলতে-বলতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

মেয়েটি কাঁদতে-কাঁদতে বলল—তিনি আর নেই গো।

—অ্যাঁ, রামদাদা মারা গেছেন! তিনি আমাকে যে বড়ই বিপদে ফেলে গেছেন।

শুনে আরো ভয় পেয়ে গেল মেয়েটি : ইনিও একজন পাওনাদার নাকি?

বিদ্যাসাগর তাড়াতাড়ি বললেন—অনেক টাকা তিনি আমাকে দিয়ে গেছলেন, বিপদে পড়লে আমার কাছ থেকে চেয়ে নেবেন বলেছিলেন। সেসব টাকা তোমাদের আমি একসঙ্গে দেব না। তোমাদের যখন যা দরকার হবে আমার কাছ থেকে নেবে। আর মাসে-মাসে আমি মাসহারা দেব।[২১]

১৮৮৫ সালে প্রকাশিত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্বে' বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন : "মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে।"[২২]

একথা ভেবে অত্যন্ত আশ্চর্য লাগে যে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৫ সালে রামমোহনের পর বাঙলাদেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতারূপে বিদ্যাসাগরের নাম উচ্চারণ করতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারে যাই হয়ে থাক, কালের বিচারে বাঙলাদেশে রামমোহনের পর দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা নিঃসন্দেহে বিদ্যাসাগর।

১৮৫৬ সালের ১৬ ডিসেম্বরের 'সম্বাদ ভাস্করে' প্রকাশিত একখানা প্রেরিতপত্র থেকে একাংশ তুলে দিচ্ছি : "...অন্য দেশীয় ইতিহাসাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন মহাত্মা স্বদেশের হিত নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া চিরস্থায়িনী কীর্তিলাভ করিয়াছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও তদনুরূপ দেশহিতৈষী বলিতে পারা যায়। উক্ত মহোদয়ও স্বদেশের হিত নিমিত্ত আবশ্যক হইলে বোধ হয় প্রাণদানেও পরাঙ্মুখ হয়েন না...।"

বিদ্যাসাগর অসামান্য দেশহিতৈষী। তাঁর দেশহিতৈষিতার অতুলনীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : "Patriot শব্দের যাঁহারা অনুবাদ করেন দেশহিতৈষী, তাঁহারা নিতান্তই দায়ে পড়িয়া তাহা করেন। Patriot শব্দের ঠিক্ প্রতিশব্দ আমাদের দেশীয় ভাষাতে নাই ও কস্মিন্‌কালে ছিলও না।... দেশের হিতসাধনকারী philanthropist স্বতন্ত্র, আর কায়মনোবাক্যে দেশের স্বকীয় মাহাত্ম্যের সমর্থনকারী patriot স্বতন্ত্র। যিনি স্বদেশের স্বাধীনতা, গৌরব, তেজোবীর্য এবং মহত্ত্ব রক্ষা করিয়া মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করেন তিনিই patriot। তিনি যদি নেপোলিয়নের ন্যায় রুধির-স্রোতে দেশকে ভাসাইয়া দিয়া দেশের পরাকাষ্ঠা অহিত সাধন করেন, আর বলেন যে, দেশের মহত্ত্ব যদি না রহিল তবে তাহার হিতে কাজ নাই, তথাপি তিনি patriot। পক্ষান্তরে, যাঁহারা কাটা ছাঁটা আঁটা সাঁটা পোষাক এবং দোকান-সাজানিয়া গৃহ সজ্জাতেই সভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখেন; স্বদেশের কিছুই যাঁহারা দুচক্ষে দেখিতে পারেন না; এমন কি, স্বদেশের সর্ববাদি-সম্মত বিশিষ্ট উৎকর্ষ-স্থানটিকেও যাঁহারা কেবল অন্যের দেখাদেখি নাক মুখ সিট্‌কাইয়া ভাল বলেন, তা বই, তাহার ভালত্ব আপন চক্ষে দেখেনও না—দেখিতে জানেনও না; যাঁহারা স্বদেশের গৌরবেও আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন না, স্বদেশের অপমানেও আপনাদিগকে অপমানিত মনে করেন না; তাহা দূরে থাকুক—উল্টা আরো যাঁহারা স্বদেশকে নিচু করিয়া আপনার উঁচু হইবার চেষ্টায় যাচিয়া মান এবং কাঁদিয়া সোহাগের কর্দমাক্ত পথে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান হন; তাঁহারা যদি স্বদেশের মাথাহেঁট করা দেহের যাঁতা চালাইবার উপযোগী মহা মহা বহ্বাড়ম্বরের ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া দেশ-হিতৈষিতার ধ্বজা উড়াইতে এক মুহূর্তও ক্ষান্ত না হ'ন, তাহা হইলেও আমি তাঁহাদিগকে Garibaldi বলিব না। স্বর্গীয়

বিদ্যাসাগর মহাশয় ওরূপ Garibaldi ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে আমরা patriot বলিলে যথার্থ যাহা তিনি ছিলেন তাঁহাকে তাহাই বলা হয়। আপনারা হয়তো মনে করিতেছেন যে, তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, দীন দঃখীদিগের মা বাপ ছিলেন, বিধবা-রমণীদিগের সন্তাপানলে নয়নজল বর্ষণ করিতেন, সেই কারণে আমি তাঁহাকে patriot বলিতেছি। এরূপ অবিচার আপনারা আমার প্রতি করিবেন না! তিনি যদি একশত বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করিতেন, শত সহস্র দরিদ্র লোককে Rothschilde করিয়া দিতেন, দশ কোটি বিধবার মৃত সাধব্য পুনর্জীবিত করিতেন, তাহা হইলে শুদ্ধ কেবল সেই কারণে তাঁহাকে আমি patriot বলিতাম না; তাহা হইলে বলিতাম তিনি মস্ত একজন philanthropist। Patriot তাঁহাকে বলিতেছি আরেক কারণে। যখন তিনি Woodrow সাহেবের অধীনতা শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া নিঃসম্বল হস্তে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক লেখনী যন্ত্র দ্বারা জীবিকা সংস্থানের পথ কাটিতে আরম্ভ করিলেন, তখন বুঝিলাম যে, হাঁ ইনি patriot যেহেতু ইনি খাওয়া পরা অপেক্ষা স্বাধীনতাকে প্রিয় বলিয়া জানেন। যখন দেখিলাম যে, তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার সারাংশ সমস্তই ক্রোড় পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ সে সভ্যতার কৃত্রিম কুহকাংশে পদাঘাত করিয়া স্বদেশীয় উচ্চ অঙ্গের সভ্যতা—বিদ্যা বিনয় দয়া দাক্ষিণ্য মহত্ত্ব এবং সদাশয়তা—সমস্তই আপনাতে মূর্তিমান করিয়াছেন, তখন বুঝিলাম যে, এ ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণ সত্যসত্যই patriot ছাঁচে গঠিত। যখন দেখিলাম যে "এ দেশের কিছু হইবে না" বলিয়া তিনি অকেজো মৌখিক সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সংসর্গে বিমুখ হইয়া বাষ্পগদ্‌গদ লোচনে গৃহ-কোটরে ঢুকিয়া আপনাতে আপনি ভর করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন—দীপ্ত দিবাকর অল্পে অল্পে তেজোরশ্মি গুটাইয়া অস্তাচল-শিখরে অবনত হইতেছেন, তখন বুঝিলাম যে, পূর্বজন্মে ইনি প্রাচীন রোম নগরের কোনো একজন খ্যাতনামা patriot ছিলেন—পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গ হইতে আমাদের এই হতভাগ্য দেশে নিপতিত হইয়া মনের খেদে ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইতেছেন; অথচ কেহ তাঁহাকে পুছিতেছে না।"[২৩]

বিদ্যাসাগরের দেশহিতৈষিতার সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর বোম্বাইতে ভারতের নানাস্থানের প্রতিনিধিরা একটি অধিবেশনে সম্মিলিত হয়েছেন। সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া বাঙলাদেশ থেকে ওই অধিবেশনে উপস্থিত হয়েছেন নরেন্দ্রনাথ সেন, জানকীনাথ ঘোষাল ও গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়। এই কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়েছে কলকাতায়। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। দাদাভাই নৌরজী সভাপতি। এই অধিবেশনে সভাপতি ব্যক্ত করেছেন—কংগ্রেস রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান।

বিদ্যাসাগর বলেছেন—বাবুরা কংগ্রেস করছেন, আস্ফালন করছেন, বক্তৃতা করছেন, ভারত উদ্ধার করছেন। দেশের হাজার হাজার লোক অনাহারে প্রতিদিন মরছে, সেদিকে কারো চোখ নেই। রাজনীতি নিয়ে কী হবে? যে-দেশের লোক দলে দলে না খেয়ে প্রত্যহ মরে যাচ্ছে, সে-দেশে আবার রাজনীতি কি?[২৪]

উত্তরকালে ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: "বিদ্যাসাগর মহাশয়কে

কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাগণ যোগ দেবার জন্য প্রতিনিধি পাঠিয়ে অনুরোধ করেন। তিনি তাদের সোজাসুজি প্রশ্ন করেন যে, "দেশের স্বাধীনতা পেতে গেলে শেষ পর্যন্ত যদি দরকার হয় তারা কি তলোয়ার ধরতে পারে?" তাঁর এই প্রশ্নে, যাঁরা এসেছিলেন, বিব্রত হয়ে পড়েন। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, "আমাকে বাদ দিয়াই তোমরা এই কাজে এগোও"। বলা বাহুল্য সে যুগের কংগ্রেস সংগ্রামী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।"[২৫]

সকল অকৃত্রিম দেশহিতৈষীর জন্য বিদ্যাসাগরের হৃদয় অবারিত। বিহারীলাল সরকার লিখেছেন : "স্বদেশী হউক, বিদেশী হউক, ব্রাহ্ম হউক, খৃষ্টান হউক, হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, সাহসী, সদালাপী সরল সত্যসন্ধ ব্যক্তিমাত্রেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয় অধিকার করিতেন। যিনি যে পথেই চলুন, দেশের হিত-কামনা তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য বুঝিলেই, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া প্রেমালিঙ্গন দিতেন।"[২৬]

বিদ্যাসাগর মুক্তকণ্ঠে বলেছেন—আমি জীবনে চারজন মানুষ দেখেছি। তার মধ্যে একজন ছিলেন প্যারীচরণ।[২৭]

প্যারীচরণের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন বিদ্যাসাগর।

একদিন প্যারীচরণের হরিতকীবাগানের বাড়িতে এসে বিদ্যাসাগর ব্যস্তভাবে বললেন—প্যারী, হাজার তিনেক টাকা দিতে পারো, বড়ো দরকার।

—হঠাৎ হাজার-তিনেক টাকা কেন?

বিদ্যাসাগর বললেন—ওহে, একটা লোকের চাকরি হয় না দেখে আমি তার জামিন হয়েছিলাম,...কিনা শেষে তিন হাজার টাকা ভেঙে পালিয়েছে। এখন ওই টাকা আমাকে দিতে হবে, কিন্তু টাকা আমার কাছে নেই।

নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তখন প্যারীচরণের সরকার। নবকৃষ্ণকে ডাকলেন প্যারীচরণ। বললেন—মুখুয্যেমশায়, তবিলটা দেখো তো, কত টাকা আছে।

তহবিলে দু-হাজার টাকা আছে।

আরেক হাজার মায়ের কাছ থেকে যোগাড় করলেন প্যারীচরণ। তিন হাজার টাকা দিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগরকে।

বিদ্যাসাগর চলে গেলেন।

নবকৃষ্ণ প্যারীচরণকে জিজ্ঞেস করলেন—ওই টাকাটার কী রকম খরচ লিখব?

বিদ্যাসাগরের নামে ধার বলে লেখা চলবে না। প্যারীচরণ বললেন—ও টাকাটা আমার নামে বাজে খাতায় খরচ লেখো।

প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছাড়া কেউ কারো কাছে এ-ভাবে টাকা নিতে পারে না, টাকা দিতে পারে না।[২৮]

প্যারীচরণের মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "We knew each other from early youth, and we were so closely attached that in him (প্যারীচরণ সরকার) I have lost a dear and affectionate brother. To the public the loss cannot be easily replaced. His great ability, high character and single minded zeal in works of humanity rendered him highly useful to society at large, while his devotedness to the cause of temperance which was manifested in the foundation of the Bengal Temperance Society, in the publication

of many valuable tracts in English and Bengali, and in other acts, will doubtless be long cherished in grateful remembrance by all lovers and promoters of temperance in this country." ২১

একবার বর্ধমানে একটি ছেলে বিদ্যাসাগরের কাছে একটি পয়সা ভিক্ষে চাইল। ছেলেটির কঙ্কালসার চেহারার দিকে তাকিয়ে কী জানি কী মনে হল, বিদ্যাসাগর বললেন—আমি যদি চারটি পয়সা দিই।

চেয়েছে তো একটি পয়সা, কিন্তু ইনি দিতে চাচ্ছেন চারটি পয়সা। এক পয়সা চাইলে কেউ কখনো চার পয়সা দেয়? ইনি নির্ঘাত ঠাট্টা করছেন!

ছেলেটি বলল—ঠাট্টা করেন কেন? একটি পয়সা দিন।

বিদ্যাসাগর বললেন—ঠাট্টা নয়। যদি চারটি পয়সা দিই, তাহলে কী করিস?

—তাহলে দুটি পয়সার খাবার কিনি আর দুটি পয়সা মাকে গিয়ে দিই।

বিদ্যাসাগর বললেন—যদি দু-আনা দিই?

ছেলেটির মনে হল, আসলে ইনি কিছুই দেবেন না, শুধু-শুধু ঠাট্টা করছেন। তাই কোনো কথা না বলে ছেলেটি চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালো। বিদ্যাসাগর হাত ধরে ফেললেন ছেলেটির। বললেন—বল না, সত্যি-সত্যি তাহলে তুই কী করিস?

ছেলেটির চোখ থেকে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। বলল—চার পয়সার চাল কিনে নিয়ে যাই। আর চার পয়সা মাকে দিই। তাতে আমাদের আরেকদিন চলবে।

বিদ্যাসাগর বললেন—যদি চার আনা দিই?

কেউ কখনো চার আনা ভিক্ষে দিতে পারে! স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এসব শুধু কথার কথা, এসব কথার উত্তর না দিলেও চলে। কিন্তু উত্তর না দিয়ে উপায় নেই, কেননা তখনো বিদ্যাসাগর ছেলেটির হাত ধরে আছেন। সে বলল—তাহলে দু-আনা দুদিন খাওয়া চলবে আর দু-আনার আম কিনি। আম কিনে বেচি। দু-আনার আমে চার আনা হবে। তাহলে আবার দুদিন চলবে। আবার দু-আনার আম কিনবো। এই ভাবে যতদিন চলে।

চার আনা নয়, ছেলেটিকে পুরোপুরি একটি টাকা দিলেন বিদ্যাসাগর।

কিছুকাল পরে বিদ্যাসাগর আবার বর্ধমানে গেছেন। স্টেশনে নেমে একটা চেনা দোকানে ঢুকতে যাচ্ছেন, এমন সময় একটি ছেলে এসে বলল—দয়া করে একবার আসুন, আমার দোকানে একবার বসতে হবে।

বিদ্যাসাগর বললেন—তুমি কে, আমি তো তোমায় চিনি না। তোমার দোকানে কেন যাবো?

ছেলেটি বলল—আপনার মনে নেই। দু-বছর আগে আমি আপনার কাছে একটি পয়সা চেয়েছিলাম। আপনি আমাকে একটি টাকা দিয়েছিলেন। সেই এক টাকায় দু-আনার চাল কিনি আর বাকি চোদ্দ আনার আম কিনে বেচি। তাতে আমার বেশ লাভ হয়। তারপর আবার আম কিনে বেচি। ক্রমে লাভ বাড়তে থাকে। এটা-সেটা বেচে বেশ পুঁজি হয়। এখন এই মনিহারী দোকানখানি করেছি।

বিদ্যাসাগরের মনে পড়ে গেলো, হ্যাঁ, একটি টাকা দিয়েছিলেন বটে

ছেলেটিকে। ওকে আশীর্বাদ করলেন বিদ্যাসাগর। ওর দোকানে গিয়ে বসলেন।[৩০]

ভাটপাড়ার একজন পণ্ডিত সম্পর্কে একটি ঘটনা এখানে বলা যেতে পারে।

রাখালদাস ন্যায়রত্ন ভাটপাড়ার একজন পণ্ডিত। বহুকাল অনবরত পরিশ্রম করে তিনি দর্শনশাস্ত্র শিখেছেন। অতঃপর তিনি সাব্যস্ত করলেন যে ভাটপাড়ায় টোল খুলে দু-তিনটি ছাত্র বাড়িতে রেখে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করবেন। কিন্তু রাখালদাসের বাবা বললেন—ছাত্রকে খেতে দিতে পারব না। খেতে দিতে হলে মাসে ছ-সাত টাকার কমে চলবে না।

রাখালদাসের অত্যন্ত দুর্ভাবনা হল। মাসিক ছ-টাকার জন্য তিনি অনেক জায়গায় অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনো ফল হল না।

খুব দুঃখের কথা।

মাখনলাল ভট্টাচার্য রাখালদাসের শিষ্য। রাখালদাসের মুখে তাঁর দুঃখের কথা শুনে মাখনলাল বললেন—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এইরকম বিষয়ে অনেককে গোপনে মাসহারা দিয়ে থাকেন। যদি ইচ্ছা হয় তো চলুন, আমি সঙ্গে করে আপনাকে নিয়ে যাই।

রাখালদাস বললেন—তিনি পণ্ডিত ও মহাশয় ব্যক্তি, তাঁর কাছে দান নিতে বাধা নেই।

রাখালদাসকে নিয়ে মাখনলাল এলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। দর্শনশাস্ত্রে রাখালদাসের পাণ্ডিত্যের কথা বিদ্যাসাগরের অজানা নেই। রাখালদাসকে বিলক্ষণ সমাদর করলেন বিদ্যাসাগর।

রাখালদাস বললেন—আমি সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি। এখন বাড়িতে টোল খুলে বিদ্যাদানের মানস করেছি। কিন্তু টোল খুলতে হলে মাসিক দশ টাকা খরচ হবে, এই টাকার সংস্থান না করতে পারলে বাড়িতে বসে নিজের কাজ করতে পারি না।

বিদ্যাসাগর বললেন—যতদিন আপনার পসার না হবে, ততদিন আমি মাসিক দশ টাকা দিতে পারব, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ আরম্ভ করুন।

বিদ্যাসাগর আট বছর রাখালদাসকে মাসে-মাসে দশ টাকা পাঠিয়েছেন। তাছাড়াও মাঝে-মাঝে বিশ-পঞ্চাশ টাকা সাহায্য করেছেন, মাঝে-মাঝে কাপড়-চোপড় দিয়েছেন।

পসার হওয়ার পর রাখালদাস একদিন বিদ্যাসাগরকে বললেন—আর আপনি সাহায্য না করলেও আমার চলতে পারে।[৩১]

বড়মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য কখনো কোনো গরীবমানুষকে অবজ্ঞা করেননি বিদ্যাসাগর। বরং গরীবমানুষের জন্য এককথায় বড়মানুষের বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছেন।

বিদ্যাসাগর একজন বড়মানুষের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছেন। বৈঠকখানায় বসে বাড়ির কর্তার সঙ্গে গল্প-গুজব করছেন। সময় সুন্দর কেটে যাচ্ছে।

বৈঠকখানার নিচে একজন ভিক্ষুক এসে দাঁড়িয়েছে। চিৎকার করে ভিক্ষা চাইছে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, ভিক্ষুকের চিৎকার থামে না। আশ্চর্য, এ-বাড়ির কেউ কি ভিক্ষুকের গলা শুনতে পাচ্ছে না?

বিদ্যাসাগর বাড়ির কর্তাকে বললেন—এই যে একটা লোক কতক্ষণ ধরে চিৎকার করছে এ কি তোমার কানে ঢোকে না?

বিদ্যাসাগরের কথার উল্টো অর্থ করলেন বাড়ির কর্তা। তিনি ভাবলেন, ভিক্ষুকের চিৎকারে গল্প-গুজবে ব্যাঘাত হচ্ছে বলে বিদ্যাসাগর রাগ করেছেন।

কর্তা গম্ভীর গলায় হাঁক দিলেন—কোই হ্যায়?

হাঁক শুনে চাকর-দারোয়ান ছুটে এলো। হুকুম হলো, ভিক্ষুককে তাড়িয়ে দাও। কর্তার হুকুমে দারোয়ান ভিক্ষুককে গলাধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দিলে।

অর্থাৎ, হিতে বিপরীত হয়ে গেল। বিদ্যাসাগর কী চেয়েছিলেন, আর কী হল্যো। বেচারি না হয় আরো খানিকক্ষণ চিৎকার করত, ভিক্ষা না পেয়ে তারপর একসময় চলে যেত। বিদ্যাসাগর ভাবলেন, আমার জন্যেই বেচারা গলা-ধাক্কা খেল, আধমরা হলো।

সেই মুহূর্তে বিদ্যাসাগর বড়মানুষের বৈঠকখানা ছেড়ে উঠলেন।

কর্তা বললেন—যান কোথায়?

—আসছি। বলে বিদ্যাসাগর সটান রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। একটু এগিয়েই সেই ভিক্ষুকটির দেখা পাওয়া গেল।

বিদ্যাসাগর একটি টাকা বের করে ওকে দেখালেন। জিজ্ঞেস করলেন—এটি কী?

ভিক্ষুকটি টাকা চেনে। বলল—টাকা।

বিদ্যাসাগর বললেন—আচ্ছা, বলো, এই একটা টাকায় কত পয়সা হয়?

ঠিকঠাক জবাব দিল।

বিদ্যাসাগর বললেন—বাপু, তুমি যদি আমার কাছে সত্য করে বলো যে, ওই বাড়িতে ভিক্ষে করতে আর কখনো যাবে না, তাহলে তোমাকে এই টাকাটি দিই। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ওই পাপিষ্ঠের বাড়িতে আর কখনো যাব না।

সত্যিই বিদ্যাসাগর আর কোনোদিন ওই বড়মানুষের বাড়িতে যাননি।

হ্যাঁ, ভিক্ষুকটিকে টাকাটা দিয়ে গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। খানিকদূর গিয়ে মনে হয়েছিল, একটা আস্ত টাকা হাতে পেয়েছে, ভিক্ষুকটি হয়তো ক্ষিদেয় মরে গেলেও টাকাটা ভাঙিয়ে খাবে না। তাই আবার ভিক্ষুকটির কাছে ফিরে এসে বিদ্যাসাগর ওর হাতে আরো দুটি পয়সা দিয়ে গিয়েছিলেন।[৩২]

একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়িতে বিদ্যাসাগর নিমন্ত্রিত হয়েছেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে, কী আশ্চর্য, দারোয়ানের নিষেধে অপদস্থ হতে হলো। বাড়িতে ফিরে এলেন বিদ্যাসাগর।

নিমন্ত্রণকর্তাদের শিক্ষা দিতে হবে। একজন চাকরকে দারোয়ান করে দরজায় বসিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর। বললেন—আমার বিনা হুকুমে কাউকে এখন বাড়িতে আসতে দেবে না।

কিছুক্ষণ পরেই নিমন্ত্রণকর্তারা এলেন। কিন্তু ঢুকতে পারলেন না, বিদ্যা-সাগরের সঙ্গে দেখা করতে পারলেন না, ফিরে যেতে হলো।

জীবনে কেবলমাত্র এই একবার নিজের বাড়ির দরজায় দারোয়ান বসিয়েছেন বিদ্যাসাগর।[৩৩]

স্বনামধন্য কবি নবীনচন্দ্র সেন প্রথম কখন দেখেছেন বিদ্যাসাগরকে?

আজ নবীনচন্দ্রের নাম কে না জানে, কিন্তু তখন কেউ চিনতেন না নবীনচন্দ্রকে।

নবীনচন্দ্রের বাড়ি চট্টগ্রামে।

১৮৬৩ সালে এণ্ট্রান্স পাশ করল নবীনচন্দ্র। তারপর কলেজে পড়ার জন্য চলে এল কলকাতায়। নবীনচন্দ্র আর চন্দ্রকুমার—দুজনে একসঙ্গে এল।

চন্দ্রকুমার নবীনচন্দ্রের চেয়ে বয়সে সামান্য একটু বড়ো। সম্পর্কে 'দাদা'।

ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর* নবীনচন্দ্রের বাবার পরম বন্ধু। নবীনচন্দ্রকে তিনি খুব ভালোবাসতেন।

কিছুকাল পর তিনি কলকাতায় এলেন। এসে ওদের বললেন—তোমরা দুজনে এভাবে কেমন করে থাকবে! অভিভাবক কেউ নেই এখানে, কিছু নেই। চলো, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেব।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচয় হবে, এ তো মহা আনন্দের কথা। অন্নদাচরণের সঙ্গে দুজনে তো চলল।

বিদ্যাসাগরকে সেই প্রথমবার দেখার কথা উত্তরকালে নবীনচন্দ্র চমৎকার বর্ণনা করেছেন :

"ও হরি! এই কি খ্যাতনামা বিদ্যাসাগর?...এই খর্বাকৃতি, চক্রাকারে মুণ্ডিতমস্তক, নিমজ্জিত তীক্ষ্ম নেত্র, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক অধরভঙ্গি, গগনোপম উচ্চ প্রশস্ত ললাট, প্রশস্ত উরস, বলিষ্ঠ শরীর, কৃষ্ণবর্ণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর? চরণে চটি, পরিধানে সামান্য ধুতি, গলায় বিশদ অমল-ধবল মুক্তাহারসন্নিভ যজ্ঞোপবীত, হস্তে ক্ষুদ্র রজতনলসংযুক্ত একটি সামান্য হুঁকা, মুখে হাসি, মূর্তিতে শান্তি, হৃদয়ে অমৃতরাশি,—আমাদের ন্যায় বালকের সঙ্গে পর্যন্ত সমানভাবে চিরপরিচিত আত্মীয়ের মত সস্নেহ আলাপ করিতেছেন—এই কি সেই বিদ্যাসাগর!"

এই সেই বিদ্যাসাগর। ওদের বাসার ঠিকানা জিজ্ঞেস করে রাখলেন বিদ্যাসাগর। সময়ে-সময়ে ওদের দেখা করতে বললেন। আর, হ্যাঁ, অসুখ-বিসুখ হলে খবর দিতে যেন ভুল না হয়। বিদ্যাসাগর মাঝে-মাঝে ওদের বাসায় যাবেন, ওদের দেখে আসবেন। নিজের মুখেই তো বিদ্যাসাগর এসব কথা বললেন। এমন সরল ও সস্নেহ গলায় এসব কথা বললেন বিদ্যাসাগর যে নবীনচন্দ্রের চোখে জল এসে গেল।

কিছুদিন পরের কথা।

কালীঘাটে গিয়েছে নবীনচন্দ্র। ফিরে এসে চাকরের মুখে শুনল, একটি লোক এসেছিল, নানারকম খোঁজ-খবর নিয়ে গেছে।

কে? ভেবেচিন্তে নবীনচন্দ্র বলল—বিদ্যাসাগর মশায় নয় তো।

চাকরটি এককথায় নস্যাৎ করে দিল।—এমন কদাকার পুরুষ কখনো বিদ্যা-সাগর হতে পারে না। যেমন চেহারা, তেমনি পোযাক। সামান্য একজন গরীব কেউ হবে।

এ যা বর্ণনা, বিদ্যাসাগরই হয়তো এসেছিলেন। কিন্তু...

---

* চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির মহাশয়কে বিদ্যাসাগর মহাশয় সহোদরনির্বিশেষে স্নেহ করিতেন। অনেক সময়ে বিধবাবিবাহ ব্যাপারে খাস্তগির মহাশয়ের সহকারিতায় আত্মীয়তার আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। ডাক্তার খাস্তগির মহাশয়ের লোকান্তর গমনের পর তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল খাস্তগির বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই পারিবারিক শোক সংবাদ প্রদান করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় রুগ্ন শরীরে বন্ধুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে ডাকাইয়া আপন স্নেহালিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, "বাবা! তোমার বাবার মৃত্যুর পূর্বে একবার সংবাদ দাও নাই। আমার সঙ্গে শেষ দেখাটা হল না, একবার মুখখানি দেখিতে পাইলাম না, নিজের মত চিকিৎসা করাইতেও পারিলাম না। নিতান্ত পরের মত একটা মৃত্যু সংবাদ পাঠাইলে, তোমার বাবা যে আমার পরমাত্মীয় ছিলেন।" (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৬৭-৬৮।)

মুখে একবার বলেছেন বলেই কি বিদ্যাসাগরের মতো মানুষ সত্যি-সত্যি এদের বাসায় এসে হাজির হবেন? এও কি সম্ভব? নবীনচন্দ্রের সন্দেহ কিছুতেই যায় না।

সন্দেহ গেল পরদিন।

পরদিন বিদ্যাসাগরের কাছে চলে এল নবীনচন্দ্র। হ্যাঁ, বিদ্যাসাগরই কাল ওদের বাসায় গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর দেখে এসেছেন, পশ্চিমদুয়ারি ঘরে নবীনচন্দ্র থাকে।

বিদ্যাসাগর বললেন—পশ্চিমদুয়ারি ঘর এত কষ্টকর যে রামরাজ্যে তার ট্যাক্স ছিল না। চল, তোমাদের জন্য আরেকটি বাড়ি দেখে আসি।

মোটা চাদরখানা গায়ে দিয়ে উঠলেন। চটি পায়ে চটাস-চটাস করে চললেন। ওদের জন্য আরেকটা বাড়ি খুঁজতে চললেন!

১৮৬৭ সালের শেষার্ধে নবীনচন্দ্রের বাবা মারা গেলেন। মস্ত সংসার। একটি পয়সাও রেখে যেতে পারেননি। উপরন্তু, ঋণের ভার আছে। সব ভার এখন নবীনচন্দ্রকে বইতে হবে।

বি.এ. পরীক্ষার তখন প্রায় তিনমাস বাকি। চোখের জল মুছে নবীনচন্দ্র বি.এ. পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে লাগল। বি.এ, পরীক্ষা দিল।

পরদিন সকালে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে গেল নবীনচন্দ্র। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে।

বৈঠকখানা তখন লোকজনে ভর্তি। বিদ্যাসাগর আর রাজকৃষ্ণকে প্রণাম করল নবীনচন্দ্র। নবীনচন্দ্রের চেহারা দেখে চমকে উঠলেন দুজনে। হয়েছে কী?

নবীনচন্দ্র বলল—আমার বাবা মারা গেছেন। আমার দারুণ বিপদ।

নবীনচন্দ্র কাঁদছে, ওঁদের দুজনেরও চোখের জল পড়ছে। বৈঠকখানা ভর্তি লোকজন।

আস্তে-আস্তে সকলকে বিদায় দিয়ে নবীনচন্দ্রকে নির্জন বারান্দায় ডেকে নিয়ে গেলেন বিদ্যাসাগর। জিজ্ঞেস করলেন—কী বিপদ?

মস্ত সংসার। বাবা একটি পয়সাও রেখে যেতে পারেননি। কেমন করে সংসার চলবে।

সব শুনলেন বিদ্যাসাগর। স্তব্ধ হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে বললেন—তুমি এখনো বালক; আর তোমার এই বিপদ! কিন্তু ভাই! তুমি কাতর হয়ো না। আমিও একদিন তোমার মতো দুঃখী ছিলাম। সংসারে দুঃখীই বেশি। তোমার বাবা আর কিছু না দিয়ে যান, তোমাকে তো শিক্ষা দিয়ে গেছেন। মোটকথা, তোমার এখন বাড়ি যাওয়া হবে না। এখানে কিছুদিন থেকে পরীক্ষার ফলের অপেক্ষা করতে হবে, চাকরির চেষ্টা করতে হবে। মাসে তোমার কত খরচ লাগে?

নবীনচন্দ্র বলল—কুড়ি টাকা। আমার দুটি প্রাইভেট টুইশন আছে, তাতেই আমার এখানে বাসা-খরচ চলে যাবে। সংসারের জন্যই ভাবনা!

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—এখন তাঁদের কেমন করে চলছে?

—বলতে পারি না। মা আমার কাছে সেসব কথা কিছু লেখেননি।

কী যেন ভাবলেন বিদ্যাসাগর। বললেন—তোমার মায়ের কাছে সেকথা জিজ্ঞেস করো। কোনো সাহায্যের দরকার আছে কিনা, জানো। আর তোমারও এখন প্রাইভেট টুইশন রাখলে চাকরির চেষ্টায় ব্যাঘাত হবে।

বলে উঠে গেলেন বিদ্যাসাগর। একখানা চিঠি লিখে নিয়ে এলেন। চিঠিখানা নবীনচন্দ্রের হাতে দিয়ে বললেন—চিঠিখানা সংস্কৃত লাইব্রেরিতে দেবে। কলকাতার বাইরে যাচ্ছি আমি। কিছুদিন পর ফিরে আসব। তখন আমার সঙ্গে দেখা ক'রো।

চিঠিখানা এনে সংস্কৃত লাইব্রেরিতে দিল নবীনচন্দ্র। সেই চিঠি দিয়ে লাইব্রেরি থেকে চল্লিশটি টাকা পেল।

টাকা কেন? টাকা কিসের?

নবীনচন্দ্র বলল—আমি তো কোনো টাকা-পয়সা চাইনি।

লাইব্রেরির কর্মচারী বললেন—সেসব কিছু জানি না। ওই চিঠিতে চল্লিশ টাকা দেবার হুকুম আছে। তাই দিলাম।[৩৩]

উত্তরকালে নবীনচন্দ্র মস্ত চাকরি করেছেন, কবি হিসেবে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছেন। নবীনচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'পলাশির যুদ্ধ', 'দয়ার সাগর—পূজ্যতম—পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে'র শ্রীচরণে উৎসর্গ করেছেন।

'পলাশির যুদ্ধে'র উৎসর্গপত্রটি তুলে দিচ্ছি :

"দয়ার সাগর,
পূজ্যতম
পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

দেব!

যে যুবক দুঃখের সময়ে অশ্রুজলে একদিন আপনার চরণ অভিষিক্ত করিয়াছিল, আজি সেই যুবক আবার আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত হইল। আপনার আশীর্বাদে, ততোধিক আপনার অনুগ্রহে, আজি তাহার বদন প্রসন্ন, হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ। আপনার দয়াসাগরের বিন্দুমাত্র সিঞ্চনে দরিদ্রতা-দাবানল হইতে যেই মানস-কানন রক্ষা পাইয়াছিল, আজি সেই কানন-প্রসূত একটি ক্ষুদ্র কুসুম আপনার শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত হইল;—এই কারণ তাহার এত আনন্দ। বঙ্গকবিরত্নগণ স্বীয় মানস-উদ্যানজাত যে চিরসুবাসিত কুসুম-রাশির দ্বারা আপনার ভারতপূজ্য পবিত্র নাম পূজা করিয়াছেন, আমি সেরূপ পবিত্র পরিমলবিশিষ্ট কুসুম কোথায় পাইব? আমার হৃদয়—কানন; আমার উপহার—বনফুল। কিন্তু মহর্ষিগণ পারিজাত কুসুমে যেই দেবপদ অর্চনা করেন, দরিদ্র ভক্তের ক্ষুদ্র অপরাজিতাও সেই পদে সমাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। আমার এই মাত্র সাহস—এই মাত্র ভরসা।

১লা বৈশাখ,
সন ১২৮২

আপনার চিরানুগত
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন"[৩৪]

১৮৬৬ সালের মাঝামাঝি দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল এদেশে। শাকপাতা, শেকড়-বাকড় খেয়ে দিন কাটিয়েছে কতজন। একমুঠো ভাতের অভাবে দিকে-দিকে মানুষজন মরে যাচ্ছে।

কলকাতার কলেজ-স্কোয়ারে সেসময়ে দিনের পর দিন উপোসী মানুষজনকে খেতে দেবার একটা ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে বিদ্যাসাগরকে নিজের হাতে পরিবেশন করতে দেখা গেছে ভাত, ডাল, তরকারি।

দারুণ দুর্ভিক্ষ। চতুর্দিকে হাহাকার।

বিদ্যাসাগর বীরসিংহে একটা অন্নছত্র খোলার ব্যবস্থা করে ফেললেন।

ক্ষীরপাই থেকে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদককে লেখা একখানা চিঠি প্রকাশিত হয়েছে ১৮৬৬ সালের ২৭-আগস্টের 'হিন্দু পেট্রিয়টে'। চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি :

"I have to inform you of the establishment of another *unnochutter* lately opened at Beersingha by Pundit Eswar Chunder Vidyasagur. Beersingha is in itself a very insignificant place but it claims the high honor of having given birth to the illustrious Vidyasagur, who has been a father to the inhabitants of his village. He supplies them food when they stand in need of it; his Doctor runs with medicines to their assistance when they fall sick; and he has also amply provided for the education of their youths in his school. Besides this he has helped many of their young men to become useful members of society as Native Doctors, Pundits and Printers."

বিদ্যাসাগরের বীরসিংহের সেই অন্নছত্রে বারোজন লোক দিনরাত রান্না করত, পরিবেশন করত কুড়িজন লোক। অন্নছত্রে ক্রমে-ক্রমে ভিড় বাড়তে লাগল। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে দিনরাত খেতে দিয়েও কূল পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগর তখন বলেছেন : যত টাকা খরচ হোক, কেউ যেন অভুক্ত না থাকে। সকলেই যেন খেতে পায়।

দুর্ভিক্ষের সময় প্রায়ই বীরসিংহে যেতেন বিদ্যাসাগর।

অন্নছত্রে মেয়েরাও খেতে আসে। পেটে ভাত নেই, মাথায় তেল দেবে কোত্থেকে। তেলের অভাবে তাদের চুল রুক্ষ হয়ে উঠল। দেখে বিদ্যাসাগর প্রত্যেকের জন্য দু-পলা তেলের ব্যবস্থা করে দিলেন। যারা তেল বিলি করত, তারা খুব সাবধানে কাজ করত। হাড়ি-মুচি-ডোম প্রভৃতি নিচুজাতের মেয়েদের সঙ্গে যদি ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায়, এই আশঙ্কায় তারা তফাৎ থেকে তেল দিত। আহা, এভাবে কি মানুষকে কিছু দিতে হয়! বিদ্যাসাগর নিজেই এগিয়ে এলেন তখন। নিজের হাতেই তিনি নিচুজাতের গরীব দুঃখিনীদের রুক্ষ চুলে তেল মাখিয়ে দিতে লাগলেন।

"এই ঘটনাশ্রবণে"—উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন—"আমাদের হৃদয় যে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহা বিদ্যাসাগরের দয়া অনুভব করিয়া নহে—কিন্তু তাঁহার দয়ার মধ্য হইতে যে একটি নিঃসংকোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহা দেখিয়া আমাদের এই নীচজাতির প্রতি চিরাভ্যস্ত ঘৃণাপ্রবণ মনও আপন নিগূঢ় মানবধর্মবশত ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।"[৩৬]

অন্নছত্রে যারা খেত তারা একবার বিদ্যাসাগরকে বলল—খিচুড়ি খেতে-খেতে অরুচি হয়ে গেছে। সপ্তাহে একদিন মাছ-ভাত হলে ভালো হয়।

তথাস্তু। সপ্তাহে একদিন ভাতের ব্যবস্থা করে দিলেন বিদ্যাসাগর। ভাত, পোনামাছের ঝোল আর দই।

দুর্ভিক্ষে বিদ্যাসাগর অনেক মানুষকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছেন। আর এই সময়েই দীনদুঃখীরা তাঁকে 'দয়ার সাগর' বলে ডাকতে আরম্ভ করেছে।

বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় লিখিত হয়েছে : "দয়া বিদ্যাসাগরের জীবনগত এক অতি প্রধান ধর্ম। এই নিমিত্ত অনেকে ইহাঁকে দয়ার সাগরও বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃও ইহাঁর ন্যায় পরোপকার ব্রতপরায়ণ লোক অতি বিরল।"[৩৭]

উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "অনেক মহৈশ্বর্যশালী রাজা রায় বাহাদুর প্রচুর ক্ষমতা লইয়া যে উপাধি লাভ করিতে পারে নাই, এই দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান (বিদ্যাসাগর) সেই 'দয়ার সাগর' নামে বঙ্গদেশে চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিলেন।"[৩৮]

অন্নছত্র খুলে বিদ্যাসাগর কত টাকা খরচ করেছেন, তার কোনো হিসেব নেই। কেবলমাত্র নিজে অন্নছত্র খুলেই কর্তব্য শেষ করেননি। সরকার যাতে অন্নছত্র খোলে, সে-বিষয়েও চেষ্টা করেছেন। সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। একাধিক সরকারী অন্নছত্র খোলা হয়েছে।

মন্‌ট্রিসর সাহেব তখন বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনার। দুর্ভিক্ষ শেষ হবার পর মন্‌ট্রিসর সাহেব, বেঙ্গল গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারির আদেশ অনুসারে, বিদ্যাসাগরকে একখানা চিঠি লিখে জানিয়েছেন : "the warm acknowledgement of Government for your generous exertions in relieving the poor during the recent scarcity in the Hooghly District.'[৩৯]

বিদ্যাসাগরের দয়া কি কেবল মানুষের জন্য? সর্বজীবে দয়া। একসময়ে মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। বাছুরেরা মায়ের দুধ পায় না দেখে এককালে দুধ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন; দুধ তো নয়ই, দুধের তৈরি কোনো জিনিষই খেতেন না। ঘোড়া নিজের কষ্ট বলতে পারে না; কিছুকাল বিদ্যাসাগর তাই ঘোড়ার গাড়িতে চড়েননি।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন : "বিদ্যাসাগর পাল্কী চড়িতেন, ঘোড়ার গাড়ী চড়িতে সহজে রাজি হইতেন না; বলিতেন যে, পাল্কী চড়ায় কোন দোষ আছে মনে করি না। ঘোড়ার গাড়ী চড়ায় কিন্তু আমার বিশেষ আপত্তি। ঘোড়াগুলোকে তাহাদের অনিচ্ছায় আমাকে বহন করিতে বাধ্য করান হয়; কিন্তু পাল্কী বেয়ারারা স্বেচ্ছায় অর্থের প্রত্যাশায় আমাকে বহন করে। এই জন্য এক হিসাবে ঘোড়ার গাড়ী চড়া কতকটা immoral মনে করি।"[৪০]

কেবল দয়ার সাগর নন, বিদ্যারও সাগর। যেমন বিশাল মনপ্রাণ, তেমনি অগাধ বিদ্যাবুদ্ধি।

হাইকোর্টের জজ দ্বারকানাথ মিত্রের সঙ্গে প্রায়ই শাস্ত্র নিয়ে আলাপ-আলোচনা হতো বিদ্যাসাগরের।

সেদিন দ্বারকানাথের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব বসে আছেন ঘরে; আলাপ-আলোচনার পর বিদ্যাসাগর উঠে গেলেন। দ্বারকানাথ বন্ধুদের বললেন—বাবা রে একটা giant! দেখলে কেমন বুদ্ধিবিদ্যার দৌড়! মানুষটার যেমন heart তেমনি head![৪১]

অগাধ পণ্ডিত হয়েও কথাবার্তায় বিদ্যাসাগর বরাবর সহজ-সরল শব্দ

ব্যবহার করেছেন। নিতান্ত দরকার না হলে দ্বরূহ শব্দ উচ্চারণ করেননি।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন : "একটিবার আমার স্মরণ হয় যে, সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে তিনি (বিদ্যাসাগর) একটি বড় গোছের সংস্কৃত কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন,—কথাটি 'স্বরূপযোগ্যতা।' এই শব্দটি ন্যায়-শাস্ত্রের ভয়ানক কঠিন একটি পারিভাষিক শব্দ; ইংরাজীতে ইহার অর্থ এইরূপ করা যায়—fitness *per se*; যে উপলক্ষে তিনি এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন সেটি এই;—একদিন আমি তাঁহার সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম,—এমন সময় দ্বারবান আসিয়া তাঁহার হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানি পড়িয়া তিনি আমাকে বলিলেন, 'প্রসন্নকুমার ঠাকুর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। দেখ, আমরা এক দেশের লোক, এক জাত, এই সহরের ভিতরেই আছি, তিনি ডেকে না পাঠিয়ে একবার এসে দেখা কর্লেই পার্তেন। সাহেবেরা যদি এই রকম চিঠি দিয়ে আমাদের ডেকে পাঠায় ত যাওয়া উচিত মনে করি; স্বদেশীর সঙ্গে আসা যাওয়ার স্বরূপযোগ্যতা আছে, সাহেবদের সঙ্গে সেটা নেই।'—অবশ্যই তিনি দেখা করিতে যান নাই।"[৪২]

নিজের লাইব্রেরির প্রতি বিদ্যাসাগরের পরম ভালোবাসা।

কথাপ্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর একদিন ঠাকুরদাসকে বললেন—কলকাতায় এতকাল ভাড়াটে বাড়িতে কাটাচ্ছি। যদি বীরসিংহকে ভুলে যাই সেইজন্যই কলকাতায় বাড়ি করিনি। কতগুলি বইয়ের সেল্ফ আছে, মাঝে-মাঝে একবাড়ি থেকে অন্যবাড়িতে নিয়ে যেতে অনেক ক্ষতি হয়, ইত্যাদি কারণে কলকাতায় জমি কিনে বাড়ি করতে ইচ্ছা করি। আপনার মত কী?

ঠাকুরদাস বললেন—বই রাখার উপলক্ষে বাড়ি করবে, এ-সংবাদে পরম সুখী হলাম। তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি করার উদ্যোগ করো।

বাবার অনুমতি না নিয়ে বিদ্যাসাগর কখনো কোনো কাজ করেন না।[৪৩]

বাদুরবাগানে বিদ্যাসাগরের নতুন বাড়ি উঠল। বাঙলা ১২৮৩ সালের শীতকালে বিদ্যাসাগর বাদুড়বাগানের নতুন বাড়িতে এলেন।

উত্তরকালে শশিভূষণ বসু বিদ্যাসাগরের লাইব্রেরি সম্পর্কে লিখেছেন :
"আমি কাচে আবৃত শেল্ফের পুস্তকগুলির প্রতি বার-বার তাকাইতে
লাগিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, বলিলেন,
"এস বই দেখাই," এই বলিয়া এক-একটি শেল্ফ খুলিয়া বই দেখাইতে
লাগিলেন। ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি বিশেষ বিশেষ
বিভাগে সজ্জিত করা হইয়াছে। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। সমস্ত
পুস্তক একই রকমের বাঁধান। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, বিলাতের পুস্তক-
বিক্রেতাদের নিকট এইরূপ বলা আছে, যে, নূতন ভাল পুস্তক বাহির হইলে,
তাহারা একরূপ বাঁধাই করিয়া, আমার এখানে পাঠাইবেন। দেখিলাম,
আরভিঙের স্কেচ-বুক, এই সামান্য দরের পুস্তকখানিও অন্যান্য দামী পুস্তকের
মত বাঁধান হইয়াছে। বইখানি কিনিতে যে খরচ পড়িয়াছে তাহা অপেক্ষা
বাঁধাইয়ের মূল্য অধিক। এই সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থরাজির মধ্যে বসিয়া বিদ্যাসাগর
মহাশয় তাঁহার সময় যাপন করিতেন। এত বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের পাশ্চাত্য
সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনের প্রতি কি প্রবল অনুরাগই তাঁহার প্রকাণ্ড
লাইব্রেরী প্রকাশ করিতেছে, তখন এই কথাই মনে আসিতে লাগিল। বইগুলি
তাঁহার এতই অনুরাগের ও ভালবাসার সামগ্রী ছিল যে, কোন ব্যক্তি ঐ লাই-

ব্রেরীর বই পড়িতে চাহিলে তিনি তাহা কখনই দিতেন না; এই কথা বলিতেন, উহা দিলে তাঁহার প্রাণে লাগে। উহা না-দিয়া তিনি সে পুস্তক একখানি কিনিয়া দিতেও প্রস্তুত হইতেন।"[৩৯]

উল্লেখযোগ্য, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর কিছুকাল বাদে তাঁর পরম ভালোবাসার লাইব্রেরীর বন্ধকী স্বত্বের অধিকারী হয়েছেন লালগোলার রাজা।*

আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ বিদ্যাসাগর। আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ বলেই বিদ্যাসাগরের জীবনে আশ্চর্য-কাহিনীর আর ইতি-অন্ত নেই।

সাতপাড়ি‌পাতি রায় বলেছেন: "একদা বৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর পথে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন এক বারাঙ্গনা বর্ষাসিক্ত হইয়া আত্মবিক্রয়ের জন্য বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। ক্রেতৃবিহীন অথচ এই কুলত্যাগিনী নারীর অন্নসংস্থানের দ্বিতীয় উপায় নাই।—বিদ্যাসাগরের করুণচিত্ত দ্রব হইয়া গেল, তিনি বারাঙ্গনার হাতে আট আনা পয়সা দিয়া বলিলেন, "যাও মা, আর জলে ভিজো না।"†[৪০]

একবার রামগোপাল ঘোষ আর ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষালের সঙ্গে বিদ্যাসাগর বর্ধমানে গিয়েছেন। তিনজনে এক বাসায় আছেন।

রাজবাড়ির সিধায় খেতে রাজি হননি বিদ্যাসাগর। একজন বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে খেতেন। এ-খবর বর্ধমানের মহারাজের অজানা থাকেনি।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে চাইলেন বর্ধমানের মহারাজ। লোক পাঠালেন। বিদ্যাসাগর প্রথমে যেতে রাজি হননি, কিন্তু শেষপর্যন্ত এড়াতে না পেরে গেছেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে বর্ধমানের মহারাজ কৃতার্থ হয়েছেন।

বর্ধমানের মহারাজ বিদায়কালে বিদ্যাসাগরকে দিয়েছেন পাঁচশো টাকা ও একজোড়া শাল। কিন্তু বিদ্যাসাগর নেননি। বলেছেন—আমি কারো দান নিই না। কলেজের বেতনেই আমার স্বচ্ছন্দে চলে। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরা এরকম বিদায় পেলে অনেকটা উপকৃত হতে পারেন।

তখন থেকে যখনই বিদ্যাসাগর বর্ধমানে যেতেন, মহারাজ আদর-অভ্যর্থনা করতেন।

বর্ধমানের মহারাজ বীরসিংহ গ্রামকে বিদ্যাসাগরের তালুক করে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর নিতে রাজি হননি। বলেছেন—আমার যখন এমন অবস্থা হবে যে আমি সমস্ত প্রজার খাজনা দিতে পারব, তখন তালুক নেব।[৪১]

বিদায় গ্রহণ করেননি, এই কারণেও বিদ্যাসাগর নিন্দিত হয়েছেন। কোনো-কালে বিদ্যাসাগরের নিন্দুকের অভাব হয়নি। ১৮৫৪ সালের ২২ জুলাইয়ের 'সম্বাদ ভাস্করে' প্রকাশিত একখানা প্রেরিতপত্রের কিয়দংশ উদ্ধার করি:

---

* বিদ্যাসাগর লাইব্রেরি বর্তমানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে। "বিদ্যাসাগর-লাইব্রেরি লালগোলার রাজা-বাহাদুরের নিকট বন্ধক ছিল। রাজা-বাহাদুর ১৯১৪ সনের ৯ই জানুয়ারি রেজেস্টারীকৃত দলিলদ্বারা সেই বন্ধকী স্বত্ব সাহিত্য-পরিষৎকে দান করিয়াছেন।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: পরিষৎ-পরিচয়, কলকাতা, ১৯৩৯, পৃ. ১৩৬।)

† বিহারীলাল সরকার লিখেছেন: "শুনিয়াছি, সময়ে সময়ে, রাত্রিকালে বাড়ী ফিরিবার সময়, কোন অভাগিনী বেশ্যাকে উপার্জন আশায় কষ্টভোগ করিতে দেখিলে, তিনি (বিদ্যাসাগর) তাহাকে টাকা পয়সা দিয়া, সে রাত্রির জন্য তাহাকে ঘরে ফিরিয়া যাইবার জন্য পরামর্শ দিতেন।" (বিহারীলাল সরকার: বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩৪৬।)

"বর্দ্ধমানেশ্বরী শ্রীল শ্রীমতী মহারাজ্ঞী তুলাদান করিয়া কলিকাতাস্থ প্রধান পণ্ডিতগণের নিকট বিদায় প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা আদরে সকল মহাশয়েরা গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কেবল শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত বিদায় গ্রহণ করেন নাই কহিয়াছেন যে আমি গবর্ণমেণ্টের স্থানে তিন শত টাকা মাসিক বেতন পাইতেছি তাহাই আমার যথেষ্ট হইয়াছে আর অন্য প্রকারে উপার্জ্জন করিতে বাসনা নাই, ইহাতে বোধ হয় যে২ মহাত্মাগণ ঐ বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা অল্পাল্প বেতন পাইয়া থাকেন তৎপ্রযুক্ত তাঁহারদিগের অন্য প্রকারে উপার্জ্জন করিবার আকাঙ্ক্ষা আছে এ কারণ তাঁহারা রাজধানীর বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন এরূপ বিবেচনা বিদ্যাসাগরের অগাধ বিদ্যা হইতে উদ্ভব হইয়াছে ইহাই বলিতে হইবেক আমরা বহু দিবসাবধি অতি দূর হইতে যে বিদ্যাসাগর২ শব্দ শুনিয়াছিলাম এই গাম্ভীর্য্য কি তাঁহার উপযুক্ত সম্ভাবনা হইতে পারে, বঙ্গদেশের মধ্যে অতি প্রাচীন রাজধানী বর্দ্ধমান, বিদ্যাসাগর গবর্ণমেণ্টের অধিক প্রিয়পাত্র হইলেও বর্দ্ধমানেশ্বরীর দান অবজ্ঞা করিয়া ফিরিয়া দেওয়া অতি অসঙ্গত কার্য্য হইয়াছে আমি বোধ করি যদি ঐ দান বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপন সম্ভ্রম সূচক জ্ঞান করিয়াও গ্রহণ করিতেন তবে তাঁহার নামের উপযুক্ত কার্য্য করা হইত, হায়, আমারদিগের বাঙ্গালি লোকের কুস্বভাব বিদ্যা প্রভাবেও দূর হইতেছে না, অন্যদেশীয় লোকেরা বিদ্যায় বিদ্বান হইলেও বহু সংখ্যক ধনোপার্জ্জন করিতে পারিলেও আপনারদিগের নম্রতা শীলতা সভ্যতা পরিত্যাগ করিতে পারেন না কিন্তু বিদ্যাসাগর বিদ্যা-সাগরের বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিয়াই ও তিনশত টাকা মাসিক বেতন প্রাপ্ত হওয়াতেই অহঙ্কারে একেবারে চক্ষুঃ কর্ণ উভয়েন্দ্রিয় হারাইয়াছেন...।"

কখনো কি বিদায় নেননি বিদ্যাসাগর? অন্তত একবার নিয়েছেন। একটি রূপোর পানপাত্র।* তাতে অঙ্কিত একটি শ্লোক :

পানপাত্রমিদং দত্তং বিদ্যাসাগরশর্ম্মণে।
স্বর্গকামনয়া মাতুর্গুরুদাসেন শ্রদ্ধয়া।

---

* এই পানপাত্রটি বর্তমানে রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে।

এছাড়াও বর্তমানে রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে : বিদ্যাসাগরের স্বহস্ত-লিখিত একটি সরকারী রিপোর্টের কপি; বিদ্যাসাগরের নিত্যব্যবহার্য কলম; বিদ্যাসাগরের নামের কার্ড এবং কার্ডপ্লেট; বিদ্যাসাগরের নিজস্ব গ্রন্থাগারের বই, একখানা 'শকুন্তলা'; বিদ্যাসাগরের কৃত্রিম দাঁত; বিদ্যাসাগরের নিজস্ব সীল (personal seals); বিদ্যাসাগর ব্যবহৃত কাগজ-কাটা (a paper cutter);; বিদ্যাসাগর ব্যবহৃত কলম মুছবার পাত্র (a pen-wiper); বিদ্যাসাগর ব্যবহৃত দোয়াতদানী (occasionally used by Vidyasagar); বিদ্যাসাগর ব্যবহৃত একটি চুণের পাত্র (এই পাত্র থেকে বিদ্যাসাগর পানের চুণ খেতেন); বিদ্যাসাগর ব্যবহৃত হুঁকোর মুখ ও মাথা; বিদ্যাসাগর ব্যবহৃত দু-খানা কাগজ-চাপা (paper weights); বিদ্যাসাগর ব্যবহৃত একখানা গরদের ধুতি (এই ধুতিখানি পরে বিদ্যাসাগর পিতামাতার শ্রাদ্ধ করেছিলেন)।

বীরসিংহে বিদ্যাসাগর-বাটীতে বর্তমানে রক্ষিত আছে : বিদ্যাসাগরের কৃত্রিম দাঁত; বিদ্যাসাগরের মণিব্যাগ; বিদ্যাসাগরের একটি সীসার পেপার-ওয়েট; বিদ্যাসাগরের একটি বাতি (মোমবাতি) নেভানোর জিনিস; বিদ্যাসাগরের একখানা ভিজিটিং কার্ড; বিদ্যাসাগরের ভিজিটিং কার্ডের প্লেট (প্লেটখানা তামার; প্লেটখানার একদিকে লেখা আছে : Iswara Chandra Sarma ; প্লেটখানার উল্টোপিঠে প্লেট-প্রস্তুতকারকের নাম-ঠিকানা লেখা আছে : Hughes & Kimber . . . 107, Shoe Lane, London.)

বীরসিংহে বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-মন্দিরে বর্তমানে রক্ষিত আছে : বিদ্যাসাগর ব্যবহৃত স্ট্রীলট্রাঙ্ক; বিদ্যাসাগর ব্যবহৃত হুঁকোর বৈঠক।

হ্যাঁ, গুরুদাস মাতৃশ্রাদ্ধে বিদ্যাসাগরকে দিয়েছেন। মাতৃভক্ত গুরুদাসের দান মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর ফিরিয়ে দিতে পারেননি।[৫৭]

দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় সহোদর। ছোটোলাট অনুগ্রহ করলেই দীনবন্ধু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারেন। বিদ্যাসাগর ছোটোলাটকে অনুরোধ করলেই কাজটা হয়ে যায়।

কিন্তু নিজের ভাইয়ের চাকরির জন্য বিদ্যাসাগর কেমন করে ছোটোলাটকে বলেন।

দীনবন্ধুর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে বিদ্যাসাগর একদিন ছোটোলাটকে বললেন—একটা কথা কদিন ধরে বলব মনে করি, তা আর বলতে পারি না।

কী এমন কথা? কিন্তু কথাটা সেদিনও বিদ্যাসাগর বলতে পারলেন না।

হপ্তাখানেক বাদে আবার ছোটোলাটের সঙ্গে দেখা। ছোটোলাট সেদিন কথাটা না শুনে বিদ্যাসাগরকে ছাড়বেন না। বললেন—আজ আপনাকে আটক করব।

বহুকষ্টে কথাটা বললেন বিদ্যাসাগর।

ছোটোলাট বললেন—এই কথাটা বলতে এত নারাজ হওয়ার কারণ কি? এতদিন বললে যে কোনকালে চাকরি হয়ে যেত, হুগলীতে খালি ছিল। কোথাও খালি আছে কিনা জেনে আপনাকে লিখব।

পরের সপ্তাহে দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে গেলেন।[৫৮]

বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সহোদর শম্ভূচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন অতি সুখ্যাতির সহিত প্রায় দুই বৎসর কাল ডেপুটী মাজিষ্টরী কর্ম করেন।...বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের কোন বিষয়ের তর্ক উপস্থিত হয়, একারণ, তেজস্বী দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ঐ কর্মে রেজাইন দেন...।"[৫৯]

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি থেকে যথেষ্ট আয়-আদায় হতো। কিন্তু একসময়ে নিতান্ত বিরক্ত হয়ে বিদ্যাসাগর ডিপজিটরির স্বত্ব ছেড়ে দিতে চাইলেন। কথায়-কথায় কৃষ্ণনগরের ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় বললেন—আপনি বিরক্ত না হয়ে যদি সন্তুষ্ট হয়ে দেন তো আমি ডিপজিটরি নিয়ে আপনার পছন্দমতো চালাতে পারি।

তথাস্তু। বিক্রী করলে কয়েক হাজার টাকা পেতে পারতেন কিন্তু মুখের কথায় বিদ্যাসাগর ডিপজিটরি ব্রজনাথকে দান করে দিলেন। বললেন—আচ্ছা, আপনাকেই দিলাম।

পরদিন লোকে টাকা নিয়ে সাধাসাধি করেছে, কিন্তু বিদ্যাসাগর বললেন—বিশ হাজার টাকা দাম হলেও দান করেছি।[৬০]

ফেরিঅলার সঙ্গে দরাদরি পছন্দ করেন না বিদ্যাসাগর। আগে থেকেই ফেরিঅলাকে সেজন্য সাবধান করে দিতেন।

পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন বললেন—দাদা কেবল কেনেন আর ঠকেন।

বিদ্যাসাগর বললেন—এমনি দু-পয়সা তো কখনো দেবে না। বাড়িতে মাথায় করে বেচতে এসেছে তাকেও কিছু দেবে না?[৬১]

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় বিদ্যাসাগরের অগাধ আস্থা। বিস্তর বই আর ওষুধ কিনেছেন, বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন। বিদ্যাসাগর ডাক্তারি শেখার জন্য নরকঙ্কাল পর্যন্ত কিনেছেন।

as if the stomach was too full— Fulness
and pressure in the Hypochondria
after eating— Pain in the abdomen
worse after eating— Rumbling in
bowels and passage of flatus down-
ward— Sudden sharp pain in the
left side of abdomen— Abdomen
distended, with shortness of breath—
Urine of a deep red colour depositing
a copious red sediment— Pain
in the small of the back— Sticking
pain in the region of the right
kidney— Weakness in the limbs—
Sleep disturbed at night by numerous
dreams and frequent wakings

17. 10. 80. Lobelia Inflata 30.
night & morning—
Much relieved
20. 10. 80

বিদ্যাসাগরের অপ্রকাশিত ডায়েরির একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

Harimohan

Obstinate & passionate - Frequent expressions of fear, with great agitation - Frequent startings from sleep - Obstinate Constipation. Stools very hard, large, and dry, passed with difficulty and often much straining -

Bryonia 30.

7. 10. 80. Twice daily

3. 10. 80. Lycopodium 30. Twice daily

Cured 16. 10. 80.

মহেন্দ্রলাল সরকার বিখ্যাত অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার। হোমিওপ্যাথিতে তখন তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই।

ভবানীপুর থেকে একই গাড়িতে আসছেন তিনজন : বিদ্যাসাগর, শম্ভুচন্দ্র আর মহেন্দ্রলাল। হোমিওপ্যাথি নিয়ে গাড়ির মধ্যে মহেন্দ্রলালের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ভয়ানক বাদানুবাদ আরম্ভ হয়ে গেল। শম্ভুচন্দ্র বললেন—মশায়, আমাকে নামিয়ে দিন। আপনাদের বিবাদে আমার কানে তালা লাগল।[৩২]

শেষপর্যন্ত মহেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ব্রতী হয়েছেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসেবেও বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছেন।

বিদ্যাসাগর স্বয়ং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেছেন। কার্মাটাড় থেকে একবার বিদ্যাসাগর রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছেন : "আমি কল্য অথবা পরশ্ব আপনাকে দেখিতে যাইব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু এরূপ দুইটি রোগীর চিকিৎসা করিতেছি যে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কোন মতে উচিত নহে। এজন্য ২।৪ দিন দেওঘর যাওয়া রহিত করিতে হইল।"[৩৩]

ক্ষুদিরাম বসু লিখেছেন : "আমার একবার পেটের ব্যায়রাম হয়েছিল। ব্রজেন বাঁড়ুয্যে, প্রতাপ মজুমদারদের ওষুধও ঠিক লাগ্‌ছিল না। বিদ্যাসাগর মশাই আমাকে দেখ্‌তে এসে বললেন—"থাকবে?—না যাবে?" (বেঁচে থাক্‌তে চাও, না মর্‌তে চাও?) আমি একটু হাস্‌লাম। তিনি বই খুঁজে খুঁজে আমাকে ওষুধ দিলেন। ২।৩ বার খেয়েই সুস্থ হলাম। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার চর্চা তিনি বিশেষ রকমেই করেছিলেন। মহেন্দ্র ডাক্তারকে (মহেন্দ্রলাল সরকার) ত তিনিই এক রকম হোমিওপ্যাথিতে হাতে খড়ি দেন। লালবিহারী মিত্রের (দে?) এক সময়ে লিভার এব্‌সেস্‌ হয়। মহেন্দ্র ডাক্তার দেখে শুনে ওষুধ দিয়ে গেলেন। তার পর বিদ্যাসাগর মশাই এসে রোগীকে দেখে সে ওষুধ আর দিতে দিলেন না। তিনি নিজে দেখে শুনে ওষুধ খাইয়ে তাঁর দুরারোগ্য রোগ সারিয়েছিলেন।"[৩৪]

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্পর্কিত বিদ্যাসাগরের স্বহস্তলিখিত একখানা ডায়েরি পাওয়া গেছে।* এই ডায়েরি আদ্যন্ত ইংরেজিতে লেখা। ডায়েরির প্রথম তারিখ : ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৮০ সাল; এবং শেষ তারিখ : ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ সাল। ডায়েরি থেকে কয়েকটি অংশ উদ্ধার করি :

"Harimohan

a large boil on the left hip

25. 9. 80. Arnica 3
27. 9. 80. Hepar Sulphur 6
28. 9. 80. Silicea 6
cured 30. 9. 80."

"Mokhada Devi

Cancer in the uterus of three years standing—continuous fever—great disgust for all food—excessive burning in the

* এই ডায়েরি বর্তমানে রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে।

uterine region—left leg very much swollen and painful—exceeding restlessness day and night.

6. 10. 80. aceticum acidum 1
27. 10. 80. — — 3
31. 10. 80. arsenicum 30."

"Sarat Kumari

Hiccaugh— . . . nausea in the morning and after meal—vomiting of food—awakens from sleep with a start

15. 10. 80. Sulphur 30
night and morning
no improvement."

"Dinamayi Devi

Thin watery evacuations—cutting pains in the bowels—violent chills ; Excessive heat and thirst—

15. 10. 80. aconitum 1
Every 2 hours
cured 16. 10. 80."

"Mrinalini

Loss of appetite—pains in the chest—nausea—Empty Evacuations—costiveness—abdomen tender to touch—general debility

18. 10. 80. Sulphur 30
night and morning
cured 27. 10. 80."

"Suresachandra

Sprain in the left ankle with severe pain and swelling

2. 11. 80. arnica
Internally and Externally
cured 4. 11. 80."

"Bhabasundari

copious, tenacious, yellowish discharge from the female genital organs—

26. 1. 81. aconitum 6
Thrice daily

1. 2. 81. Sepea 30
Thrice daily
cured 15. 2. 81."

"Taraknath Sanyal

Pressing pain in stomach, as if a load or stone were in it after moderate supper—loss of appetite—great thirst.

27. 1. 81. Calcarea C. 12
nights and mornings
Discontinued".

"Sarat Kumari

Almost daily some bloody discharge from the uterus for several weeks after the return of the long suppressed menses—discharge from the vagina, which bites like salt- Itching in the vagina from time to time . . . constant weak- ness and weariness—exhaustion of the whole body—

18. 10. 82. Sulphur 6
Every 4 hours.

ভুবনকৃষ্ণ মিত্র লিখেছেন :

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাঁপানীরোগ বহুকালব্যাপী ছিল এবং শীতকালে বিশেষতঃ মধ্যে মধ্যে বাড়িত। তাঁহার অভ্যাস ছিল, প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে দুবেলা গরম্ গরম্ চা পান করা। ইতিমধ্যে একদিন চা পান করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ লাভ করিলেন এবং হাঁপানীর টান যেন কিঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস বোধ করিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আজ চা কে তৈয়ারি করিয়াছিল?" ভৃত্য উত্তর দিল, "আমিই তৈয়ারি করিয়াছি।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—"আচ্ছা আজ উহা পান করে আমার হাঁপানির টান এত কমিল কেমন করিয়া? উহাতে শুঁট কি আদার রস মিশাইয়া- ছিলে কি?" ভৃত্য কহিল—"না, কিছু না। যেমন প্রত্যেক দিন তৈয়ারী করি, আজও তদ্রূপ করিয়াছি, তবে অন্য দিন অপেক্ষা আজ কিছু তাড়াতাড়ি করে কেট্‌লি না ধুয়ে, অগ্নি জল চাপাইয়া চা প্রস্তুত করিয়াছি; এই কেট্‌লি আনি দেখুন না।" তিনি কেট্‌লি আনিতে হুকুম দিলেন এবং পরে কেট্‌লি খুলিয়া যা' দেখিলেন, তাহাতে একেবারে হতভম্ব এবং অবাক্ হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটুকু ঘৃণার উদয় হইল বটে, কিন্তু মনে মনে আহ্লাদিত হইলেন যে, হাঁপানীর এক উৎকৃষ্ট ঔষধ তিনি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। তিনি দেখিলেন, এক কেট্‌লি জলে যখন ২টা আর্সোলা পড়িয়া তাঁহার হাঁপ অর্ধেক কমাইয়াছে, না জানি, বহু পরিমাণে উহা জলে ফেলিয়া সিদ্ধ করিয়া, পরে এল্‌কোহলে ফেলিয়া ছাঁকিয়া dilute করিয়া হোমিওপ্যাথিমতে ঔষধ বানাইয়া লোকের বা রোগীর অজ্ঞাতে সেবন করাইয়া এবং নিজেও ব্যবহার

করিয়া দেখিব, হাঁপ কাসি সারে কি না? পরে তাহার পরীক্ষা, কার্য্যে পরিণত করিয়া বিশেষ ফললাভ করিয়াছিলেন এবং হোমিওপ্যাথিমতে উক্ত ঔষধ তৈয়ারী করিয়া কাহাকেও না জানাইয়া বহু লোকের উক্ত ব্যাধি বিনাব্যয়ে অনেক উপশম করিয়াছিলেন।"[৩৩]

বহুজনের হিতকামনায় বিদ্যাসাগর একবার একটি সন্ন্যাসী-প্রদত্ত ওষুধের বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। ১৭৮২ শকের মাঘ মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' থেকে 'শূল রোগের ঔষধ' শীর্ষক সেই চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপনটি উদ্ধার করি :

"শূল কেমন ভয়ানক রোগ তাহা যিনি এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন তিনিই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন। এই রোগ জন্মিলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া সচরাচর উল্লিখিত হইয়া থাকে।

কিছু দিন হইল এক সন্ন্যাসী আমাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন। আমার মধ্যম সহোদর শ্রীযুত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন তাঁহার নিকট হইতে শূল রোগের এক ঔষধ পান। তিনি ঐ ঔষধের পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। যত ব্যক্তিকে সেবন করান সকলেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। এই রূপে ক্রমে ক্রমে তিনি প্রায় দুই শত ব্যক্তিকে শূল রোগের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করেন।

এই সংবাদ শুনিয়া এবং সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া আমিও কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থানের কতকগুলি লোককে উক্ত ঔষধ সেবন করাইয়াছিলাম, তাঁহারা সকলেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা যে শূল রোগের মহৌষধ সে বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এক্ষণে সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় যিনি এই ঔষধ সেবন করিবেন তিনি নিঃসন্দেহ শূল রোগের অসহ্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবেন।

যে যে দ্রব্যে ও যে প্রণালীতে ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয় তাহার নিয়ম :

দ্রব্য		ওজন
শুঁঠ চূর্ণ	...	৫ পাঁচ ভরি
বিট লবণ	...	২৷৷০ আড়াই ভরি
সোহাগা	...	১।০ সওয়া ভরি (খৈ করিয়া লইতে হয়)
মুলতানী হিং	...	৷৷৵০ দশ আনা

সজনা গাছের ছালের রস দিয়া প্রথমে হিং মাড়িতে হয়, তৎপরে উহাতে বিট লবণ মিশাইয়া মাড়িতে হয়, তৎপরে সোহাগার খৈ মিশাইয়া মাড়িতে হয়, তৎপরে শুঁঠ চূর্ণ মিশাইয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া ৫৪ চুয়ান্নটি বড়ী বাঁধিতে হয়। সজনারসের পরিমাণের নিয়ম নাই, যত দিলে সমুদায় দ্রব্য উত্তমরূপে মাড়া ও বড়ী বাঁধা যায় তাহাই দিতে হয়।

ঔষধ সেবনের নিয়ম

প্রাতঃকালে এক বড়ী ও সায়ংকালে এক বড়ী মুখে ফেলিয়া জল দিয়া খাইতে হয়।

পথ্যাপথ্যের নিয়ম

'পথ্য—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন, দুগ্ধ।
মৎস্য নিষিদ্ধ নহে, ঘৃতে পাক করিয়া খাওয়া যাইতে পারে।

নিষিদ্ধ—শাক, অম্ল, মিষ্ট, তৈল, কাঁচাঘৃত, ডাইল, ময়দা, পিষ্টক, ভাজা-দ্রব্য, মাদক দ্রব্য, নূতন তণ্ডুল।

কলিকাতা,
১লা অগ্রহায়ণ, ১২৬৭। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।”

•

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর স্থির করলেন, 'কলকাতা সারস্বত-সম্মিলনী' নামে একটা সাহিত্য সমিতি গড়ে তুলতে হবে। রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ একদিন এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরামর্শ করতে এলেন।

সম্মিলনীর কথা শুনে বিদ্যাসাগর বললেন—তোমরা বড়োমানুষের ছেলে। কোনো বদখেয়ালি না করে এসব নিয়ে যদি সময় কাটাও তো সে ভালোই। কিন্তু, বাবা, একটা কথা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি। বড়ো-বড়ো হোমরা-চোমরা লোকদের এর মধ্যে নিও না, তাহলেই সব মাটি হয়ে যাবে।

সমিতির কাজ কিন্তু আরম্ভ হলো হোমরা-চোমরা লোক নিয়েই। সম্মিলনীর প্রথম সভাপতি হলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। কিছুদিন বেশ চলল। তারপর—বিদ্যাসাগর যা বলেছিলেন—সব মাটি হয়ে গেল, সম্মিলনী বন্ধ হয়ে গেল।[৩৬]

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল বাড়িতে জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে খানিকটা করে 'ম্যাকবেথে'র বাঙলা অর্থ বলতেন তিনি। যতক্ষণ 'ম্যাকবেথে'র সেই অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ছন্দে তর্জমা না করতেন, জ্ঞানচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে ঘরে বন্ধ করে রাখতেন। 'ম্যাকবেথ' বইখানা রবীন্দ্রনাথের পুরোপুরি বাঙলায় তর্জমা করা হয়ে গেল।

সেই 'ম্যাকবেথে'র তর্জমা বিদ্যাসাগরকে শোনাতে হবে বলে রামসর্বস্ব পণ্ডিত একদিন রবীন্দ্রনাথকে বিদ্যাসাগরের কাছে নিয়ে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ সেদিনের কথা ভোলেননি। উত্তরকালে তিনি লিখেছেন :

“তিনি (রামসর্বস্ব পণ্ডিত) একদিন আমার ম্যাক্‌বেথের তর্জমা বিদ্যা-সাগর মহাশয়কে শুনাইতে হইবে বলিয়া আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গেলেন। তখন তাঁহার কাছে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বসিয়া ছিলেন। পুস্তকে-ভরা তাঁহার ঘরের মধ্যে ঢুকিতে আমার বুক দুরুদুরু করিতেছিল; তাঁহার মুখচ্ছবি দেখিয়া যে আমার সাহস বৃদ্ধি হইল তাহা বলিতে পারি না। ইহার পূর্বে বিদ্যাসাগরের মতো শ্রোতা আমি তো পাই নাই; অতএব, এখান হইতে খ্যাতি পাইবার লোভটা মনের মধ্যে খুব প্রবল ছিল। বোধ করি কিছু উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছিলাম।”[৩৭]

হরকালী চৌধুরী বিদ্যাসাগরের বাসায় রান্না করত। কোনো-কোনো স্ত্রীলোক বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে অনেকবার টাকা-পয়সা কাপড়-চোপড় নিয়ে যায়, বিদ্যাসাগরকে প্রতারণা করে। হরকালী একদিন একজন স্ত্রীলোককে বলল—মাগী, বিদ্যাসাগরকে কি তোরা লেদা আমগাছ পেয়েছিস?

একথা শুনে বিদ্যাসাগর হরকালীর উপর বিরক্ত হলেন। বললেন—তুমি বহুকাল আমার বাড়িতে আছ। তোমার মাইনে কত বাকি আছে, বলো, এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি। আর এই মুহূর্তেই তুমি আমার বাড়ি থেকে বিদায় হও। গরীব-দুঃখীকে আমি দান করব, তাতে তোমার বাবার কি?

হরকালী বলল—ওই বুড়ি দিনকয়েক আগে টাকা আর কাপড় নিয়ে গেছে। সেকথা আপনার মনে নেই। এক সপ্তাহও কাটেনি, আবার এসেছে। তাই অমন বলেছি। যা হোক, আমার অপরাধ হয়েছে, এযাত্রা আমায় ক্ষমা করুন।

হরকালীকে বিদায় দিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর। অবশ্য দু-টাকা মাসহারার বন্দোবস্ত করে দিলেন।[৩৮]

হাওয়া-বদলের জন্য বিদ্যাসাগর তখন বর্ধমানে গিয়েছেন। নিজের খাবার জন্য সরু দাদখানি চাল নিয়ে গেছেন কলকাতা থেকে। ঘরের কোণায় রেখে দিয়েছেন সেই চাল।

একদিন চোখে পড়ল, চাকর এসে ওই চাল তিনমুঠো নিয়ে গেল। ভিক্ষা দেবার জন্য নিয়ে গেল নাকি? মনে-মনে একটু অসন্তুষ্ট হলেন বুঝি বিদ্যাসাগর। চাকরকে ডাকলেন। বললেন—ভিক্ষে দেবার জন্য এখানকার চাল নেবে। ওই সরু দাদখানি চাল এখানে পাওয়া যায় না, ফুরিয়ে গেলে বড় কষ্ট হবে, এ-চাল নিও না।

চাকর বলল—আজ্ঞে, ভিক্ষে দেবার জন্য তিনমুঠো চাল নিইনি। আপনার খাবার জন্য নিয়েছি।

চাকর চলে গেল।

ভালো, তিনমুঠো চালে তাহলে দিন চলে যায়। বামুনের সন্তান, তিন দুয়ারে দাঁড়ালে তিনমুঠো চাল পাওয়া যাবে, তাহলে আর কিসের জন্য পরের অধীনে থেকে দাসত্ব করা?—বিদ্যাসাগর ভাবলেন। ভেবে আশ্চর্য আনন্দ হলো। আবার ডাকলেন চাকরকে। বললেন—বাপু, তুমি আমার গুরু। আমি এতদিন এত মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকের কাছে যে-শিক্ষা পাইনি, এত শাস্ত্রালোচনা করে যে-জ্ঞান পাইনি, আজ তোমার কাছে সেই শিক্ষা পেলাম, সেই জ্ঞান পেলাম। তুমি আমার শিক্ষক, তুমি আমার গুরু। গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তুমি দুটি টাকা নাও—এই নাও।[৩৯]

১২৯১ সালের আশ্বিন মাসের 'নবজীবন' পত্রিকায় 'হুতোম প্যাঁচার গান' নামে 'শ্রীরসিক মোল্লা' ছদ্মনামে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মস্ত একটি কবিতা লিখেছেন। কবিতাটিতে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কয়েকটি লাইন আছে :

"আসছে দেখো সবার আগে বুদ্ধি সুগভীর,
বিদ্যের সাগর খ্যাতি, জ্ঞানের মিহির!
বঙ্গের সাহিত্যগুরু শিষ্ট সদালাপী,
দীক্ষাপথে বুদ্ধঠাকুর স্নেহে জ্ঞান ব্যাপী!
উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দার্ঢ্যে শালকড়ি,
কাঙাল-বিধবা-বন্ধু অনাথের নড়ি!
প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম, দাতাকর্ণ দানে,
স্বাতন্ত্র্যে শেঁকুল-কাঁটা—পারিজাত ঘ্রাণে!
ইংরিজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত "ডিস্",
টোল-স্কুলী-অধ্যাপক দুয়েরই "ফিনিস"।
এসো হে দ্বিজের চূড়া বঙ্গ-অলঙ্কার,
"দিক্‌পাল" তোমার মত দেশে নাই আর!..."

অল্পকথায় বিদ্যাসাগর-চরিত্রের একটি নিখুঁত ব্যাখ্যা।

বছরে বই থেকে অনেক টাকা আয় হয়। একবার হিসেব মেলাতে গিয়ে বিদ্যাসাগর দেখলেন, সে-বছর প্রায় দশ হাজার টাকা কম আদায় হয়েছে।

এত কম কেন?

খোঁজ-খবর করে কারণ জানা গেল : পূর্ববঙ্গের একটি লোক বিদ্যাসাগরের একখানা বইয়ের জাল সংস্করণ বের করে বিক্রী করেছে।

লোকটিকে ডাকিয়ে আনলেন বিদ্যাসাগর। কাঁদতে-কাঁদতে লোকটি অপরাধ স্বীকার করল। বলল—কন্যাদায়ে আর সাংসারিক অভাবে পড়ে এই অন্যায় করেছি।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—সব অভাব কি মিটেছে?

—না। আরো দু-এক হাজার টাকা পেলে বিপদ থেকে নিস্তার পাই।

লোকটিকে সে-টাকা দিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর। বিদায় নেওয়ার আগে লোকটি বিদ্যাসাগরের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করল—আর কখনো অমন অন্যায় করব না।*[৬০]

বিদ্যাসাগরের ছোটো একটা ঘড়ি উধাও হয়ে গেল। কে নিয়ে গেল কে জানে।

দিন পনেরো বাদে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের ছেলে এসে বিদ্যাসাগরকে বললেন—আপনার ছোটো ঘড়িটি কোথায়? একবার দেখব।

বিদ্যাসাগর বললেন—ওই ঘড়িটি প্রায় পনেরো দিন হল চুরি গেছে, আর পাওয়া যায়নি।

—আপনার ঘড়ির মতো একটা ঘড়ি লালমোহনবাবুর ছেলে পাইকপাড়ার একজন মুদীর কাছে কুড়ি টাকায় বন্ধক দিয়েছে। ওই মুদী ঘড়িটি আমাকে দেখিয়েছে। আমি ওই মুদীকে বলেছি, 'এই ঘড়ি বিদ্যাসাগর মশায়ের, তুমি কোথায় পেলে?' সে বলেছে, 'লালমোহনবাবুর ছেলে আমাকে দিয়েছে।'

ওই ছেলেটি জগদ্দুর্লভ সিংহের দৌহিত্র।

স্তব্ধ হয়ে রইলেন বিদ্যাসাগর। অন্যান্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বললেন—অমন ছোকরাকে পুলিশে দেওয়া উচিত।

বিদ্যাসাগর বললেন—ওর মাতামহ আমাদের অনেক উপকার করেছেন; তাঁর দৌহিত্রের এই সামান্য অপরাধ আমার ব্যক্ত করা উচিত নয়।

তখনি পাইকপাড়ায় গেলেন বিদ্যাসাগর। ওই মুদীকে কুড়ি টাকা আর কিছু সুদ দিয়ে ঘড়িটি উদ্ধার করে নিয়ে এলেন।

লালমোহনবাবুর ছেলেকে ডেকে বিদ্যাসাগর কোনো গালমন্দ করলেন না। বললেন—তোমার মাতামহের অনেক খেয়েছি এবং বাল্যকালে তাঁরা আমার অনেক দৌরাত্ম্য সহ্য করেছেন। তোমার যখন যা দরকার হবে আমাকে জানালেই পাবে। কখনো কোনো কারণে আমি তোমাদের প্রতি বিরক্ত হব না।[৬১]

কে একজন অচেনা-অজানা এসে সকাতরে বিদ্যাসাগরকে বলল—চোর আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে গেছে। আমাকে যদি দেশে ফিরে যাবার খরচ দেন, চিরকাল কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।

তখনি খরচ দিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর।

---

* প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৮৯২ সালের ২৬-জানুআরি 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছে : "আমরা শুনিলাম পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিশু শিক্ষা জাল করিয়াছে। এইরূপ অভিযোগে ঢাকায় একটী ছাপাখানার লোকে জাল বই বিক্রয় করিয়াছিল বলিয়া নাকি একজন দোকানদার ফৌজদারী সোপর্দ হইয়াছে।"

বেরিয়ে এসেই লোকটি নিজের সঙ্গীকে বলল—ভাই, তুমি যথার্থ বলেছ, বিদ্যাসাগর শালাকে তো বেশ ঠকানো যায়!

ঘটনাক্রমে একজন ভদ্রলোক কথাটি শুনলেন এবং সেই মুহূর্তেই বিদ্যাসাগরকে জানালেন। বিদ্যাসাগর ওই ভদ্রলোককে বললেন—পরের সাহায্য করতে গেলে মধ্যে-মধ্যে ঠকতে হয়। ঠকানোর চেয়ে ঠকা ভালো।[৩২]

১৮৮০ সালের কথা। বোম্বাই থেকে একজন অবাঙালী ব্রাহ্মণ এসেছেন কলকাতায়। বাঙলা শিখতে এসেছেন। ভেবে এসেছেন, কলকাতায় থাকা-খাওয়ার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কিন্তু কোনো ব্যবস্থা করা গেল না।

অনেক কষ্টে তিনি একটা মেসে গিয়ে উঠলেন। মেসের কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁর থাকা-খাওয়ার একটা উপায় করে দিলেন।

কিন্তু সেভাবে তো আর চলে না। মেসের কয়েকজন ভদ্রলোক ওই ব্রাহ্মণকে নিয়ে গেলেন বিদ্যাসাগরের কাছে।

ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য শুনে খুশি হলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর থাকা-খাওয়ার ভার নিলেন বিদ্যাসাগর। নিজের লেখা বই দিলেন ব্রাহ্মণকে। তাঁকে সে-বই পড়িয়ে দেওয়ার ভার দিলেন রাজেন্দ্রনাথ ঘোষকে। রাজেন্দ্রনাথ এই মেসে থাকেন। ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কাছে এসেছেন।

মাসকয়েক পরে সেই ব্রাহ্মণ চলনসই বাঙলা শিখে ফেললেন। বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে চাকরি চাইলেন।

বিদ্যাসাগর বললেন—আমার কাছে কাজ করতে হলে খুব মন দিয়ে কাজ করতে হবে। দিনে ক-ঘণ্টা কাজ করতে পারবে?

দিনে ছ-ঘণ্টা কাজ করতে রাজি।

বিদ্যাসাগর বললেন—কাজ শক্ত। মন দিয়ে দিনে তিন ঘণ্টা করে করলেই হবে।

রাজি।

বিদ্যাসাগর বললেন—দিনে তিন ঘণ্টা তুমি কাজ করতে রাজি হয়েছ। এই তিন ঘণ্টা তুমি আমারই কাজ মনে করে মন দিয়ে বাঙলা পড়বে, তাতেই আমার কাজ হবে।

এবং সেজন্য বিদ্যাসাগর ওই ব্রাহ্মণের মাসহারার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।[৩৩]

শশিভূষণ বসু লিখেছেন :

“অনেক দিন পূর্বে যখন আমি শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের বাটীতে থাকিতাম, তখন একদিন মধ্যাহ্নকালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। উদ্দেশ্য, হেরম্বচন্দ্রের সহিত কোন বিষয়ে একটু কথা বলা। সে সময় হেরম্ববাবুর বৃদ্ধ পিতা তাঁহাদিগের হিজ্‌লাবট নামক গ্রাম হইতে আসিয়া পুত্রের সঙ্গে বাস করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় হঠাৎ উপস্থিত হইলে আমরা সকলেই ঐ মহাপুরুষের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক তাঁহাকে বসিবার আসন প্রদান করিলাম। হেরম্ববাবুর পিতা চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয়ের সঙ্গে পূর্বে তাঁহার বিশেষ আলাপ-পরিচয় ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বৃদ্ধ মৈত্র মহাশয়কে দেখিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন, মৈত্র মহাশয়ও এত বড় লোকের আগমনে হৃদয়ের বিশেষ আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন।

করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন তিনি একজন খুব গল্প্যে লোক ছিলেন। তিনি সেদিন একটি উচ্চ আসনে বসিয়া তাঁহার স্বভাবসুলভ মিষ্ট ভাষায় তাঁহার জীবনের নানারূপ অভিজ্ঞতার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা সকলেই নিম্নে বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলাম।...সেদিন তাঁহার কাহিনীর মধ্যে তাঁহার নির্ভীকতার ও স্বাবলম্বন-শক্তিরই বিশেষ নিদর্শন যেন প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। কোন স্থানেই তিনি কাপুরুষের ন্যায় মস্তক অবনত করিবার লোক ছিলেন না। কি রাজা, কি ধনী, কি বা উচ্চপদস্থ সাহেবদিগের নিকট।

সেদিন সূর্য্যদেব পাটে বসিবার অল্প পূর্বেই বিদ্যাসাগর মহাশয় আসন পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা সকলে দন্ডায়মান হইলাম। যাইবার সময় গৃহের বাহিরে গিয়া চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয়কে একটু গোপনে কি যেন বলিলেন, তৎপরে আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন আমি ঘরের ভিতরেই ছিলাম। আসিয়া আমায় বলিলেন, "বাপু! তুমি এ বাড়ীতে থাক, শুনিলাম। আমি আগামীকল্য এ বাটীর সমস্ত লোককেই আমার বাড়ীতে মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছি। কিন্তু মৈত্র মহাশয় বলিলেন, তোমাকে এজন্য বিশেষভাবেই বলা উচিত। তা তুমি কাল ইঁহাদের সঙ্গে গিয়া আমার বাড়ীতে দুইটি ডাল ভাত খাইবে।" আমি বিনীতভাবে সহাস্যমুখে বলিলাম, "অবশ্য আপনি আমাকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ না করিলেও, আমি ইঁহাদের সঙ্গে গিয়া আপনার বাড়ী আহার করিতাম।" সে স্নেহের বচন এখনও স্মরণে বেশ জাগিয়া রহিয়াছে।

পরদিন মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইতে-না-হইতে আমরা নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য সকলেই যাত্রা করিলাম। আমাদের গাড়ী যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাদুড়-বাগানস্থ সুন্দর ভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন তিনি স্বয়ং ফটকের দ্বারে আসিয়া আমাদিগকে যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। মহিলারা গাড়ী হইতে নামিলে, তিনি দুই একটি শিশুকে নিজে কোলে করিয়া লইলেন। আমরা ভবনে প্রবেশ করিলাম। অল্পক্ষণ পরেই আহারে বসিলাম। মহিলা-দিগের খাইবার স্থান অবশ্য অন্যত্রই হইয়াছিল। আমরা ভোজনে বসিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি মোড়ার উপর আমাদিগের নিকট উপবেশন করিলেন, করিয়া বলিলেন, "আমি পীড়িত, অম্বলের পীড়ায় ভুগিতেছি, তাই আমি ১০টার সময় আহার করি, সেজন্য বাপু তোমরা কিছু মনে করিও না।" আহারের আয়োজন দেখিয়া আমরা অবাক হইলাম; সুখী হইলাম। প্রত্যেকেরই প্রকান্ড প্রকান্ড থালার উপর সুন্দর চাউলের অন্ন ও থালাগুলি চারিদিকে ব্যঞ্জনপূর্ণ বহু বাটিতে বেষ্টিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় বেশ সুরসিক পুরুষ ছিলেন। আমরা যখন ভোজনে রত তখন তিনি হুঁকা হাতে করিয়া নানারূপ গল্প জুড়িয়া দিলেন। একটি সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া নিমন্ত্রণে ভোজনের বিষয়ে বলিলেন, জন্ম বার বার হইতে পারে, কিন্তু নিমন্ত্রণ সকল সময় ঘটিয়া উঠে না; সেজন্য, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের উচিত, ভোজনের সময় লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া উচিতমতই ভোজন করা, ইত্যাদি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এইরূপ মিষ্ট গল্পের সঙ্গে আমরা মিষ্ট ব্যঞ্জনাদি দ্বারা রসনারও তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিলাম।..."[৬৪]

কাউকে নেমন্তন্ন করলে বিদ্যাসাগর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্নের আয়োজন করেন। নিজে কাছে বসে খাওয়ান। কেউ কিছু ফেলে রাখলে বিদ্যাসাগর বলেন— একটি ভাত পাতের পাশে পড়ে থাকলে আমার বাবা আমাকে প্রহার করতেন,

আর তুমি এত জিনিস নষ্ট করবে? তা কখনো হবে না, সমস্ত খেতে হবে।[৩৫]

কখনো কখনো বিদ্যাসাগর নিজে শুধু নুন দিয়ে ভাত খেতেন। এক-একদিন শেষ থেকে খেতে সুরু করতেন। অর্থাৎ, প্রথমে মিষ্টি, পরে টক, তারপর তরকারি, তারপর ঘি আর নুন দিয়ে ভাত, শেষকালে শুধু ভাত টাস্ টাস্ করে খেতেন। এমনভাবে খাওয়ার অর্থ কী? বিদ্যাসাগর বলতেন—বাল্যকালে অনেকদিন কেবল নুন-ভাত খেতে হয়েছে, সে-অভ্যাস আজো আছে কিনা দেখা উচিত। মানুষের দশ দশা, আবার যদি আমার আগের দশা হয়, অভ্যাস রাখলে শুধু ভাত খেতে কষ্ট হবে না।[৩৬]

মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: একদিন কার্মাটার রেলওয়ে ষ্টেসনে একজন বাঙ্গালী ডাক্তারবাবু একটী ছোট ব্যাগ লইয়া ট্রেণ হইতে নামিবার সময় "কুলি কুলি" বলিয়া ডাকিতেছিলেন। একজন সামান্য বেশধারী ব্যক্তি বাবুর ব্যাগটী তাঁহার হাত হইতে লইয়া ষ্টেশনের বাহিরে বাবুটীর জন্য রক্ষিত পাল্কীতে তুলিয়া দিলে বাবু দুইটী পয়সা দিতে গেলেন। তখন ঐ ব্যক্তি একটু হাসিয়া বলিলেন, "ক্ষুদ্র ব্যাগটী লইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলেন বলিয়া একটু সাহায্য করিলাম; পারিশ্রমিক দিতে হইবে না; আমার নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।" বাবুটি লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদপ্রান্তে পতিত হইলেন এবং বলিলেন, "লোকোপকার আপনার জীবনের ব্রত; আপনি দয়ার সাগর। আমার যে শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তাহাই আজ আমাকে দিলেন; স্বহস্তে কার্য্য করিতে আর কখন সঙ্কুচিত হইব না।"[৩৭]

নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আর বঙ্কিম মিত্র বিদ্যাসাগরের কাছে কলেজ-ফেরত ভট্টীকাব্য পড়তে যেতেন। যাবার পথে একদিন দেখলেন, বিদ্যাসাগর হনহন করে কোথায় যাচ্ছেন।

যাচ্ছেন কোথায়?

বিদ্যাসাগর বললেন—তোরা যা, আমি একঘণ্টার মধ্যে আসছি।

বিদ্যাসাগরের স্কুলের নিচুক্লাশের একজন মাষ্টারমশায়ের অসুখ করেছে। কলকাতায় কেউ নেই তাঁর। ফিরে এসে বিদ্যাসাগর বললেন—দেখ ওর কলেরা হয়েছিল; তারপর জ্বর হয়। ডাক্তারের উপদেশমতো তার মণ্ড তৈয়ার করতে গিয়েছিলাম।[৩৮]

বিদ্যাসাগরের ঠাকুমা বীরসিংহে একটা অশ্বত্থ গাছ পুঁতেছিলেন। অনেক-কালের কথা। ঠাকুমা স্বর্গে গেলেন। অশ্বত্থ গাছ বড়ো হল, বেঁচে রইল।

বিদ্যাসাগর একদিন সেজোভাই শম্ভুচন্দ্রকে বললেন—অশ্বত্থ গাছটা মাঝে-মাঝে দেখা-শোনা করো তো?

শম্ভুচন্দ্র বললেন—না।

বিদ্যাসাগর বললেন—অশ্বত্থ গাছটার দেখাশোনা না করা অন্যায়। বাড়ি গিয়ে অশ্বত্থ গাছটার খোঁজ-খবর নেবে। বংশের মধ্যে কেউ যদি বৈশাখমাসে অশ্বত্থমূলে জল না দেয়, তুমি বৈশাখ মাসে প্রত্যেকদিন জল দেবে।

নবকুমারের কথা এল কথায়-কথায়।

বিদ্যাসাগরই টাকা-পয়সা খরচ করে নবকুমারকে মেডিক্যাল কলেজে পড়িয়েছেন। বিদ্যাসাগরের দয়ার ফলেই নবকুমার এখন নারাজোলের রাজ-বাড়িতে চাকরি করে খাচ্ছে।

নবকুমার নারাজোলের রাজবাড়ির ডাক্তার। সে একদিন রাজবাড়ির

হাতিতে এসেছে; রাজবাড়ির হাতিকে দিয়ে অশ্বত্থের ডাল ভাঙিয়েছে।

নবকুমার করাতি নিয়ে এসেছে। অশ্বত্থ গাছটা কেটে ফেলবে। করাতিদের তাড়িয়ে দেওয়া হল। নবকুমারকে বাড়িতে ডেকে এনে শম্ভুচন্দ্র খানিক গালমন্দ করলেন।

যা হোক, এসব পুরনো কথা।

নবকুমার মারা গেছে।

সেবার চৈত্র মাসে বীরসিংহে গিয়ে শম্ভুচন্দ্র দেখলেন, বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে অশ্বত্থ গাছটা, অশ্বত্থ গাছটাকে নষ্ট করার জন্য চতুর্দিকে লাগানো হয়েছে ফণিমনসা, অশ্বত্থের কাছে পুঁতেছে বাঁশ, তেঁতুল, বাবলা।

নবকুমারের বৌকে ডেকে শম্ভুচন্দ্র চতুর্দিকের বেড়া খুলে নিতে বললেন। অনেক তর্কাতর্কির পর সে বেড়া খুলে নিতে রাজি হল। কিন্তু অশ্বত্থতলা সে পরিষ্কার করে দেবে না। নিজেদের খরচে শম্ভুচন্দ্র অশ্বত্থ-তলা পরিষ্কার করিয়ে নিলেন।

ঘাটাল ফৌজদারী আদালতে নবকুমারের বৌয়ের তরফ থেকে নালিশ গেল। কিন্তু মামলায় নবকুমারের বৌ জিততে পারল না।

মাস কয়েক পরে নবকুমারের বৌ এল কলকাতায়, বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগরকে বলল—আপনি তো অনেক নিরুপায়কে মাসহারা দেন, আমাকে তো কিছুই দিতে হয় না আপনার, আপনি দয়া করে আমাকে ওই অশ্বত্থ গাছটা দেন। ওই অশ্বত্থ গাছের কাছে প্রায় ন-দশ বছর একটা বাগান করেছি, অশ্বত্থ গাছের আওতায় আমার বাগানের অনিষ্ট হচ্ছে।

কিন্তু বিদ্যাসাগর অশ্বত্থ গাছ দিতে রাজি হলেন না। বললেন—টাকা-পয়সা খরচ করে তোমার স্বামীকে আমি মেডিক্যাল কলেজে পড়িয়েছিলাম। তিনি রাজার ডাক্তার হয়ে হাতির পিঠে বীরসিংহে এসে আমার ঠাকুরমার হাতের অশ্বত্থ গাছের ডাল হাতি দিয়ে ভাঙিয়েছেন। এই ঘটনার আগে আমার মৃত্যু হলে সৌভাগ্য জ্ঞান করতাম। ঠাকুরমার গাছের ডাল না কেটে আমার হাত-পা কাটলে এত দুঃখ হত না। পরে আবার ওই গাছের মূলে করাত লাগালেন! আর, তুমি তার উপযুক্ত বৌ, বেড়া দিয়ে ওই গাছ নষ্ট করার জন্য শিকড় কেটে বাঁশ-বাবলা লাগিয়েছ। আদালতে নালিশ করেছ। এখন আমার কাছে এসে উদারতা দেখাচ্ছ, সরল ভাব দেখাচ্ছ। মোকদ্দমায় জিতলে কখনো তুমি আসতে না। হেরেছ, তাই এসেছ। আমার ভাই যদি অন্যায় করেছিল, আদালতে নালিশ করার আগে আমাকে জানালে না কেন?

নবকুমারের বৌ বলল—ওই গাছের তলায় আপনার কতখানি জমি চাই, আপনি আমার কাছে চেয়ে নিন।

বিদ্যাসাগর বললেন—তুমি আমার নবাবের বেটি! আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাই না। আমার হয়, আমার থাকবে, নয়তো যাবে। সেজন্য তোমার কাছে আমি ভিক্ষা চাইব না।

আবার আদালতে নালিশ হল। নালিশ দায়ের করলেন নবকুমার ডাক্তারের জামাই।

কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগরকে সব খবর বললেন শম্ভুচন্দ্র। বললেন—আমি আর মোকদ্দমায় থাকতে চাই না। অনেকে বলেন, ঠাকুরমা প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর হল স্বর্গে গেছেন, তাঁর অশ্বত্থ গাছ নিয়ে এত হাঙ্গামার দরকার কি। কেউ-কেউ বলেন, অশ্বত্থ গাছটি ছেড়ে দাও, সামান্য একটা

অশ্বত্থ গাছের জন্য এত টাকা-পয়সা খরচ করা কেন। দূর হোক, গাছটা ছেড়ে দিই, এসব হাঙ্গামায় আমি থাকতে চাই না।

বিদ্যাসাগর রাগ করে বললেন—তুই মর। তাহলে আমি স্বয়ং লাঠি হাতে করে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ওই গাছ রক্ষা করব।[১১]

আরেকটি ঘটনা।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তখন মেডিক্যাল কলেজের বাঙলা বিভাগের ছাত্র। মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল একটি ছাত্রকে চোর সন্দেহ করে পুলিশের হাতে দিয়ে দিলেন। আর, সবচেয়ে যা খারাপ কথা, প্রিন্সিপাল ওই বাঙলা বিভাগের প্রায় সব ছাত্রকেই গালমন্দ করলেন। বললেন—ইতর, ছোটলোক, চোর, বদমায়েস।

অত্যন্ত অপমানিত বোধ করল ছাত্রেরা। অনেকেই একসঙ্গে কলেজ ছেড়ে দিল। ওদের দলের নেতা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

হৈ-চৈ পড়ে গেল সর্বত্র।

প্রিন্সিপাল অন্যায় করেছেন। এই অন্যায়ের প্রতিকার চাই।

দল বেঁধে কয়েকজন ছাত্র এল বিদ্যাসাগরের কাছে। দু-চারটি কথা শুনেই বিদ্যাসাগর ওদের ধমক দিয়ে উঠলেন—যাও, যাও, আমি ওসব কিছু শুনতে চাই না। ছেলেরা অনেক সময়ে অযথা গোলমাল করে।

কোনো কথাই শুনতে রাজি হলেন না বিদ্যাসাগর।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পিছিয়ে আসার পাত্র নন। তিনি বললেন—আপনি আমাদের কোনো কথা না শুনেই একটা স্থির করে নিচ্ছেন কেন? আমাদের দুটো কথা শুনে, পরে যা ইচ্ছা বলুন। বাঙলা বিভাগে যারা পড়ে তাদের কি একটা বংশের বা জাতির মর্যাদা নেই? এরা সকলেই কি ইতর, ছোট-লোক, চোর, বদমায়েস? আপনিও একথা বলেন?

বিদ্যাসাগর চমকে উঠলেন। বললেন—কী বলছ গোঁসাই? ব্যাপার কী, বলো তো।

আদ্যন্ত ঘটনা বললেন বিজয়কৃষ্ণ। সব শুনে বিদ্যাসাগর বললেন—বটে, এইরকম ঘটনা? তবে আর তোমরা কলেজে যেও না। দেখি, আমি এর কিছু প্রতিকার করতে পারি কিনা।

ঘটনা সম্পর্কে ছোটলাটের কাছে পরিষ্কার করে সব কথা লিখলেন বিদ্যাসাগর।

এদিকে আরেক ব্যাপার। বৃত্তির টাকায় খাওয়া-পরা চলছিল অনেক ছাত্রের, অনেক ছাত্র বৃত্তির টাকা থেকেই মা-বাপকে কিছু-কিছু সাহায্য করত। মা-বাপকে কিছু-কিছু দেওয়া তো দূরের কথা, নিজেদের খাওয়া-পরাই এখন বন্ধ হবার যোগাড়। কেননা, উপরালা বৃত্তি বন্ধ করে দিয়েছেন।

বৃত্তি বন্ধ হয়েছে বলে দুর্ভাবনার দরকার নেই। বিদ্যাসাগর আছেন। তিন-চার মাস ওদের প্রায় সমস্ত খরচ জুগিয়েছেন বিদ্যাসাগর।

কিন্তু, লাটসাহেবকে বিদ্যাসাগর যে লিখে জানালেন, তার কী হল. মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের কী হল শেষ পর্যন্ত? প্রমাণ হল, প্রিন্সিপালেরই দোষ। প্রিন্সিপালকে ত্রুটি স্বীকার করতে হল।[১০]

বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "সন ১২৭৫

সালের অগ্রহায়ণ মাসে গবর্ণমেণ্টের আদেশে বাবু রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইনকম ট্যাক্স ধার্য্যের জন্য এই জাহানাবাদ মহকুমায় উপস্থিত হন। যে সকল সামান্য ব্যবসায়ীর আইনানুসারে ট্যাক্স ধার্য্য হইতে পারে না, তাহাদের প্রতি অন্যায় পূর্বক দুই নামে একত্র এক বিলে ট্যাক্স ধার্য্য করিতেছিলেন। কেহ কেহ এই গর্হিত আইনবিরুদ্ধ কার্য্যে সম্মত না হইলে ভয়প্রদর্শন দ্বারা ঐ সকল লোককে সম্মত করান। সামান্য ব্যক্তিরা নিরুপায় হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জানাইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। তিনি ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য হইতেছে অবগত হইয়া খড়ার গ্রামে সমাগত আসেসর রমেশবাবুর নিকট যাইয়া বলেন, ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী ব্যক্তিদিগকে এক ব্যবসায়ী লিখিয়া ট্যাক্স ধার্য্য করিলে অতি অন্যায় কার্য্য হয়। রমেশবাবু বলিলেন দুই নামে এক কাগজে এক বিলে না দিলে অনেক সামান্য আয়ের ব্যবসায়ী লোক বাদ পড়ে, এরূপ হইলে গবর্ণমেণ্টের আয়ের অনেক খর্বতা হয়। অগ্রজ মহাশয় আসেসর বাবুকে বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের আয়ের লাঘব হয় বলিয়া এরূপ অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কি আপনাদের উচিত হইতেছে? রমেশবাবু অগ্রজ মহাশয়ের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তৎকালে তাঁহার নিকট উপস্থিত কতকগুলি সামান্য আয়ের ব্যবসায়ীকে ধমকাইয়া স্বীকার করাইলেন। মফঃসলে এরূপ আইন-বিরুদ্ধ কার্য্য দেখিয়া অবিলম্বে অগ্রজ মহাশয় কলিকাতা প্রস্থান করিয়া লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের কর্ণগোচর করিলেন, এবং স্বয়ং দেশস্থ লোকের হিত-কামনায় বাদী হইলেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর অগ্রজ মহাশয়ের প্রমুখাৎ উহা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণনগরের মাজিস্ট্রেট মনরো সাহেবের কথা বলেন কিন্তু অগ্রজ মহাশয় হেরিসন সাহেবকে মনোনীত করেন। তদনুসারে ছোট লাট-বাহাদুর বর্দ্ধমানের কালেক্টার হেরিসন সাহেব বাহাদুরকে কমিসনার নিযুক্ত করিয়া মফঃসল তদন্ত জন্য প্রেরণ করেন। হেরিসন সাহেব বাদী অগ্রজ মহাশয় সমভিব্যাহারে খড়ার রাধানগর ক্ষীরপাই চন্দ্রকোণা রামজীবনপুর বদনগঞ্জ জাহানাবাদ প্রভৃতি গ্রামে যাইয়া সকল ব্যবসায়ীর খাতা ও কাগজ-পত্র অবলোকন করেন, ও আসেসর রমেশবাবুর কৃত অন্যায় প্রমাণ হয়। অগ্রজ মহাশয় বিপদগ্রস্ত দেশস্থ সাধারণের উপকারের জন্য প্রায় দুই মাস কাল অনন্যকর্মা ও অনন্যমনা হইয়া কেবল এই কার্য্যেই লিপ্ত ছিলেন। একারণ দেশস্থ লোক উপকার প্রাপ্ত হইয়া অগ্রজ মহাশয়ের বিশিষ্টরূপ গুণানুবাদ করেন। উহারা পূর্বে মনে করিত যে বিদ্যাসাগর কেবল বিদ্যোৎসাহী ও বিধবাবিবাহেরই প্রবর্তক। এখন দেশস্থ লোক ভালরূপ অবগত হইলেন যে সকল বিষয়েই সমদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। উক্ত কার্য্যে দুই মাস নিরন্তর লিপ্ত থাকায় অগ্রজ মহাশয়ের দুই সহস্রাধিক টাকা ব্যয় হয়।"[৭১]

এই ঘটনার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন : "বিদ্যাসাগরের জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বাংলায় অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করা দুষ্কর। আমাদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল বলিয়া আমরা প্রচার করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা কোনো ঝঞ্ঝাটে যাইতে চাহি না। এই অলস শান্তিপ্রিয়তা আমাদিগকে অনেক সময়েই স্বার্থপর নিষ্ঠুরতায় অবতীর্ণ করে। একজন জাহাজী গোরা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া মজ্জমান ব্যক্তির পশ্চাতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে; কিন্তু একখানা নৌকা যেখানে বিপন্ন, অন্য নৌকাগুলি তাহার কিছুমাত্র সাহায্য-চেষ্টা না করিয়া চলিয়া যায়, এরূপ

বিদ্যাসাগর যোগেন্দ্রকুমারকে বলতেন, যোগেন্দ্রকুমারও সেসব আনিয়ে দিতেন। এজন্যে বিদ্যাসাগর যোগেন্দ্রকুমারের নাম দিলেন—মুরুব্বি। বিদ্যাসাগর বলতেন—তোকে মুরুব্বি না পেলে আমার যে কী দশা হত তা জানি না।

কাছে গেলে বিদ্যাসাগর জলযোগ না করিয়ে ছাড়েন না। শোবার ঘরে খাটের নিচে একটা হাঁড়িতে মিষ্টি থাকে, পাঁচ-সাতখানা রেকাবী আর গ্লাশ থাকে। নিজে রেকাবীতে খাবার সাজিয়ে হাতে দেন, কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে দেন, নিজের হাতে পান সেজে দেন।

যোগেন্দ্রকুমার একদিন বললেন—আপনি নিজে পান সাজেন কেন?

বিদ্যাসাগর বললেন—আমি যে উড়ে রে। মেদিনীপুরের উড়ে। দেখিসনি, উড়েরা নিজের হাতে পান সেজে খায়।[৮০]

বিদ্যাসাগরকে অতিরিক্ত সম্মান দেখালে বিদ্যাসাগর খুশি হতেন না।

ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের কাছে এসেছেন। বিদ্যাসাগর তামাক খেয়ে হুঁকোটি ইন্দ্রকুমারের হাতে দিলেন। ইন্দ্রকুমার হুঁকোটি নিয়ে রেখে দিলেন।

বিদ্যাসাগর বললেন—সে কি? তুমি তামাক খাও না?

চুপ করে রইলেন ইন্দ্রকুমার।

বিদ্যাসাগর বললেন—বুঝেছি, তুমি তামাক খাও। আমাকে দেখে 'সমীহ' করা হচ্ছে। আমি ওসব জ্যাঠামি ভালোবাসি না। তামাক খাওয়া যদি অন্যায় মনে করো তবে খাও কেন? যদি অন্যায় বলে মনে না করো, তবে আমার সামনে খাবে না কেন?

ইন্দ্রকুমারের হাতে হুঁকো তুলে দিলেন বিদ্যাসাগর।

ইন্দ্রকুমারকে সামনে বসে তামাক না খাইয়ে ছাড়লেন না।[৮১]

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের কী মনোভাব? সে-বিষয়ে একটি ঘটনাই যথেষ্ট।

কে একজন ভদ্রলোক এসেছেন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে। এক নিশ্বাসে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্র সম্পর্কে হাজার কথা বলে গেলেন, কোনোটিই বিশেষ প্রশংসার কথা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র কী রকমে রাত কাটান, তার একটা বিশ্রী ব্যাখ্যাও দিলেন ভদ্রলোক।

সব শুনে বিদ্যাসাগর সহাস্যে বললেন—লোকটা সমস্তদিন গবর্ণমেণ্টের কাজে ব্যস্ত থাকে। আবার রাত্রিও যদি এই রকমে কাটায়, তাহলে বই লেখে কখন? তাঁর কেতাবে যে আমার আলমারির একটা সেলফ ভরে গেল। ওহে, তোমার কথা শুনে বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।[৮২]

আর বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র?

বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক। তিনি একদিন সাহস করে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গেলেন। যদি 'সাহিত্য' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখতে রাজি হন!

নানা কথাবার্তার পর 'সাহিত্য' সম্পর্কে দু-চারটি প্রশ্ন করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। জিজ্ঞেস করলেন—তোমার দাদামশায় জানেন?

হয়তো বিদ্যাসাগর জানেন। কিন্তু সুরেশচন্দ্র কখনো তাঁকে এই পত্রিকার

বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করেননি। তবে এসব তো লুকোনোর বস্তু নয়, খুব সম্ভব বিদ্যাসাগর জানেন। তিনি কখনো বারণ করেননি।

বঙ্কিমচন্দ্র সুরেশচন্দ্রকে বললেন—সে কি? দেশের লোক তাঁর পরামর্শ নিয়ে কাজ করে, আর তুমি তাঁকে না বলে কাগজ বের করে ফেললে? তিনি শুনলে রাগ করবেন না?[৮৩]

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সর্বত্র বিদ্যাসাগরের প্রতি সুবিচার করেননি।

১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে বাঙলা ১২৭৯ সনের 'বঙ্গদর্শনে' 'বিষবৃক্ষ' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে'র সূর্যমুখী একখানা চিঠিতে লিখেছে : "ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?"

তারকনাথ বিশ্বাস লিখেছেন : "তিনি (বিদ্যাসাগর) বর্দ্ধমানে আসিলে পিতৃদেব সময়ে সময়ে তাঁহাকে ভোজ দিতে অনুরোধ করিতেন। শরীর সুস্থ থাকিলে অনুরোধ প্রায়ই রক্ষিত হইত। এ ভোজ তাঁহার স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করান মাত্র; একদিন ভোজ আমাদের বাসায়। ভোক্তা বাবু দুর্গাদাস মল্লিক, বঙ্কিমবাবু, সঞ্জীববাবু এবং আরও দুই একজন লোক। সাগরের একটা কড়া বাঁধ ছিল। সে বাঁধনীর ভিতর না আসিতে পারিলে তিনি খাওয়াইতেন না। সেটী এই যে, তিনি যাহা স্বয়ং পাক করিতে পারিবেন তাহার অতিরিক্ত কোন দ্রব্য ভোক্তারা আহার করিতে পাইবেন না। সুতরাং মেনু (menu) অতি সামান্যই হইত। কথিত দিনের মেনু ভাত, পাঁঠার ঝোল এবং আম আদা দিয়া পাঁঠার মেটের অম্ল। আহারের সময় গগনভেদী বাহবা পড়িতেছে। আর দেবহৃদয় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বহস্তে উপবীত গলায় জড়াইয়া সহাস্যে পরিবেশন করিতেছেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "এমন সুস্বাদু অম্ল ত কখন খাই নাই।" সঞ্জীববাবু সহাস্যে বলিলেন "হবে না কেন, রান্নাটা কার জান ত, বিদ্যাসাগরের।" বিদ্যাসাগর মহাশয় তেমনি হাসির সহিত উত্তর দিয়া বলিলেন, "না হে না, বঙ্কিমের সূর্য্যমুখী আমার মত মূর্খ দেখেনি।" বঙ্কিমবাবু কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু একটা হাসির তুফান উঠিয়াছিল।"[৮৪]

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন :

"...আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি, তিনজনে আর এক পরামর্শে ব্যস্ত আছি। আনন্দমোহনবাবু বিলাত হইতে আসার পর হইতে আমরা একত্র হইলেই এই কথা উঠিত যে, বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কোনও রাজনৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মানুষদের কর্ম নয়; অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে তাহাদের উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক সভা থাকা আবশ্যক। আমাদের তিনজনের কথাবার্তার পর স্থির হইল যে, অপরাপর দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করা কর্তব্য। অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় আনন্দমোহন বাবুর বন্ধু এবং আমারও প্রিয় বন্ধু ছিলেন। প্রথমে তাঁহাকে পরামর্শের মধ্যে

বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছেন একদিন। সেখানে সেই ব্রাহ্মণের ছেলে নিজের হাতে বিদ্যাসাগরকে তামাক সেজে দিল। ছেলেটি কুষ্ঠরুগী।

কুষ্ঠরুগীর হাতে সাজা তামাক! বিদ্যাসাগর কিন্তু নির্বিকারভাবে সেই তামাক খেলেন।

ফিরতি-পথে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বললেন—কেমন করে আপনি কুষ্ঠ-রুগীর হাতে সাজা তামাক খেলেন?

বিদ্যাসাগর বললেন—যদি তোমার বা আমার কুষ্ঠ হত, তাহলে কী করতাম?[৭৬]

বিদ্যাসাগরের একজন পরম বন্ধু মারা গেলেন। সেই বন্ধুর কাছে বিদ্যাসাগরের কিছু টাকা পাওনা ছিল। কে একজন বিদ্যাসাগরের সামনেই বলল—ওই টাকা আদায়ের আর কোনো উপায় নেই।

—কি তোমরা দু-চার হাজার টাকার কথা বলো—বলতে-বলতে বিদ্যা-সাগরের চোখে জল এসে গেল—আমি লাখটাকা দিচ্ছি, আমাকে অমন একজন বন্ধু মিলিয়ে দাও দেখি।[৭৭]

১৮৫৬ সালের এপ্রিলে প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর 'পাটীগণিত' প্রকাশিত হল। বাঙলা পাটীগণিত। বস্তুত গণিতশাস্ত্রে বাঙলা পরিভাষার প্রথম প্রবর্তক প্রসন্নকুমার।

পাটীগণিতে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলি সম্পর্কে প্রসন্নকুমার লিখেছেন : "এই সকল শব্দের সঙ্কলন বিষয়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনেক সাহায্য করিয়াছেন।"

কেবল পাটীগণিত নয়, বাঙলায় বীজগণিতও লিখেছেন প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী।

'বীজগণিত (প্রথম ভাগ)' বইয়ের 'বিজ্ঞাপনে' প্রসন্নকুমার লিখেছেন : "বাঙ্গালা ভাষায় বীজগণিত গ্রন্থের অসদ্ভাব দেখিয়া, প্রায় দশ বৎসর পূর্বে, আমার পরমাত্মীয় অশেষ গুণসম্পন্ন শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরামর্শে, আমি এই পুস্তক সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হই।..."

বাঙলা পাটীগণিত বীজগণিতের সঙ্গেও অচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত হয়ে আছে বিদ্যাসাগরের নাম।

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন : "একবার প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয় পালকি করে শ্বশুরবাটী যাইবার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় ও ভরত শিরোমণি মহাশয় তাঁহার সঙ্গে পাইক সাজিয়া গিয়াছিলেন। কটিদেশে উপবীত গুঁজিয়া লাটি কাঁধে করিয়া পাইকের ন্যায় চলিলেন। পঁহুছিয়া সর্বাধিকারী মহাশয়ের শ্বশুর মহাশয়কে সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁরা দুজনে যখন বাটীর পুষ্করিণীতে সন্তরণ করিতেছিলেন, তখন সর্বাধিকারী মহাশয়ের স্ত্রী তাঁহাদের চিনিতে পারেন। চিনিতে পারিয়া তাঁহার বাবাকে বলিলেন; তাঁহার বাবা ঘাটে আসিয়া দেখেন যে তাঁহারা একগলা জলে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা করিতেছেন। পাছে কেহ পৈতা দেখিতে পায় বলিয়া একগলা জলে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার বাবার সন্দেহ ঘনীভূত হইল; পাইকেরা যে সন্ধ্যাহ্নিক করে ইহা কখন তিনি দেখেন নাই। ইনি গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহাদের বলিলেন, "আপনাদের চিনেছি, কেন আমাকে ছলনা করছেন? আসুন

আপনাদের সেবা করিয়া কৃতার্থ হই।" তাঁহারা তথাপি বলিলেন "আমরা বাবুর সঙ্গে এসেছি; সিধে নিয়েই আমরা খাব।" "আমরা কায়স্থ, ব্রাহ্মণের ত চিরদাস, অনুমতি করুন কি করে সেবা করুব।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "ওরে ধরেছে রে, এত করেও পাইক হতে পারলাম না।"।"[৭৮]

গ্রীষ্মকাল। দুপুরবেলা। একজন বড়মানুষের বাড়িতে বসে আছেন বিদ্যাসাগর। জাজিমে। টানাপাখার নিচে।

একজন দারোয়ান সেখানে এসে উপস্থিত। বিদ্যাসাগরের চিঠি নিয়ে এসেছে। দারুণ রোদে হেঁটে এসেছে, টকটক করছে, ঘাম বেরোচ্ছে।

বিদ্যাসাগর দারোয়ানকে নিজের কাছে বসতে বললেন। জাজিমে। টানা-পাখার নিচে।

দারোয়ান বসতে রাজি হল না। ওখানে বড়মানুষেরা বসেন, দারোয়ান কোন সাহসে বসবে।

বিদ্যাসাগর তখন দারোয়ানের হাত ধরে বসিয়ে দিলেন। জাজিমে। টানা পাখার নিচে।

খানিক ঠাণ্ডা হয়ে দারোয়ান বিদায় নিয়ে চলে গেল।

যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সেখানে, তাঁরা বিদ্যাসাগরকে বললেন—আমরা যে-আসনে বসে আছি সেখানে একজন দারোয়ানকে বসিয়ে আপনি ভালো করেননি। এতে আমাদের মান থাকে না।

বিদ্যাসাগর বললেন— আগে বিচার হোক, পরে আমাকে দোষী করো। বিচার কীভাবে হবে? হিন্দুমতে না অন্যমতে? হিন্দুমতে বিচার শোনো : এই দারোয়ান একজন কনৌজী ব্রাহ্মণ, ওরা আমাদের জল পর্যন্ত স্পর্শ করে না, তোমাদের বাপ-ঠাকুর্দা আজ এখানে থাকলে ওর পায়ের ধুলো এই জাজিমে না পড়ে তাদের মাথায় উঠত। অন্যমতে বিচার শোনো : আমরা সকলে পাঁচশো সাতশো হাজার টাকা মাইনে পাই, ওই দারোয়ান পাঁচ টাকা মাইনে পায়। এই অবস্থায় আমি ওকে অবজ্ঞা করতে পারি না, কারণ আমার বাবা বড়বাজারে এক দোকানে পাঁচ টাকা মাইনেয় কাজ করতেন। ওকে অবজ্ঞা করার আগে আমার বাবাকে অবজ্ঞা করতে হয়। হয়তো এখন আমাদের মধ্যে এখানে কেউ-কেউ আছেন যাঁদের বাবা কিংবা ঠাকুর্দা পাঁচ টাকা মাইনেয় কাজ করে গেছেন।

সকলে চুপ।[৭৯]

যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : "বিদ্যাসাগর মহাশয় শেষজীবনে, বোধহয় বৎসরাধিক কাল চিকিৎসকগণের পরামর্শে চন্দননগরে গঙ্গার তীরে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। চন্দননগরে স্ট্র্যাণ্ডের দক্ষিণপ্রান্তের গঙ্গাগর্ভে যে বাটী আছে, তিনি সেই বাটী এবং তৎসংলগ্ন দক্ষিণে আর একটি বাটী ভাড়া লইয়াছিলেন। প্রথমোক্ত বাটীটি তাঁহার অন্তঃপুর ও শেষোক্ত বাটীটি তাঁহার সদরবাটী বা বৈঠকখানা-রূপে ব্যবহৃত হইত।"

রাজমিস্ত্রির দরকার পড়ল একদিন। বিদ্যাসাগর যোগেন্দ্রকুমারকে বললেন—যোগিন, ভালো রাজমিস্ত্রি দিতে পারিস?

রাজমিস্ত্রি নিয়ে এলেন যোগেন্দ্রকুমার।

তারপর ছুতোরমিস্ত্রি, ইট, চুন, সুরকি, বালি, কাঠ—যখন যা দরকার

লওয়া হইল। তৎপরে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়কেও লওয়া হইল। মনোমোহন ঘোষের বাড়ীতে এই পরামর্শ চলিল।...

যখন একটা সভা স্থাপন একপ্রকার স্থির হইল, তখন একদিন আনন্দমোহনবাবু ও আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি বলিলেন, এতৎদ্বারা দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইবে। আমরা তাঁহাকে আমাদের প্রথম সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়া সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। কে কে এই উদ্‌যোগের মধ্যে আছেন জিজ্ঞাসা করাতে আমরা যখন অপরাপর ব্যক্তিদিগের মধ্যে অমৃতবাজারের দলের নাম করিলাম, তখন বিদ্যাসাগর বলিয়া উঠিলেন, "যা! তবে তোমাদের সকল চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাবে। ওদের এর ভিতর নিলে কেন?"

আনন্দমোহনবাবু ও আমি বলাবলি করিতে করিতে ফিরিলাম যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতি ত জানাই আছে, তাঁহার কাছে স্বর্গ ও নরক ভিন্ন মাঝামাঝি একটা স্থান নাই। যাকে ভাল জানিবেন তাকে স্বর্গে দিবেন; যাকে মন্দ জানিবেন তাকে একেবারে নরকে দিবেন। শিশিরবাবুদের প্রতি বোধহয় কোন কারণে বিরক্ত হইয়াছেন, আর ওঁদের নামও সহিতে পারেন না।

কি আশ্চর্য্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মানব-প্রকৃতির অভিজ্ঞতা! কি আশ্চর্য্য ভবিষ্যৎদর্শনের শক্তি! তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল।..."

[শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিতে'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালে। প্রথম সংস্করণের 'আত্মচরিত' থেকে একাংশ তুলে দিচ্ছি :

"কে কে এই উদ্‌যোগের মধ্যে আছেন জিজ্ঞাসা করাতে আমরা যখন অপরাপর ব্যক্তিদিগের মধ্যে অমৃতবাজারের দলের নাম করিলাম, তখন বিদ্যাসাগর বলিয়া উঠিলেন, "যা! তবে তোমাদের সকল চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাবে। ওদের এর ভিতর নিলে কেন?"

আনন্দমোহনবাবু ও আমি বলাবলি করিতে করিতে ফিরিলাম যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃতি ত জানাই আছে, তাঁহার কাছে স্বর্গ ও নরক ভিন্ন মাঝামাঝি একটা স্থান নাই। যাকে ভাল জানিবেন তাকে স্বর্গে দিবেন; যাকে মন্দ জানিবেন তাকে একেবারে নরকে দিবেন। শিশিরবাবুদের প্রতি বোধহয় কোন কারণে বিরক্ত হইয়াছেন, আর ওঁদের নামও সহিতে পারেন না।

কি আশ্চর্য্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মানব-প্রকৃতির অভিজ্ঞতা! কি আশ্চর্য্য ভবিষ্যৎদর্শনের শক্তি! তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল।..." (পৃ. ২১৮-১৯)।

১৯১৯ সালের ৩০-সেপ্টেম্বর শিবনাথ শাস্ত্রীর মৃত্যু হল। ১৯২০ সালে তাঁর 'আত্মচরিতে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পাদক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী। দ্বিতীয় সংস্করণের ২২৭-২৮ পৃষ্ঠায় উপরে উদ্ধৃত অংশটুকু আছে।

শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিতে'র তৃতীয় সংস্করণ সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর সম্পাদকত্বে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য অংশটুকু এই সংস্করণে নিশ্চিহ্ন।

কেন?

প্রশ্ন থেকে যায় : শিবনাথ শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত

'আত্মচরিত' থেকে এই অংশটুকু বিলুপ্ত করে দেওয়ার অধিকার কি কারো আছে ?]

১৮৫৬ সালে কলকাতায় এসেছে শিবনাথ। সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়েছে। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল। শিবনাথের মামা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বিদ্যাসাগরের বন্ধু। বিদ্যাসাগর মাঝে-মাঝে দ্বারকানাথের সঙ্গে দেখা করার জন্য বাসায় আসতেন। এসে, শিবনাথকে কাছে পেলেই, বিদ্যাসাগর হাতের দু-আঙুল চিমটের মতো করে শিবনাথের ভুঁড়ির মাংস টেনে ধরতেন। বিদ্যাসাগর আসছেন টের পেলে শিবনাথ তাই পালিয়ে যেত।

শিবনাথকে খুব ভালোবাসতেন বিদ্যাসাগর। ওদের বাসায় এসেই ওকে খুঁজতেন, ওর কথা জিজ্ঞেস করতেন।

বাসায় তো বিদ্যাসাগর এইরকম। আর কলেজে?

উত্তরকালে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন :

"কলেজে আমরা তাঁহাকে (বিদ্যাসাগরকে) ভয়ের চক্ষে দেখিতাম, এবং তাঁহা হইতে দূরে দূরে থাকিতাম। ছেলেরা দুষ্টামি করিলে তিনি ধরিয়া নিজের ঘরে লইয়া যাইতেন, কোণে দাঁড় করাইয়া রাখিতেন, এবং বইয়ের পাতাকাটা স্লাইসের দ্বারা তাহাদের পেটে মারিতেন। আমার যেন মনে হয়, আমার কোনও দুষ্টামির জন্য আমাকে ধরিয়া লইয়া আমার ভুঁড়িতে মারিয়াছিলেন, ও আমাকে কোণে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিলেন।"

শিবনাথের বাবার নাম হরানন্দ ভট্টাচার্য। হরানন্দকেও খুব ভালোবাসতেন বিদ্যাসাগর।

কেশবচন্দ্র সেনের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিলেন শিবনাথ। হরানন্দ শিবনাথকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। একদিন বিদ্যাসাগরকে বললেন—মানুষ যেমন ছেলে যমকে দেয়, তেমনি আমি ছেলে কেশবকে দিয়েছি।

হরানন্দের কথা শুনে বিদ্যাসাগর কেঁদে ফেললেন।

দু-জনের জন্যেই বিদ্যাসাগরের কষ্ট—হরানন্দের জন্যেও কষ্ট, শিবনাথের জন্যেও কষ্ট।

শিবনাথকে তো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, না জানি কত কষ্ট পাচ্ছে শিবনাথ। পথে-ঘাটে শিবনাথের সঙ্গে দেখা হলে প্রথমেই বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করতেন—হ্যাঁ রে, তোর কেমন করে চলে?

তারপর শিবনাথ যখন সরকারী চাকরি ছেড়ে দিলেন, কে একজন এসে শিবনাথের নামে নালিশ করলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। বললেন—মশাই, পাজিটা এমন সুখের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে।

বিদ্যাসাগর হেসে বললেন—কোন পাজির কাছে বলছ? সে তো আমার মনের মতো কাজ করেছে।

কেউ যদি বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে শিবনাথকে গালাগাল করে তো বিদ্যাসাগর শিবনাথের ব্রাহ্মসমাজে যাওয়ার জন্য দুঃখ করেন; কিন্তু বলেন—যাই বলো, ওকে বুকে রাখলে আমার বুক ব্যথা করে না।[৮৫]

একসময়ে প্রায়ই শিবনাথের বাসায় আসতেন বিদ্যাসাগর। সেদিনও এসেছেন। ঝগড়া করতে এসেছেন। ওই বাসার একজন যুবক কী একটা কথা বিদ্যাসাগরের নামে চালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কথাটা বিদ্যাসাগর স্বীকার করছেন না।

বিদ্যাসাগর বলছেন—অমন কথা আমার মুখ থেকে বেরোতেই পারে না।

আর সেই যুবকটি বলছে—উনি ওকথা বলে গেছেন। এখন ওঁর মনে নেই।

এই নিয়ে ঝগড়া। তুমুল ঝগড়া। বিদ্যাসাগরও অদম্য, সেই যুবকটিও কিছুতেই হটবে না। শেষপর্যন্ত রাগ করে চলে গেলেন বিদ্যাসাগর। কিছুতেই তাঁকে ফেরানো গেল না।

বাসার সকলে যুবকটিকে বিস্তর নিন্দামন্দ করল—যাও, ক্ষমা চেয়ে এসো গিয়ে বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে।

সেদিন বিকেলেই যুবকটি বিদ্যাসাগরের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। বিদ্যাসাগর তখন বাড়িতে ছিলেন না। বাড়িতে ফিরে এসে যুবকটিকে দেখেই বলে উঠলেন—মাপ চাইতে এসেছিস বুঝি? আরে দুদিন সবুর কর। ভোরবেলা রেগে এসেছি। দুদিন যাক। রাগটা একটু পড়ুক।[৮৩]

কলকাতায় কলেজ স্কোয়ারের উত্তরে একটি গলিতে একজন ব্রাহ্মবন্ধুর সঙ্গে শিবনাথ যে-সময়ে এক বাড়িতে ছিলেন, সেসময়ের একটা ঘটনা বর্ণনা করা যেতে পারে এবার। শিবনাথের সম্বল তখন কলেজের স্কলারশিপ। কায়ক্লেশে দিন চলে। শিবনাথের তখন চূড়ান্ত দুরবস্থা।

এই অবস্থায় একদিন সেই বাড়ির সামনে একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াল। কে এলেন?

উপেন্দ্রনাথ দাস। সঙ্গে স্ত্রী আর একটি শিশু। কাশী থেকে সরাসরি এখানে চলে এসেছেন। উপেন্দ্রনাথ গুরুতর অসুস্থ।

অন্য কোনো উপায় নেই বলে শিবনাথ সকলকে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন। পাশের ঘরের বাসিন্দা ঘর খালি করে দিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। তা না হলে এঁদের থাকবার জায়গা কোথায়?

উপেন্দ্রনাথের চিকিৎসার জন্যে যথাসাধ্য ব্যবস্থা করলেন শিবনাথ।

হাইকোর্টের উকিল শ্রীনাথ দাসের ছেলে এই উপেন্দ্রনাথ। শোনা যায়, বহুকাল আগে উপেন্দ্রনাথ বাবার সঙ্গে বিবাদ করে একবার মান্দ্রাজ গিয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন উপেন্দ্রনাথ। শিবনাথও সংস্কৃত কলেজের ছাত্র।

যা হোক, এখন উপেন্দ্রনাথের সাংঘাতিক অসুখ। ক্রমেই অবস্থা খারাপ হচ্ছে। উপেন্দ্রনাথের আয়ু বোধ হয় ফুরিয়ে এসেছে। উপেন্দ্রনাথের বাবার কথা মনে পড়ল। বাবাকে দেখবার সাধ হল একবার। উপেন্দ্রনাথ শিবনাথকে বললেন—আমি বোধ হয় আর বেশি দিন বাঁচব না। যদি একবার বাবার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারো, বড়ো ভালো হয়।

শ্রীনাথ দাসের সঙ্গে শিবনাথের আলাপ-পরিচয় নেই। শিবনাথ কেমন করে নিজে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করবেন।

ভেবে-চিন্তে শিবনাথের মনে হল বিদ্যাসাগরের কথা। মনে হল, বিদ্যাসাগরকে দিয়ে শ্রীনাথ দাসকে ধরে আনতে হবে।

একদিন সকালবেলা বিদ্যাসাগরের কাছে গেলেন শিবনাথ। কিন্তু উপেন্দ্রনাথের কথা শুনেই রেগে উঠলেন বিদ্যাসাগর। বললেন—কি, যাকে দেখলে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জুতো মারতে ইচ্ছা করে, তার হয়ে তুই আমাকে অনুরোধ করিস?

যা ভেবে আসা বিদ্যাসাগরকে দিয়ে তা বুঝি আর হল না। শিবনাথ বললেন—আপনি বাপ-বেটায় দেখা করিয়ে না দিলে আর কাউকে দিয়ে হবে না। তবে আমি যাই। কি আর করব। উপেনের শেষ অনুরোধটা রাখতে পারা গেল না।

অগত্যা শিবনাথ বিরস মুখে বিদায় নিতে উঠলেন। বিদ্যাসাগর তখন বললেন—যাস নে, রোস। মরণকালে বাপকে দেখতে চেয়েছে, শুভবুদ্ধি হয়েছে, এটাও ভালো। দেখি কিছু করতে পারি কিনা।

একটুখানি ভেবে বললেন—কাল সকাল সাতটা-আটটার মধ্যে তার বাপকে তোর বাড়িতে নিয়ে যাব। তুই ঘরে থাকিস।

পরদিন সকাল সাতটায় বিদ্যাসাগর শ্রীনাথ দাসের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত। শ্রীনাথকে বললেন—তোমার গাড়ি যুততে বলো দেখি, তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে।

শ্রীনাথ দাস কিছুই জানেন না। জিজ্ঞেস করলেন—কোন জায়গায়?

বিদ্যাসাগর বললেন—আঃ, চলো না! রাস্তায় বলব।

গাড়ি চলল। গলি পেরিয়ে বড়ো রাস্তায় এসেই বিদ্যাসাগর বললেন—কোথায় নিয়ে যাচ্ছি, জানো?

শ্রীনাথ দাস শুনতে লাগলেন—তোমার ছেলে উপেন অসুস্থ হয়ে কাশী থেকে এসে এক বন্ধুর বাসায় উঠেছে। খুব শক্ত অসুখ, বাঁচে কি না সন্দেহ। মরণকালে সে তোমাকে দেখতে চেয়েছে। তাই তার বন্ধুর অনুরোধে তোমাকে নিতে এসেছি।

উপেন্দ্রনাথের নাম শুনেই শ্রীনাথ দাস জ্বলে উঠলেন। বললেন—কোচম্যান, গাড়ি ফেরাও।

সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যাসাগর বললেন—কোচম্যান, গাড়ি থামাও। আমি নামব।

গাড়ি থামল। বিদ্যাসাগর নামতে যাচ্ছেন, শ্রীনাথ দাস তাঁর হাত ধরলেন, বললেন—এ কি? তুমি নামো কেন?

বিদ্যাসাগর বললেন—ছেড়ে দাও আমাকে। তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ বন্ধুতা। ছেলের উপর যতই অসন্তুষ্ট হয়ে থাকো, মরণকালে সে বাপকে দেখতে চেয়েছে, এখনো তুমি দেখা দিতে চাও না? কেমন বাপ হে তুমি?

বিদ্যাসাগরের কথা শুনে শান্ত হলেন শ্রীনাথ দাস। কোচম্যানকে বললেন—গাড়ি চালাও।

শ্রীনাথ দাস এলেন, ছেলেকে দেখলেন, ক্ষমা করলেন, চলে গেলেন, বিদ্যাসাগর গেলেন না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগর শিবনাথের কাছে খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন—উপেনের টাকাকড়ির অবস্থা কেমন?

সেদিকে একেবারে ফাঁকা, একটা কানাকড়িরও সম্বল নেই উপেন্দ্রনাথের।

বিদ্যাসাগর কেঁদে ফেললেন। আগের দিন যাঁর নাম শুনে জুতো মারতে চেয়েছিলেন, পরের দিন তাঁর অবস্থা দেখে কাঁদতে লাগলেন।

যাবার আগে শিবনাথের হাতে দশটি টাকা দিয়ে বিদ্যাসাগর বলে গেলেন—দেখিস, ওর স্ত্রী-পুত্র যেন না কষ্ট পায়। টাকার অভাব হলে আমাকে বলিস। এত খরচ তুই কোত্থেকে জোগাবি?[৮৭]

যাকে দেখলে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জুতো মারতে ইচ্ছা করে বলে

আগের দিন হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিলেন, পরের দিন তারই দুঃখে বিদ্যাসাগর সাহায্য না করে থাকতে পারলেন না, তারই দুঃখে বিদ্যাসাগরের দু-চোখ জলে ভরে উঠল। এরই নাম দয়া—বিদ্যাসাগরের দয়া।

কিন্তু কেবল দয়া কিম্বা বিদ্যা নয়—রবীন্দ্রনাথের ভাষা কেড়ে এনে বলা যেতে পারে—বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁর অজেয় পৌরুষ, তাঁর অক্ষয় মনুষ্যত্ব। রজনীকান্ত গুপ্ত বলেছেন : "তিনি (বিদ্যাসাগর) প্রকৃত মনুষ্যত্বের পূর্ণাবতারস্বরূপ মহাপুরুষ ছিলেন।"

শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন :

"তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) মনুষ্যত্বের প্রভাব এত অধিক ছিল যে, তিনি সেই প্রভাবে স্বদেশ ও স্বজাতির অনেক উপরে উঠিয়াছিলেন। যেমন ক্ষুদ্রকায় বনজ গুল্ম সকলের মধ্যে দীর্ঘদেহ শালবৃক্ষ দণ্ডায়মান থাকে, তেমনই সেই পুরুষ-সিংহ নিজ মহৎ মনুষ্যত্বে স্বসমকালীন জনগণকে বহু নিম্নে ফেলিয়া উর্ধ্ব-শিরা হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন,—"ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতা শুদ্ধ পাখানা তুলিয়া টক্ করিয়া লাথি মারিতে না পারি।" ঠিক কথা! এরূপ তেজস্বী পুরুষের নিকটে রাজা রাজড়া কোথায় লাগে?"[৮৮]

কিন্তু এক হিসেবে বিদ্যাসাগরও একজন রাজা, বড়ো রাজা। বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় শিবনাথ শাস্ত্রী যথার্থ লিখেছেন : "তিনি (বিদ্যাসাগর) কখনও আত্মমর্য্যাদা ভুলেন নাই; কখনও সামান্য স্বার্থের অনুরোধে অপমান সহ্য করেন নাই। ধনী বা পদস্থ লোকের তোষামোদ করা তাঁহার কুষ্ঠীতে লেখে নাই। জগদীশ্বর খাঁটি ইস্পাতে তাঁহাকে নির্মাণ করিয়াছেন, তিনি ভাঙ্গিবেন তবু নত হইবেন না। ইহাকেই ত বলে মানুষ। নতুবা ধনীর দ্বারে তোষামোদ দ্বারা জীবন ধারণ করা ত শৃগাল কুকুরের কাজ। এই গুণে এই মহাপুরুষকে আমরা এত ভালবাসি; আমাদের ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই যাঁহার অপেক্ষা ঐ দরিদ্রের সন্তান বিদ্যাসাগর বড় লোক নহেন। যে স্বকর্তব্য সাধনে সাহসী সেই মানবকুলে রাজা। আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় এই হিসাবে একজন বড় রাজা।"[৮৯]

একজন বড়ো রাজা হয়েও বিদ্যাসাগর চটি ছাড়া আর কিছু পায়ে তোলেননি। কখনো কখনো সখ করে তালতলার চটি বিলাতি বার্নিশের মতো ঝকঝকে কালো করে বুরুশ করিয়ে নিতেন। আসলে চটি তো একটা উপলক্ষ্য। এই সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখেছেন : "চটি জুতার প্রতি তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) একটা আত্যন্তিক আসক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যে চটিজুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায়ে দিতেন না, এমন নহে। আমরা যে স্বদেশের প্রাচীন চটি ত্যাগ করিয়া বুট ধরিয়াছি, ঠিক তাহা দেখিয়াই যেন বিদ্যাসাগরের চটির প্রতি অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছিল। বাস্তবিকই এই চটিজুতাকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া একটা অভিমান, একটা দর্প তাঁহার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইত।"[৯০]

চটির উপলক্ষ্যে একটা ঘটনা আছে। বিদ্যাসাগর তখন এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য। সেই সূত্রে বহুবার তিনি যাদুঘরে গেছেন। যা সব সময় থাকে, পায়ে তাঁর তালতলার চটি। তা নিয়ে কোনোবার বাধা-বিপত্তি ঘটেনি।

একবার একটা কাণ্ড হল। দরজা পার হয়ে বিদ্যাসাগরকে যাদুঘরে ঢুকতে দিল না দারোয়ান। ওই চটি পায়ে দিয়ে যাদুঘরে ঢুকবার হুকুম নেই।

যাদুঘরে ঢুকতে হলে ওই চটি খুলে রেখে ঢুকতে হবে।

বিদ্যাসাগর চটি খুললেন না, যাদুঘরে ঢুকলেন না। খোঁজ-খবর নিয়ে জানলেন, দারোয়ান খাঁটি কথা বলেছে, চটি পায়ে দিয়ে যাদুঘরে ঢোকা বারণ।

যাদুঘরের কিউরেটার ছুটে এলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। অনেক সাধ্য-সাধনা করলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর কিছুতেই যাদুঘরে ঢুকলেন না।

খবর চাপা রইল না। যাদুঘরের কর্তৃপক্ষ দুঃখ করে বিদ্যাসাগরের কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখলেন; জানালেন, বিদ্যাসাগর যখন যা খুশি পরে যাদুঘরে আসতে পারেন।

তবু গেলেন না বিদ্যাসাগর। কর্তৃপক্ষকে জানালেন—আমার জন্যে আলাদা নিয়ম করার দরকার নেই। সকলের জন্যে এক নিয়ম আর আমার জন্যে আরেক নিয়ম, এমন ব্যবস্থায় আমি রাজি নই।

সেসময়ে এই ঘটনা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় অনেক আন্দোলন হয়েছে। ১৮৭৪ সালের ১২-জুলাইয়ের 'সাধারণী' পত্রিকায় স্বনামধন্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'তালতলার চটি' নামে একটি শ্লেষাত্মক রচনা লিখেছেন। রচনাটি থেকে একটুখানি তুলে দিচ্ছি :

"রে তালতলার চটি! ইংরাজের আমলে কেবল তোরই অদৃষ্ট ফিরিল না!...

চটি তুই আপনি আপনার কর্মদোষে মারা গেলি!...নীচস্য নীচ বাঙ্গালি জাতির মধ্যে যে কুসন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তাহারই ফাটা পায়ের আশ্রয় লইয়া, মহামন্ত্রপূত ইংরাজের যাদুগৃহে প্রবেশ লাভ করিতে ইচ্ছা করিস্? তালতলা-সম্ভূতার এত দূর স্পর্ধা!...তোর এ জন্মে, এ চর্মচটি-জন্মে, কুসন্তান বিদ্যাসাগরের বলে তুই এ স্থানে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবি না।... কলঙ্কিণী, তালতলা-সম্ভূতা অপকৃষ্ট জুতা, বিদ্যাসাগর-পদাশ্রিতা! তোর কেন এ স্পর্ধা!!! দূরীভব!"

যা-হোক, আর-সকলকে বাদ দিয়ে নিজের জন্য আলাদা নিয়মের সুবিধা বিদ্যাসাগর নিতে পারেননি। সকলের জন্য এক রকম ব্যবস্থা হল না, অতএব বিদ্যাসাগর প্রতিজ্ঞা করলেন, আর কখনো যাদুঘরে ঢুকবেন না। আর কখনো ঢোকেননি।

বর্ধমানের রাজবাড়িতে গিয়েছেন একবার বিদ্যাসাগর। একজন দারোয়ান বিদ্যাসাগরকে চিনত না, দরবারে ঢোকার আগে সে তাঁকে চটি খুলে রেখে যেতে বলল। চটি খুলে রেখে বিদ্যাসাগর দরবারে ঢুকলেন।

বর্ধমানের রাজা বিদ্যাসাগরকে সাদর সম্মানে আপ্যায়িত করলেন।

রাজার কাছে বিদ্যাসাগরের এমন সাদর সম্মান দেখে দারোয়ান আশ্চর্য হয়ে গেল। ইনি কে? খোঁজ নিয়ে জানতে পারল, ইনি স্বয়ং বিদ্যাসাগর।

কাজ শেষ হয়ে গেল। বিদ্যাসাগরকে বিদায় দিতে রাজা দরজা পর্যন্ত এলেন। বিদায় দিয়ে রাজা যখন ফিরলেন, তখনই ওই দারোয়ান হাত জোড় করে বিদ্যাসাগরকে বলল—আমি চিনতে পারিনি, ক্ষমা করুন।

বিদ্যাসাগর বললেন—তোমার দোষ কি? তোমার মনিবের যেমন হুকুম, তেমনি করেছ।

কথাটা রাজা শুনতে পেয়েছেন। বিদ্যাসাগর চলে যাবার পর তিনি ওই

দারোয়ানকে বরখাস্ত করে দিলেন।

অন্যের পরামর্শে ওই দারোয়ান বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হল। সব শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন বিদ্যাসাগর। একখানা নরম-গরম চিঠিতে বিদ্যাসাগর রাজাকে অনুরোধ করলেন যেন ওই দারোয়ানকে আবার কাজে বহাল করা হয়।

চিঠিতে কাজ হল। বর্ধমানের রাজা ওই দারোয়ানকে আবার কাজে বহাল করলেন।[১১]

উত্তরকালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বিদ্যাসাগর বিষয়ে 'সাগর তর্পণ' নামে একটি কবিতা লিখেছেন। সেই কবিতায় বিদ্যাসাগরের চটি নিয়ে কয়েকটি অমোঘ পংক্তি আছে :

"তেমন মানুষ না পাই যদি খুঁজব তবে, হায়,
ধুলোয় ধুসর বাঁকা চটি ছিল যা' ওই পায় ;
সেই যে চটি উচ্চে যাহা উঠত এক একবার
শিক্ষা দিতে অহঙ্কৃতে শিষ্ট ব্যবহার।

সেই যে চটি—দেশী চটি—বুটের বাড়া ধন,
খুঁজব তারে, আন্‌ব তারে, এই আমাদের পণ ;
সোনার পিঁড়েয় রাখব তারে, থাক্‌ব প্রতীক্ষায়
আনন্দহীন বঙ্গভূমির বিপুল নন্দিগাঁয়।

রাখব তারে স্বদেশ-প্রীতির নূতন ভিতের 'পর,
নজর কারো লাগ্‌বে নাকো, অটুট হ'বে ঘর।
উঁচিয়ে মোরা রাখব তারে উচ্চে সবাকার,—
বিদ্যাসাগর বিমুখ হ'ত—অমর্যাদায় যার।

শাস্ত্রে যারা শস্ত্র গড়ে হৃদয়-বিদারণ,
তর্ক যাদের অর্কফলার তুমুল আন্দোলন ;
বিচার যাদের যুক্তিবিহীন অক্ষরে নির্ভর,—
সাগরের এই চটি তারা দেখুক নিরন্তর।"

জনসনের চরিত্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের তুলনা করেছেন যদুনাথ সরকার। তিনি লিখেছেন :

"ইংলণ্ডের সাহিত্যে এবং সমাজের ইতিহাসে ডাক্তার সেমুয়েল জন্‌সনের যে স্থান, বাঙলায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঠিক তাহাই। দুজনেই খাঁটী মানুষ ছিলেন ; কঠোর দারিদ্র্য হইতে নিজ চরিত্রবলে উঠিয়া প্রতিষ্ঠা ও ধন লাভ করেন, অথচ শেষদিন পর্য্যন্ত মিতব্যয়ী, সরল, করুণহৃদয়, নির্ভীক স্পষ্টবক্তা এবং কঠোর শ্রমী ছিলেন। দুজনেই প্রাচীন সাহিত্য ও ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত, এবং সেই প্রাচীন লাটিন (এখানে সংস্কৃত) ভাষার শব্দ ও রচনাপদ্ধতি নিজ প্রতিভাবলে মাতৃভাষায় চালাইয়া দেন এবং তাহা অনেকদিন পর্য্যন্ত আদর্শ হইয়া থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমাদের পিতা-

মহের যুগে ইংরাজীনবিস এবং বাঙ্গলালেখক সমভাবে জনসনী ইংরাজী ও বিদ্যাসাগরী বাঙ্গলা স্টাইল অনুকরণ করিতেন। এই দুজনের চরিত্রের দৃষ্টান্ত আমাদের দেশের ভণ্ড স্বার্থপর মিথ্যাবাদী মূর্খ নেতাদের নীরব তিরস্কার করিত, সমাজের সকল লোকের প্রেম ও ভক্তি পাইত। দুজনের মধ্যে কেহই বড়লোক ছিলেন না, কিন্তু আজ তাঁহারা দেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর নিকট ঠিক যেন নিজের লোক।

আমাদের দেশে ক্লব্ নাই, এবং ভগবান মনুর যুগে চীনদেশ হইতে রেশমী পতাকা ভিন্ন আমদানী বন্ধ থাকায় রাত্রে ভদ্রলোক সকলে একত্র হইয়া চা পান করিবেন এরূপ ব্যবস্থা ধর্ম-সংহিতায় লেখা হয় নাই, এই দুই কারণে জন্‌সন্ যেমন সমাজে সাহিত্য-সম্রাটরূপে বিরাজিত ও স্বীকৃত ছিলেন, বিদ্যাসাগর প্রকাশ্যে তাহা হইতে পারেন নাই। কিন্তু কয়েকটি কর্মক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর জন্‌সন্ অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি সেকেলে সংস্কৃত পণ্ডিত এবং পণ্ডিতদের বংশধর হইলেও নব্য ইউরোপীয় প্রণালীতে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করেন; সেই আবহমান কালের সংস্কৃত শিক্ষার পদ্ধতি বদলাইয়া নবযুগের উপযোগী এবং সভ্যদেশের জ্ঞানীদের মতানুযায়ী ও স্বাভাবিক করিয়া দেন। আর, প্রবল বাধার বিরুদ্ধে, হিন্দুদের যুগ-যুগ ধরিয়া প্রচলিত আচারের বিরুদ্ধে, এই ধনহীন, সামাজিক প্রতিপত্তিহীন, দলবলহীন, একাকী, "অসভ্য" পণ্ডিত দাঁড়াইয়া সমাজের সংস্কার করেন। তাঁহার দানশীলতাও জনসনের অপেক্ষা অধিকদূর প্রসারিত, অধিক পরিমাণে দাতার সর্বস্বক্ষয়কর ছিল।

লণ্ডনের সৌখিনদল অনেকদিন পর্যন্ত জনসনকে চিড়িয়াখানা হইতে পলাতক ভালুক বলিয়া মনে করিতেন, আর আমাদের তৎকালীন ইয়ংবেঙ্গল বিদ্যাসাগর মহাশয়কে রাস্তায় দেখিলে উড়ে বেহারা হইতে পৃথক ভাবিতেন না।*

ভারতের সেই যুগসন্ধির স্থলে দাঁড়াইয়া লোকশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষার প্রথম রাস্তা কাটিয়া, তাহার অভাবনীয় বাধাবিপত্তিগুলি কার্যদক্ষতার সহিত, সহৃদয়তার সহিত, অক্লান্ত শ্রমের সহিত দূর করিয়া, লোকজনকে বুঝাইয়া, সাধারণের উৎসাহ জাগাইয়া, বেসরকারী সাহায্য লইয়া, বিদ্যাসাগর স্বদেশের যে স্থায়ী উপকার করিয়া গিয়াছেন, জনসনের সেরূপ সুযোগ হয় নাই; তিনি চিরজীবন সাহিত্যিক ছিলেন, কখনও শিক্ষানেতা বা সমাজ-সংস্কারক হন নাই। পুত্র-কন্যার হাতে দেওয়া যাইতে পারে এরূপ বিশুদ্ধ অথচ হৃদয়-রঞ্জক সাহিত্য-স্রষ্টা হিসাবে বিদ্যাসাগরের যে কীর্তি, ইংলণ্ডে তাহার দৃষ্টান্ত এডিসন, জনসন নহেন।"[১২]

যদুনাথ সরকারের আগে রবীন্দ্রনাথও কয়েকটি বিষয়ে জনসনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "...জন্‌সনের সহিত কতকগুলি বিষয়ে তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) অত্যন্ত সাদৃশ্য দেখিতে পাই। সে সাদৃশ্য বাহিরের কাজে ততটা নয়—কারণ, কাজে বিদ্যাসাগর জন্‌সন অপেক্ষা অনেক বড়ো ছিলেন; কিন্তু এই সাদৃশ্য অন্তরের সরল, প্রবল এবং অকৃত্রিম মনুষ্যত্বে। জন্‌সনও বিদ্যাসাগরের ন্যায় বাহিরে রূঢ় ও অন্তরে

* যদুনাথ সরকারের এই উক্তি সমীচীন হয়নি। 'তৎকালীন ইয়ং বেঙ্গল' বিদ্যাসাগরের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

সুকোমল ছিলেন; জনসনও পাণ্ডিত্যে অসামান্য, বাক্যালাপে সুরসিক, ক্রোধে উদ্দীপ্ত, স্নেহরসে আর্দ্র, মতে নির্ভীক, হৃদয়ভাবে অকপট এবং পরহিতৈষায় আত্মবিস্মৃত ছিলেন। দুর্বিষহ দারিদ্র্যও মুহূর্তকালের জন্য তাঁহার আত্ম-সম্মান আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই।"[১৩]

বিদ্যাসাগরের তেজস্বিতার তুলনা নেই। কাজে ও কথায় অজস্রবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন এই তেজস্বী পুরুষ।

কী একটা মোকদ্দমার সাক্ষী হয়ে একবার আদালতে যেতে হল বিদ্যা-সাগরকে। দাঁড়াতে হল কাঠগড়ায়।

বিপক্ষের ব্যারিস্টার ভাবলেন, চটিয়ে দিলে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে অনেক কথা আদায় করা যাবে। তাই তিনি বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনাকে চেনে কে?

বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন—উত্তরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে কুমারিকা, পূবে ব্রহ্মদেশ এবং পশ্চিমে বিন্ধ্যপর্বত—এদের মধ্যিখানের যাবতীয় ব্যক্তি আমাকে চেনে।"[১৪]

সত্যি, কে না চেনে বিদ্যাসাগরকে। সবদিকে চোখ রেখেছেন বিদ্যাসাগর। যেখানে দেশের কল্যাণের আশা, সেখানেই বিদ্যাসাগর।

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন : "রামমোহন রায় যেরূপ প্রধানতঃ ধর্মসংস্কার কার্য্যে রত থাকিলেও, সমাজসংস্কার, শিক্ষা বিস্তার, সাহিত্যের সৃষ্টি, রাজনীতির আন্দোলন প্রভৃতি সকল বিষয়েই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেইরূপ দেশের হিতকর সকল বিষয়েই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এরূপ সর্বতোমুখ স্বদেশপ্রিয়তা প্রায় দেখা যায় না।...তিনি যে কার্য্যে দেখিতেন দেশের কিছু কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা, তাহাতেই সহায়তা করিবার জন্য অগ্রসর হইতেন। তাঁহার অর্থ ও সামর্থ্য সে কার্য্যে লাগিত। তাঁহার স্বদেশানুরাগ যেমন সর্বতোমুখীন ছিল, তাঁহার বন্ধুতা, আতিথ্য, সৌজন্য সমুদায় সেইরূপ সর্বতোমুখীন ছিল। তাঁহার প্রীতি ও দয়া জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়নির্বিশেষে সকলের প্রতি ধাবিত হইত।"[১৫]

একদিকে বিদ্যাসাগর দরাজ হাতে জলের মতো টাকা খরচ করে যাচ্ছেন, আরেকদিকে সামান্য একটু দড়ি কিম্বা কাগজের একটা টুকরো পর্যন্ত তিনি নষ্ট হতে দিচ্ছেন না। একটু কষ্ট করলে যদি সংসারের দু-পয়সা বাঁচে, সেদিকে সজাগ হয়ে আছেন।

সার্কুলার রোড ধরে হেঁটে আসছেন বিদ্যাসাগর, তাঁর চাদরটি উঁচু হয়ে আছে। উঁচু কেন, কী আছে চাদরের তলায়?

পথে ক্ষুদিরাম বসুর সঙ্গে দেখা।

বিদ্যাসাগর ক্ষুদিরামকে বললেন—এই শেয়ালদার ওদিকে গিয়েছিলাম, তা সেখানে কপি সস্তায় পেলাম, নিয়ে যাচ্ছি—গেরস্থালি তো করতে হয়। বাদুড়বাগানে এগুলো একটাকা কি বারো আনা দাম হবে। কতোয় এনেছি জানো?—চার আনায়।[১৬]

আরেকদিন। ক্ষুদিরাম বসুকে বিদ্যাসাগর কমলালেবু খেতে দিয়েছেন।

ক্ষুদিরাম কমলা খাচ্ছেন, ছিবড়েগুলো ফেলে দিচ্ছেন। বিদ্যাসাগর বললেন—দ্যাখো, ছিবড়েগুলো ফেলে দিও না। ওগুলো খাওয়ানো যাবে।

ক্ষুদিরাম অবাক হয়ে বললেন—কমলার ছিবড়ে আবার কে খাবে?

বিদ্যাসাগর বললেন—জানালার বাইরে রাখো ছিবড়েগুলো। দেখবে, যারা খায় তারা আসবে।

ছিবড়েগুলো ক্ষুদিরাম আর ফেলে দিলেন না, বিদ্যাসাগরের কথামতো জানালার বাইরে রেখে দিলেন। কিন্তু কই, কেউ তো ছিবড়ে খেতে এল না।

ক্ষুদিরাম বললেন—কই, কেউ তো এল না।

বিদ্যাসাগর বললেন—তোমার চোগা-চাপকানের জাঁকজমক দেখে তারা আসছে না। তুমি সরো দেখি।

নিজে এসে জানালার কাছে দাঁড়ালেন। আর সেই মুহূর্তে উড়ে এল কাকেরা। নির্ভয়ে ছিবড়েগুলো খেতে লাগল।[১৭]

আগেই বলা হয়েছে, সামান্য একটু দড়ি কিম্বা কাগজের একটা টুকরো পর্যন্ত বিদ্যাসাগর নষ্ট হতে দেননি। হয়তো কোনো জিনিস কিনে এনেছেন, তার মোড়কের কাগজ আর দড়ি যত্ন করে কুড়িয়ে রেখেছেন।

বিদ্যাসাগরের বড়ো মেয়ের নাম হেমলতা। তাঁর দুই ছেলে—সুরেশ আর যতীশ। দাদামশায়ের দড়ি আর কাগজের টুকরো কুড়োনো দেখে দু-ভাই হাসাহাসি করত।

একদিন রাত্রে বিদ্যাসাগর শুয়ে পড়েছেন। কী একটা কাজে, যতীশের এক টুকরো দড়ির দরকার হল। এত রাত্রে দাদামশায়ের আলমারি ছাড়া দড়ির টুকরো আর কোথায় পাওয়া যাবে! যতীশ চুপে-চুপে দাদামশায়ের ঘরে ঢুকল, চুপে-চুপে আলমারির উপর হাত দিল। হাত দিতে-না-দিতেই বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করে উঠলেন—ওখানে কে রে?

ভয়ে চুপ করে রইল যতীশ। আবার বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—ওখানে কে?

—আমি যতি।

—অন্ধকারে কী করছিস?

—একটু দড়ি নেব।

—এত রাত্রে কেন?

বিদ্যাসাগর উঠলেন। বললেন—থাম, আমি দিচ্ছি। দাদা!—যখন বুড়ো দড়ি কুড়িয়ে রাখে তখন ভাবো, দাদামশাই কী বোকা, কেবল ছেঁড়া দড়ি আর ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে মরে! আর এখন চুপে-চুপে, সেই ছেঁড়া দড়ি সরাতে এসেছ! বুড়ো কুড়িয়ে না রাখলে এখন এত রাত্রে দড়ি কোথায় পেতে বলো তো।

আরেকদিন বিদ্যাসাগরের চোখে পড়ল, বাড়ির ঝি বাটনা বাটতে-বাটতে শিলধোয়া হলুদের জলটুকু ফেলে দিচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যাসাগর বললেন—বলি, ও কি হল? হলুদের জলটুকু ফেলে দিলে?

ঝি অবাক হয়ে বলল—দাদামশায়ের কতো টাকা যাচ্ছে, সেদিকে নজর নেই, আর এই হলুদের জলটুকুতে চোখ পড়েছে।

বিদ্যাসাগর বললেন—দ্যাখো, হলুদের জলটুকু তরকারিতে দিলে কাজে

লাগত। আমি তো আর টাকা জলে ফেলে দিই না, লোককে দিই। ওই হলুদের জলটুকু নষ্ট হবে কেন?[৯৮]

আসল কথা, কিছুই নষ্ট হতে দিতে চাননি বিদ্যাসাগর।

একবার চন্দননগর থেকে কলকাতায় আসছেন বিদ্যাসাগর, সঙ্গে ক্ষুদিরাম বসু আছেন। হাওড়া স্টেশনে নেমে দেখা গেল, খুব ভীড়। বাদুড়বাগানে যেতে হবে। গাড়োয়ান গাড়িভাড়া দেড় টাকা চাইল। ভীড়ের মধ্যেই গাড়ির জন্য দর কষাকষি হচ্ছে, এমন সময় বিদ্যাসাগরকে আর দেখা গেল না। ভীড়ের মধ্যে কোথায় যে বিদ্যাসাগর হারিয়ে গেলেন, ক্ষুদিরাম তাঁকে খুঁজে পেলেন না।

অগত্যা ক্ষুদিরাম বাদুড়বাগানে চলে এলেন। বিদ্যাসাগর বাদুড়বাগানে হাজির। বিদ্যাসাগর ক্ষুদিরামকে বললেন—তুমি যে আসবে তা আমি জানতাম। কি জানি যখন দেড়টাকা ভাড়া চাইতে লাগল, তোমাকে কিছু না বলে আমি আস্তে আস্তে সরে পড়লুম। পুলটা পার হয়ে এসে ছয় আনা পয়সা দিয়ে একখানা গাড়ি ভাড়া করে বাদুড়বাগানে চলে এলুম।[৯৯]

কোথাও যাবেন বলে বিদ্যাসাগর একবার বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। শেয়ালদ স্টেশনে গেলেন, ট্রেন না পেয়ে আবার বাড়িতে ফিরে এলেন। স্টেশনে যেতে-আসতে দশ আনা গাড়ি ভাড়া গেল। বাড়িতে ফিরে এসে দুঃখ করে বললেন—এই দশ আনা মিছিমিছি গেল।

কাছাকাছি যাঁরা ছিলেন, বিদ্যাসাগরের কথায় তাঁরা হেসে উঠলেন।

—হাসছ কেন?

কে একজন বললেন—এমন কত দশ আনা যাচ্ছে।

—এই রকম অপব্যয়?

—কেন, কত লোক আপনাকে ঠকিয়ে কত টাকা নিয়ে যাচ্ছে।

সরল ভঙ্গিতে বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন—তাকে বুঝি অপব্যয় বলে? সে তো একজনকে হাতে তুলে দিলাম, আর কিছু না হোক যে পেল সে উপকার বোধ করল তো? আর এ যে 'ন দেবায় ন ধর্মায়,' যে পেল, সে তার পারিশ্রমিক বলে নিল, আর আমি দিলাম বটে, কিন্তু আমার কোনো উপকারে এল না।[১০০]

১৮৫২ সালের ১১-মে রাত্রে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে ডাকাতি হল।*[১০১]

রাত্রে একসঙ্গে চল্লিশ-পঞ্চাশজন ডাকাত সামনের দরজায় এসে উপস্থিত। একলা এদের সামনে দাঁড়ালে বিদ্যাসাগরকে প্রাণটি বিসর্জন দিতে হবে নিশ্চয়ই।

মা-বাবা এবং আর-সকলকে নিয়ে বিদ্যাসাগর পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন। নিজে প্রাণে বাঁচলেন। আর-সকলকে প্রাণে বাঁচালেন। ঘরের জিনিসপত্র নিয়ে উধাও হয়ে গেল ডাকাতের দল।[১০২]

---

* ১৮৫২ সালের ২০-মে 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছে : "আমরা কোন বন্ধু বিশেষের দ্বারা অবগত হইয়া অত্যন্ত খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, কয়েক দিবস হইল, আমারদিগের সদ্বিদ্বান্ বন্ধু সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিজ গ্রাম রাধানগরের সান্নিধ্য দর্শুনার বাটীতে একদল দস্যু প্রবেশপূর্ব্বক যথাসর্ব্বস্ব লইয়া প্রস্থান করিয়াছে।"

এ-বিষয়ে ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঈষৎ ভিন্ন ও বিস্তারিত বিবরণ দাখিল করেছেন। তিনি লিখেছেন : "(একদল ডাকাত) বাড়ীর সদর দরজা ভাঙতে সুরু করায় পিছনের খিড়কী দিয়ে বাড়ীর মেয়েরা নিজেদের অলঙ্কার-গুলি নিয়ে পলায়ন করেন। পুরুষও অনেকে ঐ পথেই চলে যান। বিদ্যা-সাগরের বয়স তখন বত্রিশ বৎসর। তিনি এইভাবে গৃহত্যাগ করতে অস্বীকৃত হ'ন। এই সময় গদাধর পাল গ্রামের লোকজনকে ডাকবার জন্য বাহির হ'ন। কিন্তু দস্যুদল সংখ্যায় অনেক বেশী থাকায় এবং গ্রামে কোনোরূপ সঙ্ঘবন্ধ হওয়ার ব্যবস্থার অভাবে কেহই গদাধর পালকে সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় নাই। যে দুজন পাহারাদার ছিল তাহারাও পলায়ন করে। ডাকাতের দল গ্রাম আক্রমণ করার পূর্বে সাধারণতঃ গ্রামের বাহিরে সমবেত হ'য়ে মদ্যপান করে উত্তেজিত হ'য়ে গ্রামে চড়াও হয়। ডাকাতদের বাধা দেওয়ার উপযুক্ত সময় গ্রামের উপকণ্ঠে যখন তারা সমবেত হয় সেই সময়। আক্রমণ শুরু হলে দলবন্ধভাবে বাধা না দিলে শুধু খুন হবারই সম্ভাবনা। এ ক্ষেত্রে গ্রামের লোক যখন এগিয়ে এল না তখন দিনময়ী দেবী তার স্বামীকে গৃহ পরিত্যাগ করতে জেদ করেন। তখনও তিনি রাজী হচ্ছেন না দেখে তিন বৎসর বয়সের পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে কোলে নিয়ে বললেন তাহলে আমিও থাকব। ফলে ঈশ্বর-চন্দ্র বাধ্য হ'য়ে খিড়কীর দরজা দিয়ে সকলের সঙ্গে চলে যান।...খিড়কীর দিকে বাড়ীর পুকুর ও অন্য একটি পুকুর থাকায় এবং গ্রামের ঘন বসতি ঐ দিকেই সুরু হওয়ায় ডাকাতরা ঐ দিকে আসে নাই। এখানে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতা ভগবতী দেবী এইভাবে বাড়ী হ'তে অন্যদের সঙ্গে কিছুদূর চলে যাওয়ার পর হঠাৎ স্মরণ করলেন যে রূপার অনেকগুলি অলঙ্কার আমানিভরা একটি হাঁড়িতে পরিষ্কার করতে রাখা হয়েছিল, সেগুলি বাড়ীতে রয়ে গেছে। প্রৌঢ়া ভগবতী দেবী তৎক্ষণাৎ অন্ধকারে অলক্ষিতে বাড়ী ফিরে গেলেন ও সেই হাঁড়িটীর আমানি ঢেলে ফেলে দিয়ে হাঁড়িটি নিয়ে পুনরায় খিড়কী দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ডাকাতরা তখন দরজা ভেঙ্গে ফেলেছে, ও মশাল জ্বেলে বাড়ীর জিনিসপত্র লুঠতরাজ করছে। মশালের আলোতে ভগবতী দেবীকে দেখতে পেয়ে একজন ডাকাত তাকে তাড়া করে। কয়েকটি অলঙ্কার পথে ছুঁড়ে ফেলে তিনি শেষে একটি জলের নালা পার হয়ে যান। ডাকাতির সময় জলের নালা পার হওয়ার সম্বন্ধে কুসংস্কার বশতঃ ডাকাতটি তার পরে আর ভগবতী দেবীর পশ্চাদ্ধাবন করে নাই। ডাকাতরা বাড়ীতে টাকাকড়ি বিশেষ কিছু না পেয়ে মরাই-এর ধান খড় প্রভৃতিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। কিন্তু জ্বলন্ত মশাল বাড়ীর উঠানে পুতে যায়। তার অর্থ ডাকাতদের—বিশ্বাসমতে—ঐ বাড়ী যেন পুনরায় ঐশ্বর্য্যে উজ্জ্বল হয়।"[১০০]

সেই রাত্রেই বিদ্যাসাগর থানায় খবর দিলেন। দারোগাসাহেব পরদিন যথারীতি তদন্তে এলেন। এবং যথারীতি বিদ্যাসাগরের বাবার কাছে দক্ষিণা দাবি করলেন।

বিদ্যাসাগরের বাবা দারোগাসাহেবকে বললেন—না, দারোগা বলে আপনাকে আমি কিছু দিতে পারব না। তবে যদি বামুনের ছেলে বলে কিছু নেন তো দিতে পারি।

বলে বিদ্যাসাগরের বাবা নির্ভয়ে বেরিয়ে গেলেন। ডাকাতেরা ঘটি-বাটি সব নিয়ে গেছে, সেসব কিছু-কিছু কিনে আনতে হবে।

দারোগাসাহেব অবাক হয়ে ভাবলেন, এই বামুনের এত তেজ কিসের।

দারোগাসাহেব বিদ্যাসাগরকে চেনেন না। বিদ্যাসাগর তখন বাড়ির উঠোনে ছেলেদের সঙ্গে তন্ময় হয়ে কপাটি খেলছেন।

দারোগাসাহেব বিদ্যাসাগরের দিকে আঙুল তুলে বললেন—আর ওই ছোঁড়াটা! আশ্চর্য কাণ্ড, কাল বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেছে, ছোঁড়াটা কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে কপাটি খেলছে দ্যাখো।

একজন সরকারী কর্মচারী ছিলেন দারোগাসাহেবের সঙ্গে। তিনি দারোগা-সাহেবকে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে দু-চারটি খবর শোনালেন। বললেন—আজ্ঞে, উনি সামান্য লোক নন। জাহানাবাদের ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট এখানে এসে ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে কৃতার্থ হয়ে যান। শোনা যায়, ছোটোলাট-বড়োলাটের সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব আছে।

খবর শুনে দারোগাসাহেব ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন। আর কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না তিনি।

এই ঘটনার কিছুকাল পরের কথা। কথায়-কথায় হ্যালিডে সাহেব একদিন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে ডাকাতির খবর শুনলেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে বললেন—আপনি শেষপর্যন্ত পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচালেন! এ যে ভয়ানক কাপুরুষতা!

বিদ্যাসাগর বললেন—যদি না পালিয়ে চল্লিশজন ডাকাতের সামনে এগিয়ে প্রাণ দিতাম তো বলতেন, লোকটা আহাম্মক। মিছিমিছি চল্লিশজন ডাকাতের সামনে একলা এগিয়ে প্রাণটা দিল। আপনাদের খুশি করা খুব শক্ত। এগিয়ে গেলেও দোষ, পিছিয়ে এলেও দোষ।[১০৪]

রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন : "ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় বিদ্যা বুদ্ধি সকলের ঘটে না। ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় ওজস্বিতা, মানসিক বল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা সকলের সম্ভবে না। ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় জগৎগ্রাহী সহৃদয়তা, বদান্যতা ও উপচি-কীর্তিও সকলের হইয়া উঠে না। কিন্তু তথাপি ঈশ্বরচন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়া আমরা বোধহয় একটু সোজাপথে চলিতে শিখিতে পারি,—একটু কর্তব্য অনুষ্ঠানে উদ্যম করিতে পারি,—একটু ভণ্ডামি ত্যাগ করিতে পারি।"[১০৫]

খাঁটি কথা।

সেদিন রবিবার। সকালবেলা। বিদ্যাসাগর বাড়ির বাগানের ঘাস নিড়ুচ্ছেন। এমন সময় মেদিনীপুর থেকে চারজন ভদ্রলোক এলেন। বিদ্যা-সাগরকে কখনো দেখেননি ওঁরা।

ওঁরা ভাবলেন, বাগানের ঘাস নিড়ুচ্ছে যখন, এ নিশ্চয়ই মালী। বিদ্যা-সাগরের মালী।

ওঁরা জিজ্ঞেস করলেন—ওহে, বিদ্যাসাগর মশায় আছেন?

আসল কথা ভাঙলেন না বিদ্যাসাগর। যেন তিনি সত্যি-সত্যি এ-বাড়ির মালী, এমনিভাবে বললেন—আপনারা একটু বসুন, তিনি একটু ব্যস্ত আছেন।

ব্যস্ত আছেন বৈকি। বাগানের ঘাস নিয়ে ব্যস্ত আছেন!

যা-হোক, এদিকে ঘাস নিড়োনো হচ্ছে, কিছুক্ষণ পর ওঁরা বললেন—ওহে, তামাক খাওয়াতে পারো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, পারি।

চারটি হুঁকো সাজিয়ে ওঁদের তামাক দিলেন।

কিছুক্ষণ কাটল। ওঁরা আবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—ওহে, দ্যাখো না, বড়ো দেরি হচ্ছে যে।

হাতের কাজ শেষ হয়েছে এতক্ষণে। বিদ্যাসাগর ওঁদের কাছে এসে বললেন—কি দরকার, বলুন।

—তুমি খবরই দাও না।

—আজ্ঞে, আমিই বিদ্যাসাগর।

এককথায় লাফিয়ে উঠলেন ওঁরা। বিদ্যাসাগরের পায়ের ধুলো নিলেন। বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনিই যথার্থ বিদ্যাসাগর।[১০৬]

গায়ের কাপড় কেনার দরকার হলে ব্রজনাথ দে কিনে নিয়ে আসেন। বিদ্যাসাগর একদিন ব্রজনাথকে বললেন—দেখ্, যখনই গায়ের কাপড় দরকার হয়, তোকেই শালওয়ালার দোকানে পাঠাই, একজন লোক চিরকাল কষ্ট পাবে ওটা ভাল নয়। তুই কাল আমাকে নিয়ে গিয়ে একবার দোকানটা দেখিয়ে দিস্, তাহলে যখন ইচ্ছে গেলুম, যা দরকার নিয়ে এলুম। তুই কাল একবার আসিস।

পরদিন ব্রজনাথ এলেন। ব্রজনাথের সঙ্গে বিদ্যাসাগর চললেন। পথে যেতে-যেতে কথা হল, গোপনে কাজ সেরে আসতে হবে, কিছু বলা-কওয়ার দরকার নেই, শালওয়ালা যেন বিদ্যাসাগরকে চিনতে না পারে।

কিন্তু বিদ্যাসাগর দোকানে পা দিতে-না-দিতেই শালওয়ালা ছুটে এসে বলল—আইয়ে পণ্ডিতজি, আজ ত হামারা সুপ্রভাত হ্যায়।

বিদ্যাসাগর চুপে-চুপে ব্রজনাথকে বললেন—ওরে, এরা যে চিনেছে রে।

শালওয়ালা বলল—ক্যা পণ্ডিতজি। আগ ক্যা কভি ছিপা রহে খাক্‌সে?

শালওয়ালা ঠিকই বলেছে, আগুন কখনো গোপন থাকে না। বিদ্যাসাগর কখনো গোপন থাকেননি।[১০৭]

বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "কলিকাতা নিবাসী বাবু শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় জালিয়াতী অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া দোষী সাব্যস্ত হন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সার্ মর্ডাণ্ট ওরেন্স তাঁহার প্রতি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডাজ্ঞাপ্রদান সময়ে যাবতীয় বঙ্গবাসী-দিগকে জালিয়াত মিথ্যা সাক্ষী প্রভৃতি বলিয়া দোষারোপ করেন ও নানা কটু বাক্য প্রয়োগ করেন; তাহাতে অগ্রজ মহাশয় (বিদ্যাসাগর) কলিকাতাবাসী ন্যূনাধিক পঞ্চ সহস্র সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্য ভদ্রলোকদিগকে এক যোগ করিয়া সার্ রাজা রাধাকান্তদেবের বাটীতে বসিয়া স্থিরভাবে কথাবার্তার পর কার্য্য শেষ করিয়া সকলের সহ এক যোগে দরখাস্ত লিখিয়া স্বাক্ষর করিলেন ও করাইলেন, এবং ঐ দরখাস্ত গবর্ণর জেনেরলের মারফতে বিলাতে ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট পাঠান ঐ দরখাস্ত অনুসারে ষ্টেট সেক্রেটারি গবর্ণর জেনেরলকে লিখেন যে, আপনি সার্ মর্ডাণ্ট ওরেন্সকে সাবধান করিয়া দিবেন অতঃপর যেন এরূপ অন্যায় কার্য্য আর না করেন। বঙ্গদেশে দাদাই এক যোগের পথপ্রদর্শক হয়েন।"[১০৮]

উল্লেখযোগ্য, এই বিচারপতির নাম মর্ডাণ্ট ওরেন্স নয়, মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স।

মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স সমগ্র বাঙালী জাতির নামে অযথা কলঙ্ক লেপন করেছেন, এই উপলক্ষ্যে দেশীয় নেতৃবর্গ, ১৮৬১ সালের ২৬-আগস্ট, রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে এক বিরাট সভার আয়োজন করেন।* ১৮৬১ সালের ১৮-সেপ্টেম্বর মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌সের বিরুদ্ধে একটি আবেদনপত্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মারফৎ বিলাতে সেক্রেটারি-অব-স্টেট স্যর চার্লস উডের কাছে প্রেরিত হয়েছে। উক্ত আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছেন মহারাজা সতীশচন্দ্র রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা প্রতাপ-চন্দ্র সিংহ, রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, রমানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরো ২০৭৮৬ জন।[১০৯] ১৮৬২ সালের ১৭-ফেব্রুয়ারি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখেছে :

"Sir Charles has viewed the subject in the light put by the aggrieved, and, mild tho' be his expressions, the censure on Judge which they convey is unmistakable and emphatic."

বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত সমস্ত কাহিনী হয়তো অক্ষরে অক্ষরে সত্য নয়। কিন্তু তাহলেও এই কাহিনীমালার মূল্য নিঃসন্দেহে অপরিসীম। বিদ্যা-সাগর-চরিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পক্ষে এই কাহিনীমালা অপরিহার্য। বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত কাহিনীমালা সম্পর্কে উত্তরকালে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত যথার্থ লিখেছেন :

"They (বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত কাহিনীমালা) may be perfectly true and they may be wholly unfounded. In any case they are of great value as throwing a flood of light upon the distinguishing traits of a remarkable man's nature. They are characteristic, they are temperamental, they are full of surprises. In the lifetime of Vidyasagar hundreds of such stories were floating in the air. They were liquid like little rills trickling through the fingers. Crystallized, these can be of immense benefit to later generations of boys and men. The mere fact that such stories were not told or invented of any other man is significant. He was expected to say and do things that would not occur to other men, and only a few of these fugitive sayings have been preserved in the account of his life. But these have a freshness, a force, a humour, a pathos that afford vivid glimpses of a personality of singular power and irresistible charm." [১১০]

জীবদ্দশাতে মানুষের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভক্তিও পেয়েছেন বিদ্যাসাগর।

---

* ১৮৬১ সালের ২৯-আগস্টের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এই সভার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু সেখানে কোথাও বিদ্যাসাগরের নাম উল্লিখিত হয়নি। বিদ্যাসাগর সেসময়ে বিপুল খ্যাতির অধিকারী, এই সভার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক থাকলে অবশ্যই সেকথা সাময়িকপত্রে উল্লিখিত হত। আলোচ্য বিষয়ে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবরণের বাইরে অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রে বিদ্যাসাগরের নাম পাওয়া যায়নি। মনে হয়, এ-ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না। সম্ভবত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভুল লিখেছেন।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ একখানা চিঠিতে বিদ্যাসাগরকে লিখেছেন : "আপনি মনের সহিত পূজা করিতে পারেন, এমন কোনও ব্যক্তির সংস্পর্শে কখনও আসেন নাই বলিয়া, দয়া করা কাহাকে বলে ইহা যেমন বুঝেন, পূজা ও ভক্তি করা কাহাকে বলে, বোধহয় তাহা ঠিক তেমনরূপ বুঝিতে পারেন না। কিন্তু আমার এই ধারণা যে, আপনার অলৌকিক হৃদয় শক্তির দ্বারা যে একবার আকৃষ্ট হইয়াছে, আপনার অতিমানুষিক স্বভাব-সৌন্দর্য্য-দর্শনে যে চিত্রকরের ন্যায় মুগ্ধ হইয়াছেন, সে আপনার জন্য অম্লানবদনে প্রাণও বিসর্জন করিতে পারে। আমার এরূপ লেখায় যাহা বেয়াদবি হয় ক্ষমা করিবেন। কিন্তু আপনাকে যেরূপ মনে ভাবি, তাহার শতাংশও কই লিখিতে পারি?"[১১১]

জীবদ্দশাতেই বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের বয়স তখন পুরোপুরি চল্লিশ বছরও হয়নি, সেই সময়েই বাঙলাদেশে বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত। ১৭৮১ শকের বৈশাখ মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' থেকে একটি বিজ্ঞাপন উদ্ধার করি : "বিজ্ঞাপন। চিত্রপট বিক্রয়। মহামান্য, দেশহিতৈষি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হওয়াতে আপামর সাধারণ প্রায় সকলেই শ্রুতিগোচর করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে দৃষ্টিগোচর করেন নাই, সুতরাং যাঁহারা তাঁহাকে দেখেন নাই, তাঁহাদিগের কথঞ্চিৎ দর্শন সুখ লাভার্থে উক্ত মহাশয়ের প্রতিকৃতি চিত্রিত করিয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত করা গিয়াছে, পটখানির পরিমাণ দেড়হস্ত হইবেক, এবং মূল্য এক টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যাঁহার প্রয়োজন হয়, লালবাজারের ২৩নং ভবনে আমাদিগের নিকট মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রী এন, সি, ঘোষ কোম্পানি"

বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধাভক্তি অপরিসীম। কিন্তু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন : "বিদ্যাসাগরের প্রতি এই যে ভক্তি, ইহার একমাত্র কারণ যে তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষ, তাহা নহে। অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি বিশিষ্ট কারণ আছে, যাহার উল্লেখ করিলে আমাদের বাঙ্গালীর চরিত্রগত একটা দোষ প্রকটিত হইয়া পড়িবে। যে সময়ের কথা আমি বলিতেছি, সে সময়ে এটা বেশ বোঝা যাইত 'সাহেবদের' কাছে বিদ্যাসাগরের খুব প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট তিনি অত খাতির পাইয়াছিলেন। 'সাহেবদের' নিকট প্রতিষ্ঠাপন্ন না হইলে বাঙ্গালী মানুষের মূল্য বুঝিতে পারে না। মুখে না বলি, কিন্তু মনে মনে যাহাদের বড় বলিয়া জানি, তাঁহাদের সিল মোহরের ছাপ না পড়িলে জিনিষের মূল্য হয় না।"[১১২]

এককালে দু-চারজন বাঙালী সম্পূর্ণ ভুল কারণে বিদ্যাসাগরের প্রতি সশ্রদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু দু-চারজনের অপরাধে কি সমস্ত জাতিকে অপরাধী সাব্যস্ত করা সঙ্গত? না, কৃষ্ণকমলের এই উক্তি গ্রহণের অযোগ্য। বাঙালী-চরিত্রের হাজার দোষ সত্ত্বেও একথা সত্য যে সাহেবদের কাছে বিদ্যাসাগরের প্রবল প্রতিপত্তির জন্য বাঙালী বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়নি। একথা নিঃসংশয়ে সত্য যে বিদ্যাসাগরের প্রতি বাঙালীর শ্রদ্ধাভক্তির একমাত্র কারণ বিদ্যাসাগরের চরিত্র, তাঁর অজেয় পৌরুষ, তাঁর অক্ষয় মনুষ্যত্ব।

বিদ্যাসাগর কি সম্পূর্ণ নির্দোষ? না, তা নয়। কিন্তু তাঁর গুণের তুলনায় তাঁর দোষের পরিমাণ নগণ্য। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন : "আমি

এ জীবনে যে অল্পসংখ্যক মানুষকে সোজাপথে চলিতে দেখিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার মধ্যে একজন প্রধান।...আমি তাঁহার অত্যুজ্জ্বল গুণাবলীর পার্শ্বে দুই একটা উৎকট দোষও দেখিয়াছি; কিন্তু সেই তেজঃপুঞ্জ চরিত্রের সোজাপথে চলা যখন স্মরণ করি, তখন আর কোনও দোষের কথা মনে থাকে না; বলি, হায়! হায়! এমন মানুষ আবার কতদিনে পাইব?"[১১০]

Walter Scott Seton-Karr লিখেছেন: "Vidya Sāgar was a man of high caste, unquestionable integrity, and profound learning." [১১৭]

C. E. Buckland লিখেছেন: "The name of Pandit Isvar Chandra Vidyasagar, C.I.E. will never be forgotten in Bengal. Few men have left such a mark as he did on his generation. . . .

He combined a fearless independence of character with great gentleness and the simplicity of a child in his dealings with people of all classes. A stern disciplinarian, he could yet forgive the shortcomings of others less gifted and less exact than himself. He was a model of patience and perseverance in literary work." [১১৫]

১৮৯১ সালের ৩-আগস্ট 'ইণ্ডিয়ান নেশন' লিখেছে:

"Vidyasagar was great by a greatness that is rare in history. It was not merely the greatness of intellect; it was not at all the greatness which appertains to authority or to physical courage or to any form of what is called worldly success. His was not the greatness of the mere scholar, not of the statesman, the soldier, or the successful trader or professional man. He was great in all that is spiritual in man. Altruism, philanthropy, generosity, were to him not mere words they are to the philologist, not mere doctrines as they are to the philosopher, not mere texts as they are to the preacher, but at once the material of his mind and the rule of his life. He lived for others and in others."

বিদ্যাসাগরের কথা বারংবার শোনা দরকার, বারংবার বলা দরকার। আরম্ভ থেকে দরকার। আরম্ভ করতে হবে—না, বীরসিংহ থেকে নয়—বনমালিপুর থেকে।

দুই

বনমালিপুরে থাকতেন ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। তাঁর পাঁচ ছেলে—নৃসিংহরাম, গঙ্গাধর, রামজয়, পঞ্চানন, রামচরণ। একান্নবর্তী পরিবার।

ভুবনেশ্বরের মৃত্যুর পর সংসারে কর্তৃত্ব করতে লাগলেন নৃসিংহরাম আর গঙ্গাধর। সংসারে ভাঙন ধরল। অবস্থা ক্রমশ এমন হয়ে উঠল যে রামজয় সংসার ছেড়ে চলে গেলেন। সংসার ছেড়ে রামজয় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন, সংসারে রেখে গেলেন তাঁর স্ত্রী দুর্গাকে, তাঁর দুটি ছেলেকে, চারটি মেয়েকে।

কিন্তু দুর্গাও বেশিদিন থাকতে পারলেন না শ্বশুরের ভিটেয়। বাধ্য হয়ে তাঁকেও চলে আসতে হল বাপের বাড়িতে। বীরসিংহে। দুর্গা আর তাঁর দুটি ছেলেমেয়ে। দুটি ছেলে—ঠাকুরদাস আর কালিদাস। চারটি মেয়ে--মঙ্গলা, কমলা, গোবিন্দমণি, অন্নপূর্ণা।

দুর্গা বীরসিংহের উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের মেয়ে। উমাপতি মস্ত পণ্ডিত। তখন বৃদ্ধ হয়েছেন। সংসারে কর্তৃত্ব করেন উমাপতির ছেলে আর ছেলের বৌ। অর্থাৎ, দুর্গার ভাই আর ভাইয়ের বৌ।

কিছুদিনের মধ্যেই দুর্গা বুঝতে পারলেন, ভাই আর ভাইয়ের বৌ খুশি হননি। কতকাল দুর্গা আর তাঁর ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে-পরাতে হবে ঠিক কি—এই ভাবনাতেই দুর্গার ভাই আর ভাইয়ের বৌ বিরূপ হয়ে উঠেছেন। ভাইয়ের বৌ কথায়-কথায় এমন সব কথা বলেন যাতে দুর্গার মান থাকে না।

উমাপতি একটা ব্যবস্থা করে দিলেন তখন। নিজের বাড়ির কাছাকাছি একখানা কুঁড়েঘর বানিয়ে দিলেন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেই কুঁড়েঘরে কায়ক্লেশে দিন কাটাতে লাগলেন দুর্গা। সুতো কাটতেন দুর্গা। সামান্য কিছু আয় হত তাতে। উমাপতি মাঝে-মাঝে কিছু-কিছু সাহায্য করতেন। তবু সংসার চলে না, চলবার কথা নয়।

ঠাকুরদাসের বয়স তখন চোদ্দ-পনেরো বছর। ঠাকুরদাস সাব্যস্ত করলেন, কলকাতা যাবেন, টাকা রোজগার করবেন, মা-ভাই-বোনের দুঃখ ঘোচাবেন।

মায়ের অনুমতি নিয়ে ঠাকুরদাস চলে এলেন কলকাতায়। এলেন জগন্মোহন ন্যায়লঙ্কারের কাছে। কাঁদতে-কাঁদতে তাঁর কাছে সব কথা বললেন, সাহায্য চাইলেন, আশ্রয় চাইলেন।

জগন্মোহনের বাড়িতে আশ্রয় পেলেন ঠাকুরদাস।

আশ্রয় তো পেলেন, কিন্তু মা-ভাই-বোনের দুঃখ দূর করার উপায় কি? একমাত্র উপায় হচ্ছে ইংরেজি শেখা। মোটামুটি ইংরেজি শিখলেই সদাগরী আপিসে কাজ পাওয়া যাবে। মা-ভাই-বোনের দুঃখ তাহলে নিশ্চয়ই দূর করা যাবে। হ্যাঁ, ইংরেজিই একমাত্র উপায়।

কিন্তু ইংরেজি শেখাবে কে? সে-ব্যবস্থাও জগন্মোহন করে দিলেন। জগন্মোহনের একজন বন্ধু ইংরেজি জানেন। তিনি ঠাকুরদাসকে ইংরেজি শেখাতে রাজি হলেন।

সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরদাস ইংরেজি শিখতে যেতেন। ফিরতে রাত হয়ে যেত।

দিনের পর দিন যায়।

একদিন সেই ভদ্রলোক ঠাকুরদাসকে জিজ্ঞেস করলেন—দিনে-দিনে তুমি এমন রোগা হয়ে যাচ্ছ কেন?

ঠাকুরদাস চুপ করে রইলেন। তাঁর দু-চোখ জলে ভরে উঠল।

ভদ্রলোক পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

যে-বাড়িতে ঠাকুরদাস আশ্রিত সন্ধ্যার পরেই সেখানে উপরি লোকের খাওয়া-দাওয়ার পালা শেষ হয়ে যায়। ঠাকুরদাস তখন ইংরেজি শিখতে আসেন। তাই রাত্রে আর খাওয়া জোটে না।

যাঁর কাছে ইংরেজি শিখতেন ঠাকুরদাস, তাঁর একজন আত্মীয় তখন ওখানে উপস্থিত। বৃত্তান্ত শুনে তিনি ঠাকুরদাসকে বললেন—যা শুনলাম, তোমার আর ও-বাড়িতে থাকা হবে না। যদি তুমি রেঁধে খেতে পারো, তাহলে আমি তোমাকে আমার বাসায় রাখতে পারি।

তাই হল।

কিন্তু এই আশ্রয়দাতার মনপ্রাণ যেমন ভালো আয়-আদায় তেমন ভালো নয়। দালালি করতেন ভদ্রলোক। এই সময়েই আবার ভদ্রলোকের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ল। দিন চলে না। বাইরে-বাইরে ঘোরেন ভদ্রলোক, কিছু রোজগার হলে দুপুরবেলা বাসায় আসেন। দুজনেরই কোনোদিন অর্ধাহার, কোনোদিন অনাহার। কোনো কোনো দিন ভদ্রলোক দিনের বেলা বাসায় আসেন না। সে-সময়ে ঠাকুরদাসকে সমস্ত দিন উপোস করে থাকতে হয়।

ঠাকুরদাসের সম্বলের মধ্যে আছে একখানা পিতলের থালা, একটা ছোটো ঘটি। থালাখানা বিক্রী করে দিলে ক্ষতি কি? না, ক্ষতি নেই, বরং থালা বিক্রীর পয়সায় খাবার কেনা যাবে। আর থালার কাজ চালানো যাবে শালপাতায়।

থালাখানা নিয়ে নতুন বাজারে কাঁসারিদের দোকানে গিয়ে উপস্থিত হলেন ঠাকুরদাস। কিন্তু সকলেই একবাক্যে ঠাকুরদাসকে ফিরিয়ে দিল। বলল—অচেনা-অজানা লোকের কাছে পুরনো বাসন কিনতে পারব না। পুরনো বাসন কিনে কখনো-কখনো বড়ো ফ্যাসাদে পড়তে হয়। আমরা তোমার থালা নেব না।

একদিন দুপুর রোদে পথে-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঠাকুরদাস। বড়বাজার থেকে ঠনঠনে পর্যন্ত হেঁটে এলেন। সেদিন পেটে এককণা খাবার নেই, শরীর আর বইতে চায় না। ভেবেছিলেন, হাঁটাহাঁটি করলে ক্ষিদের কষ্ট থাকবে না, কিন্তু উল্টো ফল হল, হাঁটাহাঁটিতে আরো কাহিল হয়ে পড়লেন। একটি মধ্যবয়সী বিধবা স্ত্রীলোকের মুড়িমুড়কির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞেস করলেন—বাবাঠাকুর, দাঁড়িয়ে আছ কেন?

ঠাকুরদাস বললেন—একটু জল খেতে চাই। সাদরে ও সস্নেহে ঠাকুরদাসকে বসতে বললেন স্ত্রীলোকটি। বামুনের ছেলেকে শুধু জল দিলে পাপ হবে। স্ত্রীলোকটি মুড়কি দিলেন, জল দিলেন।

নিদারুণ ক্ষুধায় ব্যগ্রভাবে মুড়কি খেলেন ঠাকুরদাস। সে-দৃশ্য স্ত্রীলোকটি একদৃষ্টিতে দেখলেন। বললেন—আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয়নি বাবাঠাকুর?

—না, মা, আজ আমি এখন পর্যন্ত কিছুই খাইনি।

স্ত্রীলোকটি তখন জল খেতে বারণ করলেন ঠাকুরদাসকে। খানিক অপেক্ষা করতে বললেন। কাছাকাছি গয়লার দোকান থেকে দই নিয়ে এলেন। মুড়কির সঙ্গে দই দিয়ে পেট ভরে ফলার খেতে দিলেন ঠাকুরদাসকে।

ঠাকুরদাসের মুখে তাঁর ইতিবৃত্ত শুনলেন স্ত্রীলোকটি। জিদ করে বললেন—যেদিনই দরকার হবে, এখানে এসে ফলার করে যেও।

ঠাকুরদাস যেতেন ওখানে। দিনের বেলা যখন কিছু খাবার জুটত না, ওখানে গিয়ে পেট ভরে ফলার করে আসতেন।*

নিজের দিনগুলি তো যা-হোক কেটে যাচ্ছে, কিন্তু মা-ভাই-বোন? তাদের ক্লিষ্ট মুখ অহরহ চোখের উপর ভাসতে থাকে। ঠাকুরদাস একদিন আশ্রয়দাতা ভদ্রলোকের কাছে কেঁদে পড়লেন—কোথাও আমাকে একটু কাজ-কর্ম জোগাড় করে দিন। আমি আর পারি না। মা-ভাই-বোনের কথা মনে পড়লে আমার আর একমুহূর্তও বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে না।

এই ভদ্রলোক ঠাকুরদাসকে একটা কাজ জুটিয়ে দিলেন। মাইনে দু-টাকা। খুশি হলেন ঠাকুরদাস। তা বলে নিজের খরচ এক কপর্দকও বাড়তে দিলেন না। মাইনের দু-টাকাই বাড়িতে পাঠান মা-ভাই-বোনের জন্য। এদিকে তাঁর কাজকর্ম দেখে মনিবও খুব খুশি। দু-তিন বছর পরে ঠাকুরদাসের মাইনে পাঁচ টাকা হয়ে গেল।

ওদিকে একটা মস্ত ঘটনা ঘটল এই সময়। সাত-আট বছর পরে ঠাকুরদাসের বাবা রামজয় সংসারে ফিরে এলেন। সংসার ছেড়ে নানা তীর্থে ঘুরেছেন এতকাল। দ্বারকায়, জ্বালামুখীতে, বদরিকাশ্রমে।

সংসারে ফিরে এসেছেন রামজয়। দেশে এসে প্রথমেই গিয়েছিলেন বনমালীপুরে। সেখানে গিয়ে দেখেন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেউই নেই। চলে এসেছেন তারপর বীরসিংহে। উত্তরকালে বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "শ্বশুরালয়ে বা শ্বশুরালয়ের সন্নিকটে, বাস করা তিনি (রামজয়) অবমাননা জ্ঞান করিতেন, এজন্য, কিছু দিন পরেই, পরিবার লইয়া, বনমালিপুরে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু, দুর্গাদেবীর মুখে ভ্রাতাদের আচরণের পরিচয় পাইয়া সে উদ্যম হইতে বিরত হইলেন, এবং নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্বক, বীরসিংহে অবস্থিতি বিষয়ে সম্মতিপ্রদান করিলেন। এইরূপে, বীরসিংহগ্রামে আমাদের বাস হইয়াছিল।"

রামজয় সম্পর্কে এখানে দু-চার কথা বলে রাখা ভালো।

রামজয় তর্কভূষণের যেমন অপার সাহস, তেমনি অগাধ শক্তি। একখানা লোহার ডাণ্ডা ছিল তাঁর। সেখানা হাতে না নিয়ে তিনি কখনো বাড়ি থেকে বেরোতেন না।

সে-সময়ে পথে ডাকাতের ভয় ছিল খুব। অনেক জায়গায় লোকজন বড়ো রকম দল না বেঁধে যেতে সাহস পেত না। কিন্তু রামজয় তর্কভূষণের প্রাণে ভয়ডর নেই। লোহার ডাণ্ডাখানা হাতে নিয়ে তিনি নির্ভয়ে ওসব জায়গায় একা যাতায়াত করতেন। ডাকাতেরা দু-চারবার তাঁকে আক্রমণ করেছে, এবং উপযুক্ত আক্কেলসেলামি পেয়েছে। পরে ডাকাতেরা আর তাঁকে আক্রমণ করতে সাহস পায়নি।

---

* শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের মতে ওখানে ঠাকুরদাস মাত্র একদিন ফলার করেছেন। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "বিদ্যাসাগর মহাশয় কবি ছিলেন। একদিন স্থলে অধিকদিন লেখায় ঠাকুরদাসের গুণগরিমার আধিক্য হইবে বিবেচনায় এইরূপ লিখিয়াছেন। ঠাকুরদাস যে সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না, তাহা বিশেষ না জানিলে পাঠকবর্গ আমার লেখার উপর বিশ্বাস করিবেন না তাহাও জানি, ভ্রম নিরাকরণ কর্ত্তব্য বোধে ইহা লিখিলাম।" (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস, পৃ. ২)।

ডাকাত দূরের কথা, হিংস্র জন্তু-জানোয়ারকেও রামজয় পরোয়া করতেন না তেমন।

একুশ বছর বয়সে রামজয় একবার একা মেদিনীপুর যাচ্ছিলেন। ওদিকে তখন বিস্তর বন-জঙ্গল। এবং বন-জঙ্গলে যাদের থাকবার কথা তারাও আছে। অর্থাৎ, বাঘ ভালুক ইত্যাদি।

রামজয় এক জায়গায় খাল পার হয়ে পাড়ে উঠেছেন, এমন সময় একটা ভালুক এসে পড়ল। নখের আঁচড়ে রামজয়ের সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে দিল। রামজয়ও ছাড়লেন না, সমানে তাঁর লোহার ডাণ্ডাখানা চালিয়ে যেতে লাগলেন। ভালুকটা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ল। রামজয় তারপর লাথির পর লাথিতে ভালুকটাকে মেরে ফেললেন।

রামজয়ের সমস্ত শরীর থেকে তখন অনবরত রক্ত পড়ছে। ওই অবস্থায় অবসন্ন শরীরে রামজয় প্রায় চার ক্রোশ হেঁটে মেদিনীপুরে এসে পৌঁছলেন। উঠলেন এক আত্মীয়ের বাসায়। দু-মাস সেখানে শয্যাশায়ী থাকতে হল। তারপর বাড়ি ফিরে এলেন।

কিন্তু ওই ক্ষতচিহ্ন ইহজীবনে তাঁর শরীর থেকে মিলিয়ে যায়নি।

উত্তরকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

"তর্কভূষণ মহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন; কি ছোট, কি বড়, সর্ববিধ লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপটবাচী মনে করিতেন, তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া, স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সংকুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহারও ভয়ে, বা অনুরোধে, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি, কখনও কোনও বিষয়ে অযথা নির্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তাঁহাদিগকেই ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য করিতেন; আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান্, ধনবান্ ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও, তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।

ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন, বটে; কিন্তু, তদীয় আকারে, আলাপে, বা কার্যপরম্পরায়, তাঁহার ক্রোধ জন্মিয়াছে বলিয়া, কেহ বোধ করিতে পারিতেন না। তিনি, ক্রোধের বশীভূত হইয়া, ক্রোধবিষয়ীভূত ব্যক্তির প্রতি কটূক্তি প্রয়োগে, অথবা তদীয় অনিষ্ট চিন্তনে কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না। নিজে যে কর্ম সম্পন্ন করিতে পারা যায়, তাহাতে তিনি অন্যদীয় সাহায্যের অপেক্ষা করিতেন না; এবং কোনও বিষয়ে, সাধ্যপক্ষে পরাধীন বা পরপ্রত্যাশী হইতে চাহিতেন না। তিনি একাহারী, নিরামিষাশী, সদাচারপূত, ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্মে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। এজন্য, সকলেই তাঁহাকে, সাক্ষাৎ ঋষি বলিয়া, নির্দেশ করিতেন।..."

একবার ভারি একটা মজার কথা বলেছিলেন রামজয় তর্কভূষণ। বলেছিলেন বীরসিংহে।

যে-সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে-সময়ের বীরসিংহ গ্রামের কর্তাব্যক্তিরা ছিলেন 'নিরতিশয় স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর'। নিজেদের লাভের জন্যে তাঁরা না করতে পারতেন এমন কাজ নেই। এছাড়া সময়ে-সময়ে দারুণ নির্বোধের মতো কাজ করে ফেলতেন তাঁরা। রামজয় তর্কভূষণ ঘোরতর অপছন্দ করতেন তাঁদের। স্পষ্ট ভাষায় বলতেন—এ-গ্রামে একটাও মানুষ নেই, সকলই গোরু।

লোকেরা একটা জায়গা নোংরা করে রেখেছে, আর রামজয় সেই জায়গা দিয়েই চলে যাচ্ছেন। গ্রামের একজন কর্তাব্যক্তি বললেন—তর্কভূষণ মশায়, ওখান দিয়ে যাবেন না।

তর্কভূষণ জিজ্ঞেস করলেন—দোষ কী?

—ওখানে বিষ্ঠা আছে।

খানিকক্ষণ অপলকে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন রামজয় তর্কভূষণ। তারপর বললেন—এখানে বিষ্ঠা কোথায়? আমি গোবর ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। যে-গ্রামে একটাও মানুষ নেই, সেখানে বিষ্ঠা কোত্থেকে আসবে?

রামজয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "এই হাস্যময় তেজোময় নির্ভীক ঋজুস্বভাব পুরুষের মতো আদর্শ বাংলাদেশে অত্যন্ত বিরল না হইলে বাঙালীর মধ্যে পৌরুষের অভাব হইত না।...এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোন সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয় সম্পদের উত্তরাধিকার বণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্রমাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠপৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন।"[২]

আবার আগের কথায় ফিরে আসা যাক।

কয়েকদিন বীরসিংহে কাটিয়ে রামজয় গেলেন কলকাতায়। বড়ো ছেলে ঠাকুরদাস কলকাতায় থাকে। কাজ করে।

বড়বাজারের ভাগবতচরণ সিংহের বেশ ভালো অবস্থা। রামজয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাঁর। রামজয়ের সমস্ত ইতিহাস শুনলেন তিনি। রামজয়কে বললেন—ঠাকুরদাসকে আমার কাছে রেখে যান।

তাই হল। ঠাকুরদাস উঠে এলেন ভাগবতচরণের বাড়িতে। ভাগবতচরণই ঠাকুরদাসকে আরেকটা কাজ জুটিয়ে দিলেন। আট টাকা মাইনে। আর দু-বেলা খেতে পাওয়া যায় ভাগবতচরণের বাড়িতে।

ঠাকুরদাসের বয়স তেইশ কি চব্বিশ বছর। বিয়ে হল তখন। বিয়ে হল ভগবতীর সঙ্গে। ভগবতীর বাড়ি গোঘাটে, বাবার নাম রামকান্ত তর্কবাগীশ। ভগবতীর মামাবাড়ি পাতুলে, মাতামহের নাম পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ।

উত্তরকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

"পাতুলনিবাসী মুখটী পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের চারি পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ রাধামোহন বিদ্যাভূষণ, মধ্যম রামধন ন্যায়রত্ন, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়; জ্যেষ্ঠা গঙ্গা, কনিষ্ঠা তারা। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিজ বাটীতেই চতুষ্পাঠী ছিল। এই চতুষ্পাঠীতে, তিনি স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তিনি, স্বগ্রামে ও চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে, সবিশেষ আদরণীয় ও সাতিশয় মাননীয় ছিলেন।

জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা বিবাহযোগ্যা হইলে, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, গোঘাটে একটি সুপাত্র আছে, এই সংবাদ পাইয়া, ঐ গ্রামে উপস্থিত হইলেন। পাত্রের নাম রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ইনি সাতিশয় বুদ্ধিমান ও নিরতিশয় পরিশ্রমী ছিলেন; অবাধে অধ্যয়ন করিয়া, একুশ, বাইশ বৎসরে, ব্যাকরণে ও স্মৃতিশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন, এবং তর্কবাগীশ এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি ছাত্রকে অন্নদান এবং ব্যাকরণে ও স্মৃতিশাস্ত্রে শিক্ষাদান করিতেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, এই পাত্রের বুদ্ধি, বিদ্যা ও ব্যবসায়ের পরিচয় পাইয়া, আহ্লাদিতচিত্তে, কন্যাদানে সম্মত হইলেন, এবং বাটীতে প্রত্যাগমনপূর্বক, পুত্রদের সহিত পরামর্শ করিয়া, রামকান্ত তর্কবাগীশের সহিত, জ্যেষ্ঠা

কন্যা গঙ্গার বিবাহ দিলেন।

কালক্রমে, গঙ্গাদেবীর গর্ভে, তর্কবাগীশ মহাশয়ের দুই কন্যা জন্মিল; জ্যেষ্ঠা লক্ষ্মী, কনিষ্ঠা ভগবতী। কিছু দিন পরে, তর্কবাগীশ মহাশয়, সবিশেষ যত্ন ও আগ্রহ সহকারে, তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলনে সবিশেষ মনোনিবেশ করিলেন। অতঃপর, অধ্যাপনাকার্যে তাঁহার তাদৃশ যত্ন রহিল না। তাঁহার অযত্ন দেখিয়া, ছাত্রেরা, ক্রমে ক্রমে, তদীয় চতুষ্পাঠী হইতে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত না হইয়া, অব্যাঘাতে তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলন করিতে পারিব, এই ভাবিয়া, যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন।

তর্কবাগীশ মহাশয়, অবশেষে, শবসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই, শবসাধনের সমুচিত ফললাভ করিলেন। শবের উপর উপবিষ্ট হইয়া, জপ করিতে করিতে, তিনি, তুড়ি দিয়া, "মঞ্জুর" বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ফলকথা এই, সেই অবধি, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে, উন্মাদগ্রস্ত হইলেন। অতঃপর, কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসিলে, তিনি তুড়ি দিয়া ও মঞ্জুর বলিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। সময়ে সময়ে, ইহাও অবলোকিত হইত, যখন তিনি একাকী উপবিষ্ট আছেন, কেবল তুড়ি দিতেছেন, ও মঞ্জুর মঞ্জুর বলিতেছেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহোদর বা অন্য কোনও অভিভাবক ছিলেন না। গঙ্গাদেবী, দুই শিশু কন্যা ও উন্মাদগ্রস্ত স্বামী লইয়া, বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, এবং নিরুপায় ভাবিয়া, স্বীয় পিতা পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের নিকট, এই বিপদের সংবাদ পাঠাইলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, কন্যা, জামাতা ও দুই দৌহিত্রীকে আপন বাটীতে আনিলেন। এক স্বতন্ত্র চণ্ডীমণ্ডপ উন্মাদগ্রস্ত জামাতার বাসার্থে নিয়োজিত হইল; তিনি তথায় অবস্থিতি করিলেন; কন্যা ও দুই দৌহিত্রী পরিবারের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় জামাতার বিশিষ্টরূপ চিকিৎসা করাইলেন; কিছুতেই কোনও উপকার দর্শিল না। অল্পদিনের মধ্যেই অবধারিত হইল, জামাতা, এজন্মে আর প্রকৃতিস্থ হইতে পারিবেন না। অতঃপর, কন্যা, জামাতা ও দুই দৌহিত্রীর ভরণপোষণ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের ভার বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উপরেই বর্তিল। তিনিও যথোচিত যত্ন ও স্নেহ সহকারে, তাঁহাদের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অবিদ্যমান হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন বিদ্যাভূষণ সংসারের কর্তৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, মধ্যম রামধন ন্যায়রত্ন পিতার চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ ও চতুর্থ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় বিষয়কর্ম করিতে লাগিলেন। চারি সহোদরে, যাবজ্জীবন, একান্নবর্তী ছিলেন; যিনি যে উপার্জন করিতেন, জ্যেষ্ঠের হস্তে দিতেন। জ্যেষ্ঠ, যার পর নাই, সমদর্শী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। স্বীয় পরিবারের উপর, তাঁহার যেরূপ স্নেহ ও যেরূপ যত্ন ছিল, ভ্রাতাদের পরিবারের পক্ষে, তিনি বরং তাহা অপেক্ষা অধিক স্নেহ ও অধিক যত্ন করিতেন। ফলকথা এই, তাঁহার কর্তৃত্বকালে, কেহ কখনও রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবার কোনও কারণ দেখিতে পান নাই।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, একান্নবর্তী ভ্রাতাদের, অধিক দিন, পরস্পর সদ্ভাব থাকে না; যিনি সংসারে কর্তৃত্ব করেন, তাঁহার পরিবার যেরূপ সুখে ও সচ্ছন্দে থাকেন, অন্য অন্য ভ্রাতাদের পরিবারের পক্ষে, সেরূপ সুখে ও সচ্ছন্দে থাকা, কোনও মতে, ঘটিয়া উঠে না। এজন্য, অল্প দিনেই, ভ্রাতাদের

পরস্পর মনান্তর ঘটে; অবশেষে, মুখদেখাদেখি বন্ধ হইয়া, পৃথক হইতে হয়। কিন্তু, সৌজন্য ও মনুষ্যত্ব বিষয়ে চারিজনেই সমান ছিলেন; এজন্য, কেহ কখনও ইঁহাদের চারি সহোদরের মধ্যে, মনান্তর বা কথান্তর দেখিতে পান নাই। স্বীয় পরিবারের কথা দূরে থাকুক, ভগিনী, ভাগিনেয়ী, ভাগীনেয়ীদের পুত্রকন্যাদের উপরেও, তাঁহাদের অণুমাত্র বিভিন্ন ভাব ছিল না। ভাগিনেয়ীরা, পুত্রকন্যা লইয়া মাতুলালয়ে গিয়া, যেরূপ সুখে সমাদরে, কালযাপন করিতেন, কন্যারা পুত্রকন্যা লইয়া, পিত্রালয়ে গিয়া, সচরাচর সেরূপ সুখ ও সমাদর প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

অতিথির সেবা ও অভ্যাগতের পরিচর্যা, এই পরিবারে, যেরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে, সম্পাদিত হইত, অন্যত্র প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ, ঐ অঞ্চলের কোনও পরিবার, এ বিষয়ে, এই পরিবারের ন্যায়, প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ফলকথা এই, অন্নপ্রার্থনায়, রাধামোহন বিদ্যাভূষণের দ্বারস্থ হইয়া, কেহ কখনও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, ইহা কাহারও নেত্রগোচর বা কর্ণগোচর হয় নাই। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে অবস্থার লোক হউক, লোকের সংখ্যা যত হউক, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আবাসে আসিয়া, সকলেই পরম সমাদরে অতিথিসেবা ও অভ্যাগতপরিচর্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবদ্দশায়, এই মুখোপাধ্যায় পরিবারের, স্বগ্রামে ও পার্শ্ববর্তী বহুতর গ্রামে, আধিপত্যের সীমা ছিল না। এই সমস্ত গ্রামের লোক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আজ্ঞানুবর্তী ছিলেন। অনুগত গ্রামবৃন্দের লোকদের বিবাদভঞ্জন, বিপদ্‌মোচন, অসময়ে সাহায্যদান প্রভৃতি কার্যই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবনযাত্রার সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অনেক অর্থ তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল; কিন্তু, সেই অর্থের সঞ্চয়, অথবা স্বীয় পরিবারের সুখ-সাধনে প্রয়োগ, একদিন এক্ষণের জন্যেও, তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কেবল অন্নদান ও সাহায্যদানেই সমস্ত বিনিয়োজিত ও পর্যবসিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, প্রাতঃস্মরণীয় রাধামোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত, অমায়িক, পরোপকারী ও ক্ষমতাপন্ন পুরুষ সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না।

রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ও তদীয় পরিবারবর্গের নিকট, আমরা অশেষ প্রকারে, যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পরিশোধ হইতে পারে না। আমার যখন জ্ঞানোদয় হইয়াছে, মাতৃদেবী, পুত্র-কন্যা লইয়া, মাতুলালয়ে যাইতেন, এবং এক যাত্রায়, ক্রমান্বয়ে, পাঁচ ছয় মাস বাস করিতেন; কিন্তু একদিনের জন্যেও, স্নেহ, যত্ন ও সমাদরের ত্রুটি হইত না। বস্তুতঃ, ভাগিনেয়ী ও ভাগিনেয়ীর পুত্রকন্যাদের উপর এরূপ স্নেহপ্রদর্শন অদৃষ্টচর ও অশ্রুত-পূর্ব ব্যাপার।..."৩

হুগলী জেলার বীরসিংহ গ্রামে* ১৮২০ সালের ২৬-সেপ্টেম্বর ঠাকুরদাসের প্রথম সন্তানের জন্ম হল।

---

* ১৮৭২ সালে বীরসিংহ গ্রাম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হয়েছে। তার আগে বীরসিংহ গ্রম হুগলী জেলার অন্তর্গত ছিল। (Rai Manmohan Chakrabatty Bahadur : A summary of the changes in the Jurisdiction of Districts in Bengal, 1757-1916, pp. 34-35).

স্যর জর্জ ক্যাম্পবেল বাঙলাদেশের লেফটেন্যাণ্ট-গবর্নর ছিলেন ১৮৭১-৭৪ সালে। (C. E. Buckland: Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. I, p. 482)

কিন্তু ঠাকুরদাস তখন কোথায়?

ঠাকুরদাস আহারান্তে কোমরগঞ্জে গেছেন, মঙ্গলবারের হাটে। সুখবরটা তাঁকে অবিলম্বে দিতে হয়। রামজয় অবিলম্বে কোমরগঞ্জের দিকে হাঁটাপথ ধরলেন। পথেই ঠাকুরদাসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

রামজয় সুখবরটা এককথায় ভাঙলেন না। বললেন—একটা এঁড়ে বাছুর হয়েছে।

বাড়িতে একটা গোরুর তখন বাছুর হবার কথা। ঠাকুরদাস ভাবলেন, সেই গোরুর বুঝি একটা এঁড়ে বাছুর হয়েছে।

বাড়ি ফিরেই ঠাকুরদাস এগোলেন গোয়ালঘরের দিকে। রামজয় হাসতে হাসতে বললেন—ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। এদিকে এস। এঁড়ে বাছুর দেখাচ্ছি।

গোয়ালঘরে নয়, ঠাকুরদাসকে নিয়ে আরেক ঘরে ঢুকলেন রামজয়। নবজাতককে দেখালেন। বললেন—একে এঁড়ে বাছুর বললাম কেন জানো? এ এঁড়ে বাছুরের মতো একগুঁয়ে হবে। যা ধরবে তাই করবে, কাউকে ভয় করবে না।

তারপর বললেন—ও হবে ক্ষণজন্মা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, প্রথিতযশা, দয়ার অবতার। ওর জন্য আমার বংশ ধন্য হবে। ওর নাম রাখলাম ঈশ্বরচন্দ্র।[৪]*

উত্তরকালে লালমোহন বিদ্যানিধি লিখেছেন : "তাহার (বিদ্যাসাগরের) জন্ম দিনে বাদ্যোদ্যম হয় নাই। নৃত্যগীতও কেহ দেখে নাই। তবে সূতিকা ষষ্ঠী পূজার দিন অনেক বালকবালিকা খৈ মুড়কী মোয়া পাইয়া আনন্দে গদ্‌গদ চিত্তে নৃত্যগীত ও শঙ্খধ্বনি করিয়াছিল। জন্ম সময়ে দুই চারিজন সধবা পুরস্ত্রী মাঙ্গলিক উলুউলু ধ্বনি করিয়াছিলেন...। ঐ উলুধ্বনি চতুর্দশ ভুবনে তৎকালে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।"[৫]

এই ক্যাম্পবেলের আমলেই বীরসিংহ গ্রাম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হয়েছে। উত্তরকালে বিদ্যাসাগর একদিন সহাস্যে বলেছেন : "আমি পটলডাঙ্গার পথ দিয়া যাইতেছিলাম; সেই সময় তাগা-হাতে দানা গলায়, তসর-পরা, বোধ হয় কোন বড়োমানুষের ঝি যাইতেছিল। আমার চটি জুতার ধূলা তাহার গায়ে লাগিয়াছিল। মাগী বলিল,—'আ মর উড়ের তেজ দেখ।' কাম্পবেল সাহেব সত্যসত্যই আমাকে উড়ে করেছে।" (বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৬৩)

* ঠাকুরদাস ও ভগবতী দেবীর সাত পুত্র ও তিন কন্যা। সাত পুত্রের নাম : ঈশ্বরচন্দ্র; দীনবন্ধু; শম্ভুচন্দ্র; হরচন্দ্র; হরিশ্চন্দ্র; ঈশানচন্দ্র; ভূতনাথ। তিন কন্যার নাম : মনোমোহিনী; দিগম্বরী; মন্দাকিনী।

ঠাকুরদাসের সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম কি সত্যি-সত্যি ভূতনাথ? এ-বিষয়ে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "ঠাকুরদাসের এই সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রটী অতি শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।...ফলকথা ঠাকুরদাসের কনিষ্ঠ পুত্র কোনও নামে পরিচিত হইবার পূর্ব্বেই লীলা সম্বরণ করে। তাহাকে বাটীর সকলে ভূতো বলিয়া ডাকিত।" (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ১।)

তিন

পাঁচ বছর বয়স হল ঈশ্বরের। তাকে ভর্তি করে দেওয়া হল কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায়। "চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাতিশয় পরিশ্রমী এবং শিক্ষাদান বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ ও সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। ইঁহার পাঠশালায় ছাত্রেরা, অল্প সময়ে, উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে পারিত; এজন্য, ইনি উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া, বিলক্ষণ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, পূজ্যপাদ কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গুরুমহাশয় দলের আদর্শস্বরূপ ছিলেন।"[১]

পড়াশোনার দিকে ঈশ্বরের খুব টান আছে, কিন্তু এদিকে দুরন্তপনায়ও সে অদ্বিতীয়। লোকে ঈশ্বরের জ্বালায় অস্থির। পাড়ার লোকের বাগানের যতরকম ফল চুপে চুপে খেয়ে আসে। কেউ রোদে কাপড় শুকোতে দিয়েছে, ঈশ্বর তাতে ছোটো একখানা লাঠি দিয়ে বিষ্ঠা লাগিয়ে রেখে গেছে।* ধান-ক্ষেতের কাছ দিয়ে যেতে-যেতে, কোন খেয়ালে কে জানে, খানিক কাঁচাধানের শিষ নিয়ে মুখের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে, খানিক ফেলে দিচ্ছে মাটিতে। একবার তো যবের শিষ খেতে গিয়ে কেলেঙ্কারি কাণ্ড। গলায় যবের কাঁটা ফুটে গেল। ঠাকুমা অনেক কষ্টে গলায় আঙুল দিয়ে সেই কাঁটা বের করে দিলেন।

কালীকান্তের পাঠশালায় যাবার পথে ঈশ্বর প্রায় প্রত্যেকদিন পাড়ার মথুরামোহন মণ্ডলের মা আর বৌকে বিরক্ত করার জন্যে মথুরামোহনের বাড়ির দরজায় মলমূত্র ত্যাগ করে রাখে। মথুরামোহনের মায়ের নাম পার্বতী, বৌয়ের নাম সুভদ্রা। পার্বতী আর সুভদ্রা নিজেদের হাতে সেই ময়লা পরিষ্কার করত।

কোনোদিন হয়তো সুভদ্রা বিরক্ত হয়ে বলত—দুষ্ট বামুন, রোজই তুমি পাঠশালায় যাবার সময় আমার দরজায় পায়খানা করে যাবে? আর যদি এমন করো তো তোমার গুরুমশায়কে বলে দেব, তোমার ঠাকুরমাকে বলে দেব, তোমাকে শাসন করাব।

শুনে সুভদ্রার শাশুড়ী বৌকে বলতেন—এই ছেলেটি সহজ নয়। ওর ঠাকুর্দা বারোবছর বিবাগী হয়ে তীর্থক্ষেত্রে জপতপ করে দিনপাত করতেন, তিনি সাক্ষাৎ ঋষিতুল্য ছিলেন, তাঁর মুখে শুনেছি, এই বালক অদ্বিতীয় শক্তিসম্পন্ন হবে। অতএব তুমি বিরক্ত হয়ো না। আমি নিজে এর মলমূত্র পরিষ্কার করব। এই বালক যে কে তা ভবিষ্যতে জানতে পারবে।[২]

ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে। কিন্তু এখন ঈশ্বর বড়ো দুরন্ত ছেলে।

---

* চণ্ডীচরণ বন্দ্যাপাধ্যায় লিখেছেন: "...আমি নিজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে এই ঘটনার কথা শুনিয়াছি।...বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লোকান্তরগমনের পরে ১২৯৮ সালের ১৭ শ্রাবণের সঞ্জীবনীতে লিখিত হইয়াছে:—"দেখ্ ছেলেবেলা আমিও অমনি দুষ্ট ছিলাম, পাড়ার লোকের বাগানের যত রকম ফল চুপি চুপি খাইতাম। কেহ কাপড় শুকাইতে দিয়াছে দেখিলে তাহার উপর বাহ্য করিয়া আসিতাম, লোকে আমার জ্বালায় অস্থির হইত।" ইহাও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উক্তি বলিয়া সঞ্জীবনী সম্পাদক ব্যক্ত করিয়াছেন।..." (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: বিদ্যাসাগর, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৯)

তা বলে লেখাপড়ার দিকে কোনো ত্রুটি নেই। হাতের লেখাটি ভারি সুন্দর। আশ্চর্য স্মরণশক্তি।

আট বছর বয়স পর্যন্ত ঈশ্বর পড়ল কালীকান্তের পাঠশালায়।

কালীকান্ত একদিন ঠাকুরদাসকে বললেন—এখানকার পাঠশালার পড়া শেষ হয়েছে ঈশ্বরের। ওকে এখন কলকাতায় নিয়ে যান। সেখানে নিয়ে ইংরেজি শেখালে ভালো হয়।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "অগ্রজকে কলিকাতা লইয়া যাইবার নাম শুনিয়া, জননীদেবী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে এ প্রদেশের কাহারও লেখাপড়া শিক্ষার জন্য কলিকাতা যাইবার রীতি ছিল না। ব্রাহ্মণতনয়গণ কেহ কেহ বাল্যকালে টোলে পড়িত। অধিক বয়স হইলে বিদেশের টোলে অধ্যয়নার্থে যাত্রা করিত, কেহ কেহ জমিদারী সেরেস্তায় কাগজ লিখিতে শিখিতেন।"[৩]

রামজয় তর্কভূষণের মৃত্যুর পর পিতৃকৃত্য সেরে কলকাতায় যাবার সময় ঠাকুরদাস ঈশ্বরকে সঙ্গে নিলেন। আনন্দরাম গুটিও রইল সঙ্গে। পথ চলতে-চলতে ঈশ্বর যখন ক্লান্ত হবে তখন এই আনন্দরাম ওকে কোলে বা কাঁধে নিয়ে পথ চলবে।[৪] কালীকান্তও সঙ্গে চললেন।

বীরসিংহ থেকে কলকাতা। পথ খুব কম নয়। সিয়াখালার কাছে সালিখার বাঁধা রাস্তায় উঠে ঈশ্বর লক্ষ্য করল—পাথর। বাটনা-বাটা শিলের মতো একেকখানা পাথর। পথের পাশে মাঝে-মাঝে এই পাথর কেন?

ঈশ্বর জিজ্ঞেস করল—ওই শিলগুলো কি, বাবা?

ঠাকুরদাস হাসলেন। বললেন—ওগুলো শিল নয়। ওগুলোকে বলে মাইলস্টোন।

—মাইলস্টোন কি, বাবা?

—মাইলস্টোন হল একটা ইংরেজি কথা। এক মাইল হল গিয়ে আমাদের আধক্রোশের সমান, আর স্টোন মানে পাথর। কলকাতা থেকে প্রত্যেক এক মাইল অন্তর ওরকম একেকখানা পাথর বসানো আছে। প্রত্যেক পাথরে লেখা আছে—কলকাতা থেকে ওখান পর্যন্ত কত মাইল পথ। কলকাতা থেকে এক মাইল দূরে যে-পাথরখানা বসানো আছে তাতে ইংরেজিতে এক লেখা আছে। আর দ্যাখো, এখানায় লেখা আছে ঊনিশ। মানে কলকাতা এখান থেকে ঊনিশ মাইল। সাড়ে ন-ক্রোশ।

বাঙলা অঙ্কের হিসেব ঈশ্বরের জানা আছে। ঊনিশ লেখা পাথরখানা ভালো করে দেখল ঈশ্বর। একের পিঠে নয় ঊনিশ। পাথরে হাত দিয়ে ঈশ্বর বাবাকে জিজ্ঞেস করল—ইংরেজিতে কি এটা এক আর এটা নয়?

ঠাকুরদাস বললেন—হ্যাঁ।

ঈশ্বর মনে-মনে সাব্যস্ত করল, পথে যেতে-যেতে ইংরেজি অঙ্ক শিখে ফেলতে হবে।

কলকাতা দূর আছে। কতদূর? দশ মাইল। পাঁচ ক্রোশ।

ঈশ্বর বলল—বাবা, আমি ইংরেজি অঙ্ক চিনে নিয়েছি। আমি এক থেকে দশ পর্যন্ত শিখে ফেলেছি।

সত্যি-সত্যি শিখে ফেলেছে? আচ্ছা, পরীক্ষা করে দেখা যাক।

কলকাতা আর ন-মাইল দূরে। ন-নম্বর লেখা পাথরখানা দেখিয়ে ঠাকুরদাস জিজ্ঞেস করলেন—কত?

ঈশ্বর বলল—নয়।

কলকাতা আর আট মাইল দূরে। আট নম্বর লেখা পাথরখানা দেখিয়ে ঠাকুরদাস জিজ্ঞেস করলেন—এই?

ঈশ্বর বলল—আট।

কলকাতা আর সাত মাইল দূরে। সাত নম্বর লেখা পাথরখানা দেখিয়ে ঠাকুরদাস জিজ্ঞেস করলেন—এটা?

ঈশ্বর বলল—সাত।

ঠিক আছে। ঠিক আছে।

ঠিক আছে? ঠাকুরদাসের মনে খট করে একটু সন্দেহ হল। দশের আগে নয়, নয়ের আগে আট, আটের আগে সাত। হয়তো আসলে ইংরেজি অঙ্ক চেনে না, হয়তো চালাকি দিয়ে মেরে দিচ্ছে। চালাকি? আচ্ছা, দেখা যাক।

ছ-নম্বরলেখা পাথরখানা ঠাকুরদাস ঈশ্বরকে দেখালেন না। গোপন করে গেলেন। পাঁচ নম্বর লেখা পাথরখানার সামনে এসে বললেন—এবার বলো। এটা কত?

ঈশ্বর বলল—বাবা, এটা ছয় হওয়া উচিত কিন্তু ভুলে পাঁচ লিখে রেখেছে।

ঠাকুরদাস খুশি হলেন। বললেন—সত্যি-সত্যি তুমি ইংরেজি অঙ্ক চিনেছ। ওটা ঠিক আছে। ছ-নম্বর লেখা পাথরখানা আমি তোমাকে দেখাইনি।

কালীকান্তও খুশি হলেন। ঈশ্বরের চিবুক ধরে আশীর্বাদ করলেন তিনি। বললেন—বেশ বাবা বেশ।

তারপর ঠাকুরদাসকে বললেন—ঈশ্বরের পড়াশোনার ভালো ব্যবস্থা করবেন। বেঁচে থাকলে ও মানুষের মতো মানুষ হবে।[৫]

ভাগবতচরণ সিংহের একমাত্র ছেলের নাম জগদ্দুর্লভ। ভাগবতচরণ গত হলেন, তারপর থেকে জগদ্দুর্লভই সংসারের কর্তা। তাঁর বাড়িতেই থাকেন ঠাকুরদাস। ঈশ্বর বাবার সঙ্গে এই বাড়িতেই উঠল।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "পরদিন প্রাতে পিতৃদেব জগদ্দুর্লভবাবুর এক ইংরাজী বিল ঠিক দিতেছেন, তথায় অগ্রজ বসিয়া বলিলেন বাবা আমি ইহা ঠিক দিতে পারি। উক্ত সিংহ বলিলেন, ঈশ্বর! তুমি ইংরাজী অঙ্ক কেমন করিয়া জানিলে? তাহাতে দাদা বলিলেন, কেন, বাবা ও কালীকান্ত খুড়া শ্যাখালা হইতে শালিকার ঘাট পর্যন্ত পাথরে অঙ্কিত মাইল-ষ্টোন দেখাইয়াছেন। তাহাতেই ইংরাজী অঙ্কের ১ সংখ্যা হইতে ১০ সংখ্যা পর্যন্ত শিখিয়াছি। সেই জন্য ঠিক দিতে পারিব সাহস করিয়াছি। উক্ত সিংহ কয়েকটা বিল ঠিক দিবার জন্য দাদাকে দিলেন, ঐ বিলে দাদার ঠিক দেওয়া নির্ভুল হইল দেখিয়া, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন-পূর্বক বলিলেন, তুমি চিরজীবী হও, আমি যে তোমার প্রতি আন্তরিক যত্নের সহিত পরিশ্রম করিয়াছি, তাহা অদ্য আমার সার্থক হইল।"[৬]

ঠাকুরদাস সে-সময়ে রামসুন্দর মল্লিকের দোকানে কাজ করেন, দশটাকা মাইনে। বড়বাজারের চকে রামসুন্দরের লোহা-পিতলের নানারকম জিনিসের দোকান। যারা ধারে মাল কিনতেন তাদের কাছ থেকে ঠাকুরদাসকে টাকা আদায় করে আনতে হত।

জগদ্দুর্লভের বাড়িতে থেকে ঈশ্বরের একদিনও মনে হয়নি যে সে পরের বাড়িতে আছে। এ-বাড়ির সকলেই ঈশ্বরকে খুব ভালোবাসে, কিন্তু জগদ্দুর্লভের ছোটো বোন রাইমণির স্নেহ—ভালবাসার কোনো তুলনা নেই।

কোথায় কলকাতা, কোথায় বীরসিংহ। ঠাকুরমার কথা ভেবে কখনো-কখনো খুব কষ্ট হয়, ঈশ্বরের দু-চোখ জলে ভরে ওঠে। কিন্তু রাইমণির স্নেহ-যত্নে ঈশ্বরের সেই কষ্ট অনেকখানি দূর হয়ে গেল। রাইমণির একটিমাত্র ছেলে, নাম গোপাল। সে ঈশ্বরের প্রায় সমবয়সী। রাইমণির কাছে গোপালও যেমন ঈশ্বরও তেমনি।

উত্তরকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এপর্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমূর্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে, তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে, তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধহয়, সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।"[৭]

জগদ্দুর্লভের বাড়ির কাছেই শিবচরণ মল্লিকের বাড়ি। সেখানে একটা পাঠশালা বসে। পাঠশালার গুরুমশায়ের নাম স্বরূপচন্দ্র দাস। ঈশ্বরকে ভর্তি করা হল ওই পাঠশালায়। অঘ্রাণ, পৌষ, মাঘ—এই তিন মাস ওই পাঠশালায় পড়ল ঈশ্বর।

ফাল্গুনের গোড়ার দিকে পড়ল অসুখে। কবরেজি চিকিৎসা হল, কিন্তু অসুখ সারে না। খবর পেয়ে ঈশ্বরের ঠাকুমা বীরসিংহ থেকে কলকাতায় চলে এলেন। দু-তিনদিন কলকাতায় থেকে তিনি ঈশ্বরকে নিয়ে বীরসিংহে চলে গেলেন। কোনো অষুধ-বিষুধ লাগল না, সেখানে সাত-আট দিনেই ঈশ্বর সুস্থ হয়ে উঠল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের আরম্ভে আবার কলকাতায় নিয়ে আসা হল ঈশ্বরকে।

উত্তরকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

"জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে, আমি পুনরায় কলিকাতায় আনীত হইলাম। প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময়, একজন ভৃত্য সঙ্গে আসিয়াছিল। কিয়ৎ-ক্ষণ চলিয়া, আর চলিতে না পারিলে, ঐ ভৃত্য খানিক আমায় কাঁধে করিয়া লইয়া আসিত। এবার আসিবার পূর্বে, পিতৃদেব আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, চলিয়া যাইতে পারিবে, না লোক লইতে হইবেক। আমি বাহাদুরি করিয়া বলিলাম, লোক লইতে হইবেক না, আমি অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারিব। তদনুসারে আর লোক লওয়া আবশ্যক হইল না। পিতৃদেব আমায় লইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। মাতৃদেবীর মাতুলালয় পাতুল বীরসিংহ হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্তী। এই ছয় ক্রোশ অবলীলাক্রমে চলিয়া আসিলাম। সেদিন পাতুলে অবস্থিতি করিলাম।

তারকেশ্বরের নিকটবর্তী রামনগর নামক গ্রাম আমার কনিষ্ঠা পিতৃষ্বসা অন্নপূর্ণাদেবীর শ্বশুরালয়। ইতিপূর্বে অন্নপূর্ণাদেবী অসুস্থ হইয়াছিলেন;

এজন্য, পিতৃদেব, কলিকাতায় আসিবার সময়, তাঁহাকে দেখিয়া যাইবেন, স্থির করিয়াছিলেন। তদনুসারে, আমরা পরদিন প্রাতঃকালে, রামনগর অভিমুখে প্রস্থান করিলাম। রামনগর পাতুল হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্তী। প্রথম দুই তিন ক্রোশ অনায়াসে চলিয়া আসিলাম। শেষ তিন ক্রোশে বিষম সংকট উপস্থিত হইল। তিন ক্রোশ চলিয়া, আমার পা এত টাটাইল, যে আর ভূমিতে পা পাতিতে পারা যায় না। ফলকথা এই, আর আমার চলিবার ক্ষমতা কিছুমাত্র রহিল না। অনেক কষ্টে চারি পাঁচ দণ্ডে আধ ক্রোশের অধিক চলিতে পারিলাম না। বেলা দুই প্রহরের অধিক হইল, এখনও দুই ক্রোশের অধিক পথ বাকী রহিল।

আমার এই অবস্থা দেখিয়া, পিতৃদেব বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। আগের মাঠে ভাল তরমুজ পাওয়া যায়, শীঘ্র চলিয়া আইস, ঐখানে তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইব। এই বলিয়া তিনি লোভপ্রদর্শন করিলেন; এবং অনেক কষ্টে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে, তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইলেন। তরমুজ বড় মিন্ট লাগিল। কিন্তু পার টাটানি কিছুই কমিল না। বরং খানিক বসিয়া থাকাতে, দাঁড়াইবার ক্ষমতা পর্যন্ত রহিল না। ফলতঃ, আর এক পা চলিতে পারি, আমার সেরূপ ক্ষমতা রহিল না। পিতৃদেব অনেক ধমকাইলেন, এবং, তবে তুই এই মাঠে একলা থাক, এই বলিয়া, ভয় দেখাইবার নিমিত্ত, আমায় ফেলিয়া খানিক দূর চলিয়া গেলেন। আমি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। পিতৃদেব সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, কেন তুই লোক আনিতে দিলি না, এই বলিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়া, দুই একটা থাবড়াও দিলেন।

অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, পিতৃদেব আমায় কাঁধে করিয়া লইয়া চলিলেন। তিনি স্বভাবতঃ দুর্বল ছিলেন, অষ্টমবর্ষীয় বালককে স্কন্ধে লইয়া অধিক দূর যাওয়া তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত। সুতরাং খানিক গিয়া আমায় স্কন্ধ হইতে নামাইলেন এবং বলিলেন, বাবা, খানিক চলিয়া আইস, আমি পুনরায় কাঁধে করিব। আমি চলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই চলিতে পারিলাম না। অতঃপর, আর আমি চলিতে পারিব, সে প্রত্যাশা নাই দেখিয়া, পিতৃদেব খানিক আমায় স্কন্ধে করিয়া লইতে লাগিলেন, খানিক পরেই ক্লান্ত হইয়া, আমায় নামাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই ক্রোশ পথ যাইতে প্রায় দেড় প্রহর লাগিল। সায়ংকালের কিঞ্চিৎ পূর্বে আমরা রামনগরে উপস্থিত হইলাম, এবং তথায় সে রাত্রি বিশ্রাম করিয়া, পরদিন শ্রীরামপুরে থাকিয়া, তৎপর দিন কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম।"

এবার আবার লেখাপড়ার কথা। গুরুমশায়ের পাঠশালার পালা তো শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন কোথায় ভর্তি করা যায় ঈশ্বরকে?

প্রথমবার কলকাতায় আসবার পথে মাইলস্টোন দেখে ঈশ্বর কেমন সহজে ইংরেজি অঙ্ক শিখেছেন, ঠাকুরদাসের মুখে কয়েকজন সেকথা শুনলেন একদিন। সকলেই একবাক্যে বললেন—তবে তো ওকে রীতিমতো ইংরেজি পড়ানো উচিত। ওকে হেয়ার সাহেবের ইস্কুলে ভর্তি করে দাও, ওখানে মাইনে-টাইনে দিতে হয় না। যদি ভালো শিখতে পারে, হিন্দু কলেজে বিনে মাইনেয় পড়তে পাবে। হিন্দু কলেজে পড়লে ইংরেজির চূড়ান্ত হয়ে যাবে। আর, তেমন যদি না হয়, মোটামুটি শিখতে পারলেও, অনেক কাজ হবে। মোটামুটি ইংরেজি জানলে, হাতের লেখা ভালো হলে আর যেমন-তেমন জমা-খরচ বোধ থাকলে, ও অনায়াসে সাহেবের আপিসে চাকরি পেয়ে যাবে।

ঠাকুরদাস নিজে ইচ্ছামতো সংস্কৃত শিখতে পারেননি। সাধ ছিল শেখার, সাধ্য ছিল না। ইচ্ছামতো সংস্কৃত শিখতে পারেননি বলে ঠাকুরদাসের মনে বিপুল দুঃখ। তিনি ঠিক করে রেখেছেন, ঈশ্বরকে রীতিমতো সংস্কৃত শেখাবেন।

অন্য রকম পরামর্শ তাই ঠাকুরদাস মেনে নিতে পারলেন না। বললেন—চাকরি করে আমার দুঃখ ঘোচাবে বলে আমি ঈশ্বরকে কলকাতায় আনিনি। আমার একান্ত ইচ্ছা, সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে ঈশ্বর দেশে গিয়ে একটা টোল খোলে।

মধুসূদন বাচস্পতি সেসময়ে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। তিনি ঠাকুরদাসকে পরামর্শ দিলেন—আপনি যদি ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে পড়তে দেন তাহলে ঈশ্বর আপনার ইচ্ছামতো সংস্কৃত শিখতে পারবে। আর যদি চাকরি করা ইচ্ছা হয় তো তারও বিলক্ষণ সুবিধা আছে, সংস্কৃত কলেজে পড়ে যারা ল-কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তারা আদালতে জজপণ্ডিতের কাজ পায়। অতএব, আমার বিবেচনায়, ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে পড়তে দেওয়াই উচিত।*

অনেক বিবেচনার পর সাব্যস্ত হল, ঈশ্বর সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হবে।

কিছুক্ষণের জন্য আরো অনেক পুরনো কথায় চলে যাওয়া দরকার।

এদেশে চাকরি করতেন স্যর চার্লস গ্রাণ্ট। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি ১৭৯০ সালে বিলেত চলে যান। সেখানে তিনি ভারতবর্ষ বিষয়ে দুটি প্রস্তাব দাখিল করলেন : ভারতবর্ষে পাদরীদের প্রবেশের অধিকার অবাধ হোক; এবং ভারতীয়দের মধ্যে 'লাইট অ্যাণ্ড নলেজ (light and knowledge)' বিতরণের জন্য ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা হোক। স্যর চার্লস গ্রাণ্ট ওই মর্মে ১৭৯২ সালে একখানা পুস্তিকা প্রচার করলেন। কর্তৃপক্ষ কিন্তু কোনো প্রস্তাবেই রাজি হলেন না। পার্লামেণ্টে কেউ-কেউ বললেন যে, ভারতবর্ষে ইংরেজি স্কুল-কলেজ খুললে সেখান থেকে একদিন ইংরেজদের বিদায় নিতে হবে।

স্যর চার্লস গ্রাণ্ট কিন্তু আশা ছাড়েননি। ১৭৯৭ সালে তিনি আবার আপন পুস্তিকার সারমর্ম কোম্পানির দরবারে দাখিল করেছেন।

কোম্পানির আমলের প্রথমদিকে কর্তৃপক্ষ আপন প্রয়োজনে ১৭৮১ সালে খুলেছিল কলকাতা মাদ্রাসা, ১৭৯২ সালে বারাণসী সংস্কৃত কলেজ, ১৮০০ সালে কলকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। বলা বাহুল্য, প্রাচ্যবিদ্যার সংরক্ষণ কিংবা অনুশীলনের পক্ষে এই ব্যবস্থা পর্যাপ্ত হয়নি। কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি যথাসাধ্য কাজ করেছে, কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য।

---

* শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন এ-বিষয়ে ঠাকুরদাসের আরেকজন পরামর্শদাতারূপে গঙ্গাধর তর্ক-বাগীশের নামোল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন : "জগদ্দুর্লভ সিংহের বাটীতে অনেক পণ্ডিত বার্ষিক আদায় করিতে আসিতেন, তন্মধ্যে পটলডাঙ্গাস্থ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের ৩য় শ্রেণীর পণ্ডিত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহিত পিতৃদেবের আলাপ ছিল। তাঁহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসায় তিনি উপদেশ দিলেন যে, কলেজে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে ৫।৬ মাস পরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, আপাততঃ মাসে মাসে ৫৲ টাকা বৃত্তি পাইবে, দেশের টোলে পড়িতে দিলে সংক্ষিপ্তসার অধ্যয়ন করিতে দীর্ঘকাল লাগিবে। কলেজে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া তিন বৎসরের মধ্যে ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি জন্মিলে কাব্যের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে। (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত, কলকাতা, ১৮৯১, পৃ. ২১।)

১৮১৩ সালে কর্তৃপক্ষ সনদ আইনে একটি নতুন ধারা জুড়ে দিল। সেই ধারা অনুসারে ভারতবর্ষে শিক্ষাবাবদে উদ্বৃত্ত রাজস্ব থেকে বছরে অন্যূন এক লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে; এবং এই উদ্দেশ্যে এদেশে যেসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানাদি স্থাপিত হবে তাদের নির্দেশক হবেন বড়লাট।

১৮১৪ সালের ৩-জুন কর্তৃপক্ষ পত্রযোগে যথাবিহিত নির্দেশ দিলেন বড়লাট হেস্টিংসকে (লর্ড ময়রা)।

কিন্তু ওই পর্যন্ত।

বছরের পর বছর কেটে গেল, শিক্ষা-বিষয়ে কোথাও কোনো সরকারী উদ্যম দেখা গেল না।

ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্য এই সময়ে অন্য বেসরকারী উদ্যম দেখা যাচ্ছে।

মনে রাখা দরকার, সমস্ত ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষায় পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অর্থাৎ প্রকৃত ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারের কেন্দ্রমূলে আছে হিন্দু কলেজ।

এই হিন্দু কলেজের প্রথম পরিকল্পনা করেছেন ডেভিড হেয়ার।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৮৫৩ সালের ৩-জুন আলেকজান্ডার ডাফ বলেছেন : "The system of English Education commenced in the following very simple way in Bengal. There were two persons who had to do with it; one was Mr. David Hare, and the other was a Native, Ramohun Roy. In the year 1815 they were in consultation one evening with a few friends, as to what should be done with a view to the elevation of the Native mind and character. Ramohun Roy's proposition was that they should establish an Assembly or Convocation in which what are called the higher or purer dogmas of Vedantism or ancient Hinduism might be taught; in short, the Pantheism of the Vedas and their Upanishads, but what Ramohun Roy delighted to call by the more genial title of Monotheism. Mr. David Hare was a watchmaker in Calcutta, an ordinary illiterate man himself; but being a man of great energy and strong practical sense, he said the plan should be to institute an English school or College for the instruction of the Native youth . . ."

হেয়ারের এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের শরণাপন্ন হলেন।

১৮১৬ সালের ১৪-মে ঈস্ট সাহেব একটি সভা ডাকলেন। সভায় উপস্থিত হলেন অনেক মান্যগণ্য হিন্দু। রামমোহন রায় কিন্তু সভায় নেই। তাঁর কথা উঠল, কিন্তু একজন ব্রাহ্মণ একাজে রামমোহনকে নিতে আপত্তি করলেন, আপত্তির কারণ রামমোহন হিন্দুধর্মের বিরোধী।

১৮১৬ সালের ২১-মে আবার সভা হল। সেই সভায় 'হিন্দু কলেজ'

নাম সাব্যস্ত হল। হিন্দু কলেজের জন্য কমিটি হল। কমিটিতে তিরিশজন সদস্য।

দশজন য়ুরোপীয় : স্যর এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট; জন হার্বার্ট হ্যারিংটন; ডব্লু. সি. ব্লাকিয়ার; জে. এইচ টেলর; হোরেস হেম্যান উইলসন; এন্ ওয়ালিচ; উইলিয়ম রাইস; ডি. হিমিং; টমাস রোবাক; ফ্রান্সিস আর্ভিন।

এবং কুড়িজন হিন্দু : পণ্ডিত চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন; সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার; রঘুমণি বিদ্যাভূষণ; তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ; গোপীমোহন ঠাকুর; হরিমোহন ঠাকুর; গোপীমোহন দেব; জয়কৃষ্ণ সিংহ; রামতনু মল্লিক; অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; রামদুলাল দে (সরকার); রাজা রামচাঁদ; রামগোপাল মল্লিক; বৈষ্ণবদাস মল্লিক; চৈতন্যচরণ শেঠ; শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; রাধাকান্ত দেব; রামরত্ন মল্লিক; কালীশঙ্কর ঘোষাল।

১৮১৬ সালের ১১-জুন : কমিটির অধিবেশনে য়ুরোপীয় সদস্যেরা জানালেন যে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতে অসমর্থ; অবশ্য তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে যথাসম্ভব সাহায্য করবেন।

১৮১৬ সালের আগস্ট মাসে কলেজের জন্য নিয়মাবলী রচিত হল।

টাকা চাই। হিন্দু কলেজ স্থাপনের জন্য টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন অনেকে। বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর তেরো হাজার টাকা দিলেন।

হিন্দু কলেজের য়ুরোপীয় সম্পাদক হলেন ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস আর্ভিন, তিনশো টাকা মাইনে। আর হিন্দু সম্পাদক হলেন দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, একশো টাকা মাইনে।

হিন্দু কলেজ দু-ভাগে বিভক্ত : স্কুল বা পাঠশালা; এবং অ্যাকাডেমি বা মহাবিদ্যালয়।

হিন্দু কলেজে বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসী ভাষা শেখানোরও ব্যবস্থা হল। বলা বাহুল্য, ইংরেজি ভাষা শিক্ষাই প্রথম ও প্রধান; পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ইংরেজিতেই হবে। প্রধান শিক্ষক হলেন চন্দননগরের জেমস আইজাক ডি' আনসেলম। হিন্দু কলেজের গবর্ণর : গোপীমোহন ঠাকুর ও বর্ধমান-রাজ তেজচন্দ্র।

সকল সম্ভ্রান্ত পরিবারের হিন্দুসন্তান হিন্দু কলেজে ভর্তি হতে পারে। হিন্দু কলেজের ম্যানেজিং কমিটিতে আছেন : গোপীমোহন দেব, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গানারায়ণ দাস ও হরিমোহন ঠাকুর।

কুড়িজন ছাত্র নিয়ে হিন্দু কলেজ খোলা হল ১৮১৭ সালের ২০-জানুআরি। গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে। ঠিকানা—৩০৪, চিৎপুর রোড।

নিচের দিকে যদি শিক্ষাব্যবস্থা উন্নত না হয় তো উপরদিকে সুফলের আশা করা যায় না। সেদিকেও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। উত্তম বাংলা ও ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক চাই। অতএব ইংরেজ ও বাঙালীদের নিয়ে একটা বেসরকারী সমিতি হল—নাম 'কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি'।

১৮১৭ সালের ৪ জুলাই কলকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির জন্ম হয়। কলকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির নিয়মাবলী আদ্যন্ত উদ্ধার করি :

"1. That an association be formed, to be denominated "THE CALCUTTA SCHOOL-BOOK SOCIETY."

2. That the objects of this Society be the preparation, publication, and cheap or gratuitous supply of works useful

in schools and seminaries of learning.

3. That it form no part of the design of this Institution, to furnish religious books—a restriction, however, very far from being meant to preclude the supply of moral tracts, or books of a moral tendency, which, without interfering with the religious sentiments of any person, may be calculated to enlarge the understanding, and improve the character.

4. That the attention of the Society be directed, in the first instance, to the providing of suitable books of instruction for the use of native schools, in the several languages, (English as well as Asiatic,) which are, or may be taught, in the provinces subject to the presidency of Fort William.

5. That the business of the Institution be conducted by a Committee of Managers, to be elected annually, at a meeting to be held in the first week of July.

6. That the Committee consist, inclusive of official Members, of 24 persons, of whom 16 to be Europeans, and 8 Natives,

7. That all persons, of whatever nation, subscribing any sum annually to the funds of the Institution, shall be considered Members of the Society, be entitled to vote at the annual election of Managers, and be themselves eligible to the Committee. .

8. That a European Recording Secretary, a European Corresponding Secretary, two Native Secretaries, and a Treasurer, be appointed, who shall be *ex-officio* Members of the Committee.

9. That the names of subscribers and Benefactors, and a statement of receipts and disbursements, be published annually, with a Report of the proceedings of the Committee.

10. That the committee be empowered to call a general Meeting of the Members, whenever circumstances may render it expedient.

11. That the Committee be likewise empowered to fill up from among the Members of the Society, any vacancies that may happen in its own number in the period between one annual election of Managers and another.

12. That any number of persons in the country forming themselves into a School-Book Association, auxiliary

to the Society, and corresponding with it, shall be entitled to the full amount of their annual subscriptions in the school-books at cost price." ৯

নিয়মাবলী থেকে দেখা যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রচার। কিন্তু সোসাইটির কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখলেন দেশীয় পাঠশালাগুলির সংস্কার ও উন্নতি না হলে সোসাইটির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার নয়।

১৮১৮ সালের ২৪-জুলাই সোসাইটির সদস্যেরা একটি ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হলেন। প্রস্তাব হল, দেশীয় পাঠশালাগুলির সংস্কার ও উন্নতির জন্য কলকাতায় একটি স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হোক।

স্কুল সোসাইটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্কুল সোসাইটির নিয়মাবলীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারায় স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে :

"That its design be to assist and improve existing Schools, and to establish and support any further Schools and Seminaries which may be requisite; with a view to the more general diffusion of useful knowledge amongst the inhabitants of India of every description, especially within the Provinces subject to the Presidency of Fort William.

That it be also an object of this Society to select pupils of distinguished talents and merit from elementary and other Schools, and to provide for their instruction in seminaries of a higher degree; with the view of forming a body of qualified Teachers and Translators, who may be instrumental in enlightening their countrymen, and improving the general system of education. When the funds of the Institution may admit of it, the maintenance and tuition of such pupils, in distinct seminaries, will be an object of importance." ১০

১৮১৮ সালের ১-সেপ্টেম্বর কলকাতা টাউন হলে একটা সভা হল। সভাপতি জে. এইচ. হ্যারিংটন। সাব্যস্ত হল, সোসাইটির কার্যনির্বাহক সমিতিতে সাকুল্যে চব্বিশজন সদস্য থাকবে—ষোলজন য়ুরোপীয়, আটজন ভারতীয়। উইলিয়ম কেরি আর ডেভিড হেয়ার গোড়া থেকেই সমিতির সদস্য। আটজন ভারতীয় সদস্য থাকার কথা, প্রথমে ছিলেন ছজন : মৌলবী মীর্জা কাসেম আলি খাঁ; মৌলবী ওয়ালেয়াল হোসেন; মৌলবী দরবেশ আলি; মৌলবী নুরুন্নবী; রসময় দত্ত; রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছুকাল বাদে এলেন বাকি দু-জন ভারতীয় সদস্য : রাধাকান্ত দেব; উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলকাতা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার তিনমাসের মধ্যেই আশাপ্রদ সাড়া পাওয়া গেল :

"In three months from the establishment of the Calcutta School Society, the contributions to it were Sa. Rs. 9,899 as donations, and Sa. Rs. 5,069 as annual subscriptions. A considerable proportion of both has been contributed by Natives, principally Hindoos. . . . . It is an

interesting and encouraging fact, that besides the Hindoo College, almost entirely founded on the contributions of that class of the Natives whose appellation it bears, there are now no less than four philanthropic Institutions in this metropolis or its neighbourhood, whose funds are derived partly from European partly from Native liberality. These are, the Calcutta School-Book Society, the Calcutta Leper Asylum, the Calcutta School Society, and the Institution for the encouragement of Native Schools, under the management of the Serampore Missionaries." [১১]

প্রথম থেকেই রাধাকান্ত দেব সোসাইটির ভারতীয় সেক্রেটারি। য়ুরোপীয় সেক্রেটারি ই. এস. মন্টেগু। দেশীয় পাঠশালা বিভাগের সেক্রেটারি ডব্লু. এইচ. পিয়ার্স। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার সোসাইটির মাইনে-করা পণ্ডিত; তিনি পাঠশালাসমূহের পরিদর্শক, তত্ত্বাবধায়ক।

রাধাকান্ত দেব কলকাতায় দেশীয় পাঠশালার একটি তালিকা করেছেন। কাজের সুবিধার জন্য রাধাকান্ত কলকাতাকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন।

প্রথম বিভাগের এলাকা : দক্ষিণে শার্টস বাগান, উত্তরে মির্জাপুর, পূবে সার্কুলার রোড, পশ্চিমে চিৎপুর। এই বিভাগে আটটি পল্লীতে ঊনত্রিশটি পাঠশালা : কলিঙ্গায় তিনটি; তালতলা বাজারে দুটি; জানবাজারে তিনটি; ডিঙিভাঙায় চারটি; চাঁপাতলায় একটি; কপালিতলায় সাতটি; বৈঠকখানায় একটি; মির্জাপুরে আটটি।

দ্বিতীয় বিভাগের এলাকা : দক্ষিণে পটলডাঙা, উত্তরে শিমলা, পূবে সার্কুলার রোড, পশ্চিমে চিৎপুর। এই বিভাগে নয়টি পল্লীতে বিয়াল্লিশটি পাঠশালা : পটলডাঙায় দুটি; আরপুলিতে চারটি; কেরানিবাগানে দুটি; চোরবাগানে দুটি; কলুটোলায় ছটি; সুতারবাগানে চারটি; মেছুয়াবাজারে একটি; সিমলায় নয়টি; জোড়াসাঁকোয় বারোটি।

তৃতীয় বিভাগের এলাকা : দক্ষিণে বড়বাজার, উত্তরে নিমতলা, পূবে চিৎপুর, পশ্চিমে গঙ্গানদী। এই বিভাগে ছয়টি পল্লীতে ছত্রিশটি পাঠশালা : বড়বাজারে এগারোটি; তুলাবাজারে দুটি; পাথুরেঘাটায় নয়টি; কয়লাহাটায় একটি; জোড়াবাগানে দুটি; নিমতলায় এগারোটি।

চতুর্থ বিভাগের এলাকা : দক্ষিণে বিষেণবাগান ও হাটখোলা, উত্তরে বাগবাজারের খাল, পূবে সার্কুলার রোড, পশ্চিমে গঙ্গা। এই বিভাগে বারোটি পল্লীতে ঊনষাটটি পাঠশালা : রাজাবাজারে একটি; বিষেণবাগানে একটি; গরানহাটায় একটি; চড়কডাঙায় একটি; বটতলায় দুটি; সুতানুটিতে দশটি; কুমারটুলিতে ছটি; বাগবাজারে এগারোটি; শ্যামপুকুরে চারটি; জানবাজারে দশটি; শোভাবাজারে এগারোটি; দর্জিতলায় একটি।

প্রত্যেক বিভাগের পাঠশালাসমূহের জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হলেন। প্রথম বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক দুর্গাচরণ দত্ত। দ্বিতীয় বিভাগের রামচন্দ্র ঘোষ। তৃতীয় বিভাগের নন্দলাল ঠাকুর। চতুর্থ বিভাগের স্বয়ং রাধাকান্ত দেব।

প্রত্যেক তত্ত্বাবধায়কের একজন সরকার। সরকারেরা তত্ত্বাবধায়কের গোচরে আনতেন প্রত্যেক পাঠশালার অবস্থা। সরকারেরা পাঠশালায়-পাঠশালায়

পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করতেন।[২২]

আর সোসাইটির পণ্ডিতমশাই পাঠশালাগুলি পরিদর্শন করতেন। গুরুমশায়দের অধ্যাপনা-রীতি বুঝিয়ে দিতেন। ছাত্র ও গুরুমশায়দের সামনে সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করে দিতেন পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু। প্রত্যেক বিভাগের ছাত্রদের ত্রৈমাসিক পরীক্ষা নেওয়াও সোসাইটির পণ্ডিতমশায়ের অন্যতম কর্তব্য।

গোড়ার দিকে লোকের মনে ভয় ছিল—হয়তো সোসাইটির পাঠ্যপুস্তকে খ্রীষ্টতত্ত্বের কথা আছে। কিন্তু স্বয়ং রাধাকান্ত দেব আশ্বাস দিলেন—এসব পাঠ্যপুস্তকে খ্রীষ্টতত্ত্বের কথা নেই।

১৮১৯ সালের ১৯-এপ্রিল রাধাকান্ত দেব সোসাইটির পক্ষ থেকে সকলকে জানিয়ে দিলেন—প্রত্যেক বাঙলা মাসের ২০ তারিখে ছাত্রেরা যেন গুরুমশায়দের সঙ্গে এসে বই নিয়ে যায়।

এক বছরের মধ্যে ২৬৬১ জন ছাত্র সোসাইটি থেকে বই নিল। এই সময়ে দেখা যাচ্ছে পাঠশালার সংখ্যাও বেড়ে গেছে, ছাত্রের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। ১১৪টি পাঠশালা, ৩৭৮৭ জন ছাত্র।

আদর্শ বিদ্যালয় গড়ে তোলাও সোসাইটির আরেক উদ্দেশ্য। ১৮২০ সাল থেকে সেদিকেও উদ্যোগী হল সোসাইটি। কলিঙ্গায় শ্রীরামপুর মিশনের একটি বিদ্যালয় ছিল। টালায় ব্যাপটিস্ট মিশনের একটি বিদ্যালয় ছিল। ১৮২০ সালে সোসাইটি ওই দুটি বিদ্যালয়ের ভার নিল। তাছাড়া নানা অঞ্চলে চারটি নতুন বিদ্যালয়ও স্থাপন করল। নতুন চারটির মধ্যে একটি হল আরপুলি পাঠশালা। এই পাঠশালার খরচ চালাতেন স্বয়ং ডেভিড হেয়ার।

সেসময়ে ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার একমাত্র জায়গা ছিল হিন্দু কলেজ। ১৮১৮ সালের ২৪-নভেম্বর হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ ঠিক করল সোসাইটির কুড়িজন ছাত্র হিন্দু কলেজে ভর্তি হতে পারবে, প্রত্যেক ছাত্রের জন্য মাইনে লাগবে পাঁচটাকা। যতকাল সোসাইটির অস্তিত্ব ছিল, প্রত্যেক বছর সোসাইটির কয়েকজন ছাত্র—তিরিশজনের বেশি নয়—হিন্দু কলেজে পড়বার সুযোগ পেয়েছে। সেসব ছাত্রের তত্ত্বাবধান করতেন কলেজের য়ুরোপীয় সম্পাদক ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস আর্ভিন। আর্ভিন সাহেব কলকাতা থেকে বিদায় নেবার পর ১৮১৯ সালের মাঝামাঝি থেকে ডেভিড হেয়ার এই কাজের ভার নিলেন।

সোসাইটির তখন অনেক কাজ। প্রতি বছর হাজার-হাজার পাঠ্যপুস্তক কিনে বিনামূল্যে বিলিয়ে দিতে হয়, দেশীয় পাঠশালাগুলিকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে হয়, হিন্দু কলেজের কয়েকজন ছাত্রের মাইনে দিতে হয়, আদর্শ বিদ্যালয়গুলি চালাতেও খরচ আছে। বিস্তর খরচ। এত টাকা কোথায়?

প্রথম বছরে সোসাইটির আয় ছিল দশ হাজার টাকার বেশি। দ্বিতীয় বছরে সাড়ে সাত হাজার টাকা। তৃতীয় বছরে পাঁচ হাজার টাকা। চতুর্থ বছরে টাকা ২৯৪১।৶০১১ পাই।

সোসাইটিকে অগত্যা—১৮২২ সালের কথা—আদর্শ বিদ্যালয়গুলি ছেড়ে দিতে হল। তখন তিনটি আদর্শ বিদ্যালয়ের ভার নিল চার্চ মিশনারি সোসাইটি। সোসাইটির একজন মুসলমান সদস্য একটি আদর্শ বিদ্যালয়ের ভার নিলেন; অলপকাল বাদেই সেটির আয়ু শেষ হয়ে গেল। আরপুলি-পাঠশালার ভার, আগের মতোই ডেভিড হেয়ারের হাতে থেকে গেল। ১৮২৩ সালে ডেভিড হেয়ার আরপুলি পাঠশালার সঙ্গে একটি ইংরেজি বিভাগ

জুড়ে দিলেন। সেই বছর পটলডাঙায় একটি ইংরেজি স্কুলও খোলা হল। ওই ইংরেজি স্কুল চালানোর কিছু খরচ দিয়েছে সোসাইটি, বাকি খরচ জুগিয়েছেন স্বয়ং ডেভিড হেয়ার।

সোসাইটির আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। ১৮২৩ সালের এপ্রিলে গবর্ণমেণ্টের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল সোসাইটি। প্রার্থনা মঞ্জুর হল। ১৮২৩ সালের মে মাস থেকে সোসাইটিকে গবর্ণমেণ্ট মাসে পাঁচশো টাকা সাহায্য দিতে আরম্ভ করল।

আরেকটি দরকারী খবর আছে। এতদিন ই. এস. মণ্টেগু সোসাইটির য়ুরোপীয় সেক্রেটারি ছিলেন, ১৮২১ সালে তাঁর বদলে য়ুরোপীয় সেক্রেটারি হলেন পিয়ার্স সাহেব। তখন দেশীয় পাঠশালাগুলির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিলেন ডেভিড হেয়ার। ১৮২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পিয়ার্স ইস্তফা দিলেন; অতঃপর সোসাইটির য়ুরোপীয় সেক্রেটারি হলেন ডেভিড হেয়ার। রাধাকান্ত দেব বরাবর ভারতীয় সেক্রেটারি। দেশীয় পাঠশালাসমূহের তত্ত্বাবধানের ভার প্রকৃতপক্ষে রাধাকান্ত দেবের উপরেই অর্পিত। দেশীয় পাঠশালাসমূহের উন্নতি ও সংস্কারের দিকে রাধাকান্ত বিশেষ যত্নশীল, তাঁকে সাহায্য করছেন ডেভিড হেয়ার।

দেশীয় পাঠশালার জন্য নতুন নিয়ম করে দিল সোসাইটি। যখন-তখন ছাত্র ভর্তি হতে পারবে না। বছরের গোড়ার দিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসে ছাত্রদের পাঠশালায় ভর্তি হতে হবে। নতুন নিয়মে সোসাইটির প্রত্যেক দেশীয় পাঠশালায় চারটি করে শ্রেণী হল। কিন্তু নতুন নিয়মে দেশীয় পাঠশালা থেকে সর্দারপোড়ো লুপ্ত হল না। আগে যেমন ছিল, তেমনি রইল। সর্দারপোড়ো বহাল থেকে গেল। উচ্চশ্রেণীর যেসব ছাত্র নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের পড়াশোনায় সাহায্য করে তারাই সর্দারপোড়ো।

সোসাইটির পাঠশালার ছাত্রদের প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা হল ১৮২০ সালে। ছাত্র তখন ৩৭৮৭ জন, কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষা দিল ২৫২ জন ছাত্র। কারণ, পাঠশালাসমূহের উচ্চতম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট ছাত্রেরাই কেবল পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেয়েছে।

চতুর্থ বার্ষিক পরীক্ষা হল ১৮২৪ সালে ২৮-এপ্রিল। সেবার পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেল ১৫৫ জন ছাত্র। সেবার থেকে উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে লটারি করে বার্ষিক পরীক্ষার জন্য অনুমতি দেবার নিয়ম হয়েছে। আরপুলি-পাঠশালার ইংরেজি বিভাগের ছাত্রদের, পটলডাঙা স্কুলের ছাত্রদের এবং হিন্দু কলেজের সোসাইটির ছাত্রদেরও এই বার্ষিক পরীক্ষায় যোগ দিতে হত।

বার্ষিক পরীক্ষা বরাবর হয়েছে শোভাবাজারে রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে। তাছাড়া ত্রৈমাসিক পরীক্ষারও ব্যবস্থা হয়েছিল; ত্রৈমাসিক পরীক্ষা সাধারণত হত বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়কদের বাড়িতে।

১৮২৪ সালের ৮-জুলাই রাধাকান্ত দেব লিখেছেন :

"I have great satisfaction in saying that our countrymen are convinced of the advantage derived by their children from our Society, and that the indigenous Schoolmasters and the Parents of Boys who were first alarmed and refused to receive our School Books, are anxious to come under

the control of the Society and that at the commencement of the Institution I persuaded 16 or 17 Gooroos only to ask our reading Books, and to give examination thereon at my House on the 2nd June 1819, pledging myself there should not be introduced any religious matter therein, and then I divided all the Schools amounting to 166 on Calcutta, into four Divisions and named 4 Baboos the present Superintendents to take care of them, of which 65 Schools are at present under the patronage of our Society and the remaining masters are about to be joined with them, of 30 small Schools have been since abolished on account of the number of free Schools which have been established in Calcutta." ১০

সোসাইটির তিরিশটি পাঠশালা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু কিছুদিন বাদেই সোসাইটি দশটি নতুন পাঠশালা খুলে ফেলল।

আগেই বলা হয়েছে, সোসাইটির চতুর্থ বার্ষিক পরীক্ষার তারিখ ১৮২৪ সালের ২৮-এপ্রিল। তারপর দু-বছর বার্ষিক পরীক্ষা হয়নি। পঞ্চম বার্ষিক পরীক্ষা হল ১৮২৭ সালের ২০-ফেব্রুআরি। সাকুল্যে ২১০ জন ছাত্র সেবার পরীক্ষা দিতে এল। দেশীয় পাঠশালাগুলো থেকে ১২০ জন; পটলডাঙা স্কুল থেকে ৩০ জন; আরপুলি-পাঠশালা থেকে ৩০ জন; হিন্দু কলেজ থেকে ৩০ জন।

১৮২৮ সালের ১-জানুআরির সোসাইটির রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে পাঠশালার সংখ্যা তখন ১৪৮টি এবং ছাত্রের সংখ্যা ৬১২৬ জন।

আরপুলি পাঠশালা ও পটলডাঙা স্কুল—দুটিই সোসাইটির আদর্শ বিদ্যালয় হয়ে উঠেছে।

আরপুলি পাঠশালা ছিল ঠনঠনে কালীবাড়ীর কাছে, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের পূর্বদিকে। এই পাঠশালায় ডেভিড হেয়ারের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব। অবৈতনিক পাঠশালা। কেবলমাত্র গরীব ছাত্রদের জন্য। এই পাঠশালায় একটি ইংরেজি বিভাগ ছিল, কিন্তু সেখানে আট বছরের কমবয়সী কোনো ছাত্রকে ভর্তি করা হত না। যদি দেখা যেত, ইংরেজি বিভাগের কোনো ছাত্র বাঙলায় পিছিয়ে আছে তো তাকে প্রতিদিন দু-ঘণ্টা বাঙলা পড়ানো হত।

পাঠশালায় ছাত্রেরা যাতে নিয়মিত উপস্থিত থাকে, সেদিকেও ডেভিড হেয়ার সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। যে-ছাত্র মাসে একদিনও কামাই করেনি তাকে আট আনা পুরস্কার দেওয়া হত। যে-ছাত্র মাসে মাত্র একদিন অনুপস্থিত, তার পুরস্কার ছ-আনা। আর মাসে দু-দিন উপস্থিত হতে পারেনি যে, সে পেত চার আনা। মাসে দু-দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলে কোনো পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই।

শিক্ষাবিষয়ক প্রথম রিপোর্টে (১৮৩৫) অ্যাডাম সাহেব লিখেছেন:

". . . In order to afford sufficient time for the boys to acquire a considerable knowledge of Bengalee before they began to learn English, no pupil was admitted into the school above eight years of age. The scholars were promoted to the Society's English School or to the Hindu College as

a reward for their proficiency in Bengalee, the study of which they were required to continue until they acquired a competent knowledge of the language. This attention to the cultivation of the language of the country, the chief medium through which instruction can be conveyed to the people, was a highly gratifying feature in the operations of this society; and an additional advantage of the school at Arpuly was the example which it afforded to the whole of the indigenous schools. The best proof of the estimation, in which it was held by the Native inhabitants of the neighbourhood, was the frequent earnest solicitation received from the most respectable Natives to have their children educated in it." ১৪

তারপর পটলডাঙা স্কুলের কথায় আসা যাক। এই পটলডাঙা স্কুলই কালক্রমে হয়ে ওঠে সোসাইটির আদর্শ ইংরেজি স্কুল। সোসাইটির দেশীয় পাঠশালাসমূহের ছাত্রেরা উত্তম বাঙলা শেখার পর প্রথম পটলডাঙা স্কুলে এবং পরে হিন্দু কলেজে—অথবা দু-জায়গাতেই—ভর্তি হতে পারত। তবে পটলডাঙা স্কুল থেকেই সবচেয়ে ভালো ছাত্রদের সোসাইটির খরচে হিন্দু কলেজে পাঠানো হত। পটলডাঙা স্কুলটিকে বলা হত হিন্দু কলেজের প্রিপারেটরি স্কুল। পটলডাঙা স্কুলের ছাত্রেরাই হিন্দু কলেজে গিয়েও খুব ভালো ছাত্র বলে নাম পেত।

হিন্দু কলেজের জন্মের কিছুকাল বাদে ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন একটি কলেজ খুলেছে। দু-বছর বাদে কলকাতায় বিশপস কলেজ স্থাপিত হল—স্থাপয়িতা বিশপ মিডলটন। এই দুই কলেজেই ইংরেজিতে সর্ববিধ শিক্ষার ব্যবস্থা। পাদরীদের কলেজ—অতএব দু-জায়গাতেই প্রধানত প্রচারিত হত খ্রীষ্টতত্ত্বের মহিমা। বিশপস কলেজে খ্রীষ্টান ছাড়া এ-দেশের কোনো ছাত্র ভর্তি হতে পারত না। কিন্তু খ্রীষ্টান না হলেও এ-দেশের ছাত্রের জন্য শ্রীরামপুর কলেজের দরজা খোলা।

গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে ত্রিহুত ও নবদ্বীপে দুটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব হয়েছিল ১৮১১ সালে। ভারতবর্ষে শিক্ষাখাতে সরকারী তহবিল থেকে বছরে অন্যূন একলক্ষ টাকা খরচ করার কথা ছিল, কিন্তু কথামতো কাজ হয়নি।

ত্রিহুত ও নবদ্বীপে দুটি সংস্কৃত কলেজ খোলার প্রস্তাব বাতিল করে ১৮২১ সালে গবর্ণমেণ্ট সাব্যস্ত করল কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ খোলা হবে। এ-বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিয়েছেন ডঃ হোরেস হেম্যান উইলসন। এই সংস্কৃত কলেজের জন্য বছরে পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা খরচ করতে গবর্ণমেণ্ট রাজি। কলকাতার সংস্কৃত কলেজে আপাতত পাঠ্য কয়েকটি সংস্কৃত শাস্ত্র। ভবিষ্যতে, আশা করা যায়, পাঠ্যবস্তু প্রসারিত হবে। কলকাতার সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে ১৮২১ সালের ২১ আগস্টের একটি সরকারী উচ্চারণ :

"The committee will bear in mind that the immediate object of the institution is the cultivation of Hindu litera-

ture. Yet it is in the judgment of His Lordship in council, a purpose of much deeper interest to seek every practicable means of effecting the gradual diffusion of European knowledge. It seems indeed no unreasonable anticipation to hope that if the higher and the educated classes among the Hindus shall, through the medium of their sacred language, be imbued with a taste for the European literature and science, general acquaintance with these and with the language whence they are drawn, will be as surely and as extensively communicated as by any attempt at direct instruction by other and humbler seminaries." [১১]

সরাসরি ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী হলে যদি ভারতবর্ষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এই আশঙ্কাতেই গবর্ণমেণ্ট তখন এ-দেশের ভাষায় পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা বিস্তারের জন্য ইচ্ছুক হয়েছে।

১৮২৩ সালের প্রথমার্ধে হিন্দু কলেজ গবর্ণমেণ্টের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল এবং ব্যর্থ হল।

সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে, এ-সংবাদে রামমোহন রায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি। রামমোহনের বিবেচনায় সংস্কৃতের মতো দুরূহ ভাষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতেই প্রায় সমস্ত জীবন কেটে যায় এবং সংস্কৃত শিক্ষাব্যবস্থার ফলে এ-দেশ তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। যে-শিক্ষাব্যবস্থার ফলে য়ুরোপীয় জাতিসমূহ পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় উচ্চস্থ হয়ে আছে, রামমোহন ইচ্ছা করেছেন, ভারতবর্ষেও সেইরকম শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হোক।

১৮২৩ সালের ১১-ডিসেম্বর স্বদেশবাসীর পক্ষ থেকে রামমোহন রায় বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা বড়লাটের হাতে পৌঁছে দিয়েছেন কলকাতার লর্ড বিশপ হেবার। হেবার সাহেবের মতে এই চিঠিখানা 'for its good English, good sense, and forcible arguments, is a real curiosity, as coming from an Asiatic.'

রামমোহনের এই চিঠির বক্তব্যকে বড়লাট কিছুমাত্র মর্যাদা দিলেন না।

এ. স্টার্লিং নামে একজন সাহেব তখন গবর্ণমেণ্টের অ্যাক্টিং ডেপুটি পার্শিয়ান সেক্রেটারি। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে স্টার্লিং, ১৮২৪ সালের ২-জানুআরি, যথাবিহিত মন্তব্যসহ রামমোহনের চিঠিখানার একটি প্রতিলিপি পাঠিয়ে দিলেন জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের কাছে।

স্টার্লিং সাহেবের মন্তব্য তুলে দিচ্ছি :

"I am directed to transmit to you, for information, the accompanying copy of a representation addressed by Rammohun Roy, to the Right Hon'ble the Governor General in council, expressing disappointment on the part of himself and his countrymen, at the resolution of Government to establish a new Sanskrit College in Calcutta,

instead of a seminary designed to impart instruction, exclusively in the arts, sciences and philosophy of Europe.

2. In furnishing your committee with a copy of the paper, His Lordship in council cannot abstain from remarking, that it is obviously written under an imperfect and erroneous conception of the plan of education, and course of study, which it is proposed to introduce into the new College, that the defects and demerits of Sanskrit literature, and Philosophy, are therein represented in an exaggerated light, and that the arguments in favour of encouraging native learning, as well as the positive obligation to promote its revival and improvement, imposed on the Government by the terms of the Act of Parliament, directing the appropriation of certain funds to the object of Public Education, have been wholly overlooked by the writer.

3. The letter of Rammohun Roy is not considered to call for any answer on the part of Government, but it will of course be at the discretion of your committee to address any observations, which you may deem the occasion to require, either to Rammohun Roy himself or to Government." ১৬

রামমোহনের বক্তব্য জেনারেল কমিটির কাছেও উপেক্ষিত হল। কমিটির বিবেচনায় রামমোহনের বক্তব্য তাঁর ব্যক্তিগত, এই বক্তব্যের সংগে জনসাধারণের কোনো সম্পর্ক নেই। জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন মন্তব্য করেছে :

"Under the discretion vested in the committee with respect to addressing any observations on the letter of Rammohun Roy either to himself or to Government the committee resolve that it is unnecessary to offer any remarks. The erroneous impressions entertained by the author of the letter are sufficiently adverted to in the letter from the secretary to the Government, but had the views taken in the letter been even less inaccurate the committee would still conceive it entitled to no reply, as it has disingenuously assumed a character to which it has no pretensions. The application to Government against the cultivation of Hindu literature, and in favour of the substitution of European tuition, is made professedly on the part, and in the name of the natives of India. But it bears the signature of one individual alone, whose opinions are well known to be hostile to those entertained by almost all his countrymen.

The letter of Rammohun Roy does not therefore express the opinion of any portion of the natives of India, and it is assertion to that effect, is a dereliction of truth, which cancels the claim of its author to respectful consideration." ১৭

১৮২৪ সালের ১-জানুআরি বৌবাজারের একটা ভাড়াটে বাড়িতে সংস্কৃত কলেজ খোলা হল। সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া অন্য কেউ ভর্তি হতে পারত না।

সংস্কৃত কলেজের বাড়ির জন্য গোলদীঘির উত্তরদিকে পাঁচ বিঘা সাত কাঠা জমি কেনা হল। তার মধ্যে দু-বিঘা কেনা হয়েছে ডেভিড হেয়ারের কাছ থেকে, দর পড়েছে প্রতি কাঠা পাঁচশো টাকা।

১৮২৪ সালে হিন্দু কলেজও চলে এল বৌবাজারে, সংস্কৃত কলেজের কাছাকাছি একটা ভাড়াটে বাড়িতে। গবর্ণমেণ্ট তখন হিন্দু কলেজকে মাসে-মাসে দুশো আশি টাকা দিতে রাজি হয়েছে। আর্থিক অসুবিধায় আছে তখন হিন্দু কলেজ। সাব্যস্ত হল, সংস্কৃত কলেজের জন্য যে-বাড়ি উঠবে সেই বাড়িতেই হিন্দু কলেজ ও স্কুলের জন্য ব্যবস্থা রাখতে হবে। বাড়ির জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মঞ্জুর করল।

হ্যারিংটন সাহেব লণ্ডনের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি থেকে বিনামূল্যে এবং বিনা ভাড়ায় হিন্দু কলেজের জন্য মেকানিক্স, হাইড্রোস্টাটিক্স, নিউম্যাটিক্স, অপটিক্স, ইলেকট্রিসিটি, অ্যাসট্রনমি এবং কেমিস্ট্রি শেখানোর নানারকম জিনিসপত্র আনিয়ে দিলেন। সমস্ত সাজসরঞ্জাম কলকাতায় এল ১৮২৩ সালের জুলাই মাসে।

কোথায় রাখা হবে এসব জিনিস? সাব্যস্ত হল, নতুন বাড়ির একটা ঘরে এসব জিনিস আলাদা করে রাখা হবে। শুধু জিনিসপত্র হলেই তো চলে না, উপযুক্ত শিক্ষক কই? ১৮২৪ সাল থেকে কলকাতা টাঁকশালের ফোরম্যান ভি. রস শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। তাঁর বেতন বছরে পাঁচশো পাউণ্ড।

১৮২৪ সাল থেকে গবর্ণমেণ্ট হিন্দু কলেজকে অর্থসাহায্য করছে, অতএব সরকারী পক্ষ থেকে ডঃ উইলসন হিন্দু কলেজের 'ভিজিটর' হলেন। সরকারী পক্ষ থেকে তিনি হিন্দু কলেজ পরিচালনার অন্যতম সহায়ক। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভা তাঁকে 'সহকারী সভাপতি' নির্বাচিত করে নিল।

১৮২৫ সালে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভার সদস্য হয়ে এলেন ডেভিড হেয়ার। ইতিপূর্বে আর কোনো অহিন্দু হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভার সদস্য হননি।

১৮২৫ সালে হিন্দু কলেজের কোষাধ্যক্ষ জোসেফ ব্যারেটো কোম্পানি ফেল পড়ল। সরকারী সাহায্যের উপর আরো বেশি নির্ভর করতে বাধ্য হল হিন্দু কলেজ। এই বছরেই হিন্দু কলেজকে রাজা বৈদ্যনাথ রায় দান করলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল কুড়ি হাজার টাকা, রাজা হরিনাথ রায় কুড়ি হজার টাকা।

১৮২৪ সালের ২৫-ফেব্রুআরি সংস্কৃত কলেজগৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। দু-বছরের বেশি সময় লাগল বাড়ি উঠতে। ১৮২৬ সালের ১-মে সংস্কৃত কলেজ (হিন্দু কলেজ ও স্কুল সহ) নতুন বাড়িতে এল। একই বাড়িতে দুই কলেজের ছাত্র হয়ে এল নানা সম্ভ্রান্ত পরিবারের হিন্দুসন্তান এবং কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যসন্তান।

J. Kerr লিখেছেন :

"When the new building was completed, the students of both the Sanscrit and Hindu Colleges were removed to it ; the former occupying the central building and the latter the adjoining wings.

It is curious to observe the precautions that were used at this early period, to prevent all communication between the two classes of students. The two contiguous buildings were separated by a wall surmounted by iron rails. It was thought that there would be no objection to "a common entrance." The two classes of students, the once born and the twice born, could not be prevented from breathing the same air and walking under the same sky. Similarly, they might be permitted to enter by a common gate, provided it were sufficiently wide for them to pass through it without coming into actual contact. But no further concession could be allowed. The central building must be fenced off and separated from the wings by a distinct euclosure, so as effectually to debar the students of the one Institution from entering within the precincts of the other. More especially was it considered desirable that the "out-offices" should be perfectly distinct, in compliance with what was considered as "the most inveterate of Native prejudices."

It was however, expected by the European gentlemen interested in the progress of the College, that the necessity for these precautions would only be temporary." ১৮

চার

১৮২৯ সালের ১-জুন ঈশ্বর ভর্তি হল সংস্কৃত কলেজে। তখন ঈশ্বরের বয়স ন-বছর।

দিনের পর দিন বেলা নটার সময় ঈশ্বর বড়বাজারের বাসা থেকে বাবার সঙ্গে পটলডাঙার কলেজে গেছে। ছুটির পর বেলা চারটের সময় আবার বাবা ঈশ্বরকে কলেজ থেকে বাসায় নিয়ে এসেছেন।

কিছুদিন পর বাবা বুঝলেন, এখন ঈশ্বর একা-একা বাসা থেকে কলেজে যাওয়া-আসা করতে পারবে। তাই হল। একা-একা ঈশ্বর কলেজে যায়। ছাতা মাথায় দিয়ে একা-একা একটি ছোটোখোটো মানুষ কলেজে যায়। দূর থেকে দেখলে মনে হত, যেন একটি ছাতাই আপনা-আপনি হেঁটে যাচ্ছে, যেন ছাতার তলায় মানুষজন কেউ নেই।

ঈশ্বর দেখতে ছোটোখাটো। কিন্তু মাথাটি দেখতে সেই তুলনায় বেশ বড়ো-সড়ো। কলেজের ছেলেরা তাই ঈশ্বরকে ঠাট্টা করে। বলে—যশুরে কৈ, কসুরে জৈ। ঈশ্বর রেগে যায়। ঈশ্বর যত বেশি রাগে, ছেলেরা তত বেশি পিছনে লাগে।

প্রত্যেকদিন রাত্রে বাবার কাছে পড়া দিতে হয়। কণামাত্র এদিক-ওদিক হলে আর রক্ষা নেই।

লেখাপড়া ছাড়াও ঈশ্বরের অঢেল কাজ। সকালবেলা গঙ্গাস্নান সেরে আসবার পথে বাজার করে আসতে হয়। মশলা বাটা আছে, মাছ-তরকারি কোটা আছে তারপর। রান্নার ভারও একা ঈশ্বরের হাতে। চার-পাঁচজনের রান্না। সকলের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে ঈশ্বর খেতে বসে। ফেলে-ছড়িয়ে খাঁওয়া বারণ, একটি ভাত পাতের পাশে পড়ে থাকলে ঠাকুরদাসের কাছে রেহাই নেই। খাওয়ার পর ঈশ্বর সকলের থালা-বাসন মাজে, রান্নাঘর পরিষ্কার করে। তারপর কলেজে যায়।

ঈশ্বরেরা বড়ো গরীব। রোজ দু-বেলা ভাত জোটে না। দু-বেলা যদি বা জোটে, সবসময় পেট ভরে খাবার মতো জোটে না। অনেক সময় শুধু লবণ দিয়ে ভাত খেতে হয়। যখন মাছ-তরকারি জোটে, তখনও ঘটা করে মাছ-তরকারি খাবার উপায় নেই। মাছ-তরকারির ঝোল হল। একবেলা ভাত আর শুধু ঝোল চলল। আরেকবেলা ভাত আর তরকারি। মাছটুকু রইল পরদিনের জন্য। সেদিন ওই মাছ দিয়ে অম্বল রাঁধা হল। আর ভাত।

রান্নাঘরটা অন্ধকার। একফোঁটা রোদ পড়ে না সেখানে। তার উপর রান্না-ঘরের পাশে একটা নরককুণ্ড। মলমূত্র আর কৃমিকীটে ভর্তি।

দুর্গন্ধ তো আছেই, তার চেয়েও বিশ্রী ব্যাপার আছে একটা। খাবার সময় ঈশ্বরকে এক ঘটি জল নিয়ে বসতে হয়। তা না হলে ভাত খবার উপায় নেই। দলে দলে কৃমি ঈশ্বরের থালার দিকে এগিয়ে আসে। ঘটি থেকে জল ঢেলে ঈশ্বর কৃমির দলকে ভাসিয়ে দেয়, সরিয়ে দেয়।

রান্নাঘরে আরশোলার ভারি উৎপাত।

একদিন খেতে বসে ঈশ্বর দেখল, তরকারির মধ্যে একটা আরশোলা। না, ঈশ্বর সেকথা তখন কাউকে বলেনি। যদি বলত, নিশ্চয়ই আর-সকলের খাওয়া

ভণ্ডুল হয়ে যেত। কিম্বা, যদি আরশোলাটাকে পাতের পাশে ফেলে দিত, নির্ঘাত কারো চোখে পড়ত। ফল একই হত, আর-সকলের খাওয়া পণ্ড হত। আর কারো যাতে অসুবিধা না হয়, আর-কেউ যাতে কিছুই টের না পায়, এমনিভাবে ঈশ্বর তরকারির সঙ্গে আরশোলাটাকেও খেয়ে ফেলল।[১]

ঈশ্বর ভারি একগুঁয়ে। যা বলা হবে, ঠিক তার উল্টোটি করে বসে থাকবে। ঠাকুরদাসও ছেলেকে চেনেন। কাজ হাসিল করার জন্য তিনিও যেমনটি করাতে চাইতেন ঠিক তার উল্টোটি করতে বলতেন ঈশ্বরকে।

ঠাকুরদাস বললেন—ঈশ্বর, আজ একখানা খুব পরিষ্কার কাপড় পরে যাও।

অর্থাৎ, ঠাকুরদাসের ইচ্ছা, ঈশ্বর আজ ময়লা কাপড় পরে যায়।

সেই রকমই হত। ঈশ্বর ময়লা কাপড় পরে যেত। মনে-মনে ঠাকুরদাস যা চেয়েছেন, অনেক সময় তাই হয়েছে।

কিন্তু সবসময় হয়নি। এক-একদিন ঈশ্বর ধরে ফেলেছে। হয়তো একটা কাজ আধাআধি করে ঈশ্বর বুঝতে পেরেছে যে কাজটা নিজের ইচ্ছায় হচ্ছে না, বাবার ইচ্ছায়ই হচ্ছে। হয়তো বাবা বলেছেন, 'ঈশ্বর, আজ তোমার স্নান করা হবে না।' ঈশ্বর তাড়াতাড়ি গায়ে তেল মেখে ফেলেছে। তারপর বুঝতে পেরেছে, বাবার ইচ্ছা আজ সে স্নান করে। সঙ্গে-সঙ্গে বেঁকে বসেছে। না, আজ আর কিছুতেই স্নান নয়। ঠাকুরদাস তখন ঈশ্বরকে গঙ্গার ঘাটে নামিয়ে দিয়েছেন, কিছুতেই ঈশ্বর তবু ডুব দিচ্ছে না; ঠাকুরদাস জোর করে ঈশ্বরকে স্নান করিয়েছেন, বিরক্ত হয়ে বলেছেন—এঁড়ে বাছুরই বটে। বাবা ঠাট্টা করে বলেছিলেন; কিন্তু তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন, তাঁর ঠাট্টাও মিথ্যে হবার নয়। বাবাজি আমার আস্তে-আস্তে এঁড়ে গোরুর চেয়েও একগুঁয়ে হয়ে উঠেছেন।

কারো কথা শোনে না, নিজে যা ভালো বোঝে ঈশ্বর বরাবর তাই করে। গুরুতর লোক উপদেশ দিলেও ঈশ্বর ঘাড় বাঁকিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। ঠাকুরদাস প্রহার করেও ফল পান না, ঈশ্বর নিজের জিদ বজায় রাখবেই। সেজন্য ঠাকুরদাস ঈশ্বরের নাম দিয়েছেন—ঘাড়কেঁদো। অর্থাৎ, ঘাড় বাঁকালে সোজা হওয়ার নয়।

কাজকর্ম শেষ করে ঠাকুরদাসের বাসায় ফিরতে রাত নটা বেজে যেত। বাসায় ফিরে যদি ঠাকুরদাস কোনোদিন দেখতেন, ঈশ্বর ঘুমিয়ে পড়েছে, প্রদীপ জ্বলছে, তাহলে আর নিস্তার নেই। ঘুমন্ত ঈশ্বরকে তুলে মারধোর করতেন। ঈশ্বরের কান্না শুনে ও-বাড়ির মেয়েরা ছুটে আসতেন, বলতেন—এত মার খেয়ে মরে যাবে। আপনি ব্রাহ্মণ, আমাদের বাড়িতে ব্রহ্মহত্যা করে আমাদের পাতকগ্রস্ত করবেন না। এরকম মারধোর করতে হলে আপনি এ-বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান।

মারের ভয়ে ঈশ্বর জেগে থাকত। অনেক সময় ঘুম তাড়াবার জন্য দু-চোখে প্রদীপের তেল লাগাত। যন্ত্রণায় ছটফট করত, ঘুম থাকত না চোখে। রাত জেগে পড়ত। আবার শেষরাত্রে বাবা ঈশ্বরের ঘুম ভাঙাতেন। ঈশ্বরকে মুখে-মুখে শ্লোক শেখাতেন।

গঙ্গাস্নান সেরে এসে নিয়মিত প্রাতঃসন্ধ্যা করে ঈশ্বর।

একবার সন্ধ্যা ভুলে গেল। কিন্তু সেকথা কাউকে জানতে দিল না। সন্ধ্যা করার সময় এমনভাবে হাত-টাত নাড়ত যেন সবকিছু ঠিকই মনে আছে।

ঈশ্বরের কাকা, নাম কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কে জানে কেন, একদিন

সন্দেহ করলেন। কিন্তু সরাসরি কিছু বললেন না। ঈশ্বরকে বললেন—আমরা সন্ধ্যা ভুলে গেছি। বিশেষত আমরা বিষয়ী লোক, তুমি সংস্কৃত পড়েছ, তোমার শুদ্ধ হবে, অতএব একবার সন্ধ্যাটি তুমি আবৃত্তি কর, আমি শুনতে চাই।

সব তো ভুলে গেছে, কিছুই বলতে পারল না ঈশ্বর।

কালিদাস ঠাকুরদাসকে বলে দিলেন—ঈশ্বর সন্ধ্যা সমস্ত ভুলে গেছে। মিছিমিছি কেবল হাত-টাত নেড়ে কাজ সারে।

ঠাকুরদাস বিলক্ষণ প্রহার করলেন ঈশ্বরকে। বললেন—সন্ধ্যা শেখা না হলে কিছু খেতে দেব না।

পুঁথি দেখে আবার সন্ধ্যা মুখস্থ করল ঈশ্বর।[২]

ঠাকুরদাসের হাতে চ্যালাকাঠের মার খেয়ে ঈশ্বর একদিন পালিয়ে গিয়েছে রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে। রামধন সংস্কৃত কলেজের কেরানী।

রামধন সযত্নে ঈশ্বরকে নিজের বাড়িতে রেখেছেন, খাওয়া-দাওয়া করিয়েছেন। তারপর ঈশ্বরকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বাসায় পৌঁছে দিয়েছেন।[৩]

ঈশ্বরের শরীর বেশ মজবুত। বেটে-খাটো বটে, কিন্তু খুব গ্যাঁটাগোঁটা। সাধুভাষায় যাকে বলে 'অবষ্টব্ধ'। গ্যাঁটাগোঁটা বলে কলেজে অনেকে ঈশ্বরকে আদর করে 'ঢিপলে' বলে ডাকে। যখন ঈশ্বর কোনো একটা দুরূহ প্রশ্নের সুন্দর উত্তর করে দেয়, কেউ-কেউ বলে—আমাদের ঢিপলে না হলে এরকম আর কে করে দিতে পারে।[৪]

সাকুল্যে বারো বছর পাঁচ মাস সংস্কৃত কলেজে পড়েছে ঈশ্বর। অনেকবার পুরস্কার পেয়েছে, বৃত্তি পেয়েছে।

বৃত্তির টাকায় ছাত্রদের বিস্তর মিষ্টি-মিঠাই খাইয়েছে ঈশ্বর। দারোয়ানের কাছ থেকে টাকা ধার করে গরীব ছাত্রদের নতুন কাপড় কিনে দিয়েছে। আর ঈশ্বর নিজে? চরকায় সুতো কেটে মা কাপড় তৈরি করে বীরসিংহ থেকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিতেন। সেই কাপড় পরত।

পুজোর ছুটিতে ঈশ্বর যখন দেশের বাড়িতে যেত, গরীব-দুঃখীদের সাধ্যমতো সাহায্য করত। অন্যের কাপড় নেই, গামছা পরে ঈশ্বর নিজের কাপড়চোপড় এককথায় বিলিয়ে দিয়েছে। ঈশ্বরকে তখন কে দয়া করে ঠিক নেই, ঈশ্বর নিজেই অন্যকে দয়া করে যাচ্ছে।

বাল্যকাল থেকেই ঈশ্বর পরম দয়ালু।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "মাতৃদেবীর অনুকরণে আত্মীয় লোকের পীড়া হইলে তাহাদের বাটীতে যাইয়া (ঈশ্বরচন্দ্র) শুশ্রূষাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, এরূপ কার্য্যে কিছুমাত্র ঘৃণা ছিল না। নিঃসম্পর্কীয় অর্থাৎ কোনরূপ সংশ্রব না থাকিলেও পীড়িত লোকের মলমূত্র স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন। পীড়িত লোকের শুশ্রূষাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া রাত্রিজাগরণ করিতেন। যে সকল সংক্রামক রোগাক্রান্ত রোগীকে অপরে স্পর্শ করিতেও ভীত হইত, তিনি নির্ভয়ে ও অসঙ্কুচিত চিত্তে সেইরূপ রোগীর শুশ্রূষাদি কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে ভীত হইতেন না। তিনি বাল্যকাল হইতে পরম দয়ালু ছিলেন। তাঁহার এবম্বিধ গুণ থাকায় তৎকালে কলেজের সকল শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন।"[৫]

কলকাতায় যেমন, ছুটিতে বীরসিংহে গিয়েও ঈশ্বর তেমনি অন্যের দুঃখে কাতর ও সক্রিয়। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "পুজোর অবকাশে দেশে আগমন

করিলে যে যে প্রতিবাসিগণ পীড়িত হইয়াছেন শুনিতেন, (ঈশ্বরচন্দ্র) তাহাদের বাটীতে সর্ব্বদা যাইতেন এবং তাহাদের শুশ্রূষাদি কার্য্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতেন। অপর লোকে রোগীর শুশ্রূষাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে ঘৃণা প্রকাশ বা ক্লেশ বোধ করিত, কিন্তু অগ্রজ যে কোন জাতীয় লোকের পীড়া হইলে সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাদের সেবা করিতে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিতেন, একারণ তৎকালে দেশস্থ লোক দাদাকে দয়াময় বলিত। অনেকেই দেখিয়াছেন যে, সামান্য বিড়াল বা কুকুর মরিলেও দেখিয়া তাঁহার চক্ষে জল আসিত; কোন লোক রোদন করিলে তিনিও তাহাদের সহিত রোদনে প্রবৃত্ত হইতেন।”[৬]

বাল্যকাল থেকেই যার হৃদয়ে এত দয়া, কোনোকালেই কি তার জীবনে সুখশান্তির আশা আছে?

সংস্কৃত কলেজে অনেক শ্রেণী।

ঈশ্বর প্রথম ভর্তি হয়েছে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে। ১৮২৯ সালের জুন থেকে ১৮৩৩ সালের জানুআরি পর্যন্ত পড়েছে সেই শ্রেণীতে।

“প্রথম তিন বৎসরে মুগ্ধবোধপাঠ সমাপ্ত করিয়া, শেষ ছয় মাসে অমরকোষের মনুষ্যবর্গ ও ভট্টিকাব্যের পঞ্চম সর্গ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিলাম।”[৭]

ভর্তি হওয়ার দেড়বছর পরে ১৮৩১ সালের মার্চ মাস থেকে ঈশ্বর মাসিক পাঁচটাকা বৃত্তি পেয়েছে। কৃতী ছাত্রেরা কলকাতায় বাসা-খরচের জন্য এই বৃত্তি পেত। যারা বৃত্তি পেত তাদের বলা হত পে-স্টুডেন্ট; যারা বৃত্তি পেত না, তাদের বলা হত আউট-স্টুডেন্ট।

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ তখন ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক। “শিক্ষাদান বিষয়ে তর্কবাগীশ মহাশয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তৎকালে সকলে স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিতেন, ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ কৃতকার্য্য হয়, অপর দুই শ্রেণীর ছাত্রেরা কোনও ক্রমে সেরূপ হয় না। বস্তুতঃ পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় শিক্ষাদানকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ সাতিশয় যত্নবান্ ও সবিশেষ পরিশ্রমশালী ছিলেন বলিয়া অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।”[৮]

ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে পর-পর তিনটি বার্ষিক পরীক্ষায় ঈশ্বর তিন-বারই পুরস্কার পেয়েছে। ১৮৩০-৩১ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় পেয়েছে আউট-স্টুডেন্ট রূপে ব্যাকরণ ও নগদ আট টাকা। ১৮৩১-৩২ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় পেয়েছে অমরকোষ, উত্তররামচরিত ও মুদ্রারাক্ষস। ১৮৩২-৩৩ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় পেয়েছে পে-স্টুডেন্ট রূপে নগদ দু-টাকা।[৯]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: “ব্যাকরণ শ্রেণীতে তিন বৎসরের মধ্যে দুই বৎসর পরীক্ষায় উত্তমরূপে পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। এক বৎসর অপর মন্দ বালক ভাল প্রাইজ পাইল দেখিয়া, তাঁহার মনে এত ক্ষোভ জন্মিয়াছিল যে, কলেজে আর অধ্যয়ন করিব না, দেশে যাইয়া দণ্ডিপুরে বিশ্বনাথ সার্ব্বভৌম পিসামহাশয়ের টোলে অধ্যয়ন করিব, এই স্থির করিয়াছিলেন। পিতৃদেব এবং তর্কবাগীশ ও মধুসূদন বাচস্পতির অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।”[১০]

ভালো করে লেখাপড়া শেখার জন্য ঈশ্বরের যত্নের অন্ত নেই। প্রায়ই ঠাকুরদাসকে বলত—রাত দশটার সময় খেয়ে উঠে শুয়ে পড়ব। রাত বারোটা বাজলে আপনি আমায় তুলে দেবেন, নয়তো আমার পড়া হবে না।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভা পরীক্ষা করিবার জন্য আদিরসাশ্রিত একটী কবিতার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে কহিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট প্রথমতঃ বাচ্যার্থ মাত্র কহিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় কহিলেন ইহার অন্য কোনরূপ অর্থ হয় কি না? তদুত্তরে ঈশ্বর কহিলেন এই কবিতার লক্ষ্যার্থ অন্য প্রকার এবং ব্যাঙ্গার্থে তদ্বিপরীত। তর্কালঙ্কার মহাশয় ত্রিবিধ অর্থ শুনিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠ ছাত্র মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও মধুসূদন বাচস্পতি প্রভৃতিকে কহিলেন তোমরা এই বালক হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক এমন কি তোমাদিগকে যুবা বলিলেও দোষ হয় না। তোমরা কেহই এরূপ ভাবে বাচ্যার্থ লক্ষ্যার্থ ও ব্যাঙ্গার্থ একাকী বলিতে সমর্থ হও নাই। আমি এই বালকের প্রতিভা দেখিয়া পরমাপ্যায়িত হইয়াছি।”[১৩]

১৮৩৩ সালের ফেব্রুআরি থেকে ১৮৩৫ সালের জানুআরি পর্যন্ত ঈশ্বর পড়েছে সাহিত্য-শ্রেণীতে, জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের কাছে। এই সময়েও আগের মতো মাসিক পাঁচটাকা বৃত্তি পেয়েছে। সাহিত্য-শ্রেণীতে ঈশ্বর পড়েছে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, কিরাতার্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত, শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, বেণীসংহার, রত্নাবলী, মুদ্রারাক্ষস, উত্তররামচরিত, দশকুমারচরিত ও কাদম্বরী।”[১৪]

মাসিক বৃত্তির টাকা ঈশ্বর তুলে দিয়েছে ঠাকুরদাসে হাতে। ঠাকুরদাস একদিন বলেছেন—তোমার এই টাকায় জমি কিনব। দেশে টোল করে দেব। দেশের লোক যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে তুমি সেই ব্যবস্থা করবে। তোমার বৃত্তির টাকায় যে জমি কেনা হবে তার উপস্বত্বের টাকায় বিদেশী ছাত্রদের খরচের কিছু সাহায্য হতে পারবে।

কাঁচিয়াগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে কয়েক বিঘা জমি কিনেছেন ঠাকুরদাস।

কিছুদিন পরে ঠাকুরদাস বললেন—তোমার টাকায় তোমার আবশ্যক বইপুঁথি কিনবে।

ঈশ্বর অনেক পুঁথি কিনেছে।

যখন বীরসিংহে যায়, কারো বাড়িতে আদ্যশ্রাদ্ধ হলে ঈশ্বরের উপর নিমন্ত্রণের কবিতা লেখার ভার পড়ে। নিমন্ত্রণে সমাগত পণ্ডিতেরা ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যাকরণের বিচার করেন। বিচারকালে ঈশ্বর সংস্কৃত-ভাষায় কথা বলে। পণ্ডিতেরা আশ্চর্য হয়ে যান। ক্রমশ দেশে প্রচার হয়ে গেল যে ঈশ্বর অদ্বিতীয় পণ্ডিত![১৫]

১৮৩৪-৩৫ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় ঈশ্বর প্রথম হয়েছে। পুরস্কার পেয়েছে : সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ আর দু-খণ্ড History of British India. তাছাড়া দেবনাগর হস্তাক্ষরের জন্য পুরস্কার পেয়েছে হিতোপদেশ ও রবিন্সনের Grammar of History.[১৬]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : “ঐ সময় হইতে অগ্রজকে দুই বেলা সকলের পাকাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত। কোন দাসদাসী ছিল না। প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে কিয়ৎক্ষণ পুস্তক আবৃত্তি করিয়া বড়বাজার টাকশালের গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া আসিবার সময় বড়বাজার কাশীনাথবাবুর বাজারে যাইতেন। তথায় বাটা মৎস্য ও আলু পটল তরকারী ক্রয় করিয়া আনিতেন। বাসায় পৌঁছিয়া প্রথমতঃ হরিদ্রাদি ঝাল মশলা বাটিয়া উনন ধরাইয়া মুগের দাউল পাক করিয়া মৎস্যের ঝোল রন্ধন করিতেন। তখন বাসায় চারিজন লোক ভোজন

খেয়ে উঠে ঠাকুরদাস দু-ঘণ্টা বসে থাকতেন। আরমানি গির্জার ঘণ্টা শুনে ঈশ্বরকে জাগিয়ে দিতেন।

ঈশ্বর সারারাত পড়ত।

উত্তরকালে লালমোহন বিদ্যানিধি লিখেছেন: "গঙ্গাধর তর্কবাগীশের নিকট কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় একদিন গল্পচ্ছলে কহিলেন ঈশ্বর এই আট বছরের ছেলে বীরসিংহ গ্রাম হইতে কলিকাতা আসিবার সময় পদব্রজে আমাদিগের সঙ্গে সমভাবে ২৬ ক্রোশ পথ দুই দিবসে আসিয়াছে। এবং উহার বুদ্ধিমত্তা ও মেধাশক্তি দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। একদিন আমি ও ঠাকুরদাস উভয়ে ইংরাজী বিল সমূহের ঠিক দিতে ভুলিতেছি। ঈশ্বর তথায় বসিয়াছিল কহিল আপনারা অস্থির হইয়াছেন সেইজন্য ভুল হইতেছে। আমি ভুল বাহির করিয়াছি। আমি কহিলাম তুমি কি ইংরাজী অঙ্ক চিন? ঈশ্বর কহিল শেয়াখালা হইতে শালিখার ঘাট দশক্রোশ পথ, এই দশ ক্রোশ মধ্যে কুড়ীখানি মাইল ষ্টোনের চিহ্ন দেখিয়া ইংরাজী অঙ্ক শিখিয়াছি আমি কহিলাম সে ত সোজা এ যে বাঁকা। ঈশ্বর উত্তর করিল দেখুন ও বাঁকা লেখা সোজা ভাবে বুঝিয়া লইব। তখনই পরীক্ষার জন্য বিলগুলি তাহাকে দিলাম। ঈশ্বর অনায়াসে অল্পক্ষণ মধ্যে নির্ভুল করিয়া ঠিক দিয়া দিল। তখন আমাদিগের আনন্দের সীমা রহিল না।* ইহা শুনিয়া গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ঈশ্বরচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন আজি হইতে তুই আমার প্রিয়পাত্র হইলি।"[১১]

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ইংরেজি শেখানোর জন্য ১৮২৭ সালের ১-মে থেকে ওলাস্টন নামে একজন সাহেব বহাল হয়েছেন। সব ছাত্রকেই ইংরেজি পড়তে হবে এমন কোনো কথা নেই, যাদের ইচ্ছা হবে তারা পড়তে পারে। ব্যাকরণ-শ্রেণীতে পড়তে-পড়তেই ঈশ্বর ইংরেজি-শ্রেণীতে এসেছে—১৮৩০ সালের কথা। ১৮৩৩-৩৪ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজি ষষ্ঠশ্রেণীর ছাত্ররূপে ঈশ্বর পুরস্কার পেয়েছে : History of Greece আর Reader etc. ১৮৩৪-৩৫ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় পঞ্চমশ্রেণীর ছাত্ররূপে পুরস্কার পেয়েছে : Poetical Reader No. 3 আর English Reader No. 2 কিন্তু ১৮৩৫ সালের নভেম্বরে সংস্কৃত কলেজ থেকে ইংরেজি-শ্রেণী উঠে গেল।[১২]

লালমোহন বিদ্যানিধি লিখেছেন :

"(গঙ্গাধর) তর্কবাগীশ মহাশয় (জয়গোপাল) তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষা নৈপুণ্যের কথা কহিলেন। কিন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রকে কাব্য শ্রেণীতে গ্রহণ করিতে প্রথমতঃ সম্মত হন নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় কহিলেন কাব্যে ভাব গ্রহণ করা বালকের কর্ম্ম নহে। গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় তদুত্তরে তর্কালঙ্কার মহাশয়কে কহিলেন এ বালক রসিক চূড়ামণি বয়সে কম হইলে কি হয়। দেখিতে নাড়ু গোপাল বটে কিন্তু এ কাব্যমোদী ও ভাবগ্রাহী আমি উহার কুশাগ্র বুদ্ধি ও সৎকাব্যের মর্ম্ম গ্রহণ ও ব্যাঙ্গোক্তি দেখিয়া সর্ব্বদাই পরিতুষ্ট হই। আপনি দেখিবেন সকল ছাত্র অপেক্ষা সর্ব্বাগ্রেই কাব্যের তাৎপর্য্য বুঝিবে!

---

* আলোচ্য বিষয়ে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ঈষৎ ভিন্নরূপে বিবরণ দাখিল করেছেন। সেই বিবরণ আগেই উদ্ধৃত হয়েছে।

করিতেন, ভোজনের পর উচ্ছিষ্ট মুক্ত ও বাসন ধৌত করিতে হইত। হাঁড়ী মাজিয়া, বাসন ধৌত করিয়া, ও স্থান মুক্ত করায় অংগুলির অগ্রভাগ ও নখগুলি ক্ষয় হইয়া যাইত। হরিদ্রা বাটার জন্য হস্তে হরিদ্রার চিহ্ন থাকিত।"[১৭]

১৮৩৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঈশ্বর এসেছে অলঙ্কার-শ্রেণীতে, একবছর পড়েছে সেই শ্রেণীতে। অলংকারের অধ্যাপক তখন প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ।[১৮]

দু-বেলা রান্না করতে হয় ঈশ্বরকে; রান্না করতে-করতে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে পড়ে। কলেজে যাওয়ার সময় পথে বই দেখতে-দেখতে যায়।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "(ঈশ্বরচন্দ্র) এক দিন মধ্যম সহোদর দীনবন্ধুকে সন্ধ্যার সময় বাজার করিতে পাঠাইয়াছিলেন। রাত্রি একাদশ ঘাটকা অতীত হইতে যায় তথাপি দীনবন্ধু বাসায় উপস্থিত না হওয়াতে, তাহার অত্যন্ত দুর্ভাবনা হইল। ভ্রাতার জন্য উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, অবশেষে অন্যান্য লোকের উপদেশানুসারে প্রথমতঃ বড়বাজারে কাশীনাথবাবুর বাজারে অনুসন্ধান করিলেন। তথায় অনুসন্ধান না পাওয়ায় পরিশেষে যোড়াসাঁকো নূতন বাজারে অনুসন্ধান করেন; তথায় দেখিলেন, দীনবন্ধু বাজারে দেওয়াল ঠেস দিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। নিদ্রা ভাংগাইয়া তাঁহাকে বাসায় লইয়া যান। অগ্রজ মহাশয় ছোট ছোট ভাই ও ভগিনীদিগকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন। এরূপ ভ্রাতৃস্নেহ অপর কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই।"[১৯]

অলঙ্কার-শ্রেণীতে ঈশ্বরকে পড়তে হয়েছে সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ ও রসগঙ্গাধর। ১৮৩৫-৩৬ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ঈশ্বর পুরস্কার পেয়েছে রঘুবংশ, সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ, রত্নাবলী, মালতীমাধব, উত্তররামচরিত, মুদ্রারাক্ষস, বিক্রমোর্ব্বশী ও মৃচ্ছকটিক।[২০]

অলঙ্কার-শ্রেণীতে পড়বার সময় ঈশ্বর প্রত্যহ কলেজ ছুটির পর, বিকেল চারটের সময়, ঠনঠনিয়ার চৌরাস্তার কাছে তারাকান্ত বিদ্যাসাগর, তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও মধুসূদন বাচস্পতির বাসায় যেত। তাঁরা ঈশ্বরকে খুব স্নেহ করতেন। সেই বাসায় ঈশ্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত সাহিত্যদর্পণ দেখত।

একদিন সেই বাসায় প্রখ্যাত পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন এসেছেন। ঈশ্বরকে সাহিত্যদর্পণ পড়তে দেখে তিনি বাচস্পতিকে জিজ্ঞেস করলেন—এই অলপবয়স্ক বালক কি সাহিত্যদর্পণ বুঝতে পারে?

বাচস্পতি বললেন—কীরকম শিখেছে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

সাহিত্যদর্পণের রসের বিচারস্থল জিজ্ঞেস করা হল। ঈশ্বরের ব্যাখ্যা শুনে জয়নারায়ণ আশ্চর্য হয়ে বললেন—এই বালক বড়ো হলে বাঙলাদেশের মধ্যে অদ্বিতীয় লোক হবে। এত অলপবয়সে সংস্কৃতভাষায় এমন পণ্ডিত আমি কখনো দেখিনি।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি বললেন—আমরা এই বালককে কলেজের মহামূল্য অলঙ্কারস্বরূপ জ্ঞান করে থাকি।[২১]

প্রেমচন্দ্র যোগসাধন করতেন। যোগবলে প্রেমচন্দ্র নাকি আসন থেকে একটু উপরে উঠতে পারতেন। যোগ-টোগের দিকে নজর গেল ঈশ্বরের। আর দু-জন বন্ধুর সংগে ঈশ্বর নিশ্বাস বন্ধ করে ঠনঠনে কালীবাড়ি থেকে সংস্কৃত কলেজ অবধি যেতে আরম্ভ করল।[২২] এ অবশ্যি খুব আশ্চর্য কোনো ঘটনা নয়।

আশ্চর্য একটা ঘটনা হল একদিন প্রেমচন্দ্রের একখানা পুঁথি নিয়ে।

প্রেমচন্দ্রের একখানা হাতে-লেখা পুঁথি ছিল। 'সাহিত্যদর্পণে'র একখানা টীকা। ছাত্রদের কাজে লাগে বলে পুঁথিখানা তিনি কলেজেই রেখে যেতেন।

ছাত্রেরা পুঁথির এখান-ওখান থেকে পাতা খুলে নিয়ে যেত। পড়ানোর সময় কখনো-কখনো দরকার হলে পুঁথির অনেক পাতা মিলত না।

এ তো ভালো কথা নয়। প্রেমচন্দ্র ছাত্রদের বারণ করে দিলেন—পুঁথির পাতা যেন আর কেউ বাড়িতে নিয়ে না যায়।

দিনকয়েক পরের কথা। বিকেলবেলা। কী একটা কাজে, একটু আগেই কলেজ থেকে বেরিয়ে পড়েছেন প্রেমচন্দ্র। খানিকক্ষণ আগে জোরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

এদিকে ঈশ্বর একটা কাণ্ড করে বসেছে। পুঁথির পাতা বাড়িতে নিয়ে যেতে বারণ করে দিয়েছেন প্রেমচন্দ্র, বারণ না শুনে ঈশ্বর সেই পুঁথির কয়েকখানা পাতা খুলে নিয়ে বাসায় যাচ্ছে।

কিন্তু বৃষ্টি হয়ে গিয়েই সর্বনাশ হল। পা পিছলে পড়ে গেল ঈশ্বর, জলে নিজের কাপড় ভিজে গেল, বইপত্র ভিজে গেল, পুঁথির পাতাগুলোও ভিজে গেল। তাড়াতাড়ি এক ভুনোওয়ালার দোকানে ঢুকে পড়ল ঈশ্বর, জ্বলন্ত উনুনের একপাশে নিজের ভিজে চাদরের খানিকটা বিছিয়ে দিল, আর তারই উপরে শুকোতে দিল পুঁথির পাতাগুলো।

ওই অবস্থায় প্রেমচন্দ্রের চোখে পড়ে গেল। প্রেমচন্দ্র কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন—এ কি ঈশ্বর?

ঈশ্বর একেবারে তটস্থ।

সব কথা খুলে বলল। কিছুই রাখল না, কিছুই ঢাকল না। তারপর অনুতাপ করে বলল—গুরুর আজ্ঞা লংঘনের ফল হাতে-হাতে পেলাম।

সে-বিষয়ে একটি কথাও প্রেমচন্দ্র বললেন না। তিনি বললেন—তুমি ভিজে কাপড়ে অনেকক্ষণ আছ। অসুখ করবে। এখানা পরে নাও।

বলে নিজের চাদরখানা ঈশ্বরের গায়ে ফেলে দিলেন।

ঈশ্বর কিছুতেই সেই চাদর পরতে রাজি হল না। শেষপর্যন্ত প্রেমচন্দ্র একখানা গাড়ি যোগাড় করলেন, ঈশ্বরকে সংগে করে নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে ঈশ্বর ভিজে কাপড় ছাড়ল।

পরদিন কলেজে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করল—আর কখনো গুরুর আজ্ঞা লংঘন করব না।[২০]

১৮৩৬ সালের মে থেকে ১৮৩৮ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ঈশ্বর পড়েছে বেদান্ত-শ্রেণীতে।

এতদিন মাসিক পাঁচটাকা বৃত্তি পাচ্ছিল ঈশ্বর, ১৮৩৭ সালের মে মাস থেকে টাকার অংক বেড়ে গেল, মাসিক আটটাকা বৃত্তি হল। ১৮৩৭-৩৮ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে ঈশ্বর পুরস্কার পেয়েছে: মনু; প্রবোধচন্দ্রোদয়; অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব; এবং দত্তকচন্দ্রিকা ও দত্তকমীমাংসা।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "ঐ সময় জগদ্দুর্লভ সিংহের বাটীর সম্মুখে তিলকচন্দ্র ঘোষের সোণা রূপার খোদাইখানার গৃহ ছিল, তিলকচন্দ্র ঘোষ ও উহার পুত্র রামকুমার ঘোষ অতি ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ঐ বাটীর উপরের গৃহে পিতৃব্য কালীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাত্রিতে শয়ন করিতেন; উহার নিম্নস্থ গৃহে অগ্রজ মহাশয় (ঈশ্বরচন্দ্র) রাত্রিতে পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিয়া অধিক রাত্রিতে শয়ন করিতেন। সন্ধ্যার সময় হইতে তাঁহার শয্যায় আমিও শয়ন করিতাম। এক দিবস আমার উদরাময় হওয়ায় সন্ধ্যার সময় অসাবধানপ্রযুক্ত বস্ত্রেই মলত্যাগ করিয়াছিলাম,

তজ্জন্য যদি ভোজন করিতে না দেন, এই আশঙ্কায় উহা প্রকাশ করি নাই। অধিক রাত্রিতে অগ্রজ মহাশয় শয়ন করিয়া, তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভিভূত হইলেন। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলেন যে, তাঁহার পীঠ, বুক হস্ত প্রভৃতিতে বিষ্ঠা লাগিয়া রহিয়াছে। আমায় কোন কথা না বলিয়া গাত্র ধৌত করিয়া সমস্ত শয্যা স্বহস্তে কূপোদক দ্বারা প্রক্ষালিত করিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে পিতামাতার প্রতি ভক্তি এবং ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের যথেষ্ট স্নেহ করিয়া আসিতেছেন। এরূপ পিতৃমাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃস্নেহ অন্য কেহ করিতে পারেন না। জননীরও সকল পুত্র অপেক্ষা অগ্রজ মহাশয়ের প্রতি আন্তরিক স্নেহ ছিল।"[২৪]

বেদান্ত-শ্রেণীর অধ্যাপকের নাম শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি। শম্ভুচন্দ্রের অনেক বয়স হয়েছে। শরীরের এমন দশা যে একা-একা সংসারের জরুরী কাজকর্মও করে উঠতে পারেন না। সব কাজেই তাঁকে অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। অনেক সময় ঈশ্বর শম্ভুচন্দ্রের সেবা-শুশ্রূষা করেছে।

ঈশ্বরকে ভালোবাসেন বললে কিছুই বলা হয় না, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন শম্ভুচন্দ্র। ঈশ্বরের সঙ্গে পরামর্শ না করে সংসারের কোনো কাজই তিনি করেন না।

কারা যেন শম্ভুচন্দ্রকে বুদ্ধি দিয়েছেন—আপনার এত কষ্ট, এত সব অসুবিধা, সংসারে কেউ নেই আপনার, আপনি আরেকটা বিয়ে করুন। তাহলেই সুরাহা হয়, বৌ এসে আপনার দেখাশোনা করতে পারে।

গরীব বামুনের একটি সুন্দরী মেয়ে পাওয়া গেল। একটি অল্পবয়সী মেয়ে।

শম্ভুচন্দ্র একদিন ঈশ্বরকে বললেন—দ্যাখো, সংসারে আমার কেউ নেই। বড়ো কষ্ট পাচ্ছি। লোকে বলে, আবার বিয়ে করলেই তো অনেক দুঃখ-কষ্ট ঘুচে যায়। একটি মেয়েও পাওয়া গিয়েছে। এখন তোমার মত হলেই, বাবা, আমি একাজে এগোতে পারি।

মন দিয়ে শম্ভুচন্দ্রের সব কথা শুনল ঈশ্বর। কিন্তু শম্ভুচন্দ্রের কথায় সায় দিতে পারল না। শম্ভুচন্দ্র তো বুড়ো হয়েছেন, দুদিন বাদেই মরে যাবেন, কিন্তু, হায়, সেই অল্পবয়সী মেয়েটির কী দশা হবে। বিধবা হয়ে চিরকাল দুঃখ-কষ্টে কাটাতে হবে তাঁকে। অচেনা-অজানা একটি মেয়ের ভবিষ্যতের দুঃখে ঈশ্বরের মন অপার করুণায় ভরে উঠল।

ঈশ্বর শম্ভুচন্দ্রকে বলল—এই বুড়োবয়সে নতুন করে সংসার করা আপনার কিছুতেই উচিত না। আপনার আর বেশিদিন বাঁচার আশা নেই। বিয়ে করা তো দূরের কথা বিয়ে করার কথা ভাবলেও আপনার পাপ হবে।

ঈশ্বরের মত আদায় করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন শম্ভুচন্দ্র। ঈশ্বরের দু-হাত ধরে অনেক কাকুতি-মিনতি করেছেন পর্যন্ত। কিন্তু কিছুতেই ঈশ্বর মত দিতে পারেনি।

শম্ভুচন্দ্র অবশ্যি শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেছেন। বুড়ো বয়সে একটি নিতান্ত অল্পবয়সী মেয়েকে সংসারে এনেছেন। ঈশ্বর তো আর তখন বিয়ে বন্ধ করতে পারে না। সে কেবল দুঃখ পেতে পারে। এই ঘটনায় নিদারুণ দুঃখ পেয়েছে ঈশ্বর।

কিছুদিন পরের কথা। শম্ভুচন্দ্র বললেন—ঈশ্বর, তোমার মাকে একদিনও দেখতে গেলে না?

গুরুপত্নী জননী। অতএব শম্ভুচন্দ্রের নতুন বৌ ঈশ্বরের মা বৈকি। কিন্তু শম্ভুচন্দ্রের কথার কোনো জবাব দিল না ঈশ্বর। তার দু-চোখ জলে ভরে উঠল।

তারপর একদিন ঈশ্বরকে জোর করে নিজের বাড়িতে ধরে নিয়ে গেলেন শম্ভুচন্দ্র। যাবার সময় সংস্কৃত কলেজের দারোয়ানের কাছ থেকে দুটি টাকা নিয়ে গিয়েছে ঈশ্বর।

মুখ দেখল না একটিবার, উদ্দেশে প্রণাম করে শম্ভুচন্দ্রের বৌয়ের পায়ের কাছে টাকা দুটি রাখল ঈশ্বর। তাড়াতাড়ি চলে আসছে সেখান থেকে, এমন সময় শম্ভুচন্দ্র ঈশ্বরের হাত ধরে বললেন—তোমার মাকে দেখে যাও।

বাড়ির ঝিকে শম্ভুচন্দ্র নতুন বৌয়ের ঘোমটা খুলে দিতে বললেন। নতুন বৌ দেখে ঈশ্বর আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। শম্ভুচন্দ্র তো বুড়ো হয়েছেন, দুদিন বাদেই মরে যাবেন, কিন্তু, হায়, এই অল্পবয়সী বৌটির কী দশা হবে। বিধবা হয়ে সারাজীবন দুঃখ-কষ্টে কাটাতে হবে। সেই পরম দুঃখের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ঈশ্বর কাঁদতে লাগল।

শম্ভুচন্দ্র বললেন—অকল্যাণ করিস না রে।

বলে তিনি ঈশ্বরকে সরিয়ে নিয়ে এলেন আরেকদিকে। নানা কথায় ঈশ্বরকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন শম্ভুচন্দ্র। শেষে একটু জল-টল খেতে বললেন ঈশ্বরকে।

কিন্তু কিছুই খেল না ঈশ্বর। বলল—এ-ভিটেয় আর কখনো জলস্পর্শ করব না।[২৫]

১৮৩৮ সালের প্রথম ভাগে ঈশ্বরকে দেখা যাচ্ছে স্মৃতি-শ্রেণীতে। একবছর পড়েছে এই শ্রেণীতে এবং আগের মতো মাসিক আট টাকা বৃত্তি পেয়েছে। এখানে ঈশ্বর পড়েছে মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা, দায়ভাগ, দত্তক-মীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকা, দায়তত্ত্ব, দায়ক্রমসংগ্রহ ও ব্যবহারতত্ত্ব। হরনাথ তর্কভূষণ তখন স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন ; "(হরনাথ) তর্কভূষণ মহাশয়, দর্শনশাস্ত্রেই পারদর্শী ছিলেন কিন্তু প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার তৎপূর্ব্বে বিশেষ দৃষ্টি ছিল না; সুতরাং স্মৃতির ব্যবহারাধ্যায়ে ভালরূপ ব্যবস্থা স্থির করিতে অক্ষম ছিলেন। যদিও অগ্রজ স্মৃতির শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি ঐ পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিয়া মনের তৃপ্তি জন্মাইত না, একারণ, অদ্বিতীয় ধীশক্তিসম্পন্ন হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট যাইয়া স্মৃতি অধ্যয়ন করিতেন।"[২৬] ১৮৩৮-৩৯ সালের বার্ষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়ে ঈশ্বর নগদ আশি টাকা পুরস্কার পেয়েছে।

উঁচু শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে-মধ্যে সংস্কৃতে গদ্য-পদ্য রচনা লিখতে হত। সংস্কৃত রচনা লিখতে সাহস হত না ঈশ্বরের। সংস্কৃত রচনার সময় এলেই ঈশ্বর পালিয়ে যেত।

১৮৩৮ সালে সংস্কৃত কলেজে নিয়ম হয়ে গেল স্মৃতি, ন্যায় আর বেদান্ত-শ্রেণীর ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষার সময় গদ্যে-পদ্যে সংস্কৃত রচনা লিখতে হবে। গদ্য যার সবচেয়ে ভালো হবে, সে একশো টাকা পুরস্কার পাবে। পদ্য যার সবচেয়ে ভালো হবে, সে-ও একশো টাকা পুরস্কার পাবে।

গদ্য-পদ্যের পরীক্ষা একই দিনে হবে। দশটা থেকে একটা পর্যন্ত গদ্য-

রচনার পরীক্ষা। একটা থেকে চারটে পর্যন্ত পদ্যরচনার পরীক্ষা।

সেবার গদ্য-পদ্য পরীক্ষার দিন সব ছাত্র ঠিক সময়ে এসেছে, দশটার সময় লিখতে আরম্ভ করেছে। সকলেই তো এসেছে, কিন্তু ঈশ্বর কই? ঈশ্বর গদ্য-পদ্য পরীক্ষা দিতে বসেনি কেন?

অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ খুব ভালোবাসেন ঈশ্বরকে। তিনি জোর করে ঈশ্বরকে ধরে নিয়ে গেলেন। পরীক্ষার জায়গায় বসিয়ে দিলেন।

ঈশ্বর বলল—আপনি জানেন, সংস্কৃত রচনা লিখতে আমার কোনোমতে সাহস হয় না। কেন আপনি আমাকে এখানে এনে বসালেন?

প্রেমচন্দ্র বললেন—যা পারো, কিছু লেখ। নইলে সাহেব খুব অসন্তুষ্ট হবেন।

সাহেব মানে মার্শাল সাহেব। তিনিই তখন সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি।

ঈশ্বর বলল—আর-সকলে দশটার সময় লিখতে আরম্ভ করেছে। এখন এগারোটা বেজেছে। এই অল্প সময়ে আমি কত লিখতে পারব?

প্রেমচন্দ্র বিরক্ত হলেন। বললেন—যা ইচ্ছা করো।

বলে চলে গেলেন।

'সত্য কথনের মহিমা' সম্পর্কে সংস্কৃতে গদ্যরচনা লিখতে হবে। বারোটা পর্যন্ত চুপচাপ বসে রইল ঈশ্বর, কিছুই লিখতে পারল না।

ঈশ্বর কী করছে, কে জানে। প্রেমচন্দ্র একবার খোঁজ নিতে এলেন। এসে দেখলেন, কিছুই লেখেনি, ঈশ্বর চুপচাপ শুকনো মুখে বসে আছে। প্রেমচন্দ্র রাগ করলেন।

ঈশ্বর বলল—কী লিখব, কিছুই ঠিক করতে পারছি না।

প্রেমচন্দ্র বললেন—'সত্যং হি নাম' এই বলে আরম্ভ করো।

আরম্ভ করে দিল ঈশ্বর। 'সত্যং হি নাম' লিখে আরম্ভ করল। অনেক কষ্টে অনেক ভেবে-চিন্তে একঘণ্টায় মাত্র কয়েকটি লাইন লিখতে পারল। একটার সময় নাম সই করে কাগজ দাখিল করে দিল।[২৭]

ঈশ্বরের সেই রচনাটি তুলে দিচ্ছি :

লৌকিককার্য্যে সত্যকথনস্যোপকারাঃ ॥

"সত্যং হি নাম মানবস্য সাধারণজনবিশ্বসনীয়তাপ্রতিপাদকং বিশ্বসনীয়তায়াশ্চ ফলমিহ বহুতরমুপলভ্যতে তথাহি যদি কস্যচিৎ কথঞ্চন সত্যকথনদর্শনেন সাধারণসমীপে বিশ্বসনীয়তা ভবতি ভবতি হি তস্য ক্রমশো নরপতিবিশ্বাসভাজনতা সমুদ্ভূতায়াঞ্চ তস্যাং কিং নাম নরস্য দুরবাপমবতিষ্ঠতে অর্থিপ্রত্যর্থিনোশ্চ বিবদমানয়োঃ সন্দিগ্ধবিষয়ে সন্দেহাপারপারাবারবারিণি নিমগ্নস্য নরপতের্ন তন্নিস্তরণবিষয়ে সাক্ষিণাং সত্যবচনতরণিরুপাবলম্বনমন্তরেণ কশ্চন সদুপায়ঃ সাক্ষিণামপি সত্যকথনেন বহুতরপ্রতিষ্ঠা দৃশ্যতে যস্য পুনর্বচসি ন সত্যতাপ্রতিভাসঃ কো নাম তমিহ বিশ্বসিতি তথাপি যদি কথঞ্চন সাক্ষিণাং বচনস্যাসত্যতাবিজ্ঞানং ভবতি তে খলু ভবন্তি চিরমেব সাক্ষিধর্ম্মবহিস্কৃতাঃ সততাবিশ্বসনীয়া অনেকশো দণ্ডনীয়াশ্চ অপিচ কিমত্র বহুতরং বক্তব্যং শিশবোঽপি বাললীলাবিষয়ে যদি কশ্চিন্মিথ্যাবাদিতয়া নিশ্চিতো ভবতি শৃণুত ভোঃ সখায়ো নানেনাধমেনাস্মাভিঃ পুনর্ব্যবহর্ত্তব্যময়ং খলু

মৃষাভাষীত্যেবমাদি গিরমুদ্গিরন্তীতি লৌকিককার্য্যে বহুধা সত্যকথনস্যোপকার ইত্যস্তু কিং বিস্তেরেণেতি। ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যায়ি শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ॥"*

পুরস্কার তো দূরের কথা, ঈশ্বর মনে মনে ভাবল, রচনার নমুনা দেখে, পরীক্ষকেরা নির্ঘাত হাসি-ঠাট্টা করবেন।

কিন্তু ঈশ্বরের ধারণা সত্য হল না। গদ্যরচনার জন্য সেবার ঈশ্বরই পুরস্কার পেল।

প্রেমচন্দ্র ঈশ্বরকে বললেন—দ্যাখো, তুমি কিছুতেই রচনার পরীক্ষা দিতে রাজি হওনি। পীড়াপীড়ি করে আমি তোমাকে পরীক্ষা দিতে বসিয়েছিলাম, তাতেই তুমি একশো টাকা পুরস্কার পেলে। তোমার রচনা দেখে সকলে সন্তুষ্ট হয়েছেন। সংস্কৃত রচনায় আর তুমি বিমুখ হয়ো না।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "ইহার অব্যবহিত পরে পিতৃদেব মধ্যমাগ্রজের বিবাহবিধি সমাধা করেন; এতদুপলক্ষে পিতৃদেবের বিলক্ষণ ঋণ হইয়াছিল। বীরসিংহস্থ ভবনের কিছুমাত্র ব্যয়ের লাঘব করিতে পারিলেন না, সুতরাং অগত্যা কলিকাতাস্থ বাসার ব্যয়ের হ্রাস করেন। দুগ্ধ, মৎস্যাদি কিছু কালের জন্য রহিত হয়। বৈকালে জল খাবার জন্য আধ পয়সার ছোলা আনিয়া ভিজান হইত, আধ পয়সা বাতাসা আসিত, ইহাই বৈকালে সকলের জলখাবার ব্যবস্থা ছিল। ঐ আর্দ্র ছোলার কিয়দংশ রাত্রে কুমড়ার ব্যঞ্জনের সহিত পাক হইত। ঐ সময় কষ্টের পরিসীমা ছিল না।"[২৮]

এদিকে জগদ্দুর্লভ সিংহ পুলিশের হাঙ্গামায় পড়ে গেলেন। জগদ্দুর্লভের বাড়িতে তেতলার ঘরে থাকত ঈশ্বরেরা। ভাড়া দিতে হত না। সে-বাসা কিছুকালের জন্য ছেড়ে দিতে হল। কিছুকাল ঈশ্বরেরা কাটাল গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পিসেমশায়ের বাসায়। তারপর আবার এল জগদ্দুর্লভের বাড়িতে। জগদ্দুর্লভ আর্থিক অসুবিধায় আছেন তখন, তেতলার ওই ঘর ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন তনসুকদাস নামে একজন হিন্দুস্থানীকে। অগত্যা ঈশ্বরেরা বাসা করল জগদ্দুর্লভের বাড়ির নিচতলার ঘরে। খুব স্যাঁতসেঁতে ঘর। যা হোক, গদ্য লিখে পুরস্কার পেয়ে সংস্কৃত রচনায় সাহস আর উৎসাহ পেল ঈশ্বর। পরের দুবার সংস্কৃতে পদ্য লিখে সংস্কৃত কলেজ থেকে পুরস্কার পেল।

সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মাঝে-মাঝে উঁচু শ্রেণীর ছাত্রদের পদ্য লিখতে বলতেন। অনেকেই লেখে, কিন্তু ঈশ্বর কখনো লেখে না।

সংস্কৃতে রচনা লিখে ঈশ্বর পুরস্কার পাবার পর জয়গোপাল একদিন তাকে বললেন—আর আমি তোমার ওজর শুনব না। আজ তোমাকে পদ্য লিখতে হবে।

পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন জয়গোপাল। নিতান্ত অনিচ্ছায় ঈশ্বরকে পদ্যরচনায় হাত দিতে হল।

জয়গোপাল কয়েকজন ছাত্রকে পদ্য লিখতে বললেন। একঘণ্টার মধ্যে পদ্য লিখতে হবে। পদ্যের চতুর্থ চরণে 'গোপালায় নমোঽস্তু মে' থাকা চাই।

গোপালায় নমোঽস্তু মে? একটু রঙ্গ করার ইচ্ছা হল ঈশ্বরের। সে

* সংস্কৃত কলেজের পুরনো দপ্তর থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই রচনাটি প্রথম আবিষ্কার করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন: "পুরস্কারপ্রাপ্ত গদ্য রচনাটি ঈশ্বরচন্দ্রের 'সংস্কৃত রচনা' পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু সেটির সহিত আসল রচনাটির বিশেষ মিল নাই।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-১৮, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ১৫)

জয়গোপালকে জিজ্ঞেস করল—আমরা কোন গোপালের বর্ণনা করব? এক গোপাল আমাদের সামনে আছেন। আরেক গোপাল বহুকাল আগে বৃন্দাবনে লীলা করে অন্তর্হিত হয়েছেন। এই দু-জনের মধ্যে কোন গোপালের বর্ণনা আপনি চান, স্পষ্ট করে বলুন।

ঈশ্বরের রঙ্গ শুনে জয়গোপাল না হেসে পারলেন না। বললেন—বৃন্দাবনের গোপালের বর্ণনা করো।

একঘণ্টায় পাঁচটি শ্লোক লিখল ঈশ্বর :

"যশোদানন্দকন্দায় নীলোৎপলদলশ্রিয়ে।
নন্দগোপালবালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে॥ ১॥
ধেনুরক্ষণদক্ষায় কালিন্দীকূলচারিণে।
বেণুবাদনশীলায় গোপালায় নমোঽস্তু মে॥ ২॥
ধৃতপীতদুকূলায় বনমালাবিলাসিনে।
গোপস্ত্রীপ্রেমলোলায় গোপালায় নমোঽস্তু মে॥ ৩॥
বৃষ্ণিবংশাবতংসায় কংসধ্বংসবিধায়িনে।
দৈতেয়কুলকালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে॥ ৪॥
নবনীতৈকচৌরায় চতুর্বর্গৈকদায়িনে।
জগদ্ভাণ্ডকুলালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে॥ ৫॥"[২৯]

প্রত্যেক বছর বাড়িতে ঘটা করে সরস্বতী পুজো করতেন জয়গোপাল। অনেক ছাত্রকে নেমন্তন্ন করতেন। পুজোর দিন ছাত্রেরা জয়গোপালের বাড়িতে দুবেলা দিব্যি খাওয়া-দাওয়া করত, বিকেলে আর রাত্রে গান শুনত। সরস্বতী পুজোর দিন ওদের আমোদের আর অন্ত নেই।

সরস্বতী পুজোর আগের দিন জয়গোপাল উঁচু শ্রেণীর ছাত্রদের পদ্যে সরস্বতীর বর্ণনা করতে বলতেন। ঈশ্বর কখনো সে-বর্ণনা লিখতে রাজি হত না। মাত্র একবার ঈশ্বর এড়াতে পারেনি জয়গোপালকে। তাঁর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে ঈশ্বর মাত্র একবার একটি শ্লোকে সরস্বতীর বর্ণনা করেছে, সরস্বতীর নামে একটি সরস শ্লোক লিখেছে। শ্লোক দেখে খুব খুশি হয়েছেন জয়গোপাল। অনেককে ডেকে এনে জয়গোপাল নিজে ঈশ্বরের শ্লোক পড়ে শুনিয়েছেন।

ভারি মজার শ্লোকটি :

"লুচি কচুরী মতিচুর শোভিতং
জিলেপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম্।
যস্যাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ
সরস্বতী সা জয়তান্নিরন্তরম্।"[৩০]

শ্লোক নিয়ে আরেকটা বলবার মতো ঘটনা আছে।

১৮৩৮ সালের একদিন। কলেজের সেক্রেটারি সব ছাত্রকে বললেন—জন মিয়র নামে একজন সাহেব লিখেছেন, পরমেশ্বরের মহিমা সম্পর্কে যে-ছাত্র সকলের চেয়ে ভালো একশোটি শ্লোক লিখতে পারবে, তাকে তিনি কিছু নগদ টাকা পুরস্কার দেবেন।

প্রায় সব ছাত্র পরে আলাপ-আলোচনা করে সাব্যস্ত করল, পুরস্কারের

টাকা পাওয়া যাবে কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে, অতএব পরিশ্রম করে শ্লোক লেখার দরকার নেই।

কিন্তু দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় নামে একটি ছাত্র বলল—টাকা পাই আর না পাই আমি ওই একশোটি শ্লোক লিখব।

লিখল। এবং নগদ টাকা পুরস্কার পেল।

কিছুদিন পরে আবার আরেক খবর এল। ময়র সাহেব আবার পুরস্কার দেবেন, নগদ টাকাই পুরস্কার দেবেন। তবে এবার আর পরমেশ্বরের মহিমা নিয়ে নয়, পদার্থবিদ্যা নিয়ে। পদার্থবিদ্যা বিষয়ে যার একশো শ্লোক সবচেয়ে ভালো হবে, সেই ছাত্র পুরস্কার পাবে।

এবার অনেক ছাত্রই সাব্যস্ত করল, লিখবে। সত্যি-সত্যি পুরস্কারের টাকা পাওয়া যাচ্ছে।

পাঁচসাত দিন পরের কথা। একই শ্রেণীর একটি ছেলে এসে ঈশ্বরকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল—তুমি কি পদার্থবিদ্যা বিষয়ে শ্লোক লিখবে?

ঈশ্বর বলল—আমার ইচ্ছা নেই। কিন্তু অধ্যাপক মশায়েরা বড়ো পীড়াপীড়ি করছেন, যদি তাঁদের এড়াতে না পারি, অগত্যা লিখতে হবে।

—দ্যাখো, এবার অনেকেই শ্লোক লিখবে। কিন্তু, যদি আমরা দু-জনে মিলে লিখি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা পুরস্কার পাব। এস, আমরা দু-জনে ভাগাভাগি করে শ্লোক লিখি, তুমি পঞ্চাশটি লেখ, আমি পঞ্চাশটি লিখি। তারপর, হয় তোমার নামে, না হয় আমার নামে, একশোটি শ্লোক কর্তৃপক্ষের হাতে দেব। পুরস্কার পেলে দু-জনে সমান ভাগ করে নেব।

গোড়ায় ঈশ্বর এ-কথায় রাজি হয়নি। ছেলেটির অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে শেষপর্যন্ত নিতান্ত অনিচ্ছায় রাজি হয়েছে।

কর্তৃপক্ষের হাতে সব শ্লোক যেদিন দেবার কথা তার দশ-বারো দিন আগে ওই ছেলেটি ঈশ্বরকে বলল—দ্যাখো, নানা কারণে আমার ভাগের পঞ্চাশটি শ্লোক লেখা হল না। তুমিই পুরোপুরি একশোটি শ্লোক লিখে দাও।

ঈশ্বর বলল—দ্যাখো, আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কেবল তোমার পীড়াপীড়িতেই এ-কাজ করেছি। তুমি যখন করলে না, আমিও করব না। তাছাড়া, সব যোগাড় করে আরো পঞ্চাশটি শ্লোক লেখার আর সময় নেই। এই অবস্থায় এ-বিষয়ে ক্ষান্ত হওয়াই ভালো।

বলে ওই ছেলেটির সামনেই নিজের লেখা শ্লোকগুলো ঈশ্বর ছিঁড়ে ফেলে দিল।

কর্তৃপক্ষের হাতে সব শ্লোক যেদিন দেবার কথা, আশ্চর্য কাণ্ড, ওই ছেলেটিও সেদিন নিজের লেখা একশোটি শ্লোক দাখিল করল। দেখে অবাক হয়ে গেল ঈশ্বর। এই ঘটনার আগে ঈশ্বর কখনো ধারণা করতে পারেনি যে কেউ কারো সঙ্গে এতদূর পর্যন্ত চাতুরী করতে পারে।

কিছুদিন পরে আবার আরেক পুরস্কারের পালা। ওই ময়র সাহেবই পুরস্কার দেবেন, নগদ টাকাই পুরস্কার দেবেন। এবার শ্লোক লিখতে হবে ভূগোল-খগোল বিষয়ে।

সেবার পুরস্কার পেল ঈশ্বর। ওই চতুর ছেলেটির পক্ষে দুঃসংবাদ নিশ্চয়ই।[৩১]

এই পুরস্কার পেল যখন, ঈশ্বর তখন ন্যায়-শ্রেণীর ছাত্র।

অন্যরকম একটি ঘটনার বিবরণ এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে। উত্তরকালে লালমোহন বিদ্যানিধি লিখেছেন :

"ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি তিন সহোদর ও তাহাদিগের জনক ঠাকুরদাস যে ব্যাড়ীতে থাকিতেন সেই বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীতে বিসূচিকা (কলেরা) রোগ অতি প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত হইল। প্রত্যহ অনেক ব্যক্তি যমসদনের আতিথ্য গ্রহণ করিতে লাগিল। তৎকালে ঐ পীড়াকে অতি মারাত্মক এখনকার প্লেগ রোগের ন্যায় বিশেষ সংস্পর্শাক্রান্ত রোগ মনে করিত। এখনও যে মনে করে না তাহা নহে।

ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতা জগদ্দুর্লভ সিংহের কোন পরিচিত ব্যক্তি আসিয়া কহিল আপনার পরিচিত অমুক সপরিবারে ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। সে একান্ত দরিদ্র। কেহ তাহাকে চিকিৎসা করিয়া বাঁচাইবে এমন উপায় দেখি না। ঈশ্বরচন্দ্র তথায় উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি শুনিয়া কাহাকেও কিছু কহিলেন না। আন্তরিক বড়ই ব্যথা পাইলেন। সন্ধ্যার পরেই পাক সমাধা করিয়া দীনবন্ধু ও শম্ভুকে আহার করাইয়া পিতার ভোজনের আয়োজন করিয়া সেই পীড়িত ব্যক্তিবর্গের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহারা পাঁচ জনেই শয্যাশায়ী হইয়াছে জল পিপাসায় অত্যন্ত কাতর। মধ্যে মধ্যে তাহারা বমি ও মলত্যাগ করিতেছে। ঈশ্বরচন্দ্র তৎক্ষণাৎ এক গৃহস্থের বাটী হইতে এক কলসী জল আনিলেন এবং চক্‌মকী ঠুকিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন। তিনি সকলকে জল পান করাইয়া ডাক্তার ডাকিতে গেলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের ভ্রাতা হরচন্দ্র ওলাউঠা রোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন। তদবধি তাহার মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল হয় যে যদি কেহ ওলাউঠা রোগীর পিপাসা দূর করিতে পারে তাহা হইলে শতকরা বার আনা লোকের জীবন রক্ষা হইতে পারে। একদিন একটা নিমন্ত্রণ সভায় ডাক্তার রূপচাঁদবাবুর প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলেন যে ওলাউঠা রোগে রোগীকে যত জল খাওয়াইতে পারিবে ততই তাহার উপকার হইবে।...

ঈশ্বরচন্দ্র রূপচাঁদবাবুর অন্বেষণে যাইতেছেন সৌভাগ্যক্রমে তাহার সহিত পথিমধ্যে দেখা হইল। ঈশ্বরচন্দ্র রোগীদিগের অবস্থা সমুদায় যথাযথ রূপচাঁদ-বাবুকে কহিলেন। রূপচাঁদবাবু বলিলেন চল পুলীষে একবার জানাই। গবর্ণমেণ্ট হইতে যদি অনাথ ব্যক্তিবর্গের যদি কিছু সাহায্য করিতে পারি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও নবাব নেজামত হইতে দুঃখী ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য পুলীষের হাতে টাকা ও ঔষধ আছে। উভয়ে বড় বাজারের পুলীষের নিকট উপস্থিত হইলেন। পুলীষ সাহেবকে সংবাদ দিবা মাত্র তিনি কতকগুলি ঔষধের পীল দিলেন। এবং কহিলেন খুব সাবধান যেন জল অনেক না খায়। জল না খাইলে ভাল হয়। রূপচাঁদ কহিলেন সাহেব আপনার উপদেশানুসারেই চলিব। কিন্তু এখন তাহাদিগের মলমূত্র পরিষ্কারের জন্য একটা লোক আবশ্যক। সাহেবও অতি দয়ালু ও উচ্চ বংশের লোক ছিলেন। তিনি একটী মেথরানীকে সরকার হইতে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এবং পথ্যের খরচ যাহা লাগিবে তাহার জন্য সর্কারে বিল করিতে বলিলেন। রূপচাঁদ কহিলেন কে অগ্রে খরচ দিবে যে পরে বিলের টাকা আদায় হইলে সে উহা পরিশোধ করিয়া লইবে। সাহেব কহিলেন আমি নিজ হইতে দুইটি টাকা দিলাম। ইহা আমার নিজের দান জানিবেন। এখন রূপচাঁদ ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া রোগীদিগের নিকট আসিলেন। রোগীদিগকে দেখিয়াই কহিলেন বড় মন্দ অবস্থা। পুলীষের পীল

খাওয়াইয়া উহাদিগকে অনর্থ কষ্ট দিও না কেবল জল খাওয়াও। যদি উপকার হয় ইহাতেই হইবে। মেথরানী দ্বারা মল ও বমি পরিষ্কার করাইয়া লও। আমি বাটী হইতে পুরাতন ধৌত কাপড় পাঠাইয়া দিতেছি। তাহা জলে ভিজাইয়া উহাদিগের গাত্র মার্জ্জনা করিবে। রূপচাঁদ ডাক্তার বাটী যাইয়া দুইটি বেদানা কিঞ্চিৎ মিছিরি ও এক কলসী উত্তম পানীয় জল ও ধৌত বস্ত্রখণ্ড পাঠাইয়া দিলেন।

মেথরানী বিষ্ঠা ও বমনের অপবিত্রতা মাত্র দূরীভূত করিয়া প্রস্থান করিল। ঈশ্বর এখন একাকী রোগীদিগকে রূপচাঁদবাবুর উপদেশানুসারে পিপাসার জল যোগাইতেছেন। ক্রমে শিশুত্রয় কথা কহিল। এখন ঈশ্বরচন্দ্রের মনে শ্রম সার্থক বোধ হইতে লাগিল। এই সময় তাহার মনে মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন উদিত হইল।

জলেন পাচয়েদন্নং জলে জীবঞ্চ দৃশ্যতে।

এবং অগ্নি পুরাণের চিকিৎসা প্রকরণের যথা শ্রুত বচনও তাহার চিত্ত ক্ষেত্রে উদিত হইল!

অজীর্ণে ভেষজং বারি জীর্ণে বারি বল প্রদং।

এইরূপে রাত্রি অবসান কালে স্ত্রীলোকটী কহিল বাবা তুমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বড় দুঃখ পাইয়াছ। একবার বাবুদিগের বৈঠকখানায় শয়ন কর। বাবুরা অতি ভদ্র লোক। ঈশ্বরচন্দ্র বুঝিলেন ইহারও উপকার হইয়াছে। স্ত্রীলোকটী ভাবিল এমন দয়াময় বালক যদি না ঘুমাইয়া পীড়িত হয় তবে তাহাদিগকে আর কে দেখিবে। ঈশ্বরচন্দ্র দিবার প্রথম ভাগ তাহাদিগের নিকট অতিবাহন পূর্ব্বক তাহাদিগকে মিছিরি ও বেদানা পথ্য দিয়া বাসায় প্রস্থান করিলেন। প্রস্থান সময়ে গঙ্গার ঘাটে স্নান সমাধা করিয়া না গেলে বাসার লোক ও গৃহস্থ জগদ্দুর্লভবাবু যদি শুনেন যে ওলাউঠা রোগীর সেবায় নিযুক্ত ছিল সংস্পর্শাক্রান্ত রোগ—অনায়াসে বাসায় প্রবিষ্ট হইবে বিশেষতঃ রাত্রি জাগরণের পর স্নান করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয় সেইজন্য বড়বাজারের ঘাটে স্নান করিতে যাইলেন। তথায় রূপচাঁদবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনি কহিলেন রোগীরা কিরূপ আছে। ঈশ্বর কহিলেন সমস্তই মঙ্গল। রূপচাঁদ কহিলেন তোমাকে আর দুই দিন ভুগিতে হইবে। ঈশ্বর কহিলেন তাহাও কি আপনাকে কহিতে হইবে। উহা আমার নিজের কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়াছি। রূপচাঁদ কহিলেন আমার কর্ত্তব্যও আমি করিব।

ঈশ্বরচন্দ্র স্নানান্তে বাসায় আসিলে দীনবন্ধু কহিলেন দাদা কালি আপনি রাত্রিতে গিয়াছেন এখন কত বেলা হইয়াছে দেখুন দেখি। আমাদিগের আহারাদি কিছুই হয় নাই। বাবা আপনাকে মধুসূদন ঠাকুরদাদার বাসায় অনুসন্ধানে গিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র কোন কথা না বলিয়া পাক আরম্ভ করিলেন। এমন সময় ঠাকুরদাস উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন কালি রাত্রিতে কোথা ছিলি কাহাকেও কিছু বলিস নাই। আমি বেলা হইল দেখিয়া মধুসূদনের বাসায় অনুসন্ধানে গিয়াছিলাম। সে কহিল কালি তুমি তাহার সঙ্গে দেখাও কর নাই। সে আরও বলিল এ অঞ্চলে ওলাউঠার পীড়া প্রবলভাবে বিস্তৃত হইতেছে হয়ত কোন সতীর্থের পীড়ার সংবাদ পাইয়াছে তাহার সেবা শুশ্রূষার জন্য তথায় গিয়াছে। ঈশ্বরের অন্তঃকরণ অত্যন্ত মায়ায় আচ্ছন্ন পরোপকার করিতে পারিলে তাহার আহ্লাদের সীমা থাকে না। এই কথা শুনিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। ব্যাপারখানা কি বল দেখি শুনি।

ঈশ্বরচন্দ্র দ্বিরুক্তি করিলেন না। ঠাকুরদাসও ব্যস্ততাপ্রযুক্ত আর কিছু কহিলেন না। পূর্ব্ববৎ সকলের আহারাদি সমাধা হইয়া গেল। ঠাকুরদাস আফিস যাত্রা করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র দীনবন্ধুকে কহিলেন কলেজে যাইয়া আমাদিগের শ্রেণীর অধ্যাপককে কহিবি দাদা আজি এক স্থানে পীড়ার সংবাদ পাইয়াছেন তাহাদিগের সেবা শুশ্রূষার জন্য তিনি তথায় উপস্থিত থাকিবেন। তাহারা অতি দরিদ্র সুতরাং দাদা শুনিয়া থাকিতে পারিলেন না। দীনবন্ধুকে এই কথা বলিয়া ঈশ্বরচন্দ্র প্রস্থান করিলেন।...

ঈশ্বরচন্দ্র রোগীগণের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন রূপচাঁদ ডাক্তার সভৃত্য তথায় উপস্থিত আছেন। রূপচাঁদ ঈশ্বরচন্দ্রকে কহিলেন তোমার সেবায় সকলেই জীবন পাইল এবং আমার জলচিকিৎসায় অব্যর্থ ফল দেখাইতে পারিলাম। তোমার মত প্রকৃত সুবুদ্ধি কর্ম্মঠ এবং পরোপকারী ব্যক্তিকে না পাইলে আমার জলচিকিৎসার অব্যর্থ ফল দেখাইতে পারিতাম না। আজি হইতে তোমার নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে বন্ধ রহিলাম।"[৩২]

১৮৩৯ সালের গোড়ার দিকে ঈশ্বর ন্যায় শ্রেণীতে এসেছে। এই শ্রেণীর অধ্যাপক তখন নিমাইচন্দ্র শিরোমণি। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের মতে ঈশ্বর পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে সবচেয়ে ভালো ফলের জন্য একশোটাকা এবং সংস্কৃত পদ্য লিখে একশোটাকা পুরস্কার পেয়েছে। বিদ্যার প্রশংসা বিষয়ে সংস্কৃতে একটা পদ্য লিখে ঈশ্বর একশোটাকা পুরস্কার পেয়েছে বটে।

তিন ঘণ্টায় ঈশ্বর বিদ্যার প্রশংসা বিষয়ে আটটি শ্লোক লিখেছে :

"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিপুলঞ্চ বিত্তং
চিত্তং প্রসাদয়তি জাড্যমপাকরোতি।
সত্যামৃতং বচসি সিঞ্চতি কিঞ্চ বিদ্যা
বিদ্যা নৃণাং সুরতরুর্ধরণীতলস্থঃ ॥১॥
বিদ্যা বিকাশয়তি বুদ্ধিবিবেকবীর্য্যং
বিদ্যা বিদেশগমনে সুহৃদ্দ্বিতীয়ঃ।
বিদ্যা হি রূপমতুলং প্রথিতং পৃথিব্যাং
বিদ্যা ধনং ন নিধনং ন চ তস্য ভাগঃ ॥ ২॥
রূপং নৃণাং কতিচিদেব দিনানি নূনং
দেহং বিভূষয়তি ভূষণসন্নিকর্ষাৎ।
বিদ্যাভিধং পুনরিদং সহকারিশূন্যম্
আমৃত্যু ভূষয়তি তুল্যতয়ৈব দেহম্ ॥ ৩॥
অন্যানি যানি বিদিতানি ধনানি লোকে
দানেন যান্তি নিধনং নিয়তং নু তানি।
বিদ্যাধনস্য পুনরস্য মহান্ গুণোঽসৌ
দানেন বৃদ্ধিমধিগচ্ছতি যৎ সদেদম্ ॥ ৪॥
নৈশ্বর্য্যেণ ন রূপেণ ন বলেনাপি তাদৃশী
যাদৃশী হি ভবেৎ খ্যাতির্বিদ্যয়া নিরবদ্যয়া ॥ ৫॥
দুর্বলোঽপি দরিদ্রোঽপি নীচবংশভবোঽপি সন্।
ভাজনং রাজপূজায়া নরো ভবতি বিদ্যয়া॥ ৬॥
বিদ্বৎসভাসু মনুজঃ পরিহীণবিদ্যো
নৈবাদরং ক্বচিদুপৈতি ন চাপি শোভাম্।

হাসায় কেবলনসৌ নিয়তং জনানাং
তজ্জীবিতং বিফলমেব তথাবিধস্য ॥ ৭ ॥
অজ্ঞানখণ্ডনকরী ধনমানহেতুঃ
সৌখ্যাপবর্গফলমার্গনিদেশিনী চ।
সা নঃ সমস্তজগতামভিলাষভূমি-
র্বিদ্যা নিরস্য জড়তাং ধিয়মাদধাতু ॥ ৮ ॥"[৩৩]

সেসময়ে বীরসিংহে গেলে ঈশ্বরের সঙ্গে অনেকের শাস্ত্রবিচার হয়েছে। বিচারে সন্তুষ্ট হয়ে সকলেই ঈশ্বরকে আশীর্বাদ করেছেন।

বীরসিংহের কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস মহাসমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ করেছেন। সেই শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণপত্রে সংস্কৃত কবিতা লিখে দিয়েছে ঈশ্বর। শ্রাদ্ধের দিন নানা জায়গা থেকে পণ্ডিতেরা এসেছেন। জানতে চেয়েছেন : ওই সংস্কৃত কবিতা কার লেখা?

ঈশ্বরের লেখা। তারপর সকল পণ্ডিত শাস্ত্রবিচার করেছেন ঈশ্বরের সঙ্গে এবং পরাস্ত হয়েছেন। কুরাণগ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত রামমোহন তর্কসিদ্ধান্ত বিচারে পরাস্ত হয়েছেন শুনে ঠাকুরদাস রামমোহনের বিস্তর স্তবস্তুতি করলেন, রামমোহনের পায়ের ধুলো নিয়ে ঈশ্বরের মাথায় দিলেন। রামমোহন ঠাকুরদাসকে বললেন—তোমার পুত্র ঈশ্বর যেমন কাব্য অলঙ্কার স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র শিখেছে বাঙলাদেশে তেমন আর কেউ পারে না। ভবিষ্যতেও যে পারবে, এমন আশা করা যায় না। ঈশ্বরের প্রতি সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি হয়েছে, না হলে এই অল্পবয়সে এত শাস্ত্র কেমন করে শিখল।[৩৪]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "যৎকালে অগ্রজ (ঈশ্বরচন্দ্র) ন্যায়শাস্ত্রের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তৎকালে ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন পীড়িত হইয়াছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় দাদাকে উপযুক্ত পণ্ডিত বিলক্ষণ রূপে অবগত হইয়া, ২ মাসের জন্য অগ্রজকে প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করেন। তিনি প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত থাকিয়া ৪০ টাকা প্রাপ্ত হন, সেই টাকা পিতৃদেবের হস্তে অর্পণ করিয়া বলেন, এই টাকায় পিতৃকৃত্য সম্পাদনার্থে গয়াধাম প্রভৃতি তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা করুন। ছেলেমানুষ পিতাকে তীর্থক্ষেত্রে যাইতে উপদেশ দিতেছেন, এই কথায় আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই পরম আহ্লাদিত হইলেন।"[৩৫]

সেকালে যাঁরা আদালতে জজ-পণ্ডিত হতেন, তাঁদের হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষায় পাশ করতে হত। ১৮৩৯ সালের ২২-এপ্রিল ঈশ্বর হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা দিল। পরীক্ষা দেওয়ার ছ-মাস আগের কথা। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "সাধারণ পণ্ডিতগণ ২।৩ বৎসরে যে সমস্ত প্রাচীন সংস্কৃতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা দিতেন; তিনি (ঈশ্বরচন্দ্র) স্মৃতির সেই সকল গ্রন্থ ছয় মাসে মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মানসে পিতৃদেবকে বলিলেন, আমি ছয় মাস পাকাদিকার্য্য সম্পাদন করিতে পারিব না। সুতরাং তাঁহার অনুজ দীনবন্ধুকে দুইবেলা পাকাদিকার্য্য সমাধা করিতে হইত। তখন মধ্যমাগ্রজ দীনবন্ধুর বয়ঃক্রম দশ বৎসর মাত্র। জ্যেষ্ঠাগ্রজ প্রাতঃকাল হইতে সমগ্র মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা প্রভৃতি সংস্কৃতগ্রন্থ বেলা নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যমনা হইয়া আবৃত্তি করিতেন এবং ভোজনান্তে বড়বাজার হইতে পটলডাঙ্গাস্থ বিদ্যালয় যাইবার সময় পথে আবৃত্তি করিতে করিতে গমন

করিতেন। কলেজে উপস্থিত হইয়া পড়া বন্ধ করিতেন। পুনরায় ৪টার পর বাসা আসিবার সময় পথে আবৃত্তি করিতে করিতে বাসায় আসিতেন। রাত্রি দশটার সময় ভোজন করিয়া দুই ঘণ্টা নিদ্রা যাইতেন। নিকটস্থ আরমাণি গিরজার ঘড়িতে রাত্রি বারটা বাজিলে পুনর্ব্বার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া সমস্ত রাত্রি স্মৃতি আবৃত্তি করিতেন।"[৩৩]

ছ-মাস অনবরত এইরকম পরিশ্রম করেছে ঈশ্বর। কৃতিত্বের সঙ্গে ল-কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এবং হিন্দু-ল কমিটি থেকে একখানা সার্টিফিকেট পেয়েছে :

"HINDOO LAW COMMITTEE OF EXAMINATION

We hereby certify that at an Examination held at the Presidency of Fort William on the 22nd twenty-second April 1839 by the Committee appointed under the provisions of Regulation XI 1826 Issur Chunder Vidyasagur was found and declared to be qualified by his eminent knowledge of the Hindoo Law to hold the office of Hindoo Law officer in any of the Established courts of Judicature.

H. T. Prinsep
President
J. W. J. Ousely Member of the Committee of Examination

This certificate has been granted to the said Issur Chunder Vidyasagur under the Seal of the committee this 16th Sixteenth day of May in the year 1839 corresponding with the 3rd Third Joistha 1761 Shukavda.

J. C. C. Sutherland
Secy. to the Committee"*

এই সার্টিফিকেট পাওয়ার কিছুকাল পরে ত্রিপুরায় জজ-পণ্ডিতের একটা চাকরি খালি হওয়ার খবর পাওয়া গেল। সেই চাকরির জন্য ঈশ্বর দরখাস্ত করল। চাকরিটা পাওয়া গেল, কিন্তু ঠাকুরদাস অমত করলেন বলে ঈশ্বরের আর ওই চাকরি করা হল না।

বিশেষ কোনো সখ নেই ঈশ্বরের? আছে। কবিগানের খুব সখ আছে।

---

* এই প্রশংসাপত্র প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রদত্ত এই প্রশংসাপত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের নামের শেষে "বিদ্যাসাগর" উপাধিটি লক্ষণীয়। অনেকে লিখিয়াছেন, ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে কলেজে পাঠ সমাপন করিলে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গ মিলিত হইয়া তাঁহাকে "বিদ্যাসাগর" উপাধি দিয়াছিলেন। এরূপ উক্তি যে ভিত্তিহীন, তাহা জানা যাইতেছে।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-১৮, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ১৬)

কোথাও কবিগান হলে ঈশ্বর শুনতে যায়। বীরসিংহে গেলে সমবয়সী ভাই-বন্ধু নিয়ে কবিগান করে।

ঈশ্বরের খেলাধুলো নিয়েও দু-কথা বলা দরকার। ছুটিতে বীরসিংহে গেলে গ্রামের গদাধর পাল, ব্রজমোহন চক্রবর্তী ও ছোটোভাইদের নিয়ে ঈশ্বর কপাটি খেলে। কখনো-কখনো মদনমোহন মণ্ডলের সঙ্গে লাঠি খেলে। কাস্তে নিয়ে মাঠে ধান কাটে, মাঠ থেকে মজুরদের সঙ্গে ধান বয়ে আনে। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "(ঈশ্বরচন্দ্র) বাল্যকালে দেশে যাইয়া কৃষকগণের সহিত মাঠে কাস্তিয়া লইয়া ধান্য কাটিতেন। ভ্রাতৃগণকে বলিতেন, সকলে মাঠে চল, মাঠ হইতে ধান বহিয়া আনিতে হইবে। মজুরদের সহিত ধান বহিয়া পরম আহ্লাদিত হইতেন।"[৩৭]

আগেই বলা হয়েছে, ১৮৩৫ সালের নভেম্বরে সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী-শ্রেণী বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সংস্কৃত কলেজের সকল বিভাগের বহু ছাত্র আবার ইংরেজী-শ্রেণী খোলার জন্য ১৮৩৯ সালের ২১-মে সেক্রেটারি জি. টি. মার্শালের কাছে একখানা আবেদনপত্র দাখিল করল। ঈশ্বরের স্বাক্ষর আছে সেই আবেদনপত্রে।

আবেদনপত্র থেকে তুলে দিচ্ছি :

"...আমারদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ কেবল সংস্কৃত পাঠশালাতেই ইংরাজি-ভাষাধ্যয়নের রীতি উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু মাদর্শাতে উক্তভাষাধ্যয়ন ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে কেবল আমারদিগেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবেক নতুবা যে রাজা এতদ্দেশে ইংরাজি বিদ্যাবৃদ্ধ্যর্থে যত্নপূর্ব্বক বহুতর ধন ব্যয় করিয়া বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতেছেন তাঁহার যে কেবল এতম্মহানগরস্থ প্রধান বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উক্তভাষাভ্যাস বিষয়ে অমনোযোগ হইয়াছে ইহা কোন-রূপেই সম্ভব নহে অতএব এইক্ষণে প্রার্থনা যে অনুগ্রহপূর্ব্বক রীত্যনুসারে আমারদিগের ইংরাজিভাষাভ্যাসের অনুমতি প্রকাশ হয় তাহা হইলে ক্রমে রাজকীয় কার্য্য ও শিল্পাদি বিদ্যা জানিয়া লৌকিক কার্য্য নির্ব্বাহে সমর্থ হইতে পারি—লিপিরিয়ং জ্যৈষ্ঠস্যাষ্টদিবসীয়া—"[৩৮]

১৮৪০ সালের ১২-ফেব্রুআরি নিমাইচন্দ্র শিরোমণির মৃত্যু হল। তখন কিছুদিন ন্যায়শাস্ত্র পড়ালেন সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ। তারপর ১৮৪০ সালে ১১-আগস্ট জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক হয়ে এলেন। ন্যায়-শ্রেণীতে ঈশ্বরকে পড়তে হয়েছে ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ন্যায়সূত্র ও কুসুমাঞ্জলি।

১৮৪০-৪১ সালে ন্যায়-শ্রেণীর দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় ঈশ্বর একাধিক বিষয়ে পুরস্কার পেয়েছে। ন্যায়ের পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পেয়েছে একশো টাকা; দেবনাগর হস্তাক্ষরের জন্য আট টাকা; বাঙলায় কোম্পানির রেগুলেশ্যন বিষয়ে পরীক্ষায় পঁচিশ টাকা। তাছাড়া সংস্কৃতে পদ্য লিখে একশো টাকা। 'অগ্নীধ্র রাজার তপস্যা' বিষয়ে পদ্য।

উত্তরকালে বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

"...মাননীয় বাবু রসময় দত্ত মহাশয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি, অগ্নীধ্র রাজার তপস্যাসংক্রান্ত কতিপয় কথা লিখিয়া দিয়া, আমাদিগকে বলিয়া দেন, এই বিষয়ে শ্লোকরচনা কর। তাঁহার লিখিত কথাগুলি অবলম্বন পূর্ব্বক, নিম্নমুদ্রিত দশটি শ্লোকের মধ্যে, ১।২।৩।৪।৯।১০ এই ছয়টি রচিত হইয়াছিল; আর, ৫।৬।৭।৮ এই চারিটি আমার ইচ্ছা অনুসারে রচিত

অতিরিক্ত শ্লোক। এই শ্লোকচতুষ্টয় রসময় বাবুর সাতিশয় প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল।

অগ্নীধ্রোনাম ভূমীন্দ্রঃ প্রজারঞ্জনবিশ্রুতঃ।
আরাধয়ৎ সুতাকাঙ্ক্ষী গিরিপ্রস্থে প্রজাপতিম্ ॥ ১॥
ভগবান্ সোঽথ তজ্জ্ঞাত্বা প্রেষয়ামাস সত্বরম্।
প্রযত্নতঃ পূর্ব্বচিত্তিং নাম কামপি কামিনীম্ ॥ ২॥
নৃপতিস্তাং সমালোক্য কান্ত্যা ত্রৈলোক্যমোহিনীম্।
শ্লোকানুবাচ কাঁতচিজ্জড়বম্মোহমাশ্রিতঃ ॥ ৩॥
আলীঢ়নীরদচয়ে শিখরৈরুদগ্রে—
রুচ্চাবচৈরজগরৈরভিতো বিকীর্ণে।
ক্রব্যাদনৈরগণনৈর্ভয়মাদধানে
কিং নু ব্যবস্যসি মুনীশ্বর ভূধরেঽস্মিন্ ॥ ৪॥
কোদণ্ডযুগ্মমিদমদ্ভুতমম্বুজাক্ষি
ধৎসে কিমর্থমথবা হরিণোপমানাম্।
বালে বশীকরণবাসনয়া নিতান্তম্
অস্মাদৃশাং হতদৃশামজিতেন্দ্রিয়াণাম্ ॥ ৫॥
বাণাবিমৌ বিবিধবিভ্রমমন্থরৌ তে
পুঙ্খং বিনাপি রুচিরৌ নিশিতাগ্রভাগৌ।
ধাতুঃ কটাক্ষপতিতায় হতাশ্রয়ায়
কস্মৈ প্রযোক্তুমভিবাঞ্ছসি তন্ন বিঘ্নঃ ॥ ৬॥
যদ্দৃশ্যতে সুমুখি বিশ্বফলং মনোজ্ঞং
মধ্যে সুবর্ণপরিকল্পিতবাগুরায়াঃ।
জানীমহে ন হি করিষ্যতি কস্য যন্ন-
শ্চেতোবিহঙ্গমশিশোর্বিপুলাং বিপত্তিম্ ॥ ৭॥
অস্মিন্ নিরাকৃতকলঙ্কশশাঙ্কবিম্বে
নীলাম্বুজন্মযুগলং যদিদং বিভাতি।
মন্যে সুধাংশুমুখি সংবননং বিধাত্রা
লোকত্রয়স্য বিহিতং মহতাদরেণ ॥ ৮॥
যুষ্মচ্ছিখাবিগলিতা ললিতা নিতান্তং
শিষ্যা ইমে মুনিবরানুগতা ভবন্তম্।
প্রীতা ভজন্তি বিমলাং কিল পুষ্পবৃষ্টিং
ধর্ম্মব্রতা মুনিসুতা ইব বেদশাখাম্ ॥ ৯॥
তস্মাদ্ বয়ং ভয়পরিপ্লববুদ্ধয়স্ত্বাম্
অভ্যর্থয়ামহ ইদং চটুলায়তাক্ষি।
উদ্যন্ বিজেতুমবনীং তব বিক্রমোঽয়ম্
অস্মাকমস্তু কুশলায় নিরাশ্রয়াণাম্ ॥ ১০॥"[৩৯]

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মাঝে-মাঝে বলতেন—ঈশ্বরের মতো বুদ্ধিমান ছাত্র আমার চোখে পড়েনি। পড়ানোর সময় মনে হত যেন কতকাল আগে থেকে ঈশ্বর ওসব শাস্ত্র ভালো করে জেনে রেখেছে।

ঈশ্বর আট টাকা করে মাসিক বৃত্তি পাচ্ছিল, ১৮৪১ সালের জুনমাসে তা বন্ধ হয়ে যায়।

ক্রমশ সংস্কৃত রচনা বিষয়ে ঈশ্বরের কিঞ্চিৎ সাহস ও উৎসাহ জন্মেছে। তারপর সময়ে-সময়ে ঈশ্বর নিজের ইচ্ছায় কোনো-কোনো বিষয়ে শ্লোক লিখেছে। একবার ঈশ্বর মেঘবিষয়ে দশটি শ্লোক লিখেছে :

"প্রায়ঃ সহায়যোগাৎ সম্পদমধিকর্ত্তুমীশতে সর্ব্বে।
জলদাঃ প্রাবৃড়পায়ে পরিহীয়ন্তে শ্রিয়া নিতরাম্ ॥ ১॥
কিং নিম্নগা জলদমণ্ডলগর্জ্জিতেন
তোয়েন বৃদ্ধিমুপগন্তুমধীশতে তাম্।
ন স্যাদজস্রগলিতং যদি পান্থযূনাং
সাহায্যকায় কিল নির্ম্মলমশ্রুবর্ষম্ ॥ ২॥
কান্তাভিসাররসলোলুপমানসানাম্
আতঙ্ককম্পিতদৃশামভিসারিকাণাম্।
যদ্ বিঘ্নকৃদ্ দূরিতমার্জ্জিতবানজস্রং
কেনাধুনা ঘন তরিষ্যসি তন্ন বিদ্মঃ ॥ ৩॥
ক্ষীণং প্রিয়াবিরহকাতরমানসং মাং
নো নির্দ্দয়ং ব্যথয় বারিদ নাত্মবেদিন্।
ক্ষীণো ভবিষ্যসি হি কালবশং গতঃ সন্
আস্তে তবাপি নিয়তস্তড়িতা বিয়োগঃ ॥ ৪॥
সর্ব্বত্র সন্নমৃতদস্তটিনীশরীর—
সংবর্দ্ধকস্তনুভৃতাং শমিতোপতাপঃ।
যচ্চাতকেষু করুণাবিমুখোঽসি নিত্যং
নায়ং মতো জলদ কিং বত পক্ষপাতঃ ॥ ৫॥
লোকোত্তরা যদিচ তোয়দ তে প্রবৃত্তি-
রেষা যদব্জসরিতোরশি সঙ্গহেতুঃ।
জাগর্ত্তি সজ্জনসভাসু তথাপি ঘোরং
ত্বৎকল্মষং কৃপণপান্থবধূবধোত্থম্ ॥ ৬॥
ত্বং হি স্বভাবমলিনস্তব নাশ্যমব্জং
ত্বদ্গর্জ্জিতং বিরহিবর্গনিসর্গবৈরি।
কস্ত্বাং স্তুবীত বদ তোয়দ লোকসিদ্ধাং
প্রেক্ষামহে ন যদি জীবনদায়িতাং তে ॥ ৭॥
কান্তাবিয়োগবিষজর্জ্জরপান্থযূনাং
ত্বং জীবনাপহরণব্রতদীক্ষিতোঽসি।
ত্বামামনন্তি ঘন জীবনদায়িনং যৎ
কিং স ভ্রমো ন বদ তৎ স্বয়মেব বুদ্ধ্বা ॥ ৮॥
গর্জ্জন্ ভৃশং তত ইতঃ সততং বৃথা কিং
নো লজ্জসে জলদ পান্থনিতান্তশত্রো।
আস্তে হি নান্যগতিচাতকপোতচঞ্চু—
সম্পূরণোঽপি বত যস্য ন শক্তিযোগঃ ॥৯॥
জীমূত চাতকগণং ননু বঞ্চয়িত্বা
মা মুঞ্চ বারি সরসীসরিদর্ণবেষু।
কং বা গুণং শিরসি সংস্তুতৈতললেপে
তৈলপ্রদানবিধিনা লভতেঽত্র লোকঃ ॥ ১০॥[৪০]

সংস্কৃত কলেজে প্রায় তিনবছর ন্যায়শাস্ত্র পড়েছে ঈশ্বর। আর এরই মধ্যে, খুব সম্ভব, ঈশ্বর কিছুকাল যোগধ্যান মিশ্রের কাছে জ্যোতিষ-শ্রেণীতে পড়েছে।

ঈশ্বর ন্যায়-শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময়েই জগদ্দুর্লভ সিংহের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ল। জগদ্দুর্লভ বাড়ির সদরের সমস্ত ঘর ভাড়া দিয়ে দিলেন তনসুকদাস হিন্দুস্থানীকে। ঈশ্বরদের জায়গা দিলেন অন্দর-মহলে, নিচতলার ঘরে।

ঈশ্বর অসুখে পড়ল।

চিকিৎসকেরা ঠাকুরদাসকে বললেন—নিচের ঘরে থেকে ঈশ্বরের একবার কঠিন অসুখ হয়েছিল, অনেক কষ্টে সেরে উঠেছে। ওরকম ঘরে থাকলে মৃত্যু অনিবার্য। যত তাড়াতাড়ি পারেন, এ-বাড়ি ছেড়ে যান।[৪১]

এসব কারণে বড়বাজারের বাসা ছেড়ে দিতে হল। ঠাকুরদাস বাসা নিলেন বৌবাজারে, পঞ্চাননতলায়, আনন্দচন্দ্র সেনের বাড়িতে। সেখানে প্রায় তিনবছর কেটেছে। তারপর ভাড়া নেওয়া হয়েছে হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানার দুটি ঘর। এবং কিছুকাল পরে সমস্ত বৈঠকখানা, ভাড়া লাগত মাসে আট টাকা।[৪২]

সংস্কৃত কলেজের ছাত্র যখন, তখনই ঈশ্বরের বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ের সময় ঈশ্বরের বয়স বোধ হয় চোদ্দবছর। ঈশ্বরের বৌয়ের নাম দিনময়ী, শ্বশুরের নাম শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য।

শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য ঠাকুরদাসকে বলেছিলেন—বন্দ্যোপাধ্যায়! তোমার টাকা-কড়ি নেই, তোমার ছেলে বিদ্বান হয়েছে, শুধু সেইজন্যই আমার আদরের মেয়ে দিনময়ীকে তোমার ছেলের হাতে দিলাম।[৪৩]

উত্তরকালে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "...বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন :—"আজকাল বিবাহে আর তেমন আমোদ নাই। বরকেও তেমন সঙ্কট পরীক্ষায় আজকাল আর পড়িতে হয় না।" ঈশ্বরচন্দ্রের বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ সে কালের গল্প এক আধটা বলিবার জন্য অনুরোধ করিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন : "এখন আর কি আছে? সে কালে বর বাসর ঘরে প্রবেশ করিতে না করিতে তাকে তার ক'নে খুঁজিয়া লইতে হইত। ছাদ্‌না তলায় দৃষ্টির সময়ে একটী বার চারিচক্ষে দেখা হয় কিনা সন্দেহ, সেই দেখায় বাসর ঘরে আসিয়া ক'নে খুঁজিয়া বাহির করা কিরূপ কঠিন কাজ! আমার বিবাহের সময়ে বাসর ঘরে পা দিতে না দিতে আমাকে বলিল, 'তোমার ক'নে খুঁজিয়া বাহির কর।' ক'নে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে শুনিয়া মহা মুস্কিলে পড়িলাম। গৃহে প্রবেশ করিতে না করিতে আমার উপর ক'নে খুঁজিয়া লইবার হুকুম হইল; আমি দেখিলাম সেই মেয়ের দঙ্গলের ভিতর থেকে আমার সেই অপরিচিতা অর্দ্ধাঙ্গিনীকে খুঁজিয়া বাহির করা আমার কর্ম্ম নয়—আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে আমারই বয়সের বেশ একটী টুকটুকে ফরসা মেয়েকে ধরিয়া বলিলাম, 'এই আমার ক'নে।' যেমন ধরা অমনি এক মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। কে কার ঘাড়ে পড়ে, কে কোথা দিয়া পলাইবে, তার পথ পায় না। আমি যাকে ধরিছি, তাকে খুবই ধরিছি, তার আর পলাইবার উপায় নাই। আমি তার হাত ধরিয়া বলিলাম, 'তুমিই আমার ক'নে তোমাকে হ'লেই আমার ঘর চল্‌বে। আমি আর অন্য ক'নে চাই না।' সে মেয়েটিও বাপরে মারে গেলুমরে বলিয়া চীৎকার করুক। গিন্নীবান্নী গোছ দুই একজন নিকটে

আসিয়া বলিল, 'ও তোমার ক'নে নয়, ওকে ছেড়ে দাও।' আমি বলিলাম, 'ছাড়িব কেন? খুঁজে নিতে বলেছ, আমি খুঁজিয়া এইটীকেই বাহির করিয়াছি এইটী হ'লেই আমার বেশ মনের মত হবে।' তার পর সেই মেয়েটী হাতে পায়ে ধরিয়া বলিল, আচ্ছা আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তোমার ক'নে বা'র ক'রে দিচ্ছি। তখন আপনারাই ক'নে আনিয়া হাজির করিল।" বিবাহ-বাসর সঙ্কটে বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিহাসপ্রিয় আত্মীয় স্বজনের হাতে এইরূপে নিস্তার পাইলেন। আর কেহ বড় তাঁহাকে নাড়া চাড়া দিল না।"[৪৪]*

বিয়ের পর ঈশ্বর একদিন ঠাকুমাকে বলল—এখন নাতির বিয়ে দিলে, নাতবৌ নিয়ে নৃত্যগীত আমোদ-আহ্লাদ করো। কিন্তু, দেখো, যেন ছেঁড়া চ্যাটাই বিছানায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখো না।

ঠাকুমা বললেন—দেখিস, আজ থেকে যে স্বপ্ন দেখব তা সত্য হবে। কত লাখ টাকা তুই পাবি, এ ছেঁড়া চ্যাটাই আর থাকবে না।[৪৫]

১৮৪১ সালের ৪-ডিসেম্বর ঈশ্বর কলকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের সার্টিফিকেট পেল।

তাছাড়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকেরা ঈশ্বরকে দেবনাগর অক্ষরে লেখা আলাদা একখানা প্রশংসাপত্র দিয়েছেন। সেখানা বাঙলা অক্ষরে তুলে দিচ্ছি:

"অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরায় প্রশংসাপত্রং দীয়তে। অসৌ কলিকাতায়াং শ্রীযুক্ত কোম্পানিসংস্থাপিতবিদ্যামন্দিরে ১২ দ্বাদশ বৎসরান্ ৫ পঞ্চ মাসাংশ্চোপস্থায়াধোলিখিতশাস্ত্রাণ্যধীতবান্

ব্যাকরণম্ ... শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মভিঃ
কাব্যশাস্ত্রম্ ... শ্রীজয়গোপাল শর্ম্মভিঃ
অলঙ্কারশাস্ত্রম্ ... শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্ম্মভিঃ
বেদান্তশাস্ত্রম্ ... শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ
ন্যায়শাস্ত্রম্ ... শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মভিঃ
জ্যোতিঃশাস্ত্রম্ ... শ্রীযোগধ্যান শর্ম্মভিঃ
ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ ... শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ

সুশীলতয়োপস্থিতস্যৈতস্যৈতেষু শাস্ত্রেষু সমীচীনা ব্যুৎপত্তিরজনিষ্ট। ১৭৬৩ এতচ্ছকাব্দীয় সৌরমার্গশীর্ষস্য বিংশতিদিবসীয়ম্।

Rassomoy Dutt, Secretary.
10 Decr. 1841."

---

* এই বিবরণের প্রতিবাদ করে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "আমাদের দেশে বিবাহ-রাত্রে বাসর ঘরে কন্যা খোঁজার রীতি নাই এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ রাত্রে কন্যা খুঁজিতে হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিবাহের সময় আমি নীতবর ছিলাম। আমার বেশ মনে আছে, আমাদের দেশে বিবাহের পরদিবস আকাটা পুষ্করে স্নানের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা কন্যাকে লুকাইয়া রাখিয়া বরকে কন্যা খুঁজিতে বলে। বর যত এঘর ওঘর খুঁজিতে থাকে, স্ত্রীলোকেরা তত কৌতুক করিতে থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে তাহাই হইয়াছিল; রীতিবহির্ভূত হয় নাই।...এখনকার ছেলেদের অপেক্ষা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ছেলেদের সলজ্জতা অনেক বেশি ছিল। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় তখনকার ছেলে হইয়া এরূপ ধৃষ্টতা করিবেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।" (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন: ভ্রমনিরাস, পৃ. ৩২)

বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, সংস্কৃত কলেজে লেখাপড়া সাঙ্গ করে নয়, সংস্কৃত কলেজে পড়তে-পড়তেই ঈশ্বরচন্দ্রের নামের শেষে একটি উপাধি দেখা গেছে। সেই উপাধি—বিদ্যাসাগর।*

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, সংস্কৃত কলেজের কেরানী রামধনের পরম স্নেহভাজন ছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে উচ্চপদস্থ কর্মচারী হয়ে এসেছেন, রামধন তখনো সংস্কৃত কলেজের কেরানী, বিদ্যাসাগরকে দেখে রামধন সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াতেন। বিদ্যাসাগর একদিন রামধনকে বললেন—আমি আপনার সেই স্নেহপাত্র আছি, আপনি অমন করে আমাকে লজ্জা দেবেন না।[৪৬]

এখানে একটা দুঃখের কথা আছে। অনেকদিন পরের একটা কথা।

বিদ্যাসাগর তখন বৃদ্ধ। একদিন মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কাছে কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—আমার তো খুব ইচ্ছা ছিল যে পড়াশোনা করি, কিন্তু কই তা হল! সংসারে পড়ে কিছুই সময় পেলাম না।[৪৭]

পড়াশোনা করা হল না বলে বৃদ্ধবয়সে বিদ্যাসাগরের এই অশ্রুসিক্ত আক্ষেপের কোনো তুলনা নেই।

---

* 'বিদ্যাসাগর' উপাধি সম্পর্কে উত্তরকালে রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছেন : "এই উপাধি সংস্কৃত ব্যবসায়ীমাত্রেরই হইতে পারে সত্য, কিন্তু আজি কালি শুদ্ধ "বিদ্যাসাগর" বলিলে—"হরির্যথৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃতো মহেশ্বর স্ত্র্যম্বক এব নাপরঃ" ইত্যাদিবৎ জনসাধারণে কেবল উহাঁকেই (ঈশ্বরচন্দ্র) প্রায় লক্ষ্য করিয়া থাকে।" (রামগতি ন্যায়রত্ন: বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ১৮৬)।

পাঁচ

সংস্কৃত কলেজ থেকে লেখাপড়া সাঙ্গ করে বেরোনোর অল্পদিন পরেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরেস্তাদার পদপ্রার্থী হলেন বিদ্যাসাগর। মার্শাল সাহেব তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি। ১৮৪১ সালের ২৭-ডিসেম্বর মার্শাল সাহেব বাঙলা গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারিকে একখানা চিঠি লিখেছেন, চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি :

"I beg to recommend, for the situation of Bengali Sheristadar, Ishwarchandra Vidyasagar whose acquirements are similar to those of the late Sherishtadar as appears by the undermentioned certificates which he holds, *viz.*:—

1st A certificate from the Government Sanskrit College of very good proficiency in every branch of literature taught at that institution. [Dated 4th December, 1841].

2nd one from the Hindu Law Committee of eminent knowledge of Hindu law and qualification to hold the situation of Law Pandit in any of the court of Judicature, and

3rd one from the Examiners of the College of Fort William of qualification to instruct the students in the Sanskrit and Bengali.

Iswarchandra possesses also a moderate knowledge of English of which he acquired the rudiments in the English class of the Sanskrit College but he was unable conveniently to improve his knowledge after the abolition of that class. He bears a high character for respectability of conduct and for industrious habits."

বিদ্যাসাগর চাকরি পেলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে। ১৮৪১ সালের ২৯-ডিসেম্বর থেকে বিদ্যাসাগর হলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙলা বিভাগের সেরেস্তাদার, কিম্বা বলি, প্রথম পণ্ডিত। পঞ্চাশ টাকা মাইনে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পড়তেন সাহেবেরা। বিলেত থেকে তাঁরা এদেশে বড়ো-বড়ো চাকরি করতে আসতেন। চাকরিতে বহাল হতে হলে তাঁদের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিখতে হত এদেশী ভাষা—যেমন বাঙলা, হিন্দী ইত্যাদি। পরীক্ষা দিতে হত তাঁদের এদেশী ভাষায়। পরীক্ষায় পাশ না করতে পারলে বিলেতের ছেলেকে আবার বিলেতে ফিরে যেতে হত।

মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরকে ভালো করে ইংরেজি আর হিন্দী শেখার পরামর্শ দিলেন।

ভালো পরামর্শ।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরি করতে-করতে বিদ্যাসাগর ভালোরকম ইংরেজি শিখেছেন, হিন্দী শিখেছেন। হিন্দী শিখিয়েছেন একজন হিন্দুস্থানী

পণ্ডিত। সংস্কৃতের চর্চা তো আছেই। দিনের পর দিন বিদ্যাসাগর উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে ইংরেজি শিখেছেন। প্রথমে কিছুদিন বিদ্যাসাগরকে ইংরেজি শিখিয়েছেন দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর ইংরেজি শিখিয়েছেন নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ গুপ্ত।

পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর আরো কারো-কারো কাছে ইংরেজি শিখেছেন।

১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন তখনও দেখা গেছে বিদ্যাসাগর ভালোভাবে ইংরেজি শেখায় আগ্রহী। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "(বিদ্যাসাগর) ভালরূপ ইংরাজী ভাষা শিক্ষার জন্য প্রত্যহ প্রাতে বহুবাজারের পঞ্চাননতলাস্থ বাসা ভবন হইতে, সভাবাজারস্থ রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে রাজার জামাতা বাবু অমৃতলাল মিত্র ও অপর জামাতা বাবু শ্রীনাথচন্দ্র বসুর নিকট যাইতেন। একাগ্রচিত্ত হইয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে ইংরাজী ভাষার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েন।"[১]

বিহারীলাল সরকার লিখেছেন: "বিদ্যাসাগর মহাশয়...আনন্দকৃষ্ণ (বসু) বাবুর নিকট সেক্সপীয়র পড়িতেন। সেক্সপীয়র পড়িবার জন্য প্রায়ই তিনি শোভাবাজার রাজবাটীতে যাতায়াত করিতেন।"[২]

রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন: "ইংরাজী ১৮৪৯ সালের মে মাসে সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় ইংরাজী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হই।...আমি কেবল সংস্কৃত কলেজের বালকদিগকে ইংরাজী শিখাইতাম এমত নহে। অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আমার নিকট অল্প-বিস্তর ইংরাজী পড়িয়াছিলেন। মহামান্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব সংস্কৃত অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন।"[৩]

বিদ্যাসাগরের কাজকর্ম দেখে মার্শাল সাহেব খুব খুশি।

কিন্তু এক ব্যাপারে বিদ্যাসাগর বড়ো নির্দয়। পরীক্ষার ব্যাপারে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পরীক্ষায় যাঁরা পাশ করতে না পারেন, তাঁদের সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে বিলেতে ফিরে যেতে হয়। তাই মার্শাল সাহেব একদিন বিদ্যাসাগরকে পরীক্ষার আঁটাআঁটি ভাবটা একটু কম করতে বললেন।

অর্থাৎ যাঁদের পাশ করার যোগ্যতা নেই তাঁদেরও পাশ করিয়ে দিতে হবে। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে দিয়ে তা হবার নয়। বিদ্যাসাগর মার্শাল সাহেবকে বললেন—ওটি আমাকে দিয়ে হবে না। বরং চাকরি ছেড়ে দেব, তবু অন্যায়ের প্রশ্রয় দেব না।

উত্তরকালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন: "বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিবিলিয়নদিগকে বাঙ্গালা পড়াইতেন, তখন তাঁহাকে 'বিদ্যাসুন্দর' পড়াইতে হইতে। 'বিদ্যাসুন্দরের' খেউড় অংশ পড়াইবার সময় তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিতভাব প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু এক এক জন য়ুরোপীয় তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন, 'কেন তুমি কাতুমাতু করিতেছ? আমাদের ভাষাতে কি সেক্সপীয়রের Venus and Adonis, Rape of Lucrece, এবং পোপের January and May, এই সকল বহি নাই? আর আমরা কি ঐ সকল বহি আদবে পড়ি না; শিকায় তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছি? অতএব ইহাতে আর লজ্জার বিষয় কি?' "[৪]

১৮৪২ সালে রবর্ট কষ্ট নামে একজন সিভিলিয়ান ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পড়তেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তিনি মাঝে-মাঝে নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলতেন। রবর্ট কষ্ট চমৎকার মানুষ; তাঁর সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশি হতেন বিদ্যাসাগর।

একদিন তিনি বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করলেন—আমার বিষয়ে সংস্কৃত-ভাষায় শ্লোক রচনা করে দিলে আমি খুব খুশি হই।

রবর্ট কষ্টকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বললেন বিদ্যাসাগর। তারপর তাঁকে দুটি শ্লোক লিখে দিলেন :

"শ্রীমান্ রবর্ট কষ্টোঽদ্য বিদ্যালয়মুপাগতঃ।
সৌজন্যপূর্ণৈরালাপৈর্ণিতরাং মামতোষয়ৎ॥ ১॥
স হি সদ্‌গুণসম্পন্নঃ সদাচাররতঃ সদা।
প্রসন্নবদনো নিত্যং জীবত্বব্দশতং সুখী॥ ২॥"[৫]

শ্লোক নিয়ে খুশি হয়ে চলে গেলেন রবর্ট কষ্ট।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "কষ্ট সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া অগ্রজ মহাশয়কে ২০০৲ শত টাকা দিতে মানস করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা না লইয়া সাহেবকে উপদেশ দেন যে, এই টাকা কলেজে জমা করিয়া দেন, সংস্কৃত কলেজের যে ছাত্র সংস্কৃত রচনায় ভাল পরীক্ষা দিবেন তিনি ৫০৲ টাকা পারিতোষিক পাইবেন। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে বৎসর বৎসর পরীক্ষায় একজন করিয়া ছাত্র কবিতা রচনার পুরস্কার ৫০৲ টাকা পাইবেন। কষ্ট সাহেবের পুরস্কার সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা চারি বৎসর পাইয়াছিলেন, তৎকালে এই পুরস্কারকে কষ্ট সাহেবের পুরস্কার বলিত। কষ্ট সাহেব অগ্রজকে নির্লোভ ও উদারহৃদয় দেখিয়া যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কষ্ট সাহেবের পুরস্কার প্রাপ্তির পরীক্ষায়, অগ্রজ প্রথম বৎসর এই প্রশ্ন দেন যে, বিদ্যা, বুদ্ধি, সুশীলতা এই তিনের গুণবর্ণনা সংস্কৃত গদ্যে লিখ ও এই গুণত্রয়ের মধ্যে কে প্রধান তাহাও সংস্কৃত গদ্যে লিখ। তৎকালে ঐ পরীক্ষা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সমাধা হইত। সংস্কৃত কলেজে সিনিয়র ছাত্রবর্গের মধ্যে নীলমাধব ভট্টাচার্য্য সর্বাপেক্ষা উত্তম রচনা করিয়াছিলেন সুতরাং তিনিই ঐ কষ্ট সাহেবের ৫০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় বৎসরে সংস্কৃত পদ্য লিখিবার প্রশ্ন হয়, তাহাতে দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই দুইজন সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হন। শ্রীশের ব্যাকরণ ভুল হইয়াছিল, কিন্তু দীনবন্ধুর ব্যাকরণ ভুল হয় নাই। দীনবন্ধু সহোদর, এজন্য লোকে যদি দুর্নাম করে, এই আশঙ্কায় শ্রীশকেই ঐ পারিতোষিক প্রদান করিতে বাধ্য হন।"[৬]

পরীক্ষায় পাশ করে রবর্ট কষ্ট পঞ্জাব অঞ্চলে নিযুক্ত হয়েছেন। বহুবছর কাজ করেছেন, তারপর স্বদেশে ফিরে যাবার পালা। যাবার আগে একদিন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বললেন—আমি স্বদেশে যাচ্ছি, আর এ দেশে আসব না; সুতরাং তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর রবর্ট কষ্ট বিদ্যাসাগরকে বললেন—যদি তোমার, আগের মতো, শ্লোকরচনার অভ্যাস থাকে, তাহলে, আমার বিষয়ে, কাল কয়েকটি শ্লোক পাঠালে, আমি খুব খুশি হব।

বিদ্যাসাগর পাঁচটি শ্লোক লিখে রবর্ট কষ্টকে পাঠিয়ে দিয়েছেন :

"দোষৈর্বিনাকৃতঃ সৰ্ব্বৈঃ সৰ্ব্বৈরাসেবিতো গুণৈঃ।
কৃতী সর্ব্বাসু বিদ্যাসু জীয়াৎ কষ্টো মহামতিঃ॥ ১॥
দয়াদাক্ষিণ্যমাধুর্য্যগাম্ভীর্য্যপ্রমুখা গুণাঃ।
নয়বর্ত্মরতে নূনং রমন্তেঽস্মিন্ নিরন্তরম্॥ ২॥
সদা সদালাপরতের্নিত্যং সৎপথবর্ত্তিনঃ।
সর্ব্বলোকপ্রিয়স্যাস্য সম্পদস্তু সদা স্থিরা॥ ৩॥
অস্য প্রশান্তচিত্তস্য সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ।
সৰ্ব্বধর্ম্মপ্রবীণস্য কীর্ত্তিরায়ুশ্চ বৰ্দ্ধতাম্॥ ৪॥
বিদ্যাবিবেকবিনয়াদিগুণৈরুদারৈ-
র্নিঃশেষলোকপরিতোষকরশ্চিরায়।
দূরং নিরস্তখলদুর্ব্বচনাবকাশঃ
শ্রীমান্ সদা বিজয়তাং ননু রবর্ট কষ্টঃ॥ ৫॥"[৭]

ঠাকুরদাস বিদ্যাসাগরের কথায় চাকরি ছেড়ে দিলেন। প্রথমে চাকরি ছাড়তে রাজি হননি ঠাকুরদাস, কিন্তু বিদ্যাসাগর বারংবার এমনভাবে বলতে লাগলেন যে শেষপর্যন্ত আর রাজি না হয়ে উপায় রইল না।

মনিব ঠাকুরদাসকে বললেন—ছেলেমানুষের কথায় চাকরি ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। ওই ছেলে যদি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে তোমাকে সাহায্য না করে তখন কি আবার চাকরি করতে আসবে?

ঠাকুরদাস মনিবকে বললেন—আমার পুত্র সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠিরের মতো ধর্ম-শীল, আমাকে দেবতার মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করে, তার কথা অবহেলা করতে পারব না। যদি তাকে অধার্মিক ও দুশ্চরিত্র জানতাম, তাহলে কখনই চাকরি ছাড়তাম না।

বিদ্যাসাগর ঠাকুরদাসকে মাসে-মাসে দরকারমতো টাকা পাঠিয়ে দিতেন। তারপর বাকি টাকায় কলকাতার বাসা-খরচ চালাতেন। কলকাতার বাসায় লোকসংখ্যা তখন নিতান্ত অল্প নয়, অন্ততপক্ষে ন-জনের অধিক।[৮] আর-সকলের সঙ্গে বিদ্যাসাগরকেও বাসায় পালা করে রান্নাবান্নার কাজ করতে হত।

[চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "যে সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মান সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল, সেই সময়ে তাঁহার তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার জননী তাঁহাকে বাটী যাইতে আদেশ করিয়া পাঠান। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবের নিকট ছুটি চাহিলেন। কিন্তু সে সময়ে এত বেশী কাজ যে, বিশৃঙ্খলাভয়ে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বিদায় দিতে সম্মত হইলেন না। সুতরাং তাঁহার আর বাটী যাওয়া হইল না। কলিকাতার বাসার সকলেই চলিয়া গিয়াছেন, কেবল তিনিই আছেন। সহোদরের বিবাহ, জননী গৃহে যাইতে বলিয়াছেন, তিনি ছুটী পাইলেন না, জননীর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে না পারিয়া মনে দারুণ ক্লেশের সঞ্চার হইল। বর্ষার ঘন মেঘাচ্ছন্ন রজনীর অন্ধকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়াকাশও গভীর বিষাদ-মেঘে আবৃত হইল। অন্তর্দাহ ও উৎকণ্ঠা তাঁহাকে বড়ই অধীর করিয়া

তুলিল। তিনি অনিদ্রায় বহু কষ্টে রাত্রি যাপন করিয়া শেষে প্রাতে মার্শেল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "আমার মা আমাকে বাড়ী যাইতে বলিয়াছিলেন, আমাকে বাড়ী যাইতেই হইবে। যদি বিদায় না দেন, আমি কর্ম পরিত্যাগ করিলাম, মঞ্জুর করুন, আমি বাড়ী যাইব।" সাহেব মাতৃভক্তির এই স্বর্গীয় দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমাকে কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে না, আমি বিদায় দিতেছি, তুমি বাড়ী যাও।" তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় হৃষ্টচিত্তে বাসায় আসিয়া আহারাদির আয়োজন করিলেন। আহারের পর ভৃত্য শ্রীরামকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। সে সময়ে প্রবল বর্ষাসমাগমে পথ অতি দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে, বহুকষ্টে এক এক পা অগ্রসর হইতে হইতেছে, এইরূপ ক্লেশে কতকদূর অগ্রসর হইয়া সেদিন তারকেশ্বরের নিকট রাত্রি যাপন করিতে হইল। পর দিন শ্রীরামকে পথ চলিতে অসমর্থ দেখিয়া পথে ফলার করাইয়া ও কিছু পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। শ্রীরামের বাড়ী সেখান হইতে নিকটে, সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রভুর আদেশমত বাড়ী গেল। ঈশ্বরচন্দ্রকে সে দিন যে কোন উপায়ে হউক বাটী পৌঁছিতেই হইবে। সেই দিন বিবাহ। তিনি জানিতেন, তিনি বাড়ী না গেলে, জননীর আর দুঃখের সীমা থাকিবে না। এই ভাবনার তাড়নায় তিনি ত্বরিতগমনে পথ চলিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই ভীষণ কলেবর দামোদর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দামোদরে বর্ষার ঢল নামিয়াছে, একগাছি তৃণ পড়িলে শত খণ্ড হইয়া যায়। দুকূল ভাসাইয়া, প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া, জলরাশি নৃত্য করিতে করিতে তীরবেগে ছুটিয়াছে। পারের নৌকা পরপারে, নৌকা আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলে, সে দিন আর গৃহে যাওয়া হয় না। কেবল পার হওয়া হইবে মাত্র, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর কি করিলেন, পাঠক! শুনিতে চাও, ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে, ভয়ে হাত পা পেটের ভিতর প্রবেশ করে, উপন্যাসে, কবিকল্পনায় এরূপ ঘটনার অবতারণা সম্ভব হয়, কিন্তু সত্য সত্যই যে মানুষ এরূপ করিতে পারে, তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় আবদারে মায়ের আদেশ পালনের জন্য বর্ষার ভরা দামোদরের জলোচ্ছ্বাসে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। যাহারা পারে যাইবে বলিয়া বসিয়াছিল, তাহারা অনেকে নিষেধ করিল, কেহ কেহ বাধাও দিল, কিন্তু মাতৃআজ্ঞা পালনে বদ্ধপরিকর ঈশ্বরচন্দ্র কোন বাধাই মানিলেন না। সবলদেহ বীরপুরুষ দামোদরের তরঙ্গসংগ্রামে জয়ী হইয়া পর পারে উঠিলেন। যাহারা তাঁহার আয়োজন দেখিয়া তাঁহাকে বাতুল বলিয়া মনে করিতেছিল, যাঁহারা শমন-দমন সন্নিকট ভাবিয়া আকুল হইয়া ছিল, তাহারা তাঁহার সাহস ও শক্তি সামর্থ্য দেখিয়া বিস্মিত হইল ও শতপ্রকারে তাঁহার সাধুবাদ করিতে লাগিল। পথে, পাতুলে জননীর মাতুলালয়ে মধ্যাহ্ন-ক্রিয়া সমাপন করিয়া আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। অপরাহ্নে দারকেশ্বর নদও পূর্ববৎ পার হইয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে মাঠের মধ্যে সন্ধ্যা হইল। যেখানে সন্ধ্যা হইল, সেখানে আবার দস্যুভয়। সুবিধামত কোন পথিককে একাকী পাইলে প্রায় গৃহে ফিরিতে দেয় না। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার ইষ্টদেবতা মাতৃপদ স্মরণ করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রায় প্রহরার্দ্ধ রাত্রি অতীত হইয়াছে, এমন সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় গৃহে পৌঁছিলেন। সেই সিক্ত বস্ত্রে ও ক্লান্ত শরীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া "মা—মা, আমি আসিয়াছি" বলিয়া মাকে ডাকিতে লাগিলেন।" (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৮৬-৮৮।)

বিদ্যাসাগরের বর্ষার ভরা দামোদর সাঁতার কেটে পার হওয়ার কথা চণ্ডীচরণের আগে আর-কেউ লেখেননি। চণ্ডীচরণের পরে অবশ্য অনেকেই লিখেছেন।

১৮৪১ সালের ২৯-ডিসেম্বর থেকে ১৮৪৬ সালের ৩-এপ্রিল পর্যন্ত বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার ছিলেন; চণ্ডীচরণের কথামতো এই সময়ের মধ্যেই বিদ্যাসাগর একদিন (সেজোভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহের দিন) বর্ষার ভীষণ দামোদর সাঁতার কেটে পার হয়েছিলেন।

অথচ স্বয়ং শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রতিবাদ করে লিখেছেন :

"চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ তারকেশ্বরের নিকট দিয়া আমাদের বাটী যাইবার পথ নহে, বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল একবার অতি শৈশবকালে পিতার সহিত কলিকাতায় আসিবার সময় তারকেশ্বরের নিকট রামনগর গ্রামে পিসীবাটী বলিয়া ঐ দিক দিয়া আসিয়াছিলেন।

চণ্ডীবাবু কিছুই না জানিয়া লিখিয়াছেন। ৫৭ বা ৫৮ বৎসর পূর্বে যখন আমরা কলিকাতায় অধ্যয়নার্থ গতিবিধি করিতাম, তখন এখনকার মত তারকেশ্বর রেলওয়ে হয় নাই; ঘাঁটাল দিয়া যাইবার স্টীমার ছিল না; এখনকার মত নৌকায় গতিবিধিও ছিল না। তৎকালে আমরা কলিকাতা হইতে পদব্রজে বাটী যাইতাম। হাটখোলার ঘাটে পার হইয়া শালিখার বাঁধারাস্তায় মোসাট নামক গ্রাম পর্য্যন্ত যাইয়া, ঐ বাঁধা রাস্তা ত্যাগ করিয়া মাঠের পথে বরাবর পশ্চিম মুখে রাজবলহাট নামক গ্রামে উপস্থিত হইতাম। পরে দামোদর পার হইয়া প্রায় ৫ ক্রোশ পথ যাইলে পর পাতুল নামক গ্রামে উপস্থিত হইতাম। তথা হইতে বীরসিংহা ৬ বা ৭ ক্রোশ পশ্চিম।

কয়েক মাস অতীত হইল, চণ্ডীবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণবাবুর সহিত স্টীমারে রাণীচক নামক স্থানে যান, তথা হইতে নৌকা করিয়া ঘাঁটাল গমন করেন এবং তথা হইতে ৩ ক্রোশ অন্তর বীরসিংহায় পোঁহুছেন। চণ্ডীবাবু শালিখার পথে কখনও ঐ দেশ পদব্রজে গমন করিলে ওরূপ লিখিতেন না।

দ্বিতীয়তঃ এক অসম্ভব কথা এই লিখিয়াছেন যে, "তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় হৃষ্টচিত্তে বাসায় আসিয়া আহারাদির আয়োজন করিলেন। আহারের পর ভৃত্য শ্রীরামকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন।"

কলিকাতা বহুবাজার হইতে প্রায় ১৭।১৮ ক্রোশ পথ অন্তরে তারকেশ্বর। বর্ষাকালে আফিসের ফেরত অপরাহ্ণে সতের-আঠার ক্রোশ পথ কেহ যাইতে পারে?

প্রকৃত কথা এই যে সাহেবের নিকট বিদায় লইয়া ৪টার পর কলিকাতা হইতে জনাই গ্রামের নিকট চণ্ডীতলা নামক গ্রামে সরাইতে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন।...

চণ্ডীবাবু বর্ষাকালে ভরা দামোদর সাঁতরাইয়া পার হওয়ার কথা যে লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। বোধ করি, চণ্ডীবাবু বর্ষাকালে রাজবল-হাট গ্রামের সন্নিকটে দামোদর নদের অতি ভীষণমূর্ত্তি কখনও স্বচক্ষে দেখেন নাই; তজ্জন্যই এরূপ অসম্ভব কথা লিখিয়াছেন। এরূপ মিথ্যা ও অসঙ্গত কথা লিখিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করার আবশ্যক কি? বন্যার সময় দামোদরের এত জল বৃদ্ধি হয় যে, ঐ নদের পশ্চিম প্রায় চারি ক্রোশ পর্য্যন্ত

মাঠ জলমগ্ন থাকে।...

...শ্রীরামের বাটী সেখান হইতে নিকট নহে, তাহার বাটী পাতুল গ্রাম, পাতুল দামোদর পার হইয়া প্রায় ৫ ক্রোশ যাইতে হইবে। প্রকৃত কথা, শ্রীরাম পাতুল পর্যন্ত একত্র গিয়াছিল, সেদিন নিজ বাটী পাতুল গ্রামে রহিল। বিদ্যাসাগর তথা হইতে একা বাটী গেলেন।" (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস, পৃ. ১৬—১৯)

এই প্রতিবাদের উত্তরে চণ্ডীচরণ লিখেছেন : "সেকালের দামোদরে আর একালের দামোদরে অনেক প্রভেদ। ১৮৫৬ খৃঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে খোলা হইলে পর, সহসা দামোদরের অত্যধিক জল বৃদ্ধির আশঙ্কাজনিত বিপদ নিবারণের জন্য পূর্ব্ব পারে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। সেইজন্য পশ্চিম পারে ৪।৫ ক্রোশ ভাসিয়া যায়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বন্যার জল দৈবাৎ নদের কূল অতিক্রম করিত। আমার বর্ণিত ঘটনা রেলওয়ে হইবার অনেক পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।" (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৯১)

'১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বন্যার জল দৈবাৎ নদের কূল অতিক্রম করিত' —চণ্ডীচরণের এ-উক্তি সম্পূর্ণ অসত্য। ১৮৫৬ সালের আগেও বন্যার জল দামোদরের কূল অতিক্রম করত, এবং সে-ঘটনা নিতান্ত দৈবাৎ নয়। ১৮৫৬ সালের আগে থেকেই দামোদরের দক্ষিণ পাড়ে বাঁধ ছিল। ১৮৫৯ সাল থেকে দামোদরের বাঁ-পাড়ে বাঁধ দেবার কাজ আরম্ভ হয়। কিন্তু বাঁধের সঙ্গে রেলওয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। ১৮৫২ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে দামোদরের বন্যা ও বাঁধ সম্পর্কে রীতিমতো সরকারী অনুসন্ধান। প্রমাণের জন্য দ্রষ্টব্য : Selections from the records of the Bengal Govt. containing papers from 23rd January 1852 to 18th May, 1863 relating to the Damodar floods and embankments, Vol. I, Calcutta, 1916.

১৮৪০ সালে দামোদরের যে বন্যা হয় তাতে হুগলী জেলায়— 'a discharge of about 6 lakhs cubic feet per second was recorded.'

১৮৫৬ সালে প্রকাশিত Beadle সাহেবের মানচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে দামোদর গড়ে আধমাইল চওড়া, তীরভূমি গড়ে দশ ফুট উঁচু, 'the floods rise from 14 to 16 feet above the level of dry weather stream.'

১৮৬৫ সালে দামোদরের বদলে মুণ্ডেশ্বরী নদী মুখ্যপ্রবাহমুখ হওয়ার ফলে দামোদরের চরিত্র অনেক শান্ত হয়ে যায়। তার আগে অন্ততপক্ষে শ-খানেক বছরের মধ্যে দামোদরের চরিত্রে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এবং সেই চরিত্রের পরিচয় আছে Beadle সাহেবের ম্যাপে।

চণ্ডীচরণের উত্তর একেবারেই সন্তোষজনক নয়। এখানে স্বীকার করা উচিত, শম্ভুচন্দ্রের কোনো-কোনো প্রতিবাদের চণ্ডীচরণ সদুত্তর দিয়েছেন। কিন্তু আলোচ্য প্রতিবাদের উত্তর দেখে হতাশ হতে হয়।

চণ্ডীচরণ প্রত্যক্ষদর্শী নন; বিদ্যাসাগর বর্ষার ভরা দামোদর সাঁতার কেটে পার হয়েছেন একথা চণ্ডীচরণ নিশ্চয় কারো কাছে শুনেছেন। কিন্তু কার কাছে শুনেছেন? যাঁর কাছে শুনেছেন চণ্ডীচরণ তাঁর নামোল্লেখ করলে বিচার করে দেখা যেত সেকথা বিশ্বাসযোগ্য কিনা। শম্ভুচন্দ্রের একাধিক প্রতিবাদের

উত্তরে চণ্ডীচরণ উপযুক্ত ব্যক্তির নামোল্লেখ করে সংশয় দূর করেছেন, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে চণ্ডীচরণ সেরকম কিছু করেননি।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়, বিদ্যাসাগর বর্ষার ভরা দামোদর সাঁতার কেটে পার হয়েছেন একথা চণ্ডীচরণ কার কাছে শুনেছেন? চণ্ডীচরণের কথামতো 'বিদ্যাসাগর' রচনায় বিদ্যাসাগরের দু'জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় চণ্ডীচরণকে সাহায্য করেছেন—নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। প্রথম সংস্করণ 'বিদ্যাসাগরে'র ভূমিকায় চণ্ডীচরণ লিখেছেন: "তিনি (নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন) যেরূপ আগ্রহ ও আকিঞ্চনের সহিত তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের জীবনী-বিষয়ক উপকরণাদির দ্বারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন...।" (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: বিদ্যাসাগর, পৃ. ৵০) তাহলে কি নারায়ণচন্দ্রের কাছেই শুনেছেন?

নারায়ণচন্দ্রের জন্ম হয়েছে বাঙলা ১২৫৬ সনের ৩০-কার্তিক। অর্থাৎ শম্ভুচন্দ্রের বিবাহের অনেক পরে। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন: "অগ্রজ মহাশয়ের প্রায় ৩০ বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র নারায়ণবাবু বীরসিংহে ভূমিষ্ঠ হয়েন। ভূমিষ্ঠ কালাবধি প্রায় ষোড়ষবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বীরসিংহ বিদ্যালয়েই বিদ্যাভ্যাস করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কালেজে বিদ্যাভ্যাসের জন্য প্রবেশ করেন, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই বিশেষ কারণে কালেজ ছাড়িয়া আবার বীরসিংহে গমন করেন। পিতা পুত্রে তাদৃশ সদ্ভাব না থাকায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শেষ জীবনের ও যাবদীয় ঘটনা নারায়ণবাবুকে পরমুখেই অবগত হইতে হইয়াছে।...চণ্ডীবাবুকে নারায়ণবাবু বিশেষ সাহায্য করিলেও চণ্ডীবাবুর ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা নিরাকৃত হয় নাই।" (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন: ভ্রমনিরাস, 'বিজ্ঞাপন', পৃ. ৵০)

এই অবস্থায়, অন্য সাক্ষী-প্রমাণের অভাবে, নারায়ণচন্দ্র বললেও শম্ভুচন্দ্রের উক্তিই মেনে নিতে হয়।

প্রথম সংস্করণ 'বিদ্যাসাগরে'র ভূমিকায় চণ্ডীচরণ লিখেছেন: "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র 'সাহিত্য'-সম্পাদক আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি গ্রন্থের সূচনা হইতে শেষ পর্য্যন্ত নানাবিধ পরামর্শ দ্বারা এবং বিশেষভাবে পারিবারিক জীবনীবিষয়ক উপকরণাদির দ্বারা বিবিধ প্রকারে সহায়তা করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।" (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: বিদ্যাসাগর, পৃ. ৶০)

তাহলে চণ্ডীচরণ কি সুরেশচন্দ্রের কাছেই শুনেছেন?

না। না।

শম্ভুচন্দ্রের 'ভ্রমনিরাস' প্রকাশিত হবার পর ক্ষীরোদচন্দ্র রায় 'বিদ্যাসাগর' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন: "বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল সরকার উভয়েই বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তের অনেক ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন। পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র, বাবু নারায়ণচন্দ্র ও বাবু সুরেশচন্দ্রের নিকট ইঁহারা সকলেই যথেষ্ট উপকার লাভ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র ভ্রমনিরাস নামক গ্রন্থে যে মৎসরতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েরা তাঁহাকে বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন। বিদ্যাসাগর জীবিত থাকিলে অন্যান্য ব্যবহারের ন্যায় ভ্রাতার ভ্রমনিরাস ব্যবহারে সন্তাপিত হইতেন। এরূপ বৃহৎগ্রন্থ লিখিতে চণ্ডীবাবু কয়েকটি সামান্য ভ্রমে পতিত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা দুঃখিত

হই নাই; সুখী হইয়াছি যে, ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক ভ্রম তাঁহার ঘটে নাই।" ('নব্যভারত', মাঘ, ১৩০২, পৃ. ৫৩১-৩২)।

তদুত্তরে স্বয়ং সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন: "...শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের 'বিদ্যাসাগর'। উক্ত প্রবন্ধের এক স্থলে লেখক বলিতেছেন,—"পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র, বাবু নারায়ণচন্দ্র ও বাবু সুরেশচন্দ্রের নিকট ইঁহারা সকলেই যথেষ্ট উপকার লাভ করিয়াছেন।" আমি বিদ্যাসাগরের জীবনীলেখকদের বিশেষ কোনও উপকার করিতে পারি নাই। বিদ্যাসাগরের একজন জীবনচরিত-লেখক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রণীত জীবনচরিতের ভূমিকায় আমার নাম দেখিয়া আমি বিস্মিত হই, এবং চণ্ডীবাবুকে আমার নাম তুলিয়া দিতে বলি। চণ্ডীবাবু আমার সাক্ষাতে এ বিষয়ে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু দেখিতেছি, এ পর্য্যন্ত তিনি আমার অনুরোধ পালন করেন নাই। মান্যবর ক্ষীরোদবাবুর প্রস্তাবে ইহার পুনরুল্লেখ দেখিয়া আত্মরক্ষার্থ আমায় প্রকাশ্যভাবে ইহার প্রতিবাদ করিতে হইল। ক্ষীরোদবাবু ইহার পরেই বলিতেছেন,—"দুঃখের বিষয়, পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র ভ্রমনিরাস নামক গ্রন্থে যে মৎসরতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তাহাকে বিদ্যা-সাগরের ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন।" কথাটা বড় কঠিন,—"ভ্রমনিরাস" লিখিয়াই কি শম্ভুচন্দ্র পতিত হইলেন? ভ্রমনিরাসের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আমার এক বর্ণও বক্তব্য নাই,—প্রতিবাদ সত্য হউক, মিথ্যা হউক,—প্রমাণ দেখিয়া সাধারণে তাহার বিচার করিবেন।—কিন্তু প্রতিবাদ করিয়া তিনি "মৎসরতার" পরিচয় দিয়াছেন,—এবং এই পাপে সরাসরি বিচারে বিদ্যাসাগরের সহিত সম্বন্ধসূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন ও বঞ্চিত হইবেন, ইহা কাজির বিচারের অপেক্ষাও অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়। মৎসরতা শব্দের অর্থ,—'অন্যশুভদ্বেষ'। ক্ষীরোদবাবু যদি এই অর্থে মৎসরতা শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার বন্ধু চণ্ডীবাবুর উপকারার্থ শম্ভুচন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত অন্যায় ও অবিচার করিয়াছেন। চণ্ডীবাবু পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্রের গ্রন্থ হইতে অনেক উপকরণ আহরণ করিয়াছেন; শম্ভুচন্দ্র তাহার নিবারণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি চণ্ডীবাবুর শুভকামনায় তাঁহার উপকরণ-রক্ষায় প্রবৃত্ত হন নাই,—ইহাতে বরং তাঁহার অন্যশুভাকাঙ্ক্ষার প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া যায়। ভ্রান্ত হউক বা অভ্রান্ত হউক, একজন যাহা সত্য বলিয়া জানেন, তাহা প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হইয়া যদি মৎসরতা-পরবশ বলিয়া পরিচিত হন, তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?" ('সাহিত্য', চৈত্র, ১৩০২, পৃ. ৮৩৩-৩৪)।

স্পষ্ট জানা যাচ্ছে, সুরেশচন্দ্রের মুখে চণ্ডীচরণ ওকথা শোনেননি। সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ, অন্তত আলোচ্য বিষয়ে, চণ্ডীচরণের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। এ-অবস্থায় শম্ভুচন্দ্রের উক্তিই অবশ্যমান্য। শম্ভুচন্দ্রের বিবাহের দিন বিদ্যাসাগর বর্ষার ভরা দামোদর সাঁতার কেটে পার হননি। ওকথা চণ্ডীচরণের রটনা।

কিন্তু সমস্ত রটনার মূলেই কিছু-না-কিছু ঘটনা থাকে। হয়তো চণ্ডী-চরণের এই রটনার মূলেও আছে। তা এরকম একটা গল্প আছে বটে। দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী লিখেছেন: "জেঠা মহাশয় (প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী) ও বিদ্যাসাগর মহাশয় হাঁটিয়া এই পথে কখনও কখনও কলিকাতা হইতে রাধানগরে যাইতেন; রাত্রে বামুনপাড়ায় থাকিতেন। গল্প শুনিয়াছি—একবার ঘাটে নৌকা না পাওয়ায় তাঁহারা সাঁতরাইয়া দামোদর পার হইয়াছিলেন।"

(দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী : স্মৃতি-রেখা, পৃ. ৫৩)

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর শোনা গল্প সত্য হলেও হতে পারে। কিন্তু তাহলেও চণ্ডীচরণের বিবরণ সত্য হয়ে ওঠে না। সত্য না হলেও চণ্ডীচরণের এই বিবরণ বাঙলাদেশে বহুল প্রচারিত। এবং সেই প্রচারের সমস্ত কৃতিত্ব অথবা অকৃতিত্ব চণ্ডীচরণের।

শম্ভুচন্দ্রের ভাষা কেড়ে এনে বলতে ইচ্ছা করে : ধন্য রে দেশ! ধন্য রে মিথ্যার প্রভাব! ধন্য চণ্ডীবাবু!]

১৮৪১ সালের ২৯-ডিসেম্বর থেকে ১৮৪৬ সালের ৩-এপ্রিল পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরেস্তাদারের কাজ করেছেন বিদ্যাসাগর। যতদূর জানা যায়, এই সময়ের মধ্যেই তিনি 'বাসুদেব চরিত' নামে একখানা বই লিখেছেন। 'বাসুদেব চরিত' বিদ্যাসাগরের লেখা প্রথম বাঙলা বই।

'বাসুদেব চরিত' থেকে কয়েকটি অংশ তুলে দিচ্ছি :

"এক দিবস দেবর্ষি নারদ মথুরায় আসিয়া কংসকে কহিলেন, মহারাজ। তুমি নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, কোনও বিষয়ের অনুসন্ধান কর না; এই যাবৎ গোপী ও যাদব দেখিতেছ, ইহারা দেবতা, দৈত্যবধের নিমিত্ত ভূমণ্ডলে জন্ম লইয়াছে এবং শুনিয়াছি, দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া নারায়ণ তোমার প্রাণসংহার করিবেন, এবং তোমার পিতা উগ্রসেন এবং অন্যান্য জ্ঞাতিবান্ধবেরা তোমার পক্ষ ও হিতাকাঙ্ক্ষী নহেন; অতএব, মহারাজ! অতঃপর সাবধান হও, অদ্যাপি সময় অতীত হয় নাই, প্রতিকার চিন্তা কর। এই বলিয়া দেবর্ষি প্রস্থান করিলেন। কংস শুনিয়া অতিশয় কুপিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সপুত্র বসুদেব-দেবকীকে আনাইয়া তাঁহাদিগের সমক্ষে পুত্রের প্রাণনাশ করিল এবং তাঁহাদিগকে কারাগারে নিগড় বন্ধনে রাখিল। অনন্তর নিজ পিতা উগ্রসেনকে দূরীকৃত করিয়া স্বয়ং রাজ্যশাসন ও প্রজা পালন করিতে লাগিল এবং প্রলম্ব, বক, চামুর, তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি দুর্বৃত্ত সৈন্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যদুবংশীয়দের উপরি নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল। তাহারা প্রাণভয়ে পলাইয়া কুরু, কেকয়, শাল্ব, পাঞ্চাল, বিদর্ভ, নিষধ আদি নানাদেশে প্রচ্ছন্নবেশে বাস করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কংসের শরণাপন্ন ও মতানুযায়ী হইয়া মথুরাতে অবস্থান করিলেন।"[৯]

"অনন্তর অষ্টম মাস পূর্ণ হইলে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্র সময়ে ভগবান্ ত্রিলোকনাথ দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন। তৎকালে দিক্ সকল প্রসন্ন হইল, গগনমণ্ডলে নির্ম্মল নক্ষত্রমণ্ডল উদিত হইল, গ্রামে নগরে নানা মঙ্গল-বাদ্য হইতে লাগিল। নদীতে নির্ম্মল জল ও সরোবরে কমল, প্রফুল্ল হইল। বন উপবন প্রভৃতি মধুর মধুকরগীতে ও কোকিলকলকলে আমোদিত হইল; এবং শীতল সুগন্ধি মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহিতে লাগিল। সাধুগণের আশয় ও জলাশয় সুপ্রসন্ন হইল। দেবলোকে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। সিদ্ধ চারণ কিন্নর গন্ধর্ব্বগণ গীতিস্তুতি করিতে লাগিল। বিদ্যাধরীগণ অপ্সরাদিগের সহিত নৃত্য করিতে লাগিল। দেব ও দেবর্ষিগণ হর্ষিতমনে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। মেঘসকল মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল।"[১০]

"এক দিবস কৃষ্ণ বলরাম ও অন্য অন্য গোপবালকেরা একত্র মিলিয়া খেলা

করিতেছিলেন ইতিমধ্যে বলরাম প্রভৃতি গোপনন্দনেরা নন্দমহিষীর নিকটে গিয়া কহিল ওগো কৃষ্ণ মাটী খাইয়াছে আমরা বারণ করিলাম শুনিল না। তখন পুত্রবৎসলা যশোদা অস্তব্যস্তে আসিয়া কৃষ্ণের গণ্ড ধরিলেন এবং তর্জ্জন করিয়া কহিলেন, রে দুষ্ট, তুই মাটী খাইয়াছিস রহ আজ আমি তোকে মাটী খাওয়া ভাল করিয়া শিখাইতেছি।"[১১]

"এইরূপে কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে দেবরাজের পূজা পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসীরা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অর্চ্চনার বিধি সংস্থাপন করিলেন এবং মূর্ত্তিমান দেব দর্শন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন দেখ ভাই আমরা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ইন্দ্রের পূজা করিয়াছিলাম কখন দর্শন পাই নাই কিন্তু অদ্য একবার মাত্র অর্চ্চনা করিয়া গিরিদেবের দর্শন পাইলাম অতএব এতদিন আমরা এমন প্রত্যক্ষ দেবতার উপেক্ষা করিয়া বৃথা কালক্ষেপ করিয়াছি আজ কৃষ্ণ হইতে আমাদের ভ্রম নিবারণ হইল। কৃষ্ণ দেখিতে বালক বটে কিন্তু বুদ্ধিতে আমাদের পিতামহ। এইরূপ নানাবিধ কথোপকথন করিয়া কৃষ্ণ গুণগান করিতে লাগিলেন এবং নৃত্যগীতাবসানে পুনরায় পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিয়া কৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবন প্রবেশ করিলেন।"

"ত্যজিয়া ইন্দ্রের পূজা পর্ব্বতে পূজিল।
শুনিয়া ইন্দ্রের মনে ক্রোধ উপজিল॥"[১২]

'বাসুদেব চরিত' সম্পর্কে একটা বলবার মতো খবর আছে। 'বাসুদেব চরিত' কোনোদিন ছাপার অক্ষরে বই হয়ে বেরোয়নি।

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন: "বিদ্যাসাগর প্রথমে 'বাসুদেব চরিত' বলিয়া একটি বই লিখিয়াছিলেন, একথা তাঁহার চরিতকারেরা বলিয়াছেন। তাঁহাদের উক্তিই একমাত্র প্রমাণ। এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে পাওয়া একটি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। সেটি কলেজের এক সিভিলিয়ান্ ছাত্র হেন্‌রি সারজ্যাণ্টের লেখা, 'বাসুদেব চরিত'-জাতীয় কৃষ্ণলীলা বই। আমার মনে হয় এই রচনাটি লিখিবার সময়ে বিদ্যাসাগর—তখন তিনি বোধ করি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক ছিলেন—সারজ্যাণ্ট্‌কে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই হইতেই বোধ হয় 'বাসুদেব চরিত' কিংবদন্তীর উৎপত্তি।..."[১৩]

বিদ্যাসাগরের 'বাসুদেব চরিত'কে কিংবদন্তী বলে নস্যাৎ করার মূলে কোনো সুযুক্তি নেই। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল সরকার বিদ্যাসাগরের 'বাসুদেব চরিতে'র পাণ্ডুলিপি দেখেছিলেন, এ-সত্য উপেক্ষা করা অসম্ভব।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের 'বাসুদেব চরিতে'র হস্তলিখিত পুঁথি দেখেছিলেন, সে-বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে।[১৪]

বিহারীলাল সরকার লিখেছেন: "বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিতাবস্থায় এ পুস্তক (বাসুদেব-চরিত) মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে সময় তিনি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি খুঁজিয়া পান নাই। তাঁহার পুত্র নারায়ণবাবু ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি অনেক কষ্টে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন।...আমরা নারায়ণবাবুর নিকট পুস্তকের জীর্ণ পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি।"[১৫]

উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করে শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : "হেনরি সারজ্যাণ্টের 'কৃষ্ণলীলা বই'-এর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের 'বাসুদেব চরিতে'র কোন সম্পর্কই নেই। আমরা এসিয়াটিক সোসাইটিতে গিয়ে হেন্‌রি সারজ্যাণ্টের এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি* (এসিয়াটিক সোসাইটির A. 41 নং পুঁথি) দেখেছি...।"[১৬]

বিদ্যাসাগরের কাছে সংস্কৃত পড়তেন মার্শাল সাহেব। বেশ বাঙলাভাষা শিখে নিয়েছিলেন তিনি। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তিনি বাঙলায় কথাবার্তা কইতে ভালোবাসতেন। দরকার হলে বিদ্যাসাগর মার্শাল সাহেবকে বাঙলায় চিঠিপত্র পর্যন্ত লিখেছেন।

বিশেষ কারণে কলেজে যাওয়া সম্ভব হল না একদিন। মার্শাল সাহেবকে বাঙলায় চিঠি লিখে সেকথা জানালেন। চিঠিখানা তুলে দিচ্ছি :

"শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং।

সবিনয় নিবেদনং—

অদ্য আমার পিতৃব্যপুত্রের প্রাতঃকালাবধি চারি বার ভেদ হইয়াছে ২০ ড্রপ্‌ লডেনম্‌ দেওয়াতে আপাততঃ প্রায় এক ঘণ্টা ভেদ বন্ধ রহিয়াছে কিন্তু একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে এমত বোধ হয় না অতএব তাঁহার নিকটে থাকা অত্যাবশ্যক সুতরাং অদ্য যাইতে পারিলাম না ত্রুটিমার্জ্জনে আজ্ঞা হয়। কিমধিকমিতি ২৮ নবেম্বর ১৮৪৩

আজ্ঞাবর্ত্তিনঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।"[১৭]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন :

"অনুমান হয় ইং ১৮৪৩ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় বিষম বিসূচিকারোগাক্রান্ত হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার শৌচ-প্রস্রাব বন্ধ হইয়া অত্যন্ত যাতনা হইতে লাগিল। অগত্যা তাঁহার প্রিয় ছাত্র বিদ্যা-সাগর মহাশয়কে আহ্বান করেন। ইহা শ্রবণমাত্রই তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ বদনে দ্রুতবেগে তৎকালের বিখ্যাত ডাক্তারবাবু নবীনচন্দ্র মিত্র ও তালতলা নিবাসী ডাক্তার বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের বাটী যাইয়া তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাটীতে গমন করেন। তিনি তিন দিবস অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যমনা হইয়া পীড়িত উক্ত পণ্ডিতের চিকিৎসা করাইলেন। তাহাতে তর্কবাগীশ প্রথমতঃ আরোগ্যলাভ করেন, পরে হঠাৎ এক

* এই পাণ্ডুলিপিটিতে একটি নামপত্র ও ৬৫টি পৃষ্ঠা আছে; পৃষ্ঠাগুলির আয়তন ১১·২″ × ৭″। বইটির নামপত্রটি নীচে উদ্ধৃত হল।

"শ্রীমদ্ভাগবত।—
শ্রীশ্রীনারায়ণের অষ্টমাবতার
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ তাঁহার জন্ম ও বাল্যলীলা
এবং কংস বধের উপাখ্যান।—
ভাষা সংগ্রহঃ।—
হেনেরি সারজ্যাণ্ট্‌ শাহেবেন ক্রিয়তে॥—"

দিবস প্রাণত্যাগ হয়। কয়েক দিবস অগ্রজ মহাশয় স্বহস্তে তাঁহার মলমূত্রাদি পরিষ্কার করেন। তাঁহার অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া চিকিৎসকগণ কয়েক দিবসের ভিজীটের টাকা গ্রহণ করেন নাই। উক্ত কয়েক দিবসের ঔষধের মূল্য অগ্রজ মহাশয় স্বয়ং প্রদান করেন। বাল্যকালের শিক্ষকের প্রতি তাঁহার এরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এবং সকলে একবাক্যে বলেন যে, তর্কবাগীশের পুত্র ও কন্যা এ সময়ে নিকটে উপস্থিত নাই; অনেক ছাত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু কেহই ঈশ্বরের মত ভক্তিপূর্ব্বক স্বহস্তে বিষ্ঠা মুক্ত করিতে পারে নাই। অতঃপর অপর যে কোন আত্মীয় বন্ধুর পীড়া হইত, তিনি বিনা ভিজীটে ডাক্তার পাইবার জন্য অগ্রজকে জানাইতেন। তিনিও কি আত্মীয় কি অনাত্মীয় কাহারও পীড়ার সম্বাদ পাইলে ডাক্তার দুর্গাচরণবাবুকে লইয়া সেই রোগীর ভবনে যাইতেন। যে রোগীর কোন অভিভাবক নাই জানিতে পারিতেন, তাহার বাটী যাইয়া সকল অভাব পূরণ করিতেন। তিনি তৎকালে বাসাস্থিত ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়দিগকে সকল রোগীর শুশ্রূষার জন্য পাঠাইতেন; একারণ অনেকেই বলিত, ঈশ্বরের মত দয়ালু ও ধর্ম্মশীল লোক সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।

ইহার কিছুদিন পরে দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নারিকেলডাঙ্গাস্থ ভবনে, তাঁহার ভাগিনেয় ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ওলাউঠা হয়। তর্কপঞ্চানন মহাশয় ভাগিনেয়কে ভয়ে বাটীর বাহিরে সামান্য একস্থানে রাখিয়াছেন, চিকিৎসা করান হয় নাই, মৃত্যুর আশঙ্কায় শয্যা দেন নাই, দরমার উপর রোগীকে শয়ান রাখা হইয়াছে। অগ্রজ মহাশয় এই সম্বাদ পাইয়া ডাক্তার বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমভিব্যাহারে করিয়া নারীকেলডাঙ্গায় ভট্টাচার্য্যের ভবনে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসা করাইতে প্রবৃত্ত হন। ঐ রাত্রিতে দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মধ্যম সহোদরকে বহুবাজারে পাঠাইয়া বালীশ তোষক মাদুর প্রভৃতি আনাইয়াছিলেন। নিশীথসময়ে মুটে না পাওয়ায় মধ্যমাগ্রজ দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন স্বয়ং প্রায় দেড়ক্রোশ পথ উক্ত শয্যাদি মাথায় করিয়া লইয়া যান। রোগীকে ভাল শয্যায় শয়ন করান হয়, এবং রোগীর গাত্রের মলমূত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া দেন। রোগী সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিলে, বাসায় গমন করেন। তর্কপঞ্চাননের ভাগিনেয় বিষম বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইলেন, কিন্তু তর্কপঞ্চানন বা তাঁহার শিশুসন্তানদিগকে ভয়ে রোগীর ত্রিসীমায় আগমন করিতে দেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবাজার হইতে ডাক্তার, ঔষধ ও শয্যা সহিত তথায় যাইয়া চিকিৎসা করাইলেন। তদ্দর্শনে অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান ছাত্র প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্যের মধ্যম সহোদর ও কনিষ্ঠ সহোদর বিসূচিকারোগগ্রস্ত হয়েন, এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র অগ্রজ মহাশয়, দুর্গাচরণবাবু প্রভৃতি ডাক্তারগণকে লইয়া চিকিৎসা করান। সুচিকিৎসায় প্রিয়নাথের মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু আরোগ্যলাভ করেন, দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ কালনামক ভ্রাতা মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।

ঐ সময় বহুবাজারস্থ বাসাবাটীর এক পার্শ্বে মোক্তার বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের এক ভৃত্যের ওলাউঠা হয়। মোক্তারবাবু চাকরের হাত ধরিয়া উপর হইতে নামাইয়া পথে শোয়াইয়া রাখেন। অগ্রজ তাহাকে ভূমিতে পতিত দেখিয়া অনেক দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক নিজ বাসায় লইয়া গিয়া, আপন শয্যায় শয়ন

করাইলেন, এবং অবিলম্বে ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। পাঁচ সাত দিন চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় রোগী সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করে।

ঐ সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক অনাথ পীড়িত লোকের চিকিৎসাদি-কার্য্যে বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। সকলেই বিদ্যাসাগরের এরূপ দয়া দেখিয়া বলিত, ইনি মানুষ নন, সাক্ষাৎ অবতার বিশেষ। এইরূপ কত রোগীর প্রতি যে অগ্রজ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিস্তৃতিভয়ে এক্ষণে লিখিতে ক্ষান্ত রহিলাম।"[১৮]

১৮৪৫ সালের ২৬ জুন রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছেন। ১৮৪৬ সালের ২৬ মার্চ রামমাণিক্যের মৃত্যু হল। সংস্কৃত কলেজে অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারির আসন শূন্য হয়ে গেল।

বিদ্যাসাগর সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করতে চেয়েছেন, ১৮৪৬ সালের ২৮ মার্চ দরখাস্ত করেছেন। দরখাস্তখানা তুলে দিচ্ছিঃ

"To

Baboo Russomoy Dutt,
Secretary to the Government
Sanscrit College, Calcutta.

SIR,

Understanding that the situation of Assistant Secretary to the Government Sanscrit College has been left vacant by the death of the late incumbent Rammanikya Bidyalankar, I beg to present myself as a candidate for the same.

As regards my qualifications, I beg to observe that I had the honor to be educated in the above institution where I was fortunate enough to obtain many honours and distinctions. Besides I have the honor to hold the office of Sheristadar of the Bengalee Department of the College of Fort William, to which I was appointed in 1841 since which time from the nature of my duties and the institution being a seat of learning I have improved my knowledge to a considerable degree and in addition I have given much attention to acquire proficiency in the system of Sankhyha Philosophy and the Puranahs, branches which do not fall within the regular course of education afforded by your college.

In the examinations for scholarships which Capt. Marshall, the Secretary to the College of Fort William, undertook for the Sanscrit College for the last four years I was kindly allowed the honor of, taking an active part in preparing questions and examining the answers thereunto. And I believe I have discharged my share of this duty in a

manner which afforded perfect satisfaction to the parties concerned, viz., the worthy examiner and the Professors and students of the institution. This, together with my long connection with the college as a student has given me an intimate knowledge of the system of education pursued there, and inspires me with confidence that in case my services are accepted I shall prove useful to the institution. But I confess that in offering my services it is in the hope that the emoluments attached to the situation may be increased to a higher degree, for it would not be prudent that I should quit my present office for one so troublesome without an adequate remuneration, and I respectfully submit that the present salary is very small for a duly qualified person who is expected to give his whole time to the duties.

The copies of testimonials are herewith annexed for your inspection.

I have the honor to be,
SIR,
Your most obedient Servant,
ISHWAR CHUNDER SHURMA."

Calcutta,
28th March 1846.

মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরকে একখানা সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। সার্টিফিকেটের তারিখ : ২৮-মার্চ, ১৮৪৬ সাল। বিশেষ উপকার হয়েছিল সেই সার্টিফিকেটে :

"Certified that Ishwar Chunder Vidyasagar has been Serishtadar of the Bengallee Department of the College of Fort William for nearly five years. He was educated in the Government Sanscrit College and studied all the branches of Literature and Science taught there with the greatest success, and he has since, by private study, acquired a very considerable degree of knowledge of the English language. I have derived most satisfactory aid from his learning and intelligence in matters connected with his office—and I have also received much willing assistance in others of an extra nature, especially in the annual examination of candidates for scholarships in the Sanscrit College for the last four years, in which I have been strongly impressed with his tact and intelligence and freedom from all bias or unworthy motives. On the whole, I consider, that he unites in an unusual degree, extensive acquirements, intelligence, in-

dustry, good disposition, and high respectability of character." [১৯]

সংস্কৃত কলেজে গিয়ে বিদ্যাসাগরকে যদি কোনো কারণে চাকরিতে ইস্তফা দিতে হয় তো সংসার অর্থাভাবে বিপন্ন হয়ে যাবে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বিদ্যাসাগরের জায়গায় যদি বিদ্যাসাগরের ভাই দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন নিযুক্ত হতে পারেন তো সংসারের জন্য আর কোনো দুশ্চিন্তা থাকে না।

বিদ্যাসাগর সেইরকম অনুরোধ করলেন মার্শাল সাহেবকে।

কিন্তু, প্রশ্ন, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন কি পারবেন?

বিদ্যাসাগর মার্শাল সাহেবকে বললেন—অধিক আর কী বলব, দীনবন্ধু কোনো বিষয়ে আমার চেয়ে কম নয়, বরং অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন।

মার্শাল সাহেব আর কোনো আপত্তি করলেন না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিদ্যাসাগরের জায়গায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন নিযুক্ত হলেন।

আর বিদ্যাসাগর চলে গেলেন সংস্কৃত কলেজে। ১৮৪৬ সালের ৬ এপ্রিল বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি হলেন। মাইনে পঞ্চাশ টাকা।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "বিদ্যালয়ের কোন কোন শিক্ষক চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া নিদ্রা যাইতেন, ছাত্রগণের মধ্যে কেহ পাখা লইয়া অধ্যাপককে বাতাস করিত, এই কুপ্রথা উঠাইয়া দিলেন। সাড়ে দশটার মধ্যেই অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে হইবে, এইরূপ নিয়ম করিয়া দিলেন। অতঃপর সেক্রেটারির বিনা অনুমতিতে কি শিক্ষক কি ছাত্র কেহই ইচ্ছামত বিদ্যালয় হইতে বাটী যাইতে পারিবেন না। ছাত্রগণ ইচ্ছানুসারে একবারেই সকলে ক্লাস হইতে বাহিরে মালীর গৃহে যাইতে পারিবে না, এক এক জন করিয়া যাইবে, কিন্তু তাহাও কাষ্ঠের পাশ গ্রহণ করিয়া যাইতে হইবে।"[২০]

সেসময়ে কার সাহেব হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল। কী একটা কাজে বিদ্যাসাগর একদিন কার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। কার সাহেব বিদ্যাসাগরকে আমল দিলেন না। একবার বসতে পর্যন্ত বললেন না। চেয়ারে হেলান দিয়ে টেবিলের উপর পা তুলে বসে রইলেন।

কাজের কথা শেষ করে বিদ্যাসাগর কার সাহেবের ঘর থেকে চুপচাপ চলে এলেন। কার সাহেব যে অভদ্র ব্যবহার করেছেন, সে-বিষয়ে একটি কথাও বললেন না। কিন্তু অপমানটুকু ঠিক মনে রইল।

দিন কয়েক পরের কথা। কার সাহেব কী একটা কাজে বিদ্যাসাগরের কাছে এসে উপস্থিত। এই সুযোগ। কার সাহেব যেমন করেছিলেন, বিদ্যাসাগরও ঠিক তেমনি চেয়ারে হেলান দিয়ে টেবিলের উপর চটিসুদ্ধ পা তুলে বসে রইলেন। কার সাহেব বিদ্যাসাগরকে বসতে বলেননি, বিদ্যাসাগরও কার সাহেবকে বসতে বললেন না।

কার সাহেব কাজ সেরে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেলেন। বিদ্যাসাগরের নামে নালিশ করলেন শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক ময়েট সাহেবের কাছে। ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগরের কৈফিয়ৎ তলব করলেন।

বিদ্যাসাগর কৈফিয়ৎ দিলেন: আমি ভেবেছিলাম, আমরা অসভ্য, সাহেবরা সভ্য। সাহেবদের কাছেই আমাদের সভ্যতা শেখা উচিত। কার সাহেবের কাছে আমি যেমন অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম, আমি ভেবেছিলাম, অভ্যর্থনা করার সেটাই

Government Sanscrit College

of

CALCUTTA

We hereby Certify that Ishwarchandar Bidiyasaggur has attended at the Government Sanscrit College for 12 Years. 5 Months and studied the following branches of Hindoo Literature. Grammar, Belleslettres, Rhetoric, Arithmetic, Logic Theology and Law ——— that he has attained very good ——— proficiency on the subject of these Studies and that he conducted himself well.

[illegible signatures]

Professor ... Members

General Committee of Public Instruction.

Fort William.

the 4th December 1841

Rassomoy Dutt
Secty.

সংস্কৃত কলেজের সার্টিফিকেট

সবিনয় নিবেদন—

গত বছর অবধি— শান্তিনিকেতনের [illegible]
[illegible] দুটি গাছ— [illegible] ঐ [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]। [illegible]
[illegible]

[illegible] ২৬ [illegible]
১৬ [illegible] ৪০ [illegible]
[illegible]
[illegible]। [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]

শান্তিনিকেতন
[illegible]

সভ্য রীতি, আমি তাই সেইভাবেই কার সাহেবকে অভ্যর্থনা করেছি। এতে যদি আমার কোনো অপরাধ হয়ে থাকে তো সে-অপরাধের জন্যে স্বয়ং কার সাহেবই দায়ী।

বিদ্যাসাগরের স্পষ্ট কথায় ময়েট সাহেব খুশি হয়েছেন। ময়েট সাহেবের কথায় তারপর কার সাহেব নিজেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটার একটা আপোষ-নিষ্পত্তি করেছেন।[২১]

কলেজের নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় বিদ্যাসাগরকে। কলেজের খুঁটি-নাটি ব্যাপারেও বিদ্যাসাগর চোখ রেখেছেন।

একটা ঘটনা আছে।

১৮৪৭ সালের ১৬ ফেব্রুআরি কলেজের মালির ঘরে চুরি হল। ঘরের চাবি ভেঙে চোর ঢুকেছে। দুটো সিন্দুক বের করে নিয়ে গেছে। সিন্দুক ভেঙে সব মালপত্র নিয়ে চোর উধাও। সকালে দেখা গেল, কলেজের দক্ষিণ দিকে দুটো সিন্দুক আর একটা বাক্স পড়ে আছে।

রামজী মালির কাছে এসব খবর পেলেন বিদ্যাসাগর।

রামজী মালি এসে বিদ্যাসাগরকে বলল—কলেজের তিনটে ঘটি চুরি গেছে। আর ওই ঘটির সঙ্গে আমার নিজের নগদ চল্লিশ টাকা গেছে। আমার নিজের নগদ ছত্রিশটি টাকা আর ষোলোটি সিকি ছিল সিন্দুকে।

যেমন নিয়ম, খবর পেয়ে পুলিশ এসে তদারক করে গেল।

১৮৪৭ সালের ১৭ ফেব্রুআরি বিদ্যাসাগর আদ্যন্ত ঘটনা একখানা চিঠি লিখে কলেজের সেক্রেটারিকে জানালেন।

একটি শোকসংবাদ আছে। বিদ্যাসাগরের চতুর্থ সহোদর হরচন্দ্র বারো বছর বয়সে কলেরায় মারা গেছে। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেনঃ "অনুগত, অসাধারণ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন, ভ্রাতার মৃত্যুসম্বাদে অগ্রজ মহাশয় (বিদ্যাসাগর) অত্যন্ত শোকাতুর হইয়াছিলেন। লেখাপড়ার চর্চ্চা একবারে পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি কয়েক মাস রোদনেই সময়াতিপাত করিতেন। ৫।৬ মাস রীতিমত আহার না করায়, অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছিলেন। ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে হরচন্দ্র অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিল। তাহার উপর জ্যেষ্ঠের এরূপ আশা ছিল যে, নিজে পরিবার প্রতিপালনের জন্য চাকরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইচ্ছামত ভালরূপ লেখাপড়া শিখিতে পারিলাম না; যাহা জানি, তাহাতে দেশের কোন উপকার হইবে না। হরচন্দ্রকে মনের মত লেখাপড়া শিখাইব, তাহার দ্বারা দেশস্থ লোকের উপকার হইবে। জননী দেবী, পুত্রশোকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরন্তর রোদন করিয়া থাকেন, এ কারণ তাঁহার সান্ত্বনার জন্য অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গকে কলিকাতা হইতে দেশে পাঠাইয়া দেন। মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের কার্য্যে ৬ মাস প্রতিনিধি রাখিয়া অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গ সমভিব্যাহারে দেশে অবস্থিতি করেন। কিয়দ্দিবস পরে জননী দেবীর শোকের কিছু লাঘব হইলে পর অগ্রজ মহাশয় আমাদিগকে পুনর্ব্বার কলিকাতা যাইবার আদেশ করেন।"[২২]

সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে পরিকল্পনা রচনা করলেন বিদ্যাসাগর। এই পরিকল্পনাটি সম্পর্কে মার্শাল সাহেব মন্তব্য করেছেন :

"The Assistant Secretary consulted me some time ago on a plan of study which he had prepared at a great sacrifice

of time and labour. The suggestions therein contained appealed to me highly judicious, and the scheme altogether seemed well adopted to produce order, to save time, and to secure to each subject of study the degree of attention which it deserves: as such I would beg strongly to recommend the Council to give it a trial. If I am not much mistaken, the result would prove highly satisfactory." ২৩

১৮৪৬ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগর পরিকল্পনাটি সেক্রেটারি রসময় দত্তের কাছে দাখিল করলেন।

মূল পরিকল্পনাটি এখনও সংস্কৃত কলেজের দপ্তরে রক্ষিত আছে।

পরিকল্পনাটির মার্জিনে বিস্তর মন্তব্য। সমস্ত মন্তব্যের পাঠোদ্ধার দুঃসাধ্য এবং হয়তো অনাবশ্যক। কয়েকটি মন্তব্য ও মন্তব্যাংশ নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করি :

"This defect was found by the Secy. before this information reached him. It has now been remedied."

"Considered by the Secy. unnecessary".

"The Secy. objected to the compilation of these new Books 1st because he did not consider these necessary."

"This is merely a reflection on the Professor for neglect of duty which he does not deserve. . ."

"This is also an echo of Secretary's sentiments. . ."

"Altogether a wrong opinion. . ." ২৪

রসময় দত্ত সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি বিদ্যাসাগরের অনুরোধ সত্ত্বেও কাউন্সিল অফ এডুকেশনে পাঠালেন না, কেবলমাত্র সামান্য একটু অংশ খণ্ডিত করে পাঠালেন।

খুব উৎসাহ নিয়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে কাজ আরম্ভ করেছেন। কিন্তু সে-উৎসাহ আর রইল না। বিদ্যাসাগর হতাশ হলেন। ঠিক করলেন, এই চাকরিতে ইস্তফা দেবেন।

১৮৪৭ সালের ৭ এপ্রিল বিদ্যাসাগর ইস্তফাপত্র দাখিল করলেন সরাসরি কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সেক্রেটারির কাছে। কিন্তু সে-ইস্তফাপত্র গৃহীত হল না।

১৮৪৭ সালের ১০ এপ্রিল সংস্কৃত কলেজের তেরোজন অধ্যাপক বিদ্যাসাগরের ইস্তফা সম্পর্কে একটি আবেদনপত্র দাখিল করেছেন :

"To

Baboo Rossomoy Dutt,
Secretary to the Sanscrit College.
&c, &c.

The Memorial of the Pundits and teachers of the Sanscrit College.

Respectfully Showeth,

That your memorialists beg to express their sincere regret at learning that Essur Chunder Biddasagore assistant

Secretary to the Sanscrit College has, for reasons unknown to them, resigned his situation as they are really afraid that his resignation at a time when the college is, as it were being altogether remodelled, will prove very much prejudicial to its true interests.

The assistant Secretary by his personal abilities, industrious habits, and zeal in the welfare of the College, has as is already known to you, introduced several beneficial changes and proposed such salutary innovations in the system of Education hitherto pursued, there, as your memorialists expect, will soon place that Institution on a very solid efficient footing. Your memorialists are of opinion that the appointment of the said Bidya Sagore does great credit to your judgement, who determined on the last occasion of filling up the vacant chair of your assistant upon nominating one, intimately acquainted with the Sanscrit and tolerably versed in the English Language as they believe that the assistant Secretary has been in a great measure enabled by the above qualifications to plan the revised system already noticed. Under these circumstances your memorialists cannot but be sorry that he has tendered his resignation and they sincerely trust as his loss cannot easily be supplied that you will be pleased to adopt such measures as will induce Essur Chunder to continue his services at the college which will no doubt be greatly conducive to the prosperity of our institution.

In conclusion your memorialists beg to state for your information that the resignation, referred to, being tendered to the Secretary to the Council of Education, your memorialists have with a view to prevent delay, presented a similar memorial to Dr. Mouat in the hope that he may not take hasty steps to accept of the resignation of an officer, who might otherwise be induced to continue his services to the college if not for his own, atleast for the interest of the institution which he was appointed to look over.

And your memorialists as in duty bound shall ever pray:

Sanscrit College,
10th April 1845.

শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চাননস্য
" জয়নারায়ণ শর্ম্মণাং
ভরতচন্দ্র শর্ম্মণাম্
দ্বারকানাথ "

রামগোবিন্দ ”
প্রাণকৃষ্ণ ”
তারানাথ ”
মদনমোহন ”
প্রেমচন্দ্র ”
গিরীশচন্দ্র ”
যোগধ্যান শর্ম্মণাম্ ”
Russick Lull Sen.
Shama Churun Sircar." [২৫]

১৮৪৭ সালের ১৪ এপ্রিলের "Extracts from the Proceedings of the Council of Education" থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি :

"No VII Read letter from Pundit Ishwar Chunder Surma dated 7th April tendering resignation of his appointment of Assistant Secretary to the Sanscrit College.

Ordered: that the assistant Secretary to the Sanscrit College be directed to forward his application through the regular channel when it will be duly taken into consideration.

No. XXXIII Read memorial from the Pundits of the Sanscrit College, respecting the resignation of the assistant Secretary.

Read also demi official note from the Secretary to the Sanscrit College, pointing out the irregularity of the proceedings, and requesting that the letter and petition may be returned to the writers to be forwarded through the regular channel . . .

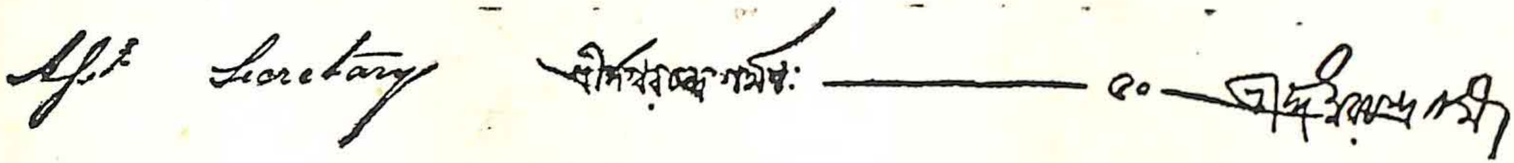
Ordered: as in para VII" [২১]

আবার বিদ্যাসাগর যথারীতি ইস্তফাপত্র দাখিল করলেন ১৮৪৭ সালের ২০ এপ্রিল :

"To Baboo Russomoy Dutt
Secretary, Sanscrit College.

Sir,

I have the honour to request that you will be so good as to tender to the Council of education my resignation of the office of Assistant Secretary to the Sanscrit College. My reason for resigning is, that I do not find those opportunities



১৮৪৭ সালের সংস্কৃত কলেজের বেতনবহিতে বিদ্যাসাগরের স্বাক্ষর

[illegible] 1847

Sir

I have the honor to request that you will be so good as to tender to the Council of Education my resignation of the office of Assistant Secretary to the Sanscrit College — My reason for resigning is, that I do not find those opportunities of being useful in anticipation of which I applied for the appointment —

I have the honor to be
Sir
your most obedient Servant
Ishwar chandra Sharman

Sanscrit College
6th April / 47

বিদ্যাসাগরের ইস্তফাপত্রের প্রতিলিপি

of being useful in anticipation of which I applied for the appointment.

I have the honour to be
Sir,
Your most obedient servant
Ishwar Chandra Sharma"[২৭]

Sanscrit College
20th April/47

বিদ্যাসাগরের ইস্তফাপত্র গৃহীত হল ১৮৪৭ সালের ১৬ জুলাই। সংস্কৃত কলেজের ১৮৪৭ সালের ১৬ জুলাইয়ের আপিস মেমোরান্ডাম-খানা প্রায় সম্পূর্ণ উদ্ধার করি :

"The Secretary begs to inform Pundit Ishwar Chunder Vidya bagesha that his resignation of the post of Assistant Secretary to the Sanscrit College has been accepted, and to request that Pundit Ishwar Chundra will have the goodness to give over charge of his office to Pundit Taranauth Tarkabachaspute the Professor of Grammar First class.

2. Pundit Ishwar Chundra's salary as assistant secretary will cease from this day. . . "[২৮]

সে-আমলে এককথায় পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে দেওয়া সামান্য কথা নয়। রসময় দত্ত নাকি তখন বলেছিলেন—বিদ্যাসাগর চাকরি তো ছেড়ে দিল, কিন্তু খাবে কী?

যার কাছে বিদ্যাসাগর একথা শুনেছিলেন তাকে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন—দত্তমশায়কে বলো, বিদ্যাসাগর আলু-পটল বেচে খাবে, মুদির দোকান করে খাবে, কিন্তু যে-চাকরিতে সম্মান নেই সে-চাকরি করবে না।

চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন, সেজন্য একবিন্দু দুর্ভাবনার চিহ্ন পড়েনি বিদ্যাসাগরের মুখে। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অগ্রজের কিছুমাত্র মানসিক কষ্ট হইল না। তৎকালে বাসায় নিরুপায় আত্মীয় ও স্বসম্পর্কীয় প্রায় ২০টি বালককে অন্নবস্ত্র দিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করাইতে-ছিলেন। তন্মধ্যে কাহাকেও বাসা হইতে যাইবার কথা এক দিনের জন্যও বলেন না।"[২৯] দীনবন্ধুর উপার্জনের টাকায় কলকাতার বাসা-খরচ কষ্টে-সৃষ্টে চলতে লাগল। মাসে-মাসে ঋণ করে বাবাকে পঞ্চাশ টাকা পাঠাতে লাগলেন।

এই সময়েই কাপ্তেন ব্যাঙ্ক নামে একজন সাহেবকে মাসকয়েক সংস্কৃত, বাঙলা আর হিন্দী পড়ালেন বিদ্যাসাগর। কাপ্তেন ব্যাঙ্ক ময়েট সাহেবের বন্ধু। ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করেছেন, তাই বিদ্যাসাগর পড়িয়েছেন।

মাসকয়েক পড়বার পর কাপ্তেন ব্যাঙ্ক একদিন টাকা বের করলেন। পঞ্চাশ টাকা মাইনে হিসেবে টাকা দিলেন বিদ্যাসাগরকে।

বিদ্যাসাগর কাপ্তেন ব্যাঙ্ককে বললেন—ময়েট সাহেব আমার পরমাত্মীয়।

তিনি আপনারও পরম বন্ধু। তাঁর অনুরোধে আপনাকে পড়িয়েছি। আপনার কাছ থেকে কেমন করে টাকা নেব?

টাকা নিলেন না।

সংস্কৃত কলেজের ওই চাকরি ছেড়ে দেবার কিছুকাল আগে বিদ্যাসাগর 'সংস্কৃতযন্ত্র' নামে একটি ছাপাখানা খুলেছেন। বিদ্যাসাগর আর মদনমোহন তর্কালঙ্কার—দুজনে মিলে 'সংস্কৃতযন্ত্র' খুলেছেন। মদনমোহন বিদ্যাসাগরের বন্ধু। দুজনে ছাপাখানার সমান অংশীদার।

'সংস্কৃতযন্ত্রে'র জন্য ঋণ করতে হয়েছে। ছশো টাকা ঋণ।

কথায়-কথায় একদিন বিদ্যাসাগর মার্শাল সাহেবকে বললেন—আমরা একটি ছাপাখানা খুলেছি। যদি কিছু ছাপাবার দরকার হয়, বলবেন।

মার্শাল সাহেব বললেন—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' পড়াতে হয়। যে-বই পড়ানো হয় তার কাগজ যেমন ছাপাও তেমনি জঘন্য। তাছাড়া বিস্তর ভুল। তুমি যদি কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ি থেকে আসল 'অন্নদামঙ্গল' পুঁথি এনে শুদ্ধ করে তাড়াতাড়ি বই ছেপে দিতে পারো, তাহলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য আমি একশোখানা বই নেব, ছশো টাকা দাম দেব।

তাই করলেন বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত বইয়ের নাম 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। হিন্দী 'বৈতাল পচ্চিসী' বইয়ের অনুবাদ। কিন্তু বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ওই হিন্দী বইয়ের হুবহু অনুবাদ নয়। উত্তরকালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন: "বেতাল পঞ্চবিংশতি নামে যে হিন্দি বহি আছে, বিদ্যাসাগরের গ্রন্থখানি উহার নামমাত্র অনুবাদ। হিন্দিতে তিনি কেবল কঙ্কালখানি পাইয়াছিলেন; রক্ত মাংস ইত্যাদি সকলই তিনি আপনা হইতে যোজনা করিয়া দিয়াছেন।"

মার্শাল সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য তিনশো টাকায় একশোখানা 'বেতালপঞ্চবিংশতি' কিনে নিলেন।

এক কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রে এক শবাবিষ্ট বেতাল মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে পঁচিশটি উপাখ্যান শুনিয়েছে। প্রধানত সেই পঁচিশটি উপাখ্যান নিয়েই 'বেতালপঞ্চবিংশতি'।

একটি উপাখ্যান উদ্ধৃত করি:

"ধর্ম্মপুরে গোবিন্দ নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র। তন্মধ্যে একজন ভোজনবিলাসী; অর্থাৎ, অন্নে ও ব্যঞ্জনে যদি কোনও দোষ থাকিত, তাহা দুর্জ্ঞেয় হইলেও, ঐ অন্নের ও ঐ ব্যঞ্জনের ভক্ষণে তাহার প্রবৃত্তি হইত না; দ্বিতীয় শয্যাবিলাসী; অর্থাৎ, শয্যায় কোনও দুর্লক্ষ্য বিঘ্ন ঘটিলেও, সে তাহাতে শয়ন করিতে পারিত না। ফলতঃ, এই এক এক বিষয়ে তাহাদের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ঈদৃশ বিস্ময়জনক ক্ষমতার বিষয় তত্রত্য নরপতির কর্ণগোচর হইলে. তিনি তাহাদের ঐ ক্ষমতার পরীক্ষার্থে, সাতিশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন, এবং উভয়কে রাজধানীতে আনাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা কে কোন বিষয়ে বিলাসী।

অনন্তর, তাহারা স্ব স্ব পরিচয় দিলে, রাজা, প্রথমতঃ ভোজনবিলাসীর পরীক্ষার্থে, পাচক ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া, নানাবিধ সুরস অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতি

প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। পাচক, রাজকীয় আজ্ঞা অনুসারে, সাতিশয় যত্ন সহকারে, চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়, চতুর্বিধ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া, ভূপতিসমীপে সংবাদ দিল। রাজা ভোজনবিলাসীকে আহার করিবার আদেশ করিলে, সে আহারস্থানে উপস্থিত হইল; এবং, আসনে উপবেশন মাত্র, গাত্রোত্থান করিয়া, নৃপতিসমীপে প্রতিগমন করিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিয়াছ। সে কহিল, না মহারাজ। আমার ভোজন করা হয় নাই। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, কেন। সে কহিল, মহারাজ! অন্নে শবগন্ধ নির্গত হইতেছে; বোধ করি, শ্মশানসন্নিহিতক্ষেত্রজাত ধান্যের তণ্ডুল পাক করিয়াছিল। রাজা শুনিয়া, তদীয় বাক্য উন্মত্তপ্রলাপবৎ অসংগত বোধ করিয়া, কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন; এবং, এই ব্যাপার গোপনে রাখিয়া, ভাণ্ডারীকে ডাকাইয়া, সেই তণ্ডুলের বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে, ভাণ্ডারী, সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, নরপতিগোচরে আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! অমুক গ্রামের শ্মশানসন্নিহিতক্ষেত্রজাত ধান্যে ঐ তণ্ডুল প্রস্তুত হইয়াছিল। রাজা শুনিয়া নিরতিশয় চমৎকৃত হইলেন, এবং ভোজনবিলাসীর সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, তুমি যথার্থ ভোজনবিলাসী।

অনন্তর, রাজা, এক সুসজ্জিত শয়নাগারে দুগ্ধফেননিভ পরম রমণীয় শয্যা প্রস্তুত করাইয়া, শয্যাবিলাসীকে শয়ন করিতে আদেশ দিলেন। সে, কিয়ৎক্ষণ শয়ন করিয়া, নৃপতিসমীপে আসিয়া, নিবেদন করিল, মহারাজ! ঐ শয্যার সপ্তম তলে এক ক্ষুদ্র কেশ পতিত আছে; তাহা আমার সাতিশয় ক্লেশকর হইতে লাগিল; এজন্য শয়ন করিতে পারিলাম না। রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন; এবং, শয়নাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক, অন্বেষণ করিয়া, দেখিতে পাইলেন, শয্যার সপ্তম তলে যথার্থই এক ক্ষুদ্র কেশ পতিত রহিয়াছে। তখন, তিনি, যৎপরোনাস্তি সন্তোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক, বারংবার তাহার প্রশংসা করিয়া কহিলেন, তুমি যথার্থ শয্যাবিলাসী। অনন্তর, তাহাদের দুই সহোদরকে, যথোচিত পারিতোষিকপ্রদান পূর্ব্বক, পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।”

দশম সংস্করণের 'বেতালপঞ্চবিংশতি' থেকে উপরের অংশটুকু উদ্ধৃত হল। দশম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর লিখেছেন : “বেতালপঞ্চবিংশতি দশম বার প্রচারিত হইল। এই পুস্তক, এতদিন, বাঙ্গালা ভাষার প্রণালী অনুসারে, মুদ্রিত হইয়াছিল; সুতরাং, ইঙ্গরেজী পুস্তকে যে সকল বিরাম-চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে সে সমুদয় পরিগৃহীত হয় নাই। এই সংস্করণে সে সমস্ত সন্নিবেশিত হইল।”

এ-বিষয়ে ডঃ শিশিরকুমার দাশ লিখেছেন : “আমাদের দেশে পণ্ডিত-মহলে যে ধারণা আছে যে বিদ্যাসাগরই বাংলায় সর্বপ্রথম সার্থকভাবে যতি-চিহ্নগুলি ব্যবহার করেন তা সত্য নয়। ১৮৫০ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর কোনো ইংরেজি যতিচিহ্ন গ্রহণই করেননি।”[৩০]

বিদ্যাসাগর বাঙলা গদ্যে ইংরেজি বিরামচিহ্নাদি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তার আগেও বাঙলা গদ্যে ইংরেজি বিরামচিহ্নাদি ব্যবহৃত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর যে সময়ে সংস্কৃত কলেজে সদ্য ভর্তি হয়েছেন, সেই সময়েও বাঙলাভাষায় ইংরেজি বিরামচিহ্নাদির ব্যবহার বিষয়ে ছাপার অক্ষরে আলোচনার দেখা পাওয়া যাচ্ছে। ১৮২৯ সালের ১৮-জুলাইয়ের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত একটি প্রেরিতপত্র থেকে একাংশ উদ্ধৃত করি : “অস্মদ্দেশীয় ভাষা ও অক্ষর

আধুনিক নহে ইহার মূল সংস্কৃত তাহার লিখন পঠনের যে ধারা ও ছেদ ও ভেদের যে চিহ্ন এক দাঁড়ি আছে তাহাই তাবদ্দেশ অর্থাৎ সংস্কৃত শাস্ত্র ও তন্মূলক ভাষা ব্যবসায়িদিগের চলিত আছে এক্ষণে নূতন কোন বিষয় কি প্রকার চলিত হইতে পারে যদ্যপি ইংলণ্ডীয় অক্ষরের সহিত ব্যবহৃত চিহ্ন বাঙ্গলা অক্ষরে ব্যবহার করা যায় তবে তত্তৎ চিহ্নানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐ চিহ্নসকল কোন অক্ষর জ্ঞান করিয়া যথার্থে সন্দিগ্ধ হইতে পারেন... চিহ্ন-নিমিত্তে এক ব্যাকরণ প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব নহে...।”

বিদ্যাসাগর ‘বেতালপঞ্চবিংশতি’ ছাপা হবার আগে পড়ে শুনিয়েছিলেন দুজন পণ্ডিত বন্ধুকে। একজন—মদনমোহন তর্কালঙ্কার; আরেকজন—গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

যেমন হয়ে থাকে সচরাচর, শুনে দুজনেই কিছু-কিছু মন্তব্য করেছেন। তাঁদের কথায় কোথাও-কোথাও দু-একটি শব্দ অদল-বদল করেছেন বিদ্যাসাগর।

মদনমোহনের মৃত্যুর বহুকাল পরে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মদনমোহনের একখানা জীবনী লিখলেন। যোগেন্দ্রনাথ মদনমোহনের জামাই।

সেই জীবনীর ৪২-পৃষ্ঠায় যোগেন্দ্রনাথ লিখেছেন : “বিদ্যাসাগরপ্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এতদূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে।”

কিন্তু সত্যিই কি এমন কথা বলা যেতে পারে? না, পারে না।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার অবশ্যি মারা গেছেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তো বেঁচে আছেন। এ-বিষয়ে গিরিশচন্দ্রকে বিদ্যাসাগর চিঠি লিখলেন :

“অশেষগুণাশ্রয়
শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভ্রাতৃ প্রেমাস্পদেষু
সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্

তুমি জান কি না বলিতে পারি না, কিছুদিন হইল, সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত প্রচারিত করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, “বিদ্যাসাগরপ্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এতদূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে”। বেতালপঞ্চবিংশতি সম্প্রতি পুনরায় মুদ্রিত হইতেছে। যোগেন্দ্রনাথ বাবুর উক্তি বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হওয়াতে, এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তাহা ব্যক্ত করিব, স্থির করিয়াছি। বেতালপঞ্চবিংশতির সংশোধন বিষয়ে তর্কালঙ্কারের কত দূর সংস্রব ও সাহায্য ছিল, তাহা তুমি সবিশেষ জান। যাহা জান, লিপি দ্বারা আমায় জানাইলে অতিশয় উপকৃত হইব। তোমার পত্রখানি আমার বক্তব্যের সহিত প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় আছে, জানিবে ইতি।

কলিকাতা। ত্বদেকশর্ম্মশর্ম্মণঃ
১০ই বৈশাখ, ১২৮৩ সাল। শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মণঃ”

দ্ুদিনেই সরাসরি জবাব এল :

"পরমশ্রদ্ধাস্পদ
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়
জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপ্রতিমেষু

শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. প্রণীত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত গ্রন্থে বেতালপঞ্চবিংশতি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "বিদ্যাসাগর-প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এতদূর সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছিল যে, বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের লিখিত গ্রন্থ-গুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলেও বলা যাইতে পারে" এই কথা নিতান্ত অলীক ও অসঙ্গত; আমার বিবেচনায়, এরূপ অলীক ও অসঙ্গত কথা লিখিয়া প্রচার করা যোগেন্দ্রনাথ বাবুর নিতান্ত অন্যায় কার্য্য হইয়াছে।

এতদ্বিষয়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত এই—আপনি, বেতালপঞ্চবিংশতি রচনা করিয়া, আমাকে ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রবণকালে আমরা মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতাম। তদনুসারে স্থানে স্থানে দুই একটি শব্দ পরিবর্ত্তিত হইত। বেতালপঞ্চবিংশতি বিষয়ে, আমার অথবা তর্কালঙ্কারের, এতদতিরিক্ত কোন সংস্রব বা সাহায্য ছিল না।

আমার এই পত্রখানি মুদ্রিত করা যদি আবশ্যক বোধ হয়, করিবেন, তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি ইতি।

সোদরাভিমানিনঃ
শ্রীগিরিশচন্দ্রশর্ম্মণঃ"

কলিকাতা।
১২ই বৈশাখ, ১২৮৩ সাল।

এই চিঠি দুখানা বিদ্যাসাগর, আপন মন্তব্য সমেত, 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র দশম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে ছেপে দিয়েছেন।

আবার চাকরি নিলেন বিদ্যাসাগর। পাঁচ হাজার টাকা জামিন দিয়ে ১৮৪৯ সালের ১-মার্চ বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ হলেন। আশি টাকা মাইনে।

এখানে আরেকটি শোকসংবাদ আছে। বিদ্যাসাগরের পঞ্চম সহোদর হরিশ্চন্দ্র লেখাপড়া শেখার জন্য কলকাতায় এসেছিল, আট বছর বয়সে সে মারা গেল। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "(হরিশ্চন্দ্র) বিষম বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হয়। এ কারণ অগ্রজ মহাশয় (বিদ্যাসাগর) কয়েক মাস শোকে অভিভূত হইয়াছিলেন। তিনি যথাসময়ে রীতিমত ভোজন করিতেন না এবং লেখাপড়ায় বিরত হইয়াছিলেন। আমরা সাত ভাই, এজন্য জ্যেষ্ঠাগ্রজ সর্ব্বদা বলিতেন যে, যদ্যপি সকলে জীবিত থাকি দেশের অনেক উপকার করিতে পারিব। তিনি মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলেন, নিজে উপার্জ্জন করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিব, অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গকে দেশে রাখিয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেশের দরিদ্র লোকের সন্তানগণকে লেখাপড়া শিখাইব। কিন্তু উপর্য্যুপরি দুই বৎসরে দুইটি ভ্রাতার মৃত্যুতে হতাশ হইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিল যে, দাদা! আমার বিবাহে বাজনা করিতে হইবে, এজন্য অদ্যাপি অগ্রজ অপর লোকের বিবাহে বাদ্যের শব্দ শুনিলে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন। লোকপরম্পরায় শুনিলেন, জননী দেবী পুত্রদ্বয়ের মৃত্যুতে সর্ব্বদা রোদন করিয়া থাকেন; এজন্য জননী দেবীকে দেশ হইতে কলিকাতা লইয়া যান। তথায় পাঁচ মাস কাল নিকটে রাখিয়া সান্ত্বনা করেন। জননী, দেশে থাকিয়া পাকাদি কার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করিয়া অপরাপর আগন্তুক ব্যক্তিগণকে বা দরিদ্র নিরুপায় লোকদিগকে ভোজন করাইতে ভাল বাসিতেন। তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিয়া রাখিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা আত্মীয় ও বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন। জননী স্বয়ং পাকাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া উপস্থিত নিমন্ত্রিতদিগকে খাওয়াইতেন। রন্ধন পরিবেশনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহার শোকের অনেক লাঘব হইতে লাগিল। জননীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পাঁচ মাস কাল অকাতরে যথেষ্ট টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। কিয়ৎপরিমাণে শোকের হ্রাস হইলে পর বৈশাখ মাসে অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গ সহিত জননীকে দেশে পাঠাইয়া দেন। ঐ মাসে অগ্রজের পুত্র নারায়ণের বয়ঃক্রম ছয় মাস; তাহার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে পিতৃদেব সমারোহ করিয়া আত্মীয়গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছিলেন। অগ্রজ তৎকাল পর্য্যন্ত মৃত হরিশ্চন্দ্র ভ্রাতার শোক সম্বরণ করিতে পারেন না; কেবল পিতার অনুরোধে দেশে গমন করেন।"[১]

এই সময়ে একবার সংস্কৃত কলেজে সিনিয়ার ও জুনিয়র স্কলারশিপের প্রশ্ন করেছেন ও পরীক্ষা নিয়েছেন একা বিদ্যাসাগর। পরীক্ষার পর যথারীতি রিপোর্ট দাখিল করেছেন। রিপোর্টটি থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি:

"The examination occupied nine days, between 15th September and 4th October, five days being taken up in

examining the senior department and four days the junior. In consequence of the smallness of the room allotted for the purpose, I thought it advisable to examine the two departments separately. The questions were prepared with great secrecy and were printed in my presence, and in fact, every precaution possible was taken to prevent unfair proceedings. . . .

The general impression from this examination is one of much satisfaction. Due attention appears to have been paid to each branch of study, and the result is very creditable to both professors and students." ২

মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন ১৮৪৬ সালের ২৭-জুন। ১৮৫০ সালের নভেম্বরে মদনমোহন জজ-পণ্ডিত হয়ে মুর্শিদাবাদে চলে গেলেন। অতঃপর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপক কে হবেন? বিদ্যাসাগর। অন্তত ময়েট সাহেবের সেই রকম ইচ্ছা। ময়েট সাহেব কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সেক্রেটারি।

বিদ্যাসাগর তখন ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের হেড-রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ। নানা কারণে তিনি তখন সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপক হয়ে সংস্কৃত কলেজে আসতে অনিচ্ছুক।

কিন্তু ময়েট সাহেবের একান্ত ইচ্ছা যে বিদ্যাসাগর সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপক হয়ে সংস্কৃত কলেজে আসেন।

বিদ্যাসাগর জানিয়ে দিলেন যে কাউন্সিল অফ এডুকেশন তাঁকে প্রিন্সিপালের ক্ষমতা দিলে তিনি সংস্কৃত কলেজে আসতে রাজি আছেন। ময়েট সাহেবের কথায় বিদ্যাসাগর এই মর্মে একখানা চিঠিও লিখে দিয়েছেন।

১৮৫০ সালের ৫-ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। নব্বুই টাকা মাইনে।

সাব্যস্ত হল, সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর একটি বিস্তারিত রিপোর্ট দাখিল করবেন।

একটি বিস্তারিত রিপোর্ট রচনা করেছেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫০ সালের ১৬-ডিসেম্বর সেই রিপোর্ট দাখিল করেছেন। রিপোর্টে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে বিধি-ব্যবস্থার নানা পরিবর্তন প্রস্তাব করেছেন :

". . . the changes now proposed by me in the system of the college are the results of a long and anxious consideration of the subject. They are extensive, but I have endevoured to select only those which are absolutely necessary for the efficiency of the institution, and which are quite practicable."

এই প্রস্তাব গৃহীত হলে, বিদ্যাসাগরের নিশ্চিত আশা, সংস্কৃত কলেজ প্রকৃত সংস্কৃতশিক্ষার পীঠস্থান হবে, সংস্কৃত কলেজ উন্নত ধারায় স্বদেশী সাহিত্যের উৎসস্থল হবে এবং এই কলেজের ছাত্রেরাই উপযুক্ত হয়ে উত্তরকালে

স্বদেশবাসীদের মধ্যে সেই সাহিত্যের সম্পদ ব্যাপ্ত করে দেবে।

১৮৫০ সালের ডিসেম্বরে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত ইস্তফাপত্র দাখিল করলেন। ফলে বিদ্যাসাগর, সাহিত্যের অধ্যাপক তো রইলেনই, উপরন্তু, ১৮৫১ সালের ৫-জানুআরি থেকে হলেন সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী সেক্রেটারি।

১৮৫১ সালের ৪-জানুআরি ময়েট সাহেব (কাউন্সিল-অফ-এডুকেশনের সেক্রেটারি) বাঙলা গবর্নমেণ্টকে একখানা চিঠি লিখেছেন, চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি :

"The office of Secretary has been held for the last ten years by Babu Rassomoy Dutt, who has discharged its duties as efficiently as could be expected from an officer unacquainted with, or at all events possessing only a limited knowledge of Sanskrit ; whose whole day was occupied in the performance of arduous and responsible duties in another office, and who could seldom or never have been present in the institution during its working hours, or been able to rectify the abuses likely in such circumstances to occur.

The consequence of this has been that the discipline of the college has become relaxed, little or no reliance can be placed in its registers of attendance ; there is some reason to believe that a fictitious system of admitting pupils to swell the apparent number on the rolls has obtained, and the institution generally is not in the sound, healthy, efficient state which the Council desire.

It is already one of the most costly colleges in Bengal, as the students contribute no schooling fees towards its expenses.

Under a more vigorous and efficient rule it might be rendered of much service in the great movement now taking place to create a vernacular literature for Bengal, and to enrich the language of the Presidency.

The only obstacle to the re-organization of the college having been removed by the resignation of Babu Rassomoy Dutt, the Council beg to recommend the following changes for the sanction of Government.

Had there been an European officer available as well acquainted with Sanskrit, as Dr. Sprenger is with Arabic, the Council would have preferred his appointment as Head of the Sanskrit College, but as this is out of the question the Council are compelled to adopt such means as are available.

They, therefore, suggest that the Sanskrit College be

placed on exactly the same footing as the Madrasa, by the creation of the office of Principal and the abolition of the offices of Secretary and Assistant Secretary.

For the office of Principal by far the fittest person known to the council, or to those well acquainted with the subject whom they have consulted, is Pandit Ishwarchandra Sharma who has been recently appointed to the Professorship of Sahitya. He is not only a first rate Sanskrit Scholar, but is well acquainted with English, and is considered the most elegant Bengali scholar in the Presidency.

His translation of *Chamber's Biography* and the *Betal Panchabingshati* are used in all the Government Colleges and Schools in Bengali as text-books, and he has, for several years past, conducted the Sanskrit College Scholarship Examinations to the entire satisfaction of the Council.

He is, in addition, a man of an amount of decision and energy of character rarely met with in a native of Bengal—qualities essential to the proper discharge of the functions of a Principal. . . ." ॰

কাউন্সিল-অফ-এডুকেশনের প্রস্তাব মঞ্জুর করল গবর্নমেণ্ট। ১৮৫১ সালের ২২-জানুআরি বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হলেন। দেড়শো টাকা মাইনে।

আগে বিদ্যাসাগর একদিনে পায়ে হেঁটে কলকাতা থেকে বীরসিংহে যেতেন, একদিনে বীরসিংহ থেকে কলকাতায় আসতেন। পথের মধ্যে কেবল মসাট নামে এক জায়গায় একবার দাঁড়াতেন, একটা ডাব খেতেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরি করার সময় প্রায়ই বীরসিংহে যাওয়া-আসা করতেন। কিন্তু সংস্কৃত কলেজে চাকরি করার সময় তত ঘন ঘন বীরসিংহে যাওয়া হয়ে উঠত না।

সংস্কৃত কলেজের যখন প্রিন্সিপাল, তখনো তিনি প্রায়ই হেঁটে বীরসিংহে যেতেন।* সঙ্গীদের কারো কাছে ভারী মালপত্র থাকলে বিদ্যাসাগর খানিক মালপত্র নিজে নিতেন, মাথায় নিয়ে হাঁটতেন। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল বিদ্যাসাগর মাথায় মালপত্র চাপিয়ে পায়ে হেঁটে পথ পাড়ি দিচ্ছেন!

---

* উত্তরকালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন : "এই হাঁটাপথে যাইবার সময়ে এক দিনের একটি বৃত্তান্তের গল্প অতি করুণভাবে তিনি (বিদ্যাসাগর) বলিতেন। তিনি বলিতেন 'আমি একদিন বাড়ি যাবার সময় দুপুরের রোদে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের জন্যে একটি খোড়ো বাড়ীর বাহিরের রোয়াকে বোসে আছি, এমন সময়ে বাড়ীর ভেতরে থেকে গুটি দুই-তিন ছেলে নাচত নাচতে আর গানের সুরে চেঁচাতে চেঁচাতে বেরিয়ে এল। তাদের মুখে এই বুলি—আজ আমাদের ডাল হয়েছে, আজ আমাদের ডাল হয়েছে। আমি ত দেখে শুনে অবাক্। ভাবলুম যে, এদের এত দুরবস্থা যে বছরের মধ্যে পাল-পাব্বর্নের মত দু'একদিন ডাল রান্না খেতে পায়! আর বোধ হয় এমন অনেকেই আছে।' এই গল্প করিতে করিতে কখনও কখনও তাঁহার চক্ষুতে জল আসিত।" (বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায়, কলকাতা, ১৩২০, পৃ, ১৩৯)।

একবার একটা কাণ্ড হয়ে গেল।

মাথায় মালপত্র নিয়ে বিদ্যাসাগর তো চলেছেন। কলেজের দুজন দারোয়ানের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল পথে। কলেজের প্রিন্সিপালকে সেই অবস্থায় দেখে ওরা তাঁর কাছ থেকে মালপত্র নেবার বিস্তর চেষ্টা করল। কিন্তু বিদ্যাসাগর কিছুতেই রাজি হলেন না। মিষ্টি কথায় ওদের বিদায় দিয়ে বিদ্যাসাগর মাথায় মালপত্র নিয়ে—যেমন যাচ্ছিলেন—হেঁটে চললেন।[৪]

আরেকবার। সেবার বিদ্যাসাগর বীরসিংহ থেকে কলকাতায় আসছেন। হ্যাঁ, হেঁটেই আসছেন। পথে দেখলেন, একটা মাঠের মধ্যে একজন বুড়ো চাষা মাথায় মালপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হয়েছে কি?

এ একজন জোয়ান ছেলের কাণ্ড। ওই বুড়োর গুণধর ছেলে। জোয়ান ছেলে বুড়ো বাপের মাথায় মালপত্র চাপিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু চলবার শক্তি নেই বুড়োর, তাই সে অমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

জোয়ান ছেলের কথা শুনে আর বুড়ো বাপের অবস্থা দেখে বিদ্যাসাগরের দুচোখ জলে ভরে উঠল। বুড়োর মাথা থেকে মালপত্র নিয়ে বিদ্যাসাগর নিজের মাথায় তুললেন। বুড়োর বাড়ি সেখান থেকে দু-তিন ক্রোশ দূরে। নিজের মাথায় মালপত্র নিয়ে বুড়োকে সেই বাড়িতে পেঁাছে দিয়ে গেলেন বিদ্যাসাগর। তারপর আবার হাঁটতে-হাঁটতে কলকাতায় চলে এলেন।[৫]

হেঁটে বিদ্যাসাগর কখনো ক্লান্ত হননি। জীবনের শেষ অবস্থায় যখন কিছুই খেয়ে হজম করতে পারতেন না, বিদ্যাসাগর ডাক্তারদের জিজ্ঞেস করলেন—কী করলে খেয়ে হজম করা যায়?

ডাক্তারেরা বললেন—খুব হাঁটতে আরম্ভ করুন।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—কতক্ষণ করে হাঁটব?

—যতক্ষণ না ক্লান্তি বোধ করেন।

—তাহলে তো দিনরাত হাঁটতে হয়, কারণ হেঁটে আমি কখনো ক্লান্তি বোধ করি না।[৬]

প্রিন্সিপাল হয়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের বিধি-ব্যবস্থার আমূল অদল-বদল করেছেন।

সংস্কৃত কলেজে নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি ছিল না। ছাত্রেরা তো দূরের কথা, অধ্যাপকেরা পর্যন্ত যখন খুশি কলেজে আসেন, বড়ো দেরি করে আসেন।

বিদ্যাসাগরের একান্ত ইচ্ছা, অধ্যাপকেরা ঠিক সময়ে কলেজে আসেন। কিন্তু সেকথা অধ্যাপকদের মুখ ফুটে বলবার উপায় নেই। এঁদের প্রায় সকলের কাছেই বিদ্যাসাগর এককালে পড়েছেন। এককালে যাঁদের ছাত্র ছিলেন, আজ প্রিন্সিপাল হয়ে কেমন করে তাঁদের মুখ ফুটে ঠিক সময়ে কলেজে আসতে বলবেন!

ভেবেচিন্তে একটা উপায় বের করলেন বিদ্যাসাগর। যখনই দেখেন একজন অধ্যাপক দেরি করে কলেজে আসেন, বিদ্যাসাগর তাড়াতাড়ি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ান, বলেন—এই এলেন নাকি?

কোনো রাগ নয়, কোনো হুকুম নয়, সামান্য একটি জিজ্ঞাসা। কিন্তু তাতেই আশ্চর্য সুফল হল। দিনকয়েকের মধ্যেই দেখা গেল অধ্যাপকেরা সময়মতো কলেজে আসছেন।

তবে একজন অধ্যাপক—নাম জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—কিছুতেই সময়-

মতো আসেন না। সব চেয়ে দেরি করে আসেন তিনি। তাঁকে কিছুই বলতে পারেন না বিদ্যাসাগর। 'এই এলেন নাকি?'—এটুকুও নয়।

তাঁর জন্য অতএব আরেক ব্যবস্থা। জয়নারায়ণের অপেক্ষায় বিদ্যাসাগর চুপচাপ কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। জয়নারায়ণ দেরি করে আসেন, বিদ্যাসাগরের সামনে দিয়ে চলে যান, বিদ্যাসাগর চুপ। দিনের পর দিন এইরকম চলল। শেষপর্যন্ত একদিন জয়নারায়ণ রাগ করে বিদ্যাসাগরকে বললেন—তুমি যে কিছু বলো না, এতেই সর্বনাশ করলে। কিছু বললে একটা জবাব দিতে পারতাম। কেন দেরি হয়, তাও বলতে পারতাম। এমন করে জব্দ করলে আর উপায় কি। আচ্ছা, মরি আর বাঁচি, কাল থেকে ঠিক সময়ে আসব।[৭]

একজন অধ্যাপক একবার বলেছেন—যদিও বিদ্যাসাগর আমার ছাত্র, তবু তার সঙ্গে কথাবার্তা কইতে আমার ভয় হয়।[৮]

সংস্কৃত কলেজে মুগ্ধবোধের চতুর্থ শ্রেণী স্থাপিত হয়েছে ১৮৪৬ সালের মে মাসে। ১৮৪৬ সালের ২০-মে এই শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর। তার আগে প্রায় তিন বছর (১৮৪৩-৪৫) প্রাণকৃষ্ণ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের প্রতিনিধি হয়ে অধ্যাপনা করেছেন।

কয়েক বছর পরের কথা। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। কী একটা কারণে বিদ্যাসাগর প্রাণকৃষ্ণের উপরে বিরক্ত হয়েছেন।

প্রাণকৃষ্ণ একটা আশ্চর্য কাণ্ড করে ফেললেন। দুটি শ্লোক লিখে ফেললেন :

> "মদ্বিধবহুবিধদুর্বিধদৈন্যে
> জ্বলদনলস্ত্বং তৃণ ইব মন্যে।
> কত ইহ শত শত যতনত এষা
> ভবতি ভবভি লিপিরথ সবিশেষা॥
> অহং তবৈবাস্মি নিদেশকারী
> তথা তবৈবাস্মি মতানুসারী।
> অত্রানৃতে কিন্তু বিপত্তি ভারি
> যথা তথাস্তাং ভরসা তোমারি॥"

রাজকুমার সর্বাধিকারী প্রাণকৃষ্ণের একজন ছাত্র। রাজকুমারের হাত দিয়ে প্রাণকৃষ্ণ শ্লোক দুটি পাঠিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগরের কাছে।

শ্লোক পড়ে বিদ্যাসাগর হেসে আকুল।[৯]

ছাত্রেরা যখন খুশি কলেজে আসত, যখন খুশি চলে যেত। সেসব অনিয়ম বিদ্যাসাগর বন্ধ করে দিলেন।

হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন সেকালের সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। উত্তরকালে তিনি লিখেছেন :

"আমি কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, ১০৷৷টা হইতে ৪৷৷টা পর্যন্ত কলেজের কার্য হয়। বিদ্যাসাগর নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন যে, ১০৷৷টা হইতে ১টা পর্যন্ত রোজ পড়া হইবে। তৎপরে ১টা হইতে ২টা পর্যন্ত খেলিবার ছুটি। তৎপরে ২টা হইতে ৪৷৷টা পর্যন্ত সংস্কৃত পাঠনা হইবে। এই নিয়ম অনুসারে প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক মহাশয়দিগকে (ন্যায়, স্মৃতি ও অলংকার—এই তিন শ্রেণীর অধ্যাপকদিগকে) প্রায় বৈকালে আসিতে হইত। এই নিয়ম অনেকদিন চলিয়াছিল। পরে খেলিবার ছুটি আধঘণ্টা হওয়াতে ৪টার পর

কলেজ বন্ধ হইতে লাগিল।

আমরা দেখিয়াছি—বিদ্যাসাগর মহাশয় ১০॥টার ঘণ্টা বাজিলে একবার প্রত্যেক গৃহে শিক্ষক আসিয়াছেন কি না দেখিয়া যাইতেন; খেলিবার ছুটির পর আর-একবার প্রত্যেক গৃহে আসিয়া দেখিয়া যাইতেন। ফলতঃ কলেজটি যেন তাঁহার নিজের সংসার ছিল।”[১০]

যতক্ষণ কলেজে ততক্ষণ বিদ্যাসাগরের গম্ভীর, কঠিন মূর্তি। তাঁর সামনে মাথা তুলে উঁচু গলায় কথা বলবে, এমন সাহস কারো নেই।

কলেজে যখন গোলমাল হত, দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগর এমন গলায় 'আস্তে' বলে উঠতেন, সমস্ত কলেজ মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যেত।

কিন্তু কলেজের বাইরে ছাত্রদের কাছে বিদ্যাসাগরের আবার আরেক রকম চেহারা। যেন তিনি ছাত্রদের কলেজের প্রিন্সিপাল নন, যেন তিনি নিজেও কলেজের একজন ছাত্র।

কী একটা জরুরি কাজে কোথায় একদিন দেরি হয়ে গেল। সেখান থেকে বাড়িতে এসে খাওয়া-দাওয়া করে যেতে হলে কিছুতেই ঠিক সময়ে কলেজে পৌঁছনো যাবে না।

বিদ্যাসাগর তাই আর বাড়ি গেলেন না।

পথে ছাত্রদের বোর্ডিং। সেখানেই ঢুকে পড়লেন। একখানা ভিজে কাপড় পরে কুয়ো থেকে কয়েক ঘটি জল তুলে মাথায় ঢাললেন। ছাত্রেরা খেতে বসেছে, তাদেরই সঙ্গে বসে গেলেন। মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই কত গল্প করলেন, কত হাসি-ঠাট্টা করলেন। ছাত্রদের মহা আনন্দ।

সকলের পাত থেকে একেক থাবা ভাত নিয়ে খাওয়া শেষ করলেন বিদ্যাসাগর। সকলের আগে উঠে পড়লেন, সকলের আগে গিয়ে কলেজে হাজির হলেন।[১১]

এই ঘটনার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে এখানে আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করা যেতে পারে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তখন ছেলেমানুষ। হরপ্রসাদের বাড়ি নৈহাটীতে। সকাল-বেলা বাড়ির মেয়েমহলে একদিন মস্ত সোরগোল উঠল—ওমা, এমন তো কখনো শুনিনি, বামুনের ছেলে অমৃতলাল মিত্তিরের পাত থেকে রুইমাছের মুড়োটা কেড়ে খেয়েছে!

পাঁচজনে পাঁচরকম কথা কইতে লাগলেন : ঘোর কলি! সব একাকার হয়ে যাবে! জাতজন্ম আর থাকবে না!

একজন মিত্তিরের পাত থেকে রুইমাছের মুড়ো কেড়ে খেয়েছে—কে সেই বামুনের ছেলে? হরপ্রসাদের জানতে ইচ্ছা হল।

—কে কেড়ে খেয়েছে?

হরপ্রসাদের মা বললেন—জানিস নি? বিদ্যাসাগর।

—তিনি কি এখানে এসেছেন?

হরপ্রসাদের মা বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ—কাল থেকে এসেছেন।[১২]

আবার সংস্কৃত কলেজের কথায় ফিরে আসা যাক।

বিদ্যাসাগর একদিন দেখলেন, একজন অধ্যাপক ক্লাশের ছেলেদের দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। অধ্যাপককে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন বিদ্যাসাগর। বললেন—কি হে! তুমি যাত্রার দল খুলেছ নাকি? তাই ছোকরাদের তালিম দিচ্ছ? তুমি বুঝি দূতী সাজবে?

আরেকদিন দেখলেন একজন অধ্যাপকের টেবিলে একখানা বেত পড়ে আছে।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—বেত কেন হে?

অধ্যাপক বললেন—মানচিত্র দেখানোর সুবিধা হয়।

বিদ্যাসাগর বললেন—রথ দেখা আর কলা বেচা দুই-ই হয়। ম্যাপ দেখানোও হয়, ছেলেদের পিঠেও পড়ে।[১৩]

বিদ্যাসাগরের ইচ্ছা নয় যে অধ্যাপকেরা ছাত্রদের মারপিট করেন। কিন্তু ছাত্রেরা যদি নিজেদের মধ্যে মারামারি করে?

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ হত, মারামারি হত। নেহাৎ খালি হাতে মারামারি নয়, মারামারির সময় ইট-পাটকেলও ছোঁড়া হত।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা তেতলার ছাদে ইট-পাটকেল যোগাড় করে রাখত, মারামারির সময় উপর থেকে ছুঁড়ে মারত সেসব। বিদ্যাসাগর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতেন, কোন পক্ষের জিত হয়, কোন পক্ষের হার হয়।

কখনো-কখনো এমন সাংঘাতিক মারামারি হত যে পুলিশ এসে যেত অকুস্থলে। মারামারির দাপটে শান্তশিষ্ট ছাত্রেরা ছুটি হয়ে গেলেও ইট ছোঁড়াছুঁড়ির মধ্যে সাহস করে বাড়ি যেতে পারত না, জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকত ক্লাশের মধ্যে। পুলিশ এলে তবে গিয়ে তারা ক্লাশ থেকে বেরত, বাড়ি যেত।[১৪]

সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া আর-কেউ ভর্তি হতে পারত না। ১৮৫১ সালের ৯-জুলাই থেকে বিদ্যাসাগর নিয়ম করলেন, কায়স্থেরাও সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হতে পারবে। অষ্টমী ও প্রতিপদ তিথিতে সংস্কৃত কলেজ বন্ধ থাকত। ১৮৫১ সালের ২৬-জুলাই থেকে বিদ্যাসাগর নিয়ম করলেন, অষ্টমী ও প্রতিপদে নয়, কেবলমাত্র রবিবার সংস্কৃত কলেজ বন্ধ থাকবে। ১৮৫১ সালের ডিসেম্বরে নিয়ম হল, যে-কোনো সম্ভ্রান্ত হিন্দু-সন্তান সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হতে পারবে।

হিন্দু কলেজ ও মাদ্রাসার কৃতবিদ্য ছাত্রেরা ডেপুটিগিরি পায়, কিন্তু সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের সেই সুযোগ দেওয়া হয় না।

১৮৫২ সালের ১৩-জানুআরি বিদ্যাসাগর কাউন্সিল-অফ-এডুকেশনের সেক্রেটারিকে লিখেছেন :

"It is well-known that several distinguished pupils of the Hindu College, and some of the Madrasa have been honoured by Government with appointments as Deputy Magistrates, but such favour has in no instance been extended towards the pupil of the Sanskrit College. Though the majority of these pupils, it must be admitted, are not in affluent circumstances, still it must be borne in mind that they are all drafted from the most intelligent and respected classes of the Hindu Community and that not a few among them enjoy an indisputably high and respectable position in native society. There is, however, no doubt that the education received at the Hindu College is superior and it is to

be expected that the students of that institution should receive greater consideration. But I would beg leave to submit, that the qualifications of the students of the Sanskrit College are at least equal to those of the students of the Madrasa. In both cases the study of a classical oriental language forms the basis of the educational course, and a fair proficiency in English is encouraged as an adjunct, which is attained by a few in each of these institutions. The Sanskrit College has, however, one important advantage over every other collegiate establishment. The course of study here adopted enables its students to acquire a thorough knowledge and a complete mastery of the Bengali language, in which the business of the mofussil is transacted.

Under these circumstances I trust I may be excused for bringing thus prominently the claims of the institution under my charge to the notice of the Council of Education whose powerful influence I hope may be used to induce the Government of Bengal to show that consideration and to afford that encouragement to the Sanskrit College which have already been extended to other educational institutions. The principles of equal and impartial but discriminating encouragement to the several Government Colleges being once admitted it would not be difficult to select a few well-educated past students of the Sanskrit College who would be found in every way qualified to enter the service as Deputy Magistrates."[১৫]

বিদ্যাসাগরের অনুরোধ ব্যর্থ হয়নি। সংস্কৃত কলেজে ছাত্রদের পরে ডেপুটিগিরি দেওয়া হত।

১৮৫২ সালের ১২-এপ্রিল বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে 'Notes on the Sanscrit College' শীর্ষক আরেকটি পরিকল্পনা দাখিল করেছেন।

এই পরিকল্পনা প্রসঙ্গে হ্যালিডে, ১৮৫২ সালের ৩০-জুন, লিখেছেন :

"The accompanying paper has been drawn up by the Principal of the Sanscrit College at my request.

It is the result of several consultations I have held with the Principal and I lay it before the Council as deserving, in my humble judgement, of very careful consideration."

সংস্কৃত কলেজের জন্ম ১৮২৪ সালে। সেই সময় থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ছাত্রেরা এই কলেজে বিনা মাইনেয় পড়েছে, ভর্তি হতেও পয়সা লাগেনি। কিন্তু তার ফল সবসময় ভালো হয়নি। হয়তো কেউ ভর্তি হয়ে চলে গেছে, দিনের পর দিন যাচ্ছে, সেই ছাত্রের আর দেখা নেই। অনেকদিন পর হাজিরাখাতা

থেকে নাম কাটা গেল, তখন হয়তো ছাত্রটি এসে উপস্থিত। আবার ভর্তি হতে এসেছে। পয়সা-কড়ি যখন লাগে না, তখন আর বাধা কোথায়।

তা এভাবে চললে কলেজে শৃঙ্খলা থাকে না।

১৮৫২ সালের আগস্ট মাস থেকে বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় নিয়ম হল, সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হতে দু-টাকা লাগবে। হাজিরাখাতা থেকে একবার নাম কাটা গেলে আবার ভর্তি হতে আবার ওই দু-টাকা দিতে হবে।

যাতে অল্পসময়ে ছাত্রেরা মোটামুটি সংস্কৃত শিখতে পারে, সেজন্য বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে পড়াশোনার রীতিনীতি নতুন রকম করে দিলেন। "পূর্ব্বে বোপদেবের 'মুগ্ধবোধ' ছিল ব্যাকরণের একমাত্র পাঠ্য পুস্তক। সংস্কৃত শিক্ষার গোড়াতেই সংস্কৃতে লেখা এই দুরূহ ব্যাকরণখানি ছেলেদের পড়িতে হইত। এখানি আয়ত্ত করিতে লাগিত চার-পাঁচ বৎসর; তাও ছেলেরা অর্থ না বুঝিয়াই মুখস্থ করিত। কাজেই সংস্কৃত-সাহিত্য পড়িবার সময় এই মুখস্থ বিদ্যা বিশেষ কাজে লাগিত না; দেখা যাইত, ভাষায় তাহারা আশানুরূপ অধিকার লাভ করে নাই। বিদ্যাসাগর ছেলেদের বাধাটুকু বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন, বাঙালী ছাত্রকে সংস্কৃত শিখাইতে হইলে বাংলায় ব্যাকরণ পড়াইতে হইবে। তিনি 'মুগ্ধবোধ' পড়ান বন্ধ করিলেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে বাংলায় লেখা স্বরচিত 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী' ধরাইলেন। এই সংগে 'ঋজুপাঠ'ও পড়ান হইতে লাগিল। সংস্কৃত গদ্য ও কাব্য হইতে কতকগুলি নির্ব্বাচিত অংশ 'ঋজুপাঠে' সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই নব ব্যবস্থার ফল ভালই হইল। সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে এই ব্যবস্থায় সংস্কৃতে মোটামুটিরূপে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে তিন বৎসরের বেশী সময় লাগে না।"[১৬]

আগেই বলা হয়েছে, ১৮২৭ সালের মে-মাসে সংস্কৃত কলেজে একটি ইংরেজি শ্রেণী খোলা হয়েছিল। আট বছর বাদে সেটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আবার সেটি খোলা হয় ১৮৪২ সালের অক্টোবরে। কিন্তু সেবারেও তেমন সুফল পাওয়া যায়নি।

বিদ্যাসাগরের বদ্ধমূল বিশ্বাস, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের একই সংগে সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠা দরকার। সেরকম ব্যবস্থা করতে হলে সংস্কৃত কলেজ নতুন করে গড়ে তুলতে হয়, আরো টাকা চাই। এই বিষয়ে বিদ্যাসাগর, ১৮৫৩ সালের ১৬-জুলাই, কাউন্সিল-অফ-এডুকেশনকে একখানা চিঠি লিখেছেন।

কলকাতার সংস্কৃত কলেজকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ করে যাচ্ছেন বিদ্যাসাগর, এই সময়ে কাউন্সিল-অফ-এডুকেশনের আমন্ত্রণে কলকাতার সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করতে এলেন, ১৮৫৩ সালের মাঝামাঝি, কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ জে. আর. ব্যালাণ্টাইন। বিদ্যাসাগরের সংগে আলাপ হল ব্যালাণ্টাইনের। আলাপে আনন্দিত হলেন ব্যালাণ্টাইন।

কলকাতার সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে ব্যালাণ্টাইন একটি রিপোর্ট দাখিল করলেন কাউন্সিল-অফ-এডুকেশনে।

১৮৫৩ সালের ২৯-আগস্ট কাউন্সিল-অফ-এডুকেশন ব্যালাণ্টাইনের রিপোর্টটি বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠিয়ে দিল। রিপোর্টে ব্যালাণ্টাইন কলকাতার সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর যেসব ব্যবস্থা করেছেন, সেসবের কিছু কিছু অদল-বদল করার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর ব্যালাণ্টাইনের রিপোর্টের সংগে সম্পূর্ণ একমত হতে পারলেন না। সেবিষয়ে বিদ্যাসাগর একখানা চিঠিতে

আপন বক্তব্য কাউন্সিল-অফ-এডুকেশনকে জানিয়ে দিলেন। এই চিঠিখানা বাঙলাদেশে শিক্ষার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই চিঠিতেই বিদ্যাসাগর ব্যক্ত করেছেন যে বেদান্ত ও সাংখ্য ভ্রান্ত দর্শন। ("That the Vedanta and Sankhya are false systems of philosophy is no more a matter of dispute.")

উত্তরকালে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী লিখেছেন: "এখন বিদ্যাসাগরের এই উক্তিটির মূল্য, গুরুত্ব ও সম্ভাবনা অসীম। অক্ষয় দত্তর প্ররোচনায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদ পৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া মানসিক জগতে বিপ্লব ও অরাজকতার যে-সম্ভাবনা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, ১৮৭২ সালের তিন আইনে বিবাহের সুযোগ গ্রহণের জন্য কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মগণ হিন্দু নয় স্বীকার করিয়া যে-সমাজবিপ্লব ও ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব অবসানের যে সূচনা করিয়া দিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরের 'বেদান্ত ও সাংখ্য ভ্রান্ত দর্শন' উক্তি তাহার চেয়ে কম বৈপ্লবিক সম্ভাবনাস্থল নহে। তার পরে এই উক্তির গুরুত্ব শতগুণ বাড়িয়া যায় যখন স্মরণ করি যে, বিদ্যাসাগর ছিলেন দেশের সংস্কৃতচর্চার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ পুরুষ (অধ্যক্ষ), নিজে ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশের সন্তান, সংস্কৃত সাহিত্য দর্শন প্রভৃতিতে 'বিদ্যাসাগর'। আজকার দিনে কয়জন দায়িত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে, লিখিত আকারে মন্তব্য করিতে পারেন যে 'বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শন ভ্রান্ত'? বোধ করি কেহই পারেন না, যদিচ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, মনে মনে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি ঐ দুই দর্শনকে, অন্তত বেদান্তকে, 'ভ্রান্ত দর্শন' মনে করিয়া থাকেন। এই উক্তিটির জন্যই পণ্ডিত সমাজের গোঁড়া অংশ এখনো বিদ্যাসাগরকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই।...আমার তো মনে হয়, প্রকাশ্যে বেদান্তকে ভ্রান্ত দর্শন ঘোষণা করাই দুঃসাহসী বিদ্যাসাগরের দুঃসাহসিকতম কার্য, তুলনায় বিধবাবিবাহ-সমর্থন বা বহুবিবাহ-প্রতিকূলতা নিতান্ত ছেলেখেলা; ঐ এক উক্তির দ্বারা ভারতের বহুযুগসঞ্চিত সংস্কার ও অহম্মন্যতার মূলে আঘাত করিয়াছেন।"[১৭]

১৮৫৩ সালের ১৪-সেপ্টেম্বর কাউন্সিল-অফ-এডুকেশন মন্তব্য করেছে:

"That the Council are gratified to find that Dr. Ballantyne reports generally so favourably on the present course of instruction and state of progress in the Sanskrit College, and that the Principal of the College be informed that he will be expected by the Council to continue that course, the success of which must however obviously depend on the competency of the teachers employed to give instruction in the most advanced works of Mental Pnilosophy by English as well as by Sanskrit authors; that for the attainment of such success the Council relies mainly on the great zeal and ability of the Principal himself and that they would, at the same time, desire the Principal freely to avail himself of the Abstracts and Treatises compiled by Dr. Ballantyne, the use of which must be in the highest degree valuable in explanation and illustration of the subjects of his own lectures and of those of the instructors under him.

All students of these subjects would indeed in the opinion of the Council derive essential aid from a familiarity with Dr. Ballantyne's works. The Principal will, also, be in frequent communication with Dr. Ballantyne on the progress of his classes, and the council would wish to see a free interchange of suggestions between the heads of the two important institutions at Benares and in Calcutta with a view to the continuing improvement of their several courses of instruction and to the establishment as far as possible of a common terminology in the rendering from English into Sanskrit or *vice versa* of the original expressions, in use in each language respectively, in the exposition or discussion of philosophical subjects." [১৮]

কিন্তু কাউন্সিল-অফ-এডুকেশনের এই নির্দেশ মেনে নিতে পারলেন না বিদ্যাসাগর। ১৮৫৩ সালের ৫-অক্টোবর বিদ্যাসাগর কাউন্সিল-অফ-এডুকেশনের সেক্রেটারিকে একখানা আধা-সরকারী চিঠি লিখেছেন। ঈষদংশ উদ্ধার করি :

"Leave me to teach Sanskrit for the leading purpose of thoroughly mastering the vernacular and let me superadd to it the acquisition of sound knowledge through the medium of the English and you may rest assured that before a few years are over I shall be enabled, if supported and encouraged by the Council, to furnish you with a body of young men who will be better qualified by their writings and teaching to disseminate widely among the people sound information than it has hitherto been possible to accomplish through the instrumentality of the educated classes of any of your colleges whether English or Oriental. To enable me to carry out this great—this darling object of my wishes I must (excuse the strong word) to a considerable extent be left unfettered. So far as I can approve of Dr. Ballantyne's abstracts and treatises—such for instance as his excellent edition of the *Novum Organum* in English, I will avail myself of them most readily and cheerfully. But if compelled to adopt all his compilations without any reference to my own humble judgment as to their utility and value or to their adoptation to the peculiar wants of the institution over which I have the honour to preside 'my occupation is gone'. Such a system would break in upon and interrupt my own plan of instruction and in spite of my sense of duty as a servant of the Council the responsibility which I now keenly feel will be assuredly weakened if not destroyed."

এই চিঠিতে সুফল পাওয়া গেল। কলকাতার সংস্কৃত কলেজকে নিজের

ইচ্ছামতো গড়ে তুলতে লাগলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫৩ সালের নভেম্বরে কলকাতা সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি শ্রেণীর জন্য নতুন, বিস্তৃত ও নিপুণ নিয়মাবলী রচিত হল। ইংরেজি হয়ে উঠল অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়। আগে অঙ্ক শেখানো হত সংস্কৃতে, পড়ানো হত ভাস্করাচার্যের 'লীলাবতী' ও 'বীজগণিত'। বিদ্যাসাগর সে-ব্যবস্থা লুপ্ত করে দিলেন, অতঃপর ইংরেজিতেই অঙ্ক শেখানো হতে লাগল।

নতুন ব্যবস্থা বিফল হয়নি। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রসংখ্যা বেড়ে গেল। কাউন্সিল-অফ-এডুকেশন তুষ্ট হল। ১৮৫৪ সালের জানুআরি মাস থেকে বিদ্যাসাগরের মাইনে বেড়ে গেল। তিনশো টাকা মাইনে হল।

১৮৫৪ সালের ৪-জানুআরি 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছে : "গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটারি নানা শাস্ত্রাধ্যাপক পরম পণ্ডিতবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও কার্য্যদক্ষতা এবং এই দেশ মধ্যে বিদ্যা প্রভা সন্দীপন বিষয়ে অবিচলিত অনুরাগ দৃষ্টি করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহার মাসিক বেতন তিনশত টাকা নিরূপণ করিয়াছেন, পূর্ব্বে তিনি ১৫০ টাকা প্রাপ্ত হইতেন। শিক্ষা কৌন্সেলের মেম্বর মহাশয়দিগের এই বিবেচনা অতি সুবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তুল্য সর্ব্ব বিষয়ে সুযোগ্য এবং সরল স্বভাব ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের অধীনে প্রায় দৃষ্ট হয় না, এতদ্দেশীয় লোকেরা সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় সুপণ্ডিত হয়েন এই উদ্দেশে তিনি অবিশ্রান্তরূপে পরিশ্রম করিতেছেন, স্বয়ং অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা সংস্কৃত কালেজে যে সকল সুনিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তত্তাবৎ ছাত্রদিগের পক্ষে অতিশয় মঙ্গলজনক বলিতে হইবেক, অতএব এতাদৃশ সুযোগ্য ও সুপণ্ডিত লোকের মহদ্‌গুণের পুরস্কার করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে, এজন্য তাঁহারা প্রতিষ্ঠা পাইতে পারেন না, না করিলে বরং অবিবেচনা প্রচার হইতে পারে।"

১৮৫৪ সালের জুন মাস থেকে নিয়ম হল, সংস্কৃত কলেজে আর বিনা মাইনেয় পড়া যাবে না, এক টাকা মাইনে দিয়ে পড়তে হবে।

১৮৫৪ সালের ১৭-জুন 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছে : "...বিবিধ বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ কালেজের প্রিন্সিপেলের পদে অভিষিক্ত হওনাবধি ক্রমে তথাকার ছাত্রদিগের শিক্ষার আতিশয্য ও নিয়মাদি উৎকৃষ্ট হইতেছে, একারণ শিক্ষা সমাজের মেম্বরগণ এবং গবরনর জেনরল সাহেব তাঁহার নিকটে সংপূর্ণ বাধ্যতা স্বীকার করিয়াছেন।"

সিপাহী বিদ্রোহের সময় মিলিটারি বিভাগ ১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের বাড়ি দখল করে। এই বাড়িতে আহত সৈন্যদের জন্য হাসপাতাল খোলা হয়। ১১০, বৌবাজার স্ট্রীটে একটি বাড়ি পঁচাত্তর টাকায় ভাড়া নেওয়া হয়; ৯২, বৌবাজার স্ট্রীটে আর একটি বাড়ি তিরিশ টাকায় ভাড়া নেওয়া হয়। আটটা ক্লাশ হত সেখানে।

১৩১, বৌবাজার স্ট্রীটে আরেকটি বাড়ি একশো চল্লিশ টাকায় ভাড়া নেওয়া হয়। বাকি ক্লাশগুলো সেই বাড়িতে হত।[১১]

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "তিনি (বিদ্যাসাগর) পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যে সম্মিলনের সেতুস্বরূপ হয়েছিলেন...। তিনি যা-কিছু পাশ্চাত্ত্য তাকে অশুচি বলে অপমান করেননি। তিনি জানতেন, বিদ্যার মধ্যে পূর্ব্ব-পশ্চিমের দিগ্‌বিরোধ নেই। তিনি নিজে সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন অথচ

তিনিই বর্ত্তমান য়ুরোপীয় বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর করবার প্রধান উদ্যোগী হয়েছিলেন...।"[২০]

সরকারী কর্মচারীরা বিদ্যাসাগরকে সম্মান করে চলতেন। শিক্ষা বিষয়ের কাজকর্মে তাঁরা বিদ্যাসাগরের পরামর্শ নিতেন।

কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে য়ুনিভার্সিটি খোলার জন্য একটা কমিটি হয়েছে। বিদ্যাসাগর সেই কমিটির একজন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। কলকাতা য়ুনিভার্সিটি হওয়ার পর বিদ্যাসাগর এই য়ুনিভার্সিটির একজন 'ফেলো' মনোনীত হয়েছেন। এখানে বলে রাখা ভালো, ১৮৮৩ সালে বিদ্যাসাগর পঞ্জাব-য়ুনিভার্সিটির 'ফেলো' মনোনীত হয়েছেন।

আরেকটা আশ্চর্য খবর, সংস্কৃত কলেজে একটা কুস্তির আড্ডা করেছিলেন বিদ্যাসাগর।

হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন লিখেছেন: "সংস্কৃত কলেজের ঈশান কোণে একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা ঝুলানো ছিল। ঐ ঘণ্টা বাজিলে বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইত। ঐ ঘণ্টা-গৃহের পূর্ব্বদিকে একটি মালীর ঘর ছিল। ঐ ঘরে অধ্যাপক মহাশয়গণ বিশ্রাম করিতেন ও কেহ-কেহ তামাক খাইতেন। ঐ গৃহের পূর্ব্ব-দিকে আর-একটি বৃহৎ 'হল্' ঘর ছিল। ঐটিতে 'পণ্ডিতগণ' কুস্তি প্রভৃতি ব্যায়াম করিতেন। আমি "পণ্ডিতগণ" বলিলাম, তাহার কারণ, উর্ধ্বতন অধ্যাপক-মহাশয়-চতুষ্টয় অর্থাৎ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় ঐ কুস্তির আড্ডায় যোগ দিতেন না। অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠ পণ্ডিতগণ অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, এবং তারাশঙ্কর তর্করত্ন—এই কয়েকজন কুস্তির আড্ডায় যোগ দিতেন...। এই ব্যায়াম-কার্য্য বিদ্যাসাগর-মহাশয় স্থাপিত করেন এবং এ কার্য্যে তাঁহার খুব উৎসাহ ছিল। এই ব্যায়াম করাতেও পণ্ডিতমহাশয়গণ সকলেই খুব সুস্থশরীর ছিলেন এবং প্রায় রোগে পড়িতেন না।...বিদ্যাসাগর-মহাশয় খুব সুস্থ শরীর ছিলেন।"[২১]

বিদ্যাসাগর একবার কিছুদিনের জন্য সংস্কৃত কলেজের কোনো একটা ক্লাশে ইংরেজি পড়াতে দিলেন কালীচরণ ঘোষকে। কালীচরণের গুণ-যোগ্যতা আছে।

কিন্তু কালীচরণের বয়স অল্প। সেই ক্লাশের ছাত্রদের তাই কালীচরণকে পছন্দ হয়নি। এমন অল্পবয়সী মাস্টারের কাছে আবার পড়া কিসের? কয়েকজন ছাত্র দল বেঁধে অপদস্থ করার চেষ্টা করতে লাগল কালীচরণকে। কলেজ থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য উঠে-পড়ে লাগল।

বিদ্যাসাগর বিরক্ত হলেন। খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন, কোন-কোন ছাত্র কালীচরণের বিরুদ্ধে লেগেছে।

কিন্তু কাউকে ধরা যাচ্ছে না। কোনো ছাত্র দোষ কবুল করছে না। দোষী কেউ-কেউ নিশ্চয়ই আছে এই ক্লাশে, অথচ সত্য বলার সাহস নেই কারো। মিথ্যাবাদী, মিথ্যাবাদী। বিদ্যাসাগর কোনো মিথ্যা সহ্য করার মানুষ নন। তিনি তখন ওই ক্লাশের সব ছাত্রকে কলেজ থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

ছাত্রেরা দল বেঁধে নালিশ করল কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে। বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে নালিশের দরখাস্ত দিল। কর্তৃপক্ষ এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের বক্তব্য জানতে চাইল।

সেই ক্লাশের ছাত্রদের মহাফূর্তি। এবার নির্ঘাত বিদ্যাসাগরের চাকরি যাবে। আনন্দে দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল তারা, বলাবলি করতে লাগল—এবার চাকরি তো যায়, উপায় কি হবে? দাঁড়িপাল্লা ধরতে হবে যে!

অর্থাৎ, চাকরি যাবার পর অবশ্যই বিদ্যাসাগরকে মুদিখানা খুলে পেট চালাতে হবে!

এদিকে বিদ্যাসাগর কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন—কলেজের ভিতরে ছোটো-খাটো বিষয় সম্পর্কে প্রিন্সিপালের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকা দরকার। এসব ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ যদি ছাত্রদের নালিশ করার সুযোগ দেয় তো ছাত্রেরা প্রশ্রয় পেয়ে যাবে, ওদের আর শাসনে রাখা যাবে না।

খাঁটি কথা। বিদ্যাসাগরের কথা মেনে নিল কর্তৃপক্ষ। ছাত্রদের দরখাস্ত-টরখাস্ত পাঠিয়ে দিল বিদ্যাসাগরের কাছে। ওই ছাত্রদের কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিল—এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগর যা করবেন, তাই হবে।

সর্বনাশ হল তাহলে। বিদ্যাসাগর দাঁড়িপাল্লা ধরবেন কি না, সে তো বহু দূরের কথা, এখন এদের কি উপায় হবে।

না, বিদ্যাসাগরের পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

কিন্তু কোন ছাত্র প্রথম এগিয়ে যাবে? প্রথম গিয়ে বিদ্যাসাগরের পায়ে পড়বে? কারো সাহস হয় না।

ক্রমশ ছাত্রদের অভিভাবকেরাও জানতে পারলেন ঘটনা। সমস্ত সমস্যার যাতে একটা সুষ্ঠু সমাধান হয়, সেজন্য কয়েকজন অভিভাবক এলেন বিদ্যা-সাগরের কাছে। বিদ্যাসাগর বলে দিলেন—ছাত্রদের কালীচরণের কাছে পাঠান।

কালীচরণের কাছে গেল ছাত্রের দল। দোষ স্বীকার করল, ক্ষমা চাইল। ছাত্রদের নিয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে চলে এলেন কালীচরণ।

দলের দু-একজন পাণ্ডাকে বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—কি রে, দাঁড়ি-পাল্লা কে ধরবে? তোরা, না আমি?

পাণ্ডারা চুপ।

বিদ্যাসাগর কালীচরণকে বললেন—কেমন, এরা তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে তো?

কালীচরণ বললেন—আমি আসতে রাজি হইনি। এরা অনেক অনুনয়-বিনয় করেছে, নিজেদের দোষ কবুল করেছে। তাই সঙ্গে এসেছি। এখন আপনার যা ইচ্ছে হয় করুন।

বিদ্যাসাগর কালীচরণকে বললেন—তুমি মাপ করতে বললে এদের মাপ করব, নয়তো করব না।

ভেবেচিন্তে কালীচরণ বললেন—এরা আমার কাছে যতখানি অপরাধ করেছে তার চেয়ে ঢের বেশি অপরাধ করেছে আপনার কাছে। আপনি যা ইচ্ছে করুন। আমাকে ভার দেবেন না।

ছাত্রেরা বিদ্যাসাগরের পায়ে ধরে কাঁদতে লাগল—আর কখনো এমন কাজ করব না। আমাদের ক্ষমা করুন।

ক্ষমা চাইলে বিদ্যাসাগর বিমুখ হতে পারেন না। বললেন—যা, পা ছেড়ে দে। কলেজে যাস।[২২]

আরেকটা খবর বলা যেতে পারে এখানে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ভেঙে গেল। তার বদলে ১৮৫৪ সালের জানুআরিতে হল বোর্ড-অফ-একজামিনার্স।

ওই বোর্ডের একজন সদস্য করে নেওয়া হল বিদ্যাসাগরকে। ১৮৬০ সালের মে-মাসে বিদ্যাসাগর সেখানে ইস্তফা দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর, ১৮৬০ সালের ২৫-মে, বেঙ্গল গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারিকে একখানা চিঠিতে লিখেছেন :

"I have the honor to request the favor of your moving His Honor the Lieutenant-Governor of Bengal to permit me to resign the office of member of the Board of Examiners. The reasons which have induced me to adopt this course have been explained to His Honor in a personal interview I had with him some days ago." [২০]

সংস্কৃত কলেজ বিদ্যাসাগরের কাছে বিপুলভাবে ঋণী।

১৮৬৩ সালের ১২-জানুআরি 'সোমপ্রকাশ' লিখেছে : "ইহা (সংস্কৃত কলেজ) উন্নতিলাভ বিষয়ে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকটে সর্ব্বতো-ভাবে ঋণী হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের অধ্যক্ষতা ভারগ্রহণের পর অবধিই ইহার ইদানীন্তন উন্নতির সোপান সংঘটিত হয়। ১৮৫১-৫২ অব্দে তিনি নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। তাহার মনোহর ফল আজি আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এ বর্ষে এই কালেজের ৯ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং ৩ জন এল. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বিদ্যাসাগর প্রণীত প্রণালী অনুসৃত না হইলে আজি আমরা কোনরূপেই ঈদৃশ ফল দর্শনে সমর্থ হইতাম না, একথা বলিলে বোধ হয় কেহ আমাদিগকে অত্যুক্ত বাদী বলিয়া দূষিতে পারেন না।"

কারো-কারো বিবেচনায় গ্রীষ্মকালে কলকাতায় লোকজনের দু-মাস ছুটি থাকা উচিত, কেননা 'এ সময়ে অল্প পরিশ্রমেই শরীর নিতান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে।' কলকাতার সমস্ত কাজকর্ম দু-মাস বন্ধ রাখা সম্ভব নয়, অতএব কারো-কারো প্রস্তাব, 'যতদূর বন্ধ করা সাধ্যায়ত্ত হয়, ততদূর করা কর্ত্তব্য।' সংস্কৃত কলেজে গ্রীষ্মকালে দীর্ঘ ছুটি থাকে এবং তার মূলে বিদ্যাসাগর। ১৮৬৩ সালের ২০-এপ্রিল 'সোমপ্রকাশ' লিখেছে : "এ বিষয়ে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ অতিশয় সৌভাগ্যশালী। ৪ঠা বৈশাখ অবধি ইহার গ্রীষ্মাবকাশ আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই সৌভাগ্যের মূল। তিনি কালেজের অন্য অন্য মহোপকারের ন্যায় এই একটী মহোপকার করিয়াছেন। সংস্কৃত কালেজের প্রতিবেশি বিদ্যালয়গুলি অধ্যক্ষদিগের বিবেচনার দোষে এরূপ সৌভাগ্য সম্পন্ন নহে। তথায় গ্রীষ্মাবকাশ নাই এমন নয়, কিন্তু অধ্যক্ষেরা যাবৎ গ্রীষ্মকাল অবকাশ না দিয়া শীতকালে এক মাস এবং গ্রীষ্মকালে কয়েকদিন মাত্র অবকাশ দেন।..."

সাত

বাঙলাশিক্ষা প্রচলনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের দান অসামান্য। বিদ্যাসাগরের এই অসামান্য দান সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা নয়, নিঃসন্দেহে একটি ধারাবাহিকতার অচ্ছেদ্য অংশ। বিদ্যাসাগরের এই অসামান্য দানের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আগে কিছুক্ষণের জন্য আরো অনেক পুরনো কথায় চলে যাওয়া দরকার।

এদেশে জনশিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন ভারতবর্ষের বড়লাট লর্ড ময়রা (১৮১৩-২২)। দেশীয় পাঠশালাগুলোর উন্নতি ও প্রসারের জন্য সরকারী ভাণ্ডার থেকে অর্থব্যয়ের সুপারিশ করেছিলেন তিনি।

১৮১৫ সালের ২-অক্টোবর লর্ড ময়রা মন্তব্য করেছেন :

" . . . These men (the humble but valuable class of village schoolmasters) teach the first rudiments of reading, writing and arithmetic for a trifling stipend which is within reach of any man's means, and the instruction which they are capable of imparting, suffices for the village zeemeendar, the village accountant and the village shop-keeper.

As the public money would be ill-appropriated in merely providing gratuitous access to that quantum of education which is already attainable, any intervention of government either by superintendence, or by contribution, should be directed to the improvement of existing tuition, and to the diffusion of it to places and persons now out of its reach. Improvement and diffusion may go hand in hand; yet the latter is to be considered matter of calculation, while the former should be deemed positively incumbent. . . ." ১

কিন্তু বহুকাল এ-বিষয়ে সরকার কিছুই করেনি। সেই সময়ে অবশ্য কলকাতা ও কাছাকাছি অঞ্চলে জনশিক্ষা বিষয়ে নানারকম বেসরকারী প্রচেষ্টা দেখা গেছে। পাদরীসাহেবেরা এগিয়ে এসেছেন।

১৮১৩ সালের সনন্দ অনুসারে পাদরীসাহেবেরা ভারতবর্ষের সর্বত্র অবাধ গতায়াতের অধিকার পেলেন। নানা অঞ্চলে তাঁদের উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। বলে রাখা ভালো, সেসব বিদ্যালয়ে গোড়া'র দিকে খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে কোনো বই পড়ানো হত না।

পাদরী রবার্ট মে-র পাঠশালা থেকে আরম্ভ করা যাক।

১৮১৪ সালের জুলাই মাসে চুঁচুড়ায় আপন বসতবাড়িতে রবার্ট মে একটি অবৈতনিক পাঠশালা খুললেন। পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা দ্রুত বেড়ে গেল। অতএব পাঠশালার জায়গা বদল করতে হল। মে-সাহেবের বসতবাড়ি থেকে

পাঠশালা চলে গেল দুর্গের মধ্যে একটা বড়ো ঘরে। এ-বিষয়ে সাহায্য করেছেন স্থানীয় ব্রিটিশ কমিশনার গর্ডন ফোর্বস।

ছাত্রসংখ্যা বাড়তির দিকে। অক্টোবরের মধ্যে বিরানব্বুইজন ছাত্র হল।

১৮১৫ সালের জানুআরি মাসে রবার্ট মে কাছাকাছি গ্রামে আরেকটি পাঠশালা খুললেন। একবছরের মধ্যে মে-সাহেব ষোলোটি পাঠশালা খুললেন, ৯৫১জন ছাত্র। মে-সাহেবের সমস্ত পাঠশালায় পড়ানো হত 'বেল' পদ্ধতিতে—কিন্তু দেশীয় রীতি পুরোপুরি বিসর্জিত হয়নি। সর্দারপোড়ো ছিল সর্বত্র, শিক্ষকেরা ওদের সাহায্য নিতেন। শিক্ষক মাইনে পেতেন হিসেব মতো—প্রতি চল্লিশজন ছাত্রের জন্য পাঁচটাকা, তারপর প্রতি কুড়িজন ছাত্রের জন্য একটাকা। পরে প্রতি দশজনেই শিক্ষক একটাকা হিসেবে মাইনে পেতেন। ছাত্রের সংখ্যা যদি পাঠশালায় একশোজন হয়ে যায় তাহলে শিক্ষকের মাইনে দশটাকা। ফলে, শিক্ষকেরাও ছাত্র যোগাড় করতে উৎসাহী হতেন।

১৮১৫ সালে ফোর্বস সাহেব উদ্যোগী হলেন, মে-সাহেবের পাঠশালাগুলোর জন্য মাসিক ছশো টাকা সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হল। সরকারী তরফ থেকে ওই পাঠশালাগুলোর তত্ত্বাবধানের ভার পেলেন ফোর্বস সাহেব।

আগেই বলা হয়েছে, মূল পাঠশালাটি ছিল দুর্গের মধ্যে। আবার জায়গা বদল হল। মে-সাহেব সেটিকে নিয়ে গেলেন চুঁচুড়ার অল্প কিছু দূরে। ১৮১৬ সালে মে-সাহেবের পাঠশালা ও ছাত্রের সংখ্যা বেড়ে গেল। তখন ২১৩৬ জন ছাত্র। উপযুক্ত শিক্ষক গড়ে তোলার জন্য মে-সাহেব এই সময়ে একটি নর্মাল স্কুলও স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু সেটি দীর্ঘায়ু হল না, বছর-খানেক বাদে উঠে গেল। ওদিকে সরকারী সাহায্য বেড়ে গিয়ে মাসিক আটশো টাকা হল।

১৮১৮ সালের আগস্ট মাসে মে-সাহেব মারা গেলেন। রেখে গেলেন ছত্রিশটি পাঠশালা, প্রায় তিন হাজার ছাত্র।

Charles Lushington লিখেছেন: "In August 1818, Mr. May's course of usefulness was arrested by death: but this excellent man was not removed from the scene of his labors, until he had witnessed how complete was their present beneficial operation, to which satisfaction he might have added, had his modest and unassuming nature admitted of it, the anticipation that future generations would be indebted to his care, for their redemption from ignorance and degradation. At the time of his decease, the existence of 36 schools attended by above 3,000 Natives, both Hindoos and Mohomedans, attested his zeal, his prudence and benevolent perseverance; and surely if the consciousness of having done good can furnish consolation, at the dying hour, his reflections must have cheered him in his awful extremity, and soothed the pangs of dissolution." [২]

মে-সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর পাঠশালাগুলোর ভার নিলেন পীয়ার্সন আর হার্লি সাহেব। ১৮২১-২২ সালে মে-সাহেবের কয়েকটি পাঠশালা উঠে গেল। ১৮২৪ সালে মে-সাহেবের সমস্ত পাঠশালার ভার নিল জেনারেল কমিটি

অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন। কমিটি এই পাঠশালাগুলোর বিশেষ পক্ষপাতী নয়। কমিটির বিবেচনায় এই পাঠশালাগুলোর জন্য দেশীয় পাঠশালাগুলোর ক্ষতির আশঙ্কা।

১৮৩২ সালে কমিটি মে-সাহেবের পাঠশালাগুলোর ভার তুলে দিল একটি খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচার সমিতির হাতে—নাম, 'Incorporated Society for propagation of the Gospel in Foreign Parts'.

কিছুকাল পরে এই সমিতির হাত থেকে আবার পাঠশালার ভার নিয়ে নিতে হল জেনারেল কমিটিকে। ওই কমিটি একটি সেণ্ট্রাল বাঙলা পাঠশালা খুলল। সেটিও উঠে গেল। ১৮৩৬ সালে মহম্মদ মহসীনের টাকায় হুগলী কলেজ ও ব্রাঞ্চ স্কুল হল, জেনারেল কমিটি তখন অন্যান্য পাঠশালা বন্ধ করে দিল।

বর্ধমানে পাঠশালা খুলেছিলেন ক্যাপ্টেন জেমস স্টুয়ার্ট। চমৎকার বাঙলা জানতেন স্টুয়ার্ট সাহেব, বাঙলাভাষায় বই লিখেছেন—'বর্ণমালা', 'উপদেশ কথা,' 'তমোনাশক'। খ্রীষ্টধর্মে অগাধ বিশ্বাস তাঁর, কিন্তু আপন পাঠশালায় সে-বিষয়ে কিছু শেখানো হত না। এক বছরের মধ্যে ১৮১৮ সালে স্টুয়ার্ট দশটি পাঠশালা খুলেছিলেন। ছাত্রসংখ্যা এক হাজারের কম নয়। এই পাঠশালা-গুলি পরিচালনার ভার নিয়েছিল চার্চ মিশনারি সোসাইটির কলকাতা শাখা। খুব সুনাম হয়েছিল স্টুয়ার্ট সাহেবের পাঠশালার।

১৮১৯ সালে—তখন তেরোটি পাঠশালা—এসব পাঠশালার তত্ত্বাবধায়ক হলেন দুজন পাদরীসাহেব। একজনের নাম জেটার, আরেকজনের নাম ডীয়ার। এই সময়ে উপযুক্ত ছাত্রদের ইংরেজি শেখানোর জন্য একটি কেন্দ্রীয় ইংরেজি স্কুলও খোলা হল। ছাত্রদের প্রথমে ভালো করে বাঙলা শিখতে হত, পরে উপযুক্ত ছাত্রেরা ইংরেজি শেখার সুযোগ পেত। সমস্ত পাঠশালার প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা ইংরেজি শেখার জন্য একত্র হত ইংরেজি স্কুলে। বাঙলা পাঠশালা-গুলোর ভার নিয়েছেন ডীয়ার সাহেব। ইংরেজি স্কুলের ভার নিয়েছেন জেটার সাহেব। স্কুল বুক সোসাইটির বই পড়ানো হত এখানে।

১৮৩৪ সালে চার্চ মিশনারি সোসাইটির হাতে বর্ধমানে ছিল সাকুল্যে ন'টি পাঠশালা।

সরকারী তহবিল থেকে এদেশে শিক্ষাখাতে লক্ষ টাকা খরচ করার নির্দেশ আসার আগেই শ্রীরামপুর মিশন বিভিন্ন অঞ্চলে কুড়িটি পাঠশালা খুলেছে।

জশুয়া মার্শম্যান শ্রীরামপুর মিশনের একজন পাদরীসাহেব। ১৮১৩ সালের শেষের দিকে শিক্ষা বিষয়ে তিনি একটি পরিকল্পনা পাঠালেন বিলাতে ব্যাপটিস্ট সোসাইটিকে। সেই পরিকল্পনা অনুসারে চার হাজার ছাত্রের জন্য মাসিক খরচ হিসেব হল এক হাজার টাকা।

পরিকল্পনা রচনা করেই জশুয়া মার্শম্যান ক্ষান্ত হননি। তাঁরই উদ্যোগে শ্রীরামপুরে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপিত হল। উপযুক্ত শিক্ষক গড়ে তোলার জন্য নর্মাল স্কুল দরকার বৈকি।

তাছাড়া চতুর্দিকে স্থাপিত হল পাঠাশালা। প্রথম পাঠশালা হল নবাব-গঞ্জে। স্থানীয় অধিবাসীরা মিশনারিদের বিপুলভাবে সাহায্য করেছেন। কারো কাছ থেকে পাওয়া গেল ঘর, কারো কাছ থেকে চণ্ডীমণ্ডপ—বিনা ভাড়ায়। নতুন পদ্ধতিতে লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে, ছাত্রেরা অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ রপ্ত হয়ে উঠত। যাবতীয় বস্তু শেখানো হত মাতৃভাষায়। আপন-আপন

এলাকায় পাঠশালা স্থাপনের অনুরোধ নিয়ে বহুদূর থেকে লোকজন আসত মিশনারিদের কাছে।

১৮১৬ সালে জশুয়া মার্শম্যান শিক্ষা বিষয়ে একটি পুস্তিকা বের করলেন। পুস্তিকার নাম : Hints relative to Native Schools together with the outline of an Institution for their extension and management.

শ্রীরামপুরের মিশনারি এ-বিষয়ে নিশ্চিত যে মাতৃভাষা ছাড়া আর কোনো ভাষা জনশিক্ষার বাহন হতে পারে না।

J. C. Marshman লিখেছেন :

"The Serampore missionaries stood almost alone in advocating a vernacular education as the only means by which, the great body of the people, who had no leisure for the acquisition of a foreign language, could be rescued from the evils of ignorance and superstition." [৩]

Hints বেরোনোর বছরখানেকের মধ্যেই শ্রীরামপুরের চতুর্দিকে কুড়ি মাইলের মধ্যে কমপক্ষে পঁয়তাল্লিশটি পাঠশালা স্থাপিত হল। দু-হাজার ছাত্র। এই ছাত্রেরাই পরে ইংরেজি শেখার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে।

১৮৩১ সালে শ্রীরামপুর মিশনের তত্ত্বাবধানে ছিল একুশটি বিদ্যালয়, ১১৯৫ জন ছাত্র। সেসব বিদ্যালয়ে শেখানো হত ইংরেজি, বাঙলা ও ফারসী।

মিশনারিরা পাশ্চাত্ত্য রীতিতে জনশিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তাঁদের পাঠশালা ছিল অবৈতনিক। সেই কারণেও তাঁদের পাঠশালায় ছাত্রের অভাব হত না।

কিন্তু তার ফলেই ওই অঞ্চলের বিস্তর দেশীয় পাঠশালা বন্ধ হয়ে যায়।

এদেশে জনশিক্ষা বিস্তারে কলকাতা স্কুল সোসাইটির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। কলকাতা স্কুল সোসাইটি সম্পর্কে অনেক আগেই দু-চার কথা বলা হয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই, সোসাইটির সুব্যবস্থার ফলে দেশীয় পাঠশালাসমূহ প্রভূত উন্নতি করেছিল।

১৮২৯ সালের ২৫-জানুআরি, সোসাইটিকে প্রদত্ত রিপোর্টের উপসংহারে, রাধাকান্ত দেব লিখেছেন :

". . . in my humble opinion, the Society has afforded considerable benefit to the natives of this country, by patronizing the indigenous schools in the metropolis. The children of all the respectable natives are taught therein, as the schools are situated either in their own houses, or very near them, and the exertions of the society have occasioned a great improvement, and their progress is increasing daily, for which the continuance of the society's kind attention to the indigenous department is very desirable." [৪]

কলকাতা স্কুল সোসাইটি, দুঃখের কথা, দীর্ঘজীবী হয়নি।

জন্মকাল থেকে সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ ছিল জোসেফ ব্যারোটা কোম্পানি। ১৮২৫ সালের ১৭-এপ্রিল জোসেফ ব্যারোটা কোম্পানি দেউলে হয়ে যায়;

সেখানে সোসাইটির ৩৯৩৭ টাকা গচ্ছিত ছিল। তারপর সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ হল ম্যাকিণ্টস কোম্পানি। ম্যাকিণ্টস কোম্পানি দেউলে হয়ে যায় ১৮৩৩ সালে; সেখানে সোসাইটির যা-কিছু সামান্য টাকা-পয়সা গচ্ছিত ছিল, সবই গেল। আগেই বলা উচিত ছিল, ১৮২৮ সালে সোসাইটি টাকাকড়ির অভাবে খুব বিপদে পড়েছিল, সেবার ডেভিড হেয়ার ছ-হাজার টাকা দিয়ে সোসাইটিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

যা হোক, সোসাইটির অধিকাংশ চাঁদাদাতাই তখন দুরবস্থায় পড়েছিলেন। সোসাইটির সম্বল তখন গবর্নমেণ্টের সাহায্য মাসিক পাঁচশো টাকা, বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক আর দু-একজনের চাঁদা। সোসাইটির মাসিক খরচ কিন্তু তখন, খুব কম করে ধরলেও, ১০৯০ টাকা।[৫]

অত টাকা কোথায়?

তখন অগত্যা দেশীয় পাঠশালাগুলিকে সোসাইটি সমস্ত সাহায্য বন্ধ করে দিল। আরপুলি-পাঠশালা উঠে গেল। অবশ্যি আরপুলি-পাঠশালার ইংরেজি-বিভাগটি যুক্ত করা হল পটলডাঙা স্কুলের সঙ্গে। হ্যাঁ, পটলডাঙা স্কুলটিকে সোসাইটি বাঁচিয়ে রাখল। হিন্দু কলেজের কয়েকটি ছাত্রের মাইনে সোসাইটি থেকে যেমন দেওয়া হচ্ছিল তেমনি দেওয়া হতে থাকল।

শেষের দিকে সোসাইটির একজন সদস্য হয়েছিলেন উইলিয়ম অ্যাডাম।

স্কুল সোসাইটির কাজকর্ম ব্যাখ্যা করে প্রথম শিক্ষা রিপোর্টে (১৮৩৫) অ্যাডাম মন্তব্য করেছেন :

"Unequivocal testimony is borne to the great improvement effected by the exertions of the School Society, both in the methods of instruction employed in the indigenous schools of Calcutta, and in the nature and amount of knowledge communicated; and I have thus fully explained the operations of this benevolent Association, because they appear to me to present an admirable model, devised by a happy combination of European and Native philanthropy and local knowledge, and matured by fifteen years' experience, on which model, under the fostering care of Government, and at comparatively little expense, a more extended plan might be framed for improving the entire system of indigenous elementary schools throughout the country."[৬]

সেসময়ে কলকাতায় ও মফস্বলে বৈতনিক-অবৈতনিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়।

প্রথমেই কলকাতার পাঁচটি বিখ্যাত বিদ্যালয়ের নাম করা যেতে পারে : রাজা রামমোহন রায়ের অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল; ভবানীপুরের জগমোহন বসুর ইউনিয়ন স্কুল; ডেভিড হেয়ার পরিচালিত পটলডাঙা স্কুল (পরে হেয়ার স্কুল); চিৎপুরে গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি; হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়।

প্যারীচাঁদ মিত্র লিখেছেন :

"One of the effects of the English education was the awakening of a desire on the part of the students to establish

free schools for poor students. Saradapersad Bose, Master of Koonjlall Banerjee, Judge of the Small Cause Court and I had morning schools at our houses. My school had the benefit of instruction from Ship Chunder Deb, Radhanath Sikdar, Gobind Chunder Bysak, Kala Chand Sett, and Rajkrishna Mittra. . . . There were several other schools. Madhub Chunder Mullick and two other gentlemen conducted a school called the Hindu Free School. The *Enquirer* conducted by Rev. K. M. Banerjee took the following notice of these schools in August 1831.

"Since the notice we took of a school of Andul, we have heard of several establishments in different parts of Calcutta are conducted by Hindoos, and all expressly for the instruction of Hindus. We understood from good authority that there are at present existing in this town, six morning schools in six different quarters, where upwards of three hundred and seventy boys receive instruction. It is a pleasing incident, that all these institutions have been projected and are materially assisted by the extertions of young men, whose youth would never create in the philosopher any expectation of what they are realizing. These considerations must be extremely gratifying to the feelings of a philanthropist, and should produce happy conceptions in the mind of a Hindu. The growing spirit of emulation in furthering the interests of India, observable in these admirable young men, will gain new strength from every encouragement that may be afforded to their pursuits. The zeal they evince in achieving all that is good and great will continue permanently warm. The spirit of liberalism has been widely diffused, and that the march of intellect will now be retarded is far from probable. When upwards of 3,000 boys are receiving systematic instruction, in the refined language of England we have nothing but hope upon our side. The rays that have emanated from the Hindu College, and that are now diverging to other places, must eventually dissipate the mists of ignorance and superstition." [৭]

কাছাকাছি সময়ে হরচন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠিত বেহালার একটি বিদ্যালয়ের সংবাদ আছে :

"We had the satisfaction yesterday to visit a native school at the village of Behalah. . . . It affords us real pleasure to say that the gentleman who has established the school at Behalah

is Baboo Harachandra Ghose, late a student of the Hindoo College. . . ."[৮]

১৮৩১ সালের ১৫-মার্চ শ্যামপুকুরের শারদাপ্রসাদ বসু 'হিন্দু বেনেভোলেণ্ট ইনস্টিটিউশন' প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই বিদ্যালয়ের একটি নিয়ম : "যে বালকগণ পাঠবিষয়ে ব্যয়াশক্ত হইবেন তাঁহারদিগের স্ব স্ব পিতা বা তত্ত্বাবধারক অথবা নৈকট্যকুটুম্বব্দারা বিশেষ নিদর্শন লিপি প্রধান সম্পাদকসমীপে আনয়ন করিলে তাঁহারা এই পাঠশালায় বিনা বেতন গ্রহণে গ্রহণীয় হইবেন।" ১৮৩১ সালের ১০-ডিসেম্বর একটি সাময়িকপত্র এই বিদ্যালয় সম্পর্কে মন্তব্য করেছে : "উক্ত বিদ্যালয়ের বালকেরা সৎপথাবলম্বী এবং শারদা বাবুর স্কুলেতে বিশেষ মনোযোগ আছে সুতরাং ভালই হইবে এবং ক্রমে ক্রমে বিদ্যা বুদ্ধি বৃদ্ধি হইবেক এ কোন বিচিত্র কথা ইতি।"[৯]

প্যারীচাঁদ মিত্র 'হিন্দু ফ্রি স্কুলে'র নাম করেছেন। ১৮৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই স্কুলটি। মাধবচন্দ্র মল্লিক ছাড়া এই স্কুলের আরো তিনজন প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকের নাম পাওয়া যাচ্ছে : ভুবনমোহন মিত্র, গঙ্গাচরণ সেন ও রাধানাথ পাল। ১৮৩২ সালের ২২-ফেব্রুআরি 'সমাচার দর্পণ' লিখেছে : "...আমরা জ্ঞাত হইলাম যে বাবু ভুবনমোহন মিত্র ও বাবু গঙ্গাচরণ সেন ও বাবু রাধানাথ পাল এবং অন্যান্য সকলে হিন্দু ফ্রি স্কুল সংস্থাপন করিয়া তাহার ব্যয় নিজ হইতে বহুকালাবধি করিতেছেন কিন্তু সংপ্রতি ঐ স্কুলের ব্যয়ের বাহুল্যহওয়াতে স্বদেশীয় লোকেরদের নিকটে তাঁহারদের উপকার যাচ্ঞা করিতে হইয়াছে।..." স্কুলটির আর্থিক অবস্থা পরে আরো খারাপ হয়ে পড়ল। আর্থিক দুরবস্থার জন্য ১৮৩৫ সালে ও ১৮৩৬ সালে এই স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা পর্যন্ত বন্ধ রাখতে হল। ১৮৩৭ সালে অবশ্য বার্ষিক পরীক্ষা হল। এই সূত্রে 'জ্ঞানান্বেষণ' মন্তব্য করেছে : "...পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে জানেন প্রথমত হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং বেতনদানে অক্ষম লোকেরদের ন্যূনাধিক দুই শত বালক ঐখানে বিদ্যাভ্যাস করিতেছে এই বিদ্যালয়ের খরচ এপর্য্যন্ত প্রজার দানেতেই চলিয়াছে কিন্তু শ্রীযুত বাবু ভুবনমোহন মিত্র যিনি অবিশ্রান্ত পরিশ্রমেতে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন তাঁহার হস্তে এইক্ষণে টাকা অধিক নাই অতএব আমরা ভরসা করি এতদ্দেশীয় লোকেরদের শিক্ষার্থ এডুকেসন কমিটির হস্তে যে টাকা ন্যস্ত আছে প্রতিমাসে তাহার কিঞ্চিদংশ দিয়া এই বিদ্যালয় রক্ষা করিবেন এতদ্বিষয়ে এডুকেসন কমিটির নিকট প্রার্থনা করণেতে আমারদিগের লজ্জা বোধ হয় কিন্তু হিন্দু ফ্রি স্কুলের সাহায্যকরণ যাঁহারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য তাঁহারদিগের মনোযোগাভাবে অগত্যা প্রার্থনা করিতে হইয়াছে।"

১৮৩১ সালে শিমলায় রসিককৃষ্ণ মল্লিক 'হিন্দু ফ্রি স্কুল' নামে আরেকটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এই স্কুলে প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকে পাঠ্যপুস্তকের অর্ধেক দাম নেওয়া হত।

১৮৩২ সালের ১-মার্চ প্রতিষ্ঠিত হল 'হিন্দু লিবার‍্যাল অ্যাকাডেমি'। "...শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র ও বাবু শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু বেহারিলাল সেট এই কএক জনে হিন্দু লিবরল একেডিমি নামক এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়া অনেক দীনদুঃখিদিগকে বিদ্যা দান করিতেছেন এবং ইহার দ্বারা অনেক দুঃখি লোকের ইঙ্গরেজী পড়ার বড়ই সুগম হইয়াছে যেহেতু অন্য২ পাঠশালায় পড়িবার অনেক বাধা আছে কারণ কোন স্থানে হিন্দু

ধর্ম্ম লোপ হয় ও কোন স্থানে বা অর্থ ব্যয় হয় কিন্তু এই পাঠশালায় কোন শঙ্কা নাই ধর্ম্মলোপ হয় না ও ব্যয়ো হয় না আর পূর্ব্বোক্ত বাবুরা কাগজ কলম ও বিবিধপ্রকার পুস্তক নিয়মমতে অবাধে বিতরণ করিতেছেন এবং ছাত্রগণের নিকট হইতে ঐ সকল সামগ্রীর কিছুমাত্র মূল্য লন না।"

১৮৩৪ সালে গোবিন্দচন্দ্র বসাক 'হিন্দু ফ্রি স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন।

১৮৩৪ সালের ১-নভেম্বরের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত জনৈক ভদ্রলোকের একখানা চিঠি থেকে একাংশ উদ্ধার করি : "অস্মদ্দেশে এমত কোন বাঙ্গালা পাঠশালা নাই যে তাহাতে পাঠার্থিগণের স্বদেশীয় ভাষায় প্রচুর বিদ্যা ব্যুৎপত্তি হয় কারণ যে এক২ বিদ্যালয় ও টোল কোন২ স্থলে আছে তাহাও অতি ম্রিয়মাণ এবং তাহাতে সাধারণের সাহায্য প্রায় দেখিতে পাই না...।"

১৮৩৬ সালে জোড়াসাঁকোতে গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার ও ভোলানাথ বসু 'ওরিয়েণ্টাল ফ্রি স্কুল' নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

১৮৩৭ সালের ২-সেপ্টেম্বর 'সমাচার দর্পণে' 'W.C.G.' স্বাক্ষরে জনৈক ভদ্রলোকের একখানা পত্র প্রকাশিত হয়েছে। পত্রখানার অংশবিশেষ উদ্ধার করি : "দেশের নানা স্থানে গবর্নমেণ্ট বালকদের বিদ্যাভ্যাসার্থ যে নানা পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে বালকদের অত্যুত্তম রীতি ও বিদ্যা ও আচার ব্যবহার হইতেছে এবং তাঁহারদের বিদ্যার উন্নতি দেখিয়া আমারদের আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে ফলতঃ ছাত্রেরদের মধ্যে অনেকে ইংগরেজী বিদ্যাতে সম্পূর্ণরূপ পারদর্শী হইয়াছেন কিন্তু আমারদের খেদের বিষয় এই যে বঙ্গভাষার অনুশীলনবিষয়ে গবর্নমেণ্টের কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ নাই ঐ ভাষা এইক্ষণে প্রায় লোপ পাইল। হুগলিপ্রভৃতি নানা স্থানে গবর্নমেণ্ট বহুতর পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে আমারদের মহোপকার হইতেছে বটে কিন্তু যদ্যপি এতদ্দেশীয় বালকদের নিমিত্ত কতিপয় বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করেন তবে আরো উত্তম হয়। বালকদের নিয়ত ইংগরেজী পুস্তক পাঠ করাতে প্রায় বঙ্গভাষাভ্যাসবিষয়ে অনুরাগ গত হইয়াছে বঙ্গভাষা কিছুমাত্র না জানিয়াই ইংগরেজী ভাষা শিক্ষা করে অতএব যদি গবর্নমেণ্ট অনুগ্রহপূর্ব্বক নানা স্থানে বঙ্গভাষার বিদ্যামন্দির স্থাপন করেন তবে বঙ্গদেশীয় বালকেরা বঙ্গভাষা কিঞ্চিৎ জানিতে পারেন।"

গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি ভবনে পার্কিন্স সাহেব প্রতিষ্ঠিত 'নেটিভ ইনফ্যাণ্ট স্কুল' নামে একটি অবৈতনিক শিশু-বিদ্যালয় সম্পর্কে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ১৮৩৬ সালের ১০-ডিসেম্বরের 'সমাচার দর্পণ' থেকে তুলে দিচ্ছি : "...কিয়দ্দিবস গত হইল সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রের দ্বারাবগত হইয়াছিলাম যে শ্রীযুত বাবু গৌরমোহন আঢ্য মহাশয়ের বটতলার ওরিএণ্টল সেমিনরিনামক ইংগরেজী পাঠশালার মধ্যে শ্রীযুত ডবলিউ এচ পরকিন্স সাহেব এতদ্দেশীয় শিশুদিগের শিক্ষার্থ নেটীব ইনফেণ্ট নামক এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে ৩ তিন বৎসরাবধি ৬ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত শিশুদিগকে বিনামূল্যে ইংগরেজী ও বাঙগলা শিক্ষা প্রদান করেন তৎপরে এক দিবস স্বয়ং গমন করিয়া দেখিলাম যে উক্ত বিদ্যামন্দিরে পঞ্চবিংশতি জন শিষ্য পাঠার্থে উপস্থিত হইয়াছেন এবং উক্ত শিক্ষক মহাশয় শিশুদিগের সহিত আমোদাহ্লাদে উপদেশ করিতেছেন। এবং নানাপ্রকার ছবি দেখাইতেছেন যাহা হউক কিয়ৎকাল শিশুগণেরা উপদেশ আদেশ ও কিঞ্চিৎ

শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে অনেকোপকার দর্শিবে। অতএব বিজ্ঞ বিচক্ষণ মহাশয়গণেরা স্বীয়২ শিশুগণকে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে কোন দ্বিধাভাব ভাবনা করিবেন না কিমধিক মিতি তারিখ ২৪ নবেম্বর ১৮৩৬।"

১৮৩৮ সালের ২৩-জুনের 'সমাচার দর্পণ' থেকে কলকাতায় গোপাললাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু চেরিটেবল্ ইনস্টিটিউসন' নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়ের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

সেসময়ে কলকাতায় আরো কিছু অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমস্ত বিদ্যালয়ের বিবরণ উদ্ধার করা দুঃসাধ্য এবং হয়তো নিষ্প্রয়োজন।

যাই হোক, অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তাদের অবলুপ্তির একটি প্রধান কারণ অবশ্যই সরকারী ঔদাসীন্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে কলকাতায় একটিমাত্র অবৈতনিক বিদ্যালয়—নাম : ইণ্ডিয়ান ফ্রি স্কুল—আপন অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। এই বিদ্যালয়টি ১৮৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৫৩ সালের ১০-মার্চ 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছে : "ইণ্ডিয়ান ফ্রি স্কুল নামক অবৈতনিক বিদ্যালয়ের কার্য্য এইক্ষণে অতি সুনিয়মে নির্ব্বাহ হইতেছে, ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের বাঙ্গালা শিক্ষা করিবার নিয়ম না থাকাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত ছিলাম। অধুনা শ্রবণ করত অতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম যে তথায় বাঙ্গালা শিক্ষাদানের নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে...।"

মফস্বল অঞ্চলেও সে-আমলে অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে।

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত টাকি স্কুল। টাকির জমিদার কালীনাথ রায় চৌধুরী ও বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী ১৮৩২ সালের ১৪-জুন এই স্কুলটি স্থাপিত করেন। ১৮৩২ সালের ৩০-জুন 'সমাচার দর্পণ' লিখেছে : "আমরা অত্যন্তাহ্লাদপূর্ব্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে কলিকাতা নগর হইতে প্রায় বিংশতি ক্রোশ অন্তর অতিসমৃদ্ধ টাকি স্থানে এতদ্দেশীয় বালকেরদের বিদ্যা শিক্ষার্থ এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ঐ স্থান শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠ রায় চৌধুরী এবং তাঁহারদের পরিজনগণের আবাস তাঁহারা ঐ স্থানে বৃহৎ২ তিনটা অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া ইঙ্গরেজী ও আরবী পারসী ও বাঙ্গালা ভাষার শিক্ষকসকল নিযুক্ত করিয়াছেন এবং এক জন উপযুক্ত সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক তথায় আছেন অল্পকালের মধ্যে তিনিও ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনারম্ভ করিবেন।..."

টাকি স্কুল প্রতিষ্ঠার তিনদিনের মধ্যেই ৩৪০ জন ছাত্র এল, মাসখানেকের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা প্রায় পাঁচশো হল।

টাকি স্কুল প্রসঙ্গে জনৈক পত্রপ্রেরক ১৮৩৭ সালের ১-জুলাইয়ের 'সমাচার দর্পণে' মন্তব্য করেছেন : "আমরা সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিরদিগকে প্রশ্ন করি যে এই অত্যুত্তম পাঠশালার সংস্থাপক ও প্রতিপোষক শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় স্বদেশীয় মহাশয়সমাজের মধ্যে কি তিলক হইবেন না। ঐ পাঠশালা এইক্ষণে পাঁচ বৎসরাবধি চলিতেছে তাহাতে জেনরল আসেম্বলি সাহেবেরা যে খরচ দিতেছেন তদ্ভিন্ন ঐ বাবু বার্ষিক বিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন। এবং টাকির ঐ বাবুরদের আদর্শে অন্য এক জন ধনি জমিদার স্বীয় অঞ্চলে এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন।..."

১৮৩৬ সালের ২৩-জানুআরির 'সমাচার দর্পণ' থেকে জানা যাচ্ছে যে

পানীয়হাটিনিবাসি অতিধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত চব্বিশ পরগনার জমীদার শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায় চৌধুরী স্বদেশীয় বালকেরদিগকে ইংগরেজী বিদ্যাতে সুশিক্ষিত করাইয়া স্বদেশীয় বিশিষ্টেরদের অনুরূপকরণার্থ একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন।" এইক্ষণে উক্ত বাবু মহাশয়েরা রাসমঞ্চের নর্ত্তনাগার বিদ্যালয় স্থাপনার্থ দান করিয়াছেন। তাঁহারা উপযুক্ত বিদ্বান শ্রীযুত এফ মাগডালননামক এক জন সাহেবকে ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতাপদে নিযুক্ত করিয়াছেন ঐ সাহেব বঙ্গভাষাতে সুশিক্ষিত নায়েব এক জন পোর্ত্তুগীশের সহকারে ঐ পাঠশালার কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন। এইক্ষণে পাঠশালাতে ৪০ জনেরও অধিক ছাত্র প্রবিষ্ট হইয়াছে। ঐ পাঠশালা অত্যল্প কাল মাত্র হইল স্থাপিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই প্রত্যহ দল২ ছাত্র উপস্থিত হওয়াতে সফল হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। প্রত্যেক বালক অতিসামান্য ব্যয়ে অর্থাৎ ২ টাকাতে কেহবা তদপেক্ষাও অল্প ব্যয়ে তথায় লিখন পঠন ও গণিত শাস্ত্র ও ব্যাকরণ ভূগোল ও খগোলীয় গ্লোব শিক্ষণ ও জ্যোতিষ ও ভাষান্তরকরণ ও রচনাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা করিতেছে।..."

কাছাকাছি সময়ে সুখচরে 'বাউণ্টিয়াস সেমিনরী' নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছেন তারকনাথ সেন।

১৮৩৫ সালের ৬-জুন 'সমাচার দর্পণ' লিখেছে : "সংপ্রতি চন্দননগরে এক পাঠশালা স্থাপন হইয়াছে এবং তাহাতে ফ্রান্সীয় ও ইংগরেজী ভাষাতে শিক্ষা দেওনক্ষম এমত এক জন শিক্ষকের অত্যাবশ্যক আছে।...পাঠশালার নিয়ম এই যে সর্ব্বজাতীয় বালকেরদিগকে জাতি ও ধর্ম্ম বিবেচনা ব্যতিরেকেই প্রবিষ্ট হইতে অনুমতি আছে এবং তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের কোন মান বিচারের হানি বা কোন উদ্বেগ না হয় এ নিমিত্ত ঐ পাঠশালাতে ধর্ম্মবিষয়ক কোন উপদেশ দেওয়া যাইবে না।..."

১৮৩৭ সালের ৬-মার্চ বড়লাট লর্ড অকল্যান্ড ব্যারাকপুরে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলেছেন। কেবল অবৈতনিক বললেই যথেষ্ট হয় না, "আরো আহ্লাদের বিষয় এই যে শ্রীযুতের বিদ্যালয়ে বালক গ্রহণে জাতিভেদ করা হইবেক না এবং কাগজ কলম পুস্তকাদি সমস্তই শ্রীযুত লার্ড সাহেব ছাত্রগণকে দিবেন আর যে সকল বালকেরা নীচের শ্রেণীর বালকদিগকে শিক্ষা দিতে যোগ্য হইবেন তাঁহারা প্রতিমাসে বেতন স্বরূপ কিঞ্চিৎ২ পাইবেন...।" এই বিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ছাত্রদের হিন্দু কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হত। লর্ড অকল্যান্ড সেসব ছাত্রকে মাসিক বৃত্তি দিতেন।

১৮৩৬ সালের ২৪-সেপ্টেম্বরের 'সমাচার দর্পণে' শান্তিপুরনিবাসী ঊনিশজন ভদ্রলোকের একখানা পত্র প্রকাশিত হয়েছে। সেই পত্রের একাংশ : "জিলা নবদ্বীপের মধ্যে শান্তিপুর গ্রাম প্রধান সমাজ এবং অধিক অন্যান্য জাতীয় ব্যতীত কায়স্থ বৈদ্য ব্রাহ্মণ জাতির ৫০০০ হাজার ঘর বসতি ইহার মধ্যে বিনা বেতনে বিদ্যাভ্যাস হওন বিদ্যালয় না থাকাতে অধিকাংশ বালক মুর্খ হয় বোধে গ্রামস্থ জমিদার এবং বিশিষ্ট শিষ্ট পরোপকারি শ্রীলশ্রীযুত বাবু মতিলাল রায় মহাশয় স্বয়ং খরচে ঐ গ্রামের মধ্যস্থলে উত্তম ইষ্টকনির্ম্মিত দোতালা বাটী ভাড়া লইয়া এক জন হিন্দু কলেজের ফাষ্ট ক্লাসের উত্তীর্ণ বিদ্বান ইংগরেজী বিদ্যাভ্যাসকারককে নিযুক্ত করিয়াছেন অত্যল্পকাল অর্থাৎ ৫ মাস আন্দাজ হইবেক।..."

অমরপুর গ্রামে কালীকিঙ্কর পালিত 'বেনিভোলেণ্ট ইন্‌ষ্টিটিউশ্যন' নামে একটি পাঠশালা খুলেছেন। এই পাঠশালাটি সম্পর্কে ১৮৩৯ সালের ২৬-জানুআরির 'সমাচার দর্পণে' 'জে আর এম' স্বাক্ষরে প্রকাশিত জনৈক ভদ্রলোকের একখানা পত্র থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি : "...এই পাঠশালা দেড় বৎসরাবধি স্থাপিত হইয়াছে এবং এই অল্পকালের মধ্যে বালকেরা নানা প্রকার বিদ্যাতে বিলক্ষণ সুশিক্ষিত হইয়াছে। এবং অরিএণ্টল সেমেনরি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু প্যারি মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রেরদিগকে নানা প্রকার বিদ্যা শিক্ষা দেওনার্থ উদ্যোগ করিতেছেন।...শেষোক্ত বিজ্ঞবর বাবুর অত্যন্ত মনোযোগ দ্বারা অত্যুত্তম পাঠশালার তুল্য এই পাঠশালা হইবে এবং শ্রীযুত বাবু কালীকিংকর পালিত এই মহা ব্যাপারের বিষয়ে যে বিলক্ষণ মনোযোগ করিতেছেন ইহাতে অত্যন্ত প্রশংসা পাত্র হইয়াছেন।..." অমরপুরের এই পাঠশালাটি ১৮৪৪ সালে বন্ধ হয়ে যায়।

আরো কিছু-কিছু বিদ্যালয় এদিকে-ওদিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেসময়। মনে রাখা দরকার, অধিকাংশ বিদ্যালয়ই অবৈতনিক।

আবার অ্যাডাম সাহেবের কথায় ফিরে আসা দরকার।

এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়ে অ্যাডাম অকুণ্ঠচিত্তে আপন চিন্তা ও পরিশ্রম ব্যয় করেছেন। ১৮২৯ সাল কি ১৮৩০ সালের কথা। বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের কাছে অ্যাডাম শিক্ষাসংস্কার বিষয়ে একখানা স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন। কোনো ফল হল না। কিন্তু অ্যাডাম নিরুৎসাহ হলেন না। সুযোগ পেলেই অ্যাডাম এদেশবাসীর শিক্ষা সম্পর্কে উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন।

১৮৩৫ সালের ২-জানুআরি অ্যাডাম একখানা পত্রে উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে কয়েকটি প্রস্তাব দাখিল করলেন। ১৮৩৫ সালের ২০-জানুআরি সে-প্রস্তাব সরকারীভাবে গৃহীত হল।

অতঃপর অ্যাডাম সাহেব দেশীয় বেসরকারী শিক্ষাব্যবস্থা অনুসন্ধানের জন্য কমিশনার নিযুক্ত হলেন। সাব্যস্ত হল, এই বিষয়ে তিনি গবর্নমেণ্টকে রিপোর্ট দাখিল করবেন। নির্ধারিত হল, জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের নির্দেশে তিনি আপন কর্তব্য সম্পন্ন করবেন।

কিন্তু অ্যাডাম সাহেব কমিশনার নিযুক্ত হবার ছ-সপ্তাহের মধ্যেই ভারত-গবর্নমেণ্ট সিদ্ধান্ত করল : এ-দেশে সরকারী বিদ্যালয়সমূহে ইংরেজিভাষাই শিক্ষার বাহন হবে।

অ্যাডাম সাহেবের কাজ অবশ্য বন্ধ করা হল না। ১৮৩৫ সালের ১-জুলাই, ২৩-ডিসেম্বর এবং ১৮৩৮ সালের ২৮-এপ্রিল তিনি রিপোর্ট দাখিল করলেন। এদেশে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নতি বিষয়ে আপন অভিমত অ্যাডাম স্পষ্ট-ভাষায় ব্যক্ত করেছেন :

"If all other resources fail, there is still, one left, the general revenue of the country on which the poor and the ignorant have a primary claim,—a claim which is second to no other whatsoever, far *from whence is that revenue derived but from the bones and the sinews, the toil and sweat of those whose cause I am pleading*? Shall £10,000 continue

to be the sole permanent appropriation from a revenue of more than twenty millions sterling for the education of nearly a hundred millions of people?

. . . I propose to qualify a body of vernacular teachers, to raise their character and provide for their support, and to give a gradual, a permanent, and a general establishment to a system of common schools." [১০]

কিন্তু কর্তৃপক্ষ অ্যাডামের পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেনি।

J. A. Richey লিখেছেন : "Lord Auckland decided against the adoption of this scheme (drawn up by Mr. Adam), largely on the ground that there were no suitable text-books in the vernacular which could be used in the proposed schools." [১১]

খুব স্বাভাবিক, দেশে তখন ইংরেজি শিক্ষারই জয়জয়কার। ইংরেজি শিক্ষার দিকেই তখন লোকজনের পক্ষপাতিত্ব। কেননা, ইংরেজি বিদ্যা অর্জন করলেই অর্থোপার্জন ও মর্যাদাবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হবে।

রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষসভার চিন্তাশীল মাননীয় ব্যক্তিরা এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। এদেশের ছেলেদের বাঙলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান অবশ্য-কর্তব্য, এই বিবেচনায় তাঁরা একটি আদর্শ বাঙলা পাঠশালা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলেন। তাঁদের সাহায্য করতে আগ্রহী হলেন ডেভিড হেয়ার ও কয়েকজন বিদেশী বন্ধু।

হিন্দু কলেজের পশ্চিমদিকে একখণ্ড জমিতে, ১৮৩৯ সালের ১৪-জুন, ডেভিড হেয়ার কর্তৃক একটি আদর্শ বাঙলা পাঠশালার ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত হল। এই পাঠশালার জন্য একটি সাব-কমিটি হল। সাব-কমিটিতে ছিলেন : ডেভিড হেয়ার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি। এই পাঠশালার মূল উদ্দেশ্য বিষয়ে ১৮৪৩-৪৪ সালের এডুকেশন রিপোর্টে লেখা আছে :

"The primary object contemplated in the establishment of the patshala were to provide a system of national education, and to instruct Hindoo youths in literature, and in the sciences of India and of Europe, through the medium of the Bengali language."

পাঠশালার গৃহনির্মাণ হয়ে গেল। হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষসভা কলেজ-ভাণ্ডার থেকে গৃহনির্মাণের অধিকাংশ টাকা দিলেন। ১৮৪০ সালের ১৮-জানুআরি বাঙলা পাঠশালা খোলা হল। সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার বহু মান্যগণ্য ইংরেজ ও বাঙালী।

এই পাঠশালার আদর্শে ১৮৪০ সালের ১৩-জুন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিমলার দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা ভাড়া নিয়ে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই পাঠশালা চলত সকাল ছটা থেকে নটা পর্যন্ত। তখন ইংরেজি শেখার দিকে খুব টান, যেসব ছাত্র ইংরেজি পড়তে চায় তারা দুপুরবেলা অন্য কোনো স্কুলে গিয়ে ইংরেজি শিখতে পারবে, তাই

'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' সকালে চালানো হত। কিন্তু সকালে এখানে এসে দুপুরে অন্য কোনো স্কুলে ইংরেজি শিখতে যাওয়া অল্পবয়সী ছাত্রদের পক্ষে খুব দুরূহ। ফলে, 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'য় ছাত্রসংখ্যা কমে যেতে লাগল। তখন অগত্যা 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'তেও ইংরেজি পড়ানোর ব্যবস্থা হল।

১৮৪৩ সালের ৩০-এপ্রিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' কলকাতা থেকে বাঁশবেড়িয়ায় সরিয়ে নিয়ে গেলেন। দিনের পর দিন পাঠশালাটির উন্নতি হতে লাগল। কিন্তু ১৮৪৮ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আর্থিক অবস্থা এমন হল যে তাঁর পক্ষে আর পাঠশালাটিকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হল না।

'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'র মতো আরো একটি অবৈতনিক পাঠশালা হয়েছিল ১৮৪৬ সালে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহায়তায়। সেখানে পাঠ্যপুস্তকও ছাত্রেরা বিনামূল্যে পেত। এই রকম আরেকটি পাঠশালা করেছিলেন কাশীশ্বর মিত্র, নদীয়া জেলার সুখসাগরে।

আবার হিন্দু কলেজ পাঠশালা বা বাঙলা পাঠশালার কথায় ফিরে আসা যাক।

সাব্যস্ত হল, বাঙলা পাঠশালার উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে পাঁচজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বিনা বেতনে হিন্দু কলেজে পড়তে পারবে।

পাঠশালায় বারোটি শ্রেণী, বারোজন শিক্ষক। সবকিছু শেখানো হয় বাঙলা ভাষায়।

১৮৪১ সালের শেষদিকে সরকারী সিদ্ধান্ত হল : হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষসভাকে কাউন্সিল অফ এডুকেশনের অধীনে একটি সাব-কমিটি হয়ে থাকতে হবে, সেই সাব-কমিটির মধ্যে থাকবেন কাউন্সিল অফ এডুকেশনের দু-জন সদস্য ও স্বয়ং সভাপতি, হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষসভাকে প্রত্যেক বিষয়ে কাউন্সিল অফ এডুকেশনের নির্দেশ মেনে নিতে হবে।

বাঙলা পাঠশালা থেকে পাঁচজন ছাত্র বিনা বেতনে হিন্দুকলেজে ভর্তি হতে পারত, অতঃপর সে-ব্যবস্থা বাতিল হয়ে গেল। কলেজ কর্তৃপক্ষ বাঙলা পাঠশালার জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশের আয়োজন করছিল, সরকারী ব্যবস্থাপনায় সেদিকেও নিরস্ত হতে হল। বাঙলা পাঠশালার জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব নিল কাউন্সিল অফ এডুকেশন। এজন্য একটা সাব-কমিটি হল। ওই কমিটিতে একমাত্র বাঙালী সদস্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর। কাউন্সিল অফ এডুকেশনের নির্দেশ : পাঠ্যপুস্তক প্রথমে ইংরেজিতে লেখা হবে, সাব-কমিটি অনুমোদন করে দিলে পাঠ্যপুস্তক ইংরেজি থেকে বাঙলা ও অন্যান্য দেশীয়ভাষায় অনূদিত হবে। হিন্দুর আচার-আচরণ, প্রাচ্যদর্শন বা ভাবধারার চিহ্ন যেন পাঠ্যপুস্তকে না থাকে।

ফলে বাঙলা পাঠশালার অবস্থা কী হল?

ছাত্রসংখ্যার দিক থেকে হিসেব নেওয়া যাক। বাঙলা পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা ১৮৪০ সালে ছিল ৪৬০; ১৮৪১ সালে ৪৮১; ১৮৪২ সালে ৪৭২; ১৮৪৩ সালে ২৫২; এবং ১৮৪৩-৪৪ সালে দেড়শোর কিছু বেশি। পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা কমে গেল, শ্রেণীসংখ্যা বারো ছিল, কমে সাত হয়ে গেল। শিক্ষকসংখ্যা কমে গেল।

বাঙলা পাঠশালার অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাউন্সিল অফ এডুকেশন বধির! আবেদন-নিবেদনে কোন ফল হল না।

১৮৫৪ সালের ১৫-মে হিন্দু কলেজ ভাগ হয়ে গেল : কলেজ-বিভাগ হল প্রেসিডেন্সি কলেজ, স্কুল-বিভাগ হল হিন্দু স্কুল।

কাউন্সিল অফ এডুকেশনের নির্দেশে ১৮৫৫ সালের গোড়ার দিকে বিদ্যাসাগর বাঙলা পাঠশালা পরিদর্শন করেছেন এবং একটি রিপোর্ট দাখিল করেছেন :

"On the days that I inspected the Institution, it contained 219 pupils, divided into seven classes, every one of which was examined by me. The Masters appeared to me all to be very diligent and attentive to their duties. The mode of teaching followed in the Institution seems open to objection. More stress appears to be laid on synonymes than on conveying the import of the words. The effect is, that while the pupil can give four, five, or six synonymes of words, he is, in most instances, unable to give the accurate meaning of words and sentences. To this however the First Class was founded to be an exception. The list of books in use requires revision. For instance, the Hitapodesh, one of the class-books, being written in a clumsy and antiquated style, should in my humble opinion be omitted.

I would also omit the study of Arithmetical Tables and Geography, as these are better studied in English Schools, into which almost all the pupils get themselves afterwards admitted. It cannot be expected that the study of these subjects in the Pautshalla would render any assistance to the pupils, when they commence to study these in English, as by that time, I believe, they generally forget everything they learn of these subjects. The omission of these, on the other hand, would afford them time to attain a greater degree of proficiency in the language than they have opportunities at present to acquire. The object of the Pautshalla is, I presume, to impart to young pupils a knowledge of Bengali, as much as it is practicable to do so before they enter into English Schools. It would of course have been advisable to retain the study of these subjects in the Pautshalla, had its object been similar to that of Mofussil Vernacular Schools, to which parents send their children to finish their School Education.

With regard to discipline, the Institution appeared to me to be well conducted."[১২]

একথা নিশ্চিত যে জনশিক্ষার প্রধান উপায় মাতৃভাষা।

দেশীয় ভাষার মাধ্যমে এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের সরকারী প্রথম প্রচেষ্টা হয়েছে বড়লাট স্যর হেনরি হার্ডিঞ্জের আমলে (১৮৪৪-৪৮)। বঙ্গ-

বিহার-উড়িষ্যার নানা অঞ্চলে তিনি ১০১টি পাঠশালা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। সরকারী নথিপত্রে এই পাঠশালাগুলির নাম 'হার্ডিঞ্জ স্কুল'। বাঙলাদেশে এই পাঠশালাগুলি 'বঙ্গবিদ্যালয়' নামে পরিচিত। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। এই পাঠশালাগুলির উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর বিস্তর চেষ্টা করেছেন। এই পাঠশালাগুলির জন্য শিক্ষক নির্বাচন করে দিয়েছেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি মার্শাল ও বিদ্যাসাগর।

বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার নানা বিভাগে সাকুল্যে ১০১টি পাঠশালা স্থাপিত হয়েছে : মুর্শিদাবাদ বিভাগে সতেরোটি; ঢাকা বিভাগে পনেরোটি; ভাগলপুর বিভাগে সতেরোটি; পাটনা বিভাগে চোদ্দটি; যশোহর বিভাগে উনিশটি; চট্টগ্রাম বিভাগে আটটি এবং কটক বিভাগে এগারোটি।

এই পাঠশালাগুলির ভার নিল 'সদর বোর্ড অফ রেভিনিউ'। কিন্তু কোনো সুফল দেখা গেল না। চার বছর যেতে-না-যেতেই 'বোর্ড অফ রেভিনিউ' মন্তব্য করেছে : সাফল্য অসম্ভব, বাঙলা পাঠশালাগুলির আর কোনো আশা নেই।

১৮৪৮ সালের ১-জুন হেয়ার-স্মৃতি-সভায় রাজনারায়ণ বসু বলেছেন :

"কোন দেশস্থ সর্ব্বসাধারণ লোকের বিদ্যালাভ সেদেশের সকল মঙ্গলের মূলীভূত হইয়াছে। প্রভাকরের উদয়াস্ত কালের বিচিত্র শোভার ভূয়োভূয় পরিবর্ত্তন দেখিয়া যে অতুল আনন্দের উদয় হয়, বায়ু হিল্লোলে কম্পিত সুচারু শ্যামবর্ণ শস্যক্ষেত্রের সুরঙ্গ তরঙ্গাবলি সন্দর্শনে যে অপূর্ব্ব আহ্লাদ সঞ্চার হয়, বা নিশানাথ পূর্ণচন্দ্রের অজস্র সুধা বর্ষণে জগৎ সুধাময় দেখিয়া চিত্ত যে অপার পুলকে পরিপূর্ণ হয়, সূর্য্য সেই সমস্ত দৃষ্টি সুখের এক মাত্র মূল কারণ; তদ্রূপ দেশস্থ লোকের কায়িক সুস্থতা, মানসিক ক্ষমতা, লোকাচারের সুশৃঙ্খলা, ধনের বৃদ্ধি ও ধর্ম্মের উন্নতি প্রভৃতি যত প্রকার মঙ্গল কল্প আছে, বিদ্যারূপ দীপ্যমান সূর্য্যজ্যোতি সে সমুদয়ের এক মাত্র মূল কারণ হইয়াছে। অতএব এদেশের দুরবস্থা মোচন বা সুখোন্নতির নিমিত্তে সর্ব্বাগ্রে দেশস্থ লোকের অজ্ঞান তিমির নিরাকরণ করা অতি গুরুতর উপায় হইয়াছে। হা! যৎপরিমাণে এই মহা কার্য্য সাধনের প্রয়োজন, তাহার প্রতি তৎপরিমাণে রাজা কি প্রজা সকলেরই অবহেলা। আমারদিগের দেশ অজ্ঞান তিমির দ্বারা যেরূপ আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে চিত্ত ব্যাকুল হয়। চতুর্দ্দিকে কি মহাশূন্য দেখিতেছি! অসীম সম বিস্তারিত মরুভূমি ঘোরতর রজনীচ্ছায়াতে আবৃত রহিয়াছে! কুত্রাপি কোন ইংলণ্ডীয় বিদ্যালয় স্বরূপ ক্ষুদ্র দীপ প্রকাশে পার্শ্ববর্ত্তী অন্ধকার আরও প্রগাঢ় বোধ হইতেছে! বিশেষতঃ সর্ব্বসাধারণের শিক্ষাস্থান যে আমারদিগের দেশীয় ভাষার পাঠশালা, তাহাও সেই অন্ধকারেরই আলয়। বিষয় কর্ম্মোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ নির্দ্দিষ্ট অঙ্ক শিক্ষা যে বিদ্যালয়ের প্রধান বা সমস্ত বিদ্যাই হইয়াছে, কতিপয় অশুদ্ধ চিরনিরূপিত পত্র লেখার অভ্যাস যাহার সম্যক্ লিপি বিদ্যা হইয়াছে, এবং অল্পজ্ঞ অঙ্ক গুরু শুভঙ্করের আর্য্যা এবং সরস্বতী বন্দনা, গুরুবন্দনা, গঙ্গাবন্দনা, ও দাতাকর্ণাদি যাহার সমুদয় পাঠ্যগ্রন্থ হইয়াছে, সে বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের যে বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি হইবে তাহার কি সম্ভাবনা? কিন্তু কেবল বুদ্ধি বৃত্তির প্রাখর্য্য করাও বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন নহে! আমারদিগের মানসিক তাবৎ বৃত্তির উন্নতি ও সুনিয়ম করা, দুষ্ট রিপু সকল শাসন করিয়া ধর্ম্মের প্রবৃত্তি প্রবল করা, সুসাধু বিশুদ্ধ চরিত্র ভূষণে আপনাকে ভূষিত করা, পিতামাতার প্রতি

ভক্তি, স্বদেশের প্রতি প্রীতি, পরোপকারে অন্‌রাগ সঞ্চার করা, এবং জগদীশ্বরের প্রেমাবৃত রসে চিত্ত আর্দ্র রাখা, বিদ্যাভ্যাসের সম্যক্ প্রয়োজন হইয়াছে। এসমস্ত প্রয়োজন এদেশের ইংলণ্ডীয় কি দেশ্য ভাষার কোন বিদ্যালয়েই সিদ্ধ হয় না, বিশেষতঃ সর্ব্বাপেক্ষা গর্‌র্‌ মহাশয়ের শিষ্যগণ ইহার বিপরীত ব্যবহার সকলের অন্‌ষ্ঠানেই প্রবৃত্ত হয়। তিনি তাহারদিগের চিত্ত ভূমিকে স্‌রম্য স্‌সৌরভ প্‌ষ্পে আমোদিত না করিয়া ঘনরোপিত কণ্টকি বন দ্বারা ভয়ঙ্কর করেন। যদ্রূপ সন্তানকে স্নেহের সহিত পালন করা উচিত, তদ্রূপ শিষ্যকে প্রীতির সহিত উপদেশ কর্ত্তব্য, কিন্তু গর্‌র্‌ মহাশয়ের ব্যবহার এ রীতির কি বিপরীত? তিনি নিয়ত ক্রোধেতে পরিপূর্ণ এবং ছাত্রেরা ভয়েতে সর্ব্বদাই শঙ্কিত। তাঁহার শত প্রকার প্রসিদ্ধ নির্দ্দয় দণ্ড ভয়ে তাহারা কম্পিতকলেবর থাকে। তাহারা শিক্ষা গর্‌র্‌কে যম স্বরূপ দেখে, এবং বিদ্যালয়কে যমালয় জ্ঞান করে; স্‌তরাং অনেকেরই স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি শত্র্‌তা ভাব ও দ্বেষানল ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইতে থাকে। তাহারা তাঁহার আসন তলে কণ্টক স্থাপন ও তিমিরাবৃত রজনীতে মৃৎপিণ্ড বা ইষ্টক খণ্ড ক্ষেপণ করিয়া তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিতে ত্র্‌টি করে না, দেব দেবীর সন্নিধানে একান্ত চিত্তে তাঁহার মৃত্যুও প্রার্থনা করিতে নিরস্ত হয় না। এস্থলেও তাহারদিগের দ্‌র্ম্মতির নিরাস নাই। পিতা মাতা তাহারদিগকে এমত যন্ত্রণার স্থানে প্রেরণ করেন, ইহা ভাবিয়া কেহ কেহ পিতা মাতারও অমঙ্গল ইচ্ছা করে। এইরূপে তাহারদিগের ক্রোধ, দ্বেষ, গর্‌র্‌নিন্দা ও অকৃতজ্ঞতাদি মনের কুবৃত্তি সকল প্রবল হয়। যাহারা গর্‌র্‌ মহাশয়ের প্রসন্নতা লাভের নিমিত্তে সচেষ্ট, তাহারা চৌর্য্যবৃত্তি ও মিথ্যাচরণের অভ্যাসে আশ্‌ নিপ্‌ণ হয়; কারণ যে বালক অপহরণ করিয়াও গর্‌র্‌ মহাশয়কে তাঁহার প্রয়োজনীয় যত বস্তু প্রদান করিতে পারে, ততই তিনি তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন।

অতএব আমারদিগের যে সকল দেশীয় পাঠশালা সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা স্থান, তাহা যখন এপ্রকার অচিন্ত্য বিষম দ্‌র্দ্দশা গ্রস্ত, তখন দেশ মধ্যে বিদ্যার আলোক বিকীর্ণ হইবার কি সম্ভাবনা? কিন্তু এই সকল পাঠশালাতেও কত লোক শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়? ইহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইতে হয় যে বাঙ্গলা ও বেহারের প্রত্যেক শত বালকের মধ্যে কেবল আটজন মাত্র বালক বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়, এবং প্রত্যেক শত প্রৌঢ় ব্যক্তির মধ্যে ছয়জন মাত্র অল্প লেখন পঠনে সমর্থ হয়—প্রত্যেক শতে ৯২ বা ৯৪ ব্যক্তি যৎ কিঞ্চিৎ অতি সামান্য প্রকার বিদ্যার্জ্জনেও বঞ্চিত রহিয়াছে! বাঙ্গলা ও বেহারের ৬০,০০০০০ ষষ্টি লক্ষ শিক্ষণীয় বালক এবং ২১০,০০০০০ দ্‌ই কোটি দশ লক্ষ প্রৌঢ় ব্যক্তি কিরণ শূন্য প্রগাঢ় অন্ধকারে মূর্চ্ছিত রহিয়াছে*! দেশীয় লোকের এবম্প্রকার বিস্তারিত অজ্ঞান চিন্তা করিলে কাহার চিত্ত প্রদীপ্ত দ্‌ঃখানলে দগ্ধ না হয়? নিরাশায় ম্লান ও অবসন্ন না হয়? তাহারা স্বীয় পার্শ্ববর্ত্তী ইতর জন্তুর ন্যায় কেবল আহার বিহারাদি যৎকিঞ্চিৎ ইন্দ্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করাই জীবনের সম্‌দয় কার্য্য বোধ করে। পশ্‌র সহিত মন্‌ষ্যের কি প্রভেদ? মন্‌ষ্যের উৎকৃষ্ট স্‌খের কারণ কোন্ পদার্থ, ও মন্‌ষ্যের স্বভাবের উৎকর্ষই বা কি? কিরূপ শক্তির বীজ সকল আমারদিগের মনে স্থাপিত আছে, এবং

---

* William Adam's Report on the State of Education in Bengal and Behar &c. reviewed in the Calcutta Review No. 4.

তাহার প্রকাশ ও উন্নতি হইয়া কি প্রকার মহৎ মঙ্গলের উদয় হইতে পারে? এই সংসারেরও সুখস্বচ্ছন্দতা কি প্রকারে প্রাপ্ত হয়, এবং রাজপদের সৃষ্টি ও রাজা প্রজার প্রভেদই বা কি নিমিত্তে হইয়াছে? এসকলের কিছুই তাহারা জ্ঞাত নহে, তাহারদিগের চিন্তা স্রোত এ পথে স্বপ্নেও কখন প্রবাহিত হয় নাই। তাহারা অজ্ঞান নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে!

দেশহিতৈষী পুরুষ এবং দয়াশীল রাজা ইহারদিগের জ্ঞানোদয়ের উপায় ধার্য্য না করিয়া কি প্রকারে মনঃস্থির রাখিতে পারেন? এ অসাধারণ অজ্ঞান নিরাকরণ না হইলে এ দেশের মঙ্গলোন্নতি জন্য অন্য কোন চেষ্টা সফল হইবে না। কিন্তু ইহার উপায় করা কি বিস্তীর্ণ কার্য্য! ক্রোশ বা দ্বিক্রোশান্তে পাঠশালা স্থাপন ব্যতীত সাধারণ রূপে বিদ্যাজ্যোতি ব্যাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু বাঙ্গলা পাঠশালা সকলের বর্ত্তমান অবস্থা যত কাল থাকিবে, ততকাল এ আশা অতি ক্ষুদ্র পরিমাণেও সার্থক হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব তৎপরিবর্ত্তে উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় সকল সংস্থাপন করা, বঙ্গ ভাষায় বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক উত্তমোত্তম গ্রন্থ সকল প্রস্তুত করা, এবং ছাত্রদিগকে তাহার উপদেশ প্রদানের নিমিত্তে সুযোগ্য কৃতবিদ্য শিক্ষক সকল নিযুক্ত করা ইহার আবশ্যক উপায় হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে ইংলণ্ডীয় ভাষায় নানাবিধ পুস্তক প্রস্তুত আছে, ও তাহার সুনিপুণ শিক্ষক সকল অনায়াসে প্রাপ্ত হয়, অতএব এদেশীয় লোককে বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে সাধারণ রূপে ইংলণ্ডীয় ভাষার উপদেশ করা উচিত। অনেক ইংলণ্ডীয় পুরুষ এবং আমারদিগের স্বদেশস্থ কোন কোন ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ যুবাও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার পর অলীক মতও আর নাই। এ ভ্রম খণ্ডনের নিমিত্তে এই মাত্র বিবেচনা করা উচিত যে আত্ম ভাষায় কি পর ভাষায় জ্ঞান উপার্জ্জন সুলভ হয়? এবিষয় আমারদিগের কোন সংশয় স্থলই বোধ হয় না—ইহা প্রশ্নেরও যোগ্য নহে। শিশুর রসনা মাতৃ দুগ্ধ পানের সহিত যে ভাষার অনুশীলন করে, বিদ্যারম্ভের পূর্ব্বকালেই যে ভাষার অর্দ্ধ ভাগ তাহার কণ্ঠগত হয়, এবং তরুণ বা প্রৌঢ় কালে সাধ্যপর যত্নেও যাহা বিস্মৃত হইতে লোক অসমর্থ হয়, সেই পৈতৃক ভাষা অভ্যাস করা সুলভ নহে, আর পৃথিবীর ভিন্ন প্রান্তবাসী পরজাতীয় ভাষা শিক্ষা সুলভ, ইহা কি প্রকারে মনুষ্যের মনোগত হয়? পরদেশীও ভাষা মাত্র অভ্যাসে যে কাল ব্যয় হয়, সে কাল মধ্যে স্বদেশীয় ভাষায় বিবিধ বিদ্যার সংস্কার হইতে পারে। যে অল্প ব্যক্তির স্বচ্ছন্দ অবস্থা, সুতরাং জ্ঞানার্জ্জনের যথেষ্ট কাল প্রাপ্তির উপায় আছে, তাহারা যদিও বহু অংশে কৃতার্থ হইতে পারে, কিন্তু দেশময় যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র সন্তান অন্নাভাবে শীর্ণ, বা যে সকল মধ্যবর্ত্তী গৃহস্থ বালকেরা দুরবস্থ হইয়া ক্ষুণ্ণ ভাবে কাল যাপন করে, যাহারদিগের পিতা মাতা কেবল আপন পুত্রদিগের ভাবী উপার্জ্জনের প্রত্যাশায় প্রাণ ধারণ করেন, সে সকল বালকের পরের ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া বিদ্যা লাভের সময় নাই, তাদৃশ বহু মূল্যে জ্ঞানার্জ্জন করিবার উপায়ও নাই। সকল দেশেরই এই প্রকার ভাব, এ নিমিত্তে ইংলণ্ড দেশে উপায়ক্ষম ব্যক্তি দিগের নানা ভাষা শিক্ষার জন্য নগর বিশেষে যেরূপ মহা মহা বিদ্যাগার বর্ত্তমান আছে, তদ্রূপ সর্ব্বসাধারণের বিদ্যাভ্যাস নিমিত্তে গ্রামমধ্যে দেশ ভাষার পাঠশালা সকল স্থাপিত আছে। এ দেশের বিষয়েও রাজ পুরুষদিগের সেই নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ ইহাও বিবেচনার যোগ্য যে আত্ম ভাষা

অপেক্ষা পরভাষা শিক্ষার নিমিত্তে চতুর্গুণ ধনের প্রয়োজন। ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রদিগের জ্ঞানাভ্যাসে যে ব্যয় হয়, স্বভাষায় বালকেরা তাহার চতুর্থ অংশের এক অংশ ব্যয়ে তুল্য জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারে। তৃতীয়তঃ স্বদেশের বিদ্যা যত কাল স্বদেশের ভাষা স্বরূপ সুচারু পরিচ্ছদ পরিধানে সজ্জীভূত না হয়, ততকাল সর্ব্বসাধারণের হৃদয়গত কখনই হইতে পারে না। এইক্ষণে যেরূপ বিদ্যা শূন্য পুরুষেরা ও জ্ঞানাধিকারবঞ্চিত অবলারা পুরাণাদি অধ্যয়ন না করিয়াও সুস্পষ্ট রূপে জ্ঞাত আছে যে পৃথিবী বাসুকীর মস্তকোপরি অবস্থিতি করিতেছে, সূর্য্য এক লক্ষ ও চন্দ্র দ্বিলক্ষ যোজনোপরি পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, রাহু দৈত্যের গ্রাস দ্বারা সময়ে সময়ে তাহারদিগের গ্রহণ হইতেছে, এবং অদিন ও অক্ষণে যাত্রা করিলে রোগাদি অমঙ্গল ঘটনা, ও দেবতা বিশেষের উদ্দেশে কামনা বিশেষ দ্বারা তাহার নিরাকরণ অবশ্যই হয়; তদ্রূপ আমারদিগের দেশীয় ভাষায় বিদ্যানুশীলন প্রচলিত হইলে তাহারা পরম্পরা শ্রুতি দ্বারাও অনায়াসেই জানিবে যে ভূমণ্ডল শূন্যেতে স্থিতি করিয়া সূর্য্যকে সম্বৎসরে পরিবেষ্টন করে, সূর্য্যমণ্ডল চন্দ্র অপেক্ষা বহু ঊর্দ্ধে স্থিতি করে, ভূচ্ছায়া প্রবেশ দ্বারা চন্দ্র গ্রহণের ও চন্দ্রবিম্ব আবরণ দ্বারা সূর্য্য গ্রহণের সংঘটনা হয়, দুর্গন্ধ ঘ্রাণ ও অপরিমিত ভোগাদি শারীরিক নিয়মভঙ্গ করা রোগের এক মাত্র কারণ, ও শারীরিক নিয়ম পালন করাই সুস্থতার হেতু, ঈশ্বরের যে বিষয়ক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবে তদ্দ্বারা সেই বিষয় ঘটিত অমঙ্গল হইবে, এবং যে বিষয়ক নিয়ম পালন করিবে তদ্দ্বারা সেই বিষয়ের সুখ প্রাপ্তি হইবে। স্বদেশোৎপন্ন শস্য যে রূপে সকলের সুলভ হইয়া সর্ব্বসাধারণের বল বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ স্বদেশের ভাষা দ্বারা সকলে জ্ঞান তৃপ্ত হইয়া তৎ ফল সুখ সম্ভোগ করিতে পারে।

এ দেশে পঞ্চবিংশতি বৎসরাবধি যে ইংরাজী ভাষার অনুশীলনা যত্নের সহিত আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে কি ফল লব্ধ হইল? এমত কি আশাই বা সঞ্চার হইয়াছে যে ভবিষ্যতে এদেশীয় লোক কেবল ইংলণ্ডীয় ভাষা দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জনে সমর্থ হইবে। ইহা সত্য যে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক দুই সহস্র ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছেন, এবং বিদ্যার প্রভাবে তাঁহারদিগের সংস্কৃত চিত্ত অজ্ঞান ঘনাম্বুদোপরি উত্থিত হইয়া অতি প্রসারিত নির্ম্মল জ্ঞানাকাশে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু তাহারদিগেরও মধ্যে কয় ব্যক্তি সে ভাষাতে বিনা সংশয়ে রচনা করিতে পারেন? আর সমস্ত দেশস্থ লোকের তুলনায় সেই দুই সহস্র সংখ্যাই বা কত? বর্ত্তমান কোন পত্র সম্পাদক যথার্থ বলিয়াছেন যে আর পঞ্চবিংশতি বৎসর পরে রাজধানী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে না হয় এদেশস্থ পঞ্চ সহস্র ব্যক্তি ইংলণ্ডীয় ভাষাতে পারদর্শী হইবে, কিন্তু এই পঞ্চ সহস্রই বা কত? এদেশীয় সমস্ত লোকের পঞ্চ সহস্র অংশের এক অংশও নহে।

ইংলণ্ডীয় ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোন কোন ব্যক্তির পরম প্রিয় বাসনা এই যে ইংলণ্ডীয় ভাষা এই মহা বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের দেশ ভাষা হইবে, এবং এইক্ষণকার দেশ ভাষা সকল ঐ পরভাষা বলে লুপ্ত হইবে। কিন্তু ইহার পর অলীক কথা আর নাই। যাঁহারা একথা কহেন, তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন যে ভারতবর্ষের তাবৎ ভূমি খনন করিয়া ইংলণ্ড ভূমি দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবেন। কোন দেশের ভাষা যে এককালে উচ্ছিন্ন হয় ইহা যুক্তি সিদ্ধ নহে, ইতিহাসেও ইহার উদাহরণ প্রাপ্ত হয় না। ইহা সত্য যে গ্রীক ও রোমান

লোকেরা আপনারদিগের অধিকৃত দেশে আত্ম ভাষা প্রচারের যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কার্য্যে তাঁহারা কি পর্য্যন্ত কৃতার্থ হইয়াছিলেন? সেই সকল দেশের ভাষা উচ্ছেদ করিতে তাঁহারা কত দূর সমর্থ হইয়াছিলেন? স্বভাবতঃ অধিকারি জাতির অধিকার নাশের সহিত অধিকৃত দেশ হইতে তাহারদিগের ভাষা লুপ্ত হইতে থাকে। মিশর দেশে রোমানদিগের অধিকার চ্যুত হইলে গ্রীক ভাষার ব্যবহার লুপ্ত হইল, কিন্তু তাহার দেশ ভাষা যে কপ্‌টিক্ তাহা এইক্ষণকার দুই শতবর্ষ পূর্ব্বে পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। ফ্রান্‌স ও স্পেন দেশেও তাদৃশ ঘটনা হয়। সীরিয়া দেশে গ্রীকদিগের অধিকার কালে যে সকল নগর গ্রীক-নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার দেশ ভাষার প্রাচীন নামে খ্যাত হইল। বাস্তবিক জয়ী লোকেরা যদি পরাজিত দেশে বহু সংখ্যাতে পুরুষানুক্রমে বসতি করেন, এবং পুরোবাসীদিগের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা মিশ্রিত হয়েন, তবে উভয়ের সংশ্রবে এক নূতন সংকীর্ণ ভাষা উৎপন্ন হয়। হিন্দুস্থানী ও পারসীক এবং ফ্রেঞ্চ ও স্পানিষ প্রভৃতি ভাষার এই রূপ উদ্ভব হইয়াছে। যদি জয়বান্ জাতি স্বাধিকৃত দেশে বাহুল্য রূপে বসতি না করেন, এবং বিবাহাদি সম্বন্ধ দ্বারা তাহারদিগের সহিত এক জাতীভূত না হয়েন, তবে সে দেশীয় ভাষার বিশেষ অন্যথা হওয়া সম্ভব নহে। আরবেরা যে ইটালী ও সিশিলি দ্বীপ অধিকার করিয়াছিল, তাহার কি নিদর্শন এইক্ষণে প্রাপ্ত হয়? জয়ী লোক যদি পরাজিত লোককে তাহারদিগের স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আপনারা তাহাতে বাস করেন, তবে সেখানে তাঁহারা আপনারদিগের ভাষা আপনারাই ব্যবহার করেন, তাহাতে সে দেশীয় লোকের ভাষার কি অন্যথা হইল? অতএব যে পক্ষে বিচার করুন, ভারতবর্ষের দেশ ভাষা সকল উচ্ছিন্ন হইয়া তৎ পরিবর্ত্তে যে ইংরাজী ভাষা স্থাপিত হইবে, ইহা কেহ যেন মনেও স্থান দেন না—নিঃসংশয়ে এই ভবিষ্যৎ কথা ব্যক্ত করিতেছি যে কাহারও এমনস্কামনা কদাপি সিদ্ধ হইবে না।

আমারদিগের দেশ ভাষার অনুষ্ঠানের প্রতি যে সকল ইংলণ্ডীয় লোক পূর্ব্ব পক্ষ করেন, তাঁহারদিগের মত খণ্ডনের নিমিত্তে পূর্ব্বোক্ত যুক্তি সকল প্রয়োগ করা উচিত, কিন্তু ব্যক্ত করিতে লজ্জা উপস্থিত হইতেছে যে আমার-দিগের স্বদেশস্থ ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ কতিপয় যুবা পুরুষ অম্লান বদনে কহিয়া থাকেন যে, "সেই বাঞ্ছিত কাল কোন্ দিন আগমন করিবে যখন কেবল ইংরাজী ভাষা এই দেশের জাতীয় ভাষা হইবে।" হা! ইংলণ্ডীয় ভাষার বিদ্যাভ্যাসে ছাত্রদিগের বুদ্ধির প্রাখর্য্য হইতেছে বটে, কিন্তু কি বিষময় বিপরীত ফলেরও উৎপত্তি হইতেছে। তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই অন্য অন্য বিদ্যা শিক্ষার সহিত স্বদেশের ভাষা, স্বদেশের বিদ্যা ও স্বদেশের লোককে তুচ্ছ করিতে নিয়মিত শিক্ষা করেন। যেরূপ কেহ কেহ আপনার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জানাইবার জন্য অনবরত ইংরাজী কথনাদি দ্বারা এইরূপ ছল করেন যে ইংরাজী সংস্কারে বঙ্গ ভাষা এককালে বিস্মৃত হইয়াছেন, তদ্রূপ অনেকে আপনার বিদ্যাভিমানে প্রমত্ত হইয়া স্বদেশের কোন পদার্থই সমাদর যোগ্য বোধ করেন না—হিন্দু নাম তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। বিদেশীয় পণ্ডিতেরা চিত্ত প্রমোদকারিণী সুমধুর সংস্কৃত ভাষার ললিত গুণে মোহিত রহিয়াছেন, আর আমারদিগের ইংরাজি ভাষার বহু ছাত্র তাহা পাঠ্য বোধ করেন না—সে যে কি দুর্ল্লভ অমূল্য রত্নাকর, তাহার অনুসন্ধান করাও উচিত বোধ করেন না। দেখ, ইঁহারদিগের কি বিপরীত ব্যবহার। ইঁহারা পরদেশের ইতিহাস

যথোচিত অভ্যাস করেন, কিন্তু স্বদেশের পুরাবৃত্ত সন্ধান করা আবশ্যকও বোধ করেন না। ইউরোপ খণ্ডের অন্তঃপাতি কোন্ দেশের কোন্ স্থানে কি নগর? কোন্ বৎসর তাহা নির্ম্মিত হইয়াছে? তদবধি সেখানে কি কি বিষয়ের ঘটনা হইয়াছে? তাহা তাঁহারদিগের সুসূক্ষ্মরূপে জ্ঞাত হইতেই হইবে; কিন্তু আপনারদিগের এই জন্ম ভূমির তদ্রূপ বিবরণ জানিবার জন্য কয় ব্যক্তি সচেষ্ট হয়েন? এই কলিকাতা নগরীর চতুর্দ্দিকে বিংশতি ক্রোশ দূরে কোন্ স্থান তাহা অনেক কৃতবিদ্য পুরুষ জ্ঞাত নহেন। পূর্ব্বকালে ইংরাজদিগের কি প্রকার স্বভাব ছিল? কি প্রকার ক্রমানুসারে এতাদৃশ সদবস্থা হইল? তাহারদিগের কোন্ বংশের কোন্ রাজা কোন্ দিবস রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া কোন্ দিন কি কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং কয় বৎসর কয় মাস পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিয়াছেন? এতাদৃশ সকল বৃত্তান্তের অতি সূক্ষ্ম অঙ্গ পর্য্যন্ত তাঁহারা বিশেষ পরিশ্রম পূর্ব্বক শিক্ষা করেন; কিন্তু আপনারদিগের কি মূল? পূর্ব্বে কোন্ সময়ে আমারদিগের কিরূপ অবস্থা ছিল? কিরূপ ধর্ম্ম ছিল? কি কি বিদ্যা প্রচার ছিল? এতাদৃশ সকল বিষয়ে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত কি পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনাও আছে, কি আক্ষেপের বিষয়! ইহাও জানিবার জন্য কেহ অনুরাগী নহেন। গ্রীক, রোম, ফ্রান্‌স, জর্ম্মেনি প্রভৃতি ইউরোপস্থ সমস্ত দেশের প্রাচীন বা আধুনিক ইতিহাস সামান্যত কণ্ঠাগতই আছে, তথাপি কোন্ দিন কোন্ গ্রন্থ কর্ত্তা তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কি নূতন ব্যাপার প্রকাশ করিলেন, ইহা জানিবার জন্য তাঁহারা কত উৎসাহী! নেবোরের রোমান্ ইতিহাস ও থরল্ ওয়ালের গ্রীক্ ইতিহাস পাঠের নিমিত্তে কত ব্যগ্র! কিন্তু ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত জানিবার জন্য কে অভিলাষ করে? এসিয়াটিক্ রিসর্চ্চ ও এসিয়াটিক্ সমাজের জর্নেল্ গ্রন্থ কে পাঠ করে? তদ্বিষয়ে এইক্ষণে এসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে যে কত চেষ্টা হইতেছে তাহার সন্ধান কে রাখে?

যাঁহারদিগের এরূপ অস্বাভাবিক ও বিপরীত রীতি হইল, আত্ম ভাষার উচ্ছেদ মানস করা তাঁহারদিগের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। আপাততঃ তাঁহারদিগের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় ভেদ হইয়াছে বটে, যাঁহারা মৌখিক বলেন যে দেশ ভাষার অনুশীলন করা অতি আবশ্যক কর্ম্ম। কিন্তু ইহা কি তাঁহারদিগের আন্তরিক বাসনা? ইহা কি তাঁহারদিগের এমত স্নেহের বিষয় যে তাহা সিদ্ধ না হইলে মনেতে অসহ্য বেদনা বোধ হইবে? ইহা যদি হইবে তবে তাঁহারা ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ কোন মিত্রকে প্রাপ্ত হইলে কেবল ইংরাজী কথোপকথনেই মনের দ্বার কেন উদ্‌ঘাটন করেন? বাঙ্গালির সভাতে ইংরাজী কথা ও ইংরাজি বক্তৃতা কেন করিয়া থাকেন? যাহা হউক এ সকল ব্যবহার জন্ম ভূমির প্রতি প্রেমের চিহ্ন নহে। জন্ম ভূমির নাম উচ্চারণ করিলে কি অনির্ব্বচনীয় স্নেহ পাত্র সকল মনেতে উদয় হয়—প্রেমাঙ্কুত রস সাগরে চিত্ত প্লাবিত হয়! যে স্থানে আমরা শৈশব কালে স্নেহ মিশ্রিত যত্নদ্বারা লালিত হইয়াছি, যে স্থানে বাল্য ক্রীড়া দ্বারা আহ্লাদের সহিত বাল্যকাল যাপন করিয়াছি, যে স্থানে যৌবনের প্রারম্ভাবধি সহযোগি মিত্রদিগের প্রীতি দ্বারা সতত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, যে স্থানে আমারদিগের বয়োবৃদ্ধির সহিত সুহৃদ্ মণ্ডলীর সীমা বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং যে স্থানের প্রসাদে ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, যশঃ, সম্পদ্, যাহা কিছু সকলই আমারদিগের লব্ধ হইয়াছে, সে স্থানের প্রতি বিশেষ স্নেহ হওয়া কি স্বভাব সিদ্ধ নহে? স্বদেশ এ প্রকার প্রিয় পদার্থ—

যে তাহার নদী, পর্ব্বত, মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমারদিগের প্রণয় আকর্ষণ ও আহ্লাদ সঞ্চার করে। জন্ম ভূমির নাম দ্বারা সেই বস্তুর নাম উচ্চারণ করা হয় যাহার অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ পৃথিবী মধ্যে আর নাই—যে নাম চিন্তা মাত্র পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা, সুহৃদ্‌বান্ধবের প্রেমার্দ্র আনন সকল মনেতে জাগ্রৎ হইয়া উঠে! যিনি প্রবাসী হইয়া দূর হইতে আপনার দেশ স্মরণ করিয়াছেন, তিনিই স্বদেশের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই জানেন যে জন্মভূমি মনুষ্যের দৃষ্টিতে কি রমণীয় বেশ ধারণ করে! "কাশ্মীরের নির্ম্মল হ্রদ ও মনোহর উদ্যান, কিম্বা শিরাজের সুচারু গুলাব পুষ্পের উপবন" কিছুতেই তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট রাখিতে সমর্থ হয় না। তিনি বালুময় মরুভূমি বাসী হইলেও এই স্বদেশ সন্দর্শন পিপাসায় ব্যাকুল থাকেন। এমত সুখের আকর যে জন্মভূমি তাহার প্রতি যাহার প্রীতি না থাকে, সে কি মনুষ্য? পূর্ব্বে আমারদিগের স্বজাতীয় লোকের এরূপ ব্যবহার কখনই ছিল না। অদ্যাপি কাহার মুখে এই রমণীয় শ্লোকার্দ্ধ শ্রুত না হয় যে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"? বীর্য্যবান্ গ্রীক্ জাতি ও জয়পিপাসু রোমান্ জাতির চরিত্র পাঠে আহ্লাদ সঞ্চার হয়, কিন্তু অমরকীর্ত্তি পাণ্ডু পুত্র ও যুদ্ধদুর্দ্দ রাজপুত্রদিগের নামোচ্চারণ মাত্র চিত্ত হর্ষোন্মত্ত হইয়া কি উৎসাহে উল্লম্ফন করিতে থাকে! সেক্‌স্‌পিয়ার স্তুতিযোগ্য এবং নিউটন্ অতি বরণীয় বটে, কিন্তু আমারদিগের আর্য্যভট্টের স্মরণে অন্তঃকরণ কি অপার প্রেমার্ণবে সন্তরণ করে! হোমর্ ও বর্জ্জিল্ অতি প্রসিদ্ধ মহাকবি, কিন্তু বিশাল মহাভারত ও হৃদয়রঞ্জন রামায়ণ এ সকল আমারদের! প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন্ এবং আধুনিক আরবী ও পারসীক বা ইংরাজী ও জর্ম্মান্, অবনীর সকল ভাষা এক দিকে, আর অন্য দিকে সুচারু সুমধুর শব্দ রত্নাকর মহাভাষা সংস্কৃতকে পরিমাণ করিলে আমারদিগের সংস্কৃতই সকল অপেক্ষা গুরুতর হইবে। হিন্দু নাম অতি মনোরম শব্দ! হিন্দু হইয়া হিন্দু নাম লোপ করিবার বাসনা, ইহার পর যাতনার বিষয় আর কি আছে? জন্মভূমির হীন অবস্থা মোচনে যত্ন না করিয়া তাহার প্রতি অনাদর করা—জননীর জীর্ণ শরীর সুস্থ না করিয়া তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা করা, ইহার অপেক্ষা হৃদয় বিদীর্ণ-কারী ব্যাপার আর কি আছে?

যদিও এই লিপিপ্রকরণের পৃথক্ উদ্দেশ্য, তথাপি ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ অনেক যুবকের প্রবোধার্থে অনুষঙ্গাধীন স্বদেশের প্রীতি প্রসঙ্গ স্বভাবত উদয় হইল। এখন বিবেচনা কর, যে স্থানের নদী পর্ব্বত মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমারদিগের প্রীতিপাত্র, সে স্থানের ভাষা, যে ভাষাতে আমরা মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া শৈশবকালের অর্দ্ধস্ফুট মধুর বাক্য ভাষণে মাতা পিতার হাস্যানন করিয়াছিলাম, সে ভাষার প্রতি প্রীতি না হওয়া মনুষ্য স্বভাবের যোগ্য নহে। জননীর স্তন দুগ্ধ যদ্রূপ অন্য সকল দুগ্ধ অপেক্ষা বল বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ জন্মভূমির ভাষা অন্য সকল ভাষা অপেক্ষা মনের বীর্য্য প্রকাশ করে। এই প্রকরণলেখকের কোন মান্য মিত্র অনেক উদাহরণ সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন যে পরভাষার আলোচনায় মনের শক্তি স্ফূর্ত্তি হয় না, এবং আত্ম ভাষার অনুশীলন বিনা কোন দেশে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের উদয় হয় নাই। দেখ ভারতবর্ষের সমীপ-বর্ত্তী পারসীক দেশে যে পর্য্যন্ত কেবল আরবী ভাষার আলোচনা বিশিষ্টরূপে প্রচার ছিল, সে পর্য্যন্ত সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তার উদয় হয় নাই। তৎপরে মহাকবি ফের্‌দোসী আত্ম ভাষাতে শাহনামা গ্রন্থ রচনা করিলে কত

কাব্যামৃত রস পূর্ণ গ্রন্থ সকল প্রকাশ হইতে লাগিল! তখন সাদি আপনার সুকোমল মধুরস্ফীত উপদেশ পুস্তকের সহিত উদয় হইলেন। তখন হাফেজ্ চিত্ত প্রমোদকারী অতি রমণীয় সংগীত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। রোমানেরা অনেক দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, ও সে সকল দেশে আপনার-দিগের ভাষা ও বিদ্যা প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বদেশ ইটালী ব্যতীত তাঁহারদিগের অধীন অন্য অন্য দেশে প্রায় কোন ব্যক্তি যশস্বী গ্রন্থকর্ত্তা রূপে বিদিত হয়েন নাই। সুবিখ্যাত বর্জ্জিল্ ও হোরেস্, এবং লিবি ও সিসিরো ইহাঁরা সকলেই ইটালী ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জর্ম্মণি দেশেতে কীর্ত্তিমান্ ফ্রেডরিক্ রাজার রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত ফ্রেঞ্চ ভাষার বহু সমাদর ছিল, তত্রস্থ বিদ্বান্ লোকেরা সেই ভাষারই অনুষ্ঠান করিতেন, এবং তাহাতেই রাজকার্য্য সম্পন্ন হইত, তথাপি তৎকাল পর্য্যন্ত সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই। পরে যখন গোএথি নামক মহাকবি স্বকৃত ললিত কবিতা দ্বারা আপনার দেশ ভাষা উজ্জ্বল করিলেন, তদবধি সে দেশীয় অন্য মহা মহা গ্রন্থকর্ত্তা আপনারদিগের অসাধারণ মানসিক বীর্য্যোদ্ভব রচনা সকল প্রকাশ করিয়া মানব জাতিকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড দেশে যত দিন জর্ম্মান ফ্রেঞ্চ নামক ভাষার আলোচনা ছিল, তত দিন সে দেশে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ হয় নাই, পরে যখন বিখ্যাত কবি চাসর্ স্বদেশীয় ভাষাতে আপনার কবিতা সকল প্রকাশ করিলেন, তদবধি কত মহত্তম মধুরতম গ্রন্থ সকলের উদয় হইতে লাগিল। সামান্যত দেখ ইউরোপ খণ্ডে যে পর্য্যন্ত লাটিন্ ভাষায় বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত ছিল, সে পর্য্যন্ত সেখানে বিদ্যার স্ফূর্ত্তি হয় নাই, ও উত্তমোত্তম গ্রন্থসকলও প্রকাশ হয় নাই; তৎখণ্ডের লোক সেই কালের অন্ধ কাল সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তৎপরে ইটালী, স্পেন্, পোর্টুগেল্ ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশীয় লোকেরা তখন স্ব স্ব দেশ ভাষার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন, তদবধি ইউরোপ খণ্ড গ্রন্থকারদিগের যশেতে আমোদিত ও জ্ঞান জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইতে লাগিল। ইহা কি সুখের চিন্তা? যে যদি এই মহাত্মাদিগের ন্যায় আমরা আত্ম ভাষাকে সুশোভিত করিতে পারি এবং তাহাতে যদি সুরচিত গ্রন্থ সকল প্রকাশ হয়, তবে আমারদিগের অতি অনুপম আত্ম সন্তোষ লব্ধ হইবে, ভবিষ্যৎ পুরাবৃত্ত বেত্তারা আত্মভাষাপ্রেমিক পূর্ব্বোক্ত জাতিদিগের মধ্যে আমারদিগকেও গণ্য করিবেন, এবং পরজাতীয় লোকেরা আমারদিগের সুচারু রচিত প্রস্তাব সকল পাঠের নিমিত্তে আমারদিগের ভাষা অধ্যয়ন করিবেন। আমারদিগের দেশ ভাষা যে এমত সুললিত হইবে ইহা সম্যক্ সম্ভব, কারণ তাহার বর্ত্তমান আকর যে রত্নাকর সংস্কৃত, তাহার ন্যায় সুশোভন সর্ব্বার্থ প্রতিপাদক মহাভাষা এই ভূমণ্ডলে কদাপি আর বিরাজমান হয় নাই।

More perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either.

Sir W. Jones's work.

অতএব হে স্বদেশস্থ বিজ্ঞ যুবকগণ! আমারদিগের দেশ ভাষা অনুষ্ঠানের বিপক্ষে পরদেশীয় কোন লোক যাহা বলুক, কিন্তু তাহারদিগের সংগী হইয়া তোমারদিগের হাস্যাস্পদ হওয়া উচিত নহে। পরন্তু অনেক ইংরাজেরও এই একান্ত মত যে সামান্য প্রকার বিদ্যাভ্যাস করা যাহারদিগের প্রয়োজন, তাহার-দিগের আপন ভাষা শিক্ষাই কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা কি ইহাতেই তৃপ্ত থাকিব? আমারদিগের উচিত যে সর্ব্বস্থানের সমস্ত বিদ্যা আপন ভাষাতে সংগ্রহ করি,

বেকন্ ও লাক্, নিউটন্ ও লাপ্‌লাস্, কুবিয়র্ ও হম্বোল্‌ট প্রভৃতি সর্ব্ববিধ তত্ত্বশাস্ত্র প্রকাশকদিগের গ্রন্থ আত্ম ভাষাতে ভাষিত করি, যাহাতে অতি উৎকৃষ্ট গুরুতম বিদ্যা সকলও স্বদেশীয় ভাষার দ্বারা শিক্ষা করা যায়। যদিও সর্ব্ব বিবেচনাতে দেশ ভাষায় বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজীর অনুশীলন রহিত করা কদাপি মত নহে। যাহারদিগের সময় আছে ও উপায় আছে, তাহারদিগের ইংরাজী ভাষা উপার্জ্জন করা অতি প্রয়োজনীয় ও মহোপকারী হইয়াছে। বরঞ্চ বর্ত্তমান কালে ইউরোপ খণ্ড যে সমস্ত বিবিধ বিদ্যার আধার হইয়াছে, সেই ইউরোপীয় ভাষা সকল শিক্ষা ব্যতীত তাহা কদাপি সম্যকরূপে উপার্জ্জিত হইবার নহে; আমারদিগের মূল ভাষা সংস্কৃত এদেশীয় সকল শাস্ত্র ও সকল বিদ্যার আধার ও বর্ত্তমান দেশ ভাষা সকলেরও আকর স্বরূপ হইয়াছে; এবং আরবী ও পারসীক ভাষা কাব্যামৃতের সমুদ্র, অতএব দেশ ভাষার পাঠশালা ব্যতীত স্থান বিশেষে এমত মহাবিদ্যাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন যেখানে বিদ্যার্থীরা ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, ও জর্ম্মাণ্ এবং সংস্কৃত, আরবী, ও পারসীক ভাষা সুন্দররূপে অভ্যাস করিতে পারে। এ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার যত বিলম্ব থাকুক, কিন্তু উৎকৃষ্ট নিয়মে দেশ ভাষার পাঠশালা সকল স্থাপন করা আশু প্রয়োজনীয় হইয়াছে। কিন্তু কি প্রকারে এই বৃহৎ কার্য্য সাধন হইতে পারে? ইহা বলা বাহুল্য যে গবর্ণমেণ্টের ইহাতে উৎসাহের সহিত সচেষ্ট হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য, কারণ প্রজাদিগকে বিদ্যাদান রাজ কার্য্যের প্রধান অংগ হইয়াছে। সাধারণ প্রজারা বিদ্যার আস্বাদন প্রাপ্ত না হইলে অন্যকে বিদ্যা বিতরণে কিরূপে তাহারদিগের প্রবৃত্তি হইবে—জ্ঞানের বিমল জ্যোতিতে পিতার মন বিশুদ্ধ না হইলে পুত্রের বুদ্ধি সংস্কারে তাঁহার কেন যত্ন হইবে? বিশেষতঃ রাজার এক আজ্ঞাতে যাহা হইবে, সহস্র সহস্র প্রজার যুগপৎ চেষ্টাতেও তাহা সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর। রাজা যদি এই নিয়ম বলবৎ রাখেন যে সমস্ত রাজ কার্য্য দেশ ভাষাতে সম্পন্ন হইবে, তবে আপনা হইতেই কত লোক আত্ম ভাষা শিক্ষাতে সযত্ন হয়েন। যদি বল গবর্ণমেণ্ট এ উপায় অগ্রেই করিয়াছেন—অগ্রেই তাঁহারা শাখা নগরস্থ বিচারালয়ের কার্য্যে দেশ ভাষা ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন, এবং বংগ দেশের স্থানে স্থানে এক শত বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহা নিরর্থক হইয়াছে। এই উভয় বিষয়েই তাঁহারদিগের যদ্রূপ অবহেলা তাহাতে সকলে অনায়াসে মনে করিতে পারেন যে, তাঁহারা কেবল এবিষয়ে আপনারদিগের অনুৎসাহ গোপন করিবার নিমিত্তে এই উভয় নিয়ম প্রচার করিয়াছেন। বংগ দেশীয় বিচারালয় সকলে বংগ ভাষা ব্যবহারের নিয়ম প্রচার করিয়া তাহা সফল করিবার জন্য কি উপযুক্ত উপায় চেষ্টা করিয়াছেন? তাঁহারা কি তৎপরে অনুসন্ধান করিয়াছেন যে সে নিয়ম বলবৎ হইতেছে কি না? এইক্ষণে যে ভাষাতে সেই সকল বিচারালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় সে ভাষা বাংগলা নহে, ইংরাজী নহে, হিন্দী নহে, পারসীক নহে, কিন্তু তাহা এই সমুদয় ভাষার সন্নিপাত স্বরূপ হইয়াছে। বিচারালয়ের কোন লিপি ঐ পর্য্যন্ত শুদ্ধ দেখি নাই, যাহারা কোন কালে ভাষা রচনা শিক্ষা করে নাই, তাহারাই বিচারাগারের লিপি কর্ম্মচারী! জ্ঞানাপন্ন রাজাদিগের রাজকার্য্যের যে এইরূপ বিকৃতি হয়, ইহা অতি দুঃখের বিষয়। নিয়ম আছে অথচ তদনুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান হয় না, ইহা কদাপি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যোগ্য নহে। পূর্ব্বোক্ত এক শত বিদ্যালয়ের কথা কি কহিব? তাহার দুরবস্থা আলোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট বোধ হয়

যে সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের লেশ মাত্রও যত্ন নাই, তাহার প্রয়োজন সিদ্ধি করা তাঁহারদিগের অভিপ্রায় নহে। এই সকল পাঠশালা অপেক্ষা ইংলণ্ডীয় ভাষার বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহারদিগের যেরূপ উৎসাহ, তাহা চিন্তা করিলেই তাঁহারদিগের আন্তরিক অভিপ্রায় সুন্দর প্রকাশ পায়। তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিমিত্তে প্রচুর ধন ব্যয় করেন, তাহার তত্ত্বাবধারণ বিষয়ে বহু মনোযোগ করেন, উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুতির জন্য পৃথক্ বিদ্যাগারও স্থাপন করিয়াছেন,* কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঐ এক শত বাঙ্গলা পাঠশালার প্রতি তাঁহারদিগের যত্নের কি চিহ্ন প্রকাশ হইয়াছে? গ্রন্থ নাই, শিক্ষক নাই, এবং তাহার তত্ত্বাবধারণেরও নিয়ম নাই, অথচ তাহার কার্য্য সকল হইবেক, ইহা অপেক্ষা অলীক কথা আর কি হইতে পারে? এক জন সাহেব যথার্থ কহিয়াছেন যে ইংরাজী পাঠশালা সকল গবর্ণমেণ্টের আপন আপন সন্তান, আর বাঙ্গলা পাঠশালা সকল সপত্নী সন্তান। আত্ম সন্তানের ন্যায় সপত্নী সন্তানকে কে স্নেহ করিয়া থাকে? অতএব এ দেশে দেশ ভাষা প্রচারের জন্য গবর্ণমেণ্টের যে চেষ্টা সে কেবল নাম মাত্র। ইংরাজ রাজা যদি এদেশীয় প্রজাদিগের কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করিতে স্বীকৃত হয়েন—আমারদিগের সর্ব্বস্বের পরিবর্ত্তে যদি কিঞ্চিৎ বিদ্যা দান করা উচিত বোধ করেন, তবে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে দেশ ভাষার পাঠশালা সকল সংস্থাপন করিয়া উৎকৃষ্ট নিয়মে শিক্ষা দান করুন। অনুরাগ, উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত ইহাতে সচেষ্ট হউন। অনুরাগ শূন্য হইয়া ইহাতে লিপ্ত থাকা অপেক্ষা এককালে নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। গুরু কার্য্যের গুরু উপায় আবশ্যক; উপযুক্ত উপায় অনুষ্ঠিত হইলে অবশ্য সে কার্য্য সিদ্ধি হইবেক! ইউরোপীয় ভাষা হইতে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সকল অনুবাদ করা এবং দেশ ভাষার উপযুক্ত শিক্ষক সকল প্রস্তুত করা এবিষয়ের মূল সাধন হইয়াছে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রজ্বলিত উৎসাহের সহিত এই উভয় অঙ্গ সুসম্পন্ন করুন, এবং সম্যক্ যত্ন পূর্ব্বক সমূহ পাঠশালা সংস্থাপন করিয়া তাহার কর্ম্ম সুসম্পাদন জন্য সুনিপুণ অধ্যক্ষ সকল নিযুক্ত করুন, তখন তাঁহারা দিন দিন কৃতকার্য্য হইবেন, দিন দিন প্রজাদিগের উন্নতি দৃষ্ট হইবেক, এবং দেশ ভাষা অনুষ্ঠানের প্রতি যত বাক্য বিবাদ আছে, তখন তাহা কার্য্য দ্বারা খণ্ডন হইয়া চতুর্দ্দিকে জ্ঞানজ্যোতি বিকীর্ণ হইবেক।”[১০]

১৭৭১ শকের বৈশাখে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লিখেছে :

“কিয়দ্দিবস হইল এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ বিদ্যালয় সমুদায়ের ছাত্রদিগের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা উপলক্ষে কোন কোন রাজকর্ম্মচারী এদেশীয় লোকের অধ্যয়ন বিষয়ে যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। শিক্ষাসমাজাধিপতি বিদ্যোৎসাহী বীটন্ সাহেব অনেকানেক বিষয়ে ছাত্রদিগের যথোচিত প্রতিষ্ঠা করিয়া এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যে হিন্দুছাত্রেরা যে প্রকার প্রখর বুদ্ধিশালী, তাহাতে যদি তাঁহারা অল্পবয়সে বিদ্যানুশীলনের অভ্যাস পরিত্যাগ না করেন, তবে ভূমণ্ডলে বুদ্ধি বিষয়ে অতি প্রধান বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। বিশেষতঃ তিনি এদেশীয় লোকের স্বজাতীয় ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে যে সদ্বিবেচনাসিদ্ধ বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইয়াছি। তিনি এরূপ কহিয়াছেন, যে এইক্ষণে যাঁহারা ইংরাজি ভাষায় বিবিধ

* বাঙ্গলা পাঠশালা অপেক্ষা ইংরাজী পাঠশালার নিমিত্তে তাঁহারদিগের কিঞ্চিৎ যত্ন দৃষ্ট হইতেছে, বাস্তবিক প্রজাদিগের বিদ্যানুশীলনের জন্য রাজার যদ্রূপ চেষ্টা কর্ত্তব্য, তাঁহারা তাহার সহস্র অংশের এক অংশও করিতেছেন না।

প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন, স্বদেশীয় লোকদিগকে সেই সমস্ত বিদ্যার উপদেশ দেওয়া তাঁহারদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগকে বিদ্যা দান করিয়া যে মহোপকার করিতেছেন, এই প্রকারেই তাহার পরিশোধ করা উচিত। কিন্তু তাঁহারা বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া স্বদেশের ভাষা শিক্ষা না করিলে কখনই এভার মোচন করিতে সমর্থ হইবেন না, কারণ বাঙ্গলা দেশে লক্ষ লক্ষ লোকের বাস আছে, সকলেই যে ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইবে, ইহা কদাপি সম্ভাবিত নহে। তিনি কহিয়াছেন, "কলিকাতায় যে সকল যুবা ব্যক্তি ইংরাজী ভাষায় গদ্য পদ্য রচনা করিয়া শ্লাঘা পূর্ব্বক আমার নিকট আনয়ন করেন, আমি তাঁহারদিগকে সর্ব্বদাই কহি যে বঙ্গভাষা শিক্ষা করাই তোমার-দিগের যশঃপ্রাপ্তির এক মাত্র উপায়। তাঁহারদিগের রচিত প্রস্তাব সমুদায়ের যথোপযুক্ত প্রশংসা করিয়া পরে কহিয়াছি, যে যদি তোমরা আমার পরামর্শ গ্রহণ কর, তবে এপ্রকারে প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা পরিত্যাগ কর। যদি তোমার-দিগের গ্রন্থকর্ত্তা হইবার অনুরাগ ও তদুপযোগী ক্ষমতা থাকে, তবে স্বকীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে, অথবা ইংরাজি গ্রন্থের উত্তমোত্তম প্রস্তাব অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে স্থায়িতর কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে। যাঁহারা প্রথমে এই পথাবলম্বী হইয়া কৃতকার্য্য হইবেন, তাঁহারদিগের নিমিত্ত বিপুল যশঃ সঞ্চিত রহিয়াছে।"

বীটন্ সাহেবের এই সকল হিতকর বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, যে তিনি এবিষয়ে প্রগাঢ়রূপে মনোনিবেশ করিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, এবং পরম সুখের বিষয় এই যে এদেশে সাধারণরূপে বিদ্যাপ্রচারের যথার্থ পথ নির্ণয় করিয়াছেন।...

গবর্ণমেণ্ট হইতে এপর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার কোন উপায় হইল না। সংবাদ-পত্র-সম্পাদকেরা যত চীৎকার করুন, আর অন্য ব্যক্তিই বা ইহার কর্ত্তব্যতা পক্ষে যত যুক্তি প্রদান করুন, কিছুতেই তাঁহারা সচেতন হয়েন না। তাঁহারা বধির হইয়া রহিয়াছেন। এক্ষণে হিন্দুকালেজে বাঙ্গলা শিক্ষার নিয়ম আছে বটে, কিন্তু সে নাম মাত্র নিয়ম। তথায় পাঠের শৃঙ্খলা নাই, উপযুক্ত শিক্ষক নাই, পাঠ্য গ্রন্থও নাই এবং কেহ তদ্বিষয়ে তত্ত্বাবধারণও করে না। বাঙ্গলা শিক্ষা করা আর না করা এক প্রকার ছাত্রদিগেরই স্বেচ্ছাধীন। তাহারা পণ্ডিত-দিগকে গ্রাহ্যই করে না, সুতরাং এবিষয়ে অবহেলা করিলে তাহারদিগকে শাসন করিবারও লোক নাই। ইহাতে তাহারদের যে প্রকার ব্যুৎপত্তির সম্ভাবনা, তাহা প্রত্যক্ষই হইতেছে। হিন্দুকালেজ-সংক্রান্ত বাঙ্গলা পাঠশালাতে যে প্রকার অধ্যয়নের রীতি আছে, তাহাও অতি যৎসামান্য। বিশেষতঃ তথায় সুশিক্ষিত হইবার আর এক বিষম প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছে। ইংরাজী ভাষা শিক্ষাতেই লোকের অত্যন্ত অনুরাগ, কারণ তদ্দ্বারা বিবিধপ্রকার বিদ্যাভ্যাস, এবং উপজীবিকা উপার্জ্জনের আশু উপায় হইতে পারে। হিন্দুকালেজের প্রচলিত নিয়মানুসারে কোন বালকের বয়ঃক্রম অষ্টবর্ষের অধিক হইলে তাহার আর তথায় প্রবেশ করিবার অধিকার থাকে না, সুতরাং যাহারদিগের কিঞ্চিৎ বিশেষ রূপে বিদ্যা-শিক্ষার বাসনা থাকে, তাহারা সপ্তবৎসর বয়ঃক্রম হইলে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার অনুরোধে কি প্রকারে আর বাঙ্গলা পাঠশালায় বদ্ধ থাকিতে পারে? এমত কোন ভবিষ্যৎ আশাও নাই যে তাহার উপর নির্ভর করিয়া স্বীয় ভাষা শিক্ষাতে নিরন্তর নিযুক্ত থাকিবেক। এবিষয়ে রাজ-পুরুষদিগের অবহেলনার কথা কি কহিব? পূর্ব্বে এপ্রকার নিয়ম ছিল, যে যে বালক বাঙ্গলা শিক্ষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট

হইবে, তাহাকে ইংরাজী অধ্যয়নের নিমিত্ত বিনা বেতনে বিদ্যালয় বিশেষে নিযুক্ত করা যাইবেক। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! তাঁহারা এই যৎকিঞ্চিৎ কৃপা বিতরণ করাও গুরুভার বোধ করিলেন; বাঙ্গলা ভাষায় তাঁহারদিগের যে প্রসিদ্ধ অনাদর আছে, তাহা আর গোপন রাখিতেও যত্ন করিলেন না। যদিও এক্ষণে অনেকানেক বিজ্ঞ লোক ইহা অঙ্গীকার করেন, যে স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলন ব্যতিরেকে কোন দেশের আপামর সাধারণ সকল লোকের বিদ্যোপার্জন হওয়া সম্ভাবিত নহে, কিন্তু আমারদিগের রাজ পুরুষেরা তাহা শুনিয়াও শুনেন না। ইহা যে তাঁহারদিগের একটা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বোধ আছে, একাল পর্যন্ত তাহার কি চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে? স্থানে স্থানে যে একশত বাঙ্গলা পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে, তাহার প্রতি তাঁহারদিগের যেমন যত্ন, তদনুযায়ী ফলোৎপত্তিও হইতেছে। বস্তুতঃ তদ্বিষয়ে তাঁহারা যে প্রকার ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা কখনই বোধ হয় না, যে তাঁহারা প্রজাগণের বিদ্যাশিক্ষার অভিপ্রায়ে এবিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যদিও এদেশের ইংরাজি বিদ্যালয় সমুদায়েও উত্তম পাঠ-শৃঙ্খলা নাই, ও অনেক আবশ্যক বিদ্যা অধীত হয় না, তথাপি তাহারও প্রতি তাঁহার-দিগের যে প্রকার যত্ন ও উৎসাহ আছে, ঐ সকল বাঙ্গলা পাঠশালার প্রতি তাহার সহস্রাংশের এক অংশও নাই। উপযুক্ত গ্রন্থ নাই, শিক্ষক নাই, ও তত্ত্বাবধারণেরও নিয়ম নাই, অথচ ঐসকল বিদ্যালয়ের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, ইহার পর অলীক কথা আর কি আছে?...

যাহা হউক, প্রজাদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে রাজ-পুরুষদিগের এপ্রকার অনুৎসাহ ও অবহেলা দেখিয়া অন্তঃকরণে বড়ই অসন্তোষ জন্মিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে বিদ্যোৎসাহী বীটন্ সাহেব বঙ্গভাষানুশীলন বিষয়ে যেরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দারা এপ্রকার যৎকিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইতেছে যে তাঁহার যত্ন দ্বারা এবিষয়ের প্রতীকার হইলেও হইতে পারে।..."

১৮৫২ সালের ১৯-এপ্রিল 'হার্ডিঞ্জ স্কুল' অথবা 'বঙ্গবিদ্যালয়' নামে পরিচিত পাঠশালাগুলি সদর বোর্ড অফ রেভিনিউর হাত থেকে কাউন্সিল অফ এডুকেশনের অধীনে চলে আসে। এই পাঠশালাগুলি সম্পর্কে কাউন্সিল অফ এডুকেশনের ১৮৫১-৫২ সালের রিপোর্টে লেখা আছে :

" . . . most of the schools appear to be in a languishing state, and not to have fulfilled the expectations formed on their establishment."

এদিকে হার্ডিঞ্জ স্কুলগুলির এই দীনদশা, ওদিকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কতগুলি নির্বাচিত জেলায় দেশীয় ভাষার শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত করেছেন ছোটোলাট টোমাসন।

Herbert Alick Stark লিখেছেন :

"Mr. Thomason, the first Lieutenant-Governor of Agra, was a man of strong personality and independence of action. His experience of the people committed to his trust was intimate, and his understanding of their needs was unerring. He was familiar with the recommendations which Mr. W. Adam had submitted in 1835 to 1838 for the consideration of the General

Committee of Education, and he regarded them as worthy of acceptance. . . ." [১৪]

টোমাসন প্রবর্তিত সেই শিক্ষাপ্রণালী সফল হয়েছে। ১৮৫৩ সালের গোড়ার দিকে বড়লাট সে-বিষয়ে রিপোর্ট পেলেন। বড়লাট অতঃপর কোর্ট অফ ডিরেক্টরদের বিশেষভাবে জানালেন : বাঙলা ও বিহারেও উক্ত শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো আদেশ আসার আগেই বড়লাট, ১৮৫৩ সালের ৪-নভেম্বর, বাঙলা গবর্নমেণ্টকে আলোচ্য বিষয়ে আপন মতামত ব্যক্ত করার অনুরোধ জানালেন।

বাঙলা গবর্নমেণ্ট, ১৮৫৩ সালের ১৯-নভেম্বর, কাউন্সিল অফ এডুকেশনকে বাঙলাশিক্ষা সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা রচনার নির্দেশ দিল।

ফ্রেডারিক জে. হ্যালিডে তখন কাউন্সিল অফ এডুকেশনের একজন সদস্য। অন্যান্য সদস্যদের মতো তিনিও বাঙলায় শিক্ষা সম্পর্কে একটি মিনিট লিখে দিয়েছেন। হ্যালিডের লেখা ওই মিনিটের তারিখ ২৪-মার্চ, ১৮৫৪ সাল। সমস্ত সদস্যের মিনিটগুলি, ১৮৫৪ সালের ৯-সেপ্টেম্বর, কাউন্সিল অফ এডুকেশন বাঙলা গবর্নমেণ্টকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এই ঘটনার কিছুদিন আগেই, ১৮৫৪ সালের ১-মে, হ্যালিডে বাঙলাদেশের ছোটোলাট হয়েছেন, হ্যালিডেই বাঙলাদেশের প্রথম ছোটোলাট।

হ্যালিডের মিনিটের উৎসমূলে কিন্তু বিদ্যাসাগর আছেন। যা হোক, সমস্ত কাগজপত্র দেখেশুনে হ্যালিডে সাব্যস্ত করলেন যে মাতৃভাষায় শিক্ষা-প্রচার সম্বন্ধে তাঁর পূর্বনির্ধারিত প্রণালীই সর্বোৎকৃষ্ট। ১৮৫৪ সালের ১৬-নভেম্বর হ্যালিডে আপন মিনিটটিই বড়লাটের কাছে পাঠালেন। হ্যালিডের মিনিটের অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি :

"I append a memorandum on the subject, drawn up by the energetic and able Principal of the Sanskrit College who, as is well-known, has long been zealous in the cause of vernacular education, and has done much to promote it, both by his improved system in the Sanskrit College and by elementary works which he has published for the use of schools.

I approve generally of the plan which is contained in the Principal's memorandum, and would wish to see it carried into effect."

হ্যাঁ, বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনাটিও হ্যালিডে বড়লাটের কাছে পাঠিয়েছেন। বলা দরকার, বিদ্যাসাগরের এই পরিকল্পনা উত্তরকালে প্রায় সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয়েছিল।

বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। লক্ষ্যণীয়, আপন পরিকল্পনার দ্বাদশ ধারায় তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখেছেন : নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত আদর্শ বঙ্গ-বিদ্যালয়গুলির প্রধান তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হবেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, কিন্তু সেজন্য তাঁকে অতিরিক্ত কোনো দক্ষিণা দিতে হবে না, তাঁকে কেবলমাত্র যাতায়াতের খরচ (বছরে তিনশো টাকার বেশি লাগবে না) দিলেই চলে যাবে।

এবং বিদ্যাসাগর বিষয়ে স্বয়ং হ্যালিডে মন্তব্য করেছেন :

"Pandit Ishwarchandra Sharma is an uncommon man, who

has shown great energy and zeal in this matter, and I should be well pleased to let him try an experiment, in the result of which he is greatly interested, and which I really think will succeed in his hands."

আট

বিদ্যাসাগর আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়গুলির প্রধান তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হবেন, কাউন্সিল অফ এডুকেশনের অনেক সদস্যই এ-প্রস্তাবে সম্মত হননি। বিদ্যাসাগরের যোগ্যতা সম্পর্কে কারো মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু কারো-কারো মনে প্রশ্ন এল : বিদ্যাসাগর তো সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, সেই গুরু-ভারের সঙ্গে আবার আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধান?

এ-বিষয়ে সকলে একমত যে কিছুতেই বিদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজ থেকে ছাড়া যায় না। সাব্যস্ত হল : এই মহৎ আন্দোলনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যুক্ত থাকা উচিত। আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে নানা বিষয়ে তাঁর পরামর্শ অত্যন্ত মূল্যবান হবে।

কিন্তু হ্যালিডে কারো কথায় কান দিলেন না। তিনি প্রস্তাবিত আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়গুলি স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচনের ভার দিলেন বিদ্যাসাগরকে।

১৮৫৪ সালের কথা। ২১-মে থেকে ১৯-জুন—সংস্কৃত কলেজে তখন ছুটি—বিদ্যাসাগর ঘুরে এলেন গ্রাম-গ্রামান্তর : শিয়াখালা; রাধানগর; কৃষ্ণনগর; ক্ষীরপাই; চন্দ্রকোণা; শ্রীপুর; কামারপুকুর; রামজীবনপুর; মায়াপুর; মলয়পুর; কেশবপুর; পাঁতিহাল। এসব গ্রামের মানুষজন আদর্শ বঙ্গ-বিদ্যালয়ের জন্য, দেখা গেল, যথেষ্ট আগ্রহী। ওঁরা আপন খরচে বিদ্যালয়ের জন্য বাড়ি তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত দিলেন।

ওদিকে সংস্কৃত কলেজের ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। বিদ্যাসাগরকে ফিরে আসতে হল। অনেক গ্রামে যেতে পারেননি, কিন্তু না গেলেও বিদ্যাসাগর অনেক সংবাদ নিয়ে এসেছেন। ১৮৫৪ সালের ৩-জুলাই বিদ্যাসাগর বাঙলার ছোটো-লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারি ক্যাপ্টেন এইচ. সি. জেমসকে একখানা চিঠিতে সমস্ত সংবাদ সবিস্তারে জানিয়েছেন।

১৮৫৪ সালের ৬-সেপ্টেম্বর 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছে : "বঙ্গভাষানুশীলন বিষয়ে যে যে নিয়ম হইয়াছে আমরা তত্তাবৎ পাঠ করিয়া অশেষানন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, সেই নিয়মানুসারে বঙ্গভাষায় শিক্ষা প্রদত্ত হইলে অল্পকালের মধ্যেই এই বঙ্গদেশে বঙ্গভাষার বিলক্ষণ প্রভার উদ্দীপন হইবেক, পণ্ডিতবর পরম বিদ্যানুরাগী শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বঙ্গভাষায় শিক্ষা প্রদানের তত্ত্বাবধায়কের পদে অভিষিক্ত হইবেন, অতএব তিনি জাতীয় ভাষানুশীলনের প্রাচুর্য্য নিমিত্ত বিশিষ্টরূপে উদ্যোগী ও মনোযোগী হইবেন তাহার সন্দেহ নাই...।"

কিছুদিন পরেই সরকারী শিক্ষাবিভাগে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। কাউন্সিল অফ এডুকেশন উঠে গেল। নিযুক্ত হলেন ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন। সরকারী নিয়মে বাঙলা-শিক্ষা-ব্যবস্থার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করা যায় না বিদ্যাসাগরকে। সে-কাজের ভার নেবেন ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন এবং তাঁর অধীনস্থ ইনস্পেক্টর। তবে বিদ্যাসাগর, সংস্কৃত কলেজের কাজের কোনো ক্ষতি না হলে, মাঝে-মাঝে আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়গুলি পরি-দর্শনের জন্য যেতে পারেন—এ-বিষয়ে বড়লাটের কোনো আপত্তি নেই।

কিন্তু ছোটোলাট হ্যালিডের বদ্ধমূল বিশ্বাস, বিদ্যাসাগরের মতো মানুষের

সাহায্য ছাড়া এদেশে বাঙলা শিক্ষাব্যবস্থায় সাফল্যের আশা সুদূরপরাহত। ১৮৫৫ সালের ২৩-মার্চ বাঙলা গবর্নমেণ্ট ডিরেক্টরকে একখানা চিঠিতে লিখেছে :

" . . . The Lt.-Governor remains of opinion that a person so specially qualified for the work as Pandit Ishwarchandra Vidyasagar may be very advantageously employed, for a time at all events, even under the new organization of the Education Department, and he requests that you will consider and report in what manner his services may be most usefully made available without injuriously interfering with his duties as Principal of the Sanskrit College." ১

ডিরেক্টর তখন প্রস্তাব করলেন : অস্থায়ীভাবে বিদ্যাসাগর ইনস্পেক্টর অফ স্কুলস নিযুক্ত হতে পারেন, কিন্তু প্র্যাট সাহেব এলেই বিদ্যাসাগরকে চলে যেতে হবে।

স্বয়ং ছোটোলাট সে-বিষয়ে লিখেছেন :

"I should not anticipate any advantage from a merely temporary employment of Pandit Ishwarchandra.

He is a man of very decided character who has formed and expressed strong views on the subject of vernacular education which, if permitted, he will no doubt endeavour to carry into effect with energy and intelligence according to the scheme approved of.

But I do not see that he could be expected to effect, if temporarily employed, and left to understand that any time, three weeks or three months hence he is to retire from the work on the appearance of Mr. Pratt as inspector.

I do not see why Ishwarchandra should not, under the name of officiating Sub-Inspector, and with the salary sanctioned by the Supreme Government, be directed to carry into effect in the three or four zilas mentioned in my plan of the scheme of vernacular institution which I have recommended and which has been approved by the Supreme Government.

This need not interfere with Mr. Pratt, who besides the task of *inspecting* what Inshwarchandra has done, will have abundant occupation as Inspector of English and Anglo-Vernacular schools and colleges in the zilas to which the plan already approved of has destined his labours to extend.

This scheme of Bengali vernacular instruction is of the deepest importance. I believe the method, which I devised with great pains and after much enquiry, to be the most promising and it would be a pity to wish its failure by placing

one of the chief instruments of its execution in an embarassing and erroneous position in which it would be difficult for him to exert himself with effect." [২]

১৮৫৫ সালের ২০-এপ্রিল বাঙলা গবর্নমেণ্ট ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনকে একখানা চিঠিতে লিখেছেন :

"2. With regard to your proposal to employ Pandit Ishwarchandra Sharma as an Inspector of Schools for a time merely, and until the services of Mr. Pratt are available for that duty, the Lt.-Governor is disposed to doubt the expediency of such an arrangement, for not only would the Pandit be necessarily unable to effect any results of importance during so brief an incumbency, but to place a man of his mature views and experience in a temporary position like that proposed, and with the understanding that he would be liable to be removed from it at any moment, would evince, the Lt.-Governor thinks, less consideration on the part of Government than the Pandit's character and great qualifications for the duty in question justly entitle him to.

3. The Lt.-Governor is of opinion that Pandit Ishwar Sharma may at once receive directions to set on foot the scheme of vernacular institutions which was recommended in the Minute [24 March 1854] drawn up by His Honour when a Member of the Council of Education in March last, and which scheme was generally sanctioned in the letter from the Supreme Government, forwarded to you with this office letter of the 23rd ultimo, three or four of the zilas in the neighbourhood of Calcutta being selected by yourself, in communication with the Pandit, for the introduction of the scheme. This will not, particularly at the present time, interfere in any way with the Pandit's duties at the college. The details of the Pandit's employment on this duty should be arranged for the present in direct communication with yourself, and will eventually be carried on in co-operation with Mr. Pratt and under his immediate superintendence. While employed in this way the Pandit should draw the allowances specified in the Minute above referred to, *viz.* Rs. 200 a month (exclusive, however, as recommended by you, of his travelling charges), in addition to his allowances as Principal of the Sanskrit College." [৩]

অতঃপর ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন ডেকে পাঠালেন বিদ্যাসাগরকে। নানা পরামর্শ করলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে।

দক্ষিণ-বাঙলার বিদ্যালয়সমূহের সহকারী ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হলেন

বিদ্যাসাগর। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে যা মাইনে তা তো আছেই, উপরন্তু ১৮৫৫ সালের ১-মে থেকে আলাদা কাজের জন্য দুশো টাকা মাইনে সাব্যস্ত হল।

দক্ষিণ-বাঙলার বিদ্যালয়সমূহের সহকারী ইনস্পেক্টর হয়েই বিদ্যাসাগর চারজন সাব-ইনস্পেক্টর বেছে নিলেন : হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবচন্দ্র গোস্বামী, তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য ও দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন। এঁদের প্রত্যেকের মাইনে একশো টাকা। তাছাড়া পথ-খরচা আছে। যা হোক, আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপনের উপযুক্ত অঞ্চল নির্বাচনের জন্য বিদ্যাসাগর সাব-ইনস্পেক্টরদের মফস্বলে পাঠিয়ে দিলেন।

তারপর প্রস্তাবিত আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়গুলির জন্য শিক্ষক নির্বাচনের পালা।

একটা মজার কাহিনী আছে।

কী একটা গ্রামে বিদ্যাসাগর একবার একটা স্কুলে গিয়েছেন। কথাবার্তা বলে দেখলেন, স্কুলের ছেলেরা অঙ্ক আর বাঙলা ভালোই শিখেছে। কিন্তু উঁচুক্লাশের ছেলেদের ভূগোলের বিদ্যা পরখ করতে গিয়েই বিদ্যাসাগর হতাশ হলেন।

—পৃথিবীর ক-রকম গতি আছে? কোন্ গতির জন্য পৃথিবীর কত সময় লাগে?

ছেলেরা জবাব দিল—পৃথিবীর কোনো গতি নেই। পৃথিবী স্থির হয়ে আছে। সূর্যই বরং পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সব ছেলেই যখন একরকম ভুল জবাব দিচ্ছে, বিদ্যাসাগর ভাবলেন, নিশ্চয়ই পণ্ডিতমশাই ভুল শিখিয়েছেন।

পণ্ডিতমশায়ের দিকে তাকালেন বিদ্যাসাগর। জিজ্ঞেস করলেন—ছেলেরা এসব কী বলছে? পৃথিবী কি সূর্যের চারদিকে ঘোরে না?

যেন কোনো আশ্চর্য কথা শুনছেন, এমনিভাবে তাকালেন পণ্ডিতমশাই। বললেন—সত্যি-সত্যি পৃথিবী ঘোরে নাকি? আমি ভাবতাম, পৃথিবী এক-জায়গায় স্থির হয়ে আছে।

—না।—বিদ্যাসাগর বললেন—দুরকম গতি আছে পৃথিবীর—আহ্নিক গতি আর বার্ষিক গতি। আহ্নিক গতির জন্য পৃথিবীতে দিনরাত্রি হয়। আপন মেরুরেখার চারদিকে পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় একবার ঘোরে; তার নাম আহ্নিক-গতি। আর বার্ষিক গতির জন্য পৃথিবীতে দিনরাত্রি ছোট-বড় হয়, পৃথিবীতে ঋতুবদল হয়। আপন মেরুরেখার চারদিকে ঘুরতে-ঘুরতে পৃথিবী একটি নির্দিষ্ট পথে প্রায় তিনশো পয়ষট্টি দিনে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে; তার নাম বার্ষিক গতি। পৃথিবী সত্যি-সত্যি ঘোরে।

পণ্ডিতমশাই বললেন—ঘুরুক তাহলে পৃথিবী। যেমন ঘুরছে তেমনি ঘুরুক চিরকাল। পৃথিবীর ঘোরাঘুরি নিয়ে কে মাথা ঘামায়?[৪]

বাঙলা শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি সফল করে তুলতে হয় তো প্রথমেই প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষক। ১৮৫৫ সালের মে মাসে বিদ্যাসাগর নোটিশ দিলেন : শিক্ষক নির্বাচনের জন্য সংস্কৃত কলেজে একটি পরীক্ষা হবে।

প্রার্থীর সংখ্যা দুশো ছাড়িয়ে গেল। পরীক্ষা হল। দেখা গেল, অধিকাংশই উপযুক্ত নন। অবশ্যি আরো কিছু শিক্ষিত হলে এঁরাই আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয়-গুলির ভার নিতে পারবেন।

সবিনয়ং সবহুমানং নিবেদনম্

আপনারা অনুগ্রহপ্রদর্শনপূর্ব্বক আমায় যে পত্র লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা সমস্ত অবগত হইলাম। আপনাদিগের উদ্যোগে ঘাটালে যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে উহার গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে যে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার অনাটন আছে আমি স্বতঃপরতঃ তাহা সমাধা করিয়া দিব সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন তজ্জন্য অন্য চেষ্টা দেখিবার আর প্রয়োজন নাই কিন্তু আগামী শারদীয় পূজার পূর্ব্বে এই টাকা আপনাদিগের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প বোধ করি এই বিলম্ব বিশেষ ক্ষতিকর বা অসুবিধাজনক হইবেক না শ্রাবণ মাসের শেষভাগে আমার বাটী যাইবার কামনা আছে যদি যাওয়া হয় সাক্ষাতে সবিশেষ নিবেদন করিব কিমধিকমিতি ২৪ আষাঢ় ১২৭৫ সাল

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

মাননীয় শ্রীযুক্ত এল. এস. উরনবুল স্কোয়ার
শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ হালদার
মহাশয় মদনুগ্রাহকেষু—
ঘাটাল।"[১০]

স্বগ্রামে ছেলেদের জন্য বিদ্যাসাগর ১৮৫৩ সালে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন।

স্কুল খোলার আগে, না বললেও চলে নিশ্চয়ই, স্কুলের জন্য জমি কিনেছেন। আগাছা-টাগাছায় জমিতে জঙ্গল হয়ে আছে, পরিষ্কার করা দরকার, কিন্তু মজুর পাওয়া গেল না সেদিন। বিদ্যাসাগর নিজেই তখন কোদাল হাতে নিয়ে, ভাইদের সঙ্গে, জমিতে নেমে পড়লেন। জঙ্গল সাফ করতে লেগে গেলেন। জঙ্গল সাফ হয়ে গেল।

তারপর স্কুলের জন্য বাড়ি। কলকাতায় ফেরার আগে সেজন্য বাবার হাতে হাজার টাকার উপরে দিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর।

এই বিদ্যালয়টি সম্পর্কে, ১৮৫৯ সালের ২০-মে, ইনস্পেক্টর অব স্কুলস (সাউথ বেঙ্গল) লজ সাহেব লিখেছেন :

"*Birsingha School.*—This school has been established and entirely supported by the well-known Pandit Ishwarchandra Vidyasagar. In mere justice to that noble philanthropist, I feel it my duty to observe that he has erected a beautiful bungalow for the school in a very convenient locality, pays some six or seven teachers from his own private resources, the boys are educated free and supplied with all sorts of books, and what is still more to be admired, the poorer students about 30 in number, are constantly boarded and lodged in his family mansion and now and then supplied with clothes, etc., when considered necessary. Careful medical attendance is also secured for them, and they are all taken care of as if they were so many members of his family.

Sanskrit is the chief subject of study here. English to the higher and Bengali to the lower classes being taught as supplementary branches. The number of classes in the school is eight, and that of the boys on the list 160, out of which 118 were present, when I visited. In English the first and second classes passed a pretty good examination, but their pronunciation appeared defective.

Bengali is not much attended to. I have recommended the introduction of Bengali books of a scientific character. In Sanskrit they are very clever." [১১]

আসল কথা, বাঙলা শিক্ষা প্রচলনের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের দান অসামান্য। কিন্তু তাঁর এই অসামান্য দান সম্পর্কে তাঁর স্বদেশবাসীরা হয়তো এখনো সম্পূর্ণ সচেতন নন। যদুনাথ সরকার দুঃখ করে বলেছেন: "এই ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের দান আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী আজিও ভোগ করিতেছে, যদিও তাহারা তাহাদের দাতার নাম জানে না।"[১২]

নয়

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল না। ১৮১৯ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' থেকে একাংশ তুলে দিচ্ছি : "স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশে স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকেং বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রের পারগরূপে বিখ্যাতা আছে, বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে, যে অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন।"[১]

পোস্তার রাজপরিবারে, জোড়াসাঁকো-পাথুরেঘাটার রাজপরিবারে এবং আরো কোনো-কোনো পরিবারে স্ত্রীশিক্ষা অপ্রচলিত ছিল না। এসব পরিবারের মেয়েরা লেখাপড়া শিখতেন, বাইরে থেকে শিক্ষয়িত্রীরা এসে লেখাপড়া শেখাতেন। তখনো বাঙলাদেশে কোনো বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি।

প্যারীচাঁদ মিত্র লিখেছেন :

"I was born in the year 1814. . . . While a pupil of the Patshala at home, I found my grandmother, mother, and aunts reading Bengali books. They could write in the Bengali and keep accounts. There were no female schools then. Nor were there suitable books for the females."[২]

এদেশে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে প্রথমে এগিয়ে এসেছেন শ্বেতাঙ্গিনী মহিলারা। গোড়ার দিকে তাঁদের সাহায্য করেছেন রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা বৈদ্যনাথ রায় এবং আরো কেউ-কেউ।

অবৈতনিক বালিকা-বিদ্যালয় খুলে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কাজে প্রথম এগিয়ে এসেছিল 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি', পুরো নাম : The Female Juvenile Society for the Establishment and Support of Bengali Female Schools. কলকাতা ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদরীদের কথায় মিসেস পীয়ার্স ও মিসেস লসনের বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীরা অন্যান্য মহিলা ও মিশনারিদের সাহায্যে 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেছেন ১৮১৯ সালে। সভাপতি হলেন ডব্ল্যু. এইচ. পিয়ার্স। সঙ্গে-সঙ্গে রচিত হয়ে গেল সোসাইটির নিয়মাবলী। সভাপতি এবং চোদ্দজন মহিলা নিয়ে কার্যনির্বাহক সমিতি হল। মাসিক বা বার্ষিক চাঁদা দিলে সকলেই এই সোসাইটির সভ্য হতে পারতেন।[৩]

ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির প্রথম বালিকা-বিদ্যালয়ের নাম : জুভেনাইল স্কুল—স্থাপিত হয় ১৮১৯ সালের প্রথমার্ধে, কলকাতার গৌরীবাড়িতে।

দেশীয় শিক্ষয়িত্রী পাওয়া গেল না, বছরের শেষ পর্যন্ত মাত্র আটজন ছাত্রী এল স্কুলে। ১৮২০ সালের এপ্রিলে একজন দেশীয় শিক্ষয়িত্রী পাওয়া গেল, ছাত্রী-সংখ্যা আস্তে-আস্তে বাড়তে লাগল।

ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি অতঃপর কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে আরো কয়েকটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করল।

হিন্দুপ্রধানেরা আপন মেয়েদের ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির বালিকা-বিদ্যালয়ে পাঠাননি; কিন্তু কেউ-কেউ ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির ছাত্রী-দের উৎসাহ দিয়েছেন। রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে স্কুল সোসাইটির ছাত্রদের ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষা হত। ১৮২১ সালে ও ১৮২২ সালে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির ছাত্রীরাও এই পরীক্ষা দিতে এসেছে।

ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির উদ্যোগে ১৮২২ সালে গৌরমোহন বিদ্যা-লঙ্কারের 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক' নামে একটি বই বেরল। স্ত্রীশিক্ষা যে সামাজিক রীতিনীতি সম্মত, প্রাচীন ও আধুনিক কালের বহু বিদুষী হিন্দু মহিলার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে সেকথা প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'। এই বই রচনায় গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারকে সাহায্য করেছেন রাজা রাধাকান্ত দেব।

'স্ত্রী শিক্ষা বিধায়কে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮২২ সালের আগস্টে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছে কলকাতা স্কুলবুক-সোসাইটি। বিতরণের জন্যই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে।

১৮২৪ সালে বেরল 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়কে'র তৃতীয় সংস্করণ। "The author has enlarged it to nearly double its original size, and has improved it by simplifying the language and by suiting it to the capacity of those for whose use it is intended."

তৃতীয় সংস্করণে সংযোজিত "দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন" অধ্যায় থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি :

"প্র। ওলো। এখন যে অনেক মেয়্যা মানুষ লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা। কালে২ কতই হবে ইহা তোমার মনে কেমন লাগে।

উ। তবে মন দিয়া শুন দিদি। সাহেবেরা এই যে ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝি এত কালের পর আমারদের কপাল ফিরিয়াছে, এমন জ্ঞান হয়।

প্র। কেন গো। সে সকল পুরুষের কায। তাহাতে আমারদের ভাল মন্দ কি।

উ। শুন লো। ইহাতে আমারদের ভাগ্য বড় ভাল বোধ হইতেছে; কেননা এদেশের স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া করে না, ইহাতেই তাহারা প্রায় পশুর মত অজ্ঞান থাকে। কেবল ঘর দ্বারের কায কর্ম্ম করিয়া কাল কাটায়।

প্র। ভাল। লেখা পড়া শিখিলে কি ঘরের কায কর্ম্ম করিতে হয় না। স্ত্রীলোকের ঘর দ্বারের কায রাঁধা বাড়া ছেলাপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষে করিবে।

উ। না। পুরুষে করিবে কেন, স্ত্রীলোকেরই করিতে হয়, কিন্তু লেখা পড়াতে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কায কর্ম্ম সারিয়া অবকাশ মতে দুই দণ্ড লেখা পড়া নিয়া থাকিলে মন স্থির থাকে, এবং আপনার গণ্ডাও বুঝিয়া পড়িয়া নিতে পারে।

প্র। ভাল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কথায় বুঝিলাম যে লেখা পড়া আবশ্যক বটে। কিন্তু সে কালের স্ত্রীলোকেরা কহেন, যে লেখা পড়া যদি স্ত্রীলোকে করে তবে সে বিধবা হয় এ কি সত্য কথা। যদি এটা সত্য হয় তবে মেনে আমি পড়িব না, কি জানি ভাঙ্গা কপাল যদি ভাঙ্গে।

উ। না বইন, সে কেবল কথার কথা। কারণ আমি আমার ঠাকুরাণী দিদির ঠাঁই শুনিয়াছি যে কোন শাস্ত্রে এমত লেখা নাই, যে মেয়্যা মানুষ পড়িলে রাঁড় হয়। কেবল গতর শোগা মাগিরা এ কথার সৃষ্টি করিয়া তিলে তাল করিয়াছে। যদি তাহা হইত তবে কত স্ত্রীলোকের বিদ্যার কথা পুরাণে শুনিয়াছি, ও বড়২ মানুষের স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলেই লেখা পড়া করে এমত শুনিতে পাই। সংপ্রতি সাক্ষাতে দেখ না কেন; বিবিরা তো সাহেবের মত লেখা পড়া জানে, তাহারা কেন রাঁড় হয় না।

প্র। ভাল। যদি দোষ নাই তবে এত দিন এ দেশের মেয়্যা মানুষে কেন শিখে নাই।

উ। শুন লো। যখন স্ত্রীলোক মা বাপের বাড়ী থাকে, তখন তাহারা কেবল খেলা ধূলা ও নাট রঙ্গ দেখিয়া বেড়ায়। বাপ মায়ও লেখা পড়ার কথা কহেন না। কেবল কহেন, যে ঘরের কায কর্ম্ম রাঁধা বাড়া না শিখিলে পরের ঘর কন্না কেমন করিয়া চালাইবি। সংসারের কর্ম্ম দেয়া থোয়া শিখিলেই শ্বশুর বাড়ী সুখ্যাতি হবে। নতুবা অখ্যাতির সীমা নাই। কিন্তু জ্ঞানের কথা কিছুই কহেন না।

প্র। হায়২ কেমন দুঃখের কথা দিদি। ভাল প্রায় সকল গাঁয়েই তো পাঠশালা আছে, তবে কন্যারা আপনারাই সেখানে গিয়া কেন শিখে না। তখন তো বাল্যকাল থাকে কোন স্থানে যাইবার বাধা নাই।

উ। হেদে দেখ দিদি। বাহির পানে তাকাইতে দেয় না। যদি ছোট২ কন্যারা বাটীর বালকের লেখা পড়া দেখিয়া সাদ করিয়া কিছু শিখে ও পাত-তাড়ি হাতে করে তবে তাহার অখ্যাতি জগৎ বেড়ে হয়। সকলে কহে যে এই মদ্দা ঢেঁটি ছুঁড়ি বেটা ছেলের মত লেখা পড়া শিখে, এ ছুঁড়ি বড় অসৎ হবে। এখনি এই, শেষে না জানি কি হবে। যে গাছ বাড়ে তাহার অঙ্কুরে জানা যায়।”

১৮২৩ সালে ‘বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান স্কুল সোসাইটি’র মহিলাবিভাগে পরিণত হল ‘ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি’। সেসময়ে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির আটটি বালিকা-বিদ্যালয় ছিল। ১৮২৩ সালের ১৯-ডিসেম্বর গৌরীবাড়িতে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির স্কুলের ছাত্রীদের একটি পরীক্ষা হয়, পরীক্ষা দিতে এসেছিল একশো-চল্লিশজনের বেশি হিন্দু-মুসলমান ছাত্রী। আগের বছর থেকে ছাত্রীদের সূচীশিল্প শেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। সোসাইটি ১৮২৩ সালে আরো দুটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেছে।

১৮২৯ সালে দেখা যাচ্ছে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির সাকুল্যে কুড়িটি বালিকা-বিদ্যালয়। ১৮৩২ সাল নাগাদ ‘ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি’র নতুন নাম হল : ক্যালকাটা ব্যাপটিস্ট ফিমেল স্কুল সোসাইটি।

সোসাইটির ছাত্রীদের বাঙলায় বিনা বেতনে লেখাপড়া শেখানো হত, ইংরেজি একেবারেই পড়ানো হত না। ক্রমে খৃষ্টতত্ত্ব শেখানোর ব্যবস্থা হল; তখন উচ্চবর্ণের দরিদ্র হিন্দুমেয়েরা সোসাইটির স্কুল ছেড়ে দিল।

তারপর লেডিজ সোসাইটির কথায় আসতে হয়। লেডিজ সোসাইটির পুরো নাম : Ladies' Society for Native Female Education in Calcutta and its vicinity. এই লেডিজ সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মূলে আছে চার্চ মিশনারি সোসাইটি।

সেকালে লণ্ডনে একটি সোসাইটি ছিল। সোসাইটির নাম : ব্রিটিশ অ্যাণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি। দেশে-বিদেশে শিক্ষাবিস্তার এই সোসাইটির উদ্দেশ্য। এই সোসাইটির তরফ থেকে ১৮২১ সালের নভেম্বরে মিস মেরী অ্যান কুক কলকাতায় এলেন।

মিস কুক ঠনঠনে, মির্জাপুর, শোভাবাজার, কৃষ্ণবাজার, মল্লিকবাজার ও কুমারটুলিতে কয়েকটি নতুন অবৈতনিক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। এ-কাজে তাঁকে সাহায্য করেছে চার্চ মিশনারি সোসাইটি ও স্থানীয় অধিবাসীরা। ১৮২২ সালের এপ্রিল নাগাদ স্থাপিত হল আটটি বালিকা-বিদ্যালয়। এক বছরের মধ্যে পনেরোটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হল; এগারোটি বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য আলাদা বাড়িও হল। বালিকা-বিদ্যালয়গুলির ছাত্রীসংখ্যা সাকুল্যে তিনশোর বেশি।

কিছুকালের মধ্যে মিস কুকের বিয়ে হয়ে গেল পাদরী আইজাক উইলসনের সঙ্গে। মিস কুক হয়ে গেলেন মিসেস উইলসন।

১৮২৪ সালের আরম্ভে বালিকা-বিদ্যালয় হল সাকুল্যে চব্বিশটি। চার্চ মিশনারি সোসাইটি তখন বালিকা-বিদ্যালয়গুলির ভার 'লেডিজ সোসাইটি'র হাতে তুলে দিল। ১৮২৪ সালের ২৫-মার্চ লেডিজ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

চব্বিশটি বালিকা-বিদ্যালয় ও চারশো ছাত্রী নিয়ে লেডিজ সোসাইটির কাজ আরম্ভ হল। ছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষায় অনেক মান্যগণ্য ভদ্রলোক উপস্থিত থাকতেন। কয়েকজনের নামোল্লেখ করা যেতে পারে : রাজা রাধাকান্ত দেব; রাজা বৈদ্যনাথ রায়; রাজা শিবকৃষ্ণ; নীলমণি দাস; কৃষ্ণসখা ঘোষ; কাশীনাথ ঘোষাল। উৎকৃষ্ট ছাত্রীরা পুরস্কার পেত সিকি, আধুলি, শাড়ি। সম্ভবত ১৮২৭ সালের কিছুকাল আগে থেকে লেডিজ সোসাইটির বালিকা-বিদ্যালয়গুলিতে খ্রীষ্টতত্ত্ব অবশ্যপাঠ্য করা হয়।

কলকাতায় একটি সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল স্থাপন লেডিজ সোসাইটি প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্যে কলকাতা, বোম্বাই ও লণ্ডনে চাঁদা তোলার ব্যবস্থা করল লেডিজ সোসাইটি।

রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের রানী বাড়িতে বসে মিসেস উইলসনের কাছে ইংরেজি শিখতেন। সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠায় তাঁর উৎসাহ ছিল। রাজা বৈদ্যনাথ রায় সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের গৃহনির্মাণের জন্য কুড়ি হাজার টাকা দান করলেন।

১৮২৫ সালের ৩১-ডিসেম্বর 'সমাচার দর্পণ' লিখেছে :

"পরীক্ষা॥—২৩ দিসেম্বর শুক্রবার কলিকাতার পুরানা গ্রিজার নিকট কলিকাতার পাঠশালার বালিকারদের বিদ্যার বার্ষিক পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে শ্রীশ্রীমতী লেডী আমহার্ষ্ট ও শ্রীমতী মিস আমহার্ষ্ট ও শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেব ও তাঁহার স্ত্রীপ্রভৃতি এবং শ্রীযুত হারিন্তন সাহেব ও অন্য২ অনেক সাহেব লোক এবং শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর ছিলেন। বালিকারা উত্তমরূপে পরীক্ষা দিয়াছে তাহার বিশেষ লিখনে অসমর্থ হইলাম যেহেতুক দর্পণে স্থানাভাব।

পরীক্ষা হইলে পর শ্রীযুত মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর ঐ পাঠশালার ব্যয়ের কারণ বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন তাহাতে সকলে তাঁহার দাতৃত্বের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং বিবি সাহেবেরা পূর্ব্বে এ বিষয়ের অনুসন্ধান পাইয়া শাদা বস্ত্রের উপর রেশম দ্বারা এইরূপ অক্ষর করিয়াছিলেন যে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল রাজা বৈদ্যনাথের প্রতি হউক। সেই লিখিত বস্ত্র লইয়া শ্রীশ্রীযুত লার্ড বিসোপ সাহেব স্বয়ং উঠিয়া মহারাজকে দিয়া সম্ভ্রম করিলেন অপর সকলে স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিলেন।"[৪]

আরো নানা সূত্র থেকে টাকা যোগাড় হল। তারপর হেদুয়ার পূবদিকে জমি কেনা হল। ১৮২৬ সালের ১৮-মে কলকাতা সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন বড়লাটপত্নী আমহার্স্ট।[৫]

সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের বাড়ি উঠবার আগেই মিসেস উইলসন কাছাকাছি একটা বাড়িতে ছাত্রীদের একত্র করে পড়াতে আরম্ভ করলেন। তারপর বাড়ি উঠল। ১৮২৮ সালের ১-এপ্রিল মিসেস উইলসন সে-বাড়ির দ্বার উন্মোচন করলেন।

Priscilla Chapman লিখেছেন: "In Dec. 1829, Miss Ward, who has joined Mrs. Wilson from England, to assist in her labors, and was left in charge of the Central School, (during Mrs. Wilson's temporary absence to the upper provinces, seeking, with the benefit of her health, the further extension of operations,) gives the following report. The daily attendance of the girls is from one hundred and fifty to two hundred, divided into twenty classes, four of which comprising fifty girls, are reading the Acts, St. Mathew's gospel, and Pearce's geography, they also write upon slates from dictation; six other classes containing sixty girls, read the Bible History and other elementary books; the other ten classes spell on cards, and learn the alphabet."[৬]

উল্লেখযোগ্য, শিক্ষয়িত্রীদের শিক্ষাদান বিষয়ে শিক্ষিত করার জন্য সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলে একটি নতুন শ্রেণী খোলা হয়েছিল।

লেডিজ সোসাইটির সমস্ত বালিকা-বিদ্যালয়েই খ্রীষ্টতত্ত্ব পড়ানো হত। উদ্দেশ্য: অল্পবয়সী ছাত্রীরা ঘরে-ঘরে খ্রীষ্টতত্ত্বের মহিমা ব্যাপ্ত করে দেবে। কিন্তু সোসাইটির সে-উদ্দেশ্য সফল হচ্ছিল না।

অনেক অনাথ শিশুকে আশ্রয় দিয়েছেন মিসেস উইলসন, তাদের জন্য সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলে একটি শিশুশ্রেণী খুলেছেন, তাদের শিক্ষার ভার নিজেই নিয়েছেন। শিশুশ্রেণীর ছাত্রীরা সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের মধ্যেই থাকত। মিসেস উইলসনের চেষ্টায় আগরপাড়ায় একটি অনাথ আশ্রম হল, ১৮৩৬ সালের ২১-অক্টোবর তিনি সেই আশ্রমের ভার নিলেন।

১৮৩৭ সালে সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল তত্ত্বাবধানের ভার নিলেন মিসেস টমসন ও মিসেস হোয়াইট। ১৮৪০ সালে সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল ছাড়া লেডিজ সোসাইটির আরো তিনটি স্কুল ছিল: মির্জাপুর স্কুল; সার্কুলার রোড স্কুল; হাওড়া স্কুল। সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচশো ছাত্রী। অধিকাংশই দেশীয় খ্রীষ্টান মেয়ে।[৭]

লেডিজ সোসাইটিকে সাহায্য করবার জন্য হয়েছিল লেডিজ অ্যাসোসিয়েশন, পুরো নাম : Calcutta Ladies' Association for Native Female Education। ১৮২৫ সালের ১৪-জানুআরি লেডিজ অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লেডিজ অ্যাসোসিয়েশনের অধিনেত্রী হলেন মিসেস উইলসন।

লেডিজ অ্যাসোসিয়েশনের দুটি উদ্দেশ্য : সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের জন্য টাকা যোগাড় করবে; এবং যে-অঞ্চলে লেডিজ সোসাইটির বালিকা-বিদ্যালয় নেই, সেই অঞ্চলে নতুন বালিকা-বিদ্যালয় খুলবে।

দুটি উদ্দেশ্যই যথাসাধ্য সফল করেছে লেডিজ অ্যাসোসিয়েশন।

১৮৩৪ সালে লেডিজ অ্যাসোসিয়েশন উঠে গেল।

বাঙলাদেশে স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। প্রথমে শ্রীরামপুরের পাদরীরা কেবলমাত্র দেশীয় খ্রীষ্টান বালিকাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তারপর, দেখা যাচ্ছে, উইলিয়ম ওয়ার্ড নিজের হাতে নিয়েছেন স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের ভার এবং শ্রীরামপুরের চতুর্দিকে স্থাপিত হচ্ছে বালিকা-বিদ্যালয়। ১৮২৩ সালের ৭-মার্চ ওয়ার্ডের মৃত্যু হল। কিন্তু শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের কাজ বন্ধ হল না। শ্রীরামপুরের হিন্দুপ্রধানেরাও বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনে মিশনারিদের অকাতরে সাহায্য করেছেন।

১৮২৪ সালের ৫-এপ্রিল শ্রীরামপুর ও কাছাকাছি বালিকা-বিদ্যালয়গুলির ছাত্রীরা একটি পরীক্ষা দিয়েছে।

সেবিষয়ে ১৮২৪ সালের ১০-এপ্রিল 'সমাচার দর্পণ' লিখেছে : "পরীক্ষা।—৫ এপ্রিল সোমবার দিবা দশ ঘণ্টার সময় শহর শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর সম্মুখস্থ বাবু গোপাল মল্লিকের বাটিতে শ্রীরামপুরের ও তচ্চতুর্দিকস্থ গ্রামের পাঠশালার বালিকারদের বিদ্যার পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে সাহেব লোক ও বিবি লোক অনেকে আসিয়াছিলেন। ঐ স্থানে তেরটা পাঠশালার সর্ব্বসুদ্ধা দুই শত ত্রিশ বালিকা একত্র হইয়াছিল। ইহারদের মধ্যে পঞ্চাশ জন শব্দ পাঠ করিল ও পঁয়ত্রিশ জন নানাপ্রকার ক্ষুদ্র২ পুস্তক পাঠ করিয়া সকলকে পরমাপ্যায়িত করিল ও অবশিষ্ট বালিকারা ফলা বানান ইত্যাদি পড়িল। পরে বিবি মার্সমন উঠিয়া বালিকারদিগকে বস্ত্র ও শিকি ও পয়সা ও ছবি ইত্যাদি পারিতোষিক দিলেন অপর সকলে সন্দেস পাইয়া সন্তুষ্টা হইয়া স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিল। দুই প্রহরের পর পরীক্ষা সমাপ্তা হইলে রিবরেণ্ড শ্রীযুত জন মাক সাহেব ঐ সকল পাঠশালার বিবরণ পাঠ করিলেন তাহা শুনিয়া সাহেব লোকের তুষ্টি হইল। অপর বালিকারা যে সকল শিল্প কর্ম্ম অর্থাৎ মোজা ও রুমাল ও থলিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছিল তাহা দেখিয়া সকলে অধিক সন্তুষ্ট হইলেন।"[৮]

১৮২৮ সালের জানুআরি পর্যন্ত যে-হিসেব পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের অধীনে বাঙলাদেশের নানাস্থানে তখন বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত—শ্রীরামপুরে, বীরভূমে, ঢাকায়, চট্টগ্রামে, যশোহরে। কিন্তু ১৮৩৫ সালে উইলিয়ম অ্যাডাম লিখেছেন :

"Native Female Schools were begun by the Serampore missionaries at that settlement in 1823, and there are now two in operation, one called the Central school containing 138

girls, and a second called the christian village school containing 14. . . Recently young christian widows, who were themselves educated in the Missionary schools, have been employed as teachers." ১

শেষপর্যন্ত শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন নানা কারণে শিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টায় ক্ষান্ত দিতে বাধ্য হল।

শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন, লেডিজ অ্যাসোসিয়েশন, লেডিজ সোসাইটি, ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি—সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রীশিক্ষার মধ্যবর্তিতায় এদেশে খ্রীষ্টতত্ত্বের মহিমা প্রচার। মূল উদ্দেশ্য যেখানে খ্রীষ্টধর্ম-প্রচার, সেখানে হিন্দুপ্রধানেরা আর কেমন করে সহযোগিতা করেন? তাঁরা অতএব সরে এলেন।

সেকালে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। অনেকেই চিন্তিত হয়েছেন স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে। কেউ স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে, কেউ বিপক্ষে। স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ রচিত হয়েছে।

১৮৪০ সালে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ইংরেজিতে একটি প্রবন্ধ লিখে দুশো টাকা পুরস্কার পেয়েছেন।

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যে-দুজন স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখতে পারবে তাদের দুটি পদক পুরস্কার দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রামগোপাল ঘোষ। ১৮৪২ সালের কথা। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছেন মধুসূদন দত্ত এবং দ্বিতীয় হয়ে রৌপ্যপদক পেয়েছেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়।*

বারাসতে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে ১৮৪৭ সালে। এই বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের মূলে প্রধানত দু-জনের নাম জড়িত: কালীকৃষ্ণ মিত্র আর প্যারীচরণ সরকার। নবীনকৃষ্ণও সাহায্য করেছেন।

বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন তো দেশাচারবিরুদ্ধ এক নতুন কাণ্ড। এই নতুন কাণ্ড করেছেন বলে প্রতিষ্ঠাতাদের কম লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়নি। নবকৃষ্ণ ঘোষ লিখেছেন:

"প্যারীবাবু, নবীনকৃষ্ণবাবু এবং ঐ বালিকাবিদ্যালয়ের শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণ বারাসতে সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। এমনকি বারাসত বিদ্যালয়ের তৎসাময়িক দ্বিতীয় শিক্ষক হরিদাসবাবুও প্যারীবাবুর বিপক্ষ দলে যোগদান করিয়াছিলেন। পাঠকের যেন স্মরণ থাকে যে সে সময়ে স্ত্রীলোকে লেখা পড়া শিখিলে বিধবা হয়, জাতি যায় প্রভৃতি কুসংস্কার বঙ্গীয় পল্লীবাসিগণের অন্তরে বদ্ধমূল। এমনকি একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ কর্ম্মচারী সস্ত্রীক বারাসতের বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ আসিয়া একটী দুগ্ধপোষ্যা বালিকার চিবুকে হাত দিয়া আদর করাতে জাতিনাশ আশঙ্কা করিয়া বারাসতবাসিগণ ঘোটমঙ্গল বসাইয়াছিলেন।

যাহা হউক প্যারীবাবু ও তদীয় বন্ধুবর্গকে যে কেবল বাচনিক কটুবাক্য বা সামাজিক নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছিল এরূপ নহে, এক সময়ে স্থানীয়

---

* মধুসূদন ও ভূদেব সে-সময়ে দ্বিতীয় সিনিয়র শ্রেণীর ছাত্র। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়নি। প্রমাণের জন্য দ্রষ্টব্য: General Report on Public Instruction in the Lower provinces of the Bengal Presidency for 1842-43, Appendix K, p. lxxiv.

জনৈক জমিদার সত্যসত্যই তাঁহাদিগকে দেশাচার ও হিন্দুধর্ম্মবিরোধী সিদ্ধান্ত করিয়া, ডাকাইত দ্বারা হত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন।”[১০]

বেথুন সাহেব কেম্ব্রিজের একজন প্রখ্যাত ছাত্র। বেথুন সাহেব চিরকুমার। ১৮৪৮ সালের এপ্রিলে তিনি এদেশে এলেন। কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সভাপতি হলেন।

কলকাতায় একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছার কথা বেথুন সাহেব সকলের আগে বলেছেন রামগোপাল ঘোষের কাছে।

১৮৪৯ সালের ৭-মে বেথুনের বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হল। এই বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনে বেথুনকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

১৮৪৯ সালের ১০-মে (বৃহস্পতিবার) 'সম্বাদ ভাস্কর' 'হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতার শুভানুষ্ঠান' শিরোনামে লিখেছে :

“এতকালের পর হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতার শুভানুষ্ঠান হইল, পরমেশ্বর করুন শিষ্ট শ্রেণীস্থ বিশিষ্ট হিন্দু মহাশয়েরা এই অনুষ্ঠানের আনুকূল্য করিতে মনোযোগী হউন, আমরা আনন্দিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি গত সোমবারে হিন্দুজাতীয়া বালিকারা বিদ্যালয়ে যাইয়া বিদ্যারম্ভ করিয়াছেন, বাহির শিমুলিয়া পল্লীতে শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের যে বৈঠকখানা আছে উদ্যান মধ্যস্থ ঐ প্রশস্ত রম্য গৃহ বালিকাদিগের শিক্ষালয় হইয়াছে, চতুর্দ্দিগে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বাগানের দক্ষিণ দিগে দক্ষিণবাবু একমাত্র দ্বার রাখিয়াছেন, সে দ্বারে প্রহরী থাকিলেই স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য পুরুষ কেহ তথায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না, বোধ হয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসের বান্ধবেরা এই বিবেচনাতেই উক্ত বাগান মনোনীত করিয়া থাকিবেন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম দিবসেই অনেক ভদ্র বালিকারা তথায় গমন করিয়াছিলেন, শিক্ষাদাত্রী এক সচ্চরিত্রা বিবী তাঁহারদিগের মনোরঞ্জন করিয়াছেন, ইহার পরে ক্রমে উক্ত বিদ্যাগারে বালিকাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, আপাততঃ শিক্ষাদানের নিয়ম হইয়াছে প্রাতঃকালাবধি নয়ঘণ্টা পর্য্যন্ত বালিকারা শিক্ষা করিবেন, ভরসা করি যুব বান্ধবগণ যাঁহারা এই সদনুষ্ঠান করিয়াছেন তাঁহারা আরো উত্তমরূপে মনোযোগ করিতে পারেন।

...এইক্ষণে বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজাধিপতি শ্রীযুত বেথুন সাহেবকে সহস্র২ নমস্কার করি তাঁহার অনুগ্রহে কলিকাতা নগরে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসের বিদ্যালয় স্থাপিত হইল।...

বঙ্গদেশীয় অঙ্গনাদিগের অবস্থার বিষয় বর্ণন করিতে বসিলে দারুময়ী লেখনীও রোদন করে, এই কারণ আমরা স্ত্রীলোকদিগের দুঃখের বিষয় যথার্থ রূপে বর্ণন করিতে পারি না, এদেশের স্ত্রীলোকেরা দিবারাত্রি অন্তঃপুরে থাকেন, তাহারা ইচ্ছানুসারে বহির্ব্বাটীতেও আসিতে পারেন না, হিন্দুজাতির বহির্ব্বাটীতেই দেবালয়, দেবগৃহে পূজাদি সময়েতেও স্ত্রীলোকদিগের সাধ্য হয় না পুরুষগণের ন্যায় বহির্ব্বাটীতে দেবালয়ে দণ্ডায়মানা হইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে পারেন, তাহারা এই প্রকার পরাধীনাবস্থায় আছেন, ইহার কারণ এই যে হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞানশিক্ষা হয় নাই এই জন্য হিন্দু মহাশয়েরা নারীজাতিকে আপনারদিগের আয়ত্তে রাখেন।

বহুকাল হইল আমারদিগের গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে

হিন্দুজাতীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসার্থ বিদ্যালয় করেন কিন্তু যাঁহারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহারা মনোযোগ না করিলে অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহাশয়েরা আপনারদিগের বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে না পাঠাইলে গবর্ণমেণ্টের অভিলাষে ইহা সম্পন্ন হইতে পারে না, অতএব গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারি শ্রীযুত হালিডে সাহেব প্রভৃতি মান্যবর সাহেবেরা চেষ্টিত হইয়াও কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারেন নাই, তৎপরে বুদ্ধিনিপুণ বেথুন সাহেব ১২ বৈশাখ সোমবারে তথায় সাধারণ বন্ধু শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন ঘোষ বাবু স্বদেশস্থ বান্ধবদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এই বিষয়ের সহায়তা করেন, তাহাতে বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয় আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শপূর্ব্বক স্বীকৃত হইলেন তাঁহারদিগের বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবেন, এবং তৎপরে সোমবারে ঐ সকল আত্মীয়গণকে লইয়া যাইয়া বেথুন সাহেবের সাক্ষাতেও বান্ধবগণকে এই বিষয় স্বীকার করাইলেন, তৎ সময়ে শ্রীযুত বেথুন সাহেব ঐ সকল ব্যক্তিকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কালে পরামর্শ ধার্য্য করিয়া গত সোমবারেই বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে দিয়াছেন, প্রথমদিবস এক বিংশতি বালিকা উপস্থিতা হইয়াছিলেন, আরো পাঁচ ছয় বালিকা আসিতে পারিতেন, পীড়া প্রযুক্ত আসিতে পারেন নাই, তৎপরদিবসাবধি ক্রমে তাঁহারদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে অতএব বেথুন সাহেবকে এবং উদ্যোগকারি বান্ধবগণকে ধন্যবাদ দিয়া শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাধুবাদ করি, উক্ত বাবু এক শত টাকা ভাড়ার উপযুক্ত বৈঠকখানা বিদ্যালয়ার্থ অমনি দিয়াছেন, বিদ্যালয়ের উপযুক্তস্থান যেপর্য্যন্ত প্রস্তুত না হয় তন্মধ্যে দক্ষিণাবাবু তাঁহার বৈঠকখানার ভাড়া লইবেন না, এবং উক্ত বাবু ৯০০০ সহস্র টাকা মূল্যে মৃজাপুরে সাড়েপাঁচ বিঘা ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন বিদ্যালয় করণার্থ ঐভূমি প্রদান করিয়াছেন।..."

১৮৪৯ সালের ১৮-মে 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখেছে : "...এতদ্ভিন্ন বিদ্যাগার প্রস্তুত করণ কালে এক সহস্র টাকা দিবেন, আর ঐ বিদ্যাগারের জন্য পুস্তক যাহার মূল্য ৫০০০ সহস্র টাকার ন্যূন নহে তাহাও দিতে স্বীকার করিলেন, ঐ সকল পুস্তক যথায় আছে আমরা তাহা জানি, এবং ইহাও বিশ্বাস করি দক্ষিণাবাবু যাহা স্বীকার করিয়াছেন তাহার অন্যথা হইবেক না, বিশেষতঃ সাহেবের সহিত কথোপকথনান্তর বাটীতে আসিয়া এক পত্রমধ্যে এই সকল বিষয় লিখিয়া বেথুন সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং সাহেবও লিখিয়াছেন তিনি সন্তোষপূর্ব্বক এই সকল দান গ্রহণ করিলেন।"

প্রথমদিন একুশজন ছাত্রী এসেছিল কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের অপপ্রচারে ছাত্রী-সংখ্যা কমে সাত হয়ে গেল। বিরুদ্ধবাদীদের জয় হয়নি শেষপর্যন্ত। প্রথম বছরের শেষে দেখা গেল চৌত্রিশজন ছাত্রী।

ছাত্রীদের কাছ থেকে মাইনে নেওয়া হত না, বইপত্রও তাদের বিনামূল্যে দেওয়া হত। বিদ্যালয়ের যাবতীয় খরচ দিতেন বেথুন সাহেব, সেজন্য মাসে তাঁর আটশো টাকা খরচ হত।

১৮৫০ সালের ১-এপ্রিল ড্যালহাউসি লিখেছেন :

"Mr. Bethune has, in my humble opinion, done a great work in the first successful introduction of Native Female Education in India, on a sound and solid foundation; and has

earned a right not only to the gratitude of the Government but to its frank and cordial support." [১১]

বেথুনের বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রথম দিনেই ভর্তি হয়েছে মদনমোহন তর্কলঙ্কারের দুই মেয়ে—ভুবনমালা ও কুন্দমালা। মদনমোহন নিজের দুই মেয়েকে বালিকা-বিদ্যালয়ে ভর্তি করেছেন, নিজে কিছুকাল নিয়মিত বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্রীদের পড়িয়েছেন, 'বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা সংসাধন করিবার আশয়ে' বই লিখেছেন।

স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে মদনমোহন সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন, সেজন্য মদন-মোহনের উপরে লোকের বিশেষ আক্রোশ। কোথাও পণ্ডিতে-পণ্ডিতে দেখা হলেই কেবল কথা হয় : ওরে মদনা করলে কি? ওরে মদনা করলে কি? [১২]

১৮৫০ সালের দ্বিতীয়ার্ধে মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'য় একটি দীর্ঘ রচনা লিখেছেন। এই রচনাটি সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু উত্তরকালে লিখেছেন : "স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ঐরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই।" [১৩]

মদনমোহনের উক্ত রচনাটি প্রায় সম্পূর্ণ উদ্ধার করি :

"এক বৎসরের অধিককাল গত হইল কন্যাসন্তানদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এই মহানগরীতে এবং বারাসতে ও অন্যান্য কতিপয় স্থানে শিক্ষা স্থান সংস্থাপিত হইয়াছে। এই শ্রেয়স্কর বিষয় সর্ব্বত্র প্রচারিত করিবার নিমিত্ত কএকজন মহাত্মা প্রথমতঃ দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া আপন আপন কন্যাসন্তান-দিগকে তত্তৎ পাঠস্থানে নিয়োজিত করিয়াছেন। ঐ ভদ্র মহাশয়েরা সর্ব্বদাই মনের মধ্যে এইরূপ প্রত্যাশা করেন যে স্বদেশস্থ সমস্ত ভদ্র ব্যক্তিই তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া স্ব স্ব কন্যাগণের অধ্যয়ন সম্পাদনে যত্নপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হন।

কিন্তু কি দুঃখের বিষয় অদ্যাপি কেহই এই শ্রেয়স্কর বিষয়ে কিছুই উদ্যোগ করিতেছেন না। সকলেই কুসংস্কার ও ভ্রান্তি জালে মুগ্ধ ও ভ্রান্ত হইয়া স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ের ভাবি উপাদেয় ফল বোধগম্য করিতে পারিতেছেন না, কেবল কুসংস্কারমূলক কতকগুলিন কুতর্ক ও অকিঞ্চিৎকর আপত্তি উপস্থাপিত করিয়া এই মঙ্গল ব্যাপারের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন।

তাঁহারা কহেন

প্রথম। শিক্ষা কর্ম্মের উপযোগিনী যে সকল মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির আবশ্যক স্ত্রীজাতির তাহা নাই সুতরাং কন্যাসন্তানেরা শিখিতে পারে না।

দ্বিতীয়। স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার ব্যবহার এদেশে কখন নাই, এবং শাস্ত্রেও প্রতিষিদ্ধ আছে; অতএব লোকাচারবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ ব্যাপার কদাচ অনুষ্ঠানযোগ্য হইতে পারে না।

তৃতীয়। স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিলে দুর্ভাগ্য দুঃখ ও পতিবিয়োগ দুঃখের ভাজন হইয়া চিরকাল কষ্টে জীবনযাপন করিবেক অতএব এতাদৃশ দৃষ্টদোষদূষিত বিষয় জানিয়া শুনিয়া পিতা মাতা কেমন করিয়া প্রাণসমান স্বসন্তানকে এই দারুণ দুঃখার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিতে পারেন।

চতুর্থ। স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে স্বেচ্ছাচারিণী ও মুখরা হইবেক, বিদ্যার অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পিতা মাতা ভর্ত্তা প্রভৃতি গুরুজনকে অবজ্ঞা করিবেক, এবং পরিশেষে দুশ্চরিত্রা হইয়া স্বয়ং পতিত হইবেক ও স্বকীয় পবিত্র কুলকে পতিত করিবেক; অতএব স্ত্রীজাতিকে সর্ব্বথা অজ্ঞানান্ধকূপে নিক্ষিপ্ত

রাখাই উচিত, কদাপি জ্ঞানপথের সোপানপ্রদর্শন করা উচিত নয়।

পঞ্চম। এই সমস্ত দৃষ্ট ও অদৃষ্ট-দোষ উল্লঙ্ঘন করিয়াও যদ্যপি স্ত্রী-জাতিকে বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করা যায়, তাহাতেই বা ফল কি? ইহারা চাকরী করিতে পারিবেক না, আদালতে গতায়াত করিয়া কোন রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেক না, কোন সাহেব শুভার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে পারিবেক না, এবং হাট বাজারে বসিয়া বা কোন দেশ দেশান্তরে গমন করিয়া বাণিজ্য কার্য্যও সম্পন্ন করিতে পারিবেক না; কুলের কামিনী অন্তঃপুরে বাস করে তাহার বিদ্যাশিক্ষায় কিছুই ইষ্টাপত্তি নাই, প্রত্যুত অনিষ্ট ঘটবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

আমরা শাস্ত্র, ন্যায় ও যুক্তি অনুসারে তাঁহাদিগের এই সমস্ত আপত্তির প্রত্যেকের সমর্থ উত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমাদিগের প্রদত্ত উত্তর যদি অশাস্ত্রীয়, অন্যায্য, অযৌক্তিক ও পক্ষপাতমূলক বলিয়া পক্ষপাতবিহীন দূরদর্শী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বোধ করেন, তবে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি স্ত্রীশিক্ষার বিষয় আর কদাপি মুখেও আনিব না। আর যদি আমাদিগের উত্তর যথার্থ হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করেন, তবে অবিলম্বেই এই মহোপকারক বিষয়ের অনুষ্ঠানে দেশীয় ভদ্রলোকেরা প্রবৃত্ত হউন নতুবা আর যেন তাঁহারা আপনা-দিগকে লোকসমাজে মনুষ্য বলিয়া পরিচয় না দেন।

প্রথম আপত্তির প্রত্যুত্তর দিবার পূর্ব্বে আমরা আপত্তিকারক মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, স্ত্রীজাতি যে বিদ্যাশিক্ষা করিতে সমর্থ নয় এরূপ সংস্কার তাঁহারা কি মূল হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন? আর কোথায় বা এমত দৃষ্টান্ত উপলব্ধি করিয়াছেন, যে স্ত্রীজাতিরা যথা নিয়মে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, শিক্ষা উপকরণ সমুদায় উপস্থিত ছিল, বিচক্ষণ উপদেশক যথা-নিয়মে উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু কোন ফল দর্শে নাই, স্ত্রীগণেরা সকলেই মূর্খ হইয়াছিল। বোধ করি আপত্তিকারক মহাশয়েরা এই প্রশ্নের কিছুই উত্তর দিতে পারিবেন না, এবং কোথাও এতাদৃশ উদাহরণ দেখাইতে পারিবেন না। অতএব তাঁহাদিগের এই আপত্তি কেবল অমূলক কল্পনা দ্বারা উদ্ভাবিত মাত্র। ভাল তাঁহারা একবার পক্ষপাতশূন্য চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন না কেন, স্ত্রীজাতিরা কেনই বা শিখিতে পারিবেক না। তাহারা কি মানুষ নয়? সচেতন জীবমধ্যে পরিগণিত নয়? তাহাতে কি বুদ্ধিবৃত্তি নাই? মেধা নাই? তর্কশক্তি নাই? সদৃশানুভূতি নাই? কেন! আমরা ত ভূয়োভূয় দর্শন করিতেছি শিক্ষাকার্য্যের উপযোগিনী যে যে শক্তিমত্তার আবশ্যক, স্ত্রীজাতির সে সমুদায়ই আছে কোন অংশের ন্যূনতা নাই; বরং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের কোন কোন বুদ্ধিবৃত্তির আধিক্যই দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশ্বপিতা স্ত্রী ও পুরুষের কেবল আকারগত কিঞ্চিৎ ভেদ সংস্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মানসিক শক্তি বিষয়ে কিছুই ন্যূনাধিক্য স্থাপন করেন নাই। অতএব বালকেরা যেরূপ শিখিতে পারে, বালিকারা সেরূপ কেন না পারিবেক? বরং কেহ কেহ বোধ করেন শৈশবকালে বালক অপেক্ষা বালিকারা স্বভাবতঃ ধীর ও মৃদু হয়, এ নিমিত্ত অধিকন্তু শিক্ষা করিতে পারে। এ বিষয় আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এক স্থানে এক অপাদান হইতে এককালে বিদ্যারম্ভ করিয়া বালক অপেক্ষা বালিকারা অধিক শিক্ষা করিয়াছে। আপত্তিকারক মহাশয়েরা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখুন কত শত বিদেশীয় নারীগণ বিদ্যা-লংকারে অলংকৃত হইয়া স্ত্রীজাতির শিক্ষাশক্তিমত্তার দেদীপ্যমান প্রমাণ পথে

দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অতএব আমরা ভরসা করি অস্মদ্দেশীয় লোকেরা স্ত্রীজাতির শিক্ষা করণে শক্তি নাই বলিয়া আর অমূলক অকিঞ্চিৎকর বৃথা আপত্তি উত্থাপিত করিবেন না।

স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাস, ব্যবহার ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া যে আপত্তি উত্থাপিত করেন ইহা কেবল অবহুজ্ঞতা ও অদূরদর্শিত্ব নিবন্ধন, সন্দেহ নাই। কারণ আমরা অতি প্রাচীন কালের ইতিহাস গ্রন্থে দেখিতে পাই, ভারতবর্ষীয় কামিনীগণেরা নানাবিধ বিদ্যার আলোচনা করিতেছেন। মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্যা আত্রেয়ী গুরুসন্নিধানে পাঠানুশীলনের প্রত্যূহ দর্শন করিয়া জন-স্থানস্থিত ভগবান্ অগস্ত্য-ঋষির পুণ্যাশ্রমে পাঠার্থিনী হইয়া উপস্থিত হইতেছেন। ভগবান্ ব্রহ্মবিদ্বান্ যাজ্ঞবল্ক্য গার্গী ও মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দান করিতেছেন। বিদর্ভ রাজনন্দিনী গুণবতী রুক্মিণী শিশুপালের সহিত পাণিগ্রহণরূপ অনিষ্টাপাত দর্শন করিয়া স্বহস্তে সাঙ্কেতিক পত্র লিখিয়া দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিতেছেন।
উদয়নাচার্য্যের নন্দিনী সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শিনী লীলাবতী শঙ্করাচার্য্যের
দিগ্বিজয় প্রস্তাবে স্বভর্ত্তা মণ্ডনমিশ্রের সহিত আচার্য্যের বিচারকালে
মধ্যস্থতাবলম্বন ও মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ সমর্থন করিতেছেন।
বোধ করি সকলেই জ্ঞাত আছেন, কর্ণাট-রাজমহিষী ও মহাকবি কালিদাসপত্নী
এবং ভাবটদুহিতা অতিশয় পণ্ডিতা ছিলেন। আর বিশ্বদেবী গঙ্গাবাক্যাবলী
নামে এক ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনা করিয়া চিরন্তনী কীর্ত্তি সংস্থাপন
করিয়াছেন। খনা জ্যোতিষশাস্ত্রে এমত পণ্ডিতা হইয়াছিলেন যে তাঁহার নিবন্ধ
বচন সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে প্রমাণরূপে পরিগণিত হইয়াছে।
আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি আপত্তিকারক মহাশয়েরাও ঐ খনার অনেক
বচন অবগত আছেন এবং তদনুসারে বিবাহাদি শুভকর্ম্মের দিন ও লগ্ন
নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, কিছু কাল হইল
হঠীবিদ্যালঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ এক রমণী বারাণসীক্ষেত্রে মঠ নির্ম্মাণ করিয়া
ভূরি ভূরি ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিয়াছেন। আমরা অনুসন্ধান করিয়া আরো
কতকগুলি পণ্ডিতা বনিতার নাম উল্লেখ করিতে পারি, কেবল পাঠকবর্গেরা
বিরক্ত হইবেন ভাবিয়া বিরত হইলাম।
এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক পূর্ব্বকালে
স্ত্রীলোক মাত্রেরই বিদ্যানুশীলনের প্রথা প্রচলিত ছিল। যাঁহারা বিদ্যা দ্বারা
খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া লোকসমাজে অত্যন্ত প্রসিদ্ধা হইয়াছিলেন
তাঁহাদিগেরি নাম ঐতিহ্যক্রমে অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। ইহাও অসম্ভাবনীয়
নহে, যে অস্মদ্দেশে উত্তম ইতিহাসগ্রন্থ না থাকাতে, হয় ত অনেকানেক প্রসিদ্ধ
বিদ্যাবতীদিগেরও নাম কালক্রমে লোপ পাইয়া থাকিবেক। এস্থলে আমরা
দৃষ্টান্ত স্বরূপে যে কএকজন প্রসিদ্ধ বিদ্যাবতীর নাম উল্লেখ করিলাম
এতদ্ব্যতিরিক্ত যে আর কোন স্ত্রীলোকই বিদ্যানুশীলন করিত না এমত কদাপি
সম্ভব হইতে পারে না। কারণ পুরুষ জাতির মধ্যে পুরাতন পণ্ডিতবর্গের
নাম উল্লেখ করিতে হইলে আমরা ব্যাস বাল্মীকি কালিদাসাদি কএক জন
গ্রন্থকার ভিন্ন আর কাহারো নাম করিতে পারি না; ইহা বলিয়া কি এই স্থির
করিতে হইবেক যে পূর্ব্বকালে সর্ব্বসাধারণ পুরুষেরা বিদ্যানুশীলন করিত
না। ফলতঃ এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত কতিপয় পণ্ডিত পুরুষের নাম শ্রবণে যেমন
প্রাচীনকালীন পুরুষসাধারণের বিদ্যাভ্যাস প্রথা স্থির হইতেছে, সেইরূপ পূর্ব্ব-

দোষ ও অধর্ম্মপ্রবৃত্তিরূপ মহারোগের শান্তি নিমিত্ত বিদ্যাই একমাত্র মহৌষধ। হিতাহিত কার্য্যাকার্য্য ধর্ম্মাধর্ম্মের উপদেশের নিমিত্ত বিদ্যাই মহাগুরু স্বরূপ। শ্রদ্ধা শান্তি ও ধর্ম্মপথের পান্থগণের পথপ্রদর্শন নিমিত্ত একমাত্র সার্থ হইয়াছেন। অতএব বিদ্যালোকসম্পন্ন কি পুরুষ কি স্ত্রী কেহই দুশ্চরিত্র ও অধর্ম্মপরায়ণ হইতে পারেন না, তাহা হইলে বিদ্যার মহিমা এতাদৃশ গুরুতর-রূপে কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিই অঙ্গীকার করিতেন না। সুতরাং বিদ্যাভ্যাস করিলে স্ত্রীলোক দুশ্চরিত্র অহঙ্কৃত ও মুখর হইবে এ কথা কথাই নয়।

স্ত্রীলোককে বিদ্যা শিখাইলে কি ফল হইবে, এই পঞ্চম আপত্তিই প্রতিপক্ষ-গণের প্রধান আপত্তি বোধ হইতেছে। কারণ তাঁহাদিগের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যাবতীয় আপত্তি, বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা ও অনুৎসাহ সকলি এতন্মূলক উত্থিত হইয়াছে, এবং এরূপ হওয়াও নিতান্ত বিস্ময়াবহ নহে, যেহেতু প্রারিপ্সিত বিষয়ে প্রয়োজনাভাব দর্শন হইলে কাজে কাজেই তদ্বিষয়ে অরুচি, অনুৎসাহ ও পরাঙ্মুখতা জন্মিতে পারে। অতএব আমরা এই আপত্তির সবিস্তর উত্তর এবং স্ত্রীজাতিকে বিদ্যাভ্যাস করাইলে যে যে মহোপকার দর্শিবে তাহা সপ্রমাণ উল্লেখ করিতেছি।

আমাদের দেশস্থ লোকেরা প্রায় সকলেই মনে করিয়া থাকেন, কতগুলি ধনোপার্জ্জন করা, সময়ে সময়ে সভা ও সমাজস্থলীতে অনর্গল বক্তৃতা করা, এবং রাজপুরুষগণের সন্নিধানে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করা, এই সকলই বিদ্যা-ভ্যাসের মুখ্য ফল। কিন্তু আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, তাঁহারা নিতান্তই অদূরদর্শী ও অত্যন্ত ভ্রান্ত। বিদ্যা যে কি অদ্ভুত পদার্থ, এবং তাহার ফল যে কি উপাদেয় ও কত মহৎ তাহা কিছুই জানেন না। জানিলে কখনই এই সকল তুচ্ছ বিষয়কে বিদ্যার মুখ্য ফল বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। যথার্থ বিদ্যা হইলে এই মনুষ্য আর এক প্রকার মনুষ্য হয়, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি সকল নৈসর্গিক দোষসমূহনির্ম্মুক্ত হইয়া কেবল গুণগ্রামে গুম্ফিত হয়। তাঁহার অন্তঃকরণে এমত কোন অনির্ব্বচনীয় অলৌকিক জ্যোতিঃপুঞ্জ প্রস্ফুরিত হইতে থাকে যদ্দ্বারা সমস্ত অজ্ঞানতমোরাশি বিনাশিত হইয়া যায় এবং বিশ্বের সমুদায় তত্ত্ব তাঁহার নিকট স্ফুটরূপে অবভাসিত হইতে থাকে। দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া কেবল যথার্থ পথে পর্য্যটন ও তত্ত্বের অনু-শীলনে প্রবৃত্ত হয়। দয়া, দাক্ষিণ্য, ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি গুণগ্রাম তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া নিত্য অধিষ্ঠান করে। কাম ক্রোধ লোভ ঈর্ষ্যা দ্বেষ মাৎসর্য্য প্রভৃতি দোষবর্গ তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে আশ্রয় না পাইয়া হতাশ হইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করে। শাঠ্য কাপট্য পৈশুন্য প্রভৃতি দস্যুগণের প্রবেশাবরোধ নিমিত্ত তাঁহার চিত্ত নিত্যই বন্ধকবাট হইয়া থাকে। তাঁহার মুখমণ্ডল এমত সৌম্য আকার ধারণ করে যে দর্শন মাত্রেই দর্শকগণের অন্তঃকরণে হর্ষ ও ভক্তির সঞ্চার হয়। তিনি দক্ষিণ হস্তে সত্য ও বাম হস্তে ন্যায় এই উভয়কে অবলম্বন করিয়া অকুতোভয়ে সকল ব্যাপার সমাধান করিতে থাকেন। সংসারের সকল ব্যক্তিই তাঁহার আত্মীয়, একবারো কাহারো প্রতি অনাত্মীয় ও শত্রুভাব বুদ্ধির আবির্ভাব হয় না; সুতরাং বিবাদবিসম্বাদ কুতর্ক কলহ জিগীষা দম্ভ, তাঁহার চিন্তাপথে অবতীর্ণই হইতে পারে না। অধিক কি? এই দুঃখময় সংসার তাঁহার সন্নিধানে কেবল সুখের নিধানরূপে ভাসমান হইতে থাকে। অতএব এতাদৃশ বিদ্যাবান্ মহাপুরুষ কি তুচ্ছ ধনোপার্জ্জনকে পরম পুরুষার্থ বোধ করেন? লোকসমাজে বক্তৃতা করা কি তাঁহার পক্ষে শ্লাঘ্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে?

এবং রাজা কি রাজকীয় পুরুষ সমীপে সুখ্যাতিলাভকে তিনি গুরুতর লাভ বলিয়া বোধ করেন? বর্লিণ্টন জামীরে ডুবাল নামক একজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের চরিত অস্মদ্দেশীয় মথুরানাথ তর্কবাগীশ নামক পণ্ডিতের চরিত শ্রবণ করিলেই ইহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। ডুবাল রাজপ্রসাদলাভের বিষয়ে এমত উদাসীন ছিলেন যে রাজবাটীর মধ্যে বহুকাল বাস করিয়াও রাজ-পরিবারের সকলকে চিনিতেন না। মথুরানাথের বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য শ্রবণ করিয়া নবদ্বীপের রাজা সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় দূত দ্বারা ঐ পণ্ডিতকে কএকবার আহ্বান করেন। নিস্পৃহ মথুরানাথ বিদ্যালোচনার ব্যাঘাতের আশঙ্কা করিয়া রাজসন্নিধানে গমনে অসম্মত হইলে রাজা স্বয়ং তাঁহার আশ্রমকুটীরে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। দেখিলেন, মথুরানাথ যথার্থ বিদ্যাবান্ কিন্তু অত্যন্ত দুর-বস্থাগ্রস্থ। রাজা তাঁহার সেই সাংসারিক দুরবস্থা দূর করিবার বাসনায় কিছু অর্থ প্রদান করিবার ছলে প্রশ্ন করিলেন। "আপনকার যদি কিছু অনুপপত্তি থাকে আজ্ঞা করিলে আমি তাহা পূরণ করিতে প্রস্তুত আছি।" মথুরানাথ শুনিয়া উত্তর করিলেন আমি চারি খণ্ড চিন্তামণি গ্রন্থের উপপত্তি করিয়াছি, আমার অনুপপত্তি কি? রাজা এই উত্তর শ্রবণে মথুরানাথকে একেবারে ধন-তৃষ্ণাশূন্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অতএব যাঁহারা ধনোপার্জ্জনাদিই বিদ্যার মুখ্য ফল বলিয়া বোধ করেন তাঁহাদিগকে অদূরদর্শী বলিতে পারা যায় কি না?

এতাদৃশ মহোপকারক ও মনুষ্যত্ব সম্পাদক বিদ্যানুশীলনে স্ত্রীজাতিকে নিযুক্ত করিলে এই সকল উপায়ে ফলের কি সমুদায় লাভ হইবেক না? যদিও সমুদায় না হয় কিয়দংশেরও কি লাভ হইবেক না? আর যদ্যাপি অস্মদ্দেশীয় লোকেরা নিতান্তই ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত লালায়িতচিত্ত হন, স্ত্রীজাতি বিদ্যাবতী হইলে তাঁহাদিগকে একবারেই যে নিরাশ করিবে এমত কদাপি সম্ভাবনীয় নহে। আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি তাঁহারা অবশ্যই তাঁহাদের ধনোপার্জ্জনের মনোরথ সম্পন্ন করিতে পারিবে। তাহারা অন্তঃপুরে বসিয়া নানাবিধ শিল্পকার্য্য ও কারুকর্ম্ম নির্ম্মাণ করিবে তদ্দ্বারা অনায়াসে অভিলষিত অর্থেরও অধিগম হইতে পারিবে। পুরুষেরা গৃহে বসিয়া যে সকল লেখা পড়া করেন স্ত্রীজাতিরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাহায্য দান করিতে পারিবে। গৃহস্থালী ব্যাপারের আয় ব্যয় বিষয়ক লিখন পঠন নির্ব্বাহার্থে বেতন দিয়া যে সমুদায় লোক নিযুক্ত করিতে হয় গৃহের গৃহিণী ও নন্দিনীরা অনায়াসে তৎসমুদায় সম্পাদন করিতে যে সমর্থা হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? এবং তাহারা স্বয়ং গ্রন্থাদির রচনা ও অনুবাদ করিয়া তদ্বারা ভূরি ভূরি অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থা হইবে। রাজদ্বারে অথবা বণিগ্জনের কর্ম্মালয়ে চাকরি করা বই কি অর্থোপার্জ্জনের অন্য উপায় নাই? বোধ করি সকলেই অবগত থাকিবেন ফ্রান্সদেশীয় মেড্যাম ডি. ষ্টেল নামে এক পণ্ডিতা রমণী অনেক বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং তত্তৎ বিষয়ে সেই সেই গ্রন্থ অদ্যাপি অত্যুৎকৃষ্ট-রূপে পরিগণিত আছে। তাঁহার ঐ সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইবামাত্রেই মুদ্রা-কারকেরা যথেষ্ট অর্থ দানপূর্ব্বক ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত, এইরূপে তিনি অপর্য্যাপ্ত ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। মিস্ এজওয়ার্থ নাম্নী ইংলণ্ডবাসিনী এক রমণী নানাবিধ পুস্তক রচনা করিয়া অনায়াসে অনেক ধন সংগ্রহ করিয়াছেন। এইরূপে ইউরোপের যে সকল রমণীরা এক্ষণে অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, এমত শত শত ব্যক্তির নাম আমরা উল্লেখ করিতে পারি। আর আর চিত্রকর্ম্ম শিল্প-

কর্ম্ম ও অন্যবিধ কারুকর্ম্ম দ্বারা বিলাতের যে রমণী অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারেন এমত স্ত্রীলোকই দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইউরোপের কি ধনী কি দরিদ্র সকল পরিবারের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। শিশু সন্তানগণকে তাঁহারা প্রথমেই বিদ্যারম্ভার্থে প্রায় বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন না। শিশুগণের জননী জ্যেষ্ঠভগিনী পিসী মাসী ইঁহারাই প্রথমে শিক্ষা দেন, এবং সেই অকৃত্রিম বাৎসল্য ও অনুপম স্নেহ সহকারে শিশুগণের চিত্তক্ষেত্রে যে সকল উপাদেয় উপদেশ বীজ বপন করা হয় সেই সকল বীজ অত্যল্পকাল মধ্যে উদ্ভিন্ন হইয়া ইউরোপীয় জাতিকে এইরূপ বিদ্যাফলে ভূষিত করিতেছে যে এক্ষণে ভূমণ্ডলে বিদ্যা বিষয়ে উহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা তুল্যকক্ষ মনুষ্য আর পাওয়াই যায় না। অতএব অস্মদ্দেশীয় লোকেরা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে বাল্যকালে জননীর দত্ত উপদেশ ও গুরুমহাশয়ের উপদেশ এ উভয়ের কত ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। আমাদের দেশস্থ শিশুগণ পঞ্চমবর্ষ অতীত না হইলে পাঠশালায় পাঠার্থে নিযুক্ত হইতেই পারে না। আর ঐরূপ বালককে যখন গুরুর সন্নিধানে প্রথম উপস্থাপিত করা হয় তখন সে সেই অপরিচিত ভীষণাকার শিক্ষক মহাশয়কে ব্যাঘ্র অথবা মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুরাজ বোধ করিয়া ভয়ে তাঁহার নিকটেই যাইতে চায় না, উপদেশ গ্রহণের ত কথাই নাই। কিন্তু সেই শিশুগণের জননী প্রভৃতিরা যদি স্বয়ং শিক্ষাদান করিতে পারিতেন তবে পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করণের প্রয়োজন কি? তাহার পূর্ব্বেও তাহারা জননীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইয়া একবার তাঁহার সুধাসোদর পয়োধরের রসাস্বাদ ও একবার তাঁহার মুখচন্দ্রবিনিঃসৃত অনুপম উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত। এবং তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহমিশ্রিত সুললিত উপন্যাস ছলে কত শত মহোপকারক বিষয়ের শিক্ষা লাভ শৈশবকালেই সম্পন্ন হইত।

আপত্তিকারক মহাশয়েরা মনোমধ্যে ভাবিয়া দেখুন, এতদ্দেশে স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাস না থাকাতে তাঁহাদের স্ত্রীপরিবারেরা কিরূপ দুরবস্থায় গৃহস্থাশ্রম যাত্রা সম্বরণ করিতেছে, এবং তাঁহারাই বা স্বয়ং মূর্খ পরিবরবর্গ বেষ্টিত হইয়া কত কষ্টে কালহরণ করিতেছেন। যাহার সহিত চিরকাল এক শরীরের ন্যায় বাস করিতে হয়, যাহার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইতে হয়, এবং শাস্ত্রানুসারে যে ব্যক্তি শরীরের অর্দ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়, সেই সহধর্ম্মিণী পশুর মত ঘোরতর মূর্খ, ইহা অপেক্ষা আর কি অধিকতর কষ্ট ঘটিতে পারে? গৃহের অবোধ স্ত্রীজাতিরা সর্ব্বদাই সংসারে সামান্য বিষয় লইয়া পরস্পর এমত ঘোরতর কলহ উত্থাপিত করে যে তন্নিমিত্ত তাহারাই কেবল স্বয়ং অশেষ ক্লেশ সহ্য করে এমত নহে, গৃহস্থ ব্যক্তিকেও সাতিশয় বিরক্ত করে। এবং কখন কখন সেই কন্দল অত্যন্ত অনর্থেরই হেতু হইয়া উঠে। আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি এতদ্দেশে কি ধনাঢ্য কি দরিদ্র এমত পরিবারই নাই যাহার গৃহে সর্ব্বদা স্ত্রীজাতির নিরর্থক কন্দল উপস্থিত হয় না ও তজ্জন্য পরিবারের কর্ত্তাকে কষ্টভোগ করিতে হয় না। অতএব স্ত্রীজাতির এই প্রকার কুক্কুর কন্দল নিবারণের উপায় বিদ্যা শিক্ষা ভিন্ন আর কি আছে?

গৃহের স্ত্রীবর্গেরা অনেকেই এমন অবোধ যে, গৃহস্থের দুঃসময় দুরবস্থা ও অসঙ্গতির প্রতি একবারও নেত্রপাত করে না, কখন পুরোহিতের প্রতারণায় কখন বা প্রতিবেশিগণের কুমন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া অশেষ ব্যয়ায়াসসাধ্য বৃথা ব্রতাদ্যনুষ্ঠানে সঙ্কল্পরূঢ় হয় এবং তজ্জন্য গৃহস্বামীকে যৎপরোনাস্তি বিব্রত করে। বোধ করি ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না, অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীগণেরা

বিদ্যারূপ অলঙ্কার না থাকাতে সুবর্ণের অলঙ্কার ও সুচিক্কণ বসনাদিকে পরম পদার্থ বলিয়া গণ্য করে, এবং কোন প্রতিবেশিনীকে আপন অপেক্ষা উত্তম বেশ-ভূষায় ভূষিত ও সুসজ্জিত দেখিলে ঈর্ষ্যায় মনে মনে অত্যন্ত কাতর হয়, ও সেইরূপ বসনভূষণের নিমিত্ত আপন ভর্ত্তাকে প্রত্যহই বিরক্ত করিতে থাকে, তাহার অর্থ সামর্থ্য আছে কি না? একবারো বিবেচনা করে না। আমরা অবগত আছি অলঙ্কারাদি বিষয়ক ভার্য্যার নির্ব্বন্ধাতিশয় এড়াইতে না পারিয়া অনেক ভদ্র ব্যক্তিকে অভদ্ররূপে অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। যদি কোন পুরুষ অন্তঃকরণের দৃঢ়তা বশতঃ ভার্য্যার সেই নির্ব্বন্ধ লঙ্ঘন করিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহাকে দাম্পত্যনিবন্ধনসুখে যাবজ্জীবন বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। কারণ, ভর্ত্তা বৈষয়িক সুখে নিধান স্বরূপ স্বকীয় প্রেয়সীর প্রার্থনা পরিপূরণে অসমর্থ হইয়া চিরকাল ক্ষোভে বিমনায়মান থাকেন। ভোগাভি-লাষিণী পত্নীও সকল সুখের নিদানভূত প্রাণাধিক প্রিয়তমের নিকট প্রার্থনাভঙ্গ দুঃখে দুঃখিনী ও আপনাকে অভাগিনী জ্ঞান করিয়া চিরকাল অস্বচ্ছন্দচিত্তা হইয়া থাকে। সুতরাং দম্পতীর পরস্পর এইরূপ অসন্তোষ জন্মিলে আর সাংসারিক সুখের বিষয়ক কি রহিল? কিন্তু যদি ঐ অবোধ অবলাগণের শরীরে বিদ্যারূপ অলঙ্কার সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হয়, এবং যদি সেই বিদ্যা-রূপ অলঙ্কার প্রভাবে সামান্য অলঙ্কার সম্ভারকে শরীরের ভার ও অসার বলিয়া বোধ জন্মে, তাহা হইলে অস্মদ্দেশীয় জায়াপতীর ঐ অপরিহার্য্য দুঃখ কি একেবারে দূরীভূত হইবে না? এবং তাঁহারা স্বচ্ছন্দে কি প্রণয়সুখ সম্ভোগ করিতে পারিবেন না?

এতদ্দেশীয় স্ত্রীজনেরা আপন আপন গৃহকর্ম্ম সমাধা করিয়া মধ্যে মধ্যে অনেক অবকাশ পাইয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞান না থাকাতে ঐ অবকাশকাল ভদ্ররূপে অতিবাহিত করিতে পারে না। তখন কার্য্যান্তরে, অব্যাসক্ত অন্তঃকরণে নানা দুর্ম্মতি ও দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হয়। পঞ্জরবদ্ধ পক্ষির ন্যায় পর্য্যাকুলচিত্তে একবার দ্বারের কবাট উদ্ঘাটন করিয়া রাজপথ অবলোকন করিতে থাকে, একবার গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া পরপুরুষদিদৃক্ষায় ইতস্ততো দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকে, একবার বা স্বৈর সখীর সঙ্গে হাস পরিহাস ও অসদ্বিষয়ক আলাপপ্রসঙ্গে নানা অসাধু কল্পনার উদ্ভাবন করিতে থাকে। কোন প্রকারেই অস্থির চিত্তকে সুস্থির করিতে পারে না। এই প্রকারে অনেক রমণীর ব্যভিচার দোষ স্পর্শও হইয়া থাকে। এরূপ দুর্ঘটনা হওয়াও নিতান্ত অসম্ভাবনীয় নহে। যেহেতু পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, কার্য্যান্তরে অবিনিযোজিত সময় অতিশয় ভয়াবহ হয়। কিন্তু স্ত্রীজাতির যদি শাস্ত্রজ্ঞান থাকিত, এবং সেই শাস্ত্রানুশীলন রস আস্বাদন করিয়া সুখে কালযাপন করিবার সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে কদাপি অন্তঃকরণে দুর্ম্মতি বা দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হইত না, এবং দুর্ব্বশ দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণ কখনই তাহাদিগের নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল চরিত্রকে সকলঙ্ক ও অপবিত্র করিতে পারিত না।

হায়! আমাদিগের সেই সৌভাগ্য ও সুখের দিন কবে সমাগত হইবে। এবং কবেই বা অস্মদ্দেশীয় হতভাগ্য নারীগণের সেই সৌভাগ্যসূচক শুভগ্রহের উদয় হইবেক। যখন আমরা দেখিতে পাইব, আমাদিগের স্ত্রীপরিবারেরা বৃথা কন্দল কলহ পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্ক দ্বারা সুখে কালহরণ করিতেছে। সাবিত্রী পঞ্চমী অনন্ত পিপীতকী প্রভৃতি ব্রতোপবাসানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ও তত্তন্নামকীর্ত্তনেও বিলজ্জিতা হইয়া ইতিহাস পুরাণাদি পুস্তকে

পারায়ণব্রতে দীক্ষিতা হইতেছে। স্বামিসন্নিধানে তুচ্ছ বসন ভূষণাদি প্রার্থনার কথা পরিহরণ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ কাব্যালঙ্কার বিষয়ক প্রসঙ্গে স্বয়ং সুখিত ও প্রিয়তমকে সুখায়িত করিতেছে। কেহ বা করকমলে বিচিত্র তুলিকা ধারণ করিয়া চিত্রপটে বিবিধ জগতী পদার্থের চিত্র বিন্যাস করিতেছে। কেহ বা সূচী ও তন্তুসন্তান হস্তে লইয়া শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। কেহ বা পুত্র কন্যা প্রভৃতি শিশুসন্তানগণকে সন্নিধানে উপবেশিত করিয়া তাহাদিগের কোমল মানস ক্ষেত্রে নির্ম্মল উপদেশ বীজ সকল বপন করিতেছে। কেহ বা নানা দেশীয় ইতিহাস সন্দর্ভ সন্দর্শনপূর্ব্বক সত্যাসত্য নির্ব্বচন করিয়া তদ্গতমনে নবীন ললিত সন্দর্ভ সঙ্কলিত করিতেছে। কেহ বা দৃষ্টি পথের পুরোভাগে বিচিত্র ভূচিত্র সকল সংস্থাপিত করিয়া ভূগোলের তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছে। কেহ বা নিশাভাগে অনাবৃত উন্নত প্রদেশে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ম্মল নভোমণ্ডলে দূরবীক্ষণ বিনিবেশিত করিয়া গ্রহনক্ষত্রাদির পরস্পরের অন্তর ও সঞ্চারাদি গবেষণা করিতেছে। তখন আমাদিগের কি সুখের অবস্থা উপস্থিত হইবে, এবং কত সুখেই বা এই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিব।

হে করুণাময় জগদীশ্বর! আমাদিগের দেশীয় লোকের অন্তঃকরণ হইতে কুসংস্কার ও কুমতি দূর করিয়া সুমতি প্রদান করুন যাহাতে সকলেই একমনা, এককর্ম্মা ও এক উদ্যোগ হইয়া দৃঢ়তর অধ্যবসায়ে আরোহণপূর্ব্বক আপন আপন নন্দিনী ও গৃহিণী প্রভৃতি স্ত্রীপরিবারকে বিদ্যাভ্যাস কার্য্যে নিয়োজিত করেন।

আমাদিগের বোধ হইতেছে এ দেশের হতভাগা সীমন্তিনীগণের দুরবস্থা দর্শনে করুণাময় বিশ্বকর্ত্তার অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইয়াছে এবং সেই দুরবস্থা একবারে দূর করিবার নিমিত্ত তাঁহার সম্পূর্ণ অভিনিবেশও হইয়াছে। যেহেতুক তিনি এতদ্দেশীয় লোকসমূহকে স্ত্রীশিক্ষানুষ্ঠান বিষয়ে ব্যয়কাতর, অনুৎসাহী, অনুদ্যোগী ও সাহসবিহীন সুতরাং তদনুষ্ঠানে অসমর্থ বিবেচনা করিয়া অতি দূর দেশ হইতে একজন উদারচিত্ত মহানুভব মহাপুরুষকে ঐ সৎকর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত আনিয়া দিয়াছেন। এই মহাত্মা বিদ্যাদান বিষয়ে যেমন বদান্য তেমনি উৎসাহগুণসম্পন্ন, এ দেশের অবস্থানুসারে এক্ষণে যাদৃশ ব্যক্তির নিতান্ত আবশ্যক ইনি যথার্থতই সেই রূপ। বোধ করি উক্ত মহাত্মার নাম সকলেই অবগত আছেন। ইনি এক্ষণে আমাদের দেশে শিক্ষাসমাজের সর্ব্বাধ্যক্ষ। ইহাঁর নাম অনরেবল ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন। ইনি সেই সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত সাধন করিবার নিমিত্ত গত বর্ষে এই মহানগরীতে এক বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। স্বয়ং আসিয়া সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করেন। এবং সেই বিদ্যালয়ের যখন যে সকল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়াদির আবশ্যক হয়, উক্ত মহাত্মা একাকী অকাতরে তৎসমুদায় নির্ব্বাহ করিতেছেন।

বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপনার কালে আমরা মনে করিয়াছিলাম, এ দেশের প্রাচীন লোকেরা প্রথমতঃ এতৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না, কারণ তাঁহারা স্বভাবসিদ্ধ বদ্ধমূল কুসংস্কারের একান্ত বিধেয়। ভদ্রাভদ্র কিছুই বিবেচনা করেন না কেবল গতানুগতিক ন্যায়ে পুরাতন পদবীর অনুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা বাল্যাবধি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে ইউরোপীয় বিদ্যার অনুশীলন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন, ন্যায়-নীতি পদার্থ-মীমাংসা প্রভৃতি পাঠ করিয়া সত্যাসত্য নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, নানাবিধ ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ দ্বারা নানা দেশের আচার ব্যবহার চরিত অবগত হইয়া অন্তঃকরণের কুসংস্কার দোষ

শোধন করিয়াছেন, এবং সর্ব্বদা স্বদেশের দুর্দ্দশা বিমোচন ও মঙ্গল সম্পাদন করিবার আকাঙ্ক্ষায় কথাপ্রসঙ্গে কত প্রকার সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্কল্পে আরূঢ় হইয়া থাকেন। তাঁহারা এই অবসর পাইয়া অবশ্যই আহ্লাদে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া এক উদ্যমেই এই মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইবেন, এবং সাধ্যানুসারে ঐ বিদেশীয় বান্ধবের সাহায্য দান করিবেন। হা! আমরা কি দারুণ ভ্রমে পতিত ছিলাম, আমাদের সেই ফলোন্মুখী আশালতা কোথায় বিলীন হইয়া গেল। সভ্যাভিমানী নবীনতন্ত্রের লোকেরা একবারে আমাদিগকে হতাশ করিয়া দিয়াছেন। কথা কহিব কি? আমরা দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়াছি, হস্ত-পাদাদি সকল উদরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম সভ্যাভিমানী নব্য সম্প্রদায়িক মহাশয়েরা স্বকীয় বিদ্যার প্রভাবে দেশের সকল প্রকার দুরবস্থা দূর করিবেন। স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষা ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশে প্রচারিত করিবেন, বাল্যপরিণয় প্রথা সুদূরপরাহত করিয়া দিবেন। বিধবাগণের দারুণ যন্ত্রণা ও দুঃখ দূর করিয়া দিয়া তাহাদিগকে পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার প্রদান করিবেন। এবং সকল দুরবস্থার নিদানভূত যে জাত্যভিমান তাহাকে আর স্থান দিবেন না। এই সমুদায় মহৎ কার্য্য যাঁহাদের কৃতিসাধ্য ভাবিয়া আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম, সেই নবীন সম্প্রদায়িক মহাত্মারা প্রথম সংগ্রামের উপক্রমেই অর্থাৎ বালিকাবিদ্যালয়ের প্রারম্ভেই যেরূপ দৃষ্টান্ত দর্শাইয়াছেন, সেই এক আঁচড়েই তাঁহাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, উৎসাহ, উদ্যোগ, দেশোপকারিতা প্রভৃতি সমুদায় গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমরা এক প্রকার স্থির করিয়াছি, এ দেশের মৃত্তিকায় যথার্থ উৎসাহী ও যথার্থ হিতকারী মনুষ্য জন্মিতে পারে না। অতএব এ দেশ মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা অথবা বিধবা বিবাহ প্রভৃতি যে কিছু মহৎ কার্য্য যখন ঘটিবে, তাহা বিদেশীয় লোকের অর্থাৎ ইউরোপীয় জাতির হস্ত দ্বারাই সম্পাদিত হইবে, দেশের লোক কেবল হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিবেন। বরং পারেন ত সাধ্যানুসারে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে ত্রুটি করিবেন না। কি লজ্জার বিষয়! কি লজ্জার বিষয়! অনরবল বীটন্ মহাশয় যে আমাদিগেরি কন্যাসন্তানগণের শিক্ষার্থে প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন ইহা একবারও কেহ মনে ভাবিলেন না, তিনি যে কেবল আমাদিগেরি হিত করিবার নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে অশেষ আয়াস পাইতেছেন ইহা একবারও আলোচনা করিলেন না, তিনি যে নিতান্ত স্বার্থশূন্য কেবল আমাদেরি কন্যা-গণের নিমিত্ত প্রতি মাসে সাত আট শত টাকা ব্যয় করিয়া যথার্থ মিত্রের কার্য্য করিতেছেন ও বহুসহস্র টাকা ব্যয় করিয়া উৎকৃষ্ট বিদ্যামন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন, ইহা একবারও বিবেচনা করিলেন না, কেবল অহরহ ঐ মহানুভবের নিন্দাবাদ, অকীর্ত্তি রচনা ও মিথ্যা কলঙ্ক জল্পনা করিয়া আপন আপন ইংরাজি বিদ্যার পরিচয় দিলেন। কি লজ্জার কথা! কি লজ্জার কথা! এ দেশীয় লোকের ইউরোপীয় বিদ্যাধ্যয়ন ও সভ্যতার উদয় কেবল অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়া কলাপেই পর্য্যবসিত হইল। বীটন সাহেবের সহিত এ দেশের লোকেরা যে প্রকার অসদ্ব্যবহার করিলেন, শুনিয়া বিদেশীয় ভদ্র লোকেরা কি মনে করিতেছেন, আমরা বোধ করি তাঁহারা এ দেশকে অকৃতজ্ঞ পাষণ্ড বলিয়া নিরন্তর ভর্ৎসনা করিতেছেন সন্দেহ নাই।...”

বেথুনের বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য স্থায়ী জমিবাড়ি দরকার। সেজন্য দক্ষিণারঞ্জন মির্জাপুরের একখণ্ড জমি দান করেছেন, আগেই বলা হয়েছে

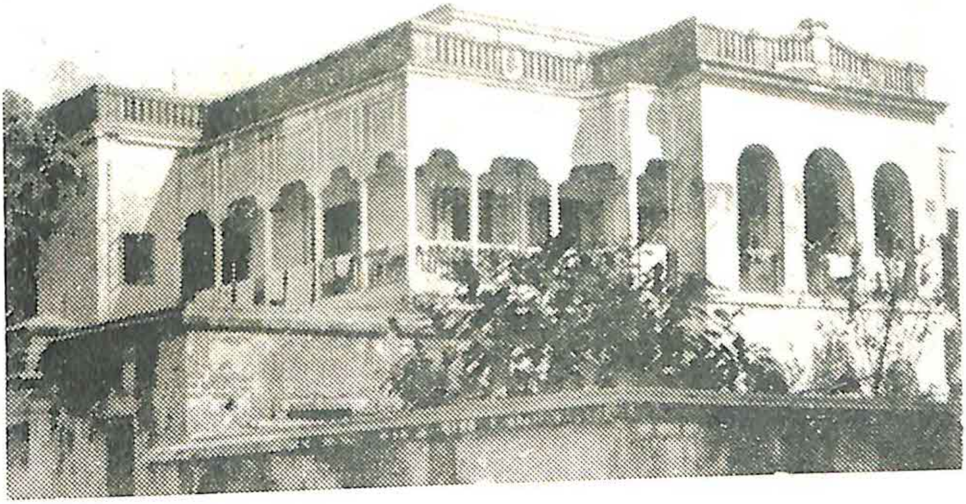
সেকথা। ওই জমির পাশাপাশি আরেকখণ্ড জমি দশহাজার টাকায় কিনে নিলেন বেথুন সাহেব।

ভদ্রঘরের মেয়েদের পক্ষে মির্জাপুরে যাওয়া-আসার বিশেষ অসুবিধা।

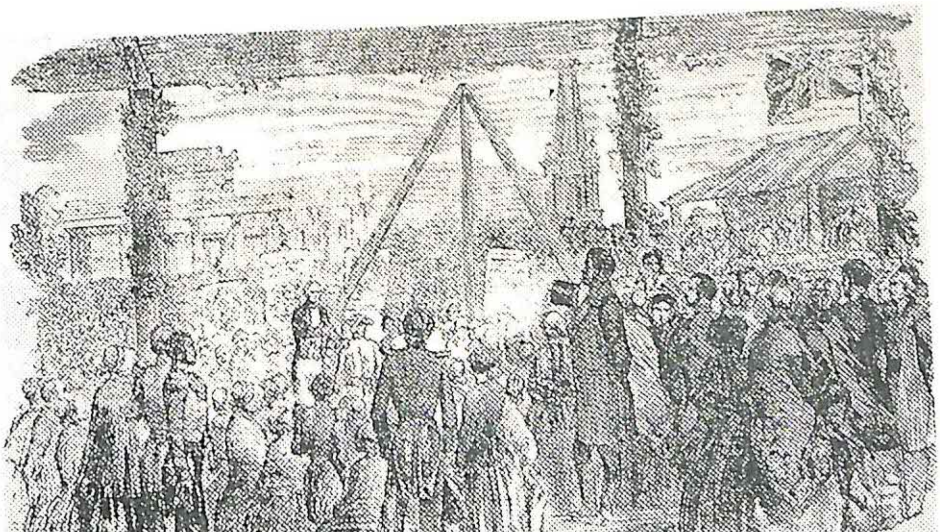
হেদুয়ার কাছে বাঙলা গভর্নমেণ্টের জমি ছিল। বেথুন সাহেবের কথায় মির্জাপুরের জমির বদলে হেদুয়ার কাছের ওই জমি দিতে রাজি হল গভর্নমেণ্ট।

১৮৫০ সালের ৭-সেপ্টেম্বর 'সংবাদ সুধাংশু' লিখেছে: "...বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় উক্ত সাহেবের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া এমত সদ্ব্যপারে যৎকিঞ্চিৎ আনুকূল্য করণার্থ সাহেবকে এক খণ্ড ভূমি দান করেন তাহার মূল্য ন্যূনাধিক ১২০০০ দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা। সেই ভূমির নিকটবর্ত্তী আর এক খণ্ড ভূমি ছিল কিয়ম্মাস গত হইল সাহেব তাহা স্বয়ং ক্রয় করেন সে খণ্ডের মূল্য প্রায় ১০০০০ টাকা কিন্তু ঐ দুই খণ্ড ভূমি নগরের প্রান্ত ভাগে স্থিত হওয়াতে সেখানে অভিপ্রেত বিদ্যামন্দির নির্ম্মাণ না করিয়া স্থানান্তরে করা অভিমত হইয়াছে অতএব সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হেদুয়া পুষ্করিণীর পশ্চিমে উত্তম সরকারী ভূমি থাকাতে সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকট স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া উক্ত দুই খণ্ড ভূমির বিনিময়ে হেদুয়া পুষ্করিণীর পশ্চিম দিকস্থ ঐ ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ঐ স্থলেই বালিকাদের অধ্যয়নার্থ এক সুশোভিত বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ঐ অট্টালিকা নির্ম্মাণে ৪০০০০ টাকা ব্যয় হইবে তাহার অদূরে বালিকাদিগের শিক্ষাদায়িনী বিবির গৃহ নির্ম্মাণ হইবে তাহাতেও ১৬০০০ টাকা ব্যয় হইবে অপর দৌবারিক প্রভৃতি ভৃত্যাদিগের গৃহ এবং ভূমি বেষ্টক প্রাচীর করিতে হইবেক তাহাতেও পাঁচ ছয় সহস্র টাকার প্রয়োজন। অতএব ঐ বিদ্যামন্দির নির্ম্মাণার্থ প্রায় ৬২০০০ টাকা ব্যয় হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট যে ভূমির পরিবর্ত্তে হেদুয়া পুষ্করিণীর পশ্চিমদিক্‌স্থ ভূমি দান করিয়াছেন তাহার মূল্য ২২০০০ টাকা সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ ৮৪০০০ টাকা হইবেক। বেথুন সাহেব স্বয়ং এই বিপুল অর্থ দান করিতেছেন তাহাতেও কেবল দক্ষিণারঞ্জন বাবু ১২০০০ টাকার ভূমি দিয়া আমারদের দেশের মান যৎকিঞ্চিৎ রক্ষা করিয়াছেন।"

১৮৫০ সালের ৬-নভেম্বর মহাসমারোহে বিদ্যালয়-ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল। উৎসবে পৌরোহিত্য করলেন বাঙলার ডেপুটি গবর্নর স্যর জন হাণ্টার লিটলার। ওই উৎসবেই ভূমি হস্তান্তর হল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এটর্ণি ভূমি-হস্তান্তর সম্পর্কিত একখানা দলিল দিলেন বেথুন আর দক্ষিণা-রঞ্জনের হাতে। সঙ্গে প্রতীকস্বরূপ একটি অশোকগাছ। ১৮৫০ সালের ৮-নভেম্বর 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখেছে: "গত পরশ্ব সায়াহ্নে স্ত্রী বিদ্যা-লয়ের শিলারোপ হইল শ্রীযুত ডেপুটী গবর্ণর স্যর জান লিট্‌লর মহোদয়ের অধিষ্ঠান হওয়াতে সমস্ত সম্ভ্রান্ত রাজকীয় কর্ম্মচারি ইউরোপীয় মহাশয়ের ও এতদ্দেশীয় বহু২ ধনি মানি বিদ্বজ্জনের সমাগমে বিদ্যালয়ের অতিপ্রশস্ত ভূমিও অতি সংকীর্ণ হইয়াছিল। ইংরাজদিগের যে২ নিয়মে প্রাসাদ বা সাধারণ বিদ্যালয়ের নির্ম্মাণারম্ভ হয় সেই সমুদয়ে নিয়ম সহিত মহামহা সমারোহ সহ স্ত্রী বিদ্যালয়ের শিলারোপ হইয়াছে।...এই বিদ্যালয়ের স্থাপনকাল স্মরণ নিমিত্ত লেডী লিট্‌লর কর্তৃক যে এক বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার প্রক্রিয়াও আমাদের দেশের বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার ব্যাপার হইতে অতিশয় বিভিন্ন নয় ফলে



বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়ি



৬ নভেম্বর, ১৮৫০ সাল : বেথুনের বালিকা বিদ্যালয়-ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উৎসব

বৃক্ষের তলে পুষ্পাদি অর্পণ হইয়াছিল বোধ হয় কোন মন্ত্র পাঠও হইয়া থাকিবেক।"

হ্যাঁ, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উৎসবে বেথুনের অনুরোধে লেডি লিটলার ভূমি-খণ্ডের প্রান্তভাগে অশোকগাছটি রোপণ করেছেন।

অশোকগাছ কেন? সেবিষয়ে সেদিনের উৎসবেই বেথুন সাহেব বলেছেন:

"The choice of this particular tree for the purpose has not been made unadvisedly or without a meaning. I am told that its Bengali name may be not unfitly paraphrased as "The Tree of Gladness." It is commended for this day's ceremony, not only by the gracefulness of its foliage, and the surpassing beauty of its flowers, but also because it is held in especial honour among Hindu women. I understand that formerly they believed that, by eating its blossoms, they should bring a blessing on their children. It seemed to me therefore not an inappropriate representation of an institution, of the fruits, of which if they will indeed consent to partake they will bring upon them the choicest blessings of which our nature is capable. I look on it as a happy coincidence that European botanists have also selected this tree, to associate it with the mem[illegible] of one of the most enlightened men whom England eve[illegible] India. The Jonesia Asoca, for that is its botanic[illegible]alls the name of the great Sir William Jones, on[illegible]t who exerted himself to link together the learn[illegible] and Western Worlds; for his zealous untiring [illegible]e universal spread of knowledge ap-[illegible] fitly represented by the elegant and [illegible]his tree. I propose therefore henceforth [illegible] be made the symbol of Female Education [illegible] not only here, but by every school which has be[illegible]d in the villages round Calcutta in imitation [illegible] all those which shall hereafter be multiplied in[illegible]est that an Asoca tree be planted, a new tree of [illegible]d us of the bond of fellowship which unites our labours in one common cause." [১৪]

সেসময়ে রামনারায়ণ তর্করত্ন রঙ্গ করে বলেছেন—বাপরে বাপ, মেয়ে-ছেলেকে লেখাপড়া শেখালে কি আর রক্ষা আছে। এক 'আনো' শিখিয়েই রক্ষা নেই। 'চাল আনো', 'ডাল আনো', 'কাপড় আনো' করে অস্থির করে, অন্য অক্ষরগুলো শেখালে কি আর রক্ষা আছে।

রাস্তায় মেয়েদের স্কুলের গাড়ির দিকে লোকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছে, স্কুলের বালিকাদের উদ্দেশে বিস্তর অভদ্র শব্দ উচ্চারণ করতে লোকের মুখে আটকায়নি। লোকজন বলাবলি করেছে—এইবার কলির বাকি যা ছিল হয়ে গেল! মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকি থাকবে না।[১৫]

১৮৫০ সালের ডিসেম্বরে বিদ্যাসাগর বেথুনের বালিকা বিদ্যালয়ের অনারারি সেক্রেটারি হলেন। বিদ্যালয়ের বালিকাদের গাড়ির দুপাশে বিদ্যাসাগর 'মহানির্বাণ তন্ত্রে'র একটি শ্লোকাংশ—"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"[১৬]—খোদিত করে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

বিদ্যালয়-ভবন সম্পূর্ণ নির্মিত হওয়ার আগেই, ১৮৫১ সালের ১২-আগস্ট, বেথুন ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। উইলে বেথুন এই বিদ্যালয়ের জন্য বিস্তর সম্পত্তি দান করে গেছেন। বেথুনের উইলের একাংশ তুলে দিচ্ছি :

"I give my carriages and horses now used at the Female School in Calcutta to the East India Company to be retained and used for the purpose of the said school. I give and devise all my interest in the lands, buildings and other property in Calcutta, now intended to be used and occupied as a Female School, to the East India Company and their successors and assignees for ever with my request that they will endow the said institution as a Female School in perpetuity. . ." [১৭]

উত্তরকালে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন : "(বেথুন) ঘন ঘন এই বিদ্যালয়ে আসিতেন; শিশু বালিকাদিগের জন্য নানা প্রকার মূল্যবান উপহার দ্রব্য আনিতেন ও তাহাদিগকে দিয়া পরম সুখবোধ করিতেন; কখনও কখনও ঘোড়ার ন্যায় চতুষ্পদ হইয়া শিশু বালিকাদিগকে পৃষ্ঠে বসাইয়া বলিতেন "আমি তোমার ঘোড়া, তুমি মেম।" গবর্ণর জেনেরালের ব্যবস্থা-সচিবের ন্যায় উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজপুরুষের এই আচরণের কথা যখন শুনি, এবং তৎপরে এদেশীয় নারীগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কথা যখন ভাবি, তখন চক্ষের জল রাখিতে পারি না,—বলি "হায়। সে দিন কোথায় গেল।" হে বঙ্গবাসিগণ, তোমরা হেয়ার ও বেথুনের নাম মালাতে গাঁথিয়া সেই মালা নিরন্তর গলে ধারণ কর; ইঁহাদের ঋণ তোমরা কোনও দিন শুধিতে পারিবে না।"[১৮]

১৮৫১ সালের অক্টোবর মাস থেকে বেথুনের বালিকা বিদ্যালয়ের সব খরচ চালাতে লাগলেন লর্ড ড্যালহাউসি। ১৮৫৬ সালের মার্চে ড্যালহাউসি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। তারপর থেকে ওই স্কুলের খরচ চালাতে লাগল গবর্নমেণ্ট। বাঙলার ছোটোলাট ওই স্কুলটিকে সিসিল বীডনের তত্ত্বাবধানে এনে দিলেন।

এই স্কুলটি সম্পর্কে ১৮৫৬ সালের ১২-আগস্ট বীডন সাহেব একখানা চিঠি লিখেছেন গবর্নমেণ্টকে। চিঠিতে এই স্কুলের জন্য একটি কমিটি করার প্রস্তাব আছে, বিদ্যাসাগরকে ওই কমিটির সেক্রেটারি করার প্রস্তাব আছে। চিঠি থেকে একটি বাক্য তুলে দিচ্ছি :

"It may be thought by His Honour no less than justly due to the past services and distinguished position of Pandit Ishwarchandra Sharma to appoint him secretary to the Committee." [১৯]

বীডনের প্রস্তাবে রাজি হল গবর্নমেণ্ট। স্কুলটির জন্য একটি কমিটি হল। বিদ্যাসাগর সেই কমিটির সেক্রেটারি হলেন।

অতঃপর একটি বিজ্ঞাপন তুলে দিচ্ছি :

"কলিকাতা ও তৎসান্নিধ্যবাসী হিন্দুবর্গের প্রতি বিজ্ঞাপন।

বীটন প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমুদায় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন, যে২ নিয়মে বিদ্যালয়ের কার্য্য সকল সম্পন্ন হয় এবং বালিকাদিগের বয়স ও অবস্থার অনুরূপ শিক্ষা দিবার যে সকল উপায় নির্দ্ধারিত আছে, হিন্দু সমাজের লোকদিগের অবগতি নিমিত্ত আমরা সে সমুদায় নিম্নে নির্দেশ করিতেছি।

উক্ত বিদ্যালয় এই কমিটির অধীন, বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এক বিবি প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত আছেন, শিক্ষা কার্য্যে তাঁহার সহকারিতা করিবার নিমিত্ত আর দুই বিবি ও একজন পণ্ডিতও নিযুক্ত আছেন।

বালিকারা যখন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকে প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ সভাপতির স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে নিযুক্ত পণ্ডিত ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পান না।

ভদ্র জাতি ও ভদ্র বংশের বালিকারা এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তদ্ব্যতীত আর কেহই পারে না, যাবৎ কমিটীর অধ্যক্ষদের প্রতীতি না জন্মে অমুক বালিকা সদ্বংশজাতা এবং যাবৎ তাঁহারা নিযুক্ত করিবার অনুমতি না দেন তাবৎ কোন বালিকাই ছাত্ররূপে পরিগৃহীত হয় না।

পুস্তক পাঠ, হাতের লেখা, পাটীগণিত, পদার্থজ্ঞান, ভূগোল ও সূচীকর্ম্ম, এই সকল বিষয়ে বালিকারা শিক্ষা পাইয়া থাকে, সকল বালিকাই বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করে আর যাহাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইংরেজী শিখাইতে ইচ্ছা করেন তাহারা ইংরেজীও শিখে।

বালিকাদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা ও বিনা মূল্যে পুস্তক দেওয়া গিয়া থাকে আর যাহাদের দূরে বাড়ী এবং স্বয়ং গাড়ী অথবা পাল্কী করিয়া আসিতে অসমর্থ তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে আনিবার ও বিদ্যালয় হইতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত গাড়ী ও পাল্কী নিযুক্ত আছে।

হিন্দুজাতীয় স্ত্রীলোকদিগের যথোপযুক্ত বিদ্যা শিক্ষা হইলে হিন্দু-সমাজের ও এতদ্দেশের যে কত উপকার হইবে তদ্বিষয়ে অধিক উল্লেখ করা অনাবশ্যক, যাঁহাদের অন্তঃকরণ জ্ঞানালোক দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়াছে তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারেন ইহা কত প্রার্থনীয় যে যাঁহার সহিত যাবজ্জীবন সহবাস করিতে হয় সেই স্ত্রী সুশিক্ষিত ও জ্ঞানাপন্ন হন এবং শিশু সন্তান-দিগকে শিক্ষা দিতে পারেন, আর স্ত্রী ও কন্যাগণের মনোবৃত্তি প্রকৃতরূপে মার্জ্জিত হইয়া অকিঞ্চিৎকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ থাকে এবং যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি ও পরিশুদ্ধি হইতে পারে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়।

অতএব আমরা এতদ্দেশীয় মহাশয়দিগকে অনুরোধ করিতেছি এই সকল গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের যে উপায় নিরূপিত রহিয়াছে সেই উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার ফলভাগী হউন এই সকল উদ্দেশ্যসাধন হিন্দুধর্ম্মের অনুযায়ী ও হিন্দু সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধন।

সিসিল বীডন,	সভাপতি।
রাজা শ্রীকালীকৃষ্ণ বাহাদুর,	সভ্য
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সিংহ,	”

শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ, "
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র, "
শ্রীপ্রাণনাথ রায় চতুর্ধুরীণ, "
শ্রীরামরত্ন রায়, "
শ্রীরাজেন্দ্র দত্ত, "
শ্রীনৃসিংহচন্দ্র দত্ত, "
শ্রীভবানীপ্রসাদ দত্ত, "
শ্রীরমাপ্রসাদ রায়, "
শ্রীকাশীপ্রসাদ ঘোষ, "

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা
সম্পাদক।

কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয়।
২৪ ডিসেম্বর ১৮৫৬।"[২০]

বেথুনের বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কে স্কুল-ইনস্পেক্টর উড্রো সাহেব, ১৮৬৪ সালের ৪-জুন, লিখেছেন :

"The Bethune School was established by the Hon'ble J. Drinkwater Bethune on the 7th May 1849, under the name of the Victoria Hindu Female School, and was held in the house of Baboo Dukhinnaranjan Mookerjee. The lamented death of the Founder occurred on the 11th August 1851, and in commemoration of him the School took the name of the Bethune School. It was moved to its present beautiful building in September 1851. Shortly after Mr. Bethune's death Lord Dalhousie undertook to bear the expense of the school, and for nearly* five years paid Rupees 652-7-3 a month, or Rupees 7,929 a year, from his own pocket. Afterwards the charge was transferred to the State. The first Head Mistress was Mrs. Ridsdale, who before her marriage with Mr. Brietzcke, kept a private school. Failing strength prevented her for managing both schools. She was succeeded by Mrs. Hoeberlin, one of the most admirable women who ever came to India, and one who had spent a large private fortune in doing good to the people of this land. After Mrs. Hoeberlin's departure Miss Turner succeeded, and after Miss Turner's death, Miss Goulding, the present Head Mistress, was appointed. The School has enjoyed the advantage of excellent Head Mistresses, but after fifteen years of labour the results are scarcely such as to give encouragement. The girls marry about ten years of age, and cease attendance just at the age

---

* From October 1851 to February 1856.

when their progress is most apparent. The little girls when first admitted are excessively irregular, they absent themselves for every trifling reason, and often without any reason at all. Consequently, as in all other girls' schools, much time is lost in the first two years, and the majority of the children are unable to read and understand even simple stories. . ." [২১]

হ্যালিডে সাহেব তখন বাঙলার ছোটোলাট। বাঙলাদেশের মেয়েরা যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে, ১৮৫৭ সালের গোড়ার দিকে তিনি সে-বিষয়ে উদ্যোগী হলেন। আলাপ-আলোচনা করলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। বিদ্যাসাগরের এ-ব্যাপারে অসামান্য উৎসাহ।

মাঝে-মাঝে হ্যালিডে সাহেবের বাড়িতে যেতেন বিদ্যাসাগর। যেতেন নিজস্ব পোষাকে। পরণে থানধুতি, গায়ে বিদ্যাসাগরী চাদর, পায়ে তালতলার চটি।

কিন্তু হ্যালিডে সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর আরেক রকম পোষাকেও তাঁর কাছে গিয়েছেন। ধুতি-চাদরের বদলে পেণ্টুলুন, চোগা-চাপকান, পাগড়ি। ওরকম পোষাক পরে বিদ্যাসাগরের মনে হত যেন তিনি সঙ সেজেছেন, যেন তিনি চুরি করেছেন। ওই পোষাকে সকলের চোখ এড়িয়ে চুপচাপ তিনি ছোটোলাটের বাড়িতে গিয়েছেন। কিন্তু দু-তিনবারের বেশি ওভাবে যেতে পারেননি।

ওই পোষাকে একদিন বিদ্যাসাগর হ্যালিডে সাহেবকে বললেন—এই আপনার সঙ্গে আমার শেষ দেখা।

হ্যালিডে সাহেব চমকে উঠলেন। বললেন—কেন পণ্ডিত, কী হয়েছে যে আর দেখা হবে না?

বিদ্যাসাগর হাসতে-হাসতে বললেন—এভাবে সঙ সেজে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব।

হ্যালিডে সাহেব কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন—পণ্ডিত, যে-পোষাকে এলে আপনার সুবিধে হয়, আপনি সেই পোষাকেই আসবেন।[২২]

কেন যে বিদ্যাসাগর ধুতি-চাদর-চটির বদলে অন্য পোষাক পরতে রাজি হননি, সে-বিষয়ে চমৎকার একটা গল্প আছে।

সেদিন বিদ্যাসাগর রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে ভাবছেন, লাটের দরবারে যাবার সময় অন্য পোষাক পরবেন কি না। ভাবছেন, কিন্তু কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছেন না।

বিদ্যাসাগরের সামনে তখন একজন মোগলাই পোষাক পরা মোটাসোটা ভদ্রলোক। আস্তে-সুস্থে তিনি নবাবী কায়দায় হাঁটছেন। কে একজন ছুটে এল ওই ভদ্রলোকের কাছে; বলল—হুজুর, আপনার বাড়িতে আগুন লেগেছে।

এই দারুণ দুঃসংবাদ শুনেও হুজুর কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। যেমন আস্তে-সুস্থে যাচ্ছিলেন, তেমনি নবাবী কায়দায় যেতে লাগলেন। যেন কিছুই হয়নি, যেন তার বাড়িতে আগুন লাগেনি।

কিন্তু খবর নিয়ে যে এসেছে, সে কেমন করে স্থির থাকে। ভদ্রলোকের ঘরবাড়ি বোধ করি এতক্ষণে ভস্ম হয়ে গেল। অস্থির হয়ে উঠল লোকটি।

—হুজুর, একটু তাড়াতাড়ি চলুন।

তাড়াতাড়ি চলা দূরের কথা, হুজুর ধমকে উঠলেন—বেকুব কোথাকার! ঘরের কয়েকখানা বাঁশ-বাখারি পুড়ে যাচ্ছে বলে আমি কি বাপ-দাদার চাল-চলন ছেড়ে দিয়ে হুড়মুড় করে ছুটব?[২০]

না, ঘরবাড়ি পুড়ে গেলেও বাপ-দাদার চাল-চলন ছাড়া চলবে না। বিদ্যাসাগর সেই মুহূর্তে সাব্যস্ত করলেন, যাই হোক, কিছুতেই ধুতি-চাদর ছেড়ে কোট-পেণ্টুলুন পরবেন না, কিছুতেই না।

জীবনে এই কয়েকবারের কথা বাদ দিলে বিদ্যাসাগর কখনো চটিজুতো, থান ধুতি, থানের চাদর ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করেননি। শেষজীবনে চিকিৎসকের কথায় মাঝে-মাঝে ফ্ল্যানেলের জামা ও উড়ানি ব্যবহার করেছেন।

এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি তুলে দিচ্ছি: "ব্রাহ্মণপণ্ডিত যে চটিজুতা ও মোটা ধুতিচাদর পরিয়া সর্বত্র সম্মানলাভ করেন, বিদ্যাসাগর রাজদ্বারেও তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তাঁহার নিজের সমাজে যখন ইহাই ভদ্রবেশ, তখন তিনি অন্য সমাজে অন্য বেশ পরিয়া আপন সমাজের ও সেই সঙ্গে আপনার অবমাননা করিতে চাহেন নাই। সাদা ধুতি ও সাদা চাদরকে ঈশ্বরচন্দ্র যে-গৌরব অর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদের বর্তমান রাজাদের ছদ্মবেশ পরিয়া আমরা আপনাদিগকে সে-গৌরব দিতে পারি না; বরঞ্চ এই কৃষ্ণচর্মের উপর দ্বিগুণতর কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করি। আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না।"[২৪]

সংস্কৃত বিদ্যায় বিদ্যাসাগর অগাধ পণ্ডিত, কিন্তু ইংরেজি বিদ্যাকে তিনি আতিথ্যে বরণ করেছেন। পোষাক-পরিচ্ছদে বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ স্বদেশী, কিন্তু কোনো-কোনো বিষয়ে তাঁর ইংরেজিয়ানা তর্কাতীত।

১৮৯১ সালের ২৮-সেপ্টেম্বর 'ইণ্ডিয়ান নেশন' লিখেছে:

"He (বিদ্যাসাগর) spent a fortune in purchasing English books. He had them bound in England by English firms and not in Calcutta by *duftries*. He presented the memory of his father and mother by portraits which he caused to be executed by English painters. He preserved the memory of his friends, the departed Professor Horace Hayman Wilson and the living Dr. Mouat, by portraits also executed by English painters. An English clock was on his staircase, and the walls of his study were hung with English water-colour drawings. The furniture of his rooms was English; he had an English taste for gardening."

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, উত্তরকালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন: "বিদ্যাসাগর বরাবরই চেয়ারে বসিতেন; কখনও ফরাসে বিছানায় বসিতে তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার মেছোবাজারের সেই ছোট বাড়ীটিতে ত ফরাসের ব্যবস্থা ছিল না; কিন্তু সুকিয়া ষ্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় সুন্দর ফরাসের বিছানা ছিল; বিদ্যাসাগর কখনও সেখানে বসিয়া গল্প করিতেন না; সন্নিকটবর্ত্তী একখানি চেয়ারে হেলান দিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন; আমরা বিছানায় উপবেশন করিতাম।"[২৫]

দশ

১৮৫৭ সালের ৩০-মের একখানা চিঠিতে বিদ্যাসাগর ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনকে বর্ধমান জেলার জৌগ্রামে নবপ্রতিষ্ঠিত একটি বালিকা-বিদ্যালয় সম্পর্কে লিখেছেন :

"It is with great pleasure I have the honour to report that the inhabitants of Jowgong in Bardwan have at the suggestion of the Head Master of the Model School at that village established a female school there. It was opened on the 15th of April last and now musters on its rolls 28 girls of different ages, ranging from 4 to 11 years, the majority of whom are daughters of respectable Brahmans and Kyasthas of the place. The school is at present located at the dwelling house of Babu Nabagopal Mazumdar the most influential man of the village and opens in the mornings when the Head Master of the Model School, assisted by another, performs the duties of teachers. The establishment of the institution was intimated to me at the commencement, but as I felt doubtful about its stability, I did not think it proper to report the circumstance to you at that time. Having however visited it during this week I have been led to hope that there is every chance of it flourishing within a short time. Not only do the inhabitants take the liveliest interest in its success, but the girls themselves appear to prosecute their studies with great delight and attention. Arrangements for the management of the school are, therefore, urgently required, and I beg to submit them in the accompanying tabular statement for your sanction.

It will be seen that in the statement I have applied for two pandits as, under present circumstances, I do not think the school can be properly managed with a less number. It is true that the number of girls is only 28 but as each girl has a separate lesson to learn, one man cannot conveniently teach them all. The contingent charges have been estimated at Rs. 5 per month. This sum includes the cost of class-books which it is intended to supply gratis to the pupils, because the inhabitants claim the same privilege in this respect as that allowed in the Bethune School.

TABULAR STATEMENT

Female School at Jowgong, Zila Bardwan:

		Rs.
Head Master	...	25
Asst. Master	...	15
Maidservant	...	2
Contingencies	...	5
		Rs. 47" ১

ওই বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক বত্রিশ টাকা সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হল।

বিদ্যাসাগরের মনে হল, বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনে গভর্নমেণ্টের সমর্থন আছে। যদি আরো বালিকা-বিদ্যালয় খোলা যায়, নিশ্চয়ই ন্যায্য সরকারী সাহায্য পাওয়া যাবে।

পরম উৎসাহে বিদ্যাসাগর একের পর আরেক বালিকা-বিদ্যালয় খুলে চললেন।

১৮৫৭ সালের ২৪-নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের ১৫-মে—এই সময়ের মধ্যে বিদ্যাসাগর স্থাপন করেছেন সাকুল্যে পঁয়ত্রিশটি বালিকা-বিদ্যালয়। চার জেলা নিয়ে এলাকা : হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর, নদীয়া। স্থাপিত হয়েছে হুগলী জেলায় কুড়িটি বালিকা-বিদ্যালয়, বর্ধমান জেলায় এগারোটি বালিকা-বিদ্যালয়, মেদিনীপুর জেলায় তিনটি বালিকা-বিদ্যালয় এবং নদীয়া জেলায় একটি বালিকা-বিদ্যালয়।

বিদ্যাসাগর হুগলী জেলায় প্রথম বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন পোটবায়, ১৮৫৭ সালের ২৪-নভেম্বর। তারপর দাসপুরে, ১৮৫৭ সালের ২৬-নভেম্বর। বঁইচিতে, ১৮৫৭ সালের ১-ডিসেম্বর। একই দিনে দু-গ্রামে দুই বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, দিগশুইতে আর তালাণ্ডুতে, ১৮৫৭ সালের ৭-ডিসেম্বর। আবার একই তারিখে আর দু-গ্রামে দুই বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, হাতিনায় আর হয়েরায়, ১৮৫৭ সালের ১৫-ডিসেম্বর। তারপর নপাড়ায়, ১৮৫৮ সালের ৩০-জানুআরি। উদয়রাজপুরে, ১৮৫৮ সালের ২-মার্চ। রামজীবনপুরে, ১৮৫৮ সালের ১৬-মার্চ। আকাবপুরে, ১৮৫৮ সালের ২৮-মার্চ। তারপর একই দিনে তিন গ্রামে তিনটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন—শিয়াখালায়, মাহেশে, বীরসিংহে—১৮৫৮ সালের ১-এপ্রিল। গোয়ালসারায়, ১৮৫৮ সালের ৪-এপ্রিল। দণ্ডীপুরে, ১৮৫৮ সালের ৫-এপ্রিল। আবার একই তারিখে দু-গ্রামে দুটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন—দেপুরে আর রাউজাপুরে—১৮৫৮ সালের ১-মে। মলয়পুরে, ১৮৫৮ সালের ১২-মে। বিষ্ণুদাসপুরে, ১৮৫৮ সালের ১৫-মে।

বিদ্যাসাগর বর্ধমান জেলায় প্রথম বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন রানাপাড়ায়, ১৮৫৭ সালের ১-ডিসেম্বর। তারপর জামুইতে, ১৮৫৮ সালের ২৫-জানুআরি। একই দিনে দু-গ্রামে দুটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন—শ্রীকৃষ্ণপুরে আর রাজারামপুরে—১৮৫৮ সালের ২৬-জানুআরি।

তারপর জ্যোৎ-শ্রীরামপুরে, ১৮৫৮ সালের ২৭-জানুআরি। আবার একই তারিখে দু-গ্রামে দুটি বালিকা-বিদ্যালয়—দাঁইহাটে আর কাশীপুরে—১৮৫৮ সালের ১-মার্চ। তারপর সানুইতে, ১৮৫৮ সালের ১৫-এপ্রিল। রসুলপুরে, ১৮৫৮ সালের ২৬-এপ্রিল। বন্তীরে, ১৮৫৮ সালের ২৭-এপ্রিল। বেলগাছিতে, ১৮৫৮ সালের ১-মে।

বিদ্যাসাগর মেদিনীপুর জেলায় প্রথম বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন ভাঙাবন্ধে, ১৮৫৮ সালের ১-জানুআরি। তারপর বদনগঞ্জে, ১৮৫৮ সালের ১০-মে। শান্তিপুরে, ১৮৫৮ সালের ১৫-মে।

এবং ১৮৫৮ সালের ১-মে বিদ্যাসাগর নদীয়ায় একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন।[২]

ওই পঁয়ত্রিশটি বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য একুনে মাসিক খরচ ৮৪৫৲ টাকা। বালিকা-বিদ্যালয়গুলোর জন্য বিদ্যাসাগর সরকারের কাছে সাহায্যের আবেদন করলেন।

কিন্তু, শেষপর্যন্ত দেখা গেল, ভারত-সরকার বিমুখ। বালিকা-বিদ্যালয়গুলোর জন্য কোনো সাহায্য মঞ্জুর হল না। অবশ্য বিদ্যাসাগর বালিকা-বিদ্যালয়গুলো খোলার আগে গবর্নমেণ্টের অনুমতি নেননি; কিন্তু এ-ব্যাপারে গবর্নমেণ্ট অনিচ্ছুক নয়, গবর্নমেণ্ট থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে, এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই বিদ্যাসাগর বালিকা-বিদ্যালয়গুলো খুলে ফেলেছেন।

আরো একটা সমস্যা। বালিকা-বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকেরা আরম্ভ থেকে মাইনে পাননি। ১৮৫৮ সালের ৩০-জুন পর্যন্ত হিসেব ধরলে তাঁদের পাওনা দাঁড়াচ্ছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা। সে-টাকা কে দেবে? যদি গবর্নমেণ্ট না দেয় তো অবশ্যই বিদ্যাসাগরকে দিতে হবে।

এই বিষয়ে ১৮৫৮ সালের ২৪-জুন বিদ্যাসাগর পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের ডিরেক্টরকে একখানা চিঠি লিখেছেন :

"With reference to the orders of the Government of India bearing date the 7th ultimo forwarded with your circular letter No. 1316 dated 29th idem, I have the honour to state that in anticipation of the sanction of Government, female schools were opened by me in several villages in the districts of Hughli, Bardwan, Nadia and Midnapur and the requisite establishment entertained in them. The schools were opened on the condition that the inhabitants of each village would provide a suitable school house, the expenses for their maintenance being defrayed by Government. The Supreme Government, however, have in their orders quoted refused to grant any aid to the schools on the above condition and the institutions must therefore be closed. But it is necessary that the establishment should receive their pay which they have not had since the commencement and which, I trust, Government will be pleased to pass.

2. It is true that the establishment was entertained by me without orders. But I must be permitted to mention that

at the commencement of my operations I was not discouraged either by yourself or Government. If I had been, I would never have ventured to open so many schools nor been placed in my present difficult position. The establishment, having been appointed by me, naturally look up to me for payment, and it will certainly be a great hardship if I am made responsible for it, especially when the expenditure has been incurred on furtherance of an object of public utility.

3. Under the above circumstances, I earnestly beg that you will have the goodness to recommend the case to the favorable consideration of the Government. . . ." ০

বিদ্যাসাগরের ১৮৫৭-৫৮ সালের একটি রিপোর্ট থেকে কিয়দংশ উদ্ধার করি :

". . . I directed my chief attention to the establishment of Female Schools in the Districts in my division. I succeeded in opening 40 Schools during the session and in the subsequent months of May and June last.* The total number of girls attending the Schools amounts to 1348. Several parties dissuaded me from undertaking the task, because they thought that the inhabitants of the Interior would never consent to send their girls to public schools. I, however, felt within myself that with energetic exertions I could be sure of success. I accordingly set to work, and I am happy to be able to state that I have not only made the people sympathize in the good cause, but that they have come forward with alacrity and sent their daughters to the new schools. If it were not for the untoward circumstance which I shall mention hereafter, I am confident that I would have been able to establish similar schools in almost every village in the Districts under me, except perhaps the district of Nuddea. Thus a change may be said to have come over the spirit of the times, and this may be reckoned as a new era in the history of Education in Bengal.

The schools were established on the understanding that

---

* প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকশনকে লেখা বিদ্যাসাগরের ১৮৫৮ সালের ২৪-জুনের চিঠির সঙ্গে প্রেরিত একটি তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৮৫৭ সালের ২৪-নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের ১৫-মে পর্যন্ত বিদ্যাসাগর সাকুল্যে পঁয়ত্রিশটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। (দ্রষ্টব্য : Education Department, Consultation, 5 August 1858, No. 16)

অতএব, বাকি পাঁচটি বালিকা-বিদ্যালয় বিদ্যাসাগর ১৮৫৮ সালের মে-জুনে স্থাপন করে থাকবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তরে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু উক্ত পাঁচটি বালিকা-বিদ্যালয়ের বিস্তারিত বিবরণ অদ্যাবধি সংগ্রহ করতে পারিনি।

the inhabitants would provide suitable School Houses, the expenses for their maintenance being defrayed by Government. These conditions were approved by His Honor the Lieutenant-Governor and strongly recommended by him; but the Supreme Government unfortunately took a different view and refused their sanction to their establishment except under the Grant-in-aid rules. My labours have thus become fruitless and the interesting little Schools will have to be closed immediately. . . "[৪]

বিদ্যাসাগরের বক্তব্য বাঙলা গবর্নমেণ্টের গোচরে আনলেন ডিরেক্টর। ডিরেক্টরের বিবেচনায় কর্তৃপক্ষের সাহায্য ও সহানুভূতি বিদ্যাসাগরের প্রাপ্য। ডিরেক্টর বাঙলা গবর্নমেণ্টকে লিখেছেন :

"I would venture to recommend to the generous consideration of Government the Pandit's petition to be shielded from personal and pecuniary liability on account of the female schools which, in anticipation of the sanction and approbation of Government, he was the means of establishing.

2. I would solicit attention to the memorandum annexed to the Pandit's letter, as the Government may perhaps hardly be aware of the extent of this officer's voluntary and unostentatious labours in the cause of female education. If so much can be done in the villages by one individual burdened with other and distant duties, occupying a position of no great authority, and almost without aid or countenance from his superiors, how much might not be done in the same way if the Government were to afford its sanction and support? On the other hand, what discouragement may not be inflicted on the cause if the benevolent exertions of the officer referred to are seen to lead only to his discredit and pecuniary loss."[৫]

১৮৫৮ সালের ২২-জুলাই ছোটোলাট ভারত-সরকারকে সমস্ত বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানালেন। ছোটোলাট ভারত-সরকারকে লিখেছেন :

"The Lieutenant-Governor desires earnestly to support the recommendation of the Director of Public Instruction, and His Honour is not without hope that when the Hon'ble the President in Council is made aware of the number of promising female schools which had been actually established by the unostentatious zeal of the very intelligent and meritorious Principal of the Sanskrit College, and which will now, together with the keen and anxious hopes and anticipations to which they have given rise, be suddenly extinguished, he may per-

haps be disposed spontaneously to reconsider the orders of the 7th May." [৬]

ভারত-সরকার জানতে চাইল : কেন বিদ্যাসাগর ধরে নিলেন যে সরকারী সাহায্য পাওয়া যাবে? সরকারী লিখিত আদেশ ছাড়া বিদ্যাসাগর একের পর আরেক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, এই কর্মের জন্য দায়ী কে?

ভারত-সরকারের জিজ্ঞাসার উত্তরে বিদ্যাসাগর পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের ডিরেক্টরকে একখানা চিঠি লিখেছেন ১৮৫৮ সালের ৩০-সেপ্টেম্বর। চিঠিখানা তুলে দিচ্ছি :

"I have the honour to state that as some female schools on this footing had already been established with the sanction of the Government, I believed that the plan was generally approved. I invariably reported to your office the establishment of every new school, and usually in the month succeeding that in which it was opened. My several applications for the establishments required in these schools were always entertained by you though no orders were ever passed, and during a period of several months I was not in any way discouraged in the course I was taking, which I believed to be in accordance with the wishes of the Government." [৭]

১৮৫৮ সালের ৪-অক্টোবর ডিরেক্টর বিদ্যাসাগরের চিঠিখানা, আপন মন্তব্যসমেত, বাঙলা গবর্নমেণ্টের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ডিরেক্টর মন্তব্য করেছেন :

"For my part, knowing or believing that the Pandit had been in personal communication with the Lieutenant-Governor on the subject during my own absence from Calcutta, and inferring from your letter (No. 503) of the 21st October that the Government was prepared to regard his exertions with favour, I did not hesitate to send on his reports to Government (as Mr. Woodrow in my absence had done) without delay, discouragement, or remark.

I regret to say that the untoward result with which the action of the department in this matter had been attended has given a 'heavy blow and great discouragement' to the cause of female education, from the effects of which, I fear, nothing that is likely to be now done will enable it speedily to recover." [৮]

বিদ্যাসাগর অসাধারণ নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে সরকারী কর্ম করেছেন। কর্তৃপক্ষের সে-বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ নেই।

দক্ষিণ-বাঙলার ইনস্পেক্টর অফ স্কুলস প্র্যাট সাহেব ছুটি নিয়ে বিলেত চলে গেলেন। আশা করা গিয়েছিল, প্র্যাট সাহেবের ওই শূন্যপদে বিদ্যাসাগরই নিযুক্ত হবেন। হ্যালিডের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের এ-সম্পর্কে কিছু কথাবার্তাও

হয়েছিল। এ-বিষয়ে ১৮৫৭ সালের মে-মাসে হ্যালিডেকে লেখা বিদ্যাসাগরের একখানা চিঠি থেকে তুলে দিচ্ছি :

"When I had the honour to wait on you on saturday last and solicited your permission to make a few suggestions regarding the appointment of an Inspector for South Bengal, you were pleased to direct me to submit a written memorandum upon the subject. I have accordingly availed myself of the permission and beg respectfully to suggest that if you should feel inclined to transfer me to that post, the appointment of my successor in the Sanskrit College may be made in consultation with me, as from an intimate personal knowledge of the several parties from whom the selection may be made, I think I will be best able to recommend the most proper person for the place. If however it should be thought inexpedient to place the division under my charge on account of the Government English Colleges and schools in it, I would earnestly solicit that at least the districts in which there are model schools, *viz.*, Hughli, Midnapur, Bardwan and Nadia may be placed under me, the colleges and schools being without inconvenience in charge of the person who may be appointed Inspector of the division." [১]

কিন্তু এই চিঠির আগেই, এপ্রিল মাসে, হ্যালিডে লজ সাহেবকে ওই শূন্য পদে নিযুক্ত করেছেন। বিদ্যাসাগরের মনে হল, তাঁর প্রতি সুবিচার করা হয়নি। মনে হল, তাঁর মতো একজন দিশী কর্মচারীর পক্ষে অধিক উন্নতি আশা করা নিরর্থক।

গর্ডন ইয়ং তখন ডিরেক্টর। ইয়ং সাহেবের হস্তক্ষেপে বিদ্যাসাগরের কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। সেদিকেও বিদ্যাসাগর অসন্তুষ্ট।

বিদ্যাসাগর অতএব সাব্যস্ত করলেন, সরকারী কর্মে ইস্তফা দেবেন। ১৮৫৭ সালের ২৯-আগস্ট বিদ্যাসাগর ডিরেক্টরকে একখানা চিঠিতে সেকথা জানিয়ে দিলেন :

"As you are about to leave town for three months, I consider this a fitting occasion to intimate to you that I have made up my mind to retire from the public service in a short time. The reasons which have induced me to come to this determination are more of a private than of a public nature, and I therefore refrain from mentioning them.

The new arrangements for the Sanskrit College have not yet been fully developed and as I am desirous of completing them which will occupy two or three months more, I wish to continue in my present office until the end of December next, when I shall tender my resignation in due form.

My object in addressing you now is that you may have ample time to consider the arrangements that you may deem most desirable for supplying my place in the Education Department." [১০]

এই চিঠির একটি প্রতিলিপি হ্যালিডেকেও পাঠিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের সঙ্কল্পের কথা জেনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন হ্যালিডে। হ্যালিডে, ১৮৫৭ সালের ৩১-আগস্ট একখানা চিঠি লিখলেন বিদ্যাসাগরকে :

"My dear Pandit,—I am really very sorry to hear of your intention. Come and see me on Thursday and tell me why it is that you have come to this determination." [১১]

বিদ্যাসাগর চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন, হ্যালিডের তা মনঃপূত নয়। হঠাৎ ইস্তফা না দিতে বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করলেন হ্যালিডে। হ্যালিডের অনুরোধ রাখলেন বিদ্যাসাগর, আরো এক বছর অনিচ্ছায় কাজ চালিয়ে গেলেন।

স্বাস্থ্যও ভালো যাচ্ছে না। ১৮৫৮ সালের ৫-আগস্ট ডিরেক্টরের কাছে ইস্তফাপত্র পাঠালেন বিদ্যাসাগর :

"The unceasing mental exertion required by the discharge of my public duties has now so seriously affected my general health, as to compel me to tender my resignation of the Education service to the Hon'ble the Lieutenant-Governor of Bengal.

I feel that I can no longer devote the assiduous attention to my duties which their due performance necessitates. I need repose, and in justice to the public interests, as well as to my own comfort and happiness, can only secure that repose by retiring into private life.

The moment my health is restored, it is my intention to devote my time and attention to the composition and compilation of useful works in the vernacular language of Bengal. Thus, although my direct official connection with the education and enlightenment of my countrymen will have ceased, I venture humbly to hope that my remaining years will still be devoted to the advancement of a great and sacred cause in which my deep and earnest interest can only close with my life.

Among the minor causes that have led to my taking so serious a step, are the absence of all further prospects of advancement and the want of that immediate personal sympathy with the present system of education, which every conscientious servant of the Department, should possess.

With regard to the former, I can occupy my time more profitably and with infinitely less strain upon mind and body,

than in my present position. It would be idle to deny that such considerations must have weight with one who has not yet been able to make any permanent provision for his family and who fears that failing health will prevent his doing so, if he delays longer the severance of his connection with the arduous and onerous duties that belong to the offices he holds.

With respect to the other, I feel that I have no right to obtrude my views and opinions upon the Government; yet I could not conceal from those I serve, the fact that my heart is not in my work, and that thereby my efficiency is, and must be, impaired. More I am unwilling to say, less I could not express, with the maintenance of the honesty of purpose which I deem to be an essential quality of a conscientious public servant.

I retire with the conscious gratification that I have always laboured earnestly to discharge my duties to the best of my humble ability and I trust that I shall not be deemed presumptuous in tendering my most sincere and heartfelt acknowledgments for the unvarying kindness, indulgence and consideration, which I have always experienced at the hands of the Government." [১২]

বিদ্যাসাগরের ইস্তফাপত্রের একটি প্রতিলিপি ডিরেক্টর বাঙলা গবর্নমেণ্টের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ১৮৫৮ সালের ১৮-আগস্ট ডিরেক্টর একখানা চিঠিতে বাঙলা গবর্নমেণ্টকে লিখেছেন :

"I have the honour to forward herewith copy of a letter dated 5th instant from the Principal of the Sanskrit College and Special Inspector of Schools and to recommend that his resignation be accepted. Until more permanent arrangement can be made, the charge of the Sanskrit College, together with the Calcutta Normal School and the Patshala may be confided to the Assistant Principal of the College, Babu Dinabandhu Sharma, and his duties as Special Inspector may be divided between the regular Inspectors of Schools in South and East Bengal, an arrangement which, as the Lieutenant-Governor is aware, has been for some time in contemplation.

It is not necessary that I should dwell at any length upon services so well known to the Lieutenant-Governor as are those of Pandit Ishwar Chandra Sharma. Suffice it to say he has laboured earnestly and to good purpose in the cause of native education, and has established a claim to the gratitude of the Government and of his countrymen on this account.

It is pleasing to find that, although the Pandit retires from office, his time and energies will still be employed for the benefit of the cause he has so much at heart." ১৩

বিদ্যাসাগরের স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না, পদত্যাগের সেটি একটি কারণ, কিন্তু সেটিই একমাত্র কারণ নয়। আরো দুটি গুরুতর কারণ আছে : উন্নতি সম্পর্কে হতাশা; এবং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ। ছোটোলাট হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের প্রতি অত্যন্ত অমায়িক, কিন্তু শিক্ষাবিভাগের নতুন ডিরেক্টরের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক সুখের নয়। ১৮৫৮ সালের ১৫-সেপ্টেম্বর হ্যালিডেকে লেখা একখানা আধা-সরকারী চিঠিতে বিদ্যাসাগর পদত্যাগের আসল কারণ ব্যক্ত করেছেন। অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি :

"After mature deliberation I find that I cannot either with consistency or propriety omit the parts of my letter which appear objectionable to you. It is true that ill-health is one of the principal causes which have induced me to resign. But I cannot conscientiously say that that is the sole cause. If it were so, I could have applied for a long leave and renovated my health. I had often represented to you, that I frequently felt it disagreeable and inconvenient to serve Government under existing circumstances and that I considered the present system upon which the department of Vernacular Education was conducted, was a mere waste of money. You are aware that I often met with discouragement in my way. I saw besides no prospects of advancement and more than once I felt my just claims passed over. Thus I hope you will be pleased to admit that I had reasonable grounds of complaint. But I would nevertheless have continued in my present post for some time longer, if I were not forced to take the step I have taken by prolonged ill-health, which has made me unfit for my responsible duties. . ." ১৪

কিন্তু হ্যালিডের বিবেচনায় বিদ্যাসাগরের অভিযোগ ভিত্তিহীন। বিদ্যাসাগরের চিঠি পেয়েই, ১৮৫৮ সালের ১৫-সেপ্টম্বর, হ্যালিডে বিদ্যাসাগরকে লিখেছেন :

"I mentioned that I thought it possible you might be asked to explain the cause of your dissatisfaction with the administration of the department, and as you expressed an insuperable objection to do this in a public form I suggested that it might be better to omit what you were unwilling to account for and merely allude to your illness which though not the sole was certainly a sufficient reason for resignation.

You ask me to admit that you have had reasonable grounds of complaint. I am quite unable to admit this as to what is now assigned as your grievance—namely, (1) that you

thought the present system of Vernacular Education a waste of money, (2) that you often met with discouragement and (3) that your just claims to promotion have been passed over.

It will be sufficient to say that I quite differ with you as to the last point, and as to the second can see nothing in which you have ever been discouraged by me but the contrary. As to the first point, it is a mere matter of opinion and moreover cannot relate to the special system of Vernacular Education with which only you had to do." ১৫

হ্যালিডের ব্যবহারে কখনো নিরুৎসাহিত হননি বিদ্যাসাগর, এ-ব্যাপারে হ্যালিডে বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের ভুল অর্থ করেছিলেন। সেকথা বিদ্যাসাগর, ১৮৫৮ সালের ১৮-সেপ্টেম্বর, একখানা চিঠিতে হ্যালিডেকে জানিয়ে দিয়েছেন :

"In referring to the discouragement I met with, I meant to say, that obstruction, I often met with, in my way to remove which I was frequently obliged to trouble you. You were always pleased to lend an attentive ear to my representations and very often those obstacles were removed by your kind interference." ১৬

স্বয়ং হ্যালিডে সাহেব একদিন ডেকে পাঠালেন বিদ্যাসাগরকে। বললেন—তুমি কাজে ইস্তফা দিও না। ইস্তফা ফিরিয়ে নাও। কাজ করো।

বিদ্যাসাগর বললেন—যে-কাজ মন দিয়ে করতে পারব না, শুধু টাকার জন্য সে-কাজ করতে আমি রাজি নই।

হ্যালিডে সাহেব বললেন—আমি জানি, তুমি সব দানধ্যান করো, কিছুই রাখো না। চাকরি ছেড়ে খাবে কী?

বিদ্যাসাগর বললেন—ডালভাত।

—তাই বা পাবে কোত্থেকে?

—এখন দুবেলা খাই, তখন না হয় একবেলা খাব। তাও না জোটে একদিন অন্তর খাব। তা বলে যে-কাজে মন বসছে না, সে-কাজ করে আমি টাকা নিতে চাই না।১৭

পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে দিতে বিদ্যাসাগরের ভয় নেই। এখানে বলে রাখা ভালো, সে-সময়ে বিদ্যাসাগরের নিজের বই বিক্রীর আয় মাসে পাঁচশো টাকার চেয়ে ঢের বেশি।*

১৮৫৮ সালের ২৫-সেপ্টেম্বর বাঙলা গবর্নমেণ্ট বিদ্যাসাগরের পদত্যাগ প্রার্থনা মঞ্জুর করে ডিরেক্টরকে জানাল :

"It is to be regretted that the Pandit should have thought

---

* প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, C. E. Buckland লিখেছেন :

"Vidyasagar's monthly benefactions amounted to about Rs. 1,500 and his income from his publications for several years ranged from Rs. 3,000 to Rs. 4,500 a month." (C. E. Buckland: Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. II, p. 1035.)

fit to make his retirement somewhat ungraciously, especially as he can have no fair reason for dissatisfaction. You will, however, be good enough tc inform him, that he carries with him the acknowledgements of the Government for his long and zealous service in the cause of Native Education." ১৮

বাঙলা গবর্নমেণ্টের মন্তব্য নিশ্চয় ন্যায্য নয়। নিশ্চয় অকারণে অসন্তুষ্ট-ভাবে সরকারী কর্ম থেকে বিদায় নেননি বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের মতো মানুষের পক্ষে এই বিদায়গ্রহণের নিশ্চয় যথেষ্ট সংগত কারণ ছিল।

যা হোক, ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন যথাসময়ে গবর্নমেণ্টের বক্তব্য বিদ্যাসাগরকে জানিয়ে দিলেন।

কিন্তু তখন পর্যন্ত বালিকা-বিদ্যালয়গুলির সমস্যার কোনো নিষ্পত্তি হয়নি, শিক্ষকদের বেতন তখনো বাকি পড়ে আছে। বিদ্যাসাগরের মনে হল, এই অবস্থায় সরকারী চাকরি থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলে ফল খুব ভালো হবে না। বিদ্যাসাগর ভাবলেন, বালিকা-বিদ্যালয়গুলির সমস্যার একটা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, গবর্নমেণ্ট রাজি হলে, তাঁর পক্ষে সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত থাকা উচিত। বিদ্যাসাগর অতএব, ১৮৫৮ সালের ৫-অক্টোবর, সেই মর্মে একখানা চিঠি লিখলেন ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন গর্ডন ইয়ংকে :

"My dear Sir,

I received your letter No. 2461 yesterday noon communicating the acceptance of my resignation.

I am already in a very disagreeable position for not having yet been able to pay the Pandits of the Female School, and I am afraid that I will be more so, as soon I leave my post. And though it is very desirable in consideration of the present state of my health, that I should cease from work as soon as possible, yet I would wish, on the above account, to defer making over charge if you see no particular objection, till the decision of Government on my application for the payment of the bill of the Female School is ascertained.

Your very truly,
Isvara Chandra Sarma." ১৯

5th Oct., 1858.
To—W. G. Young, Esq.,
Director of Public Instruction.

কিন্তু বিদ্যাসাগরের ইচ্ছা পূর্ণ হল না। বিদ্যাসাগরের এই চিঠির উত্তরে গর্ডন ইয়ং বিদ্যাসাগরকে লিখেছেন :

"Thursday Morning.

My dear Sir,

As various arrangements have been made and orders issued in regard to the charge of the College, Normal School, Verna-

cular Schools, &c., which it would be very inconvenient now to cancel, and specially as it is uncertain within what time the Supreme Government may issue final orders in the matter of the Female School, I do not think it will be expedient on public ground to defer carrying out the new arrangements any longer. Had your note of the 5th written a week or two ago I dare say your request could have been complied with, but now I think it is too late.

I trust the matter of the Female Schools will be dealt with justly and generously by the Supreme Government and that before long you will be relieved from your present awkward position in regard to these Schools.

I remain your truly,
W. Gordon Young."

To—Pandit Isvara Chandra Sarma

বিদ্যাসাগর সরকারী চাকরি ছেড়ে চলে আসার কিছুদিন আগের কথা।
বিহারীলাল সরকার লিখেছেন : "(সিপাহী) বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে পর,
মহারাণীর অভয়বাণীর ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়। সেই ঘোষণাপত্র নানা ভাষায়
অনুবাদিত হইয়াছিল। বীডন সাহেব, সেই ঘোষণা-পত্র, বাঙ্গালায় অনুবাদ
করাইবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর
মহাশয়ের পদত্যাগ করিবার এক মাস পূর্ব্বে বীডন্ সাহেব নিম্নলিখিত মর্ম্মে
পত্র লেখেন,—"আমার ইচ্ছা, আপনি ঘোষণাপত্রটী, বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন।
আগামী কল্য ১১টার সময় আফিসে আসিলে ভাল হয়। কাগজ-পত্র পাঠাইবার
নিয়ম নাই; নতুবা পাঠাইতাম। এই চিঠির মর্ম্ম কাহাকেও বলিবেন না। আপনি
যে ইহার তর্জ্জমা করিতেছেন, এ কথা কেহই যেন জানিতে না পারে।" ১২৬৫
সালের ৭ই কার্ত্তিকে (১৮৫৮ সালের ২২শে অক্টোবরে) এই পত্র লিখিত
হয়।"[২১]

রামগোপাল সান্যাল লিখেছেন :

"In 1858, soon after the Mutiny, it was arranged that Bengali translation of the Royal Proclamation should be read by Vidyasagur at the Durbar room from which he was driven away by the Durwans for having slippery shoes on. The Durbar commenced at the usual hour, but the venerable Vidyasagur was not to be seen. Sir Cecil Beadon made enquiries, and made a search after him, when he was found at the door in his usual oriental dress, with Taltollah slippers on. He was allowed to come, and read the translation from his seat at the Durbar."* [২২]

* রামগোপাল সান্যালের এই বিবরণের সত্যতায় আমি সন্দেহ করি। সমসাময়িক
পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় কিংবা অন্য কোনো সূত্র থেকে এমন কোনো প্রমাণ অদ্যাবধি সংগ্রহ

১৮৫৮ সালের ৩-নভেম্বর বিদ্যাসাগর নতুন প্রিন্সিপাল ই. বি. কাওয়েলকে সংস্কৃত কলেজের দায়িত্ব অর্পণ করে দিলেন।

উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন : "বিদ্যাসাগর স্বভাবতই সম্পূর্ণ স্বাধীনতন্ত্রের লোক ছিলেন। অব্যাহতভাবে আপন ইচ্ছা চালনা করিতে পাইলে তবে তিনি কাজ, করিতে পারিতেন। উপরিতন কর্তৃপক্ষের মতের দ্বারা কোনোরূপ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে আপন সংকল্পের প্রবাহ তিলমাত্র পরিবর্তন করিতে পারিতেন না। কর্মনীতির নিয়মে ইহা তাঁহার পক্ষে প্রশংসনীয় ছিল না। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে একাধিপত্য করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, অধীনে কাজ চালাইবার গুণগুলি তাঁহাকে দেন নাই। উপযুক্ত অধীনস্থ কর্মচারী বাংলাদেশে যথেষ্ট আছে, বিদ্যাসাগরকে দিয়া তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা বিধাতা অনাবশ্যক ও অসংগত বোধ করিয়াছিলেন।"[২৩]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "১৮৫৮ খৃঃ অব্দের শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের পদ পরিত্যাগ করেন। ঐ সময়ে কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের চিফ জষ্টীস সার জেমস কলবিন সাহেব মহোদয় তৎকালীন শিক্ষাসমাজের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ইনি অগ্রজকে (বিদ্যাসাগর) অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, একারণ অগ্রজকে বলেন তুমি যেরূপ হিন্দু ল (আইন) অবগত আছ, উকীল হইলে তোমার আরও প্রতিপত্তি হইবে। ইহা শুনিয়া অগ্রজ তাঁহাকে বলেন যে আমি ইংরাজী আইন জানি না, আর এ বয়সে আইন পরীক্ষা দিতেও ইচ্ছা নাই। তাহাতে চিফ জষ্টিস বলেন যে তোমার মত অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী বিচক্ষণ কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিকে পরীক্ষা দিতে হইবে না। আমার পাশ করিয়া দিবার ক্ষমতা আছে, তোমার মত লোক পাইলে গবর্ণমেণ্টের ও ভারতবর্ষের অনেক উপকার হইবে। কলবিন সাহেব মহোদয়ের উত্তেজনায় তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতের সর্ব্বপ্রধান উকীল বাবু দ্বারকানাথ মিত্র মহোদয়ের বাটীতে প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে যাইয়া দেখিলেন যে, হিন্দুস্থানী মোক্তারদের সহিত টাকার জন্য অনেক হুড়াহুড়ী করিতে হয়, দেখিয়া শুনিয়া ওকালতী কর্ম্মে ঘৃণা জন্মিল এবং কলবিন সাহেবের বাটী যাইয়া বলিলেন, অধিক টাকা পাইব বলিয়া এরূপ বিসদৃশ ঘৃণিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। সাহেব বলিলেন, তোমাকে মোক্তারদের সহিত টাকার জন্য কেন হুড়াহুড়ী করিতে হইবে। যেহেতু কোর্টের জজেরা আদালত মধ্যে তোমাকে দেখিলে খাতির ও সেকহ্যান্ড অর্থাৎ করস্পর্শ করিবে। তুমি ভারতবর্ষের মধ্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, একারণ কেহই তোমার সম্মান রাখিতে ত্রুটি করিবেন না। সাধারণ লোক ও মোক্তার প্রভৃতি ইহা দেখিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তোমাকেই উকীল মনোনীত করিবেন। অল্পদিনের মধ্যেই তোমার ভালরূপ পসার হইবে। সাহেব এবম্বিধ নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া বুঝাইলেন, তথাপি অগ্রজের অর্থকরী ওকালতী কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইল না।"[২৪]

কিন্তু এ-বিষয়ে মতান্তর আছে।

শশিভূষণ সিংহ বলেছেন : "দ্বারকানাথ মিত্র, কেবল মক্কেলদের কাগজ-পত্র লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার পড়াশুনার সময় থাকিত না। বিদ্যাসাগর

করতে পারিনি যার উপর নির্ভর করে বলা চলে যে বিদ্যাসাগর উক্ত ঘোষণাপত্রের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন কিংবা সেই বঙ্গানুবাদ দরবারে পাঠ করেছিলেন।

মহাশয় ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। মোকদ্দমা লইয়া থাকিলে পড়াশুনা হইবে না ভাবিয়া, তাঁহার ওকালতী করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই।"[২৫]

আলোচ্য বিষয়ে বিহারীলাল সরকার মন্তব্য করেছেন : "আধুনিক আদালতের অনেক উকীলকেই যে টাকার জন্য হুড়াহুড়ি মারামারি করিতে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় একজন শান্তিপ্রিয় ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যে সেটাকে ঘৃণা করিবেন, তাহা বলা বাহুল্য; কিন্তু দ্বারকানাথ মিত্রের ন্যায় প্রতিষ্ঠাবান্ উকীল কি টাকার জন্য মোক্তারদের সঙ্গে ঐরূপ হুড়াহুড়ি করিতেন? এ কথাটা মনে স্থান দিতে কোন মতে সহজে প্রবৃত্তি হয় না। শশিভূষণবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা এক্ষণে সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।"[২৬]

উত্তরকালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য অভিযোগ করেছেন : "আমার দৃঢ় ধারণা যে, বিদ্যাসাগরেরও সময়ে সময়ে আশঙ্কা হইত যে, পাছে আর কোনও বাঙগালীর 'সাহেবদের' কাছে তাঁহার চেয়েও বেশী প্রতিপত্তি হয়।...তিনি কাহারও নিকট মাথা হেঁট করিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এইটুকু দৌর্ব্বল্য ছিল, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। 'সাহেবদের' নিকট পসার জমাইবার চেষ্টা যে তিনি কখনও করিয়াছিলেন, একথা আমি বলিতেছি না; তবে তাঁহার বিদ্যাগৌরবে 'সাহেব' সমাজে যে প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তাহা তিনি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।"[২৭]

অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ। কিন্তু, লক্ষণীয়, এই অভিযোগের মূলে কৃষ্ণকমল কোনো প্রমাণ দাখিল করেননি। প্রমাণবিহীন এই অভিযোগের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত চারটি সাক্ষ্য উপস্থিত করি।

জনৈক সম্পাদক লিখেছেন : "যে সকল উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের কাছে অন্যে মাথা হেট করিয়া থাকেন, বিদ্যাসাগর তাহাদিগকে আপনার সমান বলিয়া মনে করিতেন। উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদিগের সহিত বন্ধুত্বসুলভ সদ্ভাবসম্বন্ধ ছিল; তিনি কোন কালে কাহারও তোষামদ করেন নাই।..."[২৮]

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন : "কোন কোন ইংরাজের সহিত তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) এতদূর প্রীতি হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে তিনি পরম মিত্র বলিয়া জানিতেন। ইংরাজেরা সচরাচর এদেশীয়দিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাকে যিনি একবার দেখিতেন, তিনিই সম্ভ্রমের সহিত ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার ব্যবহারে এমন একটা আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান থাকিত, এমন একটা নিজ চরিত্রের গুরুত্ব ও গৌরবের জ্ঞান প্রকাশ পাইত, যে, তাঁহারা তাঁহাকে সমুচিত শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহারা দেখিতেন, বিদ্যাসাগর নিঃস্বার্থ পুরুষ, স্বার্থসাধনের মানসে তাঁহাদের দ্বারস্থ হন না, পরার্থের জন্যই তাঁহাদের সাহায্য চান, সুতরাং তাঁহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। দুটি জিনিসকে ইংরাজেরা বড়ই ঘৃণা করেন, প্রথমতঃ স্বার্থসাধনার্থ বন্ধুতা, দ্বিতীয় 'না' বলিবার সাহসের অভাব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রে উক্ত উভয় দোষের কোনটিই ছিল না। তাঁহার মত নিঃস্বার্থ প্রকৃতির পুরুষ অতি অলপই দেখা গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ তিনি সততই 'না' কথাটা বলিতে সাহসী হইতেন। এজন্য ইংরাজগণ তাঁহাকে সমুচিত শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহার সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিতেন।

তাঁহাদের সহিত মিশিবার সময়ে তিনি পূর্ণ মাত্রায় আত্ম-সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতেন।"[২৯]

রজনীকান্ত গুপ্ত লিখেছেন : "পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষা হইলে বা রাজদ্বারে কিয়দংশে প্রতিপত্তি ঘটিলে, এখন আমাদের মধ্যে অনেকে জাতীয়ভাব বিসর্জ্জন দিয়া, বিজাতীয় ভাবেরই পরিপোষক হইয়া উঠেন! তাঁহারা আপনাদের অহঙ্কারে আপনারাই স্ফীত হইয়া, আপনাদের কার্য্যে আপনাদিগকেই গৌরবান্বিত মনে করিয়া, সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের হিতৈষিতা থাকিতে পারে, ভূয়োদর্শন থাকিতে পারে, কার্য্যপটুতা থাকিতে পারে; কিন্তু একমাত্র বৈষম্যবুদ্ধির বিপত্তিপূর্ণ তরঙ্গাঘাতে তৎসমুদায়ই বিজাতীয় ভাবের অতল সাগরে নিমজ্জিত হইয়া যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহাদের—এই পরমুখাপেক্ষী, পরানুগ্রহপ্রার্থী, শিক্ষিত পুরুষগণেরও শিক্ষার স্থল। তিনি ধুতি চাদর পরিয়া, পূর্ব্বতন লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর হালিডে সাহেব, বীডন সাহেব প্রভৃতির সহিত দেখা করিতে যাইতেন। কথিত আছে,—বীডন সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধুতি চাদর দেখিয়া, সময়ে সময়ে বিরক্ত হইতেন। একদা গ্রীষ্মকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের সহিত দেখা করিতে গিয়া দেখেন যে, সাহেব গ্রীষ্মাতিশয্যে পাজামা ও পাতলা কামিজ পরিয়া রহিয়াছেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এখন ইচ্ছা হয়, তোমাদের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করি।" বিদ্যাসাগর মহাশয় গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,—"তাহাই কেন করুন না।" উত্তর শুনিয়া লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বলিলেন,—"ওরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করা আমাদের দেশাচার-বিরুদ্ধ—দেশাচার বিরুদ্ধ কাজ কেমন করিয়া করি।" এবার বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের তেজস্বিতার সহিত অপূর্ব্ব অভিমানের আবির্ভাব হইল। স্বদেশীয় ভাবের প্রাধান্য-রক্ষার জন্য পুরুষসিংহ, লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরকে অম্লানবদনে কহিলেন,—"আপনাদের বেলা দেশাচার প্রবল—আর আমাদের বেলা কিছুই নয়; আপনারা এরূপ মনে করেন কেন?"* জাতীয়গৌরব রক্ষার্থী মহাপুরুষ বঙ্গের শাসনকর্ত্তার সমক্ষে এইরূপ স্বাধীনভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। এইরূপ স্বাধীনভাবের বলেই তাঁহার মহত্ত্ব অক্ষুণ্ণ, তাঁহার সম্মান অব্যাহত, তাঁহার প্রাধান্য অপ্রতিহত থাকিত। পাশ্চাত্য ভাবের প্রবাহে যে দেশ প্লাবিত হইয়াছে—পাশ্চাত্য রীতি-নীতির অপকৃষ্ট ছায়া যে দেশের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়াছে—পরানুগত্যে, পরপরিতুষ্টির আগ্রহে যে দেশ ক্রমে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, সেই দেশের একজন ব্রাহ্মণ যেরূপ স্বাধীনভাবে, যেরূপ তেজস্বিতাসহকারে, প্রধান রাজপুরুষগণেরও সমক্ষে জাতীয় ভাবের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই স্বাধীন ভাব ও তেজস্বিতার কথা, চিরকাল এই শোচনীয়ভাবাপন্ন ভূখণ্ডের শোচনীয় দশাগ্রস্ত জীবদিগকে উপদেশ দিবে।"[৩০]

শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য লিখেছেন : "লর্ড ডফরিণ যখন বড়লাট সেই সময় একদিন আমাদের দেশের কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান।...এই সময়ে অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কয়েকজনের

---

* এই গল্পটি শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর "সেকাল আর একাল" হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। লিখনভঙ্গীতে বোধ হয়, রাজনারায়ণবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়াই গল্পটি লিখিয়াছেন।

বিলাতী পরিচ্ছদ দেখিয়া বড়লাট ডফরিণ বিরক্ত হইয়া অনেক তিরস্কার করেন। মান খুঁজিতে গিয়া মুখের উপর ইহারা এইরূপ তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসেন। সহরময় মহা গোলযোগ। সর্ব্বত্রই সেই কথার আন্দোলন, আলোচনা চলিতে লাগিল। ক্রমে এ কথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্রুতিগোচর হইল। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, যে কথা বলিলেন ঠিক্ সে কথা বলার আবশ্যক নাই, যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে, "ইহারা যায় কেন? যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। যাওয়াই বা কেন, অপমান বোধ করাই বা কেন?" এই উপলক্ষে নিজ জীবনের এক দিনের গল্প বলিয়াছিলেন। হালিডে সাহেব যখন ছোট লাট, তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন প্রতি সপ্তাহে একদিন করিয়া তিনি সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। এই সাধারণ সাক্ষাতের দিন ছোট বড় কত লোকই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সাধারণ সাক্ষাতের দিনেই এক দিবস হালিডে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আহবান করিয়া পাঠান। শিক্ষাবিভাগ সম্বন্ধে কোন বিশেষ পরামর্শ জন্য হালিডে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আহবান করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিরূপিত সময়ে উপস্থিত হইয়া দেখেন, অপেক্ষা করিবার বৃহৎ ঘরে লোকে লোকারণ্য, কত রাজা মহারাজা, কত বিদ্বান বুদ্ধিমান, কত ধনী মানী লোক সমবেত। উহারি ভিতর আবার দুইদল হইয়া বসিয়া আছেন। একদিকে বনিয়াদি ধনীর দল, অপর দিকে অন্য লোক। বিদ্যাসাগর মহাশয় উপস্থিত হইয়া একটু গোলে পড়িলেন। সকলেই তাঁহার পরিচিত। তিনি কোথায় বসেন। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া গরিবের দলেই বসিলেন। অমনি অপর দলের একজন আসিয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া নিজের কাছে লইয়া বসাইলেন। বসিয়া তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা কখন আসিয়াছেন। কেহ বলিলেন এক ঘণ্টা, কেহ দুই ঘণ্টা, কেহ তিন ঘণ্টা, কেহ বা বলিলেন গত সপ্তাহ বসিয়া বসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। কেহ বলিলেন দুই সপ্তাহ আসিয়া ফিরিয়াছেন। কেহ তিন সপ্তাহ। এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ আগমন বার্ত্তা কাগজে লিখিয়া চাপরাশী দ্বারা সাহেবের গোচরে আনিলেন। অমনি হালিডে সাহেব চাপরাশী দ্বারা তাঁহাকে সেলাম দিলেন। চাপরাশী আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট দাঁড়াইয়া বলিল "লাটসাহেব সেলাম দিয়া।" যে ব্যক্তি তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত কথা কহিতে ছিলেন, বলা বাহুল্য তিনি সহরের একজন তদানীন্তন জনৈক সম্ভ্রান্ত পদস্থ লোক, তাঁহার নাম করিব না। তিনি মনে করিলেন তাঁহাকেই লাটসাহেব ডাকিয়াছেন; উঠিতেছেন অমনি চাপরাশী বলিল "আপকো নাহি, পণ্ডিত সাহেবকো।" ভদ্রলোকটী বড়ই অপ্রতিভ হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষুণ্ণমনে লাট সদনে গিয়াই প্রথম কথা জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি এই সকল আমাদের সমাজের সম্ভ্রান্ত লোককে এত কষ্ট দেন কেন?" তদুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা শুনিলেন তাহাতে তাঁহার জ্ঞান লাভ হইল। হালিডে সাহেব বলিলেন "ইহারা আসে কেন? আমি ইহাদিগকে ডাকিতে যাই নাই। ইহারা যদি পাঁচদিন সাক্ষাৎ না করিতে পাইয়া ফিরিয়া যায় আবার ষষ্ঠ দিবস আসিবে। কিন্তু আপনাকে যদি আর পাঁচ মিনিট দেরি করাইতাম তাহা হইলেই বোধ করি আপনি ফিরিয়া যাইতেন, আর ডাকিলে আসিতেন না, এই তফাৎ।" তাই ডফরিণ সাহেবের নিকট অপমানিত লোকদের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন "ইহারা যায় কেন?" ইহা সাহেবদেরই কথা।

আপনার মান আপনার ঠাঁই। মান রাখিতে না জানিলেই অপমানিত হইতে হয়। প্রসঙ্গচ্ছলে বিদ্যাসাগর মহাশয় মাননীয় শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহোদয়ের একটী গল্প সর্ব্বদাই বলিতেন। স্বর্গীয় শম্ভুনাথবাবু একদিন হাইকোর্টের একজন জজ সাহেবের নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় চাপরাশী আসিয়া সাহেবের হাতে একখানি কার্ড দিল। সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া অভদ্রোচিত গালিগালাজ করিয়া চাপরাশিকে বলিলেন "বোলোযাকে ফুরশুৎ নাহি হায়।" চাপরাশী সাহেবের মেজাজ জানিত, সেকথা আগন্তুককে না বলিয়া সাহেবের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে। ক্ষণকাল পরে সাহেবের নজর পড়িল, সাহেব বিরক্তি-সহকারে বলিলেন "আনে বোলো"। চাপরাশী দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া আগন্তুককে ঘরে প্রবেশ করাইতে না করাইতে সাহেব স্বয়ং দ্রুতপদে গিয়া সাদর অভ্যর্থনা করিলেন, দুই হাতে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া নিজাসনের একাংশে উপবেশন করাইলেন। তখন স্বর্গীয় শম্ভুনাথবাবু দেখিলেন আগন্তুক অপর কেহ নহেন, তাঁহারই বন্ধু সদর দাওয়ানি আদালতের প্রধান উকিল মুনসি আমির আলি সাহেব। শম্ভুনাথবাবু বিদায় হইলেন। বিদায়কালে শুনিতে লাগিলেন জজ সাহেব মুন্সি মহাশয়ের নিজের ও বাটীর পরিজন বর্গের কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যিনি একমুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যাঁহার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া অসাক্ষাতে অভদ্রোচিত গালিগালাজ করিয়াছিলেন, তিনি সাক্ষাতে এত আপ্যায়িত করিতেছেন। শুনিতে শুনিতে পণ্ডিতমহোদয় বিদায় হইলেন। সেই অবধি শম্ভুনাথবাবু নাকি আর কখন কোন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহেবদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা উঠিলেই এই গল্পটী করিতেন। যাঁহার নিজ মর্য্যাদা রক্ষা করা আবশ্যক তিনি কেন এইরূপে অপমানিত হইতে যাইবেন। তাই তিনি বলিয়াছিলেন "ইহারা যায় কেন?" "ইহারা যায় কেন" একথা লোভ-লালসাহীন, সাংসারিক-দুরাশা-বিহীন বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝিবেন কেন?"[৩১]

এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "আমাদের দেশে প্রায় অনেকেই নিজের এবং স্বদেশের মর্যাদা নষ্ট করিয়া ইংরাজের অনুগ্রহ লাভ করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সাহেবের হস্ত হইতে শিরোপা লইবার জন্য কখনো মাথা নত করেন নাই; তিনি আমাদের দেশের ইংরাজপ্রসাদগর্বিত সহেবানুজীবীদের মতো আত্মাবমাননার মূল্যে বিক্রীত সম্মান ক্রয় করিতে চেষ্টা করেন না।"[৩২]

এখানে বলে রাখা ভালো, তিনজন সাহেবের প্রতি বিদ্যাসাগর অসামান্য শ্রদ্ধাশীল : মার্শাল, ময়েট ও বেথুন। বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সহোদর শম্ভু-চন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "কোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ জি, টি, লেজার মার্শেল সাহেব, শিক্ষাসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষ ডাক্তার ময়েট সাহেব, শিক্ষাসমাজের প্রেসিডেণ্ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেব ইহাঁরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং ইহাঁরা তিনজনেই তাঁহার উন্নতি, প্রতিপত্তি ও মানসম্ভ্রমের আদি কারণ, এই জন্য অগ্রজ (বিদ্যাসাগর) ইহাঁদের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করাইয়া কলিকাতার বাদুড় বাগানের বাটীতে রাখিয়াছেন। প্রত্যহ উক্ত প্রতিমূর্ত্তি একবার না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না।"

বিদ্যাসাগরের প্রতি অসামান্য শ্রদ্ধাশীল হয়েও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বিদ্যা-সাগরের মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে দু-একটি অন্যায় অভিযোগ করেছেন।

কোনো সন্দেহ নেই, বিদ্যাসাগর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একথা উল্লেখ করা আবশ্যক যে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের প্রতি একদা বিদ্যাসাগর বিরূপ না হয়ে পারেননি। এবং সে-বিষয়ে সমস্ত ভুল, সমস্ত দোষ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের। পরবর্তীকালে সেকথা মনে করে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছেন।

উত্তরকালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সবিনয়ে বলেছেন : "তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক।...১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আমি প্রেসিন্ডেসি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হই। কি কুক্ষণে আমি অল্পকাল পরেই তাঁহার বিরাগ ভাজন হইলাম! যখনই মনে হয় তখনই আমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হই।...আমার অসংযত চিত্তবৃত্তি কিসের নেশায় নাচিয়া উঠিয়াছিল? পরিণীত শিক্ষিত যুবক কেন দারান্তরগ্রহণের জন্য আত্মহারা হইল? আমার সম্বন্ধে চারিদিকে অনেক কথা রটিল; শেষে বিদ্যাসাগর একদিন আমায় বলিলেন—'আমার বন্ধুবান্ধব আমায় কি বলে জানিস্? তুই আমার কথা শুনিস্, চিরকাল তুই আমার বাধ্য, আমি যদি তোকে এই বিয়ে করতে বারণ করি, তা' হ'লে তুই শুন্‌বি আমার কথা।' আমি অম্লান বদনে উত্তর দিলাম—'আপনি কেন তাঁদের বলেন না যে, আমি আপনার কথা না শুনতে পারি; আমি আপনার অবাধ্য।' তিনি আর কিছু না বলিয়া গম্ভীরভাবে চলিয়া গেলেন। তাঁহার দৃঢ়প্রতীতি জন্মিল, আমি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলাম। কিন্তু এই ঘটনার পরে আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি—বিদ্যাসাগর বন্ধুর মত, উপদেষ্টার মত, সোজা কথা বলিয়াছিলেন; বাস্তবিক সমস্ত দোষ, সমস্ত ভুল আমারই।"[৩৩]

এগারো

আবার স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। বালিকা-বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে, সন্দেহ নেই, ছোটোলাট থেকে আরম্ভ করে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত সকলেই একটি ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করেছেন। ১৮৫৮ সালের ২৭-নভেম্বর ছোটোলাট ভারত-সরকারকে আদ্যন্ত ঘটনা সবিস্তারে নিবেদন করলেন। চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি :

"The Lieutenant-Governor desires to submit the explanation of the Pandit for indulgent consideration, as it appears he has been acting under a misconception. It appears that previous to the application made to the Government of India in my letter of the 13th April last for sanction to grant to 26 female schools recommended by the Pandit and the Director of Public Instruction, which application was not complied with, four grants on similar terms had been sanctioned by the Lieutenant-Governor on the 21st October 1857 under a mistaken view of his authority. This was afterwards overlooked by the Lieutenant-Governor and the irregularly sanctioned grants to these schools continuing uninterrupted, seemed, not unreasonably, to have led the Pandit to suppose that all other such schools would receive grants on similar terms. This must have fully excused him for continuing to recommend grants to schools of a similar kind, but the question still remains why did the Pandit set the schools going and incur expense for their establishments before he had received sanction for them from Government. This question the Pandit has not answered, but he might have submitted a not unreasonable excuse for his irregularity had he stated that the wording of his application always expressed that the schools about which he wrote had been established, and specified the dates on which they had each been opened. And the Director of Public Instruction understood this as requiring retrospective sanction and so entered it in his prescribed tabular statement. But this was undoubtedly overlooked when my letter was written dated 13th April last. There has been evidently a general misconception about these grants. For some time the Lieutenant-Governor was under the impression that he could sanction them himself and when he became better informed he found that it was little more than a form to send them up the Supreme Government to for sanction, believing that the Supreme Gov-

ernment was certain to approve and sanction them and to applaud all extension of such female schools, especially when established at the desire of the people themselves and partly at their expense. This useful view naturally commended itself to the Lieutenant-Governor's subordinates so that the Pandit thought he could not please the Government better than by encouraging female schools; and the Director of Public Instruction supposed he had only to sanction a recommendation to aid a promising girls' school and it was sure to be sanctioned. The Lieutenant-Governor states all this merely as a fact without attempting to defend or extenuate the error into which he himself, not less than his subordinates, is shown to have fallen. But he trusts it may be viewed indulgently, all the circumstances having been considered." ১

ভারত-সরকার বালিকা-বিদ্যালয়গুলোর জন্য কোনো মাসিক সাহায্য মঞ্জুর করেনি, কিন্তু ওই প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা মঞ্জুর করেছে। ভারত-সরকার লিখেছে :

"It is to be regretted that the Pandit's scheme of opening female schools on a plan opposed to the orders of the Hon'ble Court, but in the name of the Government and in anticipation of sanction, should not have been discouraged at once. As it is evident, however, that the Pandit acted in good faith, and with the encouragement and approbation of his superiors, His Honour in Council is pleased under all circumstances, to relieve him from responsibility for the sum of Rs. 3,439-3-3 actually expended on these schools, and to direct that it be paid by the Government.

With regard to the future the President in Council observes that, so far as can be gathered from these papers, there is no security for the permanent character of any of the schools, and that the only sound material guarantee for their success, namely the voluntary support of the neighbourhood, is wholly wanting. It is not even stated that school houses have been built. Not an argument is brought forward to shake the decision of the Government of India already taken, that the main principle of the grant-in-aid rules shall not be relaxed in favour of these female schools. If keen and anxious hopes really exist, a small monthly payment is no very violent test of them.

With reference to the above considerations and to paragraph 38 of the Hon'ble Court's despatch, dated the 22nd June last, the President in Council must decline to give his sanction

to the grant of any public money for the continued support of the female schools opened by Pandit Ishwarchandra, or for the establishment of the Government schools it is proposed to set up in their stead. The correspondence will be forwarded for the consideration of the Rt. Hon'ble the Secretary of State, with a recommendation that a grant not exceeding Rs. 1,000 per mensem may be made for the establishment of female schools in Hughli, Bardwan, and the 24-Parganas, a portion to be expended in assisting such schools as were established by Pandit Ishwarchandra Sharma, and a portion on a few model schools to be supported by the Government." [২]

১৮৫৯ সালের ১-আগষ্ট 'সোমপ্রকাশ' লিখেছে :

"শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা দেশের ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টেনণ্ট গবর্ণর হেলিডে সাহেবের অনুমতি লইয়া বর্দ্ধমান, হুগলী প্রভৃতি কতিপয় স্থানে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। হেলিডে সাহেব অগ্রে এ বিষয়ে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের মত জিজ্ঞাসা করেন নাই। এই হেতু উক্ত বিদ্যালয় সকলের নিয়োজিত লোকদিগের বেতন দান কাল উপস্থিত হইলে তুমুল গোলযোগ উপস্থিত হয়। সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টেরও ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষের মত-গ্রহণ নিরপেক্ষ হইয়া নূতন বিষয়ে ব্যয়দানের ক্ষমতা নাই। সুতরাং তাঁহারাও বালিকা বিদ্যালয়ের স্থায়িতা বিষয়ে মতপ্রদান করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহারা তৎকালে বিদ্যালয় সকলের নিয়োজিত লোকদিগের কয়েক মাসের বেতন দিবেন স্বীকার করিলেন এবং ইহাও স্বীকার করিলেন ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ বালিকা বিদ্যালয় বিষয়ে যাহাতে মাসিক সহস্র মুদ্রা ব্যয় দান করেন, তাঁহারা সে চেষ্টা করিবেন।...এক্ষণে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ অর্থের অসঙ্গতি বলিয়া মাসিক সহস্র মুদ্রা ব্যয়দান প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন নাই।

এই কথায় আমাদিগের একটী গল্প স্মরণ হইল। একদা এক ব্রাহ্মণ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের আলয়ে অতিথি হইয়াছিলেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন অতিশয় কৃপণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি অতিথি ব্রাহ্মণের পাকের নিমিত্ত কাঁচা কাষ্ঠ, মোটা চাউল এবং একটী পোকাখেগো ক্ষুদ্র বেগন দিলেন। ব্রাহ্মণ বহু কষ্টে অন্ন প্রস্তুত করিয়া বেগনটি দগ্ধ করিবার নিমিত্ত চুল্লীতে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু উহা অবিলম্বে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন ব্রাহ্মণ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন—

"কীটাকুলিতবার্ত্তাকুঃ ক্ষুদ্রাখুবৃষণোপমা।
পঞ্চাননাৎ বিনিষ্ক্রান্তা ন নিষ্ক্রান্তা হুতাশনাৎ ॥"

ক্ষুদ্রাখুবৃষণসদৃশ কীটাকুলিত এই বার্ত্তাকু যদিও বহু কষ্টে পঞ্চাননের হস্ত হইতে বিনিঃসৃত হইল, কিন্তু হুতাশন হইতে বহির্গত হইল না। বালিকা বিদ্যালয় বিষয়েও ঐরূপ ঘটনা হইয়াছে। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের বিদ্যা-শিক্ষাবিষয়ে মাসিক সহস্র মুদ্রা দান অতি সামান্য কথা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনেক কষ্টে সেই সামান্য বিষয়ে অত্রত্য সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের যদিও মত করিলেন কিন্তু ইংণ্ডলীয় কর্ত্তৃপক্ষ তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিলেন না।...

হেলিডে সাহেব অগ্রে উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষের মত গ্রহণ না করিয়া কিরূপে এরূপ বিষয়ে মত প্রদান করিলেন এবং বিদ্যাসাগর বিষয়কর্ম্মে দক্ষ হইয়াও সবিশেষ না জানিয়া শুনিয়া কিরূপেই বা এরূপ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন, অনেকে একথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে এই উত্তর দিতে পারি, হেলিডে সাহেবের কাজের গতি এইরূপই ছিল। তিনি অগ্রে ভাবিয়াচিন্তিয়া প্রায় কোন কর্ম্ম করিতেন না। তাঁহার যখন যেমন, তখন তেমন ছিল। বিদ্যাসাগর তাঁহার নিকটে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি অনুমতি দিলেন। বোধহয়, তৎকালে তিনি এই বিবেচনা করিয়াছিলেন আমি হেলিডে সাহেব, বাঙ্গলাদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর, ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ আমার বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া আমার নিমিত্তই এই পদ নূতন স্থাপন করিয়াছেন, আমি এত বড় লোক হইয়া যদি বিদ্যাসাগরের কৃত প্রস্তাবে অনুমতি না দি, তাহা হইলে আমার মান থাকে কই, বিদ্যাসাগরই বা কি মনে করিবেন। মনোমধ্যে এইরূপ অভিমানের উদয় হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিয়া ফেলিলেন। স্বদেশের হিতানুষ্ঠান প্রসঙ্গ হইলে বিদ্যাসাগরেরও কিছু জ্ঞানগম্য থাকে না। রীতিমত কাজ হইল কি না, তিনিও তাহা বিবেচনা করিলেন না। তাড়াতাড়ি কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বসিলেন। বোধ হয়, এমন স্থলে কাহারও সংশয় জন্মে না। লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর যখন আদেশ করিতেছেন, তখন তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা কি? যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের মনে এতদিন এই আশা ছিল, ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের স্থায়িতাসম্পাদনের সদুপায় করিয়া দিবেন। এক্ষণে সে আশা উন্মূলিত হইল। তিনি এই সমাচার শুনিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইবেন সন্দেহ নাই।"

গবর্ণমেণ্ট মাসিক সাহায্য দিল না, বিদ্যাসাগর তবু নিরস্ত হলেন না। বালিকা-বিদ্যালয়গুলি চালানোর জন্য তিনি একটি নারীশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার খুললেন; তাতে নিয়মিত চাঁদা দিতে লাগলেন কয়েকজন মান্যগণ্য ভদ্রলোক। সেই চাঁদার টাকায় বিদ্যাসাগর বালিকা-বিদ্যালয়গুলি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন।

১৮৬২ সালের ৯-জুন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখেছে :

"Since the crash of '57, no Department of the State received a greater blow than the Education Department. . . .The Department was literally dying every inch out of sheer starvation. Grants to aided school were in some cases withdrawn, and in many instances refused. . . . The energetic Vidyasaghur alone established some forty-three Female Schools, and kindred spirits were working in equal earnest. But the refusal of aid strangled Vidyasaghur's institutions at their very birth, and only nine schools survived out of the immense number of forty-three, and these owing to the princely support of the lamented Countess Canning, Rajah Pertaub Chunder Sing, and a few such like spirits. The time has however now come for the revival of the schools. Thanks to the financial skill and statesmanship of Mr. Laing, the Government is now

in a position to spend a fair share of public money for maintenance of female schools. We understand that Vidyasaghur has obtained aid for his nine schools. . . .

His immense personal influence and good repute only enabled him after unremitting struggle to keep on the nine surviving schools by private subscriptions but will he dare to revive his forty-three schools under the present rule of half subscriptions and half grant? And if it were enquired as to who his supporters were, it would be found we believe that most of them were Calcutta men, either officials or wealthy Natives. But every man in the country is not a Vidyasaghur. . . ."

১৮৬১ সালের ১-আগস্ট উদয়গঞ্জে প্রতিষ্ঠিত একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য গবর্নমেণ্টের কাছে বিদ্যাসাগর সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। ইনস্পেক্টর, ১৮৬২ সালের ২-জুন, সেই আবেদনপত্র সুপারিশ করেছেন। মাসিক চোদ্দ টাকা সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হয়েছে।[৩]

১৮৫৮ সালের ২-মার্চ উদয়রাজপুরে প্রতিষ্ঠিত একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য গবর্নমেণ্টের কাছে বিদ্যাসাগর সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। ইনস্পেক্টর, ১৮৬২ সালের ১৩-জুন, মন্তব্য করেছেন :

. . . "There is no similar school within six miles of Udayrajpur. I recommend the grant. I notice, however, that it is proposed to re-place a subscription of Rupees 24 by half that sum as subscription, and half as Government aid. I believe that the death of lady Canning has had a disastrous effect on the subscription list, to which her ladyship was the chief contributor. . . ."

মাসিক বারো টাকা সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হয়েছে।[৪]

১৮৫৮ সালের ১-এপ্রিল বীরসিংহে প্রতিষ্ঠিত একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য গবর্নমেণ্টের কাছে বিদ্যাসাগর সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। ইনস্পেক্টর, ১৮৬২ সালের ১৩-জুন, মন্তব্য করেছেন :

"The residence of Pundit Eshwar Chunder Shurma is at Beersingha, and I consequently recommend that aid may be given to this school. . . ."

মাসিক বারো টাকা সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হয়েছে।[৫]

১৮৫৮ সালের ২৬-এপ্রিল রসুলপুরে প্রতিষ্ঠিত একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য গবর্নমেণ্টের কাছে বিদ্যাসাগর সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। ইনস্পেক্টর, ১৮৬২ সালের ১৪-জুন, সুপারিশ করেছেন। মাসিক দশ টাকা সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হয়েছে।[৬]

১৮৫৮ সালের ১-নভেম্বর গোবিন্দপুরে প্রতিষ্ঠিত একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য গবর্নমেণ্টের কাছে বিদ্যাসাগর সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। ইনস্পেক্টর, ১৮৬২ সালের ১৪-জুন, সেই আবেদনপত্র সুপারিশ করেছেন। মাসিক চোদ্দ টাকা সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হয়েছে।[৭]

১৮৬১ সালের ১-জানুআরি কুরানে প্রতিষ্ঠিত একটি বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য গবর্নমেণ্টের কাছে বিদ্যাসাগর সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। ইনস্পেক্টর, ১৮৬২ সালের ১৪-জুন, লিখেছেন :

"Pundit Eshwar Chunder Shurma stated that the three schools of Beersingha, Kooran, and Oodoygunge, are within a mile of each other. Beersingha is the Native place of Pundit Eshwar Chunder Shurma, and I presume he would wish to have a School for Girls there. . . ."

মাসিক চোদ্দ টাকা সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হয়েছে।[৮]

১৮৫৯ সালের ১-ফেব্রুআরি রিষড়ায় প্রতিষ্ঠিত একটি বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য গবর্নমেণ্টের কাছে বিদ্যাসাগর সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। ইনস্পেক্টর, ১৮৬২ সালের ১৭-জুন, লিখেছেন :

"Rishirah is from Konnogar about a mile and a half. It cannot be more, for Konnogar is only four miles from Serampore, and Boyheera is much nearer to Konnogar than it is to Serampore. However, as little girls cannot go a mile to school, and as the application comes from Pundit Eshwar Chunder Bidyasagur I recommend that the six mile Rule be suspended, and an aid of Rupees 12 be granted. The Director of Public Instruction will decide whether the substitution of an aid of Rupees 12, and a subscription of Rupees 12, in the place of a subscription of Rupees 23, is opposed to the principle that Government aid should not take the place of private liberality (see Grant-in-aid Rules of 1855, Clause VI). From the designation of the School, I conclude that the intention is to exclude Mahomedan and Christian Girls. In clause VII of the Grant-in-aid Rules, it is said that "Grants-in-aid will be awarded only on the *principle of perfect religious neutrality.*"

মাসিক বারোটাকা সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হয়েছে।[৯]

বিদ্যাসাগর, ১৮৬২ সালের ১৫-আগস্ট, বেঙ্গল গবর্নমেণ্টকে লিখেছেন :

"With reference to the orders of Government of the 30th June, and 1st, 2nd, and 10th July last, sanctioning Grants-in-aid of seven Female Schools in Hooghly and Burdwan, I have the honour to submit that, in the letter which accompanied my applications for aid, I solicited that the same might commence from May last, and, in anticipation of orders, entertained the requisite establishments in those Institutions from the beginning of that month.

As for want of other funds it will be difficult to meet this expenditure; if the Grants were to commence only from the respective dates of sanction, I have the honour respect-

fully to solicit that the orders in question may be allowed to have retrospective effect from the 1st of May last." ১০

এ-বিষয়ে ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন, ১৮৬২ সালের ১৯-সেপ্টেম্বর, মন্তব্য করেছেন :

"... as it appears that Pundit Eshwar Chunder Shurma solicited in his original application that the Grants to the Girls' Schools referred to might be sanctioned with effect from 1st May 1862, and as he entertained the necessary Establishments in anticipation of the Government sanction, I recommend that his request be complied with." ১১

গবর্নমেণ্ট বিদ্যাসাগরের প্রার্থনা পূর্ণ করেছে। আলোচ্য সাতটি বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ১৮৬২ সালের ১-মে থেকে সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হয়েছে।[১২]

অবস্থার ক্রমশ উন্নতি হয়েছে। এ-বিষয়ে স্যর বার্টল ফ্রিয়ারকে লেখা বিদ্যাসাগরের ১৮৬৩ সালের ১১-অক্টোবরের একখানা চিঠি থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি :

"You will no doubt be glad to hear that the Mufussil Female schools, to the support of which you so kindly contributed, are progressing satisfactorily. Female education has begun to be gradually appreciated by the people of districts contiguous to Calcutta, and schools are being opened from time to time." ১৩

বিদ্যাসাগর মনে-প্রাণে চেয়েছেন, এ-দেশের মেয়েরা শিক্ষিতা হয়ে উঠুক। মনে-প্রাণে যা চেয়েছেন তা সফল করার জন্য বিদ্যাসাগর চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি।

আগেই বলা হয়েছে, ১৮৫৬ সালের শেষার্ধে বিদ্যাসাগর বেথুন-স্কুল-কমিটির সেক্রেটারি হয়েছেন। ১৮৬২ সালের ১৫-ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর বাঙলা সরকারকে বেথুন স্কুল সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। রিপোর্টটি এখানে তুলে দিচ্ছি :

"Reading, writing, arithmetic, biography, geography, and history of Bengal, with gallery lessons on objects form the course of study. Needle-work and sewing are likewise taught. Instruction is imparted to the pupils through the medium of the Vernacular. The tutorial staff consists of a Head Mistress, with two female assistants and two pandits. Besides general superintendence, the Head Mistress teaches needle-work to the first and second classes, and revises the lessons given to them by the pandits. The second mistress teaches needle-work and sewing to the remaining classes, assisted by the third mistress. The third mistress teaches in addition the class consisting of beginners in which the phonetic system is being

experimentally introduced. The Pandits teach all the books read in the several classes. . . .

As regards the number of admissions, the committee beg to observe that there has been a steady increase from 1859. The number at present on the rolls is ninety-three. It would have exceeded 100 ere this, if the committee had not been obliged to reject applications for admission for some time from want of the means of conveyance. The inconvenience has since been removed by the provision of a third carriage, and it is hoped that the anticipated increase will soon take place. It may be as well to mention, with reference to this third conveyance, that, Rajah Pratap Chandra Singh Bahadur presented an omnibus, and that some of the members of the committee, and a few other native friends of female education, subscribed for a pair of horses. . . .

As regards the proficiency attained by the first class, the committee regret to observe that, owing to early withdrawals, the majority of the pupils are unable to prosecute their studies up to the desired standard. In cases, however, where girls are admitted at an early age, and permitted to remain at school till the age of eleven or twelve, they attain a fair amount of knowledge in the different subjects taught.

From the manner in which the number of admissions has recently gone on increasing, the committee trust that the institution is rising in the estimation of those classes of the community for whose benefit it was originally established. The wealthier classes of native gentlemen do not indeed seem as yet to be availing themselves directly of the advantages offered by the school ; a very few admissions have as yet been made from those classes. The Committee, however, are happy to believe that home education for females is being resorted to in many families amongst the wealthier classes; and this result, they believe, is in a considerable degree owing to the beneficial influence of the Bethune School.

If a large number of conveyances were at the disposal of the committee, the school might be made more extensively useful. It will be understood, however, that if the number of children should exceed a certain limit, increased resources will then be required in order to supply an extra staff of instructors, &c. . . ." [১৪]

বিদ্যাসাগর, ১৮৬৩ সালের ৫-মার্চ, (বিদ্যাসাগর তখন বেথুন স্কুল

কমিটির অনারারি সেক্রেটারি), বেঙ্গল গবর্নমেণ্টের জুনিয়ার সেক্রেটারিকে একখানা চিঠি লিখেছেন :

"With reference to the remark contained in paragraph 6 of your letter No. 3100, dated the 29th December last, to the effect that applications for admission ought not to have been rejected by the Bethune School Committee for want of conveyance, as the Rules declare that parents are expected to send their children to school, and that conveyances are kept up only for those who cannot afford for them, I am directed by the committee to explain, for the information of His Honor, that due enquiry was made whether the applicants were willing to send their children to school at their own expense, and that it was only in cases, when it was ascertained that they were not, that their applications were rejected. This practice, the Committee think, is sound, as, in their opinion, it would be useless or worse than useless to bring upon the Register the names of girls who, after all, could not be sent for, and would not attend unless they were." [১৫]

বিদ্যাসাগর, ১৮৬৩ সালের ৭-মার্চ, (বিদ্যাসাগর তখন বেথুন স্কুল কমিটির অনারারি সেক্রেটারি) বেঙ্গল গবর্নমেণ্টের কাছে প্রস্তাব করেছেন :

"A Revision of the Establishment and charges of the Bethune School being, in the opinion of the committee, absolutely necessary for the more efficient management of the Institution, I am directed to submit a revised scale, as per margin, for the sanction of Government. The new scale, it will be seen, involves an additional expenditure of Rupees 7 and annas 8 per mensem, and raises the entire assignment to Rupees 625 per mensem, or Rupees 7,500 per annum, a sum which, although the number of pupils and charges of conveyance have greatly increased, is less than the expenditure in any of the years from 1857 to 1860." [১৬]

	Rs.
Head Mistress ...	200
Second Ditto ...	60
Third Ditto ...	15
Head Pundit ...	30
Second Ditto ...	30
Assistant Secretary ...	30
Durwan ...	6
Bearer ...	5
3 coachmen ...	26
6 Syces ...	30
Mally ...	6
Bheesty ...	5
Sweeper ...	2
Contingencies, including stable expenses, and Wheel, House, and Lighting Taxes ...	180
Total Rupees ...	625

এই প্রস্তাব সম্পর্কে সরকারী আদেশ :

". . . the Lieutenant-Governor is pleased to sanction the revised scale of Establishment proposed by the Committee, with a view to the more efficient management of the Bethune Female School. But, in order to bring the entire charges of the Institution within the monthly Grant of Rupees 617-8 sanctioned by Government for its support, the allowance proposed for contingencies has been reduced to Rupees 172-8 per mensem." [১৭]

বিদ্যাসাগর, ১৮৬৩ সালের ২৮-মার্চ, (বিদ্যাসাগর তখন বেথুন স্কুল কমিটির অনারারি সেক্রেটারি) বেঙ্গল গবর্নমেণ্টের জুনিয়র সেক্রেটারিকে একখানা চিঠিতে লিখেছেন :

"I have the honor to submit a Plan and Estimate prepared by the officiating Executive Engineer for constructing a Coach House and Stable for the Bethune Female School, and to request, as the additional Buildings are urgently required for the accommodation of the third conveyance which has been added to the Establishment of the School, that you will be good enough to obtain the sanction of Government to the required expenditure, which amounts, as per Estimate, to Rupees 1,662."

এই প্রস্তাব গবর্নমেণ্ট অনুমোদন করেছে।[১৮]

গবর্নমেণ্ট ফিমেল নর্মাল স্কুল খোলার কথা বিবেচনা করতে অনুরোধ জানিয়েছে। সেবিষয়ে বিদ্যাসাগর (বিদ্যাসাগর তখন বেথুন স্কুল কমিটির অনারারি সেক্রেটারি), ১৮৬৩ সালের ১৩-জুন, বেঙ্গল গবর্নমেণ্টের জুনিয়র সেক্রেটারিকে একখানা চিঠি লিখেছেন :

"I am directed by the Bethune School Committee to acknowledge receipt of your letter No. 35, dated the 5th January last, requesting them, with reference to a letter from the Director of Public Instruction, and enclosures, to take into their consideration the formation of a Normal Class of Female Teachers in connection with the Bethune School; and in reply beg leave to state that, after mature deliberation, the Committee are of opinion that, under present circumstances, the formation of such a class is scarcely practicable. In order to get admission into respectable families as Teachers, it is necessary that the Female Teachers should be respectable by birth as well as character. But unfortunately there is little or no chance of securing such females to enter the proposed Normal class. It is presumed that the females must be grown up when they become candidates for admission, but, according to the custom of the country, it can hardly be expected that

a respectable woman who has passed the age of twelve can be prevailed upon to attend a School for instruction. The Committee deeply regret that, under the circumstances above set forth, they cannot immediately carry out the wishes of Government. They shall, however, have the subject always in view, and shall try their best to give effect to them as soon as a fitting opportunity offers itself." ১১

বিদ্যাসাগর, ১৮৬৪ সালের ৫-মার্চ, (বিদ্যাসাগর তখন বেথুন স্কুল কমিটির অনারারি সেক্রেটারি) গবর্নমেণ্টের কাছে একখানা আবেদনপত্র দাখিল করেছেন :

"I am directed by the Committee of the Bethune Female School to represent the present state of their pecuniary resources, and to request some slight assistance from Government to enable them to place the School in a more satisfactory footing.

When the salary of the School Mistress was reduced to Rupees 200 a month, it was understood that the Rupees 100 a month thus saved would be devoted to miscellaneous purposes; before that time these had been defrayed wholly by casual benefactions.

The sum, however, thus set apart has proved wholly inadequate for the purpose; indeed the necessary expenses of the School have increased in many directions far more than was anticipated. I am desired to mention, for example, that the Municipal rates and taxes paid by the School alone amount to about Rupees 35 per mensem, or more than five per cent. on their total income.

The present staff of Pundits is inadequate to the proper instruction of the average number of pupils who attend, and an additional Pundit has become necessary. To secure a fit person for this duty a salary of from Rupees 20 to 25 a month will at least be required.

The monthly expenditure scarcely leaves any balance available at the close of the year, and there is great difficulty in providing funds for prizes, etc. The greater part of the expenditure for this purpose was advanced last year by the Head Mistress out of her own resources, and there is still money owing to her on this account. The Committee consider it very desirable that a certain amount, say Rupees 10 a month, be especially set aside for this purpose. They have, however. no means of doing so without an additional grant.

The bulk of the pupils are still the children of parents who, however otherwise respectable, are generally of very

restricted means. Among this class, however, the popularity of the School is annually spreading, and the Committee believe that if they had at their disposal larger means of conveyance that a considerable accession would be secured to the number of pupils.

I am therefore directed urgently to solicit that a sum of Rupees 700 monthly may be granted to the School from the commencement of the new financial year, instead of the sum of Rupees 617-8, which is now contributed by Government." [২০]

কিন্তু এই আবেদন সফল হয়নি। এই আবেদনপত্রের উত্তরে বেঙ্গল গবর্নমেন্টের সেক্রেটারি, ১৮৬৪ সালের ২-জুলাই, বিদ্যাসাগরকে জানিয়েছেন :

". . . His Honor (the Lieutenant-Governor) can hold out no hope of an increase to the grant already allowed by Government. If any further means are required they ought, the Lieutenant-Governor thinks, to be provided by the public, especially that class of the native public which benefits by the Institution, and is well able to contribute towards its support." [২১]

বিদ্যাসাগর, ১৮৬৫ সালের ২৯-জুলাই, বেথুন স্কুল সম্পর্কে (বিদ্যাসাগর তখন বেথুন স্কুল কমিটির অনারারি সেক্রেটারি) গবর্নমেন্টের কাছে একটি রিপোর্ট দাখিল করেছেন। উক্ত রিপোর্টের শেষাংশে বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

"In conclusion, the Committee desire to express their opinion that there is no diminution in the estimation in which this school is held by the Native community. The number of Pupils has increased during the Session, and the small decline in the average attendance is chiefly owing to the Smallpox epidemic raging last year. Applications for admissions came in as before, and the parents and guardians continue to take the same interest in the Institution." [২২]

১৮৬৬ সালের শেষাশেষি মিস মেরী কার্পেণ্টার কলকাতায় এলেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা, ভারতবর্ষের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার হোক। তিনি ভারতবর্ষের একজন বন্ধু।

কলকাতায় এসেই মিস মেরী কার্পেণ্টার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

১৮৬৬ সালের ২৭-নভেম্বর অ্যাটকিনসন সাহেব (ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন) বিদ্যাসাগরকে এ-বিষয়ে একখানা চিঠি লিখেছেন :

"My dear Pandit,

Miss Carpenter whose name you are no doubt acquainted with, is anxious to make your acquaintance and to talk to you

about her projects for furthering Female Education in India; could you come at the Bethune School to meet her on Thursday morning about half past 11 o'clock? I am going to take her there at that time for a first visit which is intended to be quite of a private character, and it would be a good opportunity to introduce you to her. On another occasion I think she will be glad to meet the gentlemen of the committee, but it will be better to defer this till Mr. Seton Karr has returned to Calcutta.

Yours very truly
W. S. Atkinson."[২০]

বেথুন স্কুলে অ্যাটকিনসন সাহেব মিস মেরী কার্পেণ্টারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের আলাপ করিয়ে দিলেন। প্রথম আলাপেই দু-জনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

মিস মেরী কার্পেণ্টার, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে, কলকাতার কাছাকাছি কয়েকটি বালিকা-বিদ্যালয় দেখে এলেন।

মিস কার্পেণ্টার প্রস্তাব করলেন, একদল দিশী শিক্ষয়িত্রী গড়ে তোমার জন্য আপাতত বেথুন স্কুলে একটি মহিলা নর্মাল স্কুল খোলা হোক। মিস কার্পেণ্টারের ওই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন কেশবচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এম, এম, ঘোষ এবং আরো কেউ-কেউ। ১৮৬৬ সালের ১-ডিসেম্বর তাঁরা ব্রাহ্মসমাজে একটি সভার আয়োজন করলেন। মিস কার্পেণ্টারের সঙ্গে তাঁর প্রস্তাব সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হবে সভায়। বিদ্যাসাগরকেও সভায় ডাকা হল।

সেই সভায় একটি কমিটি তৈরি হল। বিদ্যাসাগর সেই কমিটির একজন সভ্য নির্বাচিত হলেন। ঠিক হল, মহিলা নর্মাল স্কুল সম্পর্কে সেই কমিটি গবর্নমেণ্টের কাছে আবেদন করবে।

সভার কাজকর্মে বিদ্যাসাগর সন্তুষ্ট হলেন না, কমিটিতেও নিজের নাম রাখতে রাজি হলেন না। সভায় অবশ্যি বিদ্যাসাগর কিছুই বললেন না। দু-দিন পরে—১৮৬৬ সালের ৩-ডিসেম্বর, বিদ্যাসাগর চিঠি লিখে পাঠালেন :

"Baboos Keshub Chunder Sen, M. M. Ghose and Dijendra Nath Tagore.

Gentlemen,

With reference to the proceedings of the meeting held at the Brahmo Samaj on the evening of last Saturday, resulting in the election of ourselves to form a committee for the purpose of memorialising Government on the subject of the establishment of a Normal School for the training of Female Teachers I have to observe that a question of such vital importance deserves a more serious consideration than was given to it on that occasion. Before any action

was taken, it was, in my opinion, necessary to ascertain the views of such of the leading members of our community as are known to take an interest in the cause of female education. But as they were neither invited to the meeting, nor was their co-operation sought, I do not think it advisable for me to join in the proposed representation to Government. In fact, when I was asked to attend, I was given to understand that a private conference with Miss Carpenter was intended. I had not the remotest idea that the meeting would be formal or that a question of such grave importance would be decided so summarily. As I was thus taken by surprise, I did not feel myself in a position to take part in the discussion or to express my sentiments on the subject. I need hardly add that under the circumstances set forth above, I am under the painful necessity of withdrawing myself from the Committee.

3rd December 1866, I have etc.
Isvar Chandra Sarma." [২৪]

১৮৬৬ সালের ১৪-ডিসেম্বর মিস মেরী কার্পেণ্টারের সঙ্গে উত্তরপাড়া গিয়েছেন বিদ্যাসাগর। মিস মেরী কার্পেণ্টার লিখেছেন :

"On the morning of December 14, I set off to visit the institutions connected with the Hitokorry Shova, or Benevolent Society of Ooterparrah. Our party consisted of Mr. Atkinson, the Director of Public Education, Mr. Woodrow the Inspector, and the celebrated Pundit, Isher Chunder Vidyasager." [২৫]

ফিরতি-পথে একটা দুর্ঘটনা হল, বিদ্যাসাগরের বগী গাড়ি উল্টে গেল। পড়ে গিয়ে যকৃতে দারুণ আঘাত পেলেন বিদ্যাসাগর।

এই দুর্ঘটনা নিয়ে কবিয়াল ধীরাজ একটি গান বেঁধেছেন :

"অতি লক্ষ্মী বুদ্ধিমতী এক বিবি এসেছে,
ষাট বৎসর বয়স তবু বিবাহ না করেছে,
করে তুলছে তোলাপাড়ী, এবার নাইকো ছাড়াছাড়ি,
মিস্ কার্পেণ্টার সকল স্কুল বেড়িয়ে এসেছে।
কি মান্দ্রাজ কি বোম্বাই সবই দেখেছে,
এখন এসে কল্‌কেতাতে (এবার) বাঙ্গালীদের নে পড়েছে।
উত্তরপাড়া স্কুল যেতে, বড়ই রগড় হলো পথে,
এট্‌কিন্‌সন্‌ উড্রো আর সাগর সঙ্গেতে।
নাড়া চাড়া দিলে ঘোড়া মোড়ের মাথাতে,
গাড়ী উল্‌টে পল্লেন সাগর, অনেক পুণ্যে গেছেন বেঁচে।"[২৬]

উত্তরকালে বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "বিদ্যাসাগর মহাশয় গাড়ী হইতে পড়িয়া অচেতন অবস্থায়, ঘোড়ার পায়ের

নিকটে ভূমিতে নিপতিত ছিলেন। তথায় উপস্থিত দর্শকগণের মধ্যে কেহ সাহস করিয়া সেই স্থান হইতে ঘোড়াকে সরান নাই। স্কুল ইনস্পেক্টার উডরো সাহেব ও বিদ্যালয়সমূহের ডিরেক্টার য়্যাটকিনসন সাহেব দেখিয়া ত্বরায় ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া সেই স্থান হইতে অপসারিত করেন। ঘোড়া না সরাইলে ঘোড়ার পদাঘাতেই অপমৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল। তাঁহাকে ভূমিতে পতিত ও হতজ্ঞান দেখিয়া মিস্ কারপেণ্টারের চক্ষে জল আসিল। তিনি নিজের উৎকৃষ্ট বসনের দ্বারা দাদার (বিদ্যাসাগর) গায়ের কাদা ও ধূলি সমস্ত পরিমার্জ্জিত করিয়া দেন।"

বিদ্যাসাগর সেবার বেঁচে গেলেন বটে, কিন্তু এই দুর্ঘটনার ফলেই তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে যায়। শরীর ভেঙে গেছে, কিন্তু সেদিকে তিনি নজর দিলেন না। শরীরের সেই অবস্থা নিয়েও বিদ্যাসাগর দেশের মঙ্গলের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যেতে লাগলেন।

ওদিকে বেথুন স্কুলে ছাত্রী কমে গেছে। বেথুন স্কুলে আরো এমন কিছু কারণ দেখা যাচ্ছে যার ফলে বেথুন স্কুল-কমিটির, ১৮৬৭ সালের মাঝামাঝি, বিশ্বাস হল, বেথুন স্কুলে বিশেষ অনুসন্ধানের দরকার। ১৮৬৭ সালের জুলাই মাসে কমিটির একটা জরুরি বৈঠক বসল। বৈঠকে একটা সাব-কমিটি হল। সাব-কমিটিতে রইলেন বিদ্যাসাগর, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব আর প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী। অনুসন্ধান করে ১৮৬৭ সালের ২৪-সেপ্টেম্বর সাব-কমিটি একটা রিপোর্ট দাখিল করল। রিপোর্ট দেখে-শুনে বেথুন স্কুল-কমিটি সিদ্ধান্ত করল, বেথুন স্কুলের হেডমিস্ট্রেস মিস পিগটকে না সরালে উন্নতির আশা নেই। কমিটির সিদ্ধান্ত কমিটি গবর্নমেণ্টকে জানিয়ে দিল।

মিস কার্পেণ্টারের প্রস্তাব নিয়ে কথা হচ্ছিল। বেথুন স্কুলেই একটি মহিলা নর্মাল স্কুল খোলার কথা। মহিলা নর্মাল স্কুল আর বেথুন স্কুল সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মতামত চেয়ে ১৮৬৭ সালের ১-সেপ্টেম্বর বাঙলার ছোটোলাট স্যর উইলিয়ম গ্রে, মস্ত একখানা চিঠি লিখেছেন বিদ্যাসাগরকে।

উত্তরে বিদ্যাসাগর—১৮৬৭ সালের ১-অক্টোবর— ছোটোলাটকে একখানা চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি :

"I need hardly assure you that I fully appreciate the importance and desirableness of having female teachers for female learners; but if the social prejudice of my countrymen did not offer an insuperable bar, I would have been the first to second the proposition and lend my hearty co-operation towards its furtherance. But when I see that success is by no means certain and that the Government is likely to place itself in a false and disagreeable position, I cannot persuade myself to support the experiment.

As regards the Bethune School I entirely go with you that the results are not proportionate to the amount expended upon it, but at the same time I cannot recommend its abolition altogether. As a memento of the services to the cause of female enlightenment in India of the great philanthropist

whose name the Institution bears, it has, I submit, a claim to the support of Government. In the next place, it is very desirable that there should be a well organized female school in the heart of the metropolis to serve as a model to sister institutions in the interior. The moral influence of the present institution in native society has been undoubtedly great. It has, in fact, paved the way to female education in surrounding districts and this, in my humble opinion, is no mean return for the large sums which have been annually expended upon it. But I must say that there is great room for economy and improvement." [২৭]

মহিলা নর্মাল স্কুল সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের কথা শুনল না গবর্নমেণ্ট। মিস কার্পেণ্টারের পরামর্শই গবর্নমেণ্টের পছন্দ হল।

আগেই বলা হয়েছে, বেথুন স্কুল-কমিটি গবর্নমেণ্টকে জানিয়ে দিয়েছে যে বেথুন স্কুলের হেডমিস্ট্রেস মিস পিগটকে না সরালে বেথুন স্কুলের উন্নতির আশা নেই। মিস পিগটকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিতে রাজি হল গবর্নমেণ্ট।

১৮৬৮ সালের ৩-মার্চ গবর্নমেণ্ট বেথুন স্কুল-কমিটিকে জানাল :

"I am to request at the same time that the committee will be so good as not to proceed to the engagement of another Mistress without communicating with the Lieutenant-Governor. His Honour is disposed to think that the opportunity should be taken to render the building bequeathed by the late Mr. Bethune and the large annual grant from the general revenues which is now connected with it more useful in the promotion of female education than he believes it to be under present arrangements, and this end, the Lieutenant-Governor is led to believe, may be materially served by combining with a Female School on a more moderate scale than the present one, a Normal School for female teachers.

If it is determined to utilize the Bethune School building, and the funds connected with that building for such a purpose, it will be desirable to bring the whole institution into more close and direct connection with the Education Department than it is at present. The Lieutenant-Governor will be glad to know if in this event the committee of native gentlemen who have hitherto, with an English President, conducted the affairs of the Bethune School, would be willing to act as a consultative committee in co-operation with the Divisional Inspector of Schools." [২৮]

কিন্তু সেভাবে কাজ করতে রাজি হল না বেথুন স্কুল-কমিটি। ১৮৬৯ সালের জানুআরিতে বেথুন স্কুল সম্পূর্ণভাবে গবর্নমেণ্টের আয়ত্তে চলে এল।

"When the Bethune School was made over to the Educational Department, in January 1869, there were only fifteen girls on the roll. The former teacher, Miss Pigott, under whom the school declined, had been dismissed. . ." [২৯]

গবর্নমেণ্ট তারপর বেথুন স্কুলের সঙ্গেই জুড়ে দিয়েছে একটি মহিলা নর্মাল স্কুল। বেথুন আর নর্মাল স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়ে এলেন মিসেস ব্রিটশে। বেথুন স্কুল-কমিটি ভেঙে গেল।

এই নতুন ব্যবস্থার ফল কি খুব ভালো হবে? বিদ্যাসাগর সেরকম আশা করেন না। বিদ্যাসাগরের পরামর্শ গবর্নমেণ্ট শোনেনি; তবু, এই নতুন ব্যবস্থায়ও, কর্তৃপক্ষ যখনি সাহায্য চেয়েছে, বিদ্যাসাগর সাহায্য করেছেন।

মহিলা নর্মাল স্কুলের কাজ আরম্ভ হতে দেরি হতে লাগল। দেরির কারণ : মেয়েদের গাড়ি চালানোর জন্য মেয়েমানুষ পাওয়া যাচ্ছে না।

১২৭৬ সালের ভাদ্রমাসে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' লিখেছে : "আমাদিগের কলিকাতার শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ের কার্য্য কত দিনে আরম্ভ হইবে? ঐ বিদ্যালয়ের ভারগ্রাহী উড্রো সাহেব কি শকট-চালনের জন্য দুইজন ইউরোপীয় স্ত্রীলোক এবার বিলাত হইতে সঙ্গে করিয়া আনিবেন? তাহা হইলে তবু একপ্রকার আশাপথে চেয়ে থাকা যায়। নতুবা ভারতবর্ষে শকট চালক স্ত্রীলোক প্রস্তুত করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিতে গেলে এযুগে হওয়া সম্ভব নয়।"

শেষপর্যন্ত অবশ্যি বিদ্যাসাগরের কথাই অক্ষরে-অক্ষরে মিলে গেল। তিন বছর যেতে-না-যেতেই, ১৮৭২ সালের গোড়ার দিকে, বেথুন স্কুলের সঙ্গের মহিলা নর্মাল স্কুলটি গবর্নমেণ্টকে বন্ধ করে দিতে হল।

ক্রমে-ক্রমে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারিত হয়েছে, স্ত্রীশিক্ষার প্রতি গবর্নমেণ্টের শুভদৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।

১২৮৩ সালের বৈশাখের 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'স্ত্রীশিক্ষার প্রতি গবর্ণমেণ্টের শুভদৃষ্টি' নামক একটি রচনা থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি :

"সম্প্রতি আমাদিগের দয়াশীল গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনার্থ দুইটী কার্য্য করিয়াছেন। প্রথম, ছাত্রীবৃত্তিস্থাপন, দ্বিতীয়, বালিকাবিদ্যালয়ের পরিদর্শিকা নিয়োগ।...আপাততঃ বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সী এবং ঢাকা এই তিন বিভাগে ছাত্রীবৃত্তির ব্যবস্থা হইতেছে, কারণ এই তিন বিভাগে স্ত্রীশিক্ষার সর্ব্বাধিক উন্নতি হইয়াছে, স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি দেখিলে অন্য অন্য বিভাগেও এ রীতি প্রবর্ত্তিত হইবে। ছাত্রীবৃত্তি দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার যে কিয়ৎ পরিমাণে উৎসাহ দান করা হইবে তাহার সন্দেহ নাই।...

গবর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় অনুগ্রহ ইনস্পেক্‌ট্রেস্‌ বা পরিদর্শিকা নিয়োগ। বঙ্গদেশে রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী মনোমোহিনী প্রথম পরিদর্শিকা পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি বাঙ্গালীর কন্যা বটেন,

কিন্তু একটী ইংরাজের সহধর্ম্মিণী। ইহাঁর স্বামীর নামানুসারে ইহাঁর নাম বিবী হুইলার। বাঙ্গালী ও ইংরাজী নাম একত্র হইয়া ইহাঁর নাম মনোমোহিনী হুইলার হইয়াছে। যাহা হউক মনোমোহিনী অতি সুশিক্ষিতা ও গুণবতী রমণী, তিনি পদের যথার্থ উপযুক্ত।...নূতন পরিদর্শিকা আপাততঃ কলিকাতা, হুগলী ও ২৪ পরগণার বালিকা বিদ্যালয় সকল পরিদর্শন করিবেন। মনোমোহিনী হুইলার তাঁহার পদোচিত কার্য্য সম্যকরূপে নির্ব্বাহ করিতে কৃতকার্য্য হউন, আমরা অন্তরের সহিত জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি। কিন্তু তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত পিতা ও বাবু কেশবচন্দ্র সেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির ন্যায় উপযুক্ত দেশহিতৈষী বাঙ্গালীদিগের পরামর্শ লইয়া বালিকাদিগের শিক্ষাবিষয়ক ব্যবস্থাদি করেন, ইহা দেখিলে আমরা আহ্লাদিত হই।..."

কিন্তু এদেশে স্ত্রীশিক্ষা নির্বিঘ্নে বিস্তারিত হয়নি। দীর্ঘকাল নিন্দুকদের বিরুদ্ধে কাগজে-কলমে বাক্যব্যয় প্রয়োজন হয়েছে।

১৮৬৩ সালের প্রকাশিত 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা'য় কৈলাসবাসিনী দেবী লিখেছেন : "কেহ কেহ বলেন, নারীগণ বিদ্যা শিখিলে বিধবা হয়। কেহ বলেন, ইহারা বিদ্যা রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলে আর সাংসারিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। কোন কোন মহাত্মারা বলেন, স্ত্রীগণ বিদ্যা শিক্ষা করিলে তাহাদিগের চিত্ত চঞ্চল হইবে, আর সেই চাপল্য হেতু তাহারা স্বীয় স্বামীকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিবে, এবং মনোমত ব্যক্তিকে পত্র দ্বারা আমন্ত্রণ করত উপপতিত্বে বরণ করিবে। কেহ বলেন, ইহারা বিদ্যাভ্যাস করিলে বুদ্ধিবল প্রাপ্ত হইয়া পুরুষবৎ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতে আমাদিগের মান-সম্ভ্রম একেবারে খর্ব্ব হইবে। হায়! বিদ্যা শিখিলে বিধবা হইবে? বিদ্যার কি পতিঘাতিনী শক্তি আছে, যে তদ্দ্বারা নারীগণ পতিরত্নে বঞ্চিতা হইবে?...নারীগণ বিদ্যাভ্যাস করিলে যে দ্বিচারিণী হইবে ও সাংসারিক কার্য্যে উপেক্ষা করিবে তাহার প্রমাণ কি? বিদ্যা কি নিকৃষ্ট পদার্থ যে তৎ সংস্পর্শে নারীগণ নিকৃষ্টমার্গে পদার্পণ করিবে?"[৩০]

১৮৭৭ সালের ৩-জুন 'সাধারণী' লিখেছে : "সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা বালিকাগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে অধিকারিণী বলিয়া স্থির করায়, বঙ্গসমাজের কোন কোন স্থলে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। এখনকার অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালীর লক্ষণ এই যে, তাঁহাদিগের সকল বিষয়েই উপহাস করা আছে।...আজিকার কালে তুমি যদি সকল বিষয়ে, সমান উপহাস করিয়া, টিপিটিপি হাসিতে পার, তবেই তুমি একজন চতুর রসিক পুরুষ।...বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের প্রকৃতি ও বৃত্তি এইরূপ; বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে তাঁহারা এবার তাঁহাদের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার বিশেষ সুযোগ পাইয়াছেন। কেহই আপন আপন কন্যা ভগিনীর দুরবস্থার কথা স্মরণ করেন না; তবে চারুমুখী বি এল দিয়া শামলা মাথায় কিরূপে বক্তৃতা করিবে, জজসাহেব তাহাতে কি মনে করিবেন— এই সকল অতি আবশ্যক বিষয়ের সমাধা জন্য সকলেই ব্যস্ত; কেবল ব্যস্ত নয়, অনেকে উন্মত্ত; কেননা যখন তাঁহারা নারীজাতি বিষয়ে সুরস আন্দোলন করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের চৌদ্দপুরুষের মধ্যে কেহ কখন যে রমণী জঠরে বাস করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায় না।"

মেয়েদের মধ্যে চন্দ্রমুখী বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম এম. এ. পাশ করেছেন। খুব খুশি হয়েছেন বিদ্যাসাগর। চন্দ্রমুখীকে চিঠি লিখেছেন :

"শ্রীহরিঃ শরণম্

বৎসে চন্দ্রমুখি—

সে দিন তোমায় দেখিয়া ও তোমার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া, আমি যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। তুমি সুস্থ শরীরে দীর্ঘ-জীবিনী হইয়া সুখে কালহরণ কর, এবং স্বজনবর্গের আনন্দদায়িনী ও সজ্জনসমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন হও, এই আমার আন্তরিক অভিলাষ ও ঐকান্তিক প্রার্থনা।

এই সমভিব্যাহারে যৎকিঞ্চিৎ উপহার (Shakespeare's Works) প্রেরিত হইতেছে, পরিগৃহীত হইলে নিরতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত হইব। কিমধিকমিতি ১০ অগ্রহায়ণ ১২৯১ সাল

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ"

হ্যাঁ, চিঠির সঙ্গে উপহার এসেছে একপ্রস্থ সেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলী। বিদ্যাসাগর লিখে দিয়েছেন :

SRIMATI
KUMARI CHANDRAMUKHI BASU,
The first Bengali Lady,
who has obtained the Degree of Master of Arts,
OF THE CALCUTTA UNIVERSITY.
From her sincere well-wisher
ISVARCHANDRA SARMA ৩১

যা ছিল স্বপ্নেরও অগোচর, তাই ক্রমশ সত্য হয়ে উঠেছে। সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে স্ত্রীশিক্ষার আশাতীত উন্নতি হয়েছে বাঙলাদেশে। কিন্তু বেথুন সাহেব সেসব কিছুই দেখে যেতে পারেননি। ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' লিখেছে : "স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার দেহত্যাগের কিছু দিন পূর্ব্বে বেথুন কলেজ দেখিয়া আসিয়া সমস্ত দিন কাঁদিয়াছিলেন, কোনও বন্ধু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছিলেন "মেয়েরা এত উন্নতি করিয়াছে, যে তাহা স্বপ্নেরও অতীত, কিন্তু যে বেথুন এত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া স্কুল স্থাপন করিল, সে ইহা দেখিতে পাইল না—এই দুঃখে হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে।"..."

বিদ্যাসাগর গবর্নমেণ্টের চাকরি ছাড়বার পরেও গবর্নমেণ্ট নানা সময়ে নানা বিষয়ে বিদ্যাসাগরের পরামর্শ চেয়েছে, সাহায্য চেয়েছে। বিদ্যাসাগর অকাতরে পরামর্শ দিয়েছেন, সম্ভব হলে সাহায্য করেছেন।

সংস্কৃত কলেজে বিধি-ব্যবস্থায় কিছু-কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব হল। সেই সম্পর্কে ছোটোলাট বিদ্যাসাগরের পরামর্শ চাইলেন। ১৮৫৯ সালের ১৭-এপ্রিল একখানা চিঠিতে বিদ্যাসাগর আপন মতামত জানালেন। কিয়দংশ তুলে দিচ্ছি :

"Dr. Roer recommends the abolition of the college and the appropriation of its funds to the introduction of the study of Sanskrit into Government English Colleges and schools. . . . No one is a greater advocate than myself for the introduction of Sanskrit into English colleges and schools. But no one would be more strongly opposed to the abolition of the Sanskrit college and the substitution of this arrangement in its stead. Mr. Cowell justly observes that if Sanskrit is to be studied at all it should be studied thoroughly, and I very much doubt if it can ever be properly studied in English colleges and schools, especially when it is a fact that the attempt to teach even Bengali in a proper style has proved a failure in those institutions. The result of the adoption of Dr. Roer's plan would be the extinction from this part of India of a language and literature the preservation of which in their full integrity was one of the primary objects of the founders of the Sanskrit college."

এদেশে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে ছোটোলাট গ্র্যাণ্ট সাহেব বিদ্যাসাগরের মতামত জানতে চাইলেন। সেবিষয়ে ১৮৫৯ সালের ২৯-সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগর জানিয়েছেন :

"As the best, if not the only practicable means of promoting education in Bengal, the Government should, in my humble opinion, combine itself to the education of the higher classes on a comprehensive scale. By educating one boy in a proper style the Government does more towards the real education of the people, than by teaching a hundred children mere reading, writing and a little of Arithmetic. To educate a whole people is certainly very desirable, but this is a task which, it is doubtful, whether any Government can undertake or fulfil. . ."

১৮৬৩ সালে একটা কমিটি হল। কমিটির উদ্দেশ্য 'to consider and report on the extent to which it is expedient to introduce the study of Sanskrit in the Collegiate and Zilla Schools with reference to prospective changes in the course laid down by the university for the several examinations in Arts.' ওই কমিটির একজন সভ্য হলেন বিদ্যাসাগর।[৩২]

১৮৫৪ সালের ১১-নভেম্বর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটা আইন পাশ হল। সেই আইনের বলে একজন বিশ্বস্ত সরকারী কর্মচারীর পরিচালনায় আট থেকে চোদ্দ বছর বয়সের নাবালক জমিদারদের একটা আলাদা বাড়িতে একত্র রেখে উপযুক্তভাবে শিখিয়ে-পড়িয়ে তোলার ব্যবস্থা হয়। এজন্য ১৮৫৬

সালের মার্চে কলকাতায় ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন খোলা হল। ডিরেক্টর হলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

প্রথমে ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন খোলা হল চিৎপুরে রাজা নরসিংহের বাগানে। ১৮৬৩ সালের অক্টোবরে সেখান থেকে চলে এল মানিকতলা আপার সার্কুলার রোডে, শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানে।

ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের জন্য চারজন পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছেন। ঠিক হল, প্রত্যেক পরিদর্শক বছরে তিন মাস করে পরিদর্শন করবেন। বিদ্যাসাগর ওই চারজনের একজন।

১৮৬৩ সালের নভেম্বর থেকে বিদ্যাসাগর পরিদর্শন আরম্ভ করেছেন। ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন সম্পর্কে বিদ্যাসাগর ১৮৬৪ সালের ৪-এপ্রিল একটি রিপোর্ট দাখিল করেছেন :

"Since my appointment as visitor, I have several times visited the Institution and have been satisfied with the external arrangements as far as they have come under my observation. There is one point, however, which appears to me to require a change, and it is this:

2. Under existing arrangements, all the Wards assemble in One Hall and sit round one Table for the purpose of reading. This arrangement struck me as unsatisfactory on the first day of my visit and the impression has been strengthened by the successive visits which I have since paid to the Institution. The wards are divided into several classes, their studies ranging from the spelling Book to the Entrance Course. The classes, being obliged to sit together round one Table, necessarily cause serious disturbance to each other; and those amongst the wards, who are not very attentive, generally neglect their studies. In the mornings, the Director sits in the Hall and sees whether the wards have prepared their lessons for their Schools. But his presence becomes an additional source of disturbance to the classes, owing to the ingress and egress of people who come to him during that time.

3. One private tutor assists all the wards in preparing their lessons in the evenings, but, in my humble opinion, one teacher is quite inadequate for the purpose. He cannot possibly devote more than a quarter of an hour to each class and render any material assistance to them. As a necessary consequence, the progress and proficiency of the wards are generally not very satisfactory.

4. To remedy these evils, some arrangements seem to be absolutely necessary; and I would suggest the following:—

First: Each class should have a separate place and a separate reading table.

Second: Each class should be placed in charge of a separate private Tutor.

Third: In the lower classes, the Tutors should be made to attend both in the mornings and evenings; and in the higher classes, their attendance should be required once, either in the mornings or evenings.

5. My object in suggesting the entertainment of a separate Teacher for each class is, to secure the necessary amount of aid to the wards. The present system of education followed in schools is such, that it is impossible for the generality of young pupils to attain proficiency in their studies without proper aid at home; and this much needed aid can never, as I have already stated, be expected from one individual, who attends so many classes for only one or two hours a day. Extra aid is given to their children by people who can even with difficulty afford it, and it is certainly very desirable that the wards should have that aid to its fullest extent.

6. If the arrangements, suggested above, are carried out, all causes of disturbance will be removed, negligence in the inattention materially checked, and for greater progress and proficiency secured in future.

7. Again, under the proposed arrangements, it will not be necessary for the Director to overlook the daily school lessons of the wards, a drudgery of which I would relieve him altogether and assign to him the far more agreeable, as well as important task of training their minds, and giving them instruction on subjects of general interest. Such a task would certainly better suit the talents and ability of the Director which he possesses in a higher degree.

8. At present the Director does this work to a certain extent, and when relieved of the drudgery alluded to, he will be able to perform it with much greater efficiency.

9. The primary object in bringing the wards to the Metropolis is, I presume, to educate them and train their minds in a proper style. Every possible endeavour should, in my humble judgment, therefore, be made to secure that object." ৩৩

এই ইনস্টিটিউশন সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের ১৮৬৫ সালের ১১-জানুআরির রিপোর্ট থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি :

"... I commenced my inspection from November 1863... I would beg leave respectfully to suggest a new arrangement for their education.

I. That the Institution be turned into a sort of Boarding School, instead of being merely the residence of the wards as at present.

II. That the requisite staff of efficient teachers be entertained for their instruction.

III. That a separate course of instruction, especially directed suited to the necessities of the wards, be framed for them.

. . . I also take the liberty to bring to prominent notice Rule XI of the Rules for the management of the Wards Institution. That rule prescribes that "corporal punishment shall be resorted to only in aggravated cases." It appears from the Order Book that almost in every month one or more boys have received ratan cuts varying from four to twelve. The instances in which they have thus been punished do not, however, appear to me to come under the class "aggravated cases", with the exception perhaps of one which is not sufficiently described. But, irrespective of the *nature* of the offences committed, I would beg leave to observe that corporal punishment should be discarded altogether as a part of the training of the wards. This punishment is strictly prohibited in all Educational Institutions on account of its baneful influence. Hundreds of pupils are managed in them without the use of the cane; its necessity in the Wards Institution is scarcely perceptible. In my humble opinion such harsh treatment does by no means become the inmates of that Institution. I have some experience in the training of boys and my firm conviction is that corporal punishment, from its degrading effects, spoils more than mends the recipients. I would therefore beg leave strongly to recommend that this Rule may be rescinded at once."[৩৪]

ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন সম্পর্কে রিপোর্ট দেবার জন্য, ১৮৬৫ সালের গোড়ার দিকে, নতুন একটি কমিটি হল। কমিটিতে রইলেন এইচ. উড্রো, টি. বি. লেন এবং বিদ্যাসাগর।

১৮৬৫ সালের ১-সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগর রিপোর্ট দিয়েছেন। সেই রিপোর্টের অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি :

"The object of the Wards' Institution is to give the wards a fair amount of education, train them up as useful members of society, and turn them out good landlords. But the education they receive is scarcely worth the name, and they generally leave the Institution with a mere smattering of English, and with little or no rural training. Nor can any better results be expected in the existing order of things. To remedy the

evils, certain suggestions were made by me in my report to the Board of Revenue, dated the 11th January last. I have deliberately re-considered them since the formation of the present Committee, and see no reason to change the opinions expressed in that paper. It is my firm conviction that the remodelling of the Institution on the plan suggested, is the only practicable means to better its condition, and to secure the beneficial results anticipated from the establishment of the Institution.

Great care should be taken in the selection of the teaching staff, in case it be determined to convert the Institution into a Boarding School, as suggested. They must be well-educated men, experienced in training up children and youth, and free from fashionable vice. The management and control of the Institution should be vested in the Head Master. Under such arrangements, I feel assured that the prejudices entertained against the Institution, not without reason, would be removed, and the confidence of the public restored. But, if otherwise the Institution be maintained on its present footing, I shall not be sorry to see it closed at once.

The after-career of some of the young men brought up in the Institution does not reflect credit on it, though there are a few who are well spoken of. There are others again who may be considered as only indifferent. On the whole, the results do not appear to be satisfactory.

Removal of the Institution to Krishnaghur for the present is by no means safe, on account of the epidemic raging there. The places to which it can be removed with safety, are either Beerbhoom or Berhampore. But if the changes suggested be carried out, I would prefer the Institution continuing in Calcutta, inasmuch as the supervision here, would I think, be more efficient than in the Mofussil. The frequent inspection of the visitors, as well as approximity of the controlling authorities, cannot fail to exercise an amount of beneficial influence on the Institution which will not easily be available in the Mofussil.

I think it would be highly advantageous to the wards if their term of minority extended to twenty-one years instead of eighteen years, as at present, as in that case they will have longer time for improving themselves, and they will enter upon the possession of their estates at an age when men's character are formed in a manner. This extension I believe will not be unacceptable to the class of Zemindars, as I find that the British

Indian Association sometime ago move the Legislature on the subject." ৩৫

ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের ডিরেক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের* সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মতের মিল হয়নি। খুব সম্ভব সেজন্যেই বিদ্যাসাগর শেষপর্যন্ত ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি।

১৮৮০ সালে ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন বন্ধ হয়ে যায়।

দেবোত্তর সম্পত্তি হস্তান্তর বিষয়ে আইন প্রণয়নের প্রশ্ন উঠেছে। এ-বিষয়ে গবর্নমেণ্ট বিদ্যাসাগরের মতামত চেয়েছে। বিদ্যাসাগর, ১৮৬৬ সালের ৬-আগস্ট, একখানা চিঠিতে আপন মতামত জানিয়েছেন। চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি :

". . . there do not appear to be any texts in the Books on Hindu Law which either permit or prohibit the alienation of the *Devatra* property. But the general practice of the country does not sanction the disposition of such property in any shape. In fact, when Endowments of this description are made by Hindus, they make them with the sole object of securing the property endowed from any sort of alienation, and attach conditions accordingly. Trustees are consequently prohibited from disposing of the property. Though no distinct ruling on the point is traceable in any of the Text Books, no alienation can be permitted in accordance with the principle of Hindu Law. According to that Law, alienation cannot take place except with the *express consent* of the owner, and as in the case of *Devatra* property the Idol, to which it is consecrated, *is* the owner, it cannot be disposed of except with its consent, which, as a matter of course, can neither be given nor extorted. Hence, *Devatra* property has become inalienable."

১৮৭০ সালের ১-সেপ্টেম্বর 'হিন্দু উইলস্ অ্যাক্ট' পাশ হয়। এ-বিষয়ে বিহারীলাল সরকার লিখেছেন : "গবর্ণমেণ্ট হইতে এ-বিষয়ে যাবতীয় গণ্যমান্য ও হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের মত গ্রহণ করা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত আইন সম্বন্ধে স্বীয় মত প্রদান করিতে আহূত হইয়াছিলেন। তিনি আইনের মর্ম্ম বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দুইটি বিষয় সমর্থন করেন নাই। প্রথমতঃ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে অজাত কোন ব্যক্তিকে দান করিলে তাহা বৈধ

---

* কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন : "রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলিতেন, 'ও লোকটা ইংরাজিতে একজন ধনুর্দ্ধর পণ্ডিত, কহিতে লিখতে খুব মজবুত, কিন্তু সাহেবদের কাছে বোলে বেড়ায়—'ইংরাজি আমি যৎসামান্য জানি; যদি কিছু আমার জানা শুনা থাকে তা সংস্কৃতশাস্ত্রে।' ইহাতে সাহেবেরা মনে ভাবেন—বাস্ রে, ইংরাজিতে এত সুপণ্ডিত হোয়ে যখন সে বিদ্যেকে যৎসামান্য বলে, তখন না জানি সংস্কৃততে এর কতই বিদ্যে আছে! এইরূপ কোনও এক আসরে বিদ্যাসাগরের নিজের মুখেই শুনিয়াছি, তিনি কোনও পদস্থ সাহেবকে বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের মত বুদ্ধিমানও নেই, নির্বোধও নেই; তোমরা যে বুদ্ধিমান, তাহা বলা বাহুল্য; তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় চতুর্দ্দিকে দেদীপ্যমান; কিন্তু তোমাদিগকে নির্বোধ এই জন্য বলি যে, আমাদের দেশের অকর্ম্মণ্য অনেক ব্যক্তি তোমাদের কাছে বেশ পশার করিয়া লইয়াছে; আমরা তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া যাই।'..."

হয় না। গ্রহীতার ও দাতার জীবদ্দশায় বর্ত্তমান থাকা ও বোধবিশিষ্ট হওয়া চাই। কিন্তু উক্ত আইনে এ-প্রকার দান কোন কোন স্থলে বৈধ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ উক্ত আইনে যাহাকে "Rules against perpetuity" অর্থাৎ "আবহমানকাল স্বত্বাধিকার বিরুদ্ধ বিল" বলে, তাহাও হিন্দু আইন-সম্মত নহে বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় মত প্রকাশ করেন। শাসনকর্ত্তারা উক্ত আপত্তিতে কর্ণপাত করেন নাই। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহারা উক্ত আইন বিধিবন্ধ করেন।"[৩৩]

ভারতের রাষ্ট্রীয় অভিলেখাগার থেকে জানা যাচ্ছে :

"As to the Hindu Wills Act it would appear that as early as 22 August 1865 the Government of India (Home Department) issued a circular letter to all Local Governments respecting the extension of the testamentary clauses of the Act to the Hindus and other non-Muslim sections among the Indian population. (The number of the circular was 1247-55). The circular was replied to by the Under-Secretary to Government of Bengal in his letter No. 3994 dated 27 July 1866. In paragraph 2 of the letter it was stated:

"On receipt of your letter, several leading Hindu and Muhammedan gentlemen. . . were consulted; . . . Copies of their replies received are enclosed."

The letter does not reveal the names of the gentlemen consulted and the enclosures to it include replies from 3 eminent Bengalis only, *viz.* Raja Sutt Sharn Ghoshal Bahadur, Babu Prasanna Kumar Tagore, and Babu Degambar Mitter. Vidyasagar's name is conspicuous by its absence.

After the Bill had been reported on by the Select Committee (which consisted of J. F. Stephen, G. N. Taylor, H. M. Durand, Gordon S. Forbes, F. S. Chapman, F. R. Cockerill) it was opposed by a number of Bengalis, *viz.*, Jatendro Mohun Tagore, Ramanath Tagore, Degambar Mitter, Norender Krishna, Rajendra Narain Deb, Peary Chand Mitter, Issur Chunder Ghosal, Durga Churn Law, Kumar Hurrendra Krishna, Joy Kissen Mukerjea, Chunder Coomar Chatterjee, Tarreny Chunder Banerjea, Kissory Chand Mitter, Sam Churn Mullick, Greesh Chunder Ghose, Kaliprasanno Singh, Debendro Mullick, Rajendralala Mittra, Suttynund Ghosal (all members of the British Indian Association). Among other opponents of the bill were Raja Kali Krishna Bahadoor and Chunder Seekur Mookerjea (President and Secretary, respectively of the Bharatbershiya Sonatana Dharma Rokhini Sabha); and Baboo Bhoodeb Mookerjee. It is clear from the above that Vidyasagar, according to the records here, did not figure among those who

opposed the bill (Legislative Progs., Aug. 1870, Nos. 56-110A).”[*] [৩৭]

১৮৭২ সালের গোড়ার দিকে সংস্কৃত কলেজ থেকে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ বিলুপ্ত করে দেবার প্রস্তাব হল। এ-বিষয়ে গবর্নমেণ্ট বিদ্যাসাগরের পরামর্শ চেয়েছে। বিদ্যাসাগর ওই প্রস্তাবে সায় দিতে পারলেন না। বিদ্যাসাগরের বিবেচনায় কেবলমাত্র স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য একজন অধ্যাপক প্রয়োজন।

কিন্তু বিদ্যাসাগরের পরামর্শ গবর্নমেণ্ট শোনেনি। সংস্কৃত কলেজে কেবলমাত্র স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য কোনো অধ্যাপক রইলেন না, দর্শনশাস্ত্র ও অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপকের উপর স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনার ভার অর্পিত হল।

সেণ্ট্রাল টেক্সট বুক কমিটির সভ্য হওয়ার জন্য বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করেছেন অ্যাটকিনসন সাহেব। এ-বিষয়ে অ্যাটকিনসন সাহেব, ১৮৭৩ সালের ১১-জুলাই, বিদ্যাসাগরকে একখানা চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা তুলে দিচ্ছি :

“My dear Pundit,

Will you allow me to add your name to the committee upon School Books? The enquiries of the committee are to be extended to vernacular school books as well as English, and it is therefore necessary to secure the help of the best native Scholars.

I shall be much obliged if you will give us the benefit of your services.

Sincerely yours
W. S. Atkinson’ [৩৮]

নিজে একজন পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতা বলে বিদ্যাসাগর ওই কমিটিতে যেতে রাজি হলেন না। বিদ্যাসাগর, ১৮৭৩ সালের ১৩-জুলাই, অ্যাটকিনসন সাহেবকে লিখেছেন :

“In reply to yours of the 11th instant I beg to inform you that I would have gladly accepted your invitation to serve in the School Book Committee, but on two considerations I feel constrained to decline it. As an author I am directly interested in the decision of the committee, and I do not therefore think it right to take a part in their deliberations. Besides, I am inclined to think that my presence in the committee may interfere with a free and unreserved discussion of the merits and demerits of the books. I hope you will therefore kindly excuse me if I can not persuade myself to comply with your request.” [৩৯]

---

* অতঃপর আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দপ্তরে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করেছি; কিন্তু প্রস্তাবিত হিন্দু উইলস অ্যাক্ট বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতামত সম্বলিত কোনো পত্র অদ্যাবধি সংগ্রহ করতে পারিনি।

এই চরিত্রের মানুষের নামেও এককালে ছাপার অক্ষরে প্রচারিত হয়েছে যে বিদ্যাসাগরের চক্রান্তে অন্য লেখকের বই সরকারী বিদ্যালয়ে অনাদৃত। ১৮৫৪ সালের ২২-জুলাইয়ের 'সম্বাদ ভাস্করে' প্রকাশিত একখানা প্রেরিত পত্র থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি : "বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় গবর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন তদ্ধেতু মনুষ্যকে মনুষ্য জ্ঞান করেন না একথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়াছে তিনি ব্যতীত সংসারে বিদ্বান কেহ নাই ইহাই জ্ঞান করিয়া থাকেন ইহা অত্যাশ্চর্য্য বলিতে হইবে অতএব আমি তাঁহাকে জানাই সাগর থাকিলেই মহাসাগর থাকে ইহা যেন তিনি স্মরণ করিয়া রাখেন,...পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রণীত আরোবীয়োপাখ্যান ও সেক্সপিয়র এই উভয় গ্রন্থ উত্তম হইলেও কেবল বিদ্যাসাগরের চক্রান্তে তাহা যদিচ সরকারী বিদ্যালয়ে আদরণীয় হইল না তথাপি তাহা পড়িয়া থাকিল না সকল বিদ্বান সমাজে সমাদৃত হইয়াছে এবঞ্চ রঙ্গপুরস্থ কুণ্ডাধিপতি শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় স্বভাব দর্পণ নামে এক পুস্তক প্রস্তুত করিয়া সরকারী পাঠশালার ছাত্রগণের পাঠার্থে পাঠাইয়াছিলেন তাহাও বিদ্যাসাগর চক্রান্ত করিয়া গবর্ণমেণ্টকে গ্রহণ করিতে দেন নাই এ সকল পুস্তকে কি কি দোষার্পণ করেন শুনিতে পাইলে উত্তর দিতে পারি বিদ্যা-সাগর বালকবোধের কারণ যে সকল ক্ষুদ্র ২ প্রস্তাব লেখেন তাহা ভিন্ন যে সকল গ্রন্থ শক্ত আশয়ে রচিত হইয়াছে যাহার ভাব পণ্ডিতেরাও সহজে প্রাপ্ত হন না তাহা কি বিদ্যাসাগরের মতে গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না কেবল অশ্বোধাবতি গোঃ শব্দায়তে ইহাই কি ছাত্রগণের পাঠ্য হইয়াছে...।"

সহবাস-সম্মতি-আইন বিল কাউন্সিলে উপস্থিত করার আগে গবর্নমেণ্ট বিদ্যাসাগরের মতামত চেয়েছে।

এবিষয়ে ১৮৯১ সালের ১৬-ফেব্রুআরি বিদ্যাসাগর গবর্নমেণ্টকে জানিয়েছেন :

". . . I would propose that it should be an offence for a man to consummate marriage before his wife has had her first menses. As the majority of girls do not exhibit that symptom before they are thirteen, fourteen or fifteen, the measure I suggest would give larger, more real, and more extensive protection than the Bill. At the same time, such a measure could not be objected to on the ground of interfering with a religious observance.

* * * *

From every point of view, therefore, the most reasonable course appears to me, to make a law declaring it penal for a man to have intercourse with his wife, before she has her first menses.

Such a law would not only serve the interests of humanity by giving reasonable protection to child-wives, but would, so far from interfering with religious usage, enforce a rule laid down in the Sastras. The punishment, which the Sastras pres-

cribe for violation of the rule, is of a spiritual character and is liable to be disregarded. The religious prohibition would be made more effective, if it was embodied in a penal law. I may be permitted to press this consideration most earnestly on the attention of the Government." [৪০]

১৮৬৪ সালে বিদ্যাসাগর জার্মানির শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার কেন্দ্র "Deutscher Akademischer Austanschdienst" নামক প্রতিষ্ঠানের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

"Vidyasagar was elected corresponding member of the German Oriental Society in 1864 and he remained a member till his death. . . .

He was elected in recognition of his merits in promoting the spread of literacy and education amongst his compatriots by means of exemplary books written in the Vernacular. . ." [৪১]

১৮৬৪ সালের ৪-জুলাই বিদ্যাসাগর বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির অনারারি মেম্বর নির্বাচিত হয়েছেন।

১৮৮০ সালের ১-জানুআরি ভারত-গবর্নমেণ্ট বিদ্যাসাগরকে 'সি. আই. ই' উপাধি দিয়েছে।

এ-উপাধি নিতে হবে। রাজভবনে যেতে হবে, দরবারী পোশাকে গিয়ে উপাধি নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু সে তো অসম্ভব কথা। বিদ্যাসাগরের পক্ষে অসম্ভব।

গোলমাল এড়াতে হলে দিনকয়েকের জন্য কলকাতার বাইরে গিয়ে থাকা ভালো। তাই বিদ্যাসাগর দিনকয়েকের জন্য কার্মাটাড়ে চলে গেলেন। উপাধি-বিতরণের দরবার শেষ হবার পর আবার কলকাতায় ফিরে এলেন।

দিনকয়েক পরে লাটসাহেবের দপ্তরখানা থেকে একজন বাঙালী কর্মচারী আর একজন চাপরাশি বিদ্যাসাগরের বাড়িতে এসে উপস্থিত। 'সি. আই. ই.'-র পদক নিয়ে এসেছে। বিদ্যাসাগর পদকের কাছে যাননি, পদক বিদ্যাসাগরের কাছে চলে এসেছে।

বিদ্যাসাগরের হাতে পদক এল। কিন্তু চাপরাশিটি আর লাটসাহেবের দপ্তরখানার কর্মচারীটি দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে। কাজ মিটে গেছে, তবু দাঁড়িয়ে আছে কেন?

কেননা, বকশিশ মেলেনি। সরকারী পুরস্কার নিয়ে এরা যেখানেই যায়, সেখান থেকেই দরাজ হাতে বকশিশ মেলে। বড়মানুষদের বাড়িতে নানা-রকম বকশিশ পেয়েছে; বিদ্যাসাগর এমন কি বকশিশ দিতে পারেন যাতে ওরা খুশি হবে? না, ওদের খুশি করা বোধ করি বিদ্যাসাগরের সাধ্য নয়।

বিদ্যাসাগর ওদের বললেন—আমি একটা কথা বলি, তাতে আমারও সুবিধে, তোমাদেরও সুবিধে। এই পদকখানা নিয়ে বাজারে কোনো বেনের দোকানে গিয়ে বেচে দাও। যা পাবে, দু-জনে ভাগ করে নিও।[৪২]

স্বনামধন্য সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাসাগরের নূতন উপাধি' নামে একটি চুটকি লিখেছেন :

"বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজদ্বারে নূতন উপাধি পাইয়াছেন শুনিয়া, একজন

পল্লীগ্রামের অধ্যাপক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আইসেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করিলেন—"নূতন উপাধিটা কি?"

বিদ্যা।—"সি. আই. ই.।"

অধ্যা।—"তাহাতে কি হইল?"

বিদ্যা।—"ছাই।"

অধ্যা।—"সাধু! সাধু! রাজার মুখে সকলই শোভা পায়।"..."

তারপর 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধির কথা।

'মহামহোপাধ্যায়' উপাধির প্রস্তাব এল বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগর সে-উপাধি নিতে রাজি হলেন না। অসুস্থ শরীরের দোহাই দিলেন। বললেন—যা চাপানো আছে, তা ফিরিয়ে নিলে রক্ষা পাই। এই অসুস্থ অবস্থায় প্রত্যেক দরবারে 'যেতে পারব না' বলে চিঠি লিখতে আর ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাঠাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত।[৪৩]

বিদ্যাসাগর খবর পেলেন, তাঁর নাম 'প্রাইভেট এণ্ট্রি'র ফর্দে ঢুকে গেছে।

'প্রাইভেট এণ্ট্রি'র ফর্দে নাম থাকলে কী হয়? অনেকের কাছেই ও একটা মস্ত সৌভাগ্যের কথা। ওই ফর্দে যাঁদের নাম ওঠে লাটসাহেবের সঙ্গে আলাদা ভাবে দেখা করতে পারেন তাঁরা।

বিদ্যাসাগরের নাম উঠে গেল সেই ফর্দে। খবর পেয়ে বিদ্যাসাগর লাট-সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারির কাছে এসে উপস্থিত। লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারিও একজন পুরোপাক্কা সাহেব। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে তাঁর। 'প্রাইভেট এণ্ট্রি'র ফর্দটা দেখতে চাইলেন বিদ্যাসাগর।

ফর্দে নাম দেখে নিশ্চয়ই বিদ্যাসাগর খুশি হবেন। আবার, হয়তো বিদ্যাসাগর 'প্রাইভেট এণ্ট্রি'র ফর্দে কোনো বন্ধু-বান্ধবের নাম দেবার কথা বলবেন।

বিদ্যাসাগর তাঁকে বললেন—কথা দিন, আপনি আমার একটা অনুরোধ রাখবেন।

প্রাইভেট সেক্রেটারি বললেন—কথা দিলাম, আপনার একটা অনুরোধ রাখব।

সাহেব যেমন ভেবেছেন তেমনি কিছু হল না। একটা উল্টো কাণ্ড করে বসলেন বিদ্যাসাগর। একটানে নিজের নামটি কেটে দিলেন ফর্দ থেকে। তারপর সাহেবকে বললেন—আমার অনুরোধ, আপনি রাগ করবেন না। কথা দিয়েছেন, অতএব আমার অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে। আমাকে আর কিছু বলবেন না।[৪৪]

বারো

মহারাজ রাজবল্লভ সেনের কনিষ্ঠা কন্যার নাম অভয়া। আট বছর বয়সে অভয়ার বিয়ে হল রূপেশ্বর সেন নামে একটি বালকের সঙ্গে। বিয়ের অল্পকাল পরেই রূপেশ্বর মারা গেল।

বিধবাবিবাহ কি অশাস্ত্রীয়? রাজবল্লভের ইচ্ছায় তাঁর তিনজন দ্বার-পণ্ডিত—কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, নীলকণ্ঠ সার্বভৌম এবং কৃষ্ণদেব বিদ্যা-বাগীশ—বিধবাবিবাহের সপক্ষে শাস্ত্রবাক্য খুঁজতে আরম্ভ করলেন। শেষ-পর্যন্ত তাঁরা জানালেন : অক্ষতযোনি বিধবাদের পুনর্বিবাহে হিন্দুশাস্ত্রে কোনো নিষেধ নেই।

কিন্তু কেবলমাত্র তিনজন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কথার উপর নির্ভর করে নিজের বিধবা মেয়ের বিবাহ দেওয়া রাজবল্লভ সঙ্গত বিবেচনা করলেন না। হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করতে হলে, রাজবল্লভ বিবেচনা করলেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতসমাজের সম্মতি প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের কাছে লোক পাঠালেন রাজবল্লভ। কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা প্রভৃতি নানা অঞ্চল থেকে অনুকূল মত সংগৃহীত হল। তারপর নবদ্বীপ।

নবদ্বীপে তখন অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বাস। নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতদের মত না পেলে তখন সব ব্যর্থ। নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতমণ্ডলী তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রিত। রাজবল্লভের সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের যথেষ্ট সৌহার্দ্য। রাজবল্লভ আশা করেছেন যে কৃষ্ণচন্দ্রের সাহায্যে তিনি নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে বিধবাবিবাহের সপক্ষে ব্যবস্থা পাবেন।

নবদ্বীপের পণ্ডিতদের গোপনে ডাকলেন কৃষ্ণচন্দ্র। তাঁদের মুখে শুনলেন : অক্ষতযোনি বিধবাদের পুনর্বিবাহে হিন্দুশাস্ত্রে কোনো নিষেধ নেই।

কৃষ্ণচন্দ্র তখন আক্ষেপ করে বললেন—আগে জানলে আমিই এই সমাজ-সংস্কারের কাজে হাত দিতাম। কিন্তু রাজবল্লভের চেষ্টায় বিধবাবিবাহ সমাজে প্রচলিত হয়ে গেলে আমার আর অপমানের সীমা থাকবে না। অতএব আমি অনুরোধ করি, আগামীকাল রাজবল্লভের দূতের সামনে সভায় আমি আপনাদের বারংবার বিধবাবিবাহের পক্ষে মত দিতে বলব, কিন্তু আপনারা কিছুতেই মত দেবেন না।

তাই হল। রাজবল্লভের দূত ম্লানমুখে ফিরে গেল।*১

---

* ডঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন :

"Rajaballabh secured the approval of the orthodox Pandits and also the Sastric injunction in favour of widow remarriage, as early as 1756 A.D., and this tradition influenced the views of the social reformers a century later. The failure of Rajaballabh is said to have been mainly due to the opposition of Maharaja Krishnachandra, but of this we have no definite evidence." ('Maharaja Rajballabh', p. 91)

মতান্তরে : "রাজবল্লভের প্রেরিত লোক বিধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব লইয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদিগকে অন্যান্য ভোজ্যের সহিত একটি গোবৎসও প্রদান করেন। আগন্তুকগণ এইরূপ অভিনব উপহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, যে বিধবা-বিবাহ বহুকাল যাবৎ অপ্রচলিত আছে তাহা পুনরায় প্রচলিত হইতে পারিলে শাস্ত্রানুসারে গোমাংস-ভক্ষণেও আপত্তি হইতে পারে না। রাজবল্লভের লোক এই উত্তর শ্রবণে সাতিশয় লজ্জিত হইল এবং আর বিলম্ব না করিয়া সত্বরপদে রাজনগরে প্রত্যাগমন করিল।"

ঠিক এই সময়ে কোটার রাজাও বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সার্থক হননি।[২]

বাঙলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা'য় বালবৈধব্যের সমস্যা আলোচিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাঙলাদেশে ডিরোজিওর ছাত্রেরাও এ-বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তারপর, দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় ল-কমিশন বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য একটি আইন করার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের আদালতের মতামত চেয়েছে।

১৮৩৭ সালের ২৯-এপ্রিলের 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার একটি সংবাদ থেকে জানা যাচ্ছে যে "এতদ্দেশীয় কতিপয় সমৃদ্ধ সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা পরামর্শ করিয়াছেন এক সভা করিবেন" এবং সেই সভার একটি অভিপ্রায় এই যে "ব্রাহ্মণদিগের কুপরামর্শেতে শিশুকালাবধি বিধবার বিবাহ নিষেধ বিষয়ে যে কুসংস্কার হইয়াছে তাহাও বিনষ্ট করিতে হইবেক।"[৩]

যিনি সাহস করে প্রথম বিধবাবিবাহ করবেন, শোনা যায় মতিলাল শীল ঘোষণা করেছিলেন, তাঁকে তিনি বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন।[৪]

১৮৪২ সালের এপ্রিলের 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটরে' প্রকাশিত একখানা প্রেরিত-পত্র থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি : "যেসকল বিষয়ের সাধারণে সর্ব্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দুজাতীয় বিধবার পুনর্বিবাহেরও বাদানুবাদ হইয়া থাকে বোধহয় যে উক্ত বিবাহের প্রতিবন্ধক যে সকল শাস্ত্র আছে তাহা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, কারণ পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণানন্তর পুনর্বিবাহ করিতে পারে তবে স্ত্রী কেন স্বীয় স্বামির পরলোক হইলে বিবাহকরণে সক্ষমা না হয় এবং উক্ত প্রতিবন্ধকের সবলতায় কেবল পাপ ও ক্লেশের বৃদ্ধি মাত্র। এতদ্বিষয়ের প্রস্তাব বহুবৎসরাবধি হইতেছে কিন্তু সূচনাবধি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত অস্মদ্দেশীয় লোকের দ্বারা তৎপ্রতিবন্ধকের পোষকতায় কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশিত হয় নাই অতএব বোধহয় যে তৎপ্রতি তাঁহারদিগের দ্বেষের ক্রমশঃ শেষ হইতেছে এবং কিঞ্চিৎ কালাতীতে নিঃশেষ হইতে পারে কিন্তু যে পর্য্যন্ত উক্ত প্রতিবন্ধকে সম্পূর্ণরূপে অনাস্থা হইয়া নূতন রীতির সংস্থাপন না হয় তদবধি আমরা তদাবশ্যকতার নিমিত্তে বারম্বার অনুশীলন করিতে নিবৃত্ত হইব না।..."

১৮৪২ সালের জুলাই মাসে 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' লিখেছে :

". . . What other *Shastrical* objections can there be to the commencement of the re-marriage of Hindu widows? It has been shown by our correspondent that it obtained in ancient

times and is still prevalent among the lower orders of our countrymen in some parts of India.

The *impropriety* and *mischievousness* of the prohibitions against the continuance of the practice in the Coli Yug have already been demonstrated, and we are now rejoiced to find that their *legality* is questionable.

In 1756 Rajah Rajbullub Roy Bahadoor of Dacca, wishing to have his daughter, who had become a widow, married again, applied to the learned Pundits of Dravira, Telinga, Benares, Mithila, etc. to communicate to him their opinion on the subject, which they unanimously expressed in the following words:

"গতে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ"
পঞ্চস্বাপৎস্‌ নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।*

Women are at liberty to marry again if their husbands be not heard of, die, retire from the world, prove to be eunuchs or become *patitas*. . . ."

শাস্ত্রমতে হিন্দু-বিধবার পুনর্বিবাহের নিষেধ খণ্ডন করে 'বেঙ্গল স্পেকটেটর', ১৮৪২ সালের জুলাই মাসে, লিখেছে : "হিন্দুজাতীয় বিধবার পুনর্ব্বিবাহের নিষেধ এইরূপে খণ্ডিত হওয়াতে এক্ষণে কেহ এমত প্রস্তাব করিতে পারেন যে কলিযুগে ঔরস ও দত্তক পুত্র ভিন্ন অন্য কোন পুত্রের ধনাধিকার নাই অতএব পুনর্ভূ বিবাহ পুনঃস্থাপিত হইলে তৎপুত্রের ধনাধিকারার্থ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনীয়; তাহাতে আমারদিগের বিবেচনায় এই বোধ হয় যে এতদ্রূপ প্রার্থনা অস্মদাদির পক্ষে শ্রেয়স্করী নহে যেহেতু তাহা হইলে আমাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে যে যৎকিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে তাহাও এই দৃষ্টান্তবলে ক্রমশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উচ্ছিন্ন হইবেক।..."

১৮৪৩ সালের ১৫-জানুআরির 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটরে' প্রকাশিত একখানা প্রেরিতপত্র থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি :

* উত্তরকালে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন : "অনেকের সংস্কার আছে, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ব্ব-প্রথমে বঙ্গসমাজে বিধবা বিবাহের বিচার উপস্থিত করেন। কিন্তু বোধ হয় তাহা ঠিক নহে। ১৮৪২ সাল হইতে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ডিরোজিও শিষ্যগণ যে "বেঙ্গল স্পেক্টেটার" নামক কাগজ বাহির করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে তাঁহারা বিধবা বিবাহের বৈধতা বিষয়ে বিচার উপস্থিত করেন। কয়েক মাস ধরিয়া ঐ পত্রে উক্ত বিচার চলিয়াছিল। এমন কি "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে" ইত্যাদি যে পরাশর বচনের উপরে ভিত্তি স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বপ্রথমে উক্ত পত্রে বিচারের মধ্যে উদ্ধৃত করা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই পণ্ডিতদ্বয় পশ্চাতে থাকিয়া ঐ সকল বচন উদ্ধৃত করিয়া লেখকদিগের হস্তে দিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। তাহার কোনও প্রকাশ নাই।...বিধবা-বিবাহ বিষয়ক বচন উদ্ধৃত করিয়া বেঙ্গল স্পেক্টেটারের লেখকগণের সাহায্য করা পণ্ডিতদ্বয়ের পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে।" (শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৮২-৮৩)

বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ বিষয়ক বচন উদ্ধার করে সে-সময়ে 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটরে'র লেখকদের সাহায্য করেছেন, শিবনাথ শাস্ত্রীর এই অনুমান সত্য বলে গ্রহণ করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এই অনুমান সত্য হলে বিধবা-বিবাহের পক্ষে শাস্ত্রবচন উদ্ধারের জন্য পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরের বিপুল পরিশ্রমের কোনো প্রয়োজন থাকত না।

"হিন্দু বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহের কল্পনা ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপার এ নিমিত্তে কেহ২ কহেন যে গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না কিন্তু আমার বিবেচনায় এ আপত্তি করা ভাল বোধ হয় না কারণ উক্ত বিবাহের বিধায়ক শাস্ত্র ঝটিতি পাওয়া যায় না যদি মিলে তথাপি বিচারস্থলে তাহা গ্রাহ্য হওয়া ভার অতএব এবিষয়ে দেশাধিপের সহায়তা ব্যতিরেকে আমাদিগের দ্বারা কি কার্য্য হইতে পারে? আমাদিগের ভাল করণের সমস্ত ক্ষমতা দেশাধিপতি মহাশয়েরা হস্তগত করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমাদিগের কোন ক্ষমতা নাই অতএব আমাদিগের সুখবৃদ্ধির প্রার্থনা কেন আমরা তাঁহাদিগের নিকট না করিব?।

এতদ্দেশীয়দিগের ধর্ম্ম বা জনপদীয় বিষয়ের প্রতি গবর্ণমেণ্ট যে হস্তক্ষেপণ করিবেন না এমত কোন লিখিত বা বাচনিক প্রতিজ্ঞা নাই, এবং আমাদিগের পৈতৃকাধিকার যেরূপে রক্ষণাবেক্ষণ হইয়া আসিতেছে তদ্দ্বারাও উক্ত প্রকার প্রতিজ্ঞার কোন সোপান পাওয়া যায় না। আমরা অনেক২ প্রাচীন রীতিবর্ত্ম পরিবর্ত্ত করিয়াছি ঐ সকল এইক্ষণে আর চলিত হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞান ও সভ্যতার যত বৃদ্ধি হয় ততই লোকেরদের সংস্কারের এবং চরিত্রের ও ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং তৎসমভিব্যাহারে প্রাচীন নিয়মেরও অন্যথা হয়।

অতএব আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই উদয় হয় যে যদবধি গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিষয়ে আমাদিগের মনোভীষ্ট সিদ্ধ না করেন তদবধি তাহার নিকট প্রার্থনাদি করণে আমাদিগের ক্ষান্ত থাকা অনুচিত।"

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (১৭৮৬-১৮৪৫) বাঙলা ভাষায় প্রথম অভিধান-প্রণেতা, প্রখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম আচার্য। আরেকটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বিদ্যাসাগরের আগেই তিনি বিধবা-বিবাহের সপক্ষে ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর, ১৮৪৫ সালের ১১-মার্চের 'Bengal Harkaru and India Gazette'-এ প্রকাশিত একটি পত্রের অংশ তুলে দিচ্ছি: "The liberal *viavustha* which he (রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ) recently gave regarding the remarriage of Hindoo widows, on the application of the Bengal British India Society, should rank him at the head of Hindoo reformers."

বাঙলা ১২৫৩ সনে রামজয় শর্মার 'বিধবা বিবাহ নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। বিধবা-বিবাহ বিরোধী এই পুস্তিকার 'ভূমিকা' উদ্ধৃত করি: "বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ হইবার শাস্ত্র প্রচার করিয়া কোন পণ্ডিতাভিমানী এক ব্যবস্থা পত্র প্রস্তুত করত বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাটী নামক সমাজে প্রেরণ করিয়াছিলেন অভিপ্রায় তদ্দ্বারা তাহা গবর্ণমেণ্টে প্রদত্ত হয় কিন্তু ঐ সমাজের সম্পাদক শ্রীযুত উলিয়ম থিওবোল্ড সাহেব ঐ ব্যবস্থার যাথার্থ্যাযাথার্থ্য নিশ্চয় করণার্থ স্বীয়াভিপ্রায়ক লিপি সম্বলিত ঐ ব্যবস্থাপত্র ধর্ম্মসভায় প্রেরণ করেন অনন্তর ধর্ম্মসভাধ্যক্ষ পণ্ডিতগণ কর্তৃক তদুত্তর ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত হইয়া উক্ত সম্পাদকের নিকট পাঠান গিয়াছে তাহার মর্ম্মার্থ সর্ব্বসাধারণ গোচরার্থ তদবিকল সংস্কৃত এবং তদীয় ভাষার্থ সমাজের অনুজ্ঞানুসারে প্রকাশ করা গেল যদ্যপিও বিশিষ্ট শিষ্ট ধর্ম্মিষ্ঠগণের বিলক্ষণ বিজ্ঞান আছে যে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ হইবার শাস্ত্র নাই তথাপি অজ্ঞ

অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পূর্ব্বোক্ত বিরুদ্ধ ব্যবস্থাভাসে মনশ্চাঞ্চল্য না জন্মে তজ্জন্য এই প্রাড়ম্বর সুতরাং করিতে হইল ইতি—"

ওই পুস্তিকায় রামজয় শর্মা ছাড়া আরো এগারোজন পণ্ডিত স্বাক্ষর করেছেন।

ওই পুস্তিকা থেকে একাংশ তুলে দিচ্ছি : "স্ত্রীলোকের পুনর্বিবাহে পাতিত্য জন্মে, ও দৈবপিতৃকর্ম্মে অধিকার থাকে না, বধার্হা হয়, বিবাহ সিদ্ধি হয় না, কুল অধম হয়, কুল বিনাশ পায়, সাধুদিগের অনাচরণীয় কর্ম্ম করা হয়, এবং তাহা অনাদি ধর্ম্ম নয়, ও বিদ্বানের দিগের অনাদরণীয়, এজন্য তাহা সর্ব্বদেশ সর্ব্বজাতি সর্ব্বকুলের বিরুদ্ধ ও বেশ্যার ন্যায় ধর্ম্ম সেই হেতুক সাধুরা স্ত্রীদিগের পুনর্বিবাহ বিষয়ে কখন পোষকতা করিবেন না এই ব্যবস্থাই অতি-সাধু ও সৎসম্মত ইতি।"

'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৮৫০ সালের আগষ্ট মাসে। প্রথম সংখ্যাতেই বিদ্যাসাগরের 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামে একটি রচনা আছে।

বিদ্যাসাগরের সমাজচিন্তার প্রথম ফল এই 'বাল্যবিবাহের দোষ'। সেদিক থেকে এই রচনাটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। এই রচনাটি থেকে জানা যাচ্ছে বিদ্যাসাগর তখন থেকেই বিধবাদের দুঃখে ব্যথিত। 'বাল্যবিবাহের দোষ' থেকে সামান্য অংশ তুলে দিচ্ছি : "বিধবার জীবন কেবল দুঃখের ভার। এবং এই বিচিত্র সংসার তাহার পক্ষে জনশূন্য অরণ্যাকার। পতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমস্ত সুখ সাঙ্গ হইয়া যায়। এবং পতিবিয়োগদুঃখের সহ সকল দুঃসহ দুঃখের সমাগম হয়। উপবাস দিবসে পিপাসা নিবন্ধে কিম্বা সাংঘাতিক রোগানুবন্ধে যদি তাহার প্রাণাপচয় হইয়া যায়, তথাপি নির্দ্দয় বিধি তাহার নিঃশেষ নীরস রসনাগ্রে গণ্ডূষমাত্র বারি বা ঔষধ দানেরও অনুমতি দেন না।"

১৮৫২ সালের ২৩-মার্চ 'The Bengal Hurkaru' লিখেছে :

"THE HINDU "WIDOW MARRIED."—A report is current in the native quarter of the town that an educated native of a liberal cast of mind has married a *widow*. The nuptials, it is said, have been celebrated in the Mofussil, where both the parties with their families are on a tour."

১৮৫২ সালের ২৫-মার্চের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত 'বরাহনগর বাসিনী বিরহিণী বিধবা' রচিত 'বসন্তের প্রতি বিধবার উক্তি' নামক একটি পদ্য থেকে একাংশ উদ্ধার করি :

"কিন্তু কি দুঃখিনী নারী, পতি হীনা যারা।
সৃষ্টির বিশেষ সুখ, নাহি পায় তারা।...
পুষ্পের সৌরভ মাখি, বায়ু মন্দ চলে।
ঘৃতের আহুতি যেন জ্বলন্ত অনলে॥
পিক করে, কুহু কুহু, ভৃঙ্গ গুণগুণ।
বিধবার, বাঁচা ভার, কাটাঘায়ে নুন॥
অতএব হে বসন্ত, মম বাক্য লও।
কিছুকাল এদেশেতে, ক্ষান্ত হোয়ে রও॥

কয়জন জ্ঞানি বাবু, ভ্রমনিদ্রা হত।
বিধবার বিয়ে দিতে, হোয়েছেন রত॥
মন খুলে আশীর্ব্বাদ, করিতেছি সবে।
বাবুদের অভিলাষ পরিপূর্ণ হবে॥
উঠিয়া লাগুন্ সব, দৃঢ় অনুরাগে।
পরে হবে, পরে পরে, ঘরে ঘরে আগে॥
পাড়ার ছোঁড়ারা সব, করিছে রটনা।
শুনিলাম কোথা নাকি, হোয়েছে ঘটনা॥
ঋতুরাজ, এই কথা, সত্য যদি হয়।
তবে আর কিছু আমি, করিনেকো ভয়॥...”

১৮৫৪ সালের ১৫-ডিসেম্বর কাশীপুরে কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাড়িতে সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ সমিতি স্থাপিত হয়েছে। সভাপতি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কার্যনির্বাহক সমিতিতে বারোজন সভ্য : সত্যচরণ ঘোষাল; প্যারীচাঁদ মিত্র; হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়; চন্দ্রশেখর দেব; রাজেন্দ্রলাল মিত্র; ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র; শ্যামাচরণ সেন; দিগম্বর মিত্র; যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; গৌরদাস বসাক; অক্ষয়কুমার দত্ত; কিশোরীচাঁদ মিত্র। ওই সভায় কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রস্তাব করেছেন এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সমর্থন করেছেন যে স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন, হিন্দুবিধবার পুনর্বিবাহ, বাল্যবিবাহ বর্জন এবং বহুবিবাহ-প্রচলনরোধের জন্য সমিতির শক্তি বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হোক। “বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রস্তাব করেন এবং বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র সমর্থন করেন যে, উক্ত প্রস্তাব অনুসারে এই সমিতি হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের আইন সম্বন্ধীয় অক্ষমতা দূর করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন করা হউক এবং আপাততঃ অনতিবৃহৎ আয়োজনে নগরের উপকণ্ঠে অথবা ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রযত্ন ও প্রচেষ্টা করা হউক।”[৫]

শশিভূষণ সিংহ বিদ্যাসাগরের আপন গ্রামের মানুষ। শশিভূষণকে ভালোবাসতেন বিদ্যাসাগর। এককালে বিদ্যাসাগরের মুখে অল্পবয়সী একটি বিধবার দুঃখের কাহিনী শুনেছিলেন শশিভূষণ। উত্তরকালে শশিভূষণ বলেছেন :

“বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটী বাল্য-সহচরী ছিল। সেই সহচরী তাঁহার কোন প্রতিবেশীর কন্যা। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। বালিকাটী বাল্যকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সর্ব্বদা থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কলিকাতায় পড়িতে আসেন, তখন বালিকার বিবাহ হয়; কিন্তু বিবাহের কয়েক মাস পরে তাহার বৈধব্য ঘটে। বালিকাটী বিধবা হইবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের ছুটিতে বাড়ীতে গিয়াছিলেন। বাড়ী যাইলে তিনি প্রত্যেক প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, কে কি খাইল? ইহাই তাঁহার স্বভাব ছিল। এবার গিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার বাল্যসহচরী কিছু খায় নাই; সে দিন তাহার একাদশী; বিধবাকে খাইতে নাই। এ কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার সংকল্প হইল, বিধবার এ দুঃখ মোচন করিব; যদি বাঁচি, তবে যাহা হয়, একটা করিব। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়স ১৩।১৪ বৎসর মাত্র হইবে।”[৬]

অনেকদিন চলে গেছে তারপর।

দিনের পর দিন ভেবেছেন বিদ্যাসাগর। দিনের পর দিন পুঁথির পাতায়-পাতায় খুঁজেছেন।

বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন : "তিনি (বিদ্যাসাগর) রাত্রে ঘুমাইতে পারিতেন না। তিনি দিন দিন এই চিন্তায় এতদূর নিমগ্ন হইলেন যে, আহার নিদ্রা ভুলিয়া গেলেন। সে সময়ে তাঁহার পরিশ্রম যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের মুখে শুনিতে পাই যে, তিনি সংস্কৃত কালেজের পুস্তকালয়েতে বাসা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কি প্রাতে, কি মধ্যাহ্নে, কি রাত্রে যখন যাও, দেখিবে বিদ্যাসাগর মহাশয় পুস্তকরাশির মধ্যে নিমগ্ন; মনোযোগ সহকারে কেবল বিবিধ শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন ও গভীর রূপে শাস্ত্রের বিচারে নিযুক্ত রহিয়াছেন। একবার এক মুষ্টি অন্ন মুখে দিবার জন্য বাহিরে যাইতেন, তদ্ভিন্ন সমুদয় সময় শাস্ত্র পাঠে যাপন করিতেন। এখন অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু রাশীকৃত হাতে লেখা পুথী পড়িয়া তাঁহাকে এক একটী বচন সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।"[৭]

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "শুনিয়াছি, এই সময়ে তিনি (বিদ্যাসাগর) দ্বিপ্রহরে সময়ে কেবল একবার বন্ধুবর রাজকৃষ্ণ বাবুর গৃহে আহার করিতে যাইতেন। কালেজের কার্য্য শেষ করিয়া অপরাহ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাত্রি সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাগারে পুস্তকরাশির মধ্যে মগ্ন থাকিতেন এবং গ্রন্থ-কীটের ন্যায় পুঁথির পত্রে পত্রে বিচরণ করিতেন। সন্ধ্যার পর কালেজের নিকটস্থ তাঁহার পরম বন্ধু শ্যামবাবুর বাটী হইতে যৎকিঞ্চিৎ জলখাবার আসিত, কোন দিন বা ক্ষণকালের জন্য নিজে গিয়া শ্যামবাবুর বাটীতে জলযোগ করিয়া আসিতেন। এইরূপে বহুদিন কাটিয়াছে। শাস্ত্রালোচনায় এইরূপ নিয়ত নিযুক্ত থাকার সময়ে একদিন রাত্রি শেষে একটা বিষয়ে শাস্ত্রার্থের সংগতি নির্ণয় করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণমনে বাসায় যাইতে-ছিলেন, পথে সহসা প্রজ্ঞাদেবীর কৃপা হইল, দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, ঐ শ্লোকের অর্থ কিরূপ হইবে। তৎক্ষণাৎ তাড়িত প্রবাহের ন্যায় সেই পরিশ্রান্ত শরীরে ও ক্লীষ্ট মনে নূতন শক্তির সঞ্চার হইল। তিনি গৃহে না গিয়া সংস্কৃত কালেজে আবার ফিরিয়া আসিয়া পরিত্যক্ত শ্লোকের অর্থ লিখিতে আরম্ভ করিলেন! এইরূপে শাস্ত্র চর্চ্চা করিতে করিতে রজনী শেষ হইল।"[৮]

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : "১২৬০ সালের বা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে একদিন রাত্রিকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও আমি একত্র বাসায় ছিলাম। আমি পড়িতেছিলাম। তিনি একখানি পুঁথির পাতা উল্টাইতেছিলেন। এই পুঁথিখানি পরাশর-সংহিতা। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ তিনি আনন্দ বেগে উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন,—'পাইয়াছি, পাইয়াছি।' আমি জিজ্ঞাসিলাম,—'কি পাইয়াছ?' তিনি তখনই পরাশর-সংহিতার সেই শ্লোকটী আওড়াইলেন,—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধিয়তে।"*[৯]

---

* কার্তিকেয়চন্দ্র রায় লিখেছেন : "পরাশরোক্ত যে বচন মূল করিয়া, মহামতি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিধবা-বিবাহের অখণ্ডনীয় ব্যবস্থা দেন, রাজা (শ্রীশচন্দ্র), অনেক দিন পূর্ব্বে, সেই বচন সহায় করিয়া, বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন, এবং যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি বিধবা-বিবাহের



ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়



ভগবতী দেবী



যৌবনকালে বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "(বিদ্যাসাগর) বিধবাবিবাহবিষয়ক একখানি শাস্ত্রসম্মত ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়া সর্ব্বপ্রথমে পিতার নিকট গিয়া বলিলেন,—"দেখুন, আমি শাস্ত্রাদি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বিধবা-বিবাহের পক্ষ সমর্থনের জন্য এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছি। আপনি শুনিয়া এ বিষয়ে আপনার মত না দিলে আমি ইহা প্রকাশ করিতে পারি না।" পিতা পুত্রকে বলিলেন, "যদি আমি এ বিষয়ে আমার মত না দিই, তবে তুমি কি করিবে?" পুত্র বলিলেন, "তাহা হইলে আমি আপনার জীবদ্দশায় এ গ্রন্থ প্রচার করিব না। আপনার মৃত্যুর পর আমার যেরূপ ইচ্ছা হইবে, সেইরূপ করিব।" পিতা বলিলেন, "আচ্ছা, কাল্ একবার নির্জ্জনে বসিয়া মনোযোগসহকারে সকল বিষয় শুনিব, পরে আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিব।" পরদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতার নিকট বসিয়া গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। পিতা সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "তুমি কি বিশ্বাস কর, যাহা লিখিয়াছ তাহা সমস্ত শাস্ত্রসংগত হইয়াছে?" পুত্র বলিলেন, "হাঁ, আমার তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।" তখন পিতা বলিলেন, "তবে তুমি এ বিষয়ে বিধিমতে চেষ্টা করিতে পার, আমার তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই।" পিতার আদেশ পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় হৃষ্টমনে জননীর নিকট গমন করিলেন এবং মাকে বলিলেন, "মা তুমি ত শাস্ত্রটাস্ত্র কিছু বুঝিবে না, আমি এই বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে একখানি বই লিখিয়াছি, কিন্তু তোমার মত না পেলে এ বইখানি ছাপাইতে পারি না। শাস্ত্রে বিধবাবিবাহের বিধি আছে।" উন্নতমনা সহৃদয়া জননী অমনি বলিলেন, "কিছুমাত্র আপত্তি নাই, লোকের চক্ষুশূল,—মঙ্গল কর্ম্মে অমঙ্গলের চিহ্ন,—ঘরের বালাই হইয়া নিরন্তর চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে যাহার দিন কাটিতেছে, তাহাকে সংসারে সুখী করিবার জন্য উপায় করিবে, আমার সম্পূর্ণ মত আছে। তবে এক কাজ করিবে, যেন ওঁকে (কর্ত্তাকে) বলিও না।" পুত্র বলিলেন, "কেন মা?" জননী বলিলেন, "তাহা হইলে উনি বাধা দিতে পারেন। কারণ তুমি বিধবাবিবাহের গোলযোগ তুলিলে ওঁর অনেক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, "বাবা মত দিয়াছেন।" জননী একথা শুনিবামাত্র আরও দশগুণ উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "তবে বেশ হইয়াছে, তবে আর ভয় কি?"..."[১০]

অবশ্য এ-বিষয়ে মতান্তর আছে।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন :

"এক দিবস পিতৃদেব ও বিদ্যাসাগর বীরসিংহের বাটীতে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে, জননী দেবী একটি বালিকার বৈধব্য উল্লেখ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বলিলেন, তুই এতদিন যে শাস্ত্র পড়িলি, তাহাতে বিধবাদের কোন উপায় নাই কি? ইহা শুনিয়া পিতৃদেব বলিলেন, ঈশ্বর! ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধবাবিবাহের কি কি ব্যবস্থা আছে? অগ্রজ উত্তর করিলেন, শাস্ত্রে প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য্য, অভাবে সহমরণ বা বিবাহ। পিতৃদেব বলিলেন, রাজ আজ্ঞায় সহমরণ প্রথা নিবারিত হইয়াছে। কলিতে ব্রহ্মচর্য্য সহজ নহে, সুতরাং বিবাহই একমাত্র উপায়। অতএব তুমি পুনরায় ভাল

প্রসঙ্গে, ঐ বচন উল্লেখ করেন।" (কার্তিকেয়চন্দ্র রায় : ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত, পৃ. ২১১।)

একথা সত্য বলে মনে হয় না। একথা সত্য হলে বিধবা-বিবাহের পক্ষে শাস্ত্রবচন উদ্ধারের জন্য বিদ্যাসাগরের বিপুল পরিশ্রমের কোনো প্রয়োজন থাকত না।

করিয়া শাস্ত্র দেখিয়া ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ করিবার জন্য যত্নবান হও। এবং এবিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে লোকের নিন্দাবাদে বা অপর কোন কারণে পশ্চাৎপদ হইবে না; এমন কি তোমার পিতা মাতা আমরা নিবারণ করিলেও ক্ষান্ত থাকিবে না। পুস্তক প্রচার হইবার অল্পদিন পরে পিতৃদেব কলিকাতায় বহুবাজারে পঞ্চাননতলার বাসায় ডাক্তার নবীনচন্দ্র মিত্র ও অগ্রজের সহিত কথোপকথনে হাস্যবদনে বলিলেন, ঈশ্বর আর তোমাকে আমার শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। ইহা শুনিয়া অগ্রজ সহাস্যমুখে বলিলেন, খরেদরে এক আঁঠু অর্থাৎ ভাল-মন্দ সুখ্যাতি অখ্যাতি দুই আছে। পিতৃদেব বলিলেন, বাবা ধরেছ ছেড়ো না, প্রাণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিও। এই অভিপ্রায়েই পূর্ব্বে বীরসিংহের চণ্ডীমণ্ডপে আমরা উভয়েই তোমাকে বলিয়াছিলাম।"*[১১]

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন : "সাধারণতঃ লোকের একটা ধারণা আছে যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতার আগ্রহে এই বিধি প্রচলিত করা হয়; কিন্তু আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে একটু অন্যরূপ শুনিয়াছি। যখন বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, ইহা তিনি স্থির করিয়াছিলেন, তখন একদিন তাঁহার মাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'মা, আমি একটা কায করতে যাচ্ছি, তাতে তুই কি বলিস্? (বিদ্যাসাগর শেষ পর্য্যন্ত মাকে "তুই তোকারি" এই ভাবে কথা কহিতেন)। আমার বোধ হয় বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আমি তাই বিধবাবিবাহের আইন পাশ করাবার চেষ্টা কর্‌ব ভাবছি; কিন্তু আগে আমি তোর একটা মত নিতে ইচ্ছা করি। এ কায তুই ভাল বলিস্ কি না?' মা একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন 'তুই কি ঠিক বুঝেছিস্ যে বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত?' আমি বলিলাম—'হাঁ! আমি অনেক বিবেচনা করে দেখলাম যে, বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত,—এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।' তখন তিনি বলিলেন, 'তবে আমি তোকে বারণ করি না, তুই এ কায করগে যা;—যে যা বলে বলুক।"[১২]

'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' নামে বিদ্যাসাগরের একখানা বই বেরিয়েছে ১৮৫৫ সালের জানুআরি মাসে। রচনাটি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তেও আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত হয়েছে।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "অগ্রজের উক্ত প্রস্তাবের দশ বৎসর পূর্ব্বে বহুবাজারনিবাসী বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় ভবনে কতকগুলি আত্মীয় লোককে ঐক্য করিয়া বিধবাবিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।"[১৩]

বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

"আমার পুস্তক সঙ্কলিত, মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে, কলিকাতার অন্তঃপাতী পটলডাঙ্গানিবাসী শ্রীযুত বাবু শ্যামাচরণ দাস, নিজ তনয়ার বৈধব্য দর্শনে দুঃখিত হইয়া, মনে মনে সঙ্কল্প করেন, যদি ব্রাহ্মণ

---

* চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মা ও ছেলে' নামক গ্রন্থ বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "...'মা ও ছেলে' নামক গ্রন্থে...ভগবতী দেবীর পবিত্র চরিত-কাহিনী সম্বন্ধে কয়েকটী আখ্যায়িকা লিখিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে সেগুলির প্রুফ দেখিয়া দিয়াছিলেন। বিধবা-বিবাহ বিষয়ে তাঁহার জননীর কতটুকু সম্বন্ধ ছিল, তাহাও প্রসঙ্গক্রমে সেখানে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার জননীর অনুরোধের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।" (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৬৩)

পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দেন, পুনরায় কন্যার বিবাহ দিব। তদনুসারে তিনি সচেষ্ট হইয়া বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদক এক ব্যবস্থা পত্র সংগ্রহ করেন।...উহাতে 'কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, শ্রীযুত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে।

...কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এক্ষণে প্রায় সকলেই বিধবাবিবাহের বিষয় বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছেন। ইঁহারা পূর্ব্বেই কি বুঝিয়া, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলিয়া, ব্যবস্থাপত্রে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন; আর, এক্ষণেই বা কি বুঝিয়া, বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া, বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম ইঁহারাই বলিতে পারেন।"

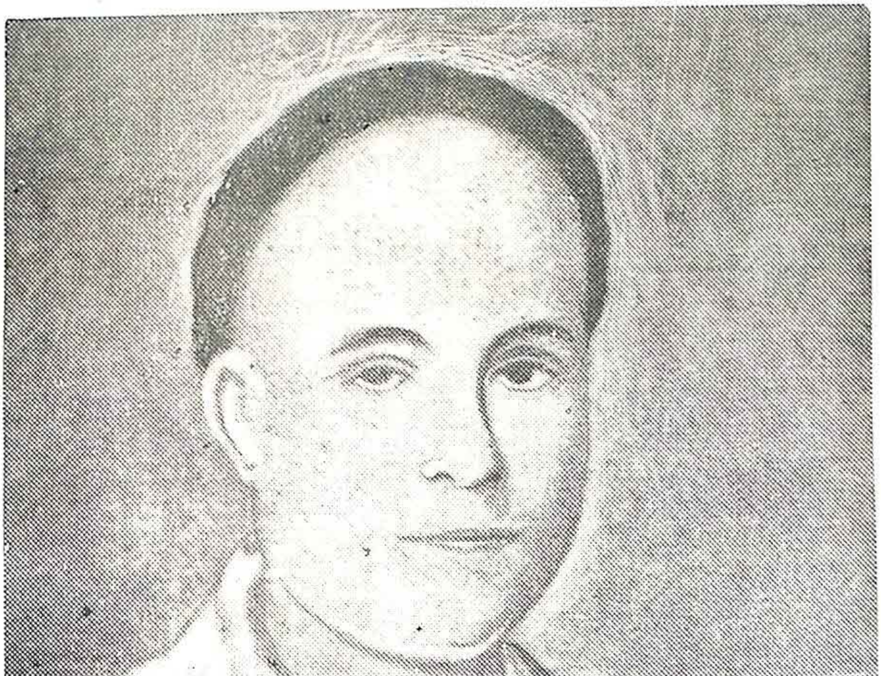
'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' থেকে ঈষদংশ উদ্ধার করি : "দুর্ভাগ্যক্রমে বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা, যাঁহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন। কত শত শত বিধবারা ব্রহ্মচর্য্যনির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া, ব্যভিচারদোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হইতেছে; এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণার নিবারণ, ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের পরিহার, ও তিন কুলের কলঙ্কবিমোচন হইতে পারে। যাবৎ এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইতেছে, তাবৎ ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ, ও বৈধব্যযন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবেক।"

১৭৭৬ শকের চৈত্রমাসে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লিখেছে : "কয়েক বৎসরের মধ্যে বিধবাগণের পুনঃসংস্কার প্রচলিত হইবার বিষয় এতদ্দেশে বারম্বার উত্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এবৎসর এই বিষয় লইয়া যাদৃশ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাদৃশ আন্দোলন অন্য কোন বৎসর হয় নাই। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বিধবাবিবাহ বিষয়ক যে পুস্তক পূর্ব্বমাসের পত্রিকায় প্রকটিত হইয়াছে, তাহাই ঐ আন্দোলনের মূলীভূত। অপর সাধারণ সকল লোকেই ঐ পুস্তক অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত বিষম ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে, ইদানীং ঐ বিষয়ই সর্ব্বত্র সকল লোকের কথোপকথনের প্রধান বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা শঙ্কিত ও চমকিত হইয়া বিধবাবিবাহের নিষেধক বচনের অন্বেষণার্থ অতিবিবর্ণ, কীট-নিষ্কুশিত, পুরাতন, জীর্ণ পুস্তক প্রভৃতি অশেষ গ্রন্থ উদ্‌ঘাটন ও পর্য্যালোচন করিতেছেন, কুসংস্কারপরতন্ত্র প্রাচীন-সম্প্রদায়ী ধনাঢ্য মহাশয়েরা আপনাদিগের গণাক্রান্ত পণ্ডিতবর্গকে পারিতোষিক প্রদানের আশ্বাস দিয়া বিদ্যাসাগর-প্রণীত পূর্ব্বোক্ত পুস্তকের নিরাকরণার্থ নিয়োজন করিতেছেন, কি ইংরেজি কি বাঙ্গলা, এতদ্দেশীয় সমুদায় সংবাদপত্রই ঐ বিষয়ের জল্পনায়, ঐ বিষয়ের আলোচনায়, ও ঐ বিষয়ের বিচারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে ঐ বিষয়ের অনুকূল ও প্রতিকূল দ্বিবিধ সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়া ঘোরতর বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ ঐ বিষয়ে সপক্ষ হইয়া উহার সংসাধনার্থ আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেছে। কেহ কেহ শাস্ত্র ও যুক্তি এই উভয়ের কিছুই অবলম্বন না করিয়া চিরাবলম্বিত কুসংস্কার বশতঃ বিষম বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছে। কেহ কেহ ঐ বিষয় প্রচলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া

মনে মনে স্থির করিয়াছেন, কিন্তু দলপতির ক্রোধাশঙ্কায়, অথবা লোকানুরাগের ব্যতিক্রম ভয়ে, বাক্যস্ফুট করিতে সমর্থ হন না। যদিও ঐ বিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় ঐ পত্রিকায় অনেকবার প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি এতাদৃশ অসাধারণ আন্দোলনের সময়ে ঐ প্রস্তাবের মীমাংসা পক্ষে সাধ্যানুসারে যত্ন করা কর্ত্তব্য। উল্লিখিত পুস্তকে বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার বিষয়ে যেরূপ সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত বিষয় শাস্ত্রানুসারে বৈধ বলিয়া এতদ্দেশীয় লোকের অনায়াসেই বিশ্বাস হইতে পারে*। আর যাহারা নিরপেক্ষ যুক্তি-পথ অবলম্বন করিয়া বিবেচনা করিবেন, বিধবা-বিবাহ এই দণ্ডেই প্রচলিত করা আবশ্যক বলিয়া তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে।...

যাঁহার কিছুমাত্রও হিতাহিত বোধ আছে, ও যাঁহার অন্তঃকরণে কস্মিন্-কালে কারুণ্য-রসের সঞ্চার হয়, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?" যিনি কোন নব-বিধবা তরুণী স্ত্রীকে সদ্য-মৃত প্রিয় পতির শোক-মোহে মুহ্যমানা, ধরাতলে লুণ্ঠমানা ও অহর্নিশ রোরুদ্যমানা দর্শন করিয়া কাতর হইয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?" যিনি দেখিয়াছেন, যে সাধ্বী রমণী মাস-দ্বয় পূর্ব্বে স্বামি-সমাদরে মানিনী ও গৌরবিণী বলিয়া স্ত্রীজনের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল, সেই স্ত্রী মাস-দ্বয় পরে একান্ত অনাথা ও নিতান্ত সহায়-হীনা হইয়া দীনভাবে, শীর্ণ শরীরে, সাশ্রু নয়নে, দিন পাত করিতেছে, এবং স্বামি-সম্পর্কীয় বিদ্বেষিণী রমণীগণ কর্ত্তৃক নানা প্রকারে নিগৃহীত ও পরিবারস্থ দাস-দাসীগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত ও অশ্রদ্ধিত হইয়া কাতর স্বরে প্রতিবেশী-দিগের দয়ার্দ্র হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?" যে রূপবান্ যুবা পুরুষ প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী, নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, লোকজন দাসদাসীতে পরিবেষ্টিত, গৃহ মধ্যে উৎসব-ব্যাপারে সতত ব্যাপৃত, সেই ব্যক্তিকে যিনি অতিবাল-বিধবা অনাথা দুহিতার ম্রিয়মাণ মুখ-চন্দ্র সহসা স্মরণ করিয়া অকস্মাৎ অবসন্ন হইতে, এবং চির-প্রদীপ্ত সুদারুণ শোক-শিখা সদৃশ ভয়ঙ্কর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে, দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?" যিনি দেখিয়াছেন, যে পবিত্র কুলে কোন কালে কলঙ্ক-স্পর্শের বাষ্পও শ্রুত হয় নাই, সেই কুলের কোন যুবতী স্ত্রী অসহ্য বৈধব্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পিতৃ-কুল, মাতৃ-কুল ও ভর্ত্তৃ-কুল চিরকালের মত কলঙ্কিত করিয়াছে এবং ভ্রূণবধ-জনিত অশুদ্ধ শোণিত সংস্পর্শে লোকমাতা বসুন্ধরাকে বারম্বার অশৌচ-গ্রস্ত করিয়াছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?" কোন পতি-বিহীনা পীড়িতা স্ত্রী তিথি-বিশেষে পথ্যাভাবে নিতান্ত নির্জীব হইল, তথাপি কেহ কণামাত্র আহার-সামগ্রী অর্পণ করিল না!—জল-

* ইতিমধ্যেই উক্ত পুস্তকের প্রত্যুত্তর স্বরূপ চারি পাঁচখানি গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। তাহাতে যেরূপ প্রমাণ ও যেরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, বিধবা-বিবাহের প্রতিবেধ পক্ষে যদি তদপেক্ষায় প্রবলতর প্রমাণ ও প্রবলতর যুক্তি না থাকে, তবে নিশ্চয় জানা গেল, বিধবা-দিগের পুনঃসংস্কার ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বতোভাবেই বিধেয়। যে ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন মহাশয় ন্যূনাধিক দেড় বৎসর পূর্ব্বে এই বিষয় প্রচলিত করা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিচার করিয়াছিলেন, উল্লিখিত কয়েকখানি গ্রন্থের একখানি তাঁহারই সহায়তায় প্রস্তুত হইয়াছে।



যৌবন বয়সে বিদ্যাসাগর



রাধাকান্ত দেব



মিস মেরী কার্পেণ্টার

তৃষ্ণায় তালু ও কণ্ঠ পরিশুষ্ক হইয়া, দুই চক্ষু স্থিরীকৃত করিয়া, প্রাণত্যাগ করিল, তথাপি কেহ জল-বিন্দু প্রদান করিল না, এই হৃদয়-বিদারক ব্যাপার যিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?"

সেসময়ে শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রবল প্রতিপত্তি।

রাজা রাধাকান্তের দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসু বিদ্যাসাগরের বন্ধু।

আনন্দকৃষ্ণ বসু বলেছেন :

"বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত কি না, এই সম্বন্ধে পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া, বিদ্যাসাগর আমাদের বাড়ীতে আসেন। তাঁহার পুস্তিকার সুন্দর লিপি-চতুরতা ও তর্ক-প্রখরতা দেখিয়া আমরা বিমোহিত হইয়াছিলাম। আমরা বলিলাম, 'এখন তুমি পুস্তিকা প্রচার করিয়া তোমার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা কর।' বিদ্যাসাগর বলিলেন, 'যখন এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন ইহার জন্য প্রাণান্ত পণ জানিও। ইহার জন্য যথাসর্ব্বস্ব দিব। তবে তোমার মাতামহ যদি সহায় হন, তবে এ কার্য্য অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ও সহজে সিদ্ধ হইবে। সমাজে ও রাজদরবারে তাঁহার যেরূপ সম্মান, তিনি সহায় হইলে, সমাজে সহজে আমার প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবে।' আমি বলিলাম, 'দাদা মহাশয়ের সম্মুখীন হইয়া, একথা বলিতে সাহস হয় না। তিনি আমাদিগকে যথেষ্ট ভালবাসেন সত্য; তাঁহার নিকট এরূপ সামাজিক কথার উত্থাপন করাকে ধৃষ্টতা মনে করি। তুমি স্বয়ং একখানি পত্র লিখিয়া একখণ্ড পুস্তিকা তাঁহার নিকট প্রেরণ কর।' বিদ্যাসাগর আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, পত্রসহ একখণ্ড পুস্তিকা মাতামহ মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন। মাতামহ মহাশয় তাঁহার পুস্তিকা পড়িয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ডাকাইয়া বলেন, 'দেখ তুমি যে প্রণালীতে পুস্তিকা লিখিয়াছ, তাহা অতি মনোহর। তবে আমি বিষয়ী লোক, এ সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার করা আমার সাধ্যাতীত এবং অসঙ্গত। একদিন পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া এ সম্বন্ধে বিচার করাইবার ইচ্ছা করি। তুমি যদি সম্মত হও, তাহা হইলে দিন ধার্য্য করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান করি।' বিদ্যাসাগর সম্মত হইলেন। নির্দ্ধারিত দিনে অনেক পণ্ডিত ও বিদ্যাসাগর আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেদিন কোন মীমাংসা হয় নাই বটে; তবে, বিদ্যাসাগরের তর্কপ্রণালীতে মাতামহ মহাশয় পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে একখানি সাল উপহার দিয়াছিলেন।* বিদ্যাসাগরকে পুরস্কৃত হইতে দেখিয়া, তাৎকালিক সমাজপতিরা সিদ্ধান্ত করিলেন, রাজা রাধাকান্ত দেব বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের পক্ষপাতী। একদিন বড়বাজারের গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের প্রধান ব্যক্তিপ্রমুখ সমাজপতিরা মাতামহ মহাশয়ের নিকটে আসিয়া বলিলেন, 'আপনি কি সর্ব্বনাশ করিলেন! আপনি কি হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহরূপ পাপপ্রথার প্রচলন করিতে চাহেন? বিদ্যাসাগরকে পুরস্কৃত করিলেন কেন?' ইহাতে মাতামহ মহাশয় উত্তর দিলেন, 'আমি বিধবা-বিবাহ-প্রচলনের পক্ষপাতী নহি। আমার তাহাতে অধিকার কি? আমি বিষয়ী লোক, শাস্ত্রবিচারের বা কি জানি। তবে বিদ্যাসাগরের তর্ক-প্রণালীতে তুষ্ট

* বার্দ্ধক্যে স্মৃতিহ্রাস জন্য এই সাল-উপহারের কথা আনন্দবাবু দৃঢ় করিয়া বলেন নাই।

কোথা বা করিছে লোক শুধু হেউ হেউ।
কোথা বা বাঘের পিছে লাগিয়াছে ফেউ॥
অনেকেই এইমত লতেছে বিধান।
"অক্ষতযোনির" বটে বিবাহ-বিধান॥
কেহ বলে ক্ষতাক্ষত কেবা আর বাছে?
একেবারে তরে যাক্ যত রাঁড়ী আছে॥
কেহ কহে এই বিধি কেমনে হইবে।
হিঁদুর ঘরের রাঁড়ী সিঁদুর পরিবে॥
বুকে ছেলে কাঁকে ছেলে ছেলে ঝোলে কোলে।
তার বিয়ে বিধি হয় উলু উলু ব'লে॥
গিলে গিলে ভাত খায় দাঁত নাই মুখে।
হইয়াছে আঁত খালি হাত চাপা বুকে॥
ঘাটে যারে নিয়ে যাব চড়াইয়া খাটে।
শাড়ীপরা চুড়ি হাতে তারে নাকি খাটে॥
শুনিয়া বিয়ের নাম "কোনে" সেজে বুড়ী।
কেমনে বলিবে মুখে "থুড়ী থুড়ী থুড়ী"॥
পোড়ামুখ পোড়াইয়া কোন্ পোড়ামুখী।
'দুখী' 'সুখী' মেয়ে ফেলে কেঁচে হবে খুকী॥
ব্যাটা আছে যার তার বেলগাছ এঁচে।
তুড়ী মেরে থুড়ী ব'লে সে বসিবে কেঁচে॥
গমনের আয়োজন শমনের ঘরে।
বিবাহের সাধ সে কি মনে আর করে॥
যেখানে সেখানে শুনি এই কলরব।
বালার বিবাহ দিতে রাজি আছে সব॥
সকলেই এইরূপ বলাবলি করে।
ছুঁড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ী নাহি তরে॥
শরীর পড়েছে ঝুলি চুলগুলি পাকা।
কে ধরাবে মাছ তারে কে পরাবে শাঁখা॥
জ্ঞানহারা হয়ে যাই নাহি পাই ধ্যানে।
কে পাইবে "সৎবাপ" মায়ের কল্যাণে॥"

দাশরথি রায় লিখেছেন :

"ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দোষ দেওয়া মিথ্যা—ইহা ঈশ্বরের কার্য্য।

সিন্ধুভৈরবী—কাওয়ালী।

তোমরা এই ঈশ্বরের দোষ ঘটাবে কিরূপে?
রাখিতে ঈশ্বরের মত, হইয়ে ঈশ্বরের দূত,
এসেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগর-রূপে॥
রাজ-আজ্ঞায় দূতে আসি, কাটে মুণ্ড দিয়ে অসি,
রশি দিয়ে ফেলে অন্ধকূপে,—
তা ব'লে দূতে কখন দূষী হয় সেই পাপে?

হইয়া, তাঁহাকে সাল পুরস্কার দিয়াছিলাম। ভাল, এতৎসম্বন্ধে পণ্ডিত-মণ্ডলীর সভা করিয়া, আর এক দিন বিচার করাইলেই হইবে।' অতঃপর আমাদের বাড়ীতে আর এক দিন পণ্ডিতমণ্ডলীর সভা হইয়াছিল। ঐ দিন নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন উপস্থিত ছিলেন। এ দিনেও বিচারে কিছুই মীমাংসা হয় নাই। বিচারকালে কেবল একটা গণ্ডগোল হইয়াছিল মাত্র। এদিন মাতামহ মহাশয়, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়কে সাল পুরস্কার দিয়াছিলেন। অতঃপর বিদ্যাসাগর বুঝিয়াছিলেন, মাতামহ মহাশয়ের নিকট তিনি কোনরূপ সাহায্য পাইবেন না।...ইহার পর বিদ্যাসাগর আমাদের বাটীতে বড় আসিতেন না। মাতামহ মহাশয় তাঁহার জীবনব্রতের সহায় না হইলেও তাঁহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন।"[১৪]

যা হোক, বিদ্যাসাগরের ওই বই হু-হু করে বিক্রী হয়ে গেল, সমস্ত দেশে সাড়া পড়ে গেল। লোকের মুখে কেবল ওই বিধবা-বিবাহ নিয়ে আলোচনা। বিদ্যাসাগর লিখে দিয়েছেন, আমাদের শাস্ত্রে বিধবাদের বিবাহের বিধি আছে।

"বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তক প্রচারিত হইলে, আপামর সাধারণ সর্ব্ববিধ লোকের মধ্যে, বিধবার বিবাহ লইয়া...অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব আন্দোলন হইয়াছিল...। ঐ সময়ে, এক দিন, হুগলি জিলার অন্তঃপাতী এক গ্রামে, পঞ্চায়ত উপলক্ষে, দুলিয়া বেহারাদিগের এক জাঁকাল মজলিস হইয়াছিল। পঞ্চায়তের কার্য্য শেষ হইবামাত্র, তাহাদের মধ্যে, বিধবাবিবাহের বিচার উপস্থিত হইল। নিজ নিজ বুদ্ধি ও নিজ নিজ বিবেচনা অনুসারে, কেহ ভাল, কেহ মন্দ, বলিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্যক্তি, কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন ও নিবিষ্টচিত্তে সমুদয় শ্রবণপূর্ব্বক, সকলের মতামত অবগত হইয়া কহিল, 'আমি বলি, বিধবার বিবাহ যদি হইয়া উঠে, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়; কারণ, জাতির মেয়ে জাতিতে থাকিবে ত; নতুবা, বামুন কায়েতের মেয়ের মত, মেয়েগুলা পাঁচজাতিয়া হয়ে যাবে, সে কি ভাল'।"[১৫]

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯) বিধবা-বিবাহের বিরোধী ছিলেন। তিনি লিখেছেন :

"বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল॥
কত বাদী প্রতিবাদী করে কত রব।
ছেলে বুড়া আদি করি মাতিয়াছে সব॥
কেহ উঠে শাখাপরে কেহ থাকে মূলে।
করিছে প্রমাণ জড়ো পাঁজি পুঁতি খুলে॥
একদলে যত বুড়ো আর দলে ছোঁড়া।
গোঁড়া হয়ে মাপে সব দেখে নাক গোড়া॥
লাফালাফি দাপাদাপি করিতেছে যত।
দুই দলে খাপাখাপি ছাপাছাপি কত॥
বচন রচন করি কত কথা বলে।
ধর্ম্মের বিচারপথে কেহ নাহি চলে॥
"পরাশর" প্রমাণেতে বিধি বলে কেউ।
কেহ বলে এ যে দেখি সাগরের ঢেউ॥

কি আর ভাব সকলেতে,
হবে যেতে জেতে হতে,
জাত-অভিমান সাগরে দাও স'পে;—
এক ধর্ম্ম প্রায় আগত, ভারত আদি পুরাণমত,
ভারতে চলিবে না কোনরূপে;—
যখন করেছে এ ভারত অধিকার কলি-ভূপে॥"

"কানেড়া-বাহার—একতালা।

বিবাহ করিতে দিদি! আছে বিধবাদের বিধি,
মরুক দেশের পোড়া-কপালে, সকলে,
কথা ছাপিয়ে রাখে হ'য়ে বাদী॥
আমাদিগকে দিতে নাগর,
এলেন, গুণের সাগর বিদ্যাসাগর,
বিধবা পার করতে, তরীর গুণ ধরেছেন গুণনিধি॥
কতকগুলো অধার্ম্মিকে, বিপক্ষ বিধবার দিকে,
জুটেছে কলিকাতায়, এই কথায়,—
তারা বিপক্ষ হয় হয়ে বাদী॥
ঈশ্বর গুপ্ত অল্পেয়ে,
নারীর রোগ চেনে না বৈদ্য হয়ে,—
হাতুড়ে বৈদ্যেতে যেন
বিষ দিয়ে দেয় প্রাণে বধি॥"[১৬]

১৮৫৬ সালের ১৭-জুলাই 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখেছে :

". . . The first pamphlet by Pundit Issur Chunder Bidyasagur, which initiated the agitation, was written in a clear business like argumentative style. It was graced by none of the ornaments of rhetoric, and owed its unprecedented circulation to the intense interest of the subject and the very becoming manner in which it was introduced. It was just such a statement as a case should be opened with. We have called the circulation of Pundit Issur Chunder Bidyasagur's pamphlet unprecedented, for we do not think that the history of Bengalle literature presents another instance of so universal, yet so rapid, a dissimination of a writing. From the moment it issued from the press, it created a sensation which extended itself to the very corners of the country. It stirred Bengallee society to its very depths. One most hopeful sign in our social condition was made apparent by the issue of this pamphlet. It elicited replies from a host of opponents the majority of whom belonged to the priestly and the professionally learned classes. Doctors of Hindoo doctrine and learning, who viewed the printing

press with almost the same jealousy that the priests of mediaeval Europe viewed it, resorted to the suspected engine for the marvellous facilities it afforded for publishing one's wisdom and knowledge. The fact was placed beyond a doubt that we are a pamphlet-reading nation, and that is a fact of unspeakable social importance."

একদল পণ্ডিত বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে কয়েকখানা বই বের করে ফেললেন। তাঁরা বললেন, না, আমাদের শাস্ত্রে বিধবাদের বিবাহের বিধি নেই।

বিধবাবিবাহের প্রতিবাদী কয়েকজন পণ্ডিতের নামোল্লেখ করি : উমাকান্ত তর্কালঙ্কার; শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ; শশিজীবন তর্করত্ন; জানকীজীবন ন্যায়রত্ন; পার্বতীনাথ রায়চৌধুরী; কালিদাস মৈত্র; সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ; রামচন্দ্র মৈত্রেয়; মধুসূদন স্মৃতিরত্ন; পীতাম্বর কবিরত্ন; ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন; ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন; মহেশচন্দ্র চূড়ামণি; দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন; শ্রীরাম তর্কালঙ্কার; ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ; গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ; কৃষ্ণমোহন ন্যায়পঞ্চানন; রামগোপাল তর্কালঙ্কার; মাধবরাম ন্যায়রত্ন; রাধাকান্ত তর্কালঙ্কার; জগদীশ্বর বিদ্যারত্ন; রামদাস তর্কসিদ্ধান্ত; প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়; নন্দকুমার কবিরত্ন; আনন্দচন্দ্র শিরোমণি; গঙ্গানারায়ণ ন্যায়বাচস্পতি; হারাধন কবিরাজ; রামদয়াল তর্করত্ন; রামধন বিদ্যাবাগীশ।

বিধবাবিবাহের একজন প্রতিবাদী সম্পর্কে একটি চমৎকার কাহিনী আছে।

স্কুল-ইনস্পেক্টর প্র্যাট সাহেব একদিন বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনার বইয়ের যেসব প্রতিবাদ বেরিয়েছে, তাদের মধ্যে কার প্রতিবাদ ভালো?

যাঁর লেখায় গালমন্দ সবচেয়ে বেশি ছিল, বিদ্যাসাগর রঙ্গ করে তাঁর নাম বললেন।

রঙ্গ বুঝলেন না প্র্যাট সাহেব, কথাটা সত্য ভেবে তিনি নামটি টুকে নিলেন। কিছুদিন পর প্র্যাট সাহেব সেই ভদ্রলোককে ডেপুটি ইনস্পেক্টর বহাল করলেন।

আসল ব্যাপার গোপন থাকল না। সব জানতে পেরে সেই ভদ্রলোক বিদ্যাসাগরকে বললেন—যা হবার হয়েছে, দেখবেন যেন চাকরিটি না যায়।

বিদ্যাসাগর সহাস্যে বললেন—তাহলে আর চাকরি হত না।[১৭]

১৮৫৫ সালের অক্টোবরে বিদ্যাসাগর আরেকখানা বই বের করলেন : 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় পুস্তক।' বিস্তর শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করে বিদ্যাসাগর নিঃসংশয়ে প্রমাণ করলেন যে কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কর্তব্য কর্ম, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত।

'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, দ্বিতীয় পুস্তক' থেকে কিয়দংশ উদ্ধার করি :

"হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কত কাল তোমরা, মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া, প্রমাদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যাভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে অতঃপর,

বিবাহ পুস্তকের শীর্ষস্থ পঙ্‌ক্তিগুলি যথা—'পরাশরবচন বিবাহিতাবিষয়—বাগ্‌দত্তাবিষয় নহে', ইত্যাদি অক্ষরগুলি ইংরেজির ইটালিক্ অক্ষরের ন্যায় বাঁকা বাঁকা অক্ষরে মুদ্রিত হইলে ভাল হইত।" কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি এইমাত্র উত্তর করেন, ইংরেজি জিওমেট্রির প্রতিজ্ঞাগুলি ইটালিক অক্ষরে আছে।" তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাগুলি যেরূপ অভ্রান্ত, অকাট্য যুক্তিপরম্পরাদ্বারা সপ্রমাণ করা হইয়াছে, বিধবাবিবাহ পুস্তকের শীর্ষকস্থ পঙ্‌ক্তিগুলিও তৎপরবর্ত্তী বিচারের দ্বারা সেইরূপে নিঃসংশয়িতরূপে উপপাদিত হইয়াছে। অতএব উভয় পুস্তকেরই শীর্ষস্থ প্রতিজ্ঞাগুলি একবিধ অক্ষরে মুদ্রিত হওয়া উচিত।"[১৮]

সমস্ত দেশে হৈ-হৈ পড়ে গেল। কেবল পণ্ডিতে-পণ্ডিতে কথা কাটাকাটি নয়, হাটে-বাজারে রাস্তা-ঘাটে সেসময়ে বিধবা-বিবাহ নিয়ে ছড়ার ছড়াছড়ি। ছড়া, কবিতা, পালাগান। শান্তিপুরের তাঁতিরা তো নতুন একরকম শাড়িই বের করে ফেলল—বিদ্যাসাগর-পেড়ে শাড়ি। বেশি দামে অনেকে ওই বিদ্যাসাগর-পেড়ে শাড়ি কিনেছেন সেসময়ে।

ওই শাড়ির পাড়ে একটি গান লেখা আছে :

সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে॥
কবে হবে শুভ দিন, প্রকাশিবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম,
মনের সুখে থাক্‌ব মোরা মনোমত পতি লয়ে।
এমন দিন কবে হবে, বৈধব্য-যন্ত্রণা যাবে,
আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই—
আলোচাল কাঁচকলার মুখে দিয়ে ছাই,—
এয়ো হয়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় লয়ে॥*[১৯]

আবার এই গানকে ব্যঙ্গ করে আরেক রকম গানও বের করেছে বিপক্ষদল। সেই গানের প্রথম লাইন : "শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চিররোগী হয়ে।"[২০]

বিধবাবিবাহের বিরোধীদের মধ্যে কেউ-কেউ বিদ্যাসাগরের নামে বিস্তর গালমন্দ করতেন।

একটা কাহিনী আছে।

একদিন বিদ্যাসাগর বর্ধমান থেকে কলকাতায় আসছেন। পান্ডুয়ায় বিদ্যাসাগরের কামরায় একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত উঠলেন। বিদ্যাসাগরকে তিনি চেনেন না।

বিদ্যাসাগরের নামে গালমন্দ করতে লাগলেন ওই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতটি। হুগলি স্টেশনে নেমে তিনি জানতে পারলেন যে বিদ্যাসাগরের সামনেই বিদ্যাসাগরকে গালমন্দ করা হয়েছে। হঠাৎ সেকথা জেনে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতটি কেমন যেন সংজ্ঞাহীন হয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পড়ে গেলেন।

---

* এই গানের দুটি ভিন্ন পাঠও দেখা যাচ্ছে। একটি ভিন্ন পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য—শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ১১৬-১৭; আরেকটি ভিন্ন পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য—কুমুদনাথ মল্লিক : নদীয়া-কাহিনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৭৯।

নিবিষ্টচিত্তে, শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও যথার্থ মর্ম্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর, এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলেই, স্বদেশের কলঙ্ক বিমোচন করিতে পারিবে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ; দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছ; দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া, লৌকিক রক্ষা ব্রতে যেরূপ দীক্ষিত হইয়া আছ; তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না, তোমরা হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জ্জন, দেশাচারের আনুগত্যপরিত্যাগ, ও সঙ্কলিত লৌকিকরক্ষাব্রতের উদ্যাপন করিয়া, যথার্থ সৎপথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাসদোষে, তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে, ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্য-যন্ত্রণাবলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ; তাহারা, দুর্নিবাররিপুবশীভূত হইয়া, ব্যভিচার দোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ; ধর্ম্মলোপ-ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল লোকলজ্জাভয়ে, তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া, স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক, পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে, এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে, সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এক কালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধান দোষে, সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম; আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্ম গ্রহণ না করে।

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্ম গ্রহণ কর, বলিতে পারি না!"

রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছেন : "বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ' ও 'বহু-বিবাহবিচার' নামক পুস্তকদ্বয় সারগর্ভ যুক্তিসমেত রচনার নিকষস্থল। বাঙ্গালা ভাষায়, শাস্ত্রীয় বিচার করা এবং সেই বিচার সরল ভাষা সহযোগে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া, এ উভয়ই কঠিন ব্যাপার। বিদ্যাসাগর যে কিরূপ পাণ্ডিত্যসহকারে ও কিরূপ সুন্দর প্রণালীতে সেই বিষয়ের সমাধান করিয়াছেন, তাহা সেই সেই গ্রন্থ একবার অধ্যয়ন না করিলে কোনমতেই হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে। তন্মধ্যে বহু বিবাহ বিচারে উচিতমত গাম্ভীর্য্য-রক্ষার কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়াছে, একথা অনেকেই কহিয়া থাকেন, কিন্তু বিধবা-বিবাহবিচারে যে কোন অংশে কিছু ত্রুটি হইয়াছে, তাহা শত্রুরাও বলিতে পারে না। ফলতঃ এই পুস্তকে বিদ্যাসাগরের বিদ্যা, বুদ্ধি, কৌশল, বহুদর্শিতা, সারগ্রাহিতা, মীমাংসকতা, বিনয়, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি অশেষ গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। আমাদের একজন সুবিজ্ঞ আত্মীয় কহিয়াছিলেন, "বিধবা-

অতঃপর বিদ্যাসাগরই তাঁর শুশ্রূষা করেছেন। এবং শেষপর্যন্ত বিদ্যাসাগর তাঁকে কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্যও করেছেন।

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময় স্বভাবকবি ধীরাজ বিদ্যাসাগরের নামে একটা গান বেঁধেছে। গানটি, আচার্য কৃষ্ণকমলের মতে, রুচিবিগর্হিত, অশ্লীল।

কিন্তু বিদ্যাসাগর ধীরাজকে নিজের বাড়িতে ডাকিয়ে আনতেন। বলতেন—ধীরাজ, একবার সেই গানটা গাও তো। সেই যে, 'বিদ্যেসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়েছে'...

ধীরাজ সকলের সামনে গান ধরত :

বিদ্যেসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়েছে,
পরাশরের * * * দিয়েছে।[২১]

১৭৭৭ শকের অগ্রহায়ণে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লিখেছে :

"শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ইতিপূর্ব্বে বিধবাদিগের পুনঃসংস্কার শাস্ত্র-সম্মত বলিয়া যে পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহা প্রচারিত হইয়া অবধি ঐ প্রস্তাব লইয়া হিন্দু সমাজে ঘোরতর আন্দোলন হইতেছে। এতদ্দেশীয় অনেক পণ্ডিত ও প্রধান বিষয়ী লোকদিগের মধ্যে অনেকে উক্ত বিষয় অপ্রচলিত রাখিবার অভিপ্রায়ে এক এক পুস্তক প্রচার করিয়া তাঁহার ঐ মতে বিস্তর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। সেই সকল আপত্তি যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, বিদ্যাসাগর মহাশয় সংপ্রতি ঐ বিষয়ে দ্বিতীয় এক পুস্তক প্রকটন করিয়া প্রতিবাদীগণের সমুদয় পুস্তকের একত্র উত্তর দিয়াছেন।...

বিধবা স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ নিরবলম্ব যুক্তি অনুসারে সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য, তাহার সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রানুসারেও সম্পূর্ণ বিধেয় বলিয়া অবধারিত হইল। অতএব এক্ষণে উহা প্রচলিত করিয়া তাহাদিগের অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা ও ঘোরতর পাতকরাশি নিবারণ করিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করা উচিত নহে।"

১৮৫৬ সালের ২২-ফেব্রুআরি ও ২৫-ফেব্রুআরির 'সংবাদ প্রভাকর' থেকে দীনবন্ধু মিত্রের একটি রচনা উদ্ধার করি :

"মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

একদা পল্লীগ্রামবাসিনী চারুহাসিনী কতকগুলিন কামিনী একত্রে বসিয়া হাস্য-কৌতুকে সময় সম্বরণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে এক নবীনা পতিহীনা অনুপমা নামা তথায় আসিয়া ম্লানভাবে অবনতমুখী হইয়া এক পার্শ্বে বসিলেন, তাঁহার এরূপ ভাবভঙ্গি ও অসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া নিস্তারিণী নাম্নী কোন এক কামিনী মধুর সম্ভাষণে জিজ্ঞাসা করিলেন, অনুপমা! আজি বোন তোমার সুধাংশুসদৃশ সুচারু লাবণ্যের এরূপ কৃশতা ও বিবর্ণতা কি জন্য ঘটিয়াছে ও বিমল বদন হইতে পীযূষমাখা বাক্য সকল কেনই বা বিনির্গত না হইতেছে, ভগিনি! একটিবার বিধুমুখে মধুমাখা বাক্য কহিয়া আমারদিগের কর্ণযুগলকে সুশীতল ও নেত্রদ্বয়কে হাস্য করত চরিতার্থ কর, আমরা কি তোমার বিমনা ও এরূপ ভাবভঙ্গি দেখিয়া স্বচ্ছন্দ শরীরে সুস্থির হইয়া রহিয়াছি? ও তোমার নীরপূর্ণ নেত্র নিরখিয়া কি আহ্লাদিত হইয়াছি? কখনই নয়, তোমার দুঃখানলে আমারদিগের অন্তঃকরণ অহরহই দগ্ধ

হইতেছে, ভগিনি! সহাস্যবদনে বাক্য কও, মনাগুন সম্বরণ সলিলে নির্ব্বাণ কর। অনুপমা সঙ্গিনীর এরূপ সম্ভাষণ শ্রবণান্তর অন্তরে আরো খেদান্বিতা হইয়া বলিলেন, বোন! পতিহীনা নারীর মলিনতা ও বন-দগ্ধা হরিণীর চাঞ্চল্য হইবার কারণ কেন অন্বেষণ করিতেছ? তাহারদের মনোদুঃখ অপরে কি প্রকারে বুঝিতে পারিবে, ভগিনি! আমি পতিরত্ন হারাইয়া যেরূপ দুঃখিতা আছি, ও আমার অন্তর যে তাহার নীরজ ন্যায় নেত্র-যুগলের পীযুষময় দৃষ্টি অন্তর হওয়ায় কি পর্য্যন্ত বিষাদাগ্নিতে বিদগ্ধ হইতেছে তাহা বর্ণনা করিতে কাহার হৃদয় না বিদীর্ণ ও শ্রবণ করিতে কাহার মন মলিন না হয়? আহা! পতিবিচ্ছেদ কি পরিতাপ, যাহা স্মরণ করিলে মরণকেও শতগুণে শ্রেয়স্কর মঙ্গলদায়ক ও কল্যাণপ্রদ বোধ হয়, আমি কি এরূপ প্রিয়ম্বদ প্রিয় মিত্রের নেত্রের বাহির হইয়া স্থিরচিত্তে দিন যামিনী যাপন করিতেছি? ও আমার নয়ন কি তাহার মোহন মূর্ত্তি পরিহারপূর্ব্বক অপরের অসামান্য ও অকিঞ্চিৎ-কর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে? ও আমার শ্রবণ কি প্রিয়তমের প্রিয় সম্ভাষণ ও সুললিত শব্দবিন্যাস শ্রবণে প্রয়াস না করিয়া অপরের লালিত্য-রহিত যৎসামান্য বক্তৃতা-রসে সুশীতল হইতেছে কোথায়? তাহারা সততই সন্তোষবিহীন হইয়া স্বীয় ২ কার্য্য সম্পাদনে সংকট ভাবিতেছে, চিত্ত ভগ্ন, নেত্র নীরে মগ্ন, শ্রবণ বধির ন্যায় রহিয়াছে, একে বিধবা হইয়া পতিবিরহে দেহে সুখশূন্য হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে সময় সম্বরণ করিতেছি, তায় আবার আজি নিদারুণ একাদশী উপবাস-রূপ অসি দেখাইয়া শরীর শুষ্ক করিতেছে, আমি কি বোন জীবনবিহীনে জীবন ধারণ ও আহার না করিয়া ক্ষুধা সম্বরণ করিতে সমর্থা হইতে পারি? আমার শরীরে কি এ কঠোররূপ একাদশীর উপবাস সহ্য হয়? প্রাণ যায় যায় আর বাঁচি না, শরীর শুষ্ক ও কম্পিত হইতেছে, ক্ষণে ২ যেন চারি দিক্ শূন্য দেখিতেছি, এ অভাগিনীকে আর কত কাল এরূপ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবেক, ও একাদশীর উপবাসে কলেবর জীর্ণ-শীর্ণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবেক, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমার চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে কি দুর্দ্দশা না ঘটিল? বসন-ভূষণে বর্জ্জিত হইয়াছি, বেশ ঘুচিয়াছে, কেশ গিয়াছে, অবশেষ শেষ হইলেই বোন অশেষ ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, আর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা নাই, জনক জননী যাঁহারা প্রাণতুল্য প্রিয়পাত্রী করিয়া অপরির্য্যাপ্ত প্রীতি ও স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহারা এক্ষণে হতভাগ্য ও পাপীয়সী ভিন্ন আর কোন সম্ভাষণই করেন না, শ্বশুর শাশুড়ী যাঁহারদের যতনের ধন ও কণ্ঠের হার ও আনন্দের আধারস্বরূপ হইয়া অসীম সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলাম, তাঁহারদেরও এক্ষণে বিষদৃষ্টি হইয়াছি ও তাঁহারা রাক্ষসী বলিয়া আর মুখাবলোকনও করেন না, আহা! আর কতকাল এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিব, প্রাণ পরিত্যাগ করিবারও তো কোন উপায় দেখিতেছি না, লার্ড বেণ্টিক ও মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সহমরণ নিবারণ করিয়া কি যোষিৎগণের বিহিত উপকার করিয়াছেন, না না আমার বিচারে তো তাঁহারদিগের এরূপ চিরস্মরণীয় মহৎ পুণ্যকে অশেষ ক্লেশকর ও দূষণাবহ বলিয়া বোধ হইতেছে, যদিস্যাৎ পতির লোকান্তে নারীগণের পক্ষে পতি পাইবার কোন উপায়ান্তর থাকিত তাহা হইলে উক্ত মহাত্মাগণের এই অনির্ব্বচনীয় করুণা ও কীর্ত্তির কতই শোভা প্রকাশ পাইত, পতির মৃত্যু হইলে বিধবা হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করা অপেক্ষা সহমরণকে শতগুণে শ্রেয়স্কর বলিলে সম্ভব হইতে পারে;

পতির সহিত সন্দর্শন হউক বা না হউক তাহাকে পাই বা না পাই যাবজ্জীবন দুঃখানলে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা এক দিবস দগ্ধ হইয়া প্রাণ বিনাশ করা কতই ক্লেশকর বল?

অনুপমার এরূপ আক্ষেপ শুনিয়া গিরিজা নাম্নী কোন গুণবতী কহিলেন, অয়ি, সুশীলে! স্থির হও আর উতলা হইও না, বোধ করি এতদিনে আমারদিগের দুঃখের নিশি অবসান হইবার উপক্রম হইয়াছে, সুখরূপ সূর্য্য আমারদিগের সৌভাগ্যরূপ গগনমণ্ডলে অচিরাৎ উদয় হইবেক, নগর পল্লী সকল স্থানে ও ঘরে পরে সর্ব্বত্রই এইরূপ জনরব হইতেছে, পতিহীনা মলিনা বিধবাগণের যন্ত্রণা নিবারণার্থে পরম করুণাকর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার ব্যবস্থা প্রস্তুত করিয়াছেন, বোধ করি অবিলম্বেই গবর্ণমেণ্ট সহমরণ রহিত করণের ন্যায় বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন।

ভগিনী! আর ভাবিও না আমারদিগের পক্ষে এ বড় কম পড়তা নয়, এ কথা শুনিয়া আর একটি স্ত্রীলোক বলিল ঠিক লো ঠিক, এ জন্যই বুঝি বোন কাল আমার কর্ত্তাটি এরূপ কৌতুক করিয়াছিলেন, "প্রিয়সী মনে রেখো, তোমারদের আর বার পায় কে? আজ কাল তোমারদের কচেবারো আর যুগ ভাঙ্গতে হবে না বিধবাগণের বিবাহ হইবেক, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আশীর্ব্বাদ কর তিনি তোমারদের সহজ উপকারক নন, এতদিনে তোমারদের সিঁতের সিন্দূর ও হাতের লোহা অক্ষয় হইল" পতিমুখে এইরূপ কৌতুক শুনিয়া প্রথমতঃ তাঁহার মনোরঞ্জন ও সুশীলা স্বভাব প্রদর্শন জন্য বলিলাম ও মা কি ঘৃণা এ কেমন করিয়া হবে, আবার আমরা অন্য পুরুষের নিকট কি প্রকারে ঘোমটা খুলিয়া মুখ তুলিয়া কথা কহিব, কি লজ্জা মেয়ে হোয়ে কি এত বেহায়া কেউ হইতে পারে, পরে মনে২ কহিলাম হে জগদীশ্বর! বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শত হস্তে লেখনী সঞ্চালনে ক্ষমতাবান করুন, তিনি যেন সহস্রলোচন হইয়া একেবারে সহস্র গ্রন্থ অবলোকন করিয়া সংযুক্তি সকল সঙ্কলন করিতে পারেন, তিনি দীর্ঘজীবী ও বৃহস্পতিতুল্য বুদ্ধিমান হউন। পরে মতি নাম্নী একটি বিধবা বলিলেন, যথার্থ বোন আমিও অনেক দিন শুনিয়াছি যে আমারদিগের শাকে বালী ঘুচিয়া দুগ্ধে চিনি হইবেক, কেবল লোকলজ্জায় এতদিন প্রকাশ করিতে পারি নাই, প্রতি দিনই কপালে করাঘাতচ্ছলে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথাযোগ্য নমস্কার করিয়া থাকি ও হে ঈশ্বর! আমাকে বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ কর বলিবার ছলে উক্ত ঈশ্বরকেই স্মরণ মনন করিয়া থাকি, কিন্তু বোন পা ফাটা মাথা চাঁচা পোড়াকপালে ভট্টাচার্য্য ও গোসাঞি আটকুড়রা যে পেছু ডাকিতেছে বিদ্যাসাগরকে বোসে যেতে হোলেই তো বোন বিলম্ব হইয়া পড়িবে। নিস্তারিণী বলিলেন না বোন ভট্টাচার্য্য ও গোসাঞি সর্ব্বনেশেদের যে শ্রী ও বিদ্যাবুদ্ধি তাহারা কি বিদ্যাসাগরের সহিত বিচার করিতে পারে, তাহারদিগের শরীর দেখিলেই বোন ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা হয় পণ্ডিত পোড়ারমুখোরা পা ফাটা মাথা চাঁচা গায়ে কতকগুলা গঙ্গামৃত্তিকা মাখিয়া ঠিক যেন কুমারটুলির একমেটে ঠাকুর, আ মরি! গোসাঞিদের বা কি ঢং ঠিক যেন অক্রূর দত্তের রাসের সং, গা-ময় তিলক ছাব দিয়া যেন সদর দেওয়ানী আদালতের ফয়সালা বেরুলেন, তাঁহারদিগের কর্ম্ম কি বোন বিদ্যাসাগরের সহিত বিচার করিয়া বিজয়ী হইতে পারে, বিবেচনা করিলে বোন আমারদিগের বড়ই সুখের সময় উপস্থিত।

পদ্য

মেয়েলী ছন্দঃ

এমন সুখের দিন কবে হবে বল, দিদী কবে হবে বল লো,
কবে হবে বল।
এত দিনে যাবে যত বিপক্ষের বল, দিদী বিপক্ষের বল লো,
বিপক্ষের বল॥
বিধবার বিয়ে হবে এত বড় কল, দিদি এত বড় কল লো,
এত বড় কল।
ভুগিতে হবে না আর অধর্ম্মের ফল, দিদি অধর্ম্মের ফল লো,
অধর্ম্মের ফল॥
বিবাদী হয়েছে এবে যত সব খল, দিদী যত সব খল লো,
যত সব খল।
ঈশ্বরের লেখনীতে সব যাবে তল, দিদী সব যাবে তল লো,
সব যাবে তল॥
পরামর্শ করিয়াছে যত যুবা দল, দিদী যত যুবা দল লো,
যত যুবা দল।
ঘুচাইবে আমাদের নয়নের জল, দুটি নয়নের জল লো,
নয়নের জল॥
বিধবার নাহি আর জুড়াবার স্থল, দিদী জুড়াবার স্থল লো,
জুড়াবার স্থল।
কতই হইব সুখী বিয়ে হোলে চল, দিদী বিয়ে হোলে চল লো,
বিয়ে হোলে চল॥
অঙ্গে দিলে অলঙ্কার লোকে ধরে ছল, পোড়া লোকে ধরে ছল লো,
লোকে ধরে ছল।
অভয়ে পরিব পায়ে চারি গাছা মল, দিদী চারি গাছা মল লো,
চারি গাছা মল॥
অবলা সরলা অতি নাহি কোন বল, দিদী নাহি কোন বল লো,
নাহি কোন বল।
পতিরে পড়িলে মনে আঁখি ছল ছল, করে আঁখি ছল ছল লো,
আঁখি ছল ছল॥
কেন আর মন দুঃখে গৃহে চল চল, দিদী গৃহে চল চল লো,
গৃহে চল চল।
ঈশ্বরের পরামর্শ জানিবে অটল, দিদি জানিবে অটল লো,
জানিবে অটল॥
ধক ধক করে মনে সদা দুখানল, দিদী সদা দুখানল লো,
সদা দুখানল।
শীতল হইবে পেলে বিবাহের জল, দিদী বিবাহের জল লো,
বিবাহের জল॥

অহং
শ্রীদী, * * *"

১০ ফাল্গুন
সন ১২৬২।

১৭৭৭ শকের চৈত্রে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লিখেছে : "যাহাতে এদেশীয় বিধবাগণের দুঃসহ চির বৈধব্য যন্ত্রণা ও চির বৈধব্য নিবন্ধন নানা অবৈধ ব্যাপারের নিবারণ হয়, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কতিপয় বিচক্ষণ বন্ধু বান্ধবের সহিত মিলিত হইয়া সে বিষয়ে প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন, বোধ হয় জগদীশ্বর তাঁহার শুভ সংকল্প সিদ্ধ করিবেন।"

বিধবাবিবাহের আইন না থাকলে কিছুতেই কিছু হবার নয়। যদি আইনসঙ্গত না হয়, কেবল শাস্ত্রসঙ্গত হলে সবই নিষ্ফল। বিদ্যাসাগর অতএব ভারত-গবর্নমেণ্টের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন ১৮৫৫ সালের ৪-অক্টোবর :

"To

W. Morgan Esq.
Clerk to the Honorable the
Legislative Council of India

Sir,

On behalf of the Petitioners I have the honor to forward herewith the Petition of certain Hindoo Inhabitants of the Province of Bengal which I beg to request you will do me the favour to lay before the Honorable Council at their next sitting.

I have the honor to be
Sir
Your most obedt. Servant
Eshwar Chandra Sharma" [২২]

Calcutta
Sanscrit College
The 4th October 1855.

আবেদনপত্রে সকলের শেষে স্বাক্ষর করেছেন বিদ্যাসাগর। এই আবেদনপত্রে সাকুল্যে ৯৮৬ জনের স্বাক্ষর আছে। দেখা যাচ্ছে, H. C. Banerjee নামে জনৈক ভদ্রলোক নাম স্বাক্ষর করে আবার কেটে দিয়েছেন।

১৮৫৫ সালের ১২-নভেম্বরের 'সমাচার সুধাবর্ষণ' থেকে একটি পদ্য উদ্ধার করি :

"শুন ২ বিধবারা শুভ সমাচার।
বিধবাবিবাহ হবে রবে সমাচার॥
হইয়াছে যত গ্রন্থ বিবাহ বিপক্ষে।
তিষ্ঠীতে না পারিবেক সাগর সমক্ষে॥
দ্বিতীয় ঈশ্বর বিদ্যাসাগর সন্ধান।
কেহ না জানেন কিছু তাহার সন্ধান॥
করিয়াছিলেন বাধা বহু ভট্টাচার্য্য।
সমুদ্র তরঙ্গ তাহে না হয় নিবার্য্য॥
তর্কেতে উঠিয়াছে যতেক আপত্তি।
ঈশ্বর সুতর্কে তার হইল বিপত্তি॥
দ্বিতীয় পুস্তক যাহা সাগর হইতে।
উঠিয়াছে সুপ্রমাণ রত্নাদি সহিতে॥

সে সব প্রমাণরত্ন যত্নে করি হার।
বিবাহ সময়ে দিব গলে বিধবার॥
সাজ গো বিধবাগণ ফুটিয়াছে ফুল।
তোমাদের সৌভাগ্যে ঈশ্বর সানুকূল॥
শাস্ত্রীয় প্রমাণ ছাড়া গোঁড়া অবতার।
চলিতে না পারিবেন বক্রপথে আর॥
নিবারণ করিবেন কি প্রমাণ দিয়া।
টানাটানী পড়িবেক নবদ্বীপ নিয়া॥
ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন পাইবেন মান।
করিতে সইবে তাঁকে মূল সূত্র গান॥
শাস্ত্রীয় বিচারাসরে যাত্রা হবে ভারি।
হইবেন ব্রজনাথ নিজে অধিকারী॥
শ্রীভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন যুড়ীদার।
হইবেন ডাহিনের মৃদঙ্গী দোহার॥
বাম দিকে কাশীনাথ বাজাবেন গাল।
ধরিবেন তালে ২ মৃদঙ্গের তাল॥
পৃষ্ঠভাগে রামতনু আদি অধ্যাপক।
তালে মানে গাহিবেন পুরাতন লোক॥
শ্রীপদ্মলোচন যিনি দিয়াছেন বাধা।
সম্মুখে প্রধান সখী সাজিবেন রাধা॥
আর যত অধ্যাপক বিপক্ষীয় শাখা।
সাজিবেন তাঁরা সব ললিতা বিশাখা॥
ধনিদের বাড়ী ২ এই যাত্রা হবে।
বিধবাবিবাহ যাত্রা চির খ্যাত রবে॥
প্রথমতঃ অধিকারী তুলিবেন তান।
হবেন ২ বিয়া নিষিদ্ধ প্রমান॥
তার পরে সখীগণ গাইবেন স্বরে।
মীমাংসায় তাল মান রহিবে না পরে॥
প্রথমে দিবেন বটে ধনিগণে পেলা।
সাগরে ডুবিয়া যাবে সব লীলা খেলা॥
আমরা বলিয়া রাখি বিধবারা সবে।
শঙ্খশাড়ী পরিয়া প্রস্তুত ভাবে রবে॥
পড়িবেন ঈশ্বর এ বিবাহের মন্ত্র।
খাটিবে না আর কারু তাল মান যন্ত্র॥
যাত্রা দিলে লোক পূর্ণ হবে রাজপুর।
সভাপতি হইবেন রাজা বাহাদুর॥
বামদিকে বসিবেন বাবু রত্নরায়।
পেলা দিতে বলিবেন গঙ্গ উপাধ্যায়॥
এবারে হবে না পেলা রত্নশিরে শাল।
প্রথমের শাল পেলা হইয়াছে শাল॥
আমরা ধূম্বুল দিতে রহিলাম সেজে।
ধন্যবাদ দিতে হবে সাগর সমাজে॥" (পৃঃ ৩-৪)

১৮৫৫ সালের ২০-নভেম্বরের 'সংবাদ প্রভাকর' থেকে একখানা প্রেরিত পত্র উদ্ধার করি :

"মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয় নিতাই চৈতন্যের ন্যায় সুপণ্ডিতবর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম প্রাতঃস্মরণীয় ও চিরস্মরণীয় হইবেক, এক্ষণে বিধবাকুল হর্ষোৎফুল্ল লোচনে সতত জগদীশ্বর সন্নিধানে সদয় হৃদয় বিদ্যাসাগর মহোদয়ের দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিতেছে ও ভাবি সুখানুভবের আশায় অনেক বিধবা মহিলা নিম্ন লিখিত গান গাইয়া বেড়াইতেছে।

গান

দিদি বিধি ভাল বিবেচনা করেছে করেছে করেছে। আমি শুনে এলেম্ ওদের টোলে, শুনে মন গেলো উতুলে, রাঁড়ের বিয়ের ছাপা নাকি এসেছে, দিদি বিধি ভাল বিবেচনা করেছে।

কি লিখন লিখেছে বিধি কপালে, সিন্দুর পরিতে বুঝি হলো এবার কপালে, একাদশী করা বুঝি উঠালে, ডায়মোনকাটা মল বুঝি পরালে। বুঝি বিদ্যাসাগর এতদিনে, বিধবা নারীগণে, একলা শোয়ার কত জ্বালা জেনেছে, দিদি বিধি ভাল বিবেচনা করেছে।

এসব্ কথা আর কি থাকে ছাপা লো, দেশবিদেশে এসব কথার গিয়েছে যে ছাপালো, আনন্দে আমাদের অঙ্গ ছাপালো, কায্ কি দিদি আর আমাদের ছাপা লো। যাতে ক্ষুণ্ণ ছিলো মনে, বিধি বুঝি এতো দিনে, রাঁড়ের প্রতি অনুকূল হয়েছে।

দিদি বিধি ভাল বিবেচনা করেছে॥

কশ্চিৎ ঈশ্বরানুরাগী"

১৮৫৬ সালের ১৭-জানুআরি 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখেছে : "ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা এখন কোথায় গেলেন? চতুর্দ্দিগ নীরব, আর যে কিছুই শুনিতে পাই না, তবে কি বিধবা বিবাহে সকলে সম্মত হইলেন, "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" ইহা সকলেই স্বীকার করেন, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয় পুস্তক অনেক দিন বাহির হইয়াছে, সকলে পাঠে ২ তাহা পুরাতন করিয়া ফেলিয়াছেন তথাপি যে কেহ উত্তরের একখানা ঠাট মাত্রও বাহির করিলেন না, ইহাতেই বোধহয় ভাড়াপুঁজী শেষ হইয়া গিয়াছে মনুষ্য জীবদ্দশায় থাকিলে সকলি দেখিতে পান, বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য যখন প্রথমে পরাশরের বচনগুলিন বাহির করিলেন তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের হাত্ পা চোক মুখ লাড়াই বা কে দেখে? অগণ্য ধনিদিগের বাটী ২ সভা করিলেন আর বিচারের ঘটাই বা কি? "কচ্ছে পুচ্ছ" অর্থাৎ কাছায় পাছা ঢাকাও রহিল না, প্রায় বিবস্ত্র হইয়া ক্ষুদ্র পুস্তক রূপ কত অস্ত্র বাহির করিয়া দিলেন, যাঁহারদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের নাম ধাম কেহ জানিত না তাঁহারাও কিঞ্চিৎ ২ ধন ব্যয়ে অধ্যাপকদিগের দ্বারা এক ২ পুস্তক বাহির করাইলেন, তাহাতেই নাম বাহির হইল অমুক অমুকের সভাপণ্ডিতেরা এই পুস্তক বাহির

করিয়াছেন, হায়, সভাই বা কোথায়, সভাপণ্ডিতই বা কৈ? সভার মধ্যে বাড়ীর ভৃত্যগণের মেলা, সভাপতির মধ্যে বাবুগণ, সভাপণ্ডিতের মধ্যে খোলাকাটা পুরোহিত সকল, ইহাতেই জাঁকজমকে ভূমিকম্প করিয়া ফেলিয়াছিলেন এইক্ষণে আর আর সভাও নাই, সভাপতিগণের নামগন্ধও পাই না, বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্যের দ্বিতীয় গ্রন্থের উত্তরদানে সকলেই নিরুত্তর হইলেন, গলী ২ ভাঙ্গা কৃষ্ণ রাঙ্গা বাবুদিগের কথা মাচাঙ্গে থাকুক, নগর বাহির বাসি নানা স্থানীয় দলপতিগণ যাহারা ধন মান জ্ঞান গুণাভিমানে উন্নত হইয়াছেন অথচ বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তকের উত্তর দিয়াছেন তাঁহারা কেন মৌনবতীর শরণাগত হইলেন, যদি প্রথম পুস্তকের উত্তর প্রদানে এইরূপ করিতেন তবে আমরা বলিতাম তুচ্ছ করিয়াছেন এই ক্ষণে তুচ্ছ বাক্যস্বরূপ ভস্ম দ্বারা তাঁহার দিগের সে মানের মূল পুষ্ট করিতে পারি না, একবার যখন উত্তর দিয়াছেন তখনই ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া যুদ্ধস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন এইক্ষণে নিরুত্তর হইলে বালকেরাও বলিবে পরাজয় মানিলেন তবে ধর্ম্ম শাস্ত্রই বা কোথায় রহিল আর তাঁহারাই বা কিরূপে ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন? সুতরাং বিধবা বিবাহ অধর্ম্ম নহে ইহা স্বীকার করিয়া লইলেন, যদি শাস্ত্রীয় প্রমাণে দুর্ব্বল হইলেন তবে রাজদ্বারে আবেদনে আর কি ফল প্রাপ্ত হইবেন যাঁহারা বিধবা বিবাহের বিধি করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন তাঁহারা অনায়াসে বলিবেন "তোমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণে দুর্ব্বল হইয়াছ কি প্রমাণে তোমার দিগের আবেদন গ্রাহ্যযোগ্য হইবেক" অতএব আমরা স্মরণ করাইতেছি যাহাতে রাজদ্বারে বড় মুখ ছোট করিতে না হয় শীঘ্র ২ এমত কোন সদুপায় করুন শাস্ত্রীয় প্রমাণ স্বরূপ রজ্জু দ্বারা বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় গ্রন্থকে কুক্কুর পুচ্ছে বন্ধন করিয়া না দিলে ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা আবেদনকারি দিগের কোন কথা শুনিবেন না, শ্রীল শ্রীযুক্ত লার্ড-বাহাদুরের সহিত ইহা স্থির স্থার হইয়া গিয়াছে এইক্ষণে আপনার দিগের বল বুঝিয়া ফল প্রার্থনা করুন।"

১৮৫৬ সালের ১৩-ফেব্রুআরির 'সংবাদ প্রভাকর' থেকে একটি প্রেরিত পত্র উদ্ধার করি :

"প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

হে সম্পাদক মহাশয়। আমি রামতনু চক্রবর্ত্তী, আমার দুঃখ বর্ণনা করিতে নিরস লেখনীও বিরসমনা হন, আহা কি আক্ষেপ! উদ্বাহ উৎসাহে মানব-মণ্ডলী মাত্র কাহার অন্তঃকরণে না সুখের সঞ্চার হয়, বিমলা বালাগণের বদন যন্ত্র হইতে হুলুধ্বনিরূপ যে নিরুপম নিনাদ নিসৃত হইতে থাকে, তাহা শ্রবণে কাহার না হর্ষ জন্মে, ধনী কি দরিদ্র গাত্রে হরিদ্রা লেপনে কোন্ ব্যক্তি না আনন্দ করিয়া থাকে, নানারূপ শোভনীয় বসন ভূষণে ভূষিত হইয়া মহা-সমারোহ পূর্ব্বক অবিবাহিত অন্ন ভক্ষণে অর্থাৎ আইবড় ভাত খাওয়াতে কাহার চিত্ত উল্লসিত না হয়। বন্ধন শব্দটি শ্রবণে প্রায়ই ক্রন্দন উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু হস্তে সূত্র বন্ধন কি মিষ্ট, বরং মোচনে লোচনে নীর নিসৃত হয়, এই বিবাহের বন্ধনে তো আনন্দের সীমা থাকে না, আহা। উল্লেখিত এরূপ আনন্দ রস আস্বাদনে আমরা প্রায় পুরুষানুক্রমে বঞ্চিত বলিতে হয়, তদ্রূপ কুলীন কামিনীদিগের যৌবন ভাগীরথীতে ভাটা না হইলে তাহারা বিলাসরূপ তরণী খুলিতে সক্ষমা নহেন, তদ্রূপ আমারদিগেরও যৌবনরূপ দিবাবসান না হইলে সন্তোষ সলিলে স্নান করিয়া স্নিগ্ধ হওয়া সুকঠিন, আমরা কেবল রন্ধন-শালার নিমিত্ত হরিদ্রা ক্রয় করিয়া থাকি, গাত্রে লেপন করিয়া চিত্তে আনন্দলাভ

করিতে পারিলাম না, আমারদিগের স্বপাকভিন্ন বিপাক উদ্ধারের কোন উপায় নাই, গুবাক ছেদনাস্ত্র অর্থাৎ জাঁতি কিরূপ আমরা কখনই তাহা আনন্দ সহিত হস্তে ধারণ করিলাম না, সংপ্রতি এক শুভজনক সংবাদ শ্রবণে বড়ই সন্তোষিত হইয়াছি, শুনিলাম যে চক্রবর্ত্তি, ঘোষাল, হড়, গুড় গড়গড়ি ইত্যাদি উপাধি-বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যূহের উপকারক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এরাজ্যে Second Hand (সেকেণ্ড হেণ্ড) রমণী অর্থাৎ স্বোজবোরে কোনে চলন হইবেক, একারণ ভরসা করি যে আমরা অতি সুলভ মূল্যেই মনোহরা মহিলা লাভ করিতে সমর্থ হইব; আর চারি পাঁচ শত মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া অশীতি ও নবতী বৎসরে পঞ্চম বর্ষীয় বালিকা বিবাহ করিতে হইবে না, বোধ করি যৌবনরূপ বসন্ত সময়েই আমারদিগের বপুরূপ বিটপিতে উদ্বাহ কুসুম বিকসিত হইতে পারে, কেননা সেকেণ্ড হেণ্ড অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পুরাতন দ্রব্য অল্প মূল্যে পাইবার কোন প্রতিবন্ধকতা দৃষ্ট হইতেছে না। হে জগদীশ্বর! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনীরূপ অশীকে তীক্ষ্ণ ও খরশান করুন, কেননা তদ্বারা এদেশের কুসংস্কাররূপ শত্রু সংহারে উক্ত মহোদয় যত্নবান হইবেন এবং আমরাও এই পরিষ্কার পদ্ধতি প্রচলিত প্রার্থনায় স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিলাম।

পদ্য

মনের হুতাশ আর ধনের বিনাশ।
অংশ নাশ বংশ নাশ আর সর্ব্বনাশ॥
হবে ক্ষয় বোধ হয় এতদিন পরে।
যথা তথা এই কথা কহে ঘরে পরে॥
নবীনা ললনা লয়ে বসিবে নবীন।
যে দিন এ দিন হবে সে দিন কি দিন॥

শিরোরুহ শ্বেতবর্ণ শরীর ললিত।
গলিত কপোল কণ্ঠ দশন পলিত॥
হোলে পর তবে বর সকলে বলিত।
অফলা তরুতে ফল তবে ত ফলিত॥
এসব যন্ত্রণা আর হবে না সহিতে।
একাকি শয্যায় পোড়ে হবে না রহিতে॥
দিন দিন দীনতা সবার হবে ক্ষীণ।
যে দিন এদিন হবে সে দিন কি দিন॥

অপরাহ্নে পীযূষ বিষম বিষময়।
সকালেতে শাক অন্ন, ভাল বোধ হয়॥
হতভাগ্যদের ভাগ্যে কত দুঃখ আছে।
কেবা শুনে মন দুঃখ কই কার কাছে॥
চারিটা বাজিলে তবে বিবাহ হইত।
বিবি বড় হোয়ে মিঞা পটল্ তুলিত॥

বুঝি মারা গেল মম দুখরূপ মীন।
যে দিন এদিন হবে সে দিন কি দিন॥

অনুপমা প্রাণ সমা প্রিয়তমা যার।
গৃহে নাই মিছে গৃহ জানিবে তাহার॥
হেরিলে যাহার মুখ সুখ হয় মনে।
অভাবে সঞ্চিত ধন বঞ্চিত সে ধনে॥
যে পদ্ধতি প্রচলিত হইবে এখন।
ষোড়ষী রূপসী হবে সহজে গ্রহণ॥
কুলীন বংশজে আর না থাকিবে ভিন্ন।
যে দিন এদিন হবে সে দিন কি দিন॥

ভবানীপুরস্থ
কস্যচিৎ
বিয়ে পাগলা।"

সন ১২৬২ সাল

এটি প্রকাশ করে "সংবাদ প্রভাকর" সম্পাদক মন্তব্য করেছেন : "এই রচনা অতি সুন্দর হইয়াছে।"

বিধবা-বিবাহ বিষয়ে ১৮৫৬ সালের ১৫-ফেব্রুআরির 'The Bengal Hurkaru and India Gazette' পত্রিকায় সম্পাদককে লেখা জনৈক ভদ্রলোকের একখানা চিঠি ছাপা হয়েছে। চিঠিখানা তুলে দিচ্ছি :

"SIR,—It was generally believed that the pamphlet by Pundit Issur Chunder Biddasagur in favour of the Remarriage of Hindu Widows would do nothing towards the adoption of the innovation; but we are now undeceived when we witness the daily progress of Society towards regeneration.

It is indeed a matter of great regret that persons born and bred in Calcutta, and with the boasted education they have received, should remain indifferent in such matter. I cannot but wonder when I reflect on the advantages Mofussil men have derived within so short a time from studying the pamphlet and the ardour they display to escape the bonds of superstition though totally destitute of that light which refines the understandings of man, by which he discerns the unjustness or justness of any thing immediately proposed. There lives a man, by birth a Sudra, in the village of Chaldha, which from its populousness is known to many, and is less than half a mile from Chandernagore. He has an only daughter whom he loves as a doting parent ought to love a beautiful child. In time his daughter arrived at that age properly fixed for marriage, and sober marriage was completed with usual solemnity. To be short in my narrative, her husband died a fortnight after his

marriage, and thus (according to our cruel Shaster) left his wife to end her days in grief and distress. It is useless to mention here the father's agony at so sad an accident; it is very well to be imagined than expressed; and afterwards the father, unable to observe the sufferings of his only daughter, began to think of re-marrying her, and after great deal of search and trouble he succeeded in fixing upon a proper bridegroom of the same village.

Thus the day was fixed, and on the night of the 9th instant, the re-marriage was celebrated in the presence of many hundreds of men.

This happy event, I think, will encourage the people to exhibit moral courage enough to adopt the innovation throughout the country. I will continue about this in my next opportunity.

If you have any feelings of sympathy with the sufferings of our widows, you will not fail to give this an early insertion in a corner of your paper.

Bow Bazar, February 14, 1856

G. C. B."

১৮৫৬ সালের ১৬-ফেব্রুআরি 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখেছে :

"আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি ১৫-ফিব্রুয়ারি দিবসীয় বাঙ্গাল হরকরা পত্রে জি সি বি ইতি নাম স্বাক্ষরিত কোন পত্রপ্রেরক লেখেন চন্দননগরের অর্দ্ধ ক্রোশ পথ ব্যবধান চালদা গ্রাম বাসি জনেক সৎ শূদ্র গত ৯ ফিব্রুয়ারি রাত্রে স্বীয় বিধবা কন্যাকে পুনঃ পাত্রস্থা করিয়াছেন, প্রথম বিবাহে যে প্রকার বৈধ বিবাহ সংস্কারাদি ক্রিয়া করিতে হয় এ বিবাহেও তদ্রূপ সমুদায় কার্য্য উত্তম রূপে সম্পন্ন হইয়াছে, পত্রপ্রেরক লেখেন ঐ বিবাহে অনেক ভদ্র বরযাত্র কন্যাযাত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সংবাদদাতার এ সংবাদ যদি সত্য হয় তবে সহজেই বলিতে হইবেক কলিকাতাবাসি সভ্য মহাশয়দিগের অপেক্ষা মফস্বলীয় লোকেরা বিধবা বিবাহ সপক্ষে অধিক অনুরাগী ও উৎসাহী হইয়াছেন, বহুকালাবধি কলিকাতা নগরীতে বিধবা বিবাহ বিষয়ে আন্দোলন চলিতেছে কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে নগরবাসি বিধবা বিবাহ সপক্ষ কোন ভদ্র বা ক্ষুদ্র মহাশয়েরা বিধবা বিবাহ দিতে ও করিতে সাহসী হয়েন নাই অতএব মফস্বলীয় লোকেরা আইন না হইতেই বিধবা বিবাহের প্রথা দেখাইলেন তজ্জন্য তাঁহারদিগকে অধিক ধন্যবাদ দিতে হয়।"

১৮৫৬ সালের ১৬-ফেব্রুআরি 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখেছে : "হিন্দু বিধবা বিবাহ বিপক্ষে যে সকল মহামহিমেরা সভা করিয়াছিলেন ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহারদিগের আবেদন সমর্পণ হইয়াছে, আবেদন পত্রে বহুলোকে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, সভ্য মহাশয়েরা পল্লি গ্রামে গ্রামে লোক পাঠাইয়া ছোট বড় অনেকের নাম স্বাক্ষর করাইয়াছিলেন কিন্তু স্বাক্ষরকারিদিগের মধ্যে এক আনা মনুষ্যও

নাম লব্ধ নহেন, "পাড়াগেঁয়ে ভূত" অর্থাৎ পল্লিগ্রামীয় দেবযোনি দিগের নাম স্বাক্ষরে কেবল আয়াস প্রকাশ হইয়াছে, ব্যবস্থাকারি সমাজাধ্যক্ষ মহাশয়েরা সে সকল ব্যক্তিদিগের এক ব্যক্তিকেও চিনিতে পারিবেন না, ইহাতে অপরিচিত নামে কি কাম সিদ্ধ হইবেক? ফলে পৃথিবীর পোনেরো আনা মনুষ্য এক দিগে হউন, আর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক আনা মনুষ্য সহিত এক দিগে থাকুন, এবং আমার দিগের বিপক্ষে লক্ষ ২ লোকে খড়্গ ধারণ করুন তথাচ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য কিম্বা আমরা ইহাতে ভীত হইব না, পরমেশ্বর যদি স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিকে সমান স্বাধীনতা প্রদান করিয়া থাকেন তবে হিন্দু বিধবাদিগের যন্ত্রণা ভোগের অবশ্যই পরিশেষ হইবেক, আমার দিগের লেখনী এই সাহসে নৃত্য করিতেছে, অনিষ্ট দর্শিরা খৃীষ্ট দেহে লৌহশলাকা পর্য্যন্ত প্রোথিত করিয়াছিলেন তথাচ ঐ মহাত্মা মৃত্যু ভয় করেন নাই "পরমেশ্বর প্রসাদাৎ ধ্রুবং তরিষ্যামি" এই নিশ্চয় বুদ্ধি দ্বারা তিনি পৃথিবীর উপকার বিষয়ে সর্ব্বজয়ী হইয়াছিলেন যদি পরমেশ্বর বিষয়ে আমার দিগের লেখনীর নিষ্ঠাচার থাকে তবে আমরাও অবশ্য দেখিব হিন্দু বিধবা দিগের বিবাহ হইয়াছে, এইক্ষণে দেখি পরমেশ্বর কি করেন।"

কাউন্সিলের অন্যতম সভ্য জে. পি. গ্রাণ্ট প্রস্তাবিত বিধবা-বিবাহ বিলের খসড়াটি, ১৮৫৫ সালের ১৭-নভেম্বর, কাউন্সিলে উত্থাপন করলেন। সমর্থন করলেন স্যর জেমস কলভিল।

১৮৫৬ সালের ৯-জানুআরি খসড়াটি দ্বিতীয়বার উপস্থাপিত হল। বিচারের ভার অতঃপর অর্পিত হল একটি সিলেক্ট কমিটির হাতে। সিলেক্ট কমিটিতে রইলেন : স্যর জেমস কলভিল; এলিয়ট; পি. ডব্ল্যু. লিগেট; জে. পি. গ্রাণ্ট।

বিধবা-বিবাহ আইন যাতে পাশ না হয় সেজন্য, ১৮৫৬ সালের ১৭-মার্চ, একটি আবেদনপত্র দাখিল করলেন রাধাকান্ত দেব। এই আবেদনপত্রে প্রায় ৩৩,০০০ স্বাক্ষর।*

সেসময়ে বিধবা-বিবাহের সপক্ষে ও বিপক্ষে নানা অঞ্চল থেকে ভারত-গবর্নমেণ্টের কাছে বহু আবেদনপত্র গেছে। অন্তত কয়েকখানা আবেদনপত্রের বিবরণ দাখিল করা যেতে পারে।

বিধবা-বিবাহের সপক্ষে একখানা আবেদনপত্র প্রেরিত হয়েছে কলকাতা থেকে, ১৮৫৫ সালের ৬-ডিসেম্বর। সেখানায় স্বাক্ষর করেছেন মহারাজ

---

* রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে প্রেরিত এই আবেদনপত্র বর্তমানে ভারতের রাষ্ট্রীয় অভিলেখাগারে রক্ষিত আছে। আবেদনপত্রে কৃত সমস্ত স্বাক্ষরের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু বিপুল সংখ্যক স্বাক্ষর যে ছিল, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। ঠিক কত ছিল? মূল আবেদনপত্রের পিছনে পেন্সিলে লেখা আছে : 36764; আবার আগের পৃষ্ঠায় এই আবেদনপত্রের স্বাক্ষরসংখ্যা বিষয়ে পেন্সিলে লেখা আছে : about 33000 signatures.

রাধাকান্ত দেব সহ ৬১৭ জনের স্বাক্ষরে বিধবা-বিবাহের বিপক্ষে দ্বিতীয়বার আবেদন-পত্র সরকারী দপ্তরে পেঁচেছে। সরকারী তরফ থেকে এই আবেদনপত্রের পিছনে লেখা আছে: "Presented 5 July 1856"; রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে প্রেরিত দ্বিতীয়বারের এই আবেদনপত্রে প্রথমবারের আবেদনপত্র সম্পর্কে লেখা আছে :

"the one signed by Royal Radhacant Deb and 33 thousand Hindu inhabitants. . .!" (Legislative Paper of Act XV 1856.-Vol. I & II, p. 1220)

শ্রীশচন্দ্র রায়বাহাদুর। এবং কৃষ্ণনগর ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের অনেক অধিবাসী।

১৮৫৫ সালের ৭-ডিসেম্বর বারাসত, হালিশহর, বেলঘরিয়া, মহেশ্বরপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বহুজন বিধবা-বিবাহের সপক্ষে 'মহামহিম শ্রীলশ্রীযুক্ত ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজাধ্যক্ষ মহাশয়ে'র কাছে আবেদন করেছেন। উক্ত আবেদনপত্র থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি : "যেহেতু স্ত্রীজাতি স্বাভাবিক গুণে পুরুষের তুল্য। পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ হইলে অনায়াসে বিবাহ হইতে পারে। অস্মদ্দেশে বিধবাগণ মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত না থাকা নিতান্ত স্বভাব বিরুদ্ধ। ঈশ্বরের নিয়ম ভঙ্গ করায় কেবল যে পতিহীনা কামিনীগণের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে ও কাহার ২ ঘোরতর দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয় এমত নহে, পুরুষদিগের ও তাহাদিগের দুঃখের ভাগি এবং কখন ২ বা উভয় জাতির সম্ভ্রম রক্ষার্থে অসত্যাবলম্বন করিতে হয়। অনেকে এই সমস্ত চিন্তা করিয়া বিশেষতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ও দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত পুস্তকদ্বয় পাঠে বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে ইহা জ্ঞাত হইয়া এই নিষ্ঠুর ও বিধিমতে অনিষ্টকর নিয়মউলঙ্ঘন করিতে উদ্যত আছেন, কিন্তু পাছে বিচারালয়ে এরূপ বিবাহ বিবাহ বলিয়া গ্রাহ্য না হয় ও তদ্‌জাত সন্তান ঔরস সন্তান বলিয়া গণনীয় না হয়, এই আশঙ্কায় অনেকে এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। ব্যবস্থা সমাজ হইতে এই ভয় দূরিকৃত হইলে অনায়াসে ও অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা।..."

পুনা থেকে বিধবা-বিবাহের সপক্ষে একখানা আবেদনপত্র প্রেরিত হয়েছে ১৮৫৫ সালের ৭-নভেম্বর।

কলকাতা মিশনারি কনফারেন্সের সদস্যবৃন্দ, ১৮৫৫ সালের ২২-ডিসেম্বর, হিন্দুর বিধবাদের পুনর্বিবাহের সপক্ষে গবর্নমেণ্টের কাছে আবেদন করেছেন।

কলকাতা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের ৬৮৫ জন হিন্দুর একখানা আবেদনপত্র—বিধবা-বিবাহের সপক্ষে—সরকারী দপ্তরে এসেছে ১৮৫৬ সালের জানুআরি মাসে। উক্ত আবেদনপত্র থেকে কয়েকজন স্বাক্ষরকারীর নাম : রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব, দিগম্বর মিত্র, রামনারায়ণ তর্করত্ন, প্যারীচরণ সরকার, ভূদেব মুখার্জি, তারিণীচরণ সরকার।

বিধবা-বিবাহের সপক্ষে ভিঞ্চুরের মারাঠাপ্রধান এবং আরো কয়েকজনের আবেদনপত্রের নিচে তারিখ : ১২-জানুআরি, ১৮৫৬ সাল। উক্ত আবেদনপত্রখানা নাসিক থেকে পাঠানো হয়েছে ১৮৫৬ সালের ১৮-জানুআরি।

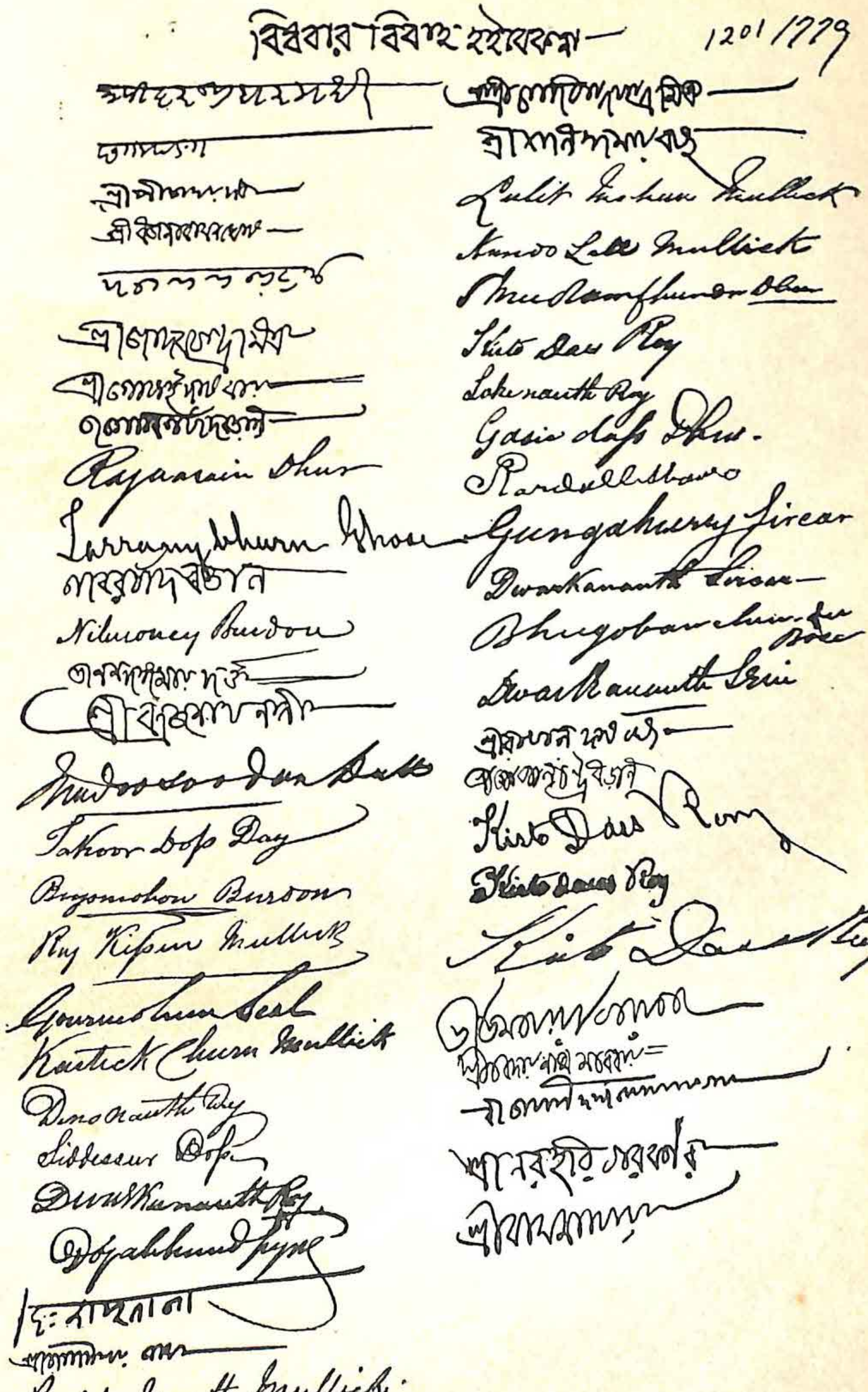
মুর্শিদাবাদ থেকে ১৮৫৬ সালের ২১-ফেব্রুআরি বিধবা-বিবাহের সপক্ষে বহুজনের স্বাক্ষরিত একখানা আবেদনপত্র প্রেরিত হয়েছে। উক্ত স্বাক্ষরকারীদের অন্যতম্ পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

মেদিনীপুরের অধিবাসীদের বিধবাবিবাহের সপক্ষের একখানা দরখাস্ত রাজনারায়ণ বসু, ১৮৫৬ সালের ২৯-মার্চ, পাঠিয়েছেন।

বাঁকুড়া ও বর্ধমান থেকে বিধবাবিবাহের সপক্ষে, ১৮৫৬ সালের ১৫-এপ্রিল, আবেদনপত্র প্রেরিত হয়েছে।

আমেদনগর থেকে ৩৪ জন হিন্দু, ১৮৫৬ সালের ২৫-এপ্রিল, বিধবা-বিবাহের পক্ষে আবেদন করেছেন।

বিধবাবিবাহের সপক্ষে ৩১২ জন স্বাক্ষরিত ১৮৫৬ সালের ৭-মের একখানা আবেদনপত্র থেকে একাংশ উদ্ধার করি : "হিন্দুজাতীয় স্ত্রীলোক-



বিধবাবিবাহ বিষয়ে সরকারী দপ্তরে প্রেরিত একখানা আবেদনপত্রের প্রতিলিপি। মূল আবেদনপত্রখানি বর্তমানে ভারতের রাষ্ট্রীয় অভিলেখাগারে রক্ষিত আছে।

1022

অনুদ্দিষ্ট অথবা ক্লীব স্থির হয় তাহাদের প্রতি শাস্ত্র সত্ত্বেও পত্যন্তর গ্রহণের—
প্রথা না থাকাতে তাহাদের হইতে ভ্রূণহত্যাদি বিবিধ কুকর্ম্ম হইয়া থাকে—
অধিকন্তু যে সকল পুরুষ লম্পট; যবনী প্রভৃতি অগম্যা গমনে আসক্ত—
অথবা ধর্ম্মান্তর অবলম্বন করে তাহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা সহধর্ম্মিণী গণ—
পতিত সংসর্গে পরাঙ্মুখী হওয়াতে সেই সকল অবলার পতি সত্ত্বেও বৈধব্য—
যন্ত্রণাপেক্ষা গুরুতর ক্লেশভোগ হইয়া থাকে ইহাও সামান্য অনিষ্ট নহে—
অতএব আমরা প্রার্থনা করি আপনারা এতদ্দেশীয় বিধবা দিগের প্রতি—
কৃপা কটাক্ষ করিয়া যেমন বিধবা বিবাহ বিষয়ক আইনের প্রস্তাব করি-—
য়াছেন তেমনি স্বামির অনুদ্দেশ প্রব্রজ্যা গমন ক্লীবত্ব প্রাপ্তি এবং পতিত-
হইলে ঐ চারি প্রকার আপদগ্রস্তা স্ত্রীদিগের প্রতিও দয়া করিয়া তাহাদে-
রও পুনর্ব্বার বিবাহের নিয়ম করুন। বিধবা বিবাহ বিষয়ক আইন—
এ প্রকার পঞ্চবিধ আপদগ্রস্ত অবলার পক্ষে সাধারণ করিয়া দিলে—
কেবল এতদ্দেশীয় অঙ্গনাগণের প্রতি আপনাদের অনুকম্পা প্রকাশ—
হইবেক এমত নহে আপনারা তদ্দ্বারা অবস্থ সমস্ত স্ত্রীর ধর্ম্ম ও মান—
রক্ষা এবং ব্যভিচার নিবারণের বিশেষতঃ দেশের প্রজাবৃদ্ধির কারণ—
হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইবেন অধিকন্তু বিধবা বিবাহ বিষয়ক আইনের—
পাণ্ডুলেখ্যে ঐ বিষয় এদেশের শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া যে অভিপ্রায় ব্যক্ত—
করিয়াছেন উক্ত পঞ্চপ্রকার আপদগ্রস্ত স্ত্রীদের বিবাহ বিষয়ক সাধারণ—
আইন করিলে তাহাও সম্পূর্ণ হইবেক ইতি — তা° ৭ মে ১৮৫৬।—

বিধবাবিবাহ বিষয়ে সরকারী দপ্তরে প্রেরিত একখানা আবেদনপত্রের শেষাংশের প্রতিলিপি।
মূল আবেদনপত্রখানা বর্তমানে ভারতের রাষ্ট্রীয় অভিলেখাগারে রক্ষিত আছে।

দিগের আপৎকালে পত্যন্তরগ্রহণ শাস্ত্রসিদ্ধ যথা নষ্টেমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতেপতৌ। পঞ্চস্বাপৎসুনারীণাং পতিরন্যোবিধীয়তে॥ ইতি॥ কেবল দেশাচারে প্রচলিত নাই, কিন্তু দেশাচার শাস্ত্রাপেক্ষা প্রবল নহে ইহা সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপেল পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহোদয় বিবিধ শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক সপ্রমাণ করিয়াছেন এবং তাহাতেই ভারতবর্ষীয় ভূরি ২ প্রজা আপনাদিগের সমীপে বিধবাবিবাহ বিষয়ক আইন-প্রচারের প্রার্থনা করিয়াছেন...।" এই আবেদনপত্রের অন্যতম স্বাক্ষরকারী দীনবন্ধু মিত্র।

১৮৫৬ সালের ১৯-মে ভগবানচন্দ্র বসু ময়মনসিংহ থেকে বিধবাবিবাহের পক্ষে আবেদন করেছেন।

বারাসত ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের ১১১ জন হিন্দু, ১৮৫৬ সালের ২০-জুন, বিধবাবিবাহের পক্ষে গবর্নমেণ্টের কাছে আবেদন করেছেন।

ঢাকা থেকে ১১৩ জন হিন্দু, ১৮৫৬ সালের ২৪-জুলাই, বিধবাবিবাহের পক্ষে গবর্নমেণ্টের কাছে আবেদন করেছেন।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং আরো কয়েকজন বিধবাবিবাহের সপক্ষে সেসময়ে আবেদন করেছেন। কেবলমাত্র বিধবাবিবাহের পক্ষে বললে সবটুকু বলা হয় না। সেই আবেদনপত্রে লিখিত আছে :

". . . the requirements of the case would be better met by a *general marriage* law, than by a special enactment, legalizing the marriage of Hindoo widows only."

অতঃপর বিধবাবিবাহবিরোধী দলের কয়েকটি আবেদনপত্রের প্রতি দৃষ্টি-পাত করা দরকার।

ত্রিপুরা থেকে ৩২০ জন হিন্দু বিধবাবিবাহের বিপক্ষে আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন বাঙলা ১২৬২ সালের ২৯-ফাল্গুন।

বোম্বাইয়ের অন্তর্গত সাতারা জেলা থেকে ১৪১ জন হিন্দু বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে আবেদন করেছেন ১৮৫৬ সালের ২৫-মার্চ।

বোম্বাইয়ের অন্তর্গত Kusba Kallian থেকে ২৪৮ জন হিন্দু বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে আবেদন করেছেন ১৮৫৬ সালের ২৩-এপ্রিল।

কলকাতাপ্রবাসী উত্তর ভারতের ৭৮৪ জন অধিবাসী ১৮৫৬ সালের এপ্রিলে বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে আবেদন করেছেন।

পুণা থেকে বিস্তর স্বাক্ষরকারী, ১৮৫৬ সালের ১৫-এপ্রিল, বিধবা-বিবাহের বিপক্ষে আবেদন করেছেন :

". . . your Lordship in Council may be pleased not to pass the remarriage act in question but to suppress it."

রাধাকান্ত দেব সহ ৬১৭ জনের স্বাক্ষরে বিধবাবিবাহের বিপক্ষে দ্বিতীয়বার আবেদনপত্র সরকারী দপ্তরে পেঁৗছেছে। সরকারী তরফ থেকে ওই আবেদন-পত্রের পিছনে লেখা আছে :

"Presented 5 July 1856"

ত্রিপুরা থেকে ৩২০ জন হিন্দু বিধবাবিবাহের বিপক্ষে আবেদনপত্র দাখিল করেছেন।

পুণা থেকে বিধবাবিবাহের বিপক্ষে প্রায় এক হাজার ব্যক্তি আবেদন করেছেন।

বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে ২৪৫ জন বাঙালী হিন্দুর স্বাক্ষরিত একখানা আবেদনপত্র দেখা যাচ্ছে।

"শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামক কোন অভিনব পণ্ডিত নব্যসম্প্রদায়ের কতিপয় যুবক সহযোগে" প্রার্থনা করায় গবর্নমেণ্ট বিধবাবিবাহ বিষয়ক আইন প্রণয়নের উদ্যোগ করেছে বলে "নবদ্বীপ ত্রিবেণী ভট্টপল্লী বংশবাটী কলিকাতা প্রভৃতি ধর্ম্ম সমাজস্থ" প্রায় এক হাজার পণ্ডিত বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে আবেদনপত্র দাখিল করেছেন : "আমরা কেবল ধর্ম্মদ্রোহ সম্ভাবনা দেখিয়াই এই আবেদনপত্র দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি আপনারা বিধবাবিবাহবিষয়ক আইন প্রচারে ক্ষান্ত হউন...।"*

হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, সপক্ষের চেয়ে বিপক্ষের আবেদনপত্রের সংখ্যা বেশি। বিধবা-বিবাহ আইনের বিপক্ষে যত স্বাক্ষরকারী আছেন, আইনের সপক্ষে তত স্বাক্ষরকারী নেই। আরো বিশদ করতে গেলে বলতে হয় তুলনায় সপক্ষে স্বাক্ষরের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প।

১৮৫৬ সালের ৩১-মে সিলেক্ট কমিটি প্রস্তাবিত আইনের পক্ষে মন্তব্য দাখিল করল। ১৮৫৬ সালের ১৯-জুলাই খসড়ার পাণ্ডুলিপি তৃতীয়বার পঠিত হল।

১৮৫৬ সালের ২৬-জুলাই বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হয়ে গেল। আইনটির নাম :

Act XV of 1856, being an Act to remove all legal obstacles to the Marriage of Hindu Widows.

১৮৫৬ সালের ১২-আগস্টের 'সম্বাদ ভাস্করে' একখানা প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধার করি : "...সম্প্রতি, পণ্ডিতবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিধবা বিবাহের সূত্র তুলিয়াই আপনার "বিদ্যাসাগর" এই উপাধিটীকে এককালে প্রভূত বিখ্যাত করিয়া লইলেন, ইদানীং প্রায় সকল স্থানে "বিধবা বিবাহ" এই মহামঙ্গল কর বিষয়সূচক নানা কথা উদ্ভাবিতা হইতেছে, অধিক আর কি কহিব কলিকাতা মহানগরীতে এবং অন্যান্য পল্লীগ্রামের প্রকাশ্য পথে বহির্গত হইলে প্রায়শঃ দেখা যায়, যে অনেকানেক প্রাকৃত লোকে, কেহ ২ গরুর গাড়ী চড়িয়া, কেহ বাঁক ঘাড়ে করিয়া, কেহ বা মদ্য পানে মত্ত হইয়া "বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে" ইত্যাকার পক্ষি রচিত গীত করিয়া, আনন্দ লাভ করিতেছে, কেবল যে ইতর লোকেরাই এই রূপ আনন্দে আছে এমত নহে, অনেকানেক ভদ্রলোকেরাও সবান্ধব হইয়া উপযুক্ত সময়ে পক্ষি রচিত ঐ গান করিয়া আমোদিত হন।..."

শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরই জয়ী হলেন। কিন্তু বিপক্ষদলের তখনো আশা, আইন পাশ হলেই সত্যি-সত্যি বিধবাবিবাহ হবে এমন কোনো কথা নেই।

---

* বিধবা-বিবাহের সপক্ষে ও বিপক্ষে প্রেরিত এই আবেদনপত্রাবলী সম্পর্কিত তথ্য বর্তমানে ভারতের রাষ্ট্রীয় অভিলেখাগারে রক্ষিত "Legislative Paper of Act XV 1856, Vol. I & II" থেকে সংগৃহীত।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন :

"হিন্দু বিধবার বিয়া আছে অপ্রচার।
বহুকাল হ'তে যার নাহি ব্যবহার॥
সে বিষয়ে ক্ষতাক্ষত না করি বিশেষ।
করিলেন একেবারে নিয়ম নির্দ্দেশ॥
শত শত প্রজা তায় ব্যথা পায় প্রাণে।
তাদের আর্দ্দাশ নাহি শুনিলেন কানে॥
গ্রাণ্ট করি গ্রাণ্টের সকল অভিলাষ।
কালবিল কাল বিল করিলেন পাস॥
না হইতে শাস্ত্রমতে বিচারের শেষ।
বল করি করিলেন আইন আদেশ॥
যাহাদের ধর্ম্ম এই আর দেশাচার।
পরস্পর তারা আগে করুক বিচার॥
বিধি কি অবিধি তারা ঘরেতে বুঝিবে।
যা হয় উচিত তাই শেষেতে করিবে॥
করিছে আমার ধর্ম্ম আমাতে নির্ভর॥
রাজা হয়ে পরধর্ম্মে কেন দেন কর॥
আগে ভাগে রাজাদেশ করিতে প্রচার।
এত কেন মাথা-ব্যথা হইল রাজার?
যদ্যপি বিধান হয় বিধবার বিয়ে।
আপনারা করুক আপন দল নিয়ে॥
যুক্তি আর বিচারেতে যে হয় বিহিত।
দেশেতে চলিত করা তাই ত উচিত॥
অনিয়মে করি এ কি নিয়মের ছল।
ভূপতি তাহাতে কেন প্রকাশেন বল॥
কোলে কাঁকে ছেলে ঝোলে যে সকল রাঁড়ী।
তাহারা সধবা হবে প'রে শাঁখা শাড়ী॥
এ বড় হাসির কথা শুনে লাগে ডর।
কেমন কেমন করে মনের ভিতর॥
শাস্ত্র নয় যুক্তি নয় হবে কি প্রকারে।
দেশাচারে ব্যবহারে বাধো বাধো করে॥
যুক্তি ব'লে বিচার করুন শত শত।
কোনমতে হইবে না শাস্ত্রের সম্মত॥
বিবাহ করিয়া তারা পুনর্ভবা হবে।
সতী ব'লে সম্বোধন কিসে করি তবে?
বিধবার গর্ভজাত যে হবে সন্তান।
বৈধ ব'লে কিসে তার করিবে প্রমাণ?
যে বিষয় সর্ব্ববাদি-সম্মত না হয়।
সে বিষয় সিদ্ধ করা শক্ত অতিশয়॥
কলে আর ছলে বলে যত পার কর।
ফলে সে কিছুই নয় মিছে ব'কে মর॥

শ্রীমান্‌ ধীমান্‌ নীতি-নির্ম্মাণকারক।
যাঁরা সবে হতে চান বিধবাতারক॥
নতভাবে নিবেদন প্রতি জনে জনে।
আইন-বৃক্ষের ফল ফলিবে কেমনে॥
বিধবার বিয়ে দিতে যাহারা উদ্যত।
তার মাঝে বড় বড় লোক আছে যত॥
যারে ইচ্ছা তারে হয় ডাকিয়া আনিয়া।
ঘরেতে বিধবা কত পরিচয় নিয়া॥
গোপনেতে এই কথা বলিবেন তারে।
জননীর বিয়ে দিতে পারে কি না পারে॥
যদি পারে তবে তারে বলি বাহাদুর।
এমনি করিলে সব দুঃখ হয় দূর॥
সহজে যদ্যপি হয় এরূপ ব্যাপার।
করিতে হবে না তবে আইন প্রচার॥
যদি কেহ নাহি পারে সাহস ধরিয়া।
বিফল কি ফল তবে আইন করিয়া॥
পরস্পর আড়ম্বর মুখে কত কয়।
কেহ আর মাথা তুলে অগ্রসর নয়॥
গোলেমালে হরিবোল গণ্ডগোল সার।
নাহি হয় ফলোদয় মিছে হাহাকার॥
বাক্যের অভাব নাই বদন-ভাণ্ডারে।
যত আসে তত বলে কে দূষিবে কারে॥
সাহস কোথায় বল প্রতিজ্ঞা কোথায়।
কিছুই না হ'তে পারে মুখের কথায়॥
মিছামিছি অনুষ্ঠানে মিছে কাল হরা।
মুখে বলা বলা নয় কাজে করা করা॥
সকলেই তুড়ি মারে বুঝে নাক কেউ।
সীমা ছেড়ে নাহি খেলে সাগরের ঢেউ॥
সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হ'তে পারে বিবাহ-ঘটন॥
নচেৎ না দেখি কোন সম্ভাবনা আর।
অকারণে হই হই উপহাস সার॥
কেহ কিছু নাহি করে আপনার ঘরে।
যাবে যাবে যায় শত্রু যাক্‌ পরে পরে॥
তখন এরূপ কবে হ'লে ব্যতিক্রম।
"ফাটায় পড়েছে কলা গোবিন্দায় নম॥"
রাজার কর্ত্তব্য কথা করিতে বর্ণন।
এরূপ লিখিতে আর নাহি প্রয়োজন॥
এইমাত্র শেষ কথা, কহিব নিশ্চয়।
এ বিষয়ে বিধি দেয়া রাজধর্ম্ম নয়॥
মরুক মরুক বাদ প্রজায় প্রজায়।
কোন্‌ কালে রাজার কি হানি আছে তায়॥[১]

১৮৫৬ সালের ২৮-আগস্ট 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখেছে : "বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় পীড়াসাগরে পড়িয়াছেন, এই অশ্ুভ সমাচারে আমরা অত্যন্ত দ্ুঃখিত হইলাম, শ্ুনিলাম কয়েক মাসের অবসর লইয়াছেন, স্থানান্তরিত হইয়া পীড়া শান্তি করিবেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিবা রাত্রি অপরিমিত পরিশ্রম করেন, দ্ুর চরণেও দ্ুই চরণকেই অশ্ব স্বর্ুপ করিয়াছেন দিবারাত্রি দ্ুরাদ্ুর সর্ব্বত্র টো ২ করিয়া বেড়ান, অধিক বেতন পাইতেছেন তথাচ গাড়ী পাল্কীর ব্যয় কুলায় না, উচ্চপদে উঠিয়াও পদকে দ্ুঃখ দিবেন তবে কি প্রকারে স্ুখে থাকিবেন? শ্ুনিতে ৫০০ টাকা মাসিক বেতন অধিক বটে অন্য লোকেরা এতদপেক্ষা অল্প বেতনেও ধনী হইয়াছেন কিন্তু বিদ্যাসাগরের বেতন যেমন আইসে অমনি সাগরে পাদ্যার্ঘ্য হইয়া যায়, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদি ভদ্র সন্তান বহ্ু ব্যক্তিকে মাসে ২ ব্ৃত্তি প্রদান করেন, বাসায় যত লোক আইসেন যতকাল স্বেচ্ছা থাকেন অন্ন বস্ত্র দেন, কাহাকেও বিদায় শব্দ বলেন না, সাধারণ পাকে যাহা উপস্থিত হয় তাহাই আহার, নিজাহারেও উপচারের বিশেষ পারিপাট্য নাই, অথচ রাজকার্য্যে অধিক পরিশ্রম ও চিন্তাশ্রম করিতে হয়, বিধবাবিবাহের বিধি প্রচার জন্য প্রায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এই সকল নানা কারণে রোগসঙ্করাহরণ করিয়াছেন, আমরা প্রার্থনা করি পরমেশ্বর পরোপকারি বিদ্যাসাগরকে রোগ সাগর হইতে উদ্ধার কর্ুন কিন্তু এ সময়ে তাঁহার অবসর গ্রহণ হিন্দ্ু সমাজে উপহাসের এক বিশিষ্ট কারণ হইয়া উঠিবে, অনেকে কহিবেন বিদ্যাসাগর ব্ুদ্ধি সাগর ব্যবস্থাকারি নাগর দিগকে বলিয়া ছিলেন হিন্দ্ু বিধবার লজ্জা পরিত্যাগ প্ূর্ব্বক বিবাহসজ্জা করিয়া উন্ম্ুখী হইয়া রহিয়াছে, বিধি প্রচার হইলেই নিধি লাভ জ্ঞানে বর গ্রহণ করিয়া স্ুখিনী হইবে কিন্তু বিধি প্রচার পরে এত দিন গেল একটী বিধবাও বিবাহ করিতে আসিল না ইহাতেই বিদ্যাসাগর গ্ুণসাগর শ্বেত কলেবরদিগের নিকটে লজ্জিত হইয়া রোগ সজ্জা করিয়া দীর্ঘকালীন অবসর লইলেন অতএব আমরা পরামর্শ বলি যে পর্য্যন্ত শরীর থাকিবে সে পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা সফলতাবিষয়ে উদ্যোগে থাকিলেই ভাল হয়, নীতিশাস্ত্রেও লিখিয়াছেন, "মাংসম্ূত্র প্ুরীষাস্থি নির্ম্মিতে চ কলেবরে। বিনশ্বরে বিহায়াস্থাং যশঃ পালয় মিত্র মে" বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকেন তথাচ কলিকাতাস্থ বাসা পরিত্যাগ করিয়া দ্ুর দেশে যাইবেন না, বাসায় বসিয়া থাকিয়া বান্ধবগণকে পরামর্শ প্রদান দ্বারা উৎসাহ প্রদান কর্ুন, সেনাপতিরা কি য্ুদ্ধস্থলে যান? না, স্বহস্তে অস্ত্র চালন করেন? সমর স্থানীয় শিবিরে বসিয়া থাকেন, কেবল পরামর্শ দ্বারা সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিয়া কর্ম্ম সাধন করেন, ম্ুলতানীয় সমর সময়ে জেনেরল হ্ুইক সাহেবের ভয়ানক জ্বর বিকার হইয়াছিল, তিনি ডাক-যোগে লাহোরে আসিলেও আসিতে পারিতেন, চিকিৎসকেরাও তাঁহাকে এই পরামর্শ দিয়াছিলেন কিন্তু তিনি সমর শিবির পরিত্যাগ করিলেন না, জ্বর বিকার কালেও সৈন্য জালে ম্ুলতান দ্ুর্গ বেষ্টন করিলেন এবং একরাত্রি মধ্যেই দ্ুর্গ দ্বারাভিম্ুখে ৫০ তোপ খাড়া করিয়া দিলেন সেই তোপে ২ দ্ুর্গদ্বার ভঙ্গ হয়, বিপক্ষ পক্ষীয় সেনাপতি ম্ুলরাজ ৫০০ সৈন্য সহিত সমাগত হইয়া উক্ত জেনেরল সাহেবের শরণাগত হন, য্ুদ্ধ জয়ী হইয়া তাঁহার-দিগকে সৈন্য বেষ্টনে রাখিলেন পরে অম্বালায় আসিয়া রোগ চিকিৎসা করাইলেন, ইংলণ্ডীয়েরা সমর সময়ে শরীর বা প্রাণ পানে দ্ৃষ্টি করেন না এবং হিন্দ্ু মধ্যেও প্রচার আছে অভিমন্য্ু ম্ৃত্যু শোকে অর্জ্জ্ুন একেবারে অচৈতন্য

হইয়া পড়িয়াছিলেন, শোক জন্য দুঃখাপেক্ষা রোগ জন্য দুঃখ অতি বল নয়, সেই প্রবল শোকানল রোগে প্রাণ বিয়োগাবস্থাতেও ধনঞ্জয় যুদ্ধ পরিত্যাগ করেন নাই, কুরুকুল নির্ম্মূল হইয়া গেল, দুর্য্যোধন একাকী হইয়া শোকাকুলাবস্থায় ক্ষিপ্তের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন তথাপি যুদ্ধস্থলে যুদ্ধে ২ প্রাণ দিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য এমন কি সাংঘাতিক পীড়ায় জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন দীর্ঘ বিদায় গ্রহণ করিলেন? না, না, এ সময়ে বিদায় গ্রহণ ব্যবহার করা হইবেক না, যদি উত্থান শক্তি রহিত হইয়া থাকেন তথাচ বাসায় পড়িয়া থাকিয়া পীড়া চিকিৎসা করাইবেন, পীড়া নিমিত্ত অন্যত্র গমন করিবেন না, দুর্গোৎসব নামক মহোৎসব আসিতেছে, হিন্দুরা এই অবধি নৃত্য করিতেছেন, বিদ্যাসাগর দুর্গোৎসব করেন না, বিধবা বিবাহোৎসবই তাঁহার মহোৎসব এবং ইহাও মনে করিবেন না কেবল তাঁহার উদ্যোগেই হিন্দু বিধবাদিগের বিবাহের বিধি প্রয়োগ হইয়াছে, আমরা এই উদ্যোগে জীবনের অধিক সময় মৃত্যুযোগে দিয়াছি, ন্যূনাধিক এক বৎসর অতীত হইল নানা রোগে দুঃখভোগ করিতেছি তথাচ এ সময়ে পাঠকগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি নাই, তিনটী বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান হইয়াছে অতি শীঘ্র শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইবে কেহ ২ কেবল অকাল বলিয়া কাল বিলয় করিতেছেন আমরা তাহা করিতে দিব না, বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় চিন্তাজ্বরে জ্বরীভূত হইয়াছেন, দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্ত্র শস্ত্র পরিহীন সমর কাতর কর্ণের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া গাত্রোত্থান করুন, রোগ ভোগে চরম যোগ উপস্থিত হয় হইবে, এক সময়ে তাহা হইবেই নিশ্চিত।"

১৮৫৬ সালের ২৫-সেপ্টেম্বর 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখেছে : "বালি দেওয়ানগঞ্জ নামক প্রসিদ্ধ প্রদেশ মধ্যে মাঝের গ্রাম নামক এক গ্রাম আছে ঐ গ্রামে কতকগুলিন অগ্রদানী ব্রাহ্মণ বসতি করেন, এক অগ্রদানির একটী কন্যা বিধবা হইয়াছিল, অগ্রদানিরা জাতি জ্ঞাতি সকলে ঐক্যবাক্য হইয়া পরামর্শ করিলেন বিধবাবিবাহ বিষয়ে রাজবিধি প্রচার হইয়াছে এবং ভাস্কর পত্রে বারম্বার বিধবা বিবাহের শাস্ত্র প্রমাণ প্রকাশ পাইয়াছে বিশেষত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয় মন্ত্র তন্ত্র প্রমাণ প্রয়োগাদি সমস্তই লিখিয়াছেন, বিধবা সম্প্রদানে কোন বাধা নাই অতএব তাহারা স্বজাতীয় এক ব্রাহ্মণে ঐ বিধবা কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন, যাঁহারা বলিতেন ব্যবস্থাপক সমাজ বিধি প্রকাশ করিয়াছেন অথচ বিধবা সম্প্রদান হইল না তাঁহারা দেখুন উক্ত মাঝের গ্রামে এই বিধবা বিবাহ হইয়াছে যদি কহেন অগ্রদানী ব্রাহ্মণেরা পবিত্র ব্রাহ্মণ নহেন, পতিত ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্ম বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইতে পারে না, তবে বিশিষ্ট হিন্দুরা অগ্রদানী ব্রাহ্মণ দ্বারা পৌরোহিত্য করাইয়া কি প্রকারে আপনারদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন? যাঁহার দিগের পৌরোহিত্যে হিন্দুদিগের আদ্যকৃত্য হইতেছে তাঁহার দিগের মধ্যেই সর্ব্বাগ্রে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইল, এ বিবাহ অবিহিত বিবাহ বলা যায় না. যদি কেহ এ বিষয়ে সন্দেহ করেন তবে বালি দেওয়ানগঞ্জে অনুসন্ধান করিলেই সন্দেহ ভঞ্জন হইবেক।"

১৮৫৬ সালের ৪-ডিসেম্বরের 'Friend of India' থেকে জানা যাচ্ছে যে ১৮৫৬ সালের ১-ডিসেম্বর মাদ্রাজে একটি হিন্দু বিধবার বিবাহ হয়ে গেছে :

"The Madras papers mention the remarriage of a Hindu widow at Salem. She was a girl of 13 who had never lived

with her deceased husband. Her father determined to re-marry her, and did so though threatened with excommunication by his caste. Numbers of respectable natives were present at the ceremony and "a gentleman of the Civil Service honored the occasion." The caste of the family is not mentioned."

১৮৫৬ সালের ২৬-নভেম্বর "The Englishman and military Chronicle'-এ একখানা প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত পত্রের একাংশ উদ্ধার করি :

"The late act passed by the Legislative Council through the great exertions of the Honorable Mr. Grant and Pundit Isser Chunder Bydasagur in legalizing the marriage ceremony of the Hindoo Widows, has hitherto brought forth no happy result; though some four or five months have elapsed, that such a decree has been publicly enacted, yet we scarcely find any one of an enterprizing disposition who is bold enough to carry it into execution. True, that speeches and lectures are every day offered by Young Bengal in all public places, and it is laudble to see him engaged in solemly discussing every-point of his controversy; but where, I ask, Sir, has been the good result of his exertion?. . ."

বাঙলাদেশে আইনসম্মত বিধবাবিবাহের আদিপর্বে একটি হতাশার সংবাদ আছে। ১৮৫৬ সালের ২৫-নভেম্বর 'ইংলিশম্যান' লিখেছে :

"We regret to hear that Pundit Sreesh Chunder Nyruteen, Judge's Pundit in the Moorshedabad circle, who had openly expressed his intention of marrying a young widow in her teens, has been dissuaded from his laudable purpose. The venerable lady, his mother, distinctly told him that it would be impossible for her to remain in the same house with him if he took to wife a widow, and that in obtaining a wife, he must be prepared to lose a mother. The Pundit was compelled at last to abandon his intention."

১৮৫৬ সালের ২৬-নভেম্বর 'ইংলিশম্যান' লিখেছে :

"We hear that a millionaire native gentleman of the orthodox class having espoused the cause of the injured party, an interesting case will be set down in the Cause Board of the Supreme Court, viz., *Widow Vs. Pundit*. The fair complainant states, that she is the decendant of a long line of illustrious Brahmins, and the widow of a respectable inhabitant of Santipore; and that she was induced by the promises of the defendant, and of his Young Bengal friends in general, to quit her house and relations, and reside in Calcutta at the house of an opulent Banerjee Baman, in the hope of being married by

the defendant. That the said defendant without any just or probable cause, has receded from his promises, and refuses to marry her. That she has by such refusal lost her position in society, and is now an outcast; and as the defendant is a man of property, she estimates her damage at forty thousand rupees. The defendant, it is said, will urge in mitigation of damages, that he was not, what he poetically called, "in love," but merely wanted to prove to his countrymen, that it was neither morally nor physically impossible to comply with the object of the new law, and that he is prevented from carrying out his intention by the force of parental authority. Many witnesses will be examined on both sides, but the *fair* complainant, it is said, is likely to win."

উপরোক্ত সংবাদে 'পণ্ডিতে'র নাম গোপন রাখা হলেও একথা অনুমানে সকলেই বুঝতে পেরেছেন যে ওই 'পণ্ডিতে'র নাম শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

১৮৫৬ সালের ২৭-নভেম্বর 'The Englishman and Military Chronicle' লিখেছে :

"If any fresh confirmation of the melancholy fact that Young Bengal is mere sound and fury were necessary, that confirmation will be found in the *finale* of the recent widow marriage movement. Young Bengal was clamorous about a law, and the law was manufactured accordingly. What more can he expect at the hands of the rulers? Why did not widow marriage take place? Forsooth, because an old lady threatened separation from her son!. . ."

১৮৫৬ সালের ২-ডিসেম্বর 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখেছে :

"বিদিত হইল শান্তিপুরবাসি কোন যুব ব্রাহ্মণ উক্তস্থান বাসিনী সৎকুলজাতা কোন বিধবাকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করেন পরে বিবাহে অস্বীকৃত হইবায় কামিনী সুপ্রিমকোর্টে যুবার নামে অভিযোগ করিয়াছেন, স্ত্রীলোক কহেন যুবা আমাকে বিবাহ করণেচ্ছায় সবকুল বহির্গত করিয়াছেন, এইক্ষণে বিবাহ না করিলে আমি সকল কুল পরিত্যক্তা হই, অতএব যুবা হয় আমাকে বিবাহ করিয়া প্রতিজ্ঞা রাখুন নতুবা জাতিনাশ জন্য আমাকে চল্লিশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করুন, এই বলিয়া বিধবা সুপ্রিমকোর্টে ঐ যুবার নামে চল্লীশ সহস্র টাকার অভিযোগ করিয়াছেন, বিচারপতি মহাশয়েরা অদ্যাপি এ মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি করেন নাই বোধ হয় বিধবা জয়লাভ করিবেন।

আমরা ইংলিসম্যান হইতে এই সমাচারটী গ্রহণ করিলাম, ইংলিসম্যানের সম্বাদ লেখক প্রকারান্তরে সমস্তই লিখিয়াছেন কেবল বর বাবুর নামটী প্রকাশ করেন নাই কিন্তু অনুমানে সকলেই বুঝিতে পারিবেন শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের উপর এই অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে "বড় ২ বানরের বড় ২ পেট, লঙ্কায় যাইতে মাথা করে হেট" হিন্দুকালেজীয় নবীন প্রাচীন ছাত্র মাত্র কেহ বাগ্‌দারিদ্র নহেন বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে একমুখে পঞ্চমুখের ন্যায় বক্তৃতা করেন; তাহাতে

জ্ঞান হয় যেন বৈধব্যদশায় আপনারাই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন কিন্তু কার্য্য-কালে সে সকল স্মরণ থাকে না, শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিধবা বিবাহ বিষয়ে বাক্য দ্বারা সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই পরে যখন সময় উপস্থিত হইল তখন পরাঙ্মুখ হইয়া কহিলেন "বিবাহ করিতে পারিব না" পূর্ব্বে এই বিষয়ের লিখন পঠন চলিয়াছে, তাঁহার হস্ত লিখিত পত্র সকল রহিয়াছে, আপনি সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ করিয়া আত্মীয় লোক দ্বারা ব্রাহ্মণ কন্যাকে শান্তিপুর হইতে কলিকাতায় আনাইয়াছেন, সমস্ত স্থির হইয়াছিল অগ্রহায়ণ মাসের দশম দিবসীয় রজনী-যোগে বিবাহ সম্পন্ন হইবে; ভট্টাচার্য্য কার্য্যকালে পলায়ন করিলেন আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি তিনি মুর্শিদাবাদাদি কয়েক জিলার জজ পণ্ডিত হইয়াছেন তাঁহার ব্যবস্থানুসারে প্রজাদিগের স্বত্বাধিকার বিচার হইবেক, তিনিই যদি অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলেন তবে তাঁহার কথায় কে বিশ্বাস করিবে? গবর্ণ-মেণ্টই কি তাঁহাকে পণ্ডিতি পদে রাখিবেন? যাঁহার প্রতিজ্ঞা স্থির থাকে না তিনি কি না করিতে পারেন? আর ধর্ম্ম দৃষ্টিতেই বা কিরূপে উদ্ধার হইতে পারিবেন? এক কুলবালাকে নানা প্রকারে আশ্বাস দিয়া জ্ঞাতি কুটুম্বাদির মধ্য হইতে বাহির করিয়া লইয়া আসিলেন এইক্ষণে আর সে কুলবালা কোন কুলে যাইতে পারিবেন না, তবে তাঁহার জীবন রক্ষার উপায় কি অতএব যদি ঐ রমণী রাজ বিচারে অভিযোগ করিয়া থাকেন তবে উত্তম কর্ম্ম করিয়াছেন, শ্রীশচন্দ্র তাঁহাকে চল্লিশ সহস্র টাকা দিয়া কর্ণদ্বয়ে হস্তস্পর্শ পূর্ব্বক প্রকাশ করুন কুকর্ম্ম করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কেবল শ্রীশচন্দ্র আপনি কৃতঘ্ন হইলেন এমত নহে, বান্ধবগণকেও লজ্জা দিলেন, বান্ধবেরা কি আর ইংরাজ মণ্ডলে মুখমণ্ডল দেখাইতে পারিবেন, এবং যে সকল বিধবার অভিলাষ ছিল বিবাহ করিবেন এইক্ষণে তাঁহারাও ভীতা হইবেন, নানা ইতিহাসে লেখেন পুরুষেরা প্রেম রক্ষা করিতে পারেন না অতএব প্রীতি বিষয়ে পুরুষ জাতি যে বিশ্বাস ঘাতী তাহাও প্রতিপন্ন হইল এইক্ষণেই হউক বা একশত বৎসর পরেই হউক হিন্দু বিধবাদিগের বিবাহ চলিত হইবেই সন্দেহ নাই কিন্তু ইতিহাসে লিখিত থাকিবে বিধবা বিবাহের উদ্যম সময়ে শ্রীশচন্দ্র নামা কোন কৃতঘ্ন এই রূপে উদ্যম ভঙ্গ করিয়াছিলেন? দেখা যাইবে শ্রীশচন্দ্র সুপ্রিমকোর্টে কি উত্তর দিয়া বাদিনীর কৌন্সেলিগণকে নিরুত্তর করেন, সুপ্রিমকোর্টে এই এক নূতন মোকদ্দমা হইবে আমরাও শুনিতে যাইব শ্রীশচন্দ্র কি উত্তর করেন।"

১৮৫৬ সালের ৪-ডিসেম্বর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখেছে :

"THE ENGLISHMAN severely criticises the conduct of "Young Bengal" in the matter of Hindoo Widows' Remarriage. The law has been passed, but not a widow is married yet. One Baboo promised to marry a widow, and when all was settled backed out for fear of the displeasure of his relatives. Time will show whether "Young Bengal" was sincere in the movement or not, and a few weeks whether he can brave public opinion."

১৮৫৬ সালের ২৯-নভেম্বর 'ইংলিশম্যান' লিখেছে :

"We understand that a petition will be immediately presented to the Legislative Council, signed by Rajah Radacant Deb, Rajah Komul Kishen Bahadoor, Baboo Khelut

Chunder Ghosh, Obey Churn Banerjee, Loll Chunder Misser, and about ten thousand heads of orthodox Hindoo families, praying for recision of the Widow Marriage Act. The petitioners state, that though a poor woman or two could be found willing to take a second husband, not a man could be pointed out in all Bengal who is willing to wed a widow!. . . The petitioners further urge, that it is impossible that any widow marriage could take place so long as the natives of the country entertain peculiar notions of chastity. . ."

রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : "...একদিন (প্রেমচন্দ্র) তর্কবাগীশ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলেন,—ঈশ্বর! বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান হইতেছে বলিয়া প্রবল জনরব। কতদূর কি হইয়াছে জানি না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই যে, দেশের বিজ্ঞ ও বৃদ্ধমণ্ডলীকে স্বমতে আনিতে কৃতকার্য্য হইয়াছ কি না? যদি না হইয়া থাক তবে অপরিণামদর্শী নব্যদলের কয়েক জন মাত্র লোক লইয়াই এইরূপ গুরুতর কার্য্যে তাড়াতাড়ি হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করিবে। বিদ্যাসাগর বলিলেন,—"মহাশয়! আপনার প্রশ্নভঙ্গীতে আমার উদ্যমভঙ্গের আশঙ্কা দেখিতেছি;—আপনাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, নচেৎ আপনাকে"—তর্কবাগীশ তাঁহার কথা শেষ না হইতেই বলিলেন—নচেৎ আমাকে এই আসন হইতে এখনি উঠাইয়া দিতে। ঈশ্বর! তুমি এই কার্য্যে যেরূপ দৃঢ়সংকল্প এবং একাগ্রচিত্ত হইয়াছ তাহাতে আমি এইরূপ উত্তর পাইব বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি। ইহাতে অণুমাত্র ক্ষুব্ধ নহি। বিদ্যাসাগর বলিলেন,—আমি তত সাহসের কথা বলিতেছিলাম না। আপনি বিজ্ঞ ও বৃদ্ধমণ্ডলী বলিয়া যাহা কহিতেছেন ইহাতে কলিকাতার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রভৃতি আপনার লক্ষ্য কি না? আমি উহাঁদের অনেক উপাসনা করিয়াছি, অনেককেই নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছি, সকলেই ক্ষীণবীর্য্য ও ধর্ম্মকণ্ঠুকে সংবৃত বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি। যাঁহারা মুক্তকণ্ঠে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি। মহাশয়! আমি অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছি, এখন আমায় আর প্রতিনিবৃত্ত করিবার কথা বলা না হয়। তর্কবাগীশ বলিলেন,—ঈশ্বর! বাল্যাবধি তোমার প্রকৃতি ও অদম্য মানসিক শক্তির প্রতি আমার লক্ষ্য রহিয়াছে, তোমায় ভগ্নোদ্যম ও প্রতিনিবৃত্ত করা আমার সংকল্প নহে। তুমি যে কার্য্যটীকে লোকের হিতকর বলিয়া জ্ঞান করিতেছ এবং যাহার অনুষ্ঠান বিষয়ে প্রগাঢ় চিন্তা করিয়াছ, সেই কার্য্যের মূলবন্ধন সম্যক্‌রূপে দৃঢ়তর হয় এবং তাহা অর্দ্ধ-সম্পন্ন হইয়াই বিলীন না হয়—ইহাই আমার উদ্দেশ্য। কেবল কলিকাতার কয়েকটী বৃদ্ধ আমার লক্ষ্য নহে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে, বোম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে যথায় হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত—ততদূর দৌড়িতে হইবে, ধর্ম্মবিপ্লব ও লোকমর্য্যাদার অতিক্রম করা হইতেছে বলিয়া যাঁহারা মনে করিতেছেন তাঁহাদিগকে সম্যক্‌রূপে বুঝাইতে হইবে; সকলকে বুঝান সহজ নহে সত্য; প্রধান প্রধান স্থানের সমাজপতিদিগকে অন্ততঃ স্বমতে আনিতে হইবে। এইরূপে সমাজসংস্কার করা কেবল রাজার সাধ্য। অন্য লোকে এরূপ কার্য্যে হাত দিতে গেলে বিপুল অর্থ ও লোকবল আবশ্যক। বিজাতীয় রাজপুরুষ দ্বারা এইরূপ সংস্কারের সম্ভাবনা নাই। বিধবাগর্ভজাত সন্তান দায়ভাক্ হইবে বলিয়া যে বিধি হইয়াছে

তাহাই পর্য্যাপ্ত জ্ঞান করিতে হইবে। যখন তুমি রাজপুরুষদের সাহায্যে এই বিধি প্রচলিত করাইতে সমর্থ হইয়াছ তখন পূর্ব্বকথিত দেশবিভাগের সমাজপতিদিগের সহায়তা লাভে যে কৃতকার্য্য হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতেছে না। ইহাতে যেমন কালবিলম্ব ঘটিবে, তেমন সময়ের স্রোত তোমারই অনুকূলে বহিবে। লোকবলের নিকটে অর্থাভাব অনুভূত হইবে না। ত্বরায় প্রয়োজন দেখি না। হিন্দুসমাজ এ পর্য্যন্ত অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। দুই চারিটী বিধবাবিবাহ দিলে আর একটী থাক বাড়ান মাত্র হইবে; সমাজবন্ধন এইরূপে আরও শিথিল করিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর! যাহা বক্তব্য বলিলাম। তুমি বড় ব্যস্ত দেখিতেছি, চলিলাম, বিবেচনা করিও।”[২৩]

তেরো

১৮৫৬ সালের ৭-ডিসেম্বর। যতদূর জানা যাচ্ছে, সেদিনই সম্ভ্রান্ত হিন্দুসন্তান প্রথম আইনসম্মত বিধবাবিবাহ করেছেন। পাত্রীর নাম কালীমতী দেবী। পাত্রের নাম শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। এই বিয়েতে খরচ হয়েছে প্রায় দশহাজার টাকা।

বিয়ে হল বিদ্যাসাগরের বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। বাড়ির ঠিকানা বারো নম্বর সুকিয়া ষ্ট্রীট। সেদিন সন্ধ্যাবেলা ওই বাড়ির সামনে অসংখ্য মানুষের ভিড়। তিলধারণের স্থান নেই কোথাও।

রাস্তায় পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। দু-হাত অন্তর একেকজন পুলিশ। পাছে কোনো গোলমাল হয়, সেজন্য বিদ্যাসাগর আগে থাকতেই পুলিশের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। পথের ভিড় এমন সাংঘাতিক যে বরের পাল্কি আর এগোতে পারে না। সারা শহর যেন ভেঙে পড়েছে, দেখতে এসেছে আইনসম্মত প্রথম বিধবা-বিবাহের বর শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে। এত ভিড় দেখে শ্রীশচন্দ্র বুঝি একটু ভয় পেলেন। তখন বরের পাল্কির দু-পাশে দাঁড়ালেন রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, শম্ভূনাথ পণ্ডিত এবং আরো কেউ-কেউ। এঁরা সকলেই বিদ্যাসাগরের বন্ধু। বরের পাল্কি এগিয়ে চলল।[১]*

বিয়ে হয়ে গেল। বিদ্যাসাগরের জয়জয়কার।

কিশোরীচাঁদ মিত্রের ডায়েরি থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি: "৭ই ডিসেম্বর ১৮৫৬। অদ্যকার দিন আমার দেশের ইতিবৃত্তে নবযুগের প্রারম্ভ বলিয়া গণ্য হইবে। অদ্য রাত্রি দুই প্রহরের সময় প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হইল।...আমি আহারাদির পর দাদা, শিবচন্দ্র দেব, গোপী ও অন্যান্য বন্ধুগণের সহিত গিয়াছিলাম। বাড়ীতে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। নব্যবঙ্গের দল ত ছিলই, তদ্ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক এবং বালী ও অন্যান্য স্থানের কয়েকজন পণ্ডিত ও বাঙ্গালার প্রাচীন সম্প্রদায়ের দুই-একজন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সকল কার্য্যই নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইল। পুরাতন শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি অনুসারেই ক্রিয়াটি আচরিত হয়। কন্যার মাতা লক্ষ্মী দেব্যা কন্যা সম্প্রদান করিলেন। যে ঘরে সম্প্রদান হয় সে ঘরে আমি ও রামগোপাল মাত্র উপস্থিত ছিলাম; পরিবারস্থ ব্যক্তি ভিন্ন আর কেবল ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন, যাঁহার অবিশ্রান্ত উৎসাহ এবং অননুকরণীয় যুক্তি-কুশলতার জন্যই এই শুভ ফল প্রধানতঃ উৎপন্ন হইয়াছে।"[২]

সেসময়ে 'সংবাদ প্রভাকর' এই বিধবা বিবাহের একটি বিবরণ মন্তব্যসহ দাখিল করেছে। সেই বিবরণের অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি:

"গত ২৩ অগ্রহায়ণ রবিবার বিধবার বিবাহপক্ষ ব্যক্তিব্যূহের বিশেষ স্মরণীয় হইবেক, প্রতি বৎসর তাঁহারা ঐ দিবস পর্ব্বাহ দিবসের ন্যায় বিবেচনা করিয়া আমোদপ্রমোদ করিলেও করিতে পারেন, যেহেতু উক্ত দিবা যামিনীযোগে তাঁহারা বিবিধ প্রকার প্রতিবন্ধকতা প্রতিসংহার পূর্ব্বক আপনাদিগের দলস্থ শ্রীযুক্ত

---

* এ-বিষয়ে মতান্তর আছে। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "শ্রীশবাবু পাল্কীতে বিবাহ করিতে আইসেন নাই। বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের বড় জুড়ি গাড়ীতে আইসেন। ঐ গাড়ীতে রামগোপালবাবু প্রভৃতি ছিলেন। (ভ্রমনিরাস, পৃ. ২৬)



শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন





শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সহিত লক্ষ্মীমণি নাম্নী কোন অবীরার বিধবা-কন্যার উদ্বাহ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন...।

...বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু দিগম্বর মিত্র, বাবু প্যারিচাঁদ মিত্র, বাবু নৃসিংহচন্দ্র বসু, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভাস্কর সম্পাদক, প্রভৃতি অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে বিদ্যালয়ের বালক ও কৌতুকদর্শি লোক সংখ্যাই অধিক বলিতে হইবেক, রঙ্গতৎপর লোকসমারোহে রাজপথ আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সারজন সাহেবেরা পাহারাওয়ালা লইয়া জনতা নিবারণ করেন, রাত্রি অনুমান ১১ ঘটিকা-কালে বর বাহাদুর শকটারোহণে সমাগত হইয়া সভাস্থ হইলে সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করেন, দুই এক টাকা বিদায় পাইবার প্রত্যাশাপন্ন হইয়া প্রায় শতাধিক লোক লাল বনাতাবৃত ভট্টাচার্য্য ও রামগতি প্রভৃতি কয়েকজন ঘটক ও পঞ্চু ভাট প্রভৃতি কয়েকজন ভাট উপস্থিত থাকিয়া গোল করিয়া হাট বসাইয়াছিল, অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

বিবাহ সময়ে বরবাহাদুর আসনোপবিষ্ট হইলে উভয় পক্ষের পুরোহিতেরা বিবাহমন্ত্র পাঠ করেন, তাহার কিছুই রূপান্তর করেন নাই, লক্ষ্মীমণি কন্যাদান করেন, দান সামগ্রী অলঙ্কার সকলই ছিল, পরে বর স্ত্রী-আচারস্থলে গমনকালে এদেশের প্রচলিত প্রথানুসারে "দ্বারষষ্ঠী ঝাঁটাকে" প্রণাম করেন, ও স্ত্রী-আচারস্থলে উলু উলু ধ্বনি নাকমলা, কানমলা ও "কড়ি দে কিনলেম, দড়ি দে বাঁদলেম, হাতে দিলাম মাকু একবার ভ্যা করত বাপু" রমণীগণের একান্ত প্রার্থনায় বর বাহাদুর ভ্যাও করিয়াছিলেন।

এইরূপে উদ্বাহ নির্ব্বাহ হইলে আহারের ধূম পড়িয়া যায়। প্রায় ছয় শত লোক রঙ্গ দেখিয়া মোণ্ডা ভাঙ্গিয়া গোল করিয়া ঢোল পিটিয়া পাড়া তোলপাড় করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন, বাসর ঘরের ব্যাপার আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই, যাহা হউক, এই বিবাহে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহ পবিত্র হইয়াছে, অঙ্গনাগণও বিলক্ষণ আমোদপ্রমোদ করিয়াছিলেন, দম্পতির উভয় কুল পরিশুদ্ধ হইল, "যেমন হাড়ি তেমনি সরা" মিলিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তদনুসঙ্গে বিধবার বিবাহরঙ্গিগণের ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া অনেকেই তাঁহাদিগের সাধুবাদ করিয়াছেন।

পাঠকগণ! আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি এবং এইক্ষণেও লিখিতেছি যে হিন্দু বিধবার এই প্রথম বিবাহ কোন ক্রমেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে বাচ্য হইতে পারে না, যেহেতু বিবাহস্থলে দম্পতির পরিবার বা জাতি কুটুম্ব কেহই উপস্থিত হয় নাই এবং কন্যার খুড়া কিম্বা ভ্রাতা ইত্যাদি কেহই তাঁহাকে পাত্রস্থ করেন নাই, তাঁহার জননী চক্রাকার রূপচাঁদের মোহনমন্ত্রে মুগ্ধা হইয়া তাঁহাকে সম্প্রদান করিয়াছেন, বরপাত্রও কেবলমাত্র রাজদ্বারে প্রিয়পাত্র হইবার প্রত্যাশায় এতদ্রূপে ত্রিকুল পবিত্র করিলেন, পরিশেষে কি হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয়, যাহা হউক, তিনি প্রথমতঃ সাহসিকরূপে বুক বাঁধিয়া এতদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়াতে বিধবার বিবাহপক্ষগণ অবশ্য তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিবেন।..."[৩]

১৮৫৬ সালের ৯-ডিসেম্বর 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখেছে :

"আমরা বহুকালাবধি যে বিষয়ের জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলাম এবং যাহার জন্য দেশস্থ অনেকে আমারদিগকে তিরস্কার করিয়াছেন বরং বহু লোকের প্ররোচনায় কত ব্যক্তি আমারদিগের জীবিকা পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছেন,

সংক্ষেপে বলিতে হইলে হিন্দু মধ্যে অসংখ্য লোক আমারদিগের বিপক্ষ হইয়া রহিয়াছেন, আমরা এক দিগে হইয়া কেবল পরমেশ্বরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছি এবং যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা হইতে বিচলিত হই নাই, গত রবিবাসরীয় রজনীযোগে সেই প্রতিজ্ঞার সুখ ভোগ করিয়াছি অতএব পরমেশ্বরকে অসংখ্য নমস্কার দিলাম, শ্রীশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় যিনি অতি ভদ্র কুলে জন্মিয়াছেন, ৭। ৮ শত ভদ্র ব্রাহ্মণ যাঁহার বাটীতে অন্ন ভোজন করেন, °প্রাপ্ত রামধন তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় যিনি এতদ্দেশে অদ্বিতীয় রূপে কথকতা ব্যবসায় করিতেন, শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার পুত্র, সংস্কৃত কালেজে এতদ্দেশে প্রচলিত প্রায় সর্ব্বশাস্ত্র পড়িয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সুপণ্ডিত জানিয়া মুর্শিদাবাদাদি কয়েক জেলার পণ্ডিতি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, শ্রীশচন্দ্রের কোন দোষ নাই, বরং চন্দ্রে কলঙ্ক আছে শ্রীশচন্দ্র চন্দ্রে কোন কলঙ্ক দেখা যায় না, সেই শ্রীশচন্দ্র বরপাত্র, কন্যা অতি বিশিষ্ট কুল-জাতা সদ্বংশ বনিতা, বালিকাকালে বিধবা হইয়াছিলেন, তাঁহার বয়ঃক্রম একাদশ বৎসর, ঐ সৎকুলজাতার মাতার নাম শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী, তিনি প্রাণাধিক বালিকার বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিলেন না অতএব শ্রীশচন্দ্র বরে কন্যা দান সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ করিয়া ঐ কন্যাকে কলিকাতা নগরে লইয়া আসিয়াছিলেন এতন্নগরীয় শিমলা পল্লীর সুকের স্ট্রিট স্থানের দ্বাদশ সংখ্যক ভবনে মহা সভা হইয়াছিল, গত রবিবাসরীয় রজনীযোগে লক্ষ্মীমণি দেবী শ্রীশচন্দ্র বরে ঐ কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন, বিবাহের পূর্ব্ব দিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিস্তর চলিত পত্র বিতরণ হইয়াছিল উপস্থিত পণ্ডিতগণকে পত্র দিতে অবকাশ হয় নাই, অনেকে উপস্থিত হইয়াছিলেন অধ্যক্ষ মহাশয়েরা তাঁহারদিগের নাম লিখিয়া লইয়াছেন, বরযাত্র কন্যাযাত্র ও দর্শকাদি প্রায় দুই সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল, বিবাহ সভায় দর্শকদিগের স্থান হইবার উপায় ছিল না, পরিশেষে এমত গোল হইয়া উঠিল দর্শকদিগকে নিবারণ করিয়া রাখা যায় না অতএব অগত্যা পোলিসাশ্রয় করিতে হইয়াছিল, শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী ন্যূনাধিক দুই সহস্র লোকের খাদ্য দ্রব্যাদি আহরণ করিয়াছিলেন, বিবাহ পরে সমস্ত রাত্রি নিমন্ত্রিতানিমন্ত্রিত সাধারণ সর্ব্বজনকে ভোজন করাইয়াছেন, বিবাহকালে স্ত্রীআচারাদি যে সকল হইয়া থাকে এ বিবাহে সে সকলের কোন অংশে ত্রুটি হয় নাই, যথাশাস্ত্র মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদান হইয়াছে, যদি মধ্যে গোলমাল না হইত তবে সপ্তাহ পূর্ব্বাবধি নৃত্য গীত, বাজী ইত্যাদির আমোদাদিও হইতে পারিত, শ্রীশ ভট্টাচার্য্যের মাতাঠাকুরাণী ছুরী হস্তে করিয়া বসিলেন যদি শ্রীশচন্দ্র বিধবা বিবাহ করেন তবে গলনলে ছুরী দিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেন, এই কারণ অগ্রহায়ণ মাসের দশম দিনে এবং পঞ্চদশ দিনে বিবাহ হয় নাই, পরে মাতাকে সান্ত্বনা করিয়া ভ্রাতাদির অনুমতি লইয়া শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন, ইহাতে আমরা শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে আর্য্য জ্ঞানে ধন্যবাদ দিলাম।

এইক্ষণে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে এবং তাঁহার উত্তর সাধক মান্য বংশ ধনিগণকে যথাযোগ্য নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ করি, তাঁহারদিগের সচ্চেষ্টায় হিন্দু বিধবাদিগের বৈধব্য কষ্ট নিবারণের এই সুপথ প্রস্তুত হইল, যাঁহারা কণ্টক ছিলেন তাঁহারা এতৎপথের উভয় পার্শ্বে সরিয়া পড়িলেন, ঐ সকল মহামহিমেরা এইক্ষণে আমারদিগের প্রতি বিরক্ত হইবেন কিন্তু কিছুকাল পরে যখন বিধবাগণের স্বত্বাধিকার বুঝিতে পারিবেন তখন

পুনর্ব্বার স্নেহভাব প্রকাশ করিবেন, আমরা ভীতভাবে নত হই না, প্রকৃত বিষয়ে প্রাণপণ অংগীকার করি, সহমরণ নিবারণ কালেও হিন্দুমহাশয়েরা আমারদিগের প্রতি খড়্গ হস্ত হইয়াছিলেন কিন্তু এইক্ষণে আর কেহ সতী দেখিতে পান না, অনেকে বলেন সহমরণ নিবারণে হিন্দুরাজ্য স্ত্রীহত্যা পাপ হইতে উদ্ধার পাইয়াছে, হিন্দু বিধবাদিগের বিবাহ প্রচলিত হইয়া গেলে কিছু-কাল পরে সকলেই বলিবেন গর্ভহত্যা পাপ হইতে নিস্তার পাইলেন, হিন্দু বিধবা বিবাহ বিষয়ে এ দেশের মান্য ২ লোকেরাও অনেকবার উদ্যোগ করিয়া-ছিলেন, বিশেষতঃ রাজা নন্দকুমার রায় বাহাদুর, রাজা রাজবল্লভ রায় বাহাদুর পরাক্রান্ত মনুষ্য হইয়াও ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে সর্ব্বোপরি টীকা দিলেন, পরমেশ্বর তাঁহাকে চিরজীবী করুন, কলিকাতা নগরীয় সম্ভ্রান্ত পদ-ধারী অভিমানভারী মহাশয়গণ এইক্ষণে কোথায় রহিলেন? প্রতি বাড়ীর নব্য কল্পেরা এই বিবাহ সভায় গমন করিয়াছিলেন, দলপতি মহাশয়েরা কি দলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে আটক করিয়া রাখিতে পারিলেন? যে ২ বাড়ীর যে সকল যুবারা এবং যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বিবাহ সভায় গমন করিয়া-ছিলেন আমরা তাঁহারদিগের নাম ধাম তালিকা পাইয়াছি, অদ্য লিখিলাম না যিনি বলিবেন বিবাহ সভায় যান নাই তাঁহাকে দেখাইয়া দিব তাঁহার পুত্র কি পৌত্র কি দৌহিত্র, কি ভাগিনেয় ইত্যাদি কেহ না কেহ গিয়াছেন, এবং দলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সভায় যাইয়া বিদায় লইয়া আসিয়াছেন এইক্ষণে সকলে আপনারদিগের ঘর সন্ধান করুন, এই বিবাহে লক্ষ্মীমণি দেবীর অন্তঃপুরে এতন্নগরীয় প্রায় ২০০ শত ভদ্র স্ত্রীলোক গমন করিয়াছিলেন তাঁহারাই স্ত্রী আচারাদি করিয়াছেন এবং অনেকে বরকন্যাকে যৌতুকও দিয়াছেন।”

১৮৫৬ সালের ১৬-ডিসেম্বর ‘সম্বাদ ভাস্কর’ লিখেছে :

“শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবীর বিধবা কন্যা বিবাহ করিয়াছেন, এ বিষয় লোক শাস্ত্র উভয় মতে সর্ব্ব সামঞ্জস্যে সম্পন্ন হইয়াছে, ইহাতে বিপক্ষ দল হতবল হইয়া নানা প্রকার ছল উত্থাপন করিতেছেন তাঁহারা কহেন লক্ষ্মীমণি দেবী, কে, কোথাকার স্ত্রীলোক, তাহার পতিকুল পিতৃকুল কেহ জানে না, বিদ্যাসাগর কোথা হইতে একটা মেয়ে কুড়াইয়া আনিয়া বিবাহ দিয়াছেন, যদি সামান্য লোকেরা এই সকল কথা বলিত তবে আমরা তুচ্ছ করিতাম, মান্য কল্পেরাই এই সকল জল্পনা করিতেছেন অতএব তাঁহারদিগের ভ্রমনিকর করিকুম্ভে এই অংকুশ প্রদান করি।

হে খণ্ডজ্ঞান বিতণ্ডা বাদি মহাশয়গণ, এ লক্ষ্মীমণি সামান্যা লক্ষ্মীমণি নহেন, লক্ষ্মীমণি দেবীর পিতা ৺আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার নিবাস শান্তিপুর, তিনি শান্তিপুরে অতি প্রধান মনুষ্য ছিলেন, লক্ষ্মীমণি দেবীর পিতার বিষয় চিন্তা করিতে ২ যাঁহারদিগের শিরঃপীড়া হইয়াছে তাঁহারা শান্তিপুরে যাইয়া তদাদি তদন্ত মহৌষধ গ্রহণ করুন।

লক্ষ্মীমণি দেবীর স্বামী ৺ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়, নিবাস জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি পলাসডাংগা, তিনি ঐ স্থানের একজন মহৎ লোক ছিলেন।

ঐ প্রধান লোকের কন্যা শ্রীমতী কালীমতী দেবী, ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহুব্যয়ে ৺রুক্মিণীপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র ৺হরমোহন ভট্টাচার্য্যের সহিত কালীমতির প্রথম বিবাহ দেন, জেলা কৃষ্ণনগরের অন্তঃপাতি বাহিরগাছি গ্রামে তাঁহারদিগের বসতি ছিল, তাঁহারা অতি প্রধান বংশ, বিশেষতঃ নবদ্বীপ

রাজগোষ্ঠীর মান্যবর গুরুগোষ্ঠী, ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় চারি বৎসর বয়ঃক্রমে এই কন্যা সম্প্রদান করেন, ছয় বৎসর বয়ঃক্রমে কালীমতী পতিহীনা হন, এইক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম দশ বৎসর, বিপক্ষ মহাশয়েরা বিধবা বিবাহ বিপক্ষ পত্রে একযাই নাম স্বাক্ষর করিবার জন্য দেশে ২ কত ভাতমারাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন সে সকল ভাতমারা লোক এখনও উপস্থিত থাকিতে পারে, তাঁহার-দিগের অভাব কি? পেটুকদিগকে কতই দিয়াছেন, আর কিঞ্চিৎ ব্যয় করিয়া শান্তিপুর, পলাসডাঙ্গা, বাহিরগাছি এবং নবদ্বীপ রাজবাড়ীতে প্রেরণ করিলেই হৃদয় শূল সংশয় হইতে মুক্ত হইবেন; বিপক্ষেরা ইহাও বলেন বিদ্যা-সাগর লক্ষ্মীমণি দেবীকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া কন্যা সহিত কলিকাতায় লইয়া আসিয়াছেন, অর্থে কিনা হয়? এ পক্ষেও সংশয় শত্রু বিপক্ষ মহামহিম-দিগের গাত্রদাহ করিতেছে অতএব আমরা কিঞ্চিৎ ঔষধ প্রদান করি, লক্ষ্মীমণির পিতৃকুল স্বামীকুল উভয় কুল মধ্যবিত্ত ধনী ছিলেন, লক্ষ্মীমণি পিতার এবং স্বামীর সমস্ত বিষয় প্রাপ্তা হন এবং তাঁহার ও কন্যার দুই তিন সহস্র টাকার আভরণাদিও আছে, লক্ষ্মীমণি দুঃখিনী নহেন; একমাত্র কন্যাধন, তাহার বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারেন না, দিবা রাত্রি প্রায় রোদনেই কালক্ষেপ করিতেন পরে যখন বিধবা বিবাহের আন্দোলন হইতে লাগিল তখন প্রতিজ্ঞা করিলেন যদি রাজবিধি প্রচার হয় তবে কালীমতীর বিবাহ দিবেন পরমেশ্বর প্রসাদাৎ রাজপুরুষেরা বিধি প্রকাশ করিয়া দিলেন লক্ষ্মীমণিও কোন মান্য লোকের নিকট প্রকাশ করিলেন উপযুক্ত পাত্র পাইলে কালীমতীকে সম্প্রদান করেন তাঁহার কন্যার ভাগ্যে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন পতিরত্নও উপস্থিত হইলেন এ বিবাহ উভয় কুল শুদ্ধ ২ বিবাহ হইয়াছে, আমরা অনুমান করি লক্ষ্মীমণি দেবী ইহাতে স্বয়ং পাঁচ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন, এইক্ষণে বিপক্ষ মহাশয়েরা নির্দ্দোষ কর্ম্মে আর কি দোষোত্থাপন করিতে পারেন তাহার চেষ্টা দেখুন।”

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিধবাবিবাহ করার পরদিনই মধুসূদন ঘোষ বিধবা-বিবাহ করলেন। পাত্রীর নাম থাকমণি।

১৮৫৬ সালের ১১-ডিসেম্বর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখেছে :

"At the beginning of the week two marriages were celebrated under the recent Act for the removal of the legal disabilities of Hindoo Widows. The fears of those who thought the country was utterly unprepared for this great social innovation, and the hopes of those who wished ill to the cause have alike been dissipated. As to the merits of the change itself, the question has assumed a shape which makes it extremely unsuited for discussion. The more liberal view is now daily gaining adherents, while the holders of the orthodox tenet are receding in number. Discussion cannot now help on progress, and it is not necessary to obviate a reaction. Our duty now is, simply, to congratulate those who have laboured in this good cause upon the realization of their object;—for that has been attained in the character and strength of the examples now set. . .

The marriages, it will be observed, have taken place pre-

cisely in those grades of society whose social influence is greatest, and whose acts operate most powerfully as examples. Already there is gone forth a cry that the ancient institution of the life-long celibacy of Hindoo widows can no longer be maintained. The last argument of the oppositionists, namely, that the law lately passed was unnecessary and would remain inoperative is crushed beneath the wright of facts. It remains now for the country to accept this change with a cordial acknowledgment of its benefits, and for hypocritical heads of families to cease wailing fancied dangers to which they aver Hindooism is freshly exposed, and to turn their anxiety towards the interests of genuine social morality."

১৮৫৬ সালের ১১-ডিসেম্বর 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখেছে : "গত রবিবাসরীয়
রাত্রিতে এক বিধবা পাত্রসাৎ হইয়াছেন, আমরা সেই আনন্দে থাকিতে থাকিতেই
দ্বিতীয়ানন্দে নিমগ্ন হইয়াছি, সেই রাত্রির পররাত্রিতেই পিঠাপিঠী আর এক
বিবাহ হইয়াছে...পূর্ব্ব রাত্রিতে সর্ব্ব জাতি প্রধান জাতি ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে
বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল, তৎপর রাত্রিতেই কুলীন কায়স্থ দিগের মধ্যে
বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইল তবে আর কি অবশিষ্ট রহিল? দুঃখের বিষয় এই
যে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে আর বিবাহের দিন নাই তৎপরেই কাল পৌষ মাস
আসিয়া পড়িবে অতএব কিছুকাল বিধবা বিবাহ স্থগিত রাখিতে হইল, মাঘ
মাস আসিলে সকলে দেখিবেন কত বিধবা সধবা হইবেন...।"

১৮৫৬ সালের ১৬-ডিসেম্বরের 'সম্বাদ ভাস্করে' প্রকাশিত একখানা
প্রেরিতপত্র থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি : "বৃদ্ধেরা বলিতেছিলেন "বিদ্যাসাগর
কখনও বিবাহ দিতে পারিবেন না" এখন যে তাঁহারা নীরব হইলেন, সকলে এরূপ
বিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়াই এতকাল চুপ করিয়াছিলেন এক্ষণে উহা যে
ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত তদ্বিষয়ে প্রায় সকলেরই প্রতীতি জন্মিয়াছে ইহাতে স্পষ্টই
বোধ হইতেছে ইহা অতি ত্বরায় সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে, দেশীয় মহাশয়েরা যেন
এমত ভাবেন না, যে এই দুইটী বৈ আর হইবেক না "এবং ইহাও যেন মনে
করেন না যে এই বিবাহে যে সকল লোক সভাস্থ হইয়াছিলেন ইহা ছাড়া এ
দলে আর কেহ আসিবেন না ও এ সভায় যত লোক আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে
অধিকাংশই বিদ্যাসাগরের অধীন তিনি উপরোধ করাতেই তাঁহারা আসিয়া-
ছিলেন বিধবা বিবাহ নির্ব্বাহ করা তাঁহাদিগের যথার্থ অভিপ্রেত নহে"
মহাশয়েরা নিশ্চয় জানিবেন উক্ত মহাত্মার স্বভাব সে রূপ নহে তিনি কাহাকেও
উপরোধ বা অনুরোধ করেন নাই, সকলেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সভায় অধিষ্ঠিত
হইয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে প্রায় সকলেই স্বাধীন বরং অধীন কার্য্যকারিমধ্যে
অধিকাংশ ব্যক্তি এ বিষয়ে যথার্থ উৎসাহশালী হইলেও বিশেষ প্রতিবন্ধক
বশতঃ দলভুক্ত হইতে পারেন নাই কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদিগকে একবার
মাত্র উপরোধ করিলেই তাঁহারা নিঃসন্দেহ আসিতেন ইহাতেও কি তাঁহার
সামান্য ঔদার্য্য ও সামান্য মহত্ত্ব প্রকাশ হইয়াছে, উক্ত মহাত্মা এবিষয়ে এতবড়
উৎসাহী হইলেও পরামর্শ জিজ্ঞাসুকে অম্লান বদনে ও অক্ষুণ্ণ মনে বলিয়াছেন
যাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ অসুবিধাও থাকে তাঁহাদিগের বৈবাহিক সভায় উপস্থিত
হওয়া যুক্তিযুক্ত হয় না, অতএব হে স্বদেশীয় মহাশয়গণ, আপনারা নিশ্চয়

জানিবেন বিদ্যাসাগর মহাশয় সামান্য মনুষ্য নহেন জগদীশ্বরের নিতান্ত অনুগৃহীত পাত্র অথবা কৃপানিধান পরমেশ্বর এতদ্দেশীয় বিধবাদিগের অসহ্য যন্ত্রণা দর্শনে স্বয়ং ঈশ্বররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিলেও বলা যাইতে পারে।...”

১৭৭৮ শকের পৌষে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ লিখেছে :

“আমরা পরমাহ্লাদের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে আমাদিগের চির-বাঞ্ছিত বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমতঃ গত ২৩ অগ্রহায়ণ রবিবাসরে দেশ বিখ্যাত শ্রীযুক্ত রামধন তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যের সহিত, পলাসডাঙা গ্রাম নিবাসী ভদ্র বংশোদ্ভব ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশম বর্ষীয়া বিধবা কন্যার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই কন্যার যখন ৪ বৎসর বয়ঃক্রম তৎকালে ইহার সহিত নবদ্বীপাধিপতি রাজার গুরুবংশীয় শ্রীযুক্ত রুক্মিণীপতি ভট্টাচার্য্যের পুত্র হরমোহন ভট্টাচার্য্যের প্রথমতঃ বিবাহ হইয়াছিল, ঐ বিবাহের ২ বৎসর পরে অর্থাৎ ৬ বৎসর বয়সে ইহার বৈধব্য হয়। এই কন্যা পতি কুলে বাস করিত, ইহার জননী স্বীয় দুহিতার অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আপন আত্মীয় বর্গের সম্মতি অনুসারে তাহার পুনঃ পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদনার্থে অতীব যত্নশীলা হয়েন এবং সেই যত্নানুসারে এই শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। এই কন্যার পিতা লোকান্তরিত হওয়াতে ইহার মাতা লক্ষ্মীমণি দেবী হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ও দেশ প্রচলিত ব্যবহার অনুযায়ী উল্লিখিত পাত্রে ইহাকে সম্প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ বর্ণের বিবাহ উপলক্ষে এদেশে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ ও কুশণ্ডিকাদি যে যে ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এ বিবাহে সে সমস্তই হইয়াছিল, তাহার কোন প্রকার অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি হয় নাই। এই বিবাহে ন্যূনাধিক আটশত নিমন্ত্রণের পত্র মুদ্রিত হয়, তদ্ভিন্ন অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য দিগের নিমন্ত্রণের জন্য কতকগুলি পত্র পৃথক্ রূপে সংস্কৃত কবিতায় মুদ্রিত হইয়াছিল। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা ঐ দুই প্রকার পত্রই পশ্চাতে অবিকল সঙ্কলন করিলাম।

শ্রীলক্ষ্মীমণি দেব্যাঃ সবিনয়ং নিবেদনং। ২৩ অগ্রহায়ণ রবিবার আমার বিধবা কন্যার শুভ বিবাহ হইবেক মহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক কলিকাতার অন্তঃপাতী সিমুলিয়ার সুকেসষ্ট্রিটের ১২ সংখ্যক ভবনে শুভাগমন করিয়া শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন, পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম ইতি। তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ শকাব্দাঃ ১৭৭৮।

অন্ত্যে ভৌমে নিশান্তে বিলসতি নিতরং। পদ্মিনীপ্রাণকান্তে স্বাহাকান্তেক্ষণাংশে দিনকিরণদিনে শাস্ত্রমার্গানুসারী। ভূয়োভাবী বিধানাৎ পরিণয়নবিধির্ভর্ত্তৃহীনাত্মজায়াঃ পূর্য্যোবর্য্যার্য্যবিজ্ঞৌরিহ সদসি গতৈর্ম্মৎকৃপাপারতন্ত্র্যাৎ।

ইহার পরদিবস পাণিহাটী গ্রাম নিবাসী প্রসিদ্ধ কায়স্থ কুলীন বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত বাবু হরকালী ঘোষের ভ্রাতা কৃষ্ণকালী ঘোষের পুত্র মধুসূদন ঘোষের সহিত কলিকাতা নিবাসী নিমাইচরণ মিত্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র মিত্রের দ্বাদশ বর্ষীয়া একটি বিধবা কন্যার বিবাহ হয়। এই কন্যাকে ইহার পিতাই সম্প্রদান করেন। ইহাও কায়স্থ বর্গের নির্দ্দিষ্ট কুলাচারানুসারে সম্পন্ন হইয়াছিল।

উল্লিখিত মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন উপলক্ষে মহা সমারোহ হইয়াছিল। শুভ বিবাহের সভায় প্রায় কলিকাতা নিবাসী প্রধান প্রধান সমস্ত ভদ্র পরিবারেরই অধিষ্ঠান হইয়াছিল এবং অনেক ভদ্রসন্তান কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিয়া

উক্ত কর্ম্ম সমাধা করিয়াছিলেন। উল্লিখিত পর্ব্বে এত লোকের সমারোহ হইয়াছিল, যে সকল লোকে সুন্দর রূপে বসিতে স্থান প্রাপ্ত হয়েন নাই এবং কন্যা সম্প্রদানের বাটীর নিকটস্থ রাজ পথ শকটাদি দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ হিন্দু শাস্ত্র ব্যবসায়ী অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও উক্ত বিবাহের সভায় অধিষ্ঠিত হইয়া শুভ কর্ম্ম সম্পন্ন করাইয়া ছিলেন। এই মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হওয়াতে যে বঙ্গ দেশের মধ্যে প্রকাণ্ড আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কোন কোন ব্যক্তি মহানন্দে পুলকিত হইয়া আহ্লাদ সাগরে ভাসিতেছেন এবং কোন কোন লোক শোকেতে মুহ্যমান হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, কেহ বা এই ঘটনাকে স্বদেশের চির কল্যাণের কারণ জানিয়া ইহার প্রয়োজক ও প্রবর্ত্তক দিগকে মনের সহিত সাধুবাদ প্রদান করিতেছেন, কেহ বা ইহাকে নিশ্চয় ভারত বর্ষের কলঙ্ক স্বরূপ ও হিন্দু ধর্ম্মের উৎসেদের হেতু মনে করিয়া ইহার উদ্যোগ কর্ত্তা ও উৎসাহ দাতাদিগকে নানা প্রকার অশ্রাব্য কটু কাটব্য কহিতেছেন। যে সকল জ্ঞান সম্পন্ন দেশ হিতৈষি বুদ্ধিমান লোকে এই পরম কল্যাণকর শুভ ঘটনা সম্পন্ন হইবার প্রতি বহু কাল হইতে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছিলেন, যাঁহারা এই শুভ দিন উপস্থিত হইবার জন্য প্রতি দিন দিন গণনা করিতেছিলেন, যাঁহারা এই আনন্দময় সুখের দিন প্রাপ্ত হইবার জন্য দূরবলম্বিনী আশা লতার মূলে নিয়ত যত্নবারি সেচন করিতেছিলেন, এবং যাঁহারা এই বিধবা বিবাহ রূপ পুণ্য তরুকে স্নেহাস্পদ জন্ম ভূমিতে রোপণ করিবার জন্য নানা প্রকার মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক স্বদেশীয় অনেক বন্ধু বান্ধবের মানস ক্ষেত্রে ইহার বীজ বপন করিয়াছিলেন, এই ব্যাপার সম্পন্ন হওয়াতে তাঁহাদিগেরই মনে আনন্দের উদয় হইয়াছে, এই চিরবাঞ্ছিত ও দূর লক্ষিত সুখময় শুভ দিন উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারাই আহ্লাদে পুলকিত হইয়াছেন এবং এই কল্যাণকর পুণ্য তরু সত্বরে সফল হওয়াতে, তাঁহারাই আপনদিগের সকল শ্রম ও সকল যত্নকে সার্থক জ্ঞান করিয়া আনন্দস্রোতে প্লাবিত হইতেছেন। তাঁহারা দেখিতেছেন যে জগদীশ্বরের অসদৃশ করুণা প্রসাদে তমসাচ্ছন্ন ভারত বর্ষে জ্ঞান সূর্য্যের উদয় হওয়াতে ক্রমে ক্রমে এখান হইতে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইতেছে, জ্ঞান জ্যোতিঃ প্রভাবে ভারত বর্ষের অনেক সন্তান জননী জন্মভূমিকে নানা প্রকার অধর্ম্ম কণ্টকে বিদ্ধ দেখিয়া তাহা উত্তোলন করিবার জন্য ব্যাকুলিত চিত্ত হইয়াছে এবং তাহাকে পুণ্য কর্ম্ম রূপ পরম শোভনীয় অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিতে কায়মনো বাক্যে যত্নশীল হইয়াছে, তাঁহারা দেখিতেছেন, যে পাপভার প্রপীড়িত ভারত ভূমি অনেক সাধু ব্যক্তির যত্ন হেতু এত দিনে এই সকল পাপের ভার হইতে পুনর্ব্বার মুক্ত হইতেছে ভুবন বিখ্যাত হিন্দু জাতির বহু কালের গাঢ় কলঙ্ক ক্রমে অপনীত হইবার উপায় হইয়াছে এবং অবনত মস্তক হিন্দু স্থান পুনর্ব্বার উন্নতগ্রীব হইয়া আপনার মহত্ত্ব প্রকাশ করিবার পথ প্রাপ্ত হইতেছে এবং তাঁহারা এই সমস্ত শুভ চিহ্ন সন্দর্শন করিয়া হিন্দু স্থানের শ্রীবৃদ্ধির ও হিন্দু জাতির গৌরব বৃদ্ধির জন্য আশালতাকে নিয়ত বলবতী করিতেছেন। কিন্তু যে সকল জ্ঞানহীন পণ্ডিতাভিমানি দ্বেষ পরবস লোকে আপনাদিগের দৃঢ় সংবদ্ধ কুসংস্কার হেতু এই সকল শুভ ব্যাপারকে অকারণে নিন্দিত কর্ম্ম মনে করিয়া ইহা সম্পন্ন হইবার প্রতি নানা প্রকার ব্যাঘাত করিয়াছে, যাহারা ধর্ম্মাধর্ম্মের কোন বিচার না করিয়া এবং পাপ পুণ্যের প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া এই শুভ দিন

উপস্থিত হইবার আশঙ্কায় নিয়ত শঙ্কিত হইয়াছে এবং যাহারা এই শুভানুষ্ঠান কর্ত্তা সাধু দিগের আশা লতার মূলচ্ছেদ করিবার জন্য কায়মনো বাক্যে চেষ্টা করিয়াছে এবং যাহারা জ্ঞান চক্ষুকে একেবারে রুদ্ধ করিয়া এবং বুদ্ধি যুক্তি ও বিচারের পথে এক কালে কণ্টক প্রদান করিয়া দেশ প্রচলিত ব্যবহার পরম্পরাকেই সর্ব্ব সিদ্ধি জ্ঞান করিয়া তাহা নিরাকৃত হইবার নাম শ্রবণ করিলে স্তব্ধ বুদ্ধি ও লোমাঞ্চিত কলেবর হইয়াছে। এই নিত্য বাঞ্ছিত শুভ সংকল্প সিদ্ধ হওয়াতে তাহারাই ম্রিয়মাণ হইয়াছে এই মঙ্গল ময় সুখের দিন উপস্থিত হওয়াতে তাহারাই শোক সাগরে মগ্ন হইয়াছে এবং এই সন্তাপ হারক শীতল তল ধর্ম্ম বৃক্ষ ফলবান্ হওয়াতে তাহারাই হতাশ ও হতচেতন হইয়া অনর্থক হাহাকার করিতেছে। তাহারা মনে করিতেছে, যে ক্রমে কলি প্রবল হওয়াতে ধর্ম্মের স্রোত এক কালে রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল, ধর্ম্ম শাস্ত্র লোক সমাজে অমান্য হইয়া উঠিল এবং ভারত বর্ষে অধর্ম্মের অধিকার দিন দিন বিস্তার হইতে লাগিল, তাহারা ভাবিতেছে যে এত দিনের পর হিন্দু নাম বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল, ভারত ভূমি ক্রমে পাপ ভারে ভারাক্রান্ত হইতে লাগিল এবং ভারত বর্ষীয় হিন্দু জাতির মান যশ শ্রী সৌভাগ্য সকলি অন্তরিত হইয়া গেল এবং তাহারা এই সকল অমূলক আশঙ্কা কল্পনা করিয়া আপনা-দিগের ভাবি সৌভাগ্যের আশা ভরসাকে এক কালে ক্ষীণ করিতেছে। কিন্তু ফলত এই বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হওয়াতে যে ভারত বর্ষের কি পর্য্যন্ত সৌভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে এবং ভারত বর্ষ বাসি হিন্দু জাতির কতদূর গৌরব বৃদ্ধি হইবার পথ হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। এই রূপে ক্রমে যদি ভারত বর্ষের সকল কুপ্রথা নিরাকৃত হয় এবং এখানে সুপদ্ধতি সকল প্রচলিত হইয়া উঠে তাহা হইলে, ভারত ভূমি পৃথিবীর মধ্যে পুনর্ব্বার সর্ব্বাগ্রগণ্য ধর্ম্ম ক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, এবং হিন্দু জাতি সম্যক রূপে নিষ্কলঙ্ক ও নিষ্পাপ হইয়া উঠে। বিধবা বিবাহ কার্য্যতঃ প্রচলিত হওয়াতে যাহারা মনে মনে বিষণ্ণ হইয়াছেন, এবং এদেশের অদৃষ্টকে অকারণে নিন্দা করিতেছেন, তাঁহারা কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তাঁহাদিগের সে বিষাদ দূর হইবেক এবং তাহারা স্বদেশকে সৌভাগ্যবন্ত দেখিতে পাইবেন। এদেশে পতিহীনা অনাথা দিগের পনরুদ্বাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে যে এখানে ভ্রূণহত্যা স্ত্রীহত্যা ব্যাভিচার প্রভৃতি নানা প্রকার উৎকট উৎকট পাপের পথ পরিষ্কৃত ছিল, তাহা নানা পণ্ডিত বারম্বার নানা প্রকার যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং যাহার অতি যৎ সামান্য বুদ্ধি আছে, সেই ব্যক্তিই তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে, অতএব সেই প্রথা প্রচলিত হইলে যে ঐ সমস্ত পাপের পথ অবশ্যই রুদ্ধ হইবে তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই এবং তদ্দ্বারা দেশের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলেরই বা সম্ভাবনা কি? ইহাতে হিন্দুধর্ম্মাভিমানী প্রতিপক্ষীয় মহাশয়েরা কি জন্য যে উৎসাহান্বিত না হইয়া বিষণ্ণ হইবেন তাহা আমাদিগের বুঝিবার শক্তি নাই, তবে তাঁহারা যদি কেবল অভিমান পরবশ হইয়া এবং যথার্থ ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি পাত না করিয়া বহুকাল প্রচলিত বংশ পরম্পরা গত দেশ ব্যবহারের উৎসেদ ও অপ্রচলিত আধুনিক পদ্ধতির প্রচার দেখিয়া দুঃখিত হয়েন তাহা হইলে আর আমাদিগের কোন উপায় নাই। কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধি-মান্ বলিয়া মনে মনে অভিমান করেন, পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দেন এবং ধর্ম্ম পালক বলিয়া দম্ভ করেন, এমন মঙ্গল বিষয়েও এপ্রকার আনন্দের স্থলে

তাঁহাদিগের দুঃখিত হওয়া ও অনাহ্লাদ প্রকাশ করা কোন ক্রমেই উপযুক্ত হয় না। দীর্ঘকালের পর শরীরের কোন চির রোগ আরোগ্য হইলে তজ্জন্য আক্ষেপ করা যেমন অসঙ্গত, সেইরূপ দেশ প্রচলিত কোন প্রাচীন কুপ্রথার উৎসেদ দেখিয়া খেদ করাও অন্যায়। যাহা হউক প্রতিপক্ষীয় মহাশয়দিগের যখন চিত্ত কিঞ্চিৎ স্থির হইবে, দ্বেষানল নির্ব্বাণ হইবে এবং অভিমান দূরে গমন করিবে, তখন তাঁহারা আপনা হইতেই দেখিতে পাইবেন, যে এখানে বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হওয়াতে এদেশের কি পর্য্যন্ত সৌভাগ্য হইয়াছে।

এক্ষণে যে সকল অসামান্য লোকের প্রযত্নে এই মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে যাঁহাদিগের উৎসাহে এই চির বাঞ্ছিত সুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের অসাধারণ শক্তি ও অতুল্য গুণের বিষয় বর্ণন না করিয়া কোন মতে নিরস্ত থাকিতে পারা যায় না। এই মহৎ ব্যাপার যে কএক ব্যক্তি অসামান্য ধী সম্পন্ন প্রসন্ন মতি মহাত্মাদিগের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তন্মধ্যে মহামান্য ও সর্ব্বাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণ আমরা জীবন সত্বেও ভুলিতে পারিব না। তাঁহার অদ্বিতীয় নাম এই অসাধারণ কীর্ত্তির সহিত মহীতলে চির কাল জীবিত থাকিবে। এই মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি যেপর্য্যন্ত পরিশ্রম ও যেপর্য্যন্ত যত্ন স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমরা শত বর্ষেও বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারিব না, তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়, অদ্বিতীয় তিতিক্ষা ও তুলনা রহিত ধী শক্তিই এই মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইবার প্রতি প্রধান কারণ। তিনিই অসাধারণ বুদ্ধি বলে হিন্দু দিগের সমস্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র সমন্বয় করিয়া তাহার শেষ সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন এবং বিধবা বিবাহ যে হিন্দু ধর্ম্ম বিরুদ্ধ নহে, তিনি স্বীয় বিচার কৌশলে তাহা সকল লোককে শিক্ষা প্রদান করিলেন, তাঁহারই প্রভাবে হিন্দু শাস্ত্রের এ কলঙ্ক দূর হইল এবং তাঁহারই প্রসাদাৎ হিন্দু বিধবারা অসহ্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইল। তিনি এই শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ করণার্থে নিন্দাকে নিন্দা বোধ করেন নাই, অপমানকে অপমান জ্ঞান করেন নাই, এবং কটু কাটব্য ও উপহাস্যাদির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। তিনি যখন বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তক প্রচার করেন তখন প্রতিবাদিগণ তদুত্তরে তাঁহাকে কটু কহিতেও অপেক্ষা রাখে নাই, নিন্দা করিতেও ত্রুটি করে নাই এবং নানা শত্রু নানা মতে বৈরতা সাধন করিতেও ক্ষান্ত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার ভূধর সম নিশ্চল স্বভাব কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। বজ্র যেমন পর্ব্বত উপর পতিত হইয়া আপনিই তেজো হীন হয় শত্রুগণের নিন্দা-বাদ ও কটু বাক্য সকলও সেইরূপ তাঁহার উপর পতিত হইয়া আপনা হইতেই নিস্তেজ হইয়াছে। তিনি যদি জ্ঞানহীন অবোধ লোকের বৈর ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া এই শুভানুষ্ঠান সিদ্ধ করিতে কোন রূপে ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে ভারত বর্ষীয় বিধবাদিগের প্রজ্বলিত বৈধব্য যন্ত্রণানল নির্ব্বাণ হইবার আর কোন উপায় হইত না এবং দুর্ভাগ্য ভারত বর্ষ ভ্রূণ হত্যা ও ব্যভিচারাদি পাপ ভার হইতে কস্মিন্‌কালেও পরিত্রাণ পাইত না, অনাথা বিধবাদিগের হৃদয়স্থিত শোকাগ্নি নিঃসৃত নিশ্বাসানলে ভারত বর্ষ চির দিনই দগ্ধ হইত।

হা জগদীশ! এসমস্ত কল্যাণকর ব্যাপারের মধ্যে আমরা কেবল তোমারই মহিমা সন্দর্শন করিতেছি এবং তোমারই প্রসাদ প্রত্যক্ষ করিতেছি, তুমি যে কোন্‌ সূত্রে ও কোন্‌ কৌশলে জীবের কল্যাণ সাধন কর তাহা কাহার সাধ্য যে বোধগম্য করিতে পারে? কাহার মনে ছিল যে তমসাচ্ছন্ন ভারত বর্ষে হিন্দু

বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইয়া পতিহীনা অবলাদিগের অনিবার্য্য শোকাগ্নিকে নির্ব্বাণ করিবে, কে মনে করিত যে হিন্দু বিধবা বনিতারা দুশ্চ্ছেদ্য শাস্ত্রের শাসন ছেদন করিয়া আপনাদিগের দুঃখ রাশিকে নষ্ট করিতে সক্ষম হইবে, আহা! তাহাদিগের অসহ্য যন্ত্রণা স্মরণ হইলে এখনও আমাদিগের অশ্রুপাত হয়, তাহারা যে আবার এ শুভ দিন প্রাপ্ত হইবে, আমাদিগের আর ইহা মনে ছিল না। কেবল তোমার কৃপাই এসকলের মূল। ভারত ভূমি পূর্ব্বাবধিই ধর্ম্ম ভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল এবং হিন্দু জাতি চিরদিনই ধর্ম্মপাত্র রূপে পরিচিত ছিল, কিন্তু তাহাদিগের দারুণ দেশ ব্যবহার সে সকল সম্পত্তিই হরণ করিয়াছিল, আবার তুমিই তাহাদিগকে সে অমূল্য সম্পত্তি প্রদান করিবার পথ প্রস্তুত করিলে। অতএব আমরা তোমাকেই নমস্কার করি। যে বৈধব্য যন্ত্রণাকে এদেশীয় স্ত্রীলোকে অনিবার্য্য মনে করিয়াছিল, যে রোগকে তাহারা অসাধ্য ও অনারোগ্য ভাবিয়াছিল, যাহা হইতে তাহারা কস্মিন্‌কালে মুক্তি পাইবার আশা করিত না এক্ষণে যে মহাত্মা ব্যক্তির প্রযত্নে সেই যন্ত্রণার শেষ হইল সেই রোগের ঐষধ স্থির হইল এবং তাহা হইতে এদেশীয় অবলারা মুক্তি পাইল তাঁহার এই অসামান্য কীর্ত্তি যেন নিত্য কাল পৃথিবী মধ্যে তোমার মহিমাকে মহীয়ান করে, অবশেষে এই আমাদিগের প্রার্থনা।"

বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করেছেন বলে একদল লোক বিদ্যাসাগরের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল। বিদ্যাসাগর রাস্তায় বেরোলে চারদিক থেকে লোক এসে তাঁকে ঘিরে ফেলত। কেউ গালাগাল করত, কেউ ঠাট্টা করত, কেউ-কেউ মেরে ফেলবার ভয়ও দেখিয়েছে। কিন্তু, না বললেও চলে নিশ্চয়ই, বিদ্যাসাগর কণামাত্র বিচলিত হননি।

একদিন শুনলেন, কলকাতার একজন বড়মানুষ তাঁকে মারবার জন্য লোক লাগিয়েছেন। ভাড়াটে গুন্ডারা তক্কে-তক্কে আছে। সুযোগ পেলেই বিদ্যাসাগরকে মারবে।

বিদ্যাসাগর সটান সেই বড়মানুষের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন একদিন। বড়মানুষটি তখন মোসাহেবদের নিয়ে মশগুল হয়ে আছেন, ভাড়াটে গুন্ডাদের হাতে মার খেয়ে বিদ্যাসাগরের কী দশা হবে সেই তত্ত্বকথায় ব্যস্ত আছেন। এমন সময় বিদ্যাসাগরকে সশরীরে দেখে নির্বাক হয়ে গেলেন সকলে।

কিন্তু বিদ্যাসাগর এখানে এসেছেন কেন?

বিদ্যাসাগর বললেন—শুনলাম, আমাকে মারবার জন্য আপনাদের ভাড়াটে লোকেরা আহার-নিদ্রা ছেড়ে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাই আমি ভাবলাম, ওদের কষ্ট দেবার দরকার কি, আমি নিজেই যাই। নিজেই চলে এলাম। এখন আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর পাবেন না।[৪]

যে-কোনো সময় বিদ্যাসাগরের দারুণ বিপদ হতে পারে, এ-সংবাদ বীরসিংহে ঠাকুরদাসের কানে পৌঁছল। শ্রীমন্ত নামে একজন জেলে-সর্দারকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন তিনি। রাস্তাঘাটে শ্রীমন্ত সবসময় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। হাতে তার লাঠি। আর লাঠিতে শ্রীমন্ত ওস্তাদ।

একদিন রাত্রে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ থেকে বাসায় ফিরে আসছেন। ঠনঠনের কালীতলায় দেখলেন, কয়েকজন ষণ্ডামার্ক গুন্ডা তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। লক্ষণ ভালো নয়।

একবার শ্রীমন্তকে ডাক দিলেন বিদ্যাসাগর—কই রে ছিরে, সঙ্গে আছিস কি?

পিছন থেকে শ্রীমন্ত বলল—তুমি চলো না। কে আসে-যায়, সে আমি দেখব। তুমি চলে যাও। চাকর সঙ্গে আছে।[৫]

অতঃপর বিধবা-বিবাহ করেছেন দুর্গানারায়ণ বসু ও মদনমোহন বসু! দুজনেই স্বনামধন্য রাজনারায়ণ বসুর ভাই। দুর্গানারায়ণ জ্যেঠতুতো ভাই। মদনমোহন সহোদর।

হ্যাঁ, রাজনারায়ণই নিজ পরিবারে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন করেছেন। দুর্গা-নারায়ণ যখন বিধবা-বিবাহ করতে যাচ্ছিলেন, গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাল্কির ভেতর মুখ দিয়ে বললেন—দুর্গা, তোর মনে এই ছিল, একেবারে মজালি।

হরনারায়ণ দত্ত সেসময়ে মেদিনীপুরে গবর্নমেণ্ট উকিল। তিনি বলেছিলেন —রাজনারায়ণবাবু জানেন না যে তিনি বাঙলা ঘরে বাস করেন।

অর্থাৎ বাঙলা ঘর অনায়াসে পুড়িয়ে দেওয়া যায়।

জঙ্গল থেকে একটা মোটা লাঠি কেটে নিয়ে এসেছেন রাজনারায়ণ। যদি দাঙ্গা হয় আত্মরক্ষা করতে হবে তো।

বিবাহকালে রাজনারায়ণের মা মথুরায় ছিলেন। তিনি বাড়িতে থাকলে রাজনারায়ণ বোধ করি দু-ভাইয়ের বিধবা-বিবাহ দিতে পারতেন না। এই বিধবা-বিবাহের জন্য তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হয়েছিলেন। একদিন বলেছিলেন—রাজনারায়ণ, তোর মনে এই ছিল।

রাজনারায়ণের বাড়ি বোড়াল গ্রামে। বোড়ালের লোক সেসময়ে বলেছিল—রাজনারায়ণ বসু গ্রামে এলে আমরা ইট মারব।

একথা শুনে রাজনারায়ণ বলেছিলেন—তাহলে আমি খুশি হব। আমি বাঙালীকে উদাসীন জাতি বলে জানি। এমন ঘটনা হলে আমি বুঝব, এখন বিধবাবিবাহের প্রতি তাঁদের বিদ্বেষ যেমন প্রবল, বিধবাবিবাহ যখন ভালো মনে করবেন, তখন তার প্রতি তাঁদের অনুরাগও তেমনি প্রবল হবে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন পশ্চিমাঞ্চলে। তিনি রাজনারায়ণকে লিখেছেন: "এই বিধবা-বিবাহ হইতে যে গরল উত্থিত হইবে, তাহা তোমার কোমল মনকে অস্থির করিয়া ফেলিবে; কিন্তু সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়।"[৬]*

অক্ষয়কুমার দত্ত একখানা চিঠিতে রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছেন: "আপনি মেদিনীপুর অঞ্চলে বিধবাবিবাহ সম্পাদনার্থ সচেষ্টিত আছেন শুনিয়া সুখী হইয়াছি। আমাকে তদ্বিষয়ের সমাচার লিখিতে আলস্য করিবেন না। বিদ্যাসাগরকে মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেও ত্রুটি করিবেন না। জয়োস্তু! জয়োস্তু!"[৭]

বিদ্যাসাগর একখানা চিঠিতে রাজনারায়ণকে লিখেছেন: "আপনি অসাধারণ সাহস প্রদর্শন পূর্ব্বক বিধবাবিবাহের মঙ্গলার্থে প্রবৃত্ত হইয়াছেন...। বস্তুত আপনি অতি মহাত্মার কর্ম্ম করিয়াছেন। এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নানা

---

* প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছেন: "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিতও দেবেন্দ্রনাথের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধর্ম্মতত্ত্ব অপেক্ষা বিধবাবিবাহ প্রচারেই অধিক উৎসাহ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ-ভক্ত অথচ রক্ষণশীল লোকদিগকে বিরক্ত করিয়া তোলেন।" (সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত: শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, তৃতীয় সংস্করণ পৃ. ৩৫৭)

প্রকারে আপনার মনের যেরূপ ক্লেশ হইতেছে, আর কাহাকেও সেরূপ ক্লেশ পাইতে হইতেছে না।"[৮]

১৮৫৭ সালের ৫-ফেব্রুআরির 'সম্বাদ ভাস্করে' প্রকাশিত একখানা প্রেরিতপত্র উদ্ধার করি :

"শ্রীযুত ভাস্কর সম্পাদক মহাশয়েষু।

বিনয় পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদন মিদং। মহাশয় ভাস্কর পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ভাস্কর যন্ত্রালয়ে গমন পূর্ব্বক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করত বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দিয়াছিলেন সংবৎসর মধ্যে বিধবা বিবাহের সাহায্য ও উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে প্রত্যেক বিবাহে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিবেন সে বিজ্ঞাপন এইক্ষণে কোথায় থাকিল, বাবু মহাশয়ের বাক্য শরৎকালের মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় কেবল ডাক হাঁক সার হইল, আমি বিধবা রমণীর পাণি পীড়ন করিয়া মহাবিপদগ্রস্ত হইয়াছি, কোন ব্যক্তির পরামর্শক্রমে উক্ত মহাশয়কে পত্র লিখিয়া বিস্তারিত জ্ঞাপন করিয়াছি অনুমান ছিল বাবু মহাশয়ের বদান্যতা সফল হইবেক তাহা কি হইল, সে পত্র প্রাপ্ত হইলেন কিনা তাহাই বা কিসে জানিতে পারিব; এইক্ষণে মহাশয়ের অতুল্য অমূল্য ভাস্করের আশ্রয় ভিন্ন আর উপায় দেখি না, মহাশয় দয়া পূর্ব্বক এই পত্রখানী প্রকাশ পূর্ব্বক আমার হৃদয়াকাশের চিন্তারূপ অন্ধকার বিনাশ করিয়া বাধিত করিবেন ইতি সন ১২৬৩ সাল তাং ১৬ মাঘ।

ভদ্র বংশজাত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ
শ্রীশ্রীহরি চক্রবর্ত্তী বিধবা বিবাহকারক।"

১৮৫৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহ হল।

বিধবাবিবাহের উপর সিপাহীদের আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর গবর্নমেণ্ট জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। উত্তরকালে তিনি লিখেছেন : "একস্থানের বিদ্রোহের সংবাদের পর আর এক স্থানের বিদ্রোহের সংবাদ যেমন মেদিনীপুরে আসিতে লাগিল তেমনি মেদিনীপুরবাসী অত্যন্ত ভয়াকুল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। ...আমরা স্কুলে কাজ করিবার সময় প্যাণ্টালুনের ভিতর ধুতি পরিয়া কাজ করিতাম, যখনই সিপাহী আসিবে প্যাণ্টালুন ও চাপকান ছাড়িয়া ধুতি ও চাদর বাহির করিয়া পরিব স্থির করিয়াছিলাম। সিপাহীদিগের প্যাণ্টালুনের উপর বিশেষ রাগ ছিল। কোন্ পথ দিয়া পলায়ন করিতে হইবে তাহা আগেই ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। বিধবা-বিবাহ নিবন্ধন আমার বিশেষ ভয় ছিল। বিধবা-বিবাহের উপর তাহাদের আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল।..."[৯]

উত্তরকালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন : "এই বিধবাবিবাহ-প্রচলন সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। শুধু দাঁত দিয়া টোটা কাটা নয়,—বিধবাদের বিবাহ দিয়া ইংরাজ হিন্দুর সর্ব্বনাশ করিতেছে, এইরূপ একটা রব উঠিয়াছিল।"[১০]

সেসময়ে কেউ-কেউ রটনা করেছেন যে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়েছে বলেই এই সিপাহী-বিদ্রোহ হল, আর বিধবাবিবাহ হবে না।

বাঙলা ১২৬৪ সনে সিপাহী বিদ্রোহের সময় যে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী

হয় তদুপলক্ষে ১২৬৪ সনের 'বর্ষবিদায়' লিখেছেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ওই 'বর্ষবিদায়ে' বিধবা-বিবাহ বিষয়েও কটাক্ষ আছে :

"কাট কাট মার্ মার্। মুখে রব যার তার॥
বলহীন পরিবার। কারো নাই ঘর দ্বার॥
বৃক্ষতলা করি সার। চক্ষে ফেলে শতধার॥
শত শত সধবার। শাঁকা খাড়ু নাহি আর॥
পতিহীন হয়ে সবে। কাঁদিতেছে হাহারবে॥
অন্ন নাই বস্ত্র নাই। কিসে বাঁচি ভাবি তাই॥
বিদ্যাসাগর নাহি তথা। কে কবে বিয়ের কথা?
বিয়ে হ'লে বেঁচে যেত। সাধ পুরে খেতে পেত॥
গহনা উঠিত গায়। এড়াতো সকল দায়॥
কি করে কপাল পোড়া। বিধাতা নষ্টের গোড়া॥
যায় সব যমপুরে। সাগর অনেক দূরে॥
উজানেতে থাকে তারা। সে জলের ভাঁটি-ধারা॥
সাগরের লোণা জল। বান ডাকে কল কল॥...
কার ঘাড়ে কার বোঝা। কিছু নাহি যায় বোঝা॥
বিধবায় পতি পায়। আবার কি শুনি তায়॥
অনুকূলা নন কালী। সে গুড়ে বা পড়ে বালি॥
বিলাতের অভিপ্রায়। আইন বা উঠে যায়॥
ওরে কাল দুরাচার। তোর এই অত্যাচার॥
প্রথমে আইন খুলে। ফের তাহা দিস্ তুলে॥
সাগর ডাগর হয়ে। নাগর নাগরী লয়ে॥
দেখায়ে নূতন ক্রিয়ে। যে কটা দিলেন বিয়ে॥
সে বিয়ে কি সিদ্ধ নয়। ফিরে যাবে সমুদয়॥
শত্রু-লোক হাসালি। আঁখি-জলে ভাসালি॥
রাগ ক'রে যত রাড়ে। শাপ দেবে হাড়ে-হাড়ে॥
জান না সতীর শাপে। ত্রিভুবন ভয়ে কাঁপে॥
পেয়ে সাবিত্রীর শাপ। যম বলে বাপ বাপ॥..."

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "সন ১২৬৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে অগ্রজ মহাশয় (বিদ্যাসাগর) সিসিলবীডন মহোদয়কে বলিয়াছিলেন যে, সিপাহী বিদ্রোহ নিবন্ধন বিধবাবিবাহ কার্য্য স্থগিত রাখা হইয়াছে। ইহা শ্রবণ করিয়া সিসিলবীডন মহোদয় বলিলেন, যখন আমাদের তরবারির উপর নির্ভর, তখন ভয় করিয়া বিধবাবিবাহ কার্য্য স্থগিত রাখা তোমার কর্ত্তব্য নয়; অনন্তর ইহাঁর কথা শুনিয়া পুনর্ব্বার বিধবাবিবাহ দিতে যত্নবান হইলেন।"[১১]

১৭৭৯ শকের পৌষে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লিখেছে :

"গত ২৮ অগ্রহায়ণ শনিবার রজনীতে একটী বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইয়াছে। এই কন্যার পিতা বর্ত্তমান তিনি স্বয়ং কন্যাদান করিয়াছেন। শ্রীযুত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় বর। শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী কন্যা। বর সুশিক্ষিত ও সদ্বংশজাত বয়ঃক্রম আঠার বৎসর। কন্যাটী অতি বালিকা, বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র। এই বয়সের মধ্যেই তিনি বিবাহ সংস্কার লাভ ও

বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। অতি শিশুকালেই অর্থাৎ দেড় বৎসর বয়সে বিবাহ ও আড়াই বৎসর বয়সে বৈধব্য সংঘটন হইয়াছিল। এরূপ অল্পবয়সে বিবাহ হইলে ঐ বিবাহ প্রকৃত বিবাহ সংস্কার বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত কি না, ইহা সম্পূর্ণ সন্দেহ স্থল। যাহা হউক দেশাচারানুসারে ঐরূপ বিবাহ বিবাহ সংস্কার বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে এবং ঐরূপ নাম মাত্র বিবাহের অব্যবহিত পরক্ষণেই বরের মৃত্যু হইলে কন্যাও বিধবা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাদৃশী বিধবা কন্যাকেও যাবজ্জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যাবজ্জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ কেমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহা বোধবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই বিলক্ষণ অবগত আছেন। অতএব শাস্ত্রানুসারে চলিয়া অবলা জাতিকে দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করা বুদ্ধিজীবী জীবের বিধেয় কিনা এবিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

এতদ্দেশীয় লোকেরা চির প্ররূঢ় কুসংস্কারের নিতান্ত বশীভূত। পুরুষানুক্রমে যাহা হইয়া আসিতেছে, তাহা নানা অনর্থের মূল ও নানা উৎপাতের হেতু হইলেও, তাঁহারা শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া তদনুসারেই চলিয়া থাকেন। এই প্রথা প্রবল ও প্রচলিত থাকাতে কত প্রকারে কত অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইহা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তথাপি কেবল কুসংস্কার দোষে এতদ্দেশীয় লোকদিগের জ্ঞান হয় না। ফলতঃ কুসংস্কার মনুষ্যের অতি বিষম শত্রু। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে যে এককালে অনেক অনর্থ নিবারণ হইয়া যায়, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু বিধবা বিবাহ বহুকাল প্রচলিত ছিল না। কতিপয় পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া চলেন নাই। সুতরাং এক্ষণকার লোকদিগের চিত্তক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে এই কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে যে বিধবা বিবাহ অতি অসৎ কর্ম্ম। বিধবা বিবাহ যে যথার্থ শাস্ত্রানুগত কর্ম্ম সে বিষয়ে আর সংশয় করা যাইতে পারে না। কিন্তু এতদ্দেশে শাস্ত্র অপেক্ষা দেশাচারের অধিক সম্মান। সুতরাং শাস্ত্রসম্মত হইলেও দেশাচার পরিগৃহীত নয় বলিয়া এক্ষণ পর্য্যন্ত বিধবা বিবাহের তাদৃশ আদর হইতেছে না। কিন্তু যখন প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তখন ইহা কোনমতেই অসম্ভাবিত নহে যে এই শ্রেয়স্কর ব্যবহার অনধিক কাল মধ্যেই প্রবল হইয়া উঠিবেক।

অনেকে এই আপত্তি করিয়া থাকেন, যদি এই ব্যবহার যথার্থই শ্রেয়স্কর হইবেক, তাহা হইলে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া চলেন নাই কেন? এবিষয়ে বক্তব্য এই যে এই ব্যবহার সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগের কিছুকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, স্মৃতি ও পুরাণে তাহার অসংশয়িত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে এই ব্যবহার রহিত হইয়া আসিয়াছে। রহিত হইবার এই এক প্রধান কারণ লক্ষিত হইতেছে যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগ অপেক্ষা কলিযুগে সহমরণের ও অনুগমনের প্রথা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে। অনেক অথবা প্রায় সকল বিধবাই স্বামীর সহিত জ্বলচ্চিতায় কিম্বা বিদেশস্থ স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া স্বতন্ত্র চিতায় আরোহণ করিয়া জীবনযাত্রা সমাপণ করিতেন। সুতরাং এক্ষণকার ন্যায় পূর্ব্বে বিধবার সংখ্যা এত অধিক ছিল না এবং সকলকে স্ব স্ব কন্যা ভগিনী পুত্রবধূ প্রভৃতির দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ এবং বৈধব্য নিবন্ধন পরিবার মধ্যে নানা অনর্থ সংঘটন অবলোকন করিতে হইত না। যদি বিধবার সংখ্যা, বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ ও বৈধব্য নিবন্ধন অনর্থ সংঘটনের মাত্রা অল্প হইল, তাহা হইলে আর বিধবা

বিবাহের তাদৃশী আবশ্যকতা রহিল না। বোধ হয়, এই হেতু বশতই ক্রমে বিধবা বিবাহের প্রথা অপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে রাজ শাসনে সহমরণ ও অনুগমনের প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং বিধবার সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠিয়াছে এবং তন্নিবন্ধন অনর্থ সংঘটনের পরিমাণও উত্তরোত্তর অসম্ভব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, অতএব, যে কারণের অসদ্ভাবে বিধবা বিবাহের প্রথা অপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল, যখন ঐ কারণ বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তখন বিধবা বিবাহের প্রথা অবলম্বন ভিন্ন অনর্থ নিবারণের আর কোন উপায় হইতে পারে না।

গত বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে এই শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানারম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতীয় কএকটী বিধবার বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হয়। তৎপরে কয়েক মাস আর বিবাহ হয় নাই। ইহাতে অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং সর্ব্বত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যে বিধবা বিবাহের আইন রহিত হইয়া গিয়াছে, আর বিধবার বিবাহ হইবেক না। কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক এবং ঐ প্রচার চেষ্টা যে কেবল বিদ্বেষ মূলক, তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন নাই। গত অগ্রহায়ণের অষ্টাবিংশ দিবসে কলিকাতা রাজধানীতে একটী বিধবার বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, ইহাই তাহার দেদীপ্যমান প্রমাণ। যাঁহারা এত দিন লোকের নিকট এই অলীক কথা যথার্থ বলিয়া প্রচার করিয়া আমোদ ও আস্ফালন করিয়া বেড়াইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাদিগকে বোধ হয় কিছু অপ্রতিভ হইতে হইবেক।”

১৭৮০ শকের শ্রাবণে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লিখেছে :

“কি আহ্লাদের বিষয়! গত ১২ ও ২৮ আষাঢ় হুগলিজিলার অন্তঃপাতী রামজীবনপুর নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে দুইটী বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা নগরে ক্রমে ক্রমে পাঁচটী বিধবার উদ্বাহ ব্যাপার নির্ব্বাহ হইয়াছিল; পল্লী গ্রামে রীতিমত বিধবা বিবাহের এই সূত্রপাত হইল।

অনেকে মনে করিতেন, যদিও কলিকাতায় কথঞ্চিৎ এবিষয়ের আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু পল্লী গ্রামে সহসা হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। কলিকাতার অধিকাংশ লোক সুশিক্ষিত ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের কুসংস্কার বিমোচন হইয়াছে। এমত স্থলে এরূপ হিতকর ব্যাপার প্রচলিত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা। পল্লী গ্রামের অধিকাংশ লোকই অদ্যাপি অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন আছেন, সুতরাং তাঁহারা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের নিতান্ত বশীভূত। এমত স্থলে এরূপ ব্যাপার হিতকর বলিয়া বোধ হওয়াই অসম্ভব। এই কথা অতি যথার্থ বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণ লক্ষিত হয়। এক্ষণে এতন্নগরে অনেকেই সুশিক্ষিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে সেই শিক্ষা সম্যক ফলোপধায়িনী হইয়া উঠে নাই। ঐ শিক্ষার এইমাত্র ফল লক্ষিত হইতেছে যে, অনেকেই স্বদেশীয় আচার ব্যবহার জঘন্য বোধে পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় লোক দিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকাতে ইউরোপীয় লোকেরা প্রশংসনীয় হইয়াছেন, তাহার কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অকিঞ্চিৎকর আচার ব্যবহারের অনুকরণে কোন বিশেষ ফল নাই; যদি এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিতেরা সাহস দেশ হিতৈষিতা প্রভৃতি সদগুণের অনুকরণ শিক্ষা করিতে

পারিতেন তাহা হইলে এত দিনে এতদ্দেশের কত শ্রীবৃদ্ধি হইত বলা যায় না। যৎকালে যুবকেরা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের তৎকালীন ভাব দেখিয়া সকলেই মনে করেন ইহাঁদিগের দ্বারা অনেকাংশে দেশের দুরবস্থা বিমোচন হইতে পারিবেক। কিন্তু ঐ সকল যুবক বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বিষয় কর্ম্মে ও সংসার ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইলেই সেসকল ভাবের এক কালে অভাব হইয়া উঠে।

যাহা হউক রামজীবন পুরে যে প্রণালীতে বিধবা বিবাহের শুভ সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, ঐ গ্রামে ও তৎসন্নিহিত গ্রাম সমূহে এই মঙ্গলকর ব্যাপার অনায়াসে প্রচলিত হইতে পারিবেক। প্রথম বিবাহ দিবসে ব্রাহ্মণ কায়স্থ নবশাখ প্রভৃতি প্রায় দুই সহস্রের অধিক লোক নিমন্ত্রিত ও সভাস্থ হইয়া যথাবিধানে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। বর ও কন্যা উভয় পক্ষীয় জাতি জ্ঞাতি ও কুটুম্ব বিবাহের পর উভয় পক্ষের আবাসেই আহার ব্যবহারাদি করিয়াছেন। উভয় পক্ষীয় কর্ত্তৃপক্ষের অভিমতে বিবাহ হইয়াছে, এবং বিবাহ দিয়া বর কন্যা রীতিমত গৃহে পরিগৃহীত হইয়াছে। যাহার যে কুলপুরোহিত তিনিই পৌরোহিত্য করিয়াছেন। এই অভাবনীয় ব্যাপার সন্দর্শনার্থ বহু সহস্র লোক রামজীবন পুরে সমবেত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিবাহের দিবস তাদৃশ সমারোহ হয় নাই, কিন্তু উহাও যথাবিধানে সম্পন্ন হইয়াছে।

এক্ষণে প্রার্থনা এই, জগদীশ্বর সুপ্রসন্ন হইয়া এতদ্দেশীয় লোক দিগকে এরূপ সুমতি প্রদান করুক যে তাঁহারা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারে বিসর্জ্জন দিয়া, যাহাতে এই পরম হিতকর ব্যাপার স্বদেশে শীঘ্র প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে আন্তরিক যত্ন ও আগ্রহ প্রদর্শন করেন।”

১৭৮০ শকের ভাদ্রে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ লিখেছে :

“গত মাসের পত্রিকাতে দুইটী বিধবাবিবাহের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছিল। ইহা পরম আহ্লাদের বিষয় যে শ্রাবণ মাসেও চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, রামজীবন পুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বাসুলি গ্রামে যথা বিধানে ও মহা সমারোহে পাঁচটী বিধবা কন্যার উদ্বাহ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মধ্যে মধ্যে ঐ অঞ্চলে বিধবা দিগের বিবাহ হইতে পারিবেক। বিংশতি মাস অতীত হইল, কলিকাতা নগরীতে বিধবাবিবাহের প্রথম সূত্রপাত হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে পাঁচটী বিধবার বিবাহ হইয়াছিল। এই পাঁচটী বিবাহ হইতে প্রায় এক বৎসরের অধিক কাল লাগে। পরে গত ১২ আষাঢ় রামজীবন পুরে বিধবা বিবাহের শুভ আরম্ভ হইয়া ১৩ শ্রাবণ পর্য্যন্ত সাতটী বিধবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই স্বল্পকাল মধ্যে পল্লীগ্রামে সাতটী বিধবার বিবাহ হওয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় বলিতে হইবেক। যাহা হউক এক্ষণে এরূপ প্রত্যাশা করা অন্যায় নহে, যে ঐ অঞ্চলে অল্পকাল মধ্যে এই শুভ ব্যাপার এক প্রকার প্রচলিত হইয়া উঠিবেক।”

১৭৮০ শকের আশ্বিনে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ লিখেছে :

“শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের পত্রিকাতে উল্লিখিত হইয়াছিল যে আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে হুগলীজিলার অন্তঃপাতী রামজীবন পুর প্রভৃতি গ্রামে সাতটী বিধবা-বিবাহ নির্ব্বাহ হইয়াছে। পরে ১লা ও ১৭ই ভাদ্রে চন্দ্রকোনা নগরে আর দুইটী বালিকা বিধবা কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে ১২ই আষাঢ় অবধি ১৭ই ভাদ্র পর্য্যন্ত ঐ অঞ্চলে সমুদয়ে নয়টী বিধবা বিবাহ হইয়া গেল। এরূপ

স্বল্পকাল মধ্যে এতগুলি বিধবাবিবাহ সম্পন্ন হওয়া অল্প আহ্লাদের বিষয় নহে। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই যেন তাঁহার প্রসাদাৎ এই শুভকর ব্যাপার এতদ্দেশে অবিলম্বে প্রচলিত হইয়া উঠে।"

১২৬৯ সালের ২৪-শ্রাবণ বীরসিংহে প্রথম বিধবা-বিবাহ হয়েছে।

১৮৬২ সালের ১৮-আগস্ট 'সোমপ্রকাশ' লিখেছে : "আমরা শ্রবণ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম, হুগলীজেলার অন্তঃপাতী বীরসিংহ গ্রামে ২৪ শ্রাবণ শুক্রবার মহাসমারোহে একটি বিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই বীরসিংহ বিধবাবিবাহপ্রবর্ত্তক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাসস্থান। ইতিপূর্ব্বে এই গ্রামের চতুর্দ্দিকে চন্দ্রকোনা রামজীবনপুর প্রভৃতি নানাস্থানে বিবাহ হইতেছিল, বীরসিংহ গ্রামে এই প্রথম সূত্রপাত হইল। বীরসিংহ রাধানগর ঈড়পালা যদুপুর লক্ষ্মণপুর উদয়গঞ্জ দীর্ঘগ্রাম নিশ্চিন্তপুর গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রামের যাবতীয় ভদ্রলোক সভাস্থ হইয়া কর্ম্ম সমাধা করিয়াছেন।

এই অঞ্চলে গত তিন বৎসরে ক্রমে ক্রমে ২০।২২টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে কিন্তু কোন বিবাহেই এরূপ সমারোহ ও এরূপ বহুগ্রামের সম্মতি ও বহু ভদ্রলোকের সমাগম হয় নাই। বরের নাম শ্রীযুত রামব্রহ্ম পাঠক, বয়স্ ২১ বৎসর। এই ইহাঁর প্রথম বিবাহ। কন্যার নাম শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবী, ক্ষীরপাই নিবাসী শ্রীযুত হারাধন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। পাঁচ বৎসর বয়সে চন্দ্রকোনানিবাসী ৺সীতারাম চৌধুরীর সহিত প্রথম বিবাহ হইয়া ঐ বৎসরেই বৈধব্য সংঘটন হয়। এক্ষণে কাদম্বিনীর বয়ঃক্রম ৯ নয় বৎসর মাত্র। বিবেচনা করিতে গেলে অদ্যাপি কাদম্বিনীর বিবাহের প্রকৃত বয়স্ হয় নাই। এই বয়সের মধ্যে বিবাহ বৈধব্য সংঘটন ও পুনরায় বিবাহ হইল।"

আরো অনেক বিধবাবিবাহ হয়েছে, কিন্তু সমস্ত বিধবাবিবাহের বিবরণ উদ্ধার করা দুঃসাধ্য এবং হয়তো আপাতত অনাবশ্যক।

গ্রামের চাষাভূষোর কাছে বিদ্যাসাগরের নাম হয়ে গেছে : বিধবার বিয়ে দেওয়া বিদ্যাসাগর।[১২]

১৮৬১ সালের ৩০-সেপ্টেম্বর 'সোমপ্রকাশ' লিখেছে : "শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বর্ত্তমান হিন্দুরীতি ও শাস্ত্রানুসারে বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, এবং স্বয়ংও কোন কোন স্থলে অধ্যক্ষতা করিয়া বিবাহ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এ নিমিত্ত সে দিন ইণ্ডিয়ান মিরর সম্পাদক তাঁহাকে গালি দিয়াছেন। কেবল মিরর সম্পাদক কেন, নব্যসম্প্রদায়ের অনেকে তাঁহাকে দূষিত করিয়া থাকেন এবং ঐ কারণের নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার সপক্ষতা করিতে উন্মুখ হন না।..."

বিধবা-বিবাহের প্রবর্তক বলে বিদ্যাসাগরকে বহু নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। সামাজিক ব্যবহারে তিনি একঘরে হয়েছেন। কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করেননি বিদ্যাসাগর। তিনি নিজেই লোকদের বলতেন—ওহে আমার সঙ্গে খেলে তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না তো ইত্যাদি।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে একবার কার্মাটাড়ে গিয়েছেন নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। নগেন্দ্রনাথ প্রাচীন সমাজের লোক। বিদ্যাসাগর নগেন্দ্রনাথকে বললেন—তোর খাওয়ার কি হবে রে? চাল-ডাল রয়েছে, নিজে রেঁধে খেতে পারিস্, কিংবা আমার ব্রাহ্মণের রান্না খেতে পারিস্, যা তোর ইচ্ছা কর।[১৩]

কোনো বাধা-বিপত্তি গ্রাহ্য করেননি বিদ্যাসাগর। মনে-প্রাণে যা ভালো

বুঝেছেন, চিরকাল নির্ভয়ে তাই করেছেন। কারো অন্যায় বা ভীরুতা তিনি মুখ বুজে সহ্য করতে পারেননি।

বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনে অনেকেই বিদ্যাসাগরকে উৎসাহ দিয়েছেন, সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর বিশ্বাস করেছেন সকলকে, কিন্তু তার ফল ভালো হয়নি। কথা রাখেননি সকলে।

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠানে, শোনা যায়, রমাপ্রসাদ রায় উপস্থিত হতে রাজি হননি। রমাপ্রসাদ রাজা রামমোহন রায়ের ছেলে। বিদ্যাসাগরের বন্ধু। আগে রমাপ্রসাদ কথা দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন তিনি সেই বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অনিচ্ছুক কেন?

রমাপ্রসাদ বললেন—আমি তো ভেতরে-ভেতরে আছিই। সাহায্যও করব, তবে বিবাহস্থলে না-ই বা গেলাম।

এ তো সাহসীর কথা নয়, ভীরুর কথা। হায়, রাজা রামমোহন রায়ের ছেলের মুখে এই কথা!

রাগে ও বিরক্তিতে বিদ্যাসাগর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। চোখ পড়ল দেয়ালের দিকে। দেয়ালে একখানা ছবি, পরম সাহসী মহাপুরুষের ছবি, রাজা রামমোহনের ছবি। বিদ্যাসাগর ছবিখানার দিকে তাকিয়ে বললেন—ওটা ফেলে দাও, ফেলে দাও।[১৪]

বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে যাঁদের কাছে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল, তাঁদের অনেকের কাছেই সাহায্য মেলেনি। কিন্তু এককেটা বিধবা-বিবাহে বিস্তর খরচ। উপযুক্ত সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না, অতএব বিদ্যাসাগর ঋণ করে অনেক বিধবা-বিবাহের খরচ চালিয়েছেন। ঋণের দায়ে বিদ্যাসাগরের প্রায় সর্বস্বান্ত হবার দশা।

সেসময়ে এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগর লিখেছেন: "অধিকাংশ ব্যক্তিই অঙ্গীকৃত সাহায্য দানে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। উত্তরোত্তর এ বিষয়ের ব্যয়বৃদ্ধি হইতেছে কিন্তু আয় ক্রমে খর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে সুতরাং আমি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। সেই সকল ব্যক্তি অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলে আমাকে এরূপ সঙ্কটে পড়িতে হইত না। কেহ মাসিক কেহ এক কালীন কেহ বা উভয় এইরূপ নিয়মে অনেকে দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কোন হেতু দেখাইয়া কেহ বা তাহা না করিয়াও দিতেছেন না।...এইরূপে আয়ের অনেক খর্ব্বতা হইয়া আসিয়াছে কিন্তু ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিয়াছে সুতরাং এই বিষয় উপলক্ষে যে ঋণ হইয়াছে তাহার সহসা পরিশোধ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক আমি এই ঋণ পরিশোধের সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখিতেছি। অন্য উপায়ে তাহা না করিতে পারি, অবশেষে আপন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও পরিশোধ করিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই।..."[১৫]

বিধবা-বিবাহের দৌলতে বিদ্যাসাগরের তখন বিস্তর ঋণ। বিদ্যাসাগরকে সেই ঋণভার থেকে মুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হলেন স্বনামধন্য প্যারীচরণ সরকার।

চাঁদার খাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন প্যারীচরণ। চলে এলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের কাছে।

প্রসন্নকুমার চাঁদার খাতায় সই দিলেন না। উপরন্তু, ধর্মবিরোধী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন বলে প্যারীচরণকে দু-কথা শুনিয়ে দিলেন।

সব কথা যথাসময়ে বিদ্যাসাগরের কানে গেল। অপমানিত বোধ করলেন

বিদ্যাসাগর। প্যারীচরণ প্রসন্নকুমারের কাছে না গেলে এ-অপমানের হাত থেকে বাঁচা যেত। প্যারীচরণের জন্যই এই অপমান হল।

অসন্তুষ্ট হলেন বিদ্যাসাগর। আপন অসন্তুষ্টি জানানোর জন্য একজন ভদ্রলোককে পাঠিয়ে দিলেন প্যারীচরণের কাছে। ভদ্রলোক প্যারীচরণের বন্ধু, বিদ্যাসাগরেরও বন্ধু।

ভদ্রলোক প্যারীচরণের বাড়িতে এসে পাঁচজনের সামনে প্যারীচরণকে বললেন—বিদ্যাসাগরকে তোমার এরকম অপমান করানো ভারি অন্যায়।

এবং আরো অনেক কথা।

কিছুই বুঝতে পারলেন না প্যারীচরণ। কোথায় অপমান করানো হল বিদ্যাসাগরকে?

ভদ্রলোক আপন বক্তব্য সবিস্তারে বললেন। তখন প্যারীচরণ বুঝতে পারলেন উপকার করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের অপকার করেছেন তিনি, বিদ্যাসাগরের বিরাগের কারণ হয়েছেন।

প্যারীচরণ সবিনয়ে বললেন—আমি না জেনে অন্যায় কাজ করেছি। সেজন্য যারপরনাই দুঃখিত। বিদ্যাসাগরকে বলবেন তিনি যেন আমায় ক্ষমা করেন।[১৬]

বিধবাবিবাহের জন্য বিদ্যাসাগর শেষ পর্যন্ত নিদারুণ বিপন্ন হয়ে পড়েছেন।

সিসিল বীডন তখন বাঙলাদেশের ছোটোলাট। কথায়-কথায় বীডন সাহেব একদিন জানতে পারলেন যে বিদ্যাসাগর বিপন্ন। বীডন সাহেব বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কি আবার সরকারী চাকরি নিতে ইচ্ছুক?

বিদ্যাসাগর তখন অনিচ্ছুক।

বছরখানেক বাদে, যা ছিল ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার, তা প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিল। এতদূর বিপন্ন হয়ে পড়লেন বিদ্যাসাগর যে আবার সরকারী চাকরি নেবার কথা ভাবতে হল। একখানা চিঠিতে সিসিল বীডনকে সেকথা জানালেন বিদ্যাসাগর। চিঠিখানা তুলে দিচ্ছি :

"My dear Sir,—A change in circumstances compels me to trouble you with a request to do something for me if possible. I am in difficulties and I find it almost impossible for me to put over them without a fresh source of income. About this time in the last year you were pleased to ask me whether I was willing to reenter the public service. I think I expressed my unwillingness at the time but what was then a matter of choice has now become a matter of necessity.

Trusting to be excused for the trouble.

I remain etc.;

Isvara Chandra Sarma."[১৭]

তদুত্তরে বীডন সাহেব জানালেন যে আপাতত বিদ্যাসাগরের উপযুক্ত কোনো কর্মখালি নেই; যা হোক, বিদ্যাসাগরের ইচ্ছার কথা বীডন সাহেব মনে রাখবেন।

দিনের পর দিন চলে গেল। বিদ্যাসাগর কোনো চাকরি পেলেন না। তারপর একদিন কথায়-কথায় বিদ্যাসাগর বীডন সাহেবের মুখে শুনলেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজে একজন সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হবেন। ওই কাজ কি

বিদ্যাসাগর পেতে পারেন না? বিদ্যাসাগর প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক হতে রাজি আছেন। কিন্তু য়ুরোপীয় অধ্যাপকদের চেয়ে কম মাইনে দিলে বিদ্যাসাগর কিছুতেই রাজি হবেন না। বিদ্যাসাগর বিপন্ন, প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের কাজ পেলে ভালো হয়, কিন্তু য়ুরোপীয় অধ্যাপকদের থেকে কম মাইনেয় প্রেসিডেন্সি কলেজে বহাল হয়ে বিদ্যাসাগরের পক্ষে আত্মসম্মান নষ্ট করা অসম্ভব।

একখানা চিঠিতে বিদ্যাসাগর বীডন সাহেবকে সবকথা স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিলেন :

"About three years ago, I communicated to you my willingness to re-enter the public service on account of the difficulty I was in, and solicited you to do some thing for me if practicable, you were pleased to say in reply that you would bear my wishes in mind. Since that time my difficulties have gradually assumed a far more serious aspect, and I am compelled though most unwillingly, to trouble you again with the request for doing some thing for me, if practicable.

In March last, you expressed in the course of conversation a wish for appointing a professor of Sanskrit in the Presidency College. If you still entertain that wish, and if you see no objection to my being selected for the appointment, kindly give it to me. But I must say candidly that notwithstanding the serious nature of the difficulties I am in, my vanity would not permit me to serve if the salary which European professors of the Institution draw, is not allowed to me, the grant of such an indulgence would not be an altogether unprecedented one. The native Judge of the High Court can be pointed out as an instance, with every sentiment of respect and esteem.

Yours Sincerely,

Isvara Chandra Sarma" [১৮]

বিদ্যাসাগরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারলে খুশি হতেন বীডন সাহেব। কিন্তু বীডন সাহেবের বিশ্বাস যে ভারত-সরকার য়ুরোপীয় অধ্যাপকদের সমান মাইনেতে প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক বহাল করতে রাজি হবে না। যা-হোক, বীডন সাহেব বিদ্যাসাগরকে জানিয়ে দিলেন, বিদ্যাসাগরের নামোল্লেখ না করে এ-বিষয়ে তিনি অ্যাটকিনসন সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে দেখবেন।

বিদ্যাসাগরের ধারণা ছিল এ-বিষয়ে বীডন সাহেবই বুঝি সর্বেসর্বা। জানতে পারলেন, তাঁর ধারণা ভুল। বীডন সাহেবকে নিতান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে বিব্রত করতে চাননি বিদ্যাসাগর, অতএব বিদ্যাসাগর আপন প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিলেন, বীডন সাহেবকে অনুরোধ জানালেন যেন তিনি এ-ব্যাপারে আর কোনো কষ্টস্বীকার না করেন। বিদ্যাসাগর বীডন সাহেবকে লিখেছেন :

"When I wrote to you about the Sanskrit Professorship, I

was under the impression that the creation of such an appointment had been settled and that the place was entirely in your gift. But as it appears from your favour of the 9th ultimo that there is likely to be great difficulty in the matter, and as it is farthest from my wish to put you to any sort of inconvenience on my personal account, I most gladly withdraw my request. You need not trouble yourself any farther on the subject." ১১

সমস্ত বিষয়টির উপর এখানেই যবনিকা পড়ল।

বিদ্যাসাগর তখন কলকাতার বাইরে গেছেন। বিধবা-বিবাহের জন্য বিদ্যাসাগর ঋণভারে বিপন্ন, অতএব বিদ্যাসাগরের একাধিক বন্ধু প্রস্তাব করলেন, দেশবাসী চাঁদা দিয়ে বিদ্যাসাগরকে ঋণমুক্ত করুক।* সেই প্রস্তাব ছাপার অক্ষরে, ১৮৬৭ সালের প্রথমার্ধে, কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত হল। কলকাতায় ফিরে এসে বিদ্যাসাগর ব্যাপারটা জানতে পারলেন। এবং সেই মুহূর্তে জনসাধারণকে এ-বিষয়ে আপন বক্তব্য জানালেন :

"I have thought it proper to publish this statement solely and wholly in the interest of the cause. I do not care what people may think or say of me individually, but I should be extremely sorry to see anything done which, though originating with the best of motives, was calculated to harm the cause I have expoused. If the parties, who have set subscriptions on foot, had confined their efforts to the formation of a Widow Marriage Fund, and had not made allusion to my own liabilities, for meeting which, I need hardly repeat, I had not and have not the remotest idea of appealing to the public, I would not have felt it necessary to remonstrate against the agitation. But the national object for which I am laboring

* শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "তৎকালের এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক বাবু প্যারীচরণ সরকার ও বারাসত নিবাসী বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়দ্বয় অগ্রজের (বিদ্যাসাগর) পরম বন্ধু ছিলেন। বিধবাবিবাহ ও বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি দেশহিতকর কার্য্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রায় পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ঋণ হইয়াছিল; একারণ উক্ত সরকার ও মিত্র মহাশয় অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন এবং এডুকেশন গেজেটে প্রকাশ করেন যে বিদ্যাসাগর দেশহিতকর কার্য্যে যথেষ্ট ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। অতএব তাঁহার বন্ধুবান্ধবের কর্ত্তব্য যে, সকলে কিছু কিছু সাহায্য করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্লেশে ঋণ দায় হইতে পরিত্রাণ পান। যাঁহার সাহায্য করিবার ইচ্ছা হইবে, তিনি এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক প্যারীবাবুর নিকট প্রেরণ করিবেন, ইহা প্রকাশ করায় অল্প দিনের মধ্যেই যথেষ্ট টাকা প্যারীবাবুর নিকট জমা হইল। ঐ সময় দাদা (বিদ্যাসাগর) বাটী হইতে কলিকাতা আইসেন। তিনি এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পত্রের দ্বারা সম্বাদপত্রে প্রকাশ করেন যে, হে বন্ধুগণ, তোমরা আমায় রক্ষা কর, আমি কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিব না। যিনি যাহা আমার উদ্দেশে প্যারীবাবুর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি তাহা অবিলম্বে ফেরৎ লইবেন। আমার ঋণ আমিই পরিশোধ করিব। আমার ঋণের জন্য তোমাদিগকে কোন চিন্তা করিতে হইবে না। পূর্ব্বাপেক্ষা আমার ঋণ অনেক কমিয়াছে, যাহা অবশিষ্ট আছে, আমিই শোধ করিতে পারিব।" (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত, কলকাতা, ১৮৯১, পৃ. ২০২-০৩।)

has been so much mixed up with me personally that I must protest against the move under notice, and request those gentlemen who have initiated it to desist in their efforts." [২০]

মধুসূদন স্মৃতিরত্ন বিদ্যাসাগরের পরম বন্ধু। তিনি একদিন বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা বিদ্যাসাগর, দেশে এত লোক থাকতে তুমি কেন একাজে একা এগোলে?

বিদ্যাসাগর বললেন—যখন আরম্ভ করেছিলাম তখন কি আর একা ছিলাম। অনেকে মিলে-মিশে একাজে হাত দিয়েছিলাম, কিন্তু যারা মায়ের ব্যাটা তারা চুপে-চুপে ঘরে গেল, মায়ের ছেলে মায়ের কোলে গেল, আর আমি বাপের ব্যাটা কাজে-কাজেই ধরা পড়লাম।[২১]

মনে রাখা দরকার, আপন উপার্জন থেকে বিদ্যাসাগর সব ঋণ পরিশোধ করে গেছেন।

বিধবা-বিবাহ নিশ্চয়ই কোনো হাসিঠাট্টার বিষয় নয়। অন্তত বিদ্যাসাগরের পক্ষে নয়। কিন্তু খাশ বিধবা-বিবাহের আসরে বসেও বিদ্যাসাগর বিধবা ও বিবাহ সম্পর্কে রঙ্গ করতে পেরেছেন। বিদ্যাসাগর বলেই পেরেছেন।

এক বিধবা-বিবাহের নেমন্তন্নে গিয়েছেন বিদ্যাসাগর। সেখানে একজন বন্ধুর সাত-আট বছরের একটি মেয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করল।

বিদ্যাসাগর বললেন—বেঁচে থাকো মা। বিয়ে হোক, বিধবা হও, আমি আবার বিয়ে দি।

উপস্থিত সকলে দরাজ গলায় হেসে উঠলেন।

বিদ্যাসাগর হাসতে-হাসতে বললেন—আরে, আমার বন্ধুদের মেয়েরা বিধবা না হলে আমি বিয়ে দেব কার?[২২]

১২৭৭ সালের শ্রাবণের 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'হিন্দু বিধবা' নামক একটি রচনা থেকে কিয়দংশ তুলে দিচ্ছি :

"বিধবা কুলহিতৈষী পণ্ডিতবর বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাগণের বিবাহের জন্য কায়মন ও অর্থ দিয়া যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ফল দ্বারা আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান আচার ব্যবহার প্রণালী থাকিতে ইহা সফল হইবার আশা নাই। সাধারণ লোকে যুক্তিও বুঝে না, শাস্ত্রও বুঝে না, দেশাচার ও মোটামুটি একটা সংস্কার ধরিয়া কার্য্য করে। তাহারা বিধবার বিবাহ শুনিলে মহাপাপ বলিয়া বিজাতীয় ঘৃণা প্রদর্শন করে। এ প্রকারে বিবাহিত দম্পতি সাধারণের চক্ষুশূল, বিদ্বেষ ও বিদ্রূপের পাত্র হইয়া কি প্রকারে সমাজে বাস করিতে পারে?..."

শোনা গেল বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিধবা-বিবাহ করবেন।

১২৭৭ সালের ২৪-আষাঢ় শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন একখানা চিঠিতে বিদ্যাসাগরকে লিখেছেন : "কৃষ্ণনগরের কন্যা ভবসুন্দরীকে গত রবিবার কলিকাতা পাঠাইয়াছি বোধকরি তাহারা পঁহুছিয়া থাকিবেন। পরম্পরায় শুনিতেছি নারায়ণ বাবাজীউ কৃষ্ণনগরের কন্যা ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিবেন, ইহা আমি বিশেষরূপ অবগত নহি। আমি কন্যাকে মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছি মহাশয় কর্ত্তা আপনি কন্যাকে যে পাত্রে দিবেন তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই আর নারায়ণের মাতা আমাকে বৃথা দোষ দেন, নারায়ণ ছেলে মানুষ নয় যে আমি ভুলাইয়াছি। কৃষ্ণনগরের কন্যার বিষয় মহাশয়ের যেরূপ অভিলাষ হয়

তাহাই করিবেন তদ্বিষয়ে আমার কোন কথা বলিবার নাই যদি নারায়ণের বিবাহ হয় তাহা হইলে জননী দেবীকে যেন পত্র পাঠাইয়া লইয়া যান জননী দেবীর বিধবাবিবাহে বিশেষ যত্ন আছে।"[২৩]

কেউ-কেউ বলত, পরের বিধবা মেয়ের বিয়ে দিয়ে পরের ছেলের জাতি মজিয়ে সমাজ-সংস্কার করা সহজ কাজ, পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে বিদ্যাসাগর নাম কিনছেন। কিন্তু সে-অভিযোগের উপায় বুঝি আর থাকে না। জানাজানি হয়ে গেছে বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিধবা-বিবাহ করবেন।

১২৭৭ সালের ২১-শ্রাবণ শম্ভুচন্দ্র আরেকখানা চিঠিতে বিদ্যাসাগরকে লিখেছেন "...নারায়ণ বাবাজীউ বিধবা বিবাহ করিবেন দেশে প্রচার হইয়াছে এই নিমিত্ত আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও কুটুম্বগণ আমাকে বিশেষ অনুরোধ করায় মহাশয়কে লিখিতেছি। ইহারা বলেন আরো ২।৪ বৎসর নারায়ণ বিধবা-বিবাহ করিতে ক্ষান্ত থাকুক, পরে যদি বিধবাবিবাহ করাই শ্রেয়ঃকল্প হয় তাহা হইলে ৭।৮ বৎসরের অর্থাৎ অক্ষত যোনি কন্যার সহিত বিবাহ হইলে ভাল দেখায় ও শাস্ত্রসম্মত হয়। আর ইহারা আমাকে বলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় অপরের বিবাহ দিউন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, নারায়ণের বিধবা-বিবাহ দিলে আমরা আর তোমাদের সহিত আহার ব্যবহার করিতে পারি এমত বোধ হয় না কারণ তোমাদের সহিত আমরা আহার ব্যবহার করিলে সমাজে রহিত হইব আর নানা গোলযোগ উপস্থিত হইবে অর্থাৎ আমাদের পুত্র কন্যার বিবাহ হওয়া দুষ্কর হইবে এই কারণেই নারায়ণের বিবাহ দিতে ক্ষান্ত হইতে বলিতেছি এতাবৎকাল মহাশয়দের অনুগত ও আশ্রিত থাকিয়া অতঃপর আমাদের কি দশা ঘটিবে স্থানান্তরে যাইলে আমাদিগকে কেহ হুঁকো দিবে না ও উপহাস করিবেক ইহারা নারায়ণকে ক্ষান্ত করিবার জন্য আমাকে কলিকাতা যাইতে বলেন আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম অগ্রে অগ্রজ মহাশয়কে পত্র লিখি তিনি যেরূপ আদেশ করেন পরে আপনাদিগকে জানাইব এমত স্থলে যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন ও নারায়ণ বাবাজীউকে আমার প্রণয় সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বাদ জানাইবেন...।"[২৪]

আত্মীয়-কুটুম্বের ভয়ে বিদ্যাসাগর কি নিরস্ত হবেন? অসম্ভব কথা।

১২৭৭ সালের ২৭-শ্রাবণ নারায়ণচন্দ্র বিধবা-বিবাহ করলেন। পাত্রীর নাম ভবসুন্দরী। বিবাহ হল কালীচরণ ঘোষের বাড়িতে।[২৫]

বিবাহরাত্রে বিদ্যাসাগরের কোনো আত্মীয় স্ত্রীলোক বরকন্যা বরণ করতে রাজি হলেন না। তারানাথ তর্কবাচস্পতি তখন বাড়িতে গিয়ে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে এলেন; তারানাথের স্ত্রী বর-কন্যা বরণ করলেন।[২৬]

১২৭৭ সালের ৩১-শ্রাবণ বিদ্যাসাগর শম্ভুচন্দ্রকে একখানা চিঠি লিখেছেন। অসামান্য চিঠি। আদ্যন্ত উদ্ধার করি :

"শ্রীশ্রীহরিঃ।
শরণং।

শুভাশিষঃ সন্তু—

২৭শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার নারায়ণ ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে। এই সম্বাদ মাতৃদেবী প্রভৃতিকে জানাইবে।

ইতি পূর্ব্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিধবাবিবাহ করিলে আমাদের কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারায়ণের বিবাহ

নিবারণ করা আবশ্যক। এবিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারায়ণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে; আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই। যখন শুনিলাম সে বিধবাবিবাহ করা স্থির করিয়াছে এবং কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা আমার পক্ষে কোনও মতেই উচিত কর্ম্ম হইত না। আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক তাহার পথ করিয়াছে। বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। এজন্মে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই। এবিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা। কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবা-বিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে, আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক হইবে, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না। অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে সমাজের ভয়ে বা অন্য কোন কারণে নারায়ণের সহিত আহার ব্যবহার করিতে যাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবেক, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন, সে জন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেক এরূপ বোধ হয় না এবং আমিও তজ্জন্য বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইব না। আমার বিবেচনায় এরূপ বিষয়ে সকলেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ, অন্যদীয় ইচ্ছার অনুবর্ত্তী বা অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া চলা কাহারও উচিত নহে। ইতি ৩১শে শ্রাবণ।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।”[২৭]

১৮৭০ সালের ১২-সেপ্টেম্বরের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত একখানা প্রেরিত-পত্র উদ্ধার করি: “সম্পাদক মহাশয়! আমরা জনশ্রুতিতে জানিতেছি যে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বীয়পুত্র নারায়ণের বিধবার সহিত বিবাহ দিয়াছেন। মহাশয় এখনত সকলের ভ্রম ঘুচিয়া গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয় অবলা বিধবাদের জন্য যত্নের একশেষ করিলেন। সম্পাদক মহাশয়! আমাদের পিতা মাতার হৃদয় কি পাষাণ নির্ম্মিত? দয়ার লেশ মাত্র নাই? জগদীশ্বর এমন কঠিন বংশের লোপ করেন নাই কেন? আমরা এতদিন মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছিলাম যে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং প্রবৃত্ত হন নাই, এখন ত আর মন প্রবোধ মানে না। ভাল আমরা ব্যগ্রতা পূর্ব্বক বিলাপ বাক্যে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশের প্রধান মিত্র বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ মিত্র যিনি হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন, তিনি চেষ্টা করিলে কি আমাদের দেশের বিধবাঙ্গনাদের কিছু উপকার হইতে পারে না? দ্বারি বাবু জজ হওয়াতে আমরা মনে করিয়াছিলাম আমাদের দেশে ত দ্বিতীয় আর এক জন বিদ্যাসাগর

হইলেন। কিন্তু বাবু হতভাগ্যদের পক্ষে কিছুই করিলেন না। বাবুর স্ত্রী-বিয়োগ হইলে দুইবার বিবাহ করিলেন ছয়মাস অতীত হইল না। জজ বাবুর সন্তান সন্ততিও বর্ত্তমান। আমরা যে আদৌ পতি কেমন তাহা জানিলাম না। বাবু কি আমাদিগের দুঃখ একবারও অনুভব করিয়া দেখিবেন না?

শ্রীমতী শিবসুন্দরী দেবী
শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবী
শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী
শ্রীমতী ভবসুন্দরী দেবী
শ্রীমতী মেঘমালা দেবী
শ্রীমতী রাজকুমারী দাসী"

৪ঠা ভাদ্র ১২৭৭।
আমতার নিকট বাসস্থান

বিধবা-বিবাহ ব্যাপারেও বিদ্যাসাগর প্রবঞ্চিত হয়েছেন। বিধবা-বিবাহের নামে কেউ-কেউ বহুবিবাহ করেছেন, একের পর আরেক বিধবাকে বিবাহ করেছেন। আগে বিদ্যাসাগর কল্পনাও করতে পারেননি যে এমন কান্ড কেউ করতে পারেন।

পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর অতএব কোনো-কোনো বিধবা-বিবাহে একখানা অঙ্গীকারপত্র লিখিয়ে নিতেন। একখানা অঙ্গীকারপত্রের অংশবিশেষ উদ্ধার করি : "বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ও আইনসঙ্গত কর্ম্ম জানিয়া আমি স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে তোমার পাণিগ্রহণ করিলাম, অদ্যাবধি আমরা পরস্পর দাম্পত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলাম। অর্থাৎ তুমি আমার পত্নী হইলে আমি তোমার পতি হইলাম, আমি ধর্ম্মপ্রমাণ প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি প্রকৃতরূপে পতিধর্ম্ম পালন করিব, অর্থাৎ তোমায় যাবজ্জীবন সাধ্যানুসারে সুখে ও সচ্ছন্দে রাখিব। তোমার প্রতি কখনও অযত্ন বা অনাদর প্রদর্শন করিব না, আর ইহাও অঙ্গীকার করিতেছি, তোমার জীবদ্দশায় আমি আর বিবাহ করিব না। যদি দুর্ব্বুদ্ধির অধীন বা অন্যদীয় অসৎ পরামর্শের বশবর্ত্তী হইয়া অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ তোমার জীবদ্দশায় ভার্য্যান্তর পরিগ্রহ করি, তাহা হইলে তোমাকে আধিবেদনিক স্বরূপ এক সহস্র টাকা দিব। আর যদি আমি পুনরায় বিবাহ করাতে তুমি অসন্তুষ্ট বা অন্যবিধ অন্যায় আচরণ দর্শনে বিরক্ত হইয়া আমার সহবাসে থাকিতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে তুমি স্থানান্তরে থাকিতে পারিবে। তোমার গ্রাসাচ্ছদনাদির ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত আমি তোমাকে মাসিক নিয়মে প্রতি মাসের আরম্ভে ১০৲ টাকা করিয়া দিব।...আমি অবর্ত্তমানে তুমি ও তোমার পুত্র কন্যারা প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে আমার পৈতৃক ও স্বার্জ্জিত যাবতীয় বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে তাহাতে কেহ প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। আর যদি আমি তোমাকে বা তোমার পুত্র কন্যাদিগকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে বিনিয়োগ পত্রাদির দ্বারায় আমার বিষয়ের অন্য কোন ব্যবস্থা করি, তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবেক। এতদর্থে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, সুস্থ শরীরে ও সচ্ছন্দমনে এই এক্‌রার-পত্র লিখিয়া দিলাম।"

একটাকার ষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা এই অঙ্গীকারপত্রে, দেখা যাচ্ছে, চারজন সম্ভ্রান্ত লোকের স্বাক্ষর আছে।[২৮]

প্রথমদিকে বিধবা-বিবাহ বিষয়ে যে উৎসাহ দেখা গিয়েছিল ক্রমশ তা স্তিমিত হয়ে এসেছে। বিধবা-বিবাহ বিষয়ে শিক্ষিত যুবকদের ঔদাসীন্য ও শৈথিল্য দেখে কেউ-কেউ এককালে আক্ষেপ করেছেন।

১২৮৩ সালের শ্রাবণের 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'বিধবা বিবাহ' নামক একটি রচনার অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি :

"বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব যখন প্রথম বঙ্গসমাজে অবতারিত হয়, তখন অনেক শিক্ষিত যুবক সাহসী হইয়া বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। দুই একজন বিবাহও করিয়াছিলেন। তখন বিধবা কন্যা পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। তখন জনক জননী কন্যার বিবাহ দিতে অগ্রসর ছিলেন না। তখন তাহাদিগের এ সংস্কারে তেমন আস্থা ছিল না। তখন বিধবাগণ নিজেই তত প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু আজি দশাধিক বৎসরে, দশ শত বৎসরের কাজ হইয়া গিয়াছে। লোকের প্রবৃত্তি ও ভাব অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দুঃখ ও প্রয়োজন কুসংস্কারকে দূরীকৃত করিয়াছে। আজি বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে সমাজ ঠিক বিপরীত ভাবে অবস্থিত। পূর্ব্বে কন্যা প্রস্তুত ছিল না, বর প্রস্তুত; এখন কন্যা অগ্রসারিণী, বর পশ্চাৎগামী হইতেছেন।...

...শিক্ষিত যুবকগণকে আর একবার উত্তেজন বাক্যে সম্বোধন করিতেছি, কেন তাহারা বিধবা বিবাহ বিষয়ে এত উদাসীন ও শিথিল যত্ন হইলেন? তাঁহারা নিঃসহায়া অবলা বিধবাগণের জন্য কি দুঃখিত নহেন? তাহাদিগের কি কর্ত্তব্য নয় সেই দুঃখ মোচন করেন? তবে তাঁহাদিগের সুশিক্ষার কি ফল হইল? তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া এ বিষয়ে পুনরায় উদ্যোগী হউন, অবশ্য কৃতকার্য্য হইবেন। সমাজ তাঁহাদিগের দ্বারা যদি উন্নত না হইল, তবে আর কাহাদিগের নিকট হইতে সে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? সকলে দৃঢ়ব্রত হইয়া আর একবার প্রাণপণ চেষ্টায় সমাজের উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হউন, দেখিবেন এক্ষণে পথ পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। কারণ আমরা দেখিয়া আসিতেছি অধুনা দশ বৎসরে দশশত বৎসরের কাজ হইয়া যাইতেছে।"

ছোটোলাট স্যর রিচার্ড টেম্পলের আমলে বিদ্যাসাগর গবর্নমেণ্টের কাছ থেকে একখানা সম্মানপত্র পেয়েছেন। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের নেতা বিদ্যাসাগর, এই নেতার আন্তরিকতায় গবর্নমেণ্ট নিঃসন্দেহ; ভারতবর্ষের প্রগতিশীল সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবেও বিদ্যাসাগরের মর্যাদা স্বীকার করেছে গবর্নমেণ্ট। তাই এই মানপত্র।

জীবনের শেষপর্বেও বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ বিষয়ে আপন কল্যাণহস্ত প্রসারিত রেখেছেন। ১৮৯০ সালের মার্চ মাসে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' লিখেছে : "শ্রীহট্টে বালবিধবাদিগের বিবাহ সম্পাদনার্থ এক সভা হইয়াছে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।..."

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই বিধবা-বিবাহ বন্ধ হয়ে যায়নি। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর প্রায় এক যুগ পরে ১৩১২ সালের বৈশাখে 'ভারতী' মন্তব্য করেছে : "অনেকের ধারণা, বিদ্যাসাগর-প্রবর্ত্তিত বিধবাবিবাহ শুধু বিধিবদ্ধ হইয়া আছে, কার্য্যতঃ হিন্দুসমাজ এই সংস্কারের সঙ্গে কোনরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই। বিধবাবিবাহ প্রকৃতপক্ষে হিন্দুসমাজে ক্রমশঃ শক্তি-সঞ্চয় করিয়া পুষ্টিলাভ করিতেছে।"

মন্তব্যসহ গত সাড়ে তিন বছরের বিধবা-বিবাহের একটি তালিকাও আছে। তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে ওই সাড়ে তিন বছরে সাকুল্যে একাশিটি বিধবা-বিবাহ হয়েছে। বলা দরকার, এই তালিকাটি সর্বভারতীয়। "এই তালিকার সকল বিবাহগুলিই স্বজাতি ও স্ববর্ণের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।"

বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন, বিদ্যাসাগরের বিবেচনায়, তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান

সৎকর্ম। কিন্তু কেবলমাত্র এই সৎকর্মের জন্যই কি বিদ্যাসাগর অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন?

না।

১৮৯১ সালের ২৪-আগস্ট 'ইণ্ডিয়ান নেশন' যথার্থ লিখেছে :

"Vidyasagar will be remembered more for his charity, his educational work, his literary work, and his reforming spirit, than for the single legislative measure he succeeded in getting passed."

সুহৃদ সমিতির কথা আগেই বলা হয়েছে। সুহৃদ সমিতির দু-জন সম্পাদক : কিশোরীচাঁদ মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত। ১৮৫৫ সালের গোড়ার দিকে সুহৃদ সমিতি গবর্নমেণ্টের কাছে বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আবেদন করেছে।[১] ১৮৭১ সালে বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "প্রথমতঃ, ১৬ বৎসর পূর্ব্বে, শ্রীযুত বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে, বন্ধুবর্গসমবায়নামক সভা হইতে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজে এক আবেদনপত্র প্রদত্ত হয়। বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কার্য্য, তাহা রহিত হইলে হিন্দুদিগের ধর্ম্মলোপ হইবেক, অতএব এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে, এই মর্ম্মে প্রতিকূল পক্ষ হইতেও এক আবেদনপত্র প্রদত্ত হইয়াছিল।"[২]

১৮৫৫ সালের ২৭-ডিসেম্বর বর্ধমানের মহারাজা গবর্নমেণ্টের কাছে বহুবিবাহ নিরোধক আইন প্রণয়নের প্রার্থনা জানিয়ে আবেদন করেছেন।[৩]*

১৮৫৫ সালের ৩১-ডিসেম্বর 'সমাচার সুধাবর্ষণ' লিখেছে : "শ্রীযুক্ত মান্যবর প্রসন্নকুমার ঠাকুর গবর্ণমেণ্টে এক দরখাস্ত করিয়াছেন তাহার আশয় এই যে ভারতবর্ষি মনুষ্যদিগের মধ্যে কুলিন ব্রাহ্মণ মহাশএরা এককশত বিবাহ করিয়া থাকেন এবং সেই এক ব্যক্তি মৃত হইলে তাঁহার সমুদয় ব্রাহ্মণী বিধবা হইয়া সংসারিক সুখ শাস্ত্রানুসারে কদাচ ভোগ করিতে পারেন নাই এতন্নিমিত্তে অনেকে ও ধর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক ব্যভিচারিণী হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী হন অতএব কোন দেশে কুলিন ব্রাহ্মণ অথবা অন্য জাতি কেহ এক স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয় বিবাহ করিতে না পারেন কিন্তু স্ত্রী মৃতে বিবাহ করিতে পারিবেন এতদ্বিধায়ে পার্লিয়ামেণ্ট হইতে আইন প্রকাশ হয়...।"

সেসময়ে বহুবিবাহ নিরোধক আইন প্রণয়নের জন্য অনেকেই গবর্নমেণ্টের কাছে আবেদন করেছেন : নদীয়ার রাজা, দিনাজপুরের রাজা এবং কলকাতা, হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর, যশোহর, ঢাকা, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, বাঁকুড়া, দিনাজপুর এবং ময়মনসিংহের বহু হিন্দু।

ঢাকার জমিদার রাজমোহন রায় গবর্নমেণ্টের কাছে বহুবিবাহ নিরোধক আইন প্রণয়নের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। ১৮৫৬ সালের ১২-ফেব্রুআরি অনুরূপ আরেকখানা আবেদনপত্র প্রেরিত হয়েছে। এই সমস্ত আবেদনপত্রের স্বাক্ষরসংখ্যা ন-হাজার।[৪]

আলোচ্য বিষয়ে রমাপ্রসাদ রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৭১ সালে বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "লোকান্তরবাসী সুপ্রসিদ্ধ বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়, এই সময়ে, এই কুৎসিত প্রথার নিবারণ বিষয়ে যেরূপ যত্নবান

---

* ১৮৬৬ সালের ৫-এপ্রিল বেঙ্গল গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারি একখানা চিঠিতে ভারত-গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারিকে লিখেছেন :

"This petition of the Maharaja's. . . was followed by no less than 127 others of the same tenor, very numerously signed, from all parts of Bengal, and one from Benares. . ." (Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal during May 1866, General Department, No. 76, p. 49)

হইয়াছিলেন, এবং নিরতিশয় উৎসাহসহকারে অশেষপ্রকারে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়। ব্যবস্থাপক সমাজ বহুবিবাহনিবারণী ব্যবস্থা বিধিবন্ধ করিবেন, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ আশ্বাস জন্মিয়াছিল। কিন্তু, এই হতভাগ্য দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে, সেই সময়ে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল। রাজপুরুষেরা, বিদ্রোহনিবারণবিষয়ে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত হইলেন; বহুবিবাহনিবারণবিষয়ে আর তাঁহাদের মনোযোগ দিবার অবকাশ রহিল না।"[৫]

রমাপ্রসাদ রায় বহুবিবাহ নিবারক আইনের জন্য একটি খসড়া বিলও রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে চেষ্টা করেও সেই খসড়া বিল সংগ্রহ করা যায়নি।

"Endeavour has been made to obtain a copy of Babu Ramaprasad's Bill, but without success."[৬]

১৭৭৭ শকের চৈত্রে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'বহুবিবাহ' নামক একটি রচনায় বহুবিবাহের মতো ভয়ানক কুপদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। রচনাটির শেষাংশ তুলে দিচ্ছি: "এমত ভয়ানক কুপদ্ধতি এই দণ্ডেই দেশ হইতে দূর করা বিধেয় কি না? রাজনিয়ম রাজদণ্ড প্রভৃতি এ কুপদ্ধতি নিবারণ করিবার অনেকানেক উপায় আছে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা নিবারিত হইলে আমাদিগের দেশের আর কি মহত্ত্ব রহিল এবং দেশস্থ লোকেরই বা কি মুখ উজ্জ্বল হইল? যাহা কোন মতেই যুক্তি সিদ্ধ নহে, কখনই মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে, যে বিষয় কোন অংশেই ভদ্র সমাজের শ্রবণ যোগ্য নহে এবং যাহা প্রচলিত থাকাতে সহস্র সহস্র অনিষ্ট ভিন্ন অন্য কোন ফল নাই এবং রহিত করিলে অশেষ প্রকার উপকার ব্যতীত কোন হানি নাই, তাহাতে কি জন্য আমরা লিপ্ত থাকিয়া বৃথা দুর্নামের ভাগী হই, লোকের নিকট নিন্দনীয় ও ঈশ্বরের নিকট পাপ ভাজন হই ও আপনাদিগের পরমার্থ পথে কণ্টক প্রদান করি। ইহা রহিত করা কিছু বহু আয়াস কি বহুব্যয় সাধ্য নহে, কেবল পরস্পর আপনারা সকলে মনোযোগী হইলেই এইক্ষণে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে। অতএব এক্ষণে দেশস্থ মহাত্মা দিগের সমীপে বিনীতভাবে আমাদিগের এই নিবেদন যে অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে তাঁহারা কিঞ্চিৎ মনোযোগী হউন, আর বিলম্ব করা কোন মতেই শ্রেয় নহে।"

হিন্দুদের বহুবিবাহ বিষয়ে গবর্নমেণ্টের দপ্তরে ১৮৫৫ সালের জুলাই থেকে ১৮৫৭ সালের ফেব্রুআরি পর্যন্ত বিস্তর আবেদনপত্র এসেছে। হিন্দুদের বহুবিবাহ নিরোধক আইন প্রণয়নের পক্ষে বহু আবেদনপত্র এসেছে; বিরুদ্ধে রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে কেবলমাত্র ১৬৩৮ জনের স্বাক্ষরিত একখানা আবেদনপত্র।

"The Petitions, in favor of a Law on the subject, are not only numerous in themselves, but bear the signatures of the most distinguished Hindoo families from nearly all parts of Bengal. There are Petitions from the Rajahs of Burdwan, of Nuddea, of Dinajpore and of Nattore, as well as from other individuals of distinction and rank. These facts prove that there is a large and intelligent body of Hindoos, who are anxious

that some Legislative provision may be made against the abuse of Hindoo polygamy. . ."[৭]

১৮৬৩ সালের ২৩-আগস্ট রাজা দেবনারায়ণ সিংহ বহুবিবাহের বিরুদ্ধে গবর্নমেণ্টের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন। আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবনারায়ণ বহুবিবাহ নিরোধক একটি খসড়া বিলও দাখিল করেছেন।[৮]

১৮৭১ সালে বিদ্যাসাগর লিখেছেন: "বারাণসীনিবাসী অধুনা লোকান্তরবাসী রাজা দেবনারায়ণ সিংহ মহোদয় বহুবিবাহ নিবারণবিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী ও উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই সময়ে, উদারচরিত রাজা-বাহাদুর ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজের সভ্য ছিলেন। তিনি নিজে সমাজে এ বিষয়ের উত্থাপন করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। তদনুসারে তদ্বিষয়ক উদ্যোগও হইতেছিল। কিন্তু, আক্ষেপের বিষয় এই, তাঁহার ব্যবস্থাপক সমাজে উপবেশন করিবার সময় অতীত হইয়া গেল; সুতরাং তথায় তাঁহার অভিপ্রেত বিষয়ের উত্থাপন করিবার সুযোগ রহিল না।"[৯]

কলকাতাস্থিত ৪৮ নম্বর নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রিট থেকে প্রাণনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৮৬৩ সালের ১-অক্টোবর, বহুবিবাহ নিরোধক আইন প্রণয়নের পক্ষে বহুজনের স্বাক্ষরিত একখানা আবেদনপত্র গবর্নমেণ্টের কাছে পাঠিয়েছেন। উক্ত আবেদনপত্রে প্রাণনাথ লিখেছেন:

"Some years ago a similar Petition was laid before the old Legislative Council, but, owing to the horrors of the Sepoy insurrection, which immediately after distracted the country, it was not made the subject of consideration." [১০]

অতঃপর বহুবিবাহ নিরোধক আইন প্রণয়নের পক্ষে গবর্নমেণ্টের দপ্তরে প্রেরিত আরেকখানা আবেদনপত্র দেখা যাচ্ছে। উক্ত আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছেন দুর্গাচরণ নন্দী, ভগবতীচরণ মল্লিক, গঙ্গানারায়ণ মল্লিক এবং আরো প্রায় ১৫৮০ জন বাঙালী হিন্দু।[১১]

হিন্দুদের বহুবিবাহ নিরোধক আইন প্রণয়নের বিপক্ষে গবর্নমেণ্টের কাছে আবেদন করেছেন রাজা রাধাকান্ত দেব এবং আরো অনেকে। আবেদনপত্রের তারিখ: ১-জানুআরি, ১৮৬৬ সাল। এই আবেদনপত্রের শেষাংশের কয়েকটি পংক্তি:

"That, whatever might be the supposed evils of Kulin polygamy, your petitioners apprehend your Hon'ble Council cannot interfere with that subject without legislating on Hindu polygamy in general, nor would it be fair, they submit, to enact a law prohibiting polygamy among the Hindus without, at the same time, abolishing Mahomedan polygamy, so that your Hon'ble Council will have to consider whether polygamy as well amongst the Hindus as the Mahomedans should at once be abolished. . ." [১২]

১৮৬৬ সালের গোড়ার দিকে বর্ধমানের মহারাজা এবং প্রায় ২১,০০০ বাঙালী হিন্দু বহুবিবাহ নিরোধক আইন প্রণয়নের জন্য গবর্নমেণ্টের কাছে আবেদন করেছেন।[১৩]

১৮৫৫ সালের ২৭-ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ রহিত করার জন্য গবর্নমেণ্টের কাছে আবেদনপত্র দাখিল করেছেন।

একটা ঘটনা আছে।

বিদ্যাসাগর তখন বীরসিংহে।

দুপুরবেলা খেতে গিয়েছেন বাড়ির মধ্যে, দেখলেন দুজন অচেনা স্ত্রীলোক বসে আছেন। একজনের বয়স প্রায় ষাট বছর, আরেকজনের আঠারো-ঊনিশ বছর।

বিদ্যাসাগর মাকে জিজ্ঞেস করলেন—মা! এঁরা কে? এখানে বসে আছেন কেন?

বিদ্যাসাগরের মা বললেন—এঁরা মা আর মেয়ে। তোমার বাল্যকালের গুরুমশায়ের প্রথমা স্ত্রী আর তাঁর মেয়ে। তোমাকে এঁদের দুঃখের কথা বলার জন্য এঁরা এখানে বসে আছেন।

বাল্যকালের গুরুমশায়কে বিদ্যাসাগর আট টাকা মাসহারা দেন। তাছাড়া বীরসিংহে একটা চাকরি দিয়েছেন তাঁকে।

গুরুমশায় ভঙ্গ কুলীন। পাঁচ-ছটি বিয়ে করেছেন। কিন্তু কোনো স্ত্রীকেই গুরুমশায় বাড়িতে এনে রাখতে পারেন না। গুরুমশায়ের বাড়িতে থাকেন তাঁর দুই বোন আর ভাগ্নে-ভাগ্নীরা। যা উপার্জ্জন করেন গুরুমশায়, সবই দুবোনের হাতে দেন। দু-বোনই অত্যন্ত দুর্বৃত্তা, প্রখরা। কোনো স্ত্রীকে যদি গুরুমশায় কখনো নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন, বোনেরা তার জিনিসপত্র রেখে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। বোনদের ভয় করেন গুরুমশায়। নিজে অত্যন্ত ভদ্রলোক বলে তিনি কোনো বোনকে কখনো সাহস করে কিছু বলতে পারেন না।

গুরুমশায়ের প্রথমা স্ত্রী আর তাঁর মেয়ে এসেছেন বিদ্যাসাগরের কাছে। দুঃখের কথা বলতে এসেছেন।

মেয়েটির বিয়ে হয়েছে। কুলীনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। কিন্তু সেই কুলীন তো এই একটিমাত্র বিয়ে করেনি। প্রায় চল্লিশটি বিয়ে করেছে। যে শ্বশুরবাড়ি থেকে খোরাকির টাকা পাওয়া যায়, কেবলমাত্র সেই শ্বশুরের মেয়েকেই ওই জামাই নিজের বাড়িতে রাখে। এঁদের কাছ থেকে কণামাত্র পাবার আশা নেই, অতএব জামাই এই মেয়েটিকে কখনো নিয়ে যায় না। বছরের মধ্যে একবার জামাইকে আনতে গেলে দশটাকা খরচ লাগে। গুরুমশায়ের প্রথমা স্ত্রীর দশটাকা খরচ করার সাধ্য নেই। কুলীন জামাইয়ের বৌকে খেতে-পরতে দেবার কথা নয়। এই মেয়েটি অতএব মায়ের কাছেই থাকে।

বাপের বাড়িতে জীবন কাটাচ্ছেন গুরুমশায়ের স্ত্রী। কষ্টে-সৃষ্টে দিন যাচ্ছে। এঁর ছেলেই সংসার চালায়। এখন ছেলেটি বলছে—আমি তোমাদের দুজনকে ভাত-কাপড় দিতে পারব না।

গুরুমশায়ের প্রথমা স্ত্রী ছেলেকে বলেছেন—বল কি বাবা? তুমি এমন বললে আমরা কোথায় যাই।

ছেলে বলল—তুমি মা। তোমাকে না হয় খেতে দিতে পারি, কিন্তু বোনকে খেতে দিতে পারব না।

—কুলীনের স্ত্রী চিরকাল ভাইয়ের বাড়িতেই থাকে।

—যা হোক, তোমাকেই শুধু খেতে দেব। তুমি ওর বন্দোবস্ত করো।

মা রাগ করে বললেন—তুমি খেতে দেবে না, তবে কি প্রসন্ন বেশ্যা হয়ে যাবে?

মেয়েটির নাম প্রসন্নময়ী।

প্রসন্নময়ীর ভাই বলল—ওর যা ইচ্ছা তাই করুক।

এই নিয়ে মায়ের সঙ্গে ছেলের মনান্তর হল। চতুর্দিক অন্ধকার দেখলেন প্রসন্নময়ীর মা।

শুনলেন, তাঁর মাসতুতো ভাইয়ের বাড়িতে একটি পাচিকার দরকার। প্রসন্নময়ীকে নিয়ে মাসতুতো ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্য, আগেই সে-বাড়িতে পাচিকা বহাল হয়ে গিয়েছে।

মেয়েকে নিয়ে কোথায় যাওয়া যায়, কী করা যায়।

মনে পড়ে গেল, কাছাকাছি একটা গ্রামে চট্টোপাধ্যায়ের আরেক স্ত্রীর বাড়ি। তাঁর ছেলে ব্যবসা-বাণিজ্য করে বিলক্ষণ সংগতি করেছেন। ভালো ছেলে। হয়তো বিমাতাকে সে তাড়িয়ে দেবে না, হয়তো বিমাতার মেয়েকেও সে খেতে-পরতে দেবে।

সেই ছেলেটির কাছে গিয়ে সব বললেন প্রসন্নময়ীর মা, ছেলেটির হাত ধরে কাঁদতে লাগলেন। সত্যিই ভালো ছেলে। বিমাতা বলে সে অযত্ন করল না। বলল—মা, যতদিন তোমরা দুজনে বেঁচে থাকবে ততদিন আমি তোমাদের খেতে-পরতে দেব।

ভালো। সুখের কথা।

কিন্তু ছেলে ভালো হলে কী হবে, বাড়ির মেয়েরা সেরকম নয়। মেয়েরা প্রায়ই বলে—এ আপদ আবার কোত্থেকে এল।

অবস্থা এমন হয়ে উঠল যে প্রসন্নময়ী এবং তার মায়ের আর ও-বাড়িতে থাকা অসম্ভব। সতীনের ছেলেকে সব কথা জানালেন প্রসন্নময়ীর মা।

শুনে ছেলে বলল—আগেই আমি সব জানতে পেরেছি। বাড়ির মেয়েদের শাসন করলে ওরা তোমাদের সঙ্গে আরো খারাপ ব্যবহার করবে। এই অবস্থায় তোমাদের এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো। তোমাদের খাওয়া-পরা বাবদ আমি মাসে-মাসে কিছু-কিছু সাহায্য করতে পারি।

নিরুপায় হয়ে সে-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। এলেন স্বামীর কাছে। বিদ্যাসাগরের বাল্যকালের গুরুমশায় চট্টোপাধ্যায়ের কাছে।

কিন্তু সেখানে কোনো সুবিধা হল না। বোনেদের পরামর্শে চট্টোপাধ্যায় স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন—তোমাদের এখানে থাকা হবে না। তোমাদের খেতে-পরতে দিতে পারব না।

তাহলে কী করে, কোথায় যায়।

গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোক তখন বললেন—তোমরা বিদ্যাসাগরের কাছে যাও। বিদ্যাসাগর কাল বাড়িতে এসেছেন। বিদ্যাসাগর পরম দয়ালু।

তাই এঁরা বিদ্যাসাগরের কাছে এসেছেন। প্রসন্নময়ীর মা বললেন—তুমি আমাদের যা হোক একটা উপায় করে দাও।

মা আর মেয়ের দুঃখে বিদ্যাসাগর কাঁদতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে প্রসন্নময়ীর মাকে আশ্বাস দিয়ে বিদ্যাসাগর গেলেন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। চট্টোপাধ্যায়কে বললেন—আপনার ব্যবহার দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি। কেমন করে আপনি নিজের স্ত্রী আর মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। আপনি ওঁদের বাড়িতে রাখবেন কি না, জানতে ইচ্ছা করি।

বিদ্যাসাগরের ভাবভঙ্গি দেখে গুরুমশায় ভয় পেলেন। বললেন—তুমি এখন বাড়ি যাও। আমি ঘরে দুই বোনের সঙ্গে বুঝে-শুনে পরে তোমার কাছে যাচ্ছি।

সন্ধ্যাবেলা এলেন তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে। বললেন—যদি তুমি ওদের হিসেবে মাসে-মাসে আলাদা কিছু টাকা দিতে রাজি হও, তাহলে আমি ওদের বাড়িতে রাখতে পারি। নইলে আমার বোনেরা ওদের বাড়িতে রাখতে রাজি হবে না।

ওদের হিসেবে মাসে-মাসে চারটাকা করে দিতে রাজি হলেন বিদ্যাসাগর। তিন মাসের জন্য বারোটাকা তক্ষুনি দিয়ে দিলেন। বললেন—এইভাবে তিন-তিন মাসের টাকা অগ্রিম পাবেন। এছাড়া এঁদের কাপড় দেবার ভার আমার উপর রইল।

ওদের ছ-মাসের কাপড় বিদ্যাসাগর গুরুমশায়ের হাতে দিয়ে দিলেন।

স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে গুরুমশাই নিজের বাড়িতে চলে গেলেন। মাসে-মাসে এঁদের জন্য বিদ্যাসাগর আরো চারটাকা দেবেন, গুরুমশায়ের বোনেদের তাই আর কোনো আপত্তি রইল না।

হিসেবমতো টাকা দিয়ে যাচ্ছেন বিদ্যাসাগর। মাসকয়েক পরে কলকাতা থেকে বীরসিংহে এসে প্রসন্নময়ী আর তার মায়ের খোঁজ নিলেন।

ওরা কোথায়?

বোনেদের কথায় গুরুমশায় ওদের তাড়িয়ে দিয়েছেন।

ওদের জন্য মাসে-মাসে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে নতুন মাসহারা পাওয়া যাচ্ছে, তবু ওদের তাড়ানো হল কেন?

গুরুমশায়ের বোনেরা ভেবেছিল: বিদ্যাসাগরের দেওয়া নতুন মাসহারা পুরনো মাসহারার সামিল হয়ে গেছে, কোনো কারণেই আর সেটা বন্ধ হওয়ার নয়।[১৪]

নিরুপায় হয়ে মা-মেয়ে কলকাতায় চলে গেছে।

"কন্যাটি সুশ্রী ও বয়স্থা, বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, এবং জননীর সহিত সচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছে।"[১৫]

উত্তরকালে বিদ্যাসাগর লিখেছেন: "আমি গুরুমহাশয়ের (কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের) প্রিয়শিষ্য ছিলাম।...আমি তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতাম। তাঁহার দেহাত্যয়ের কিছু দিন পূর্ব্বে, একবার মাত্র, তাঁহার উপর আমার ভক্তি বিচলিত হইয়াছিল।"[১৬]

সম্ভবত এই ঘটনাতেই ভক্তি বিচলিত হয়েছিল।

১৮৬৬ সালের ১-ফেব্রুআরি বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ রহিত করার জন্য দ্বিতীয়বার গবর্নমেণ্টের কাছে অবেদনপত্র দাখিল করেছেন। ১৮৬৬ সালের ২৬-মার্চ 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখেছে:

"After the lapse of a decade a fresh agitation has been organized under the auspices of that ardent advocate of social reform, Pundit Eswar Chunder Vidyasagur, for the restriction of the abuses of Koolin Polygamy. . ."

১৮৬৬ সালের ১-ফেব্রুআরি মহারাজা সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর এবং আরো অনেকে গবর্নমেণ্টের কাছে হিন্দুদের বহুবিবাহ নিরোধক আইন প্রণয়নের প্রার্থনা জানিয়ে আবেদন করেছেন। এই আবেদনপত্রখানা লেফটেন্যান্ট-

গবর্নরের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন একটি ডেপুটেশন। চব্বিশজনের ডেপুটেশন। চব্বিশজনের অন্যতম বিদ্যাসাগর। আরেকজন রাজা সত্যশরণ ঘোষাল। তিনি আবেদনপত্রখানা পাঠ করেছেন; এবং বর্ধমানের মহারাজার পক্ষ থেকে বহু-বিবাহবিরোধী একখানা আবেদনপত্র দাখিল করেছেন। ১৮৬৬ সালের ১৯-মার্চের বিকেলবেলার ঘটনা।

সেদিন লেফটেন্যান্ট-গবর্নর বলেছেন :

"I have taken a deep interest in the question since it was first seriously agitated by our late lamented friend, Baboo enactment. Vidyasagar thereupon saw the Maharajahs of petitions on the subject had been presented to the Legislative Council, Sir John Grant promised very shortly to introduce a Bill for the abolition of Hindu polygamy; and he would no doubt have fulfilled his promise, but for the mutiny of the Native Army, which broke out soon afterwards. Three years ago my honorable friend, Raja Deonarayan Singh, of Benares, essayed to bring a Bill for this purpose into the Viceroy's Council, and was, I believe, prevented from doing so only by a suggestion from Lord Elgin that some further expression of public opinion was desirable before having recourse to legislation. . . ." ১৭

১৮৬৬ সালের ২৪-মে ময়মনসিংহ থেকে তিনশো ব্যক্তি গবর্নমেণ্টের কাছে হিন্দুদের বহুবিবাহ নিরোধক আইন প্রণয়নের জন্য আবেদন করেছেন। উক্ত আবেদনপত্রে পণপ্রথা নিবারণের জন্যও গবর্নমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়েছে।১৮

উত্তরকালে রামগোপাল সান্যাল লিখেছেন :

"The Pundit was advised by Cecil Beadon to present a memorial from the Hindus of Bengal in support of a legislative enactment. Vidyasagar thereupon saw the Maharajahs of Burdwan and Krishnaghur and induced them to sign a memorial. The members of the British Indian Association, including the late Babu Joy Kishen Mukerji, the late Rajah Degumber Mitter, the late Rajah Romanath Tagore and others, at first approved of his proposal and encouraged him in every way possible. The memorial was then submitted with the name of His Highness the Maharajah of Burdwan at the top of the signatories. At this, said Vidyasagar to us, the Calcutta Zemindars took offence, and tried secretly to baffle the project. It was after a good deal of correspondence with the Supreme Government, a Commission was appointed to report on this subject. But the representatives of the Calcutta Zemindars on this Commission took a hostile attitude in the matter, and the project fell through. It was for this treachery, said Vidya-

sagar to us, he never crossed the threshold of these Zemindars. [১৯]

১৮৬৬ সালের ৫-এপ্রিল, ১২-জুন ও ৮-আগস্ট বেঙ্গল গবর্নমেণ্ট হিন্দুদের বহুবিবাহ নিরোধক আইন প্রণয়ন সম্পর্কে ভারত-গবর্নমেণ্টকে চিঠি লিখেছে। বিষয়টি ভারত-সরকার, ১৮৬৬ সালের ১৬-আগস্ট, সেক্রেটারি-অফ-স্টেটকে লিখিতভাবে জানিয়েছে। সেক্রেটারি-অফ-স্টেট, ১৮৬৬ সালের ৩১-অক্টোবর, ভারতের গবর্নর-জেনারেলকে লিখেছেন :

"I concur with your Excellency in the opinion that there is not sufficient evidence "that a large majority of even the more enlightened people of the Province" of Bengal "will be found to be heartily against Polygamy, apart from the special abuses practised by the Kulin Brahmins."

I am inclined to think therefore that at present no measure of a legislative character should be taken.

Any legislation having reference to the marriages of natives should, in my opinion, emanate from your Excellency in Council, and no proposal for legislation on that subject, affecting so deeply the feelings both of Hindoos and Mussulmans, should be entertained without the sanction of Her Majesty's Government previously given." [২০]

১৮৬৬ সালের ২২-আগস্টের সরকারী চিঠি থেকে দেখা যাচ্ছে যে সি. পি. হবহাউস, রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, দিগম্বর মিত্র, রমানাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর এবং এইচ. টি. প্রিন্সেপ "appointed to form a Committee to report on the best means of giving practical effect to the wishes of the Government of India on the subject of restricting unlimited polygamy among Hindus in Bengal by legal enactment." [২১]

১৮৬৬ সালের ১৮-সেপ্টেম্বরের একখানা সরকারী চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে যে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও ওই কমিটিতে নিযুক্ত হয়েছেন।[২২]

অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে বিদ্যাসাগর আলোচ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হতে পারলেন না।

১৮৬৭ সালের ২২-জানুআরি বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

"I do not concur in the conclusion come to by the other gentlemen of the Committee. I am of opinion that a Declaratory Law might be passed without interfering with that liberty which Hindoos now by law possess in the matter of marriage." [২৩]

১২৭৭ সালের শ্রাবণে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' লিখেছে :

"এদেশে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের বহুবিবাহ কুপ্রথা এইবার বোধহয় উঠিবে। লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় নামে এক কুলীন ছয় বিবাহ করেন, কৃষ্ণমণি নামে তাঁহার এক স্ত্রী খোরপোষের দাবীতে নালিশ করিয়া মাসিক ১৫ টাকা ডিক্রী পান। জজ নর্ম্মান্ সাহেবের নিকট এই বিষয়ের আপীল হইলে লক্ষ্মীনারায়ণ

বলেন, "হিন্দু শাস্ত্রানুসারে কুলীনকে স্ত্রীর ভরণ পোষণ করিতে হয় না। আমার ছয় ছয় স্ত্রী, আমি কি প্রকারে প্রতিপালন করিব?" জজসাহেব বলিলেন, "তুমি যদি খাওয়াইতে না পারিবে তবে বিবাহ করিলে কেন? এক্ষণে জেলে যাও। প্রত্যহ ।০ আনা করিয়া খোরাকী পাইবে।" দুর্ভাগ্য ব্রাহ্মণকে জেলে যাইতে হইল!"

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "(বিদ্যাসাগর) ১২৭৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে কলিকাতার সন্নিহিত কাশীপুরের গঙ্গাতীরস্থ বাবু হীরালাল শীলের এক ভবনে মাসিক ১৫০্ টাকা ভাড়া দিয়া কয়েক বৎসর অবস্থিত করেন।"[২৪]

বহুবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রথম বই প্রকাশিত হয়েছে ১৮৭১ সালের ১০-আগস্ট। বইখানার নাম: "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার।"

১৮৭১ সালের ১৪-আগস্ট 'সোমপ্রকাশ' লিখেছে:

"বিধাতা হিন্দু সমাজের প্রতি একান্ত বাম। শীঘ্র যে এ সমাজের সৌভাগ্য লাভ হয়, সে সম্ভাবনা নাই। সমাজ সংস্কার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই ঋষি শ্রাদ্ধের কাণ্ড উপস্থিত হয়। ফল যত হউক না হউক, আড়ম্বরের সীমা থাকে না। অগ্রে শাস্ত্র বিচার আরম্ভ হয়; কিন্তু সে বিচার বিচার নয়, ঋষি হত্যা। উভয় পক্ষই ঋষির বচন তুলিয়া আপনার মনোমত তাহার ব্যাখ্যা করিয়া স্বপক্ষ সমর্থন চেষ্টা পান। ঋষিরা কি উভয় পক্ষেরই যাহাতে মনোরথ পূর্ণ হয়, এইরূপ বচন রচনা করিয়া গিয়াছেন? এ কি মকদ্দমাকারিদিগের কালী-ঘাটের স্বস্ত্যয়ন? যাঁহার যথার্থ মকদ্দমা, তিনিও স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিলেন, আর যাহার মকদ্দমা অযথার্থ, তিনিও স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিলেন, এখন কালী কাহার মন রক্ষা করেন? আমরা এত দিন কৌতুক দেখিতেছিলাম, দুই দল পণ্ডিত শাণিতাস্ত্র হস্তে লইয়া রঙ্গ ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এক দল কহিতেছেন, বহুবিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, আর এক দল কহিতেছেন, শাস্ত্রসিদ্ধ। নিষেধবাদী দলই প্রবল। আমরা ভাবিতেছিলাম, এবার আর বহুবিবাহের নিস্তার নাই।...

আমরা এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমাদিগের হস্তে পতিত হইল। উহার মূর্দ্ধস্থানে বহু-বিবাহ বলিয়া লিখিত আছে। আমরা আগ্রহসহকারে উহার পাঠ আরম্ভ করিলাম। বিদ্যাসাগর কুলীনদিগের অত্যাচার ও কুলীন কন্যাদিগের ক্লেশের বিষয় যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা পড়িতে পড়িতে অনেকবার আমাদিগের নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইল।...

প্রস্তাবিত গ্রন্থের অত্যাচার বর্ণনাটীই যে কেবল চমৎকারিণী হইয়াছে এরূপ নহে, বিদ্যাসাগর বহুবিবাহকে শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে যে অংশে শাস্ত্রের বিচার করিয়াছেন, সে অংশটীও অতি মনোহারী হইয়াছে। যিনি ঐ অংশ পাঠ করিয়া বিদ্যাসাগরের প্রতিভা গুণের, তর্ক শক্তির, লিপি নৈপুণ্যের ও লিখন চাতুর্য্যের প্রশংসা না করেন, এরূপ লোক অতি বিরল; কিন্তু আমরা বিস্মিত হইলাম, উল্লিখিত পণ্ডিত দলের ন্যায় বিদ্যাসাগরও বহুবিবাহকে শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত বৃথা বহুল প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাতে ইষ্টলাভ কি?..."

বিদ্যাসাগরের 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' সম্পর্কে ১২৭৮ বঙ্গাব্দে 'রহস্য-সন্দর্ভ' (সপ্তম পর্ব, ৬৭-খণ্ড) লিখেছে:

"শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা চাতুর্য্যাদি বিষয়ে আমাদিগের কিছু বলার প্রয়োজন করে না, যেহেতু সহৃদয় পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা গদ্যের আদি উন্নতিকারক ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লেখক। বর্ত্তমান গ্রন্থে প্রশংসিত মহাশয় কুলীনগণের বহু-বিবাহরূপ কুপ্রথার দোষাদোষ ব্যাখ্যা করিয়া তদবৈধতা ও তন্নিবারণ কর্ত্তব্যতা দর্শাইয়াছেন। এতদগ্রন্থ সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, পাঠকগণ যেন ইহাকে কেবল বহু-বিবাহ নিবারণ করণার্থে প্রদর্শিত কারণ শমষ্টী মাত্র বিবেচনা না করেন। বিদ্যাসাগর মহোদয় "বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কি না" ইত্যভিধেয় যে দুই খণ্ড গ্রন্থ পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছেন তদ্দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যের বিশেষ উন্নতি সিদ্ধ হইয়াছে। আমাদিগের ভাষায় কাব্য অলঙ্কার ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি বিষয়ক রচনার অভাব দেখা যায় না, কিন্তু যথার্থ বৈচারিক রচনার লেশমাত্রও ছিল না। "বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কি না?" ও "বহু-বিবাহ নিবারণ হওয়া উচিত কিনা?" ইত্যাক্ষ গ্রন্থখানিতে বাঙ্গালার সে অপযশ দূরীকৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের রচনা-প্রণালী বিশেষরূপে আলোচনা ও অভ্যাস করিলে এক ব্যক্তি ন্যায়দর্শন পাঠ ব্যতিরেকেও উত্তম বৈচারিক রচনায় পারগ হয়েন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নব নব রচনা দর্শনে কেবল আমরা অভিলাষী নহি বোধ করি বঙ্গলক্ষ্মী তাঁহার নূতন গ্রন্থ নিত্য নিত্য দেখিতে ইচ্ছা করেন।"

'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' থেকে দু-একটি অংশ উদ্ধৃত করি :

"যে সকল হতভাগা কন্যা স্বকৃতভঙ্গ অথবা দুপুরুষিয়া পাত্রে অর্পিত হয়েন, তাঁহারা যাবজ্জীবন পিত্রালয়ে বাস করেন। বিবাহকর্ত্তা মহাপুরুষেরা, কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইয়া, কন্যাকর্ত্তার কুলরক্ষা অথবা বংশের গৌরববৃদ্ধি করেন, এইমাত্র। সিদ্ধান্ত করা আছে, বিবাহকর্ত্তাকে বিবাহিতা স্ত্রীর তত্ত্বাবধানের, অথবা ভরণপোষণের, ভারবহন করিতে হইবেক না। সুতরাং কুলীনমহিলারা, নামমাত্রে বিবাহিতা হইয়া, বিধবা কন্যার ন্যায়, যাবজ্জীবন পিত্রালয়ে কালযাপন করেন। স্বামিসহবাসসৌভাগ্য বিধাতা তাঁহাদের অদৃষ্টে লিখেন নাই; এবং তাঁহারাও সে প্রত্যাশা করেন না। কন্যাপক্ষীয়েরা সবিশেষ চেষ্টা পাইলে, কুলীন জামাতা শ্বশুরালয়ে আসিয়া দুই চারিদিন অবস্থিতি করেন; কিন্তু সেবা ও বিদায়ের ত্রুটি হইলে, এ জন্মে আর শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করেন না।

কোনও কারণে কুলীনমহিলার গর্ভসঞ্চার হইলে, তাহার পরিপাকার্থে, কন্যাপক্ষীয়দিগকে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। প্রথম, সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া, জামাতার আনয়ন। তিনি আসিয়া, দুই এক দিন শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিয়া, প্রস্থান করেন। ঐ গর্ভ তৎসহযোগসম্ভূত বলিয়া পরিগণিত হয়। দ্বিতীয়, জামাতার আনয়নে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে, ব্যভিচার-সহচরী ভ্রূণহত্যাদেবীর আরাধনা। এ অবস্থায়, এতদ্ব্যতিরিক্ত নিস্তারের আর পথ নাই। তৃতীয় উপায় অতি সহজ, অতি নির্দোষ ও সাতিশয় কৌতুকজনক। তাহাতে অর্থব্যয়ও নাই, এবং ভ্রূণহত্যাদেবীর উপাসনাও করিতে হয় না। কন্যার জননী, অথবা বাটীর অপর গৃহিণী, একটি ছেলে কোলে করিয়া, পাড়ায় বেড়াইতে যান, এবং একে একে প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গিয়া, দেখ মা, দেখ বোন, অথবা দেখ্ বাছা, এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া, কথাপ্রসঙ্গে

বলিতে আরম্ভ করেন, অনেক দিনের পর কাল রাত্রিতে জামাই আসিয়াছিলেন; হঠাৎ আসিলেন, রাত্রিকাল, কোথা কি পাব; ভাল করিয়া খাওয়াতে পারি নাই; অনেক বলিলাম, এক বেলা থাকিয়া, খাওয়া দাওয়া করিয়া যাও; তিনি কিছুতেই রহিলেন না; বলিলেন, আজ কোনও মতে থাকিতে পারিব না; সন্ধ্যার পরেই অমুক গ্রামের মজুমদারের বাটীতে একটা বিবাহ করিতে হইবেক; পরে, অমুক দিন, অমুক গ্রামের হালদারদের বাটীতেও বিবাহের কথা আছে, সেখানেও যাইতে হইবেক। যদি সুবিধা হয়, আসিবার সময় এই দিক দিয়া যাইব। এই বলিয়া ভোর ভোর চলিয়া গেলেন। স্বর্ণকে বলিয়াছিলাম, ত্রিপুরা ও কামিনীকে ডাকিয়া আন্, তারা জামায়ের সঙ্গে খানিক আমোদ আহ্লাদ করিবে। একলা যেতে পারিব না বলিয়া, ছুঁড়ী কোনও মতেই এল না। এই বলিয়া, সেই দুই কন্যার দিকে চাহিয়া, বলিলেন, এবার জামাই এলে, মা তোরা যাস্ ইত্যাদি। এইরূপে পাড়ার বাড়ী বাড়ী বেড়াইয়া জামাতার আগমনবার্ত্তা কীর্ত্তন করেন। পরে স্বর্ণমঞ্জরীর গর্ভসঞ্চার প্রচার হইলে, ঐ গর্ভ জামাতৃকৃত বলিয়া পরিপাক পায়।"

"কুলীনভগিনী ও কুলীনভাগিনেয়ীদের বড় দুর্গতি। তাহাদিগকে, পিত্রালয়ে ও মাতুলালয়ে থাকিয়া, পাচিকা ও পরিচারিকা উভয়ের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয়। পিতা যতদিন জীবিত থাকেন, কুলীনমহিলার তত দিন নিতান্ত দুরবস্থা ঘটে না। তদীয় দেহাত্যয়ের পর, ভ্রাতারা সংসারের কর্ত্তা হইলে, তাহারা অতিশয় অপদস্থ হন। প্রখরা ও মুখরা ভ্রাতৃভার্য্যারা তাঁহাদের উপর, যার পর নাই, অত্যাচার করে। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ, রাত্রিতে নিদ্রাগমন, এ উভয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী দীর্ঘ কাল, উৎকট পরিশ্রম সহকারে সংসারের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াও, তাঁহারা সুশীলা ভ্রাতৃভার্য্যাদের নিকট প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন না। তাহারা সর্ব্বদাই তাঁহাদের উপর খড়্গহস্ত। তাঁহাদের অশ্রুপাতের বিশ্রাম নাই বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইতে হয় না। অনেক সময়, লাঞ্ছনা সহ্য করিতে না পারিয়া, প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গিয়া, অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে, তাঁহারা আপন অদৃষ্টের দোষ কীর্ত্তন ও কৌলীন্যপ্রথার গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; এবং পৃথিবীর মধ্যে কোথাও স্থান থাকিলে চলিয়া যাইতাম, আর ও বাড়ীতে মাথা গলাইতাম না, এইরূপ বলিয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া, মনের আক্ষেপ মিটান। উত্তরসাধকের সংযোগ ঘটিলে, অনেকানেক বয়স্থা কুলীনমহিলা ও কুলীনদুহিতা, যন্ত্রণাময় পিত্রালয় ও মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া, বারাঙ্গনাবৃত্তি অবলম্বন করেন।

ফলতঃ, কুলীনমহিলা ও কুলীনতনয়াদিগের যন্ত্রণার পরিসীমা নাই।... পৃথিবীর কোনও প্রদেশে স্ত্রীজাতির ঈদৃশী দুরবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না।... স্বামিগৃহবাস, স্বামিসহবাস, স্বামিদত্ত গ্রাসাচ্ছাদন কুলীনকন্যাদের স্বপ্নের অগোচর।

এ দেশের ভঙ্গকুলীনদের মত পাষণ্ড ও পাতকী ভূমণ্ডলে নাই। তাঁহারা দয়া, ধর্ম্ম, চক্ষুলজ্জা ও লোকলজ্জায় একেবারে বর্জ্জিত। তাঁহাদের চরিত্র অতি বিচিত্র। চরিত্রবিষয়ে তাঁহাদের উপমা দিবার স্থল নাই। তাঁহারাই তাঁহাদের একমাত্র উপমাস্থল।—কোনও অতিপ্রধান ভঙ্গকুলীনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঠাকুরদাদা মহাশয়! আপনি অনেক বিবাহ করিয়াছেন, সকল স্থানে যাওয়া হয় কি। তিনি অম্লানমুখে উত্তর করিলেন, যেখানে

ভিজিট (১) পাই, সেইখানে যাই।—গত দুর্ভিক্ষের সময়, এক জন ভঙ্গকুলীন অনেকগুলি বিবাহ করেন। তিনি লোকের নিকট আস্ফালন করিয়াছিলেন, এই দুর্ভিক্ষে কত লোক অন্নাভাবে মারা পড়িয়াছে, কিন্তু আমি কিছুই টের পাই নাই; বিবাহ করিয়া সচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছি।—গ্রামে বারোয়ারিপূজার উদ্যোগ হইতেছে। পূজার উদ্যোগীরা, এই বিষয়ে চাঁদা দিবার জন্য, কোনও ভঙ্গকুলীনকে পীড়াপীড়ি করাতে, তিনি, চাঁদার টাকা সংগ্রহের জন্য, একটি বিবাহ করিলেন।—বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণের উপযুক্ত অর্থ লইয়া গেলে, কোন ভঙ্গকুলীন, দয়া করিয়া, তাহাকে আপন আবাসে অবস্থিতি করিতে অনুমতি প্রদান করেন; কিন্তু সেই অর্থ নিঃশেষ হইলেই, তাহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।...বহুকাল স্বামীর মুখ দেখেন নাই; তথাপি কোনও ভঙ্গকুলীনের ভার্য্যা ভাগ্যক্রমে গর্ভবতী হইয়াছিলেন। ব্যভিচারিণী কন্যাকে গৃহে রাখিলে, জ্ঞাতিবর্গের নিকট অপদস্থ ও সমাজচ্যুত হইতে হয়, এজন্য, তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা পরামর্শ স্থির হইলে, তাহার হিতৈষী আত্মীয়, এই সর্ব্বনাশ নিবারণের অন্য কোনও উপায় করিতে না পারিয়া, অনেক চেষ্টা করিয়া, তদীয় স্বামীকে আনাইলেন। এই মহাপুরুষ, অর্থলাভে চরিতার্থ হইয়া, সর্ব্বসমক্ষে স্বীকার করিলেন, রত্নমঞ্জরীর গর্ভ আমার সহযোগে সম্ভূত হইয়াছে।”

“বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকাতে, অশেষপ্রকারে হিন্দুসমাজের অনিষ্ট ঘটিতেছে। সহস্র সহস্র বিবাহিতা নারী, যার পর নাই, যন্ত্রণাভোগ করিতেছেন। ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। দেশের লোকের যত্নে ও চেষ্টায় ইহার প্রতিকার হওয়া কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। সম্ভাবনা থাকিলে, তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকিত না।...বস্তুতঃ, রাজশাসন দ্বারা এই নৃশংস প্রথার উচ্ছেদ হইলে, সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল ঘটিবেক, তাহার কোনও হেতু বা সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না।...আমাদের ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের হস্তে দেওয়া উচিত নয়, এ কথা বলা বালকতা প্রদর্শন মাত্র। আমাদের ক্ষমতা কোথায়। ক্ষমতা থাকিলে, ঈদৃশ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকটে যাওয়া কদাচ উচিত ও আবশ্যক হইত না; আমরা নিজেই সমাজের সংশোধনকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম। ইচ্ছা নাই, চেষ্টা নাই, ক্ষমতা নাই, সুতরাং সমাজের দোষসংশোধন করিতে পারিবেন না; কিন্তু তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিলে অপমানবোধ বা সর্ব্বনাশজ্ঞান করিবেন, এরূপ লোকের সংখ্যা, বোধ করি, অধিক নহে; এবং অধিক না হইলেই, দেশের ও সমাজের মঙ্গল।”

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: “বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থে তিনি হুগলী জেলার অন্তর্গত বহুবিবাহকারী কুলীনগণের যে তালিকা দিয়াছেন, তদৃষ্টে দেখা যায় যে, মোট ৮৬ খানি গ্রামের* ১৯৭ জন কুলীন সন্তান সে সময়ে বহু বিবাহ করিয়াছিলেন, ইঁহারা সর্ব্বসমেত ১২৮৮ জন বঙ্গ রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া ইহাদের অধিকাংশকেই চিরদুঃখানলে

১ ডাক্তারেরা চিকিৎসা করিতে গেলে, তাঁহাদিগকে যাহা দিতে হয়, এ দেশের সাধারণ লোকে তাহাকে ভিজিট (visit) বলে।

* অবশ্য এই অনুসন্ধানে যে কোন গ্রাম কিংবা কোন লোক বাদ পড়ে নাই এরূপ বলা যাইতে পারে না।

দগ্ধ করিয়াছেন! হুগলী জেলার অন্তর্গত বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ভদ্রমণ্ডলীর বাসস্থান সুপ্রসিদ্ধ জনাই গ্রামের ৬৪ জন কুলীন মহাশয় ১৬২টী বিবাহ করিয়াছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে যিনি সংখ্যায় অধিক বিবাহ করিয়াছিলেন, সেরূপ দুই মহাত্মার প্রত্যেকের গৃহিণীর সংখ্যা ১০। এতদ্ভিন্ন সমগ্র হুগলী জেলায় বহুবিবাহে বিপন্না স্ত্রীর সংখ্যার তুলনায় দেখা যায় যে, প্রত্যেক মহাশয় গড়ে ১১ টীর অধিক বিবাহ করিয়াছিলেন। আর যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ কৌলীন্য রক্ষা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার বয়স যখন ৫৫ বৎসর তখন তিনি কুঁড়ি গণ্ডা বিবাহ করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন! জানি না তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কালের মধ্যে আর ৮০টী বিবাহ করিতে অবসর পাইয়াছিলেন কি না! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকান্তর্গত তালিকা দৃষ্টে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি বয়সে সর্ব্ব কনিষ্ঠ সে যুবক অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে একাদশে পদার্পণ করিয়াছিল, অপর জন বিশ বৎসরের সময়ে ষোড়শাঙ্গনার পরিচর্য্যায় পরম পরিতুষ্ট। পাঠক মহাশয়, যদি ইহাতেই সন্তুষ্ট হন ভালই, নতুবা বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিক্রমপুর অঞ্চলের বহুবিবাহের যে দুখানি তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে যে বিচিত্র বিবরণ বিবৃত আছে, তাহা পাঠ করিয়া অধিকতর বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। সে বিবরণ এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। আমরা সেই তালিকা হইতে কয়েকটী বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। এই তালিকাভুক্ত ১৭৭খানি গ্রাম ঢাকা, বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত, ঐ সকল গ্রামের বহুবিবাহকারী মহাশয়দের মোট সংখ্যা ৬৫২। ইঁহারা সর্ব্বসমেত ৩৫৮৮টী বঙ্গবালার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং গড়ে প্রত্যেকের হিসাবে ৫॥ সাড়ে পাঁচটী পড়ে। ইঁহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বপেক্ষা অধিক পরিমাণে কৌলীন্য-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে অক্ষয়কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তিনি বরিশাল জেলার অন্তঃপাতী কলসকাটী গ্রাম নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। যে সময়ে উল্লিখিত তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই সময়ে তিনি পঞ্চান্ন বৎসর বয়ঃক্রম কালে ১০৭টী মাত্র প্রাণীর স্বামিত্বে বৃত হইয়াছিলেন!...”[২৫]

তারানাথ তর্কবাচস্পতি লিখেছেন: “সম্প্রতি কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহোদয় বহুবিবাহ বিষয়ক যে একখানি ক্রোড়-পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উপসংহারে লিখিত আছে “অনেকের মুখে শুনিতে পাই, তাঁহারা কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শে, সহায়তায় ও উত্তেজনায় বহুবিবাহবিষয়ক শাস্ত্রসম্মত বিচারপত্র প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সহসা এ বিষয়ে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না।” বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্যের সহিত আমার যে প্রকার চিরপ্রণয়, আত্মীয়তা, ও সম্বন্ধ আছে তাহাতে পরমুখে শ্রবণ মাত্রই উহা প্রচার না করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। এককালে শোনা কথা প্রচার করা বিদ্যাসাগর সদৃশ ব্যক্তির উপযুক্ত ও কর্ত্তব্য হয় না। তিনি কি জানেন না যে তাঁহার কথার মূল্য কত? যাহা হউক বিদ্যাসাগরের হঠকারিতাদর্শনে আমি বিস্মিত ও আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি। ফলতঃ বিদ্যাসাগর মিথ্যাবাদী লোক দ্বারা বঞ্চিত ও মোহিত হইয়াছেন। আমি উক্ত বিষয়ে পরামর্শ, সহায়তা ও উত্তেজনা কিছুই করি নাই। তবে প্রায় একমাস গত হইল, সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা পরিত্যাগ করিবার

কয়েকটী কারণ মধ্যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ইহার প্রমাণ্যার্থে একটী বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছিলাম, যে বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত কিনা, তাহার রহিত করণ বিষয়ে ধর্ম্মসভার হস্তক্ষেপ করা অন্যায় তাহাতেই যদি বিদ্যাসাগরের নিকটে কেহ সহায়তা করা কহিয়া থাকে বলিতে পারি না; কিন্তু...বহুবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত ইহা আমার চিরসিদ্ধান্ত আছে এবং বরাবর কহিয়া আসিতেছি এবং এক্ষণেও কহিতেছি যে, বহুবিবাহ সর্ব্বদেশপ্রচলিত ও সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত ও চির প্রচলিত, তদ্বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতের সহিত আমার মতের ঐক্য না হওয়ায় দুঃখিত হইলাম। তিনি বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনার্থে যেরূপ শাস্ত্রের অভিনব অর্থ ও যুক্তির উদ্ভাবন করিয়াছেন, অবশ্য বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ অর্থ ও যুক্তি শাস্ত্রানুমোদিত বা সংগত বলিয়া বোধ হয় না। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইলেও ভংগকুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে প্রণালীতে উহা সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল এবং কতক পরিমাণে এ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে, তাহা অত্যন্ত ঘৃণাকর লজ্জাকর ও নৃশংস। ইহা বিলক্ষণ আমার অন্তরে জাগরূক আছে এবং উহার নিবারণ হয় ইহাতে আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এবং আছে। অধিক কি এইজন্য ৫।৬ বৎসর গত হইল "তৎকালে উপায়ান্তর নাই বিবেচনা করিয়া সামাজিক বিষয় হইলেও" নিরতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ বিষয়ের নিবারণার্থে আইন প্রস্তুত করিবার জন্য রাজদ্বারে আবেদনপত্রেও স্বাক্ষর করিয়া তদ্বিষয় সম্পাদনার্থে বিশেষ উদ্যোগী ছিলাম; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, বিদ্যাচর্চ্চার প্রভাবে বা যে কারণে হউক ঐ কুৎসিত বহুবিবাহ প্রণালী অনেক পরিমাণে ন্যূন হইয়াছে। আমার বোধ হয় অল্পকাল মধ্যে উহা এককালে অন্তর্হিত হইবে। অতএব তজ্জন্য আর আইনের আবশ্যকতা নাই সকল সময়ে সকল আইন আবশ্যক হয় না। এই নিমিত্তই ব্যবস্থাপক সমাজ হইতে বর্ষে বর্ষে আইন পরিবর্ত্তিত হয়।"[২৬]

১২৭৮ সালের আশ্বিনে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' লিখেছে : "বহু বিবাহ নিবারণের আপত্তিকারীগণের আপত্তি খণ্ডন করিয়া সম্প্রতি সুবিখ্যাত বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। যাঁহারা বহু বিবাহকে শাস্ত্র-সিদ্ধ বলেন, শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা তাঁহাদিগের আপত্তি যে ভ্রমমূলক তাহা সুস্পষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বামাকুলের পরম হিতৈষী বন্ধু। বংগীয় অবলাগণের দুরবস্থা দর্শনে তাঁহার দয়ার্দ্র চিত্ত স্বভাবতঃ ব্যথিত হয়। দুঃখিনী বংগবালাগণের দুঃখ দূর করণে তিনি বহু-কালাবধি শ্রম ও যত্ন করিয়া আসিতেছেন। আহ্লাদের বিষয় এই, এত দিন তাঁহার যে যত্ন ও শ্রম অতি অল্প সংখ্যক লোক আদর করিয়াছেন, এখন অনেক কৃতবিদ্য লোকের নিকট তাহা আদরণীয় হইতেছে। কিন্তু সেই সংগে সংগে দুঃখের বিষয়ও বলিতে হইবে যে তাঁহার পূর্ব্ব সহচর কয়েকটী পণ্ডিত তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন।"

উল্লিখিত পূর্বসহচরদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তারানাথ তর্কবাচস্পতির নাম। গবর্নমেণ্টের কাছে বহুবিবাহ রহিত করার জন্য আবেদন-পত্রে তারানাথ স্বাক্ষর করেছেন অথচ বহুবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের রচনার প্রতিবাদ করেছেন। প্রতিবাদ করে বই লিখেছেন।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি সম্পর্কে আলোচ্য বিষয়ে বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

"তর্কবাচস্পতি মহাশয় কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যালয়ে ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন, কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছেন। তিনি যে ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী নহেন, এবং কখনও রীতিমত ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই, তদীয় পুস্তক তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তৎসমুদয়ই অপসিদ্ধান্ত।"[২৭]

'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাও বহুবিবাহের বিরোধী। কিন্তু আইন করে গবর্নমেণ্ট বহুবিবাহ বন্ধ করুক, এ-প্রস্তাবে 'সোমপ্রকাশে'র সমর্থন নেই, কেননা, সামাজিক বিষয়ে গবর্নমেণ্টের হস্তক্ষেপ, 'সোমপ্রকাশে'র বিবেচনায় অবাঞ্ছনীয়। 'সোমপ্রকাশে'র প্রস্তাব যে বহুবিবাহের উপর ট্যাক্স বসিয়ে গবর্নমেণ্ট কৌশলে বহুবিবাহ বন্ধ করুক।

এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগর, ১৮৭১ সালের ২৩-আগস্ট, 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদককে একখানা চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা প্রকাশিত হয়েছে ১৮৭১ সালের ২৮-আগস্টের 'সোমপ্রকাশে'। চিঠিখানা থেকে অংশবিশেষ তুলে দিচ্ছি :

"রাজবিধি দ্বারা বহুবিবাহ নিবারণ প্রার্থীদের উদ্দেশ্য এই, এই লজ্জাকর, ঘৃণাকর, অনর্থকর, অধর্ম্মকর, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্তিকর বহুবিবাহকাণ্ড রহিত হইয়া যায়, এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া তাহারা রাজবিধি দ্বারা তৎসাধনার্থ উদ্যোগ করিয়াছেন।...

যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড অশেষ দোষের আস্পদ, তাহা আপনি সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া থাকেন এবং এই নৃশংস প্রথার নিবারণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তাহা অঙ্গীকার করেন; কেবল তদর্থে রাজবিধি প্রার্থনা করিতে সম্মত নহেন, কারণ তাহা হইলে রাজাকে সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হয়। কিন্তু রাজা বহুবিবাহের উপর গুরুতর কর নির্দ্ধারণ করিয়া কৌশলক্রমে তাহা রহিত করুন, অনায়াসে এই প্রস্তাব করিতেছেন এবং এই প্রস্তাবটি সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ কালোপধায়ক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এ বিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই, বহুবিবাহ বিষয়ে গুরুতর কর নির্দ্ধারণ করিলে রাজার কি সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে না? কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে কেবল সামাজিক বিষয়ে নয়, ধর্ম্মবিষয়েও হস্তক্ষেপ করা হইবেক; কারণ স্ত্রী বন্ধ্যা বা অন্যবিধ দোষাক্রান্ত হইলে শাস্ত্রকারেরা পুনরায় বিবাহ করিবার বিধি দিয়াছেন। বহুবিবাহের উপরে গুরুতর কর নির্দ্ধারিত হইলে নিঃস্ব ব্যক্তির ঐ বিধি প্রতিপালনের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। বলিতে কি আপনকার এই প্রস্তাবটি সমুচিত বিবেচনাপূর্ব্বক করা হয় নাই।..."

১৮৭২ সালের ২৮-মার্চ 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লিখেছে : "বহুবিবাহ নিবারণের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঢাকায় যাইবেন। বিক্রমপুরে বহু কুলীনের বাস। সম্ভবত এ বিষয়ে মতামত গ্রহণই তাঁর উদ্দেশ্য। স্বপক্ষে ও বিপক্ষে উভয় মতই প্রবল। বিপক্ষবাদীদের মতে—বিদেশী রাজার সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপের অর্থ স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আমাদের সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা এ বিষয়ে অনেক সময় সাহায্য চাহিলে গবর্ণমেণ্ট নিজ প্রতিজ্ঞা অনুসারে কাজ না করিলে কোন দোষ করিবেন না।"...

বহুবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তক 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার। দ্বিতীয় পুস্তক।' প্রকাশিত হল ১৮৭৩ সালের ১-এপ্রিল।

এই পুস্তকের তীব্র সমালোচনা করলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র—'বঙ্গদর্শনে', বাঙলা ১২৮০ সনের আষাঢ়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাটি আদ্যান্ত উদ্ধার করি :

"প্রায় দুই বৎসর হইল, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহু-বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রচার করেন। তদুত্তরে শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, এবং অন্যান্য কয়জন পণ্ডিত যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে যত্ন পাইয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বিতীয় পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। ইহার বিচার্য্য বিষয় এই যে, যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিবাহ হিন্দু শাস্ত্রসম্মত কি না? আমরা প্রথমেই বলিতে বাধ্য হইলাম যে আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; সুতরাং এ বিচারে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিবাদীদিগের মত খণ্ডন করিয়া জয়ী হইয়াছেন কিনা, তাহা আমরা জানি না। এবং সে বিষয়ে কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অক্ষম। তবে এবিষয়ে অশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরও কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে। আমাদিগের যাহা বক্তব্য তাহা অতি সংক্ষেপে বলিব।

বহুবিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জ্জনীয়, এবং স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ, তাহা বোধ হয় এদেশের জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সুশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত, এদেশে এমত লোক বোধ হয় অল্পই আছে, যে বলিবে, "বহুবিবাহ অতি সুপ্রথা, ইহা ত্যাজ্য নহে।"

যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকের প্রতিবাদ করিয়াছেন বোধ হয়, তাঁহাদেরও এই মাত্র উদ্দেশ্য, যে তাঁহারা আপন ২ জ্ঞানমত বহুবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করেন। তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থ আমরা সবিশেষ পড়ি নাই, কিন্তু বোধ হয় তাঁহারা কেহই বলেন না, যে বহুবিবাহ সুপ্রথা, ইহা তোমরা ত্যাগ করিও না। যদি কেহ এমত কথা বলিয়া থাকেন তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার মত কুসংস্কার বিশিষ্ট লোক এক্ষণে অতি অল্প। যাঁহারা স্বয়ং বহুবিবাহ করিয়া থাকেন, তাঁহারদিগেরই মুখে বহুবিবাহ প্রথার ভূয়সী নিন্দা এবং কৌলীন্যের উপর ধিক্‌কার আমরা শতবার শুনিয়াছি। তবে যে তাঁহারা কেন এত বিবাহ করেন, সে স্বতন্ত্র কথা। এমত চোর কেহই নাই যে জিজ্ঞাসা করিলে চুরিকে অসৎকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবে না—কিন্তু অসৎকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াও সে আবার চুরি করে। কুলীনেরাও বহু-বিবাহ নিন্দনীয় বলিয়া, স্বীকার করিয়াও বহুবিবাহ করেন। কিন্তু সে যাহাই হউক, বহুবিবাহ যে কুপ্রথা তদ্‌বিষয়ে বাঙ্গালীর মতৈক্য সম্বন্ধে আমাদের কোন সংশয় নাই।

এই ঐকমত্য যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত বহুবিবাহ বিষয়ক প্রথম পুস্তক প্রচারের পর হইয়াছে, এমত নহে। অনেকদিন হইতেই ইহা সংস্থাপিত হইয়া আসিতেছে। ইহা দেশের মধ্যে সুশিক্ষা প্রচার, বা ইউরোপীয় নীতির প্রচার, বা সাধারণ উন্নতির ফল। তথাপি তাঁহার প্রথম পুস্তকের জন্য আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। যাহা কিছু সদভিপ্রায়ে অনুষ্ঠিত তাহা সার্থক হউক বা নিরর্থক হউক, প্রয়োজন বিশিষ্ট হউক বা নিষ্প্রয়োজনীয় হউক, তাহাই প্রশংসনীয় এবং কৃতজ্ঞতার স্থল। বিশেষ, বহুবিবাহ সম্বন্ধে লোকের মত যাহাই হউক, বহুবিবাহ প্রথা দেশ হইতে একেবারে উচ্ছিন্ন হয় নাই। তবে বহুবিবাহ এদেশে যতদূর প্রবল বলিয়া, বিদ্যাসাগর প্রতিপন্ন

করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বাস্তবিক ততটা প্রবল নহে। আমাদিগের স্মরণ হয়, হুগলী জেলায় যত গুলিন বহুবিবাহ পরায়ণ ব্রাহ্মণ আছেন, বিদ্যাসাগর প্রথম পুস্তকে তাহাদিগের তালিকা দিয়াছেন। অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে তালিকাটি প্রমাদশূন্য নহে। কেহ ২ বলেন মৃতব্যক্তির নাম সন্নিবেশের দ্বারা তালিকাটি স্ফীত হইয়াছে। আমরা স্বয়ং যে দুই একটির কথা সবিশেষ জানি, তাহা তালিকার সঙ্গে মিলে নাই। যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের খ্যাতির অনুরোধে আমরা সেই তালিকাটি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। তাহা করিলেও, হুগলী জেলার সমুদায় লোকের মধ্যে কয় জন বহুবিবাহ পরায়ণ পাওয়া যায়? এই বাঙ্গালায় এক কোটি আশী লক্ষ হিন্দু বাস করে; ইহার মধ্যে আঠারশত জন ব্যক্তিও যে অধিবেদন পরায়ণ নহে, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ দশ সহস্র হিন্দুর মধ্যে একজনও অধিবেদন পরায়ণ কি না সন্দেহ। এই অল্পসংখ্যকদিগের সংখ্যাও যে দিন ২ কমিতেছে, স্বতই কমিতেছে, তাহাও সকলে জানেন। কাহারও কোন উদ্যোগ করিতে হইতেছে না—কোন রাজ ব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না—কোন পণ্ডিতের ব্যবস্থার আবশ্যক হইতেছে না, আপনা হইতেই কমিতেছে। ইহা দেখিয়া অনেকেই ভরসা করেন, যে এই কুপ্রথার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা আপনা হইতেই কমিবে। এমত অবস্থায়, বহুবিবাহরূপ রাক্ষস বধের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মহারথীকে ধৃতাস্ত্র দেখিয়া, অনেকেরই ডন্ কুইক্সোটকে মনে পড়িবে।

কিন্তু সে রাক্ষস বধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুমূর্ষু হইলেও বধ্য। আমরা দেখিয়াছি এক এক জন বীরপুরুষ, মৃত সর্প বা মৃত কুক্কুর দেখিলেই, তাহার উপর দুই এক ঘা লাঠি মারিয়া যান, কি জানি যদি ভাল করিয়া না মরিয়া থাকে। আমাদিগের বিবেচনায় ইঁহারা বড় সাবধান এবং পরোপকারী। যিনি এই মুমূর্ষু রাক্ষসের মৃত্যুকালে দুই এক ঘা লাঠি মারিয়া যাইতে পারিবেন, তিনি ইহলোকে পূজ্য এবং পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই।

কিন্তু একটা কথায় একটু গোলযোগ বোধ হয়। আমরা স্বীকার করিলাম বহুবিবাহ এদেশে বড় চলিত—আপামর সাধারণ সকলেই বহুপত্নীক। জিজ্ঞাস্য এই, এ প্রথা কি প্রকারে নিবারিত হওয়া সম্ভব? বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক, বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করা তাহার একটি প্রধান। বাস্তবিক এই প্রথা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না, কেননা, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে আমরা ঘোরতর মূর্খ। দেখা যাইতেছে যে এবিষয়ে মতভেদ আছে। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যম, পুস্তকের আকার, এবং স্মৃতিশাস্ত্রোদ্ধৃত বচনের আড়ম্বর দেখিয়া, আমরা তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছি। মনে করুন দেশশুদ্ধ লোক সকলেই স্বীকার করিল যে বহুবিবাহ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ। তাহাতে কি বহুবিবাহ প্রথা নিবারিত হইবে? আমরা সে বিষয়ে বিশেষ সংশয়াবিষ্ট। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে যে সকল সামাজিক প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা সকলই শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রচলিত এমত নহে। সে সমাজমধ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রাপেক্ষা লোকাচার প্রবল। যাহা লোকাচার সম্মত তাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলেও প্রচলিত; যাহা লোকাচার বিরুদ্ধ তাহা শাস্ত্র সম্মত হইলে প্রচলিত হইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্বে একবার বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়াছেন; প্রমাণ সম্বন্ধে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন; অনেকেই তাঁহার

মতাবলম্বী; কিন্তু কয়জন, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, বিধবা বিবাহের শাস্ত্রীয়তা বা অনুষ্ঠেয়তা অনুভূত করিয়া আপন পরিবারস্থা বিধবাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়াছেন? কোন একজন বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণ লইয়া বসুন। এবং তৎসঙ্গে মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ লইয়া এক একটি বচন ধরিয়া তাঁহার আচার ব্যবহারের সহিত মিলাইয়া লউন। কয়টি বচনের সঙ্গে তাঁহার কৃতানুষ্ঠান মিলিবে? শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই বলিবেন, অতি অল্প। যদি শাস্ত্রজ্ঞ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণদিগের এই দশা, তবে আপামর সাধারণের কথার আর কাজ কি? বাস্তবিক, মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত বিধিসকলের সম্পূর্ণ চলন, কোন সমাজমধ্যে সম্ভব নহে। কস্মিনকালে, কোন সমাজে, ঐ সকল বিধি সম্পূর্ণ রূপে প্রচলিত ছিল কি না সন্দেহ। সকল বিধিগুলি চলিবার নহে। অনেকগুলি অসাধ্য। অনেকগুলি, সাধ্য হইলেও মনুষ্যের এতদূর ক্লেশকর, যে তা স্বতই পরিত্যক্ত হয়। অনেকগুলি পরস্পর-বিরোধী। এই বিধিগুলি সম্যক্ প্রচলিত রাখা, যদি কোন সমাজের অদৃষ্টে কখন ঘটিয়া থাকে, বা কখন ঘটে, তবে সে সমাজের অদৃষ্ট বড় মন্দ সন্দেহ নাই। অনেকেরই বিশ্বাস আছে, প্রাচীন ভারতে এই ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল, কেবল এখনই কাল মাহাত্ম্যে লুপ্ত হইতেছে। যাঁহারা এরূপ বিবেচনা করেন তাঁহাদের সহিত আমরা বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। কিন্তু ইহা স্বীকার করি যে পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে এই সকল বিধি কতদূর প্রচলিত ছিল, এখনও কতদূর প্রচলিত আছে। প্রচলিত ছিল, এবং প্রচলিত আছে, বলিয়াই ভারতবর্ষের এ অধোগতি। যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী, তাঁহাদিগকে এ কথা বলা বৃথা। কিন্তু অনেক হিন্দু আমাদিগের কথার অনুমোদন করিবেন ভরসা আছে। আমরা হিন্দুধর্ম্মবিরোধী নহি; হিন্দুধর্ম্ম, পরিশুদ্ধ হইয়া, প্রচলিত থাকে, ইহাই আমাদিগের কামনা। তাই বলিয়া, যাহা কিছু ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিচিত, তাহাই যে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত অংশ, এবং সমাজের মঙ্গলকারক, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছি কি না বলিতে পারি না। যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ শাস্ত্র নিষিদ্ধ, সেই কারণেই বহু-বিবাহ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলে একটি দোষ ঘটে। বহুবিবাহপরায়ণ পক্ষেরা বলিতে পারেন, "যদি আপনি আমাদের শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিতে বলেন, তবে আমরা সম্মত আছি। কিন্তু যদি শাস্ত্র মানিতে হয়, তবে আপনার ইচ্ছামত, তাহার একটী বিধি গ্রহণ করা, অপরগুলি ত্যাগ করা যাইতে পারে না। আপনি কতক গুলিন বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, এই ২ বচনানুসারে তোমরা যদৃচ্ছাক্রমে বহু বিবাহ করিতে পারিবে না। ভাল, আমরা তাহা করিব না। কিন্তু সেই সেই বিধিতে যে ২ অবস্থায় অধিবেদনের অনুমতি আছে, আমরা এই দুই কোটি হিন্দু সকলেই সেই ২ বিধানানুসারে প্রয়োজনমত অধিবেদনে প্রবৃত্ত হইব—কেন না সকলেরই শাস্ত্রানুমত আচরণ করা কর্ত্তব্য। আমরা যত ব্রাহ্মণ আছি,—রাঢ়ীয়, বৈদিক, বারেন্দ্র, কান্যকুব্জ প্রভৃতি—সকলেই অগ্রে সবর্ণা বিবাহ করিয়া কামতঃ ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা, এবং শূদ্রকন্যা বিবাহ করিব। আমাদিগের মধ্যে যখনই কাহারও স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে বচসা করিয়া বাপের বাড়ী যাইবে, আমরা তখনই বিবাহের উদ্দেশ্য অসিদ্ধ বলিয়া, ছোট জাতির মেয়ে খুঁজিব। গৃহিণী যখন ঝগড়া করিয়াছেন, তখন রাগের মাথায় সম্মতি দিবেন সন্দেহ নাই।" এই দুই কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারই স্ত্রী

বন্ধ্যা,* সেই আর একটি বিবাহ করুক, যাহারই স্ত্রী মৃতপ্রজা, সেই আর একটি বিবাহ করুক—যে হতভাগিনীকে বিধাতা বর্ষে ২ মনঃপীড়া দিয়া থাকেন, স্বামীও তাহার মর্ম্মান্তিক পীড়ার বিধান করুন, কেন না ইহা শাস্ত্র সম্মত। তদ্ভিন্ন, যাহার কন্যাভিন্ন পুত্র জন্মে নাই, এই দুই কোটি হিন্দুর মধ্যে এমত যত লোক আছে, সকলেই আর এক এক দারপরিগ্রহ করুন। আমাদিগের এমন ভরসা আছে, যে এই সকল কারণে, হিন্দুগণ শাস্ত্রানুসারে অধিবেদনে প্রবৃত্ত হইলেন, এখন যেখানে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ বহুবিবাহ পরায়ণ, সেখানে সহস্র ২ কুলীন, অকুলীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বহু পত্নী লইয়া সুখে সচ্ছন্দে শাস্ত্রানুসারে সংসার ধর্ম্ম করিতে থাকিবেন।

কিন্তু এখনও শাস্ত্রের মহিমা শেষ হয় নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রধান বিধির উল্লেখ করিতে বাকি আছে।—"সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী!" ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী হইলে সদ্যই অধিবেদন করিবে! আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ, যে যাঁহার যাঁহার ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী, তাঁহারা, হিন্দুশাস্ত্রের গৌরব বর্দ্ধনার্থ, সদ্যই পুনর্ব্বার বিবাহ করুন। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ মুখরা, দ্বিতীয়া ভার্য্যাও অপ্রিয়বাদিনী হইলে হইতে পারে,—তাহা হইলে আবার তৃতীয় বিবাহ করিবেন, তৃতীয়াও যদি অপ্রিয়বাদিনী হয় (বাঙ্গালীর মেয়ের মুখ ভাল নহে) তবে আবার বিবাহ করিবেন—এরূপ "লোকহিতৈষী নিরীহ শাস্ত্রকারদিগের"† অনুকম্পায় আপনারা অনন্ত গৃহিণীশ্রেণীতে পুরী শোভিতা করিতে পারিবেন। এমন বাঙ্গালিই নাই যাহাকে একদিন না একদিন, স্ত্রীর কাছে "মুখঝাম্‌টা" খাইতে না হয়। অতএব আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের অনন্ত মহিমার গুণে সকলেই অনন্ত সংখ্যক গৃহিণীগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। যাঁহারই স্ত্রী, ননন্দার সহিত বচসা করিয়া আসিয়া, স্বামীর উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিবেন, তিনিই তৎক্ষণাৎ অন্য বিবাহ করিতে পারিবেন। যাঁহারই স্ত্রী, যাতার অঙ্গে নূতন অলঙ্কার দেখিয়া আসিয়া, স্বামীকে বলিবেন, "তোমার হাতে পড়িয়া আমার কোন সুখ হইল না," তিনি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রে ঘটক ডাকাইয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়া, সদ্যই অন্য দার গ্রহণ করিবেন। যাহার স্ত্রী, স্বামীর মুখে স্বকৃত পাকের নিন্দা শুনিয়া বলিবেন, "কিছুতেই তোমার মন যোগাইতে পারিলাম না—আমার মরণ হয় ত বাঁচি"—তিনি তখনই চেলির কাপড় পরিয়া, সোলার টোপর মাথায় দিয়া, প্রতিবাসীর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিবেন, "মহাশয় কন্যা দান করুন।" এত দিনে বাঙ্গালীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করা সার্থক হইল,—অমূল্যধন স্ত্রীরত্ন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করা যাইতে পারিবে। বঙ্গসুন্দরীগণ বোধহয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচারের এই নবোদ্যম দেখিয়া তত সন্তুষ্ট হইবেন না। কিন্তু তাঁহাদিগের শাসনের যে একটা সদুপায় হইতে পারিবে, ইহাতে আমরা বড় সুখী। আমাদের এমত ভরসা হইয়াছে যে অনেক ভদ্রলোক নিখুঁত মুক্তা খুঁজিয়া বেড়াইবার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন—কেননা নথ নাড়া দিবার দিনকাল গেল। বিধুমুখী ঘোষ, সৌদামিনী মিত্র, কামিনী গাঙ্গুলী প্রভৃতি দেশের শ্রীবৃদ্ধির পতাকাবাহিনীগণ, বোধহয় পতাকা ফেলিয়া দিয়া, ফিরে বাঙ্গালীর মেয়ে সাজিয়া, স্বামীর শ্রীচরণ মাত্র

---

* বন্ধ্যাষ্টমেহধিবেদ্যাব্দে দশমেতুমৃতপ্রজা। একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্ব প্রিয়বাদিনী॥—বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক, ১৪৩

† "বহুবিবাহ", দ্বিতীয় পুস্তক, ২৫২ পৃ,

ভরসা মনে করিয়া, বিবিয়ানা চাল খাট করিয়া আনিবেন। কালভুজঙ্গিনী কুলকামিনীগণ এখন হইতে মুখের বিষ হৃদয়ে লুকাইয়া, কেবল কটাক্ষ বিষকে সংসার জয়ের একমাত্র সম্বল করিবেন। তাঁহাদিগের মনে থাকে যেন "সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী!"—বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে এ ব্যবস্থা খুঁজিয়া পাইয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নিবারণ জন্য এই পুস্তক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালীর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন! —আমাদিগের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য অনন্ত! সেই পুস্তকোদ্ধৃত ধর্ম্মশাস্ত্রের বলে, বাঙ্গালী মাত্রেই অসংখ্য বিবাহ করিতে পারিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে শাস্ত্রকারদিগকে "লোকহিতৈষী" বলিয়াছেন, তাহা সার্থক বটে।

এরূপ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কি ফল! এ শাস্ত্রানুসারে লোককে কার্য্য করিতে বলিলে বহুবিবাহ নিবারণ হয়, না বৃদ্ধি হয়?

কিন্তু বোধ হয়, শাস্ত্রাবলম্বন পূর্ব্বক বহুবিবাহ পরিত্যাগ করিতে বলা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাঁহার সহিত যাঁহারা এক মতাবলম্বী তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে বহুবিবাহ নিবারণ জন্য রাজব্যবস্থা প্রচার হউক। দ্বিতীয় পুস্তকে সে কথা কিছুই নাই, কিন্তু প্রথম পুস্তকে আছে। সেই উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তিদায়ক স্বরূপ বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন। নচেৎ শাস্ত্রের নামে ভয় পাইয়া হিন্দু বহুবিবাহ বা কোন চিরপ্রচলিত প্রথা হইতে নিবৃত্ত হইবেক, এমত ভরসা বিদ্যাসাগর মহাশয় করিবেন বোধ হয় না। কিন্তু রাজ ব্যবস্থার পক্ষে প্রবৃত্তিদায়ক বলিয়াও এ বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের সাহায্য অবলম্বন করা আমাদিগের উপযুক্ত বোধ হয় না। এ বিষয়ে রাজবিধি প্রণীত করিতে গেলে, তাহা কি শাস্ত্রানুমত হওয়া আবশ্যক? না শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও ক্ষতি নাই? যদি তাহা শাস্ত্রানুমত হওয়া আবশ্যক হয়, তবে "সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী" "ক্ষত্র বিট্ শূদ্রকন্যাস্তু * * * বিবাহ্যা ক্কচিদেবতু" প্রভৃতি কথাগুলিও বিধিবদ্ধ করিতে হইবে। আর যদি তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও চলে, তবে বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাওয়া নিষ্প্রয়োজনে পরিশ্রম করা মাত্র।

আর একটি কথা এই, যে এদেশে অর্দ্ধেক হিন্দু, অর্দ্ধেক মুসলমান। যদি বহুবিবাহ নিবারণ জন্য আইন হওয়া উচিত হয় তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া উচিত। হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, মুসলমানের পক্ষে ভাল এমত নহে। কিন্তু বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া, মুসলমানের পক্ষেও তাহা কি প্রকারে দণ্ডবিধির দ্বারা নিষিদ্ধ হইবে? রাজব্যবস্থা বিধাতৃগণ কি প্রকারে বলিবেন, যে "বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ, অতএব যে মুসলমান বহুবিবাহ করিবে, তাহাকে সাত বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইতে হইবে।" যদি তাহা না বলেন, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, যে "আমরা বড় প্রজা হিতৈষী ব্যবস্থাপক বটে; প্রজার হিতার্থ আমরা বহু-বিবাহ কুপ্রথা উঠাইব; কিন্তু আমরা অর্দ্ধেক প্রজাদিগের মাত্র হিত করিব। হিন্দুদিগের শাস্ত্র ভাল, তাঁহাদিগের ব্যাকরণের গুণে এক স্থানে "ক্রমশোবরা" ও "ক্রমশো অবরা" উভয় পাঠ চলিতে পারে, সুতরাং তাঁহাদিগেরই হিত করিব। আমাদিগের অবশিষ্ট প্রজা তাহাদিগের ভাগ্য দোষে মুসলমান, তাহাদিগের শাস্ত্র প্রণেতৃগণ সুচতুর নহে; আরবী কায়দা হেলে দোলে না; বিশেষ মুসলমানেদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় কেহ পণ্ডিত নাই, অতএব বাকি অর্দ্ধেক প্রজাগণের হিত করিবার আবশ্যক নাই।"

আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয়, যে ব্যবস্থাপক সমাজ এই দ্বিবিধ উক্তির মধ্যে কোন উক্তিই ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিবেন না।

অতএব, আমাদিগের সামান্য বিবেচনায়, ধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন দিকে কোন ফল নাই। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার কর্ত্তব্য, যে যদি ধর্ম্মশাস্ত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে, এবং যদি বহুবিবাহ সেই শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস থাকে, তবে তিনি আত্ম পক্ষ সমর্থনে অধিকারী বটে, এবং তাঁহার পুস্তক, একজন সদনুষ্ঠাতার সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তির প্রমাণ স্বরূপ সকলের নিকট আদরণীয়। আর যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রে বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকে, তবে সেই শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া কপটতা মাত্র। যিনি বলিবেন যে সদনুষ্ঠানের অনুরোধে এইরূপ কপটতা প্রশংসনীয়, আমরা তাঁহাকে বলিব, যে সদনুষ্ঠানের উদ্দেশেই হউক, বা অসদনুষ্ঠানের উদ্দেশেই হউক, যিনি কপটাচার করেন, তাঁহাকে কপটাচারী ভিন্ন আর কিছুই বলিব না। আপনার ক্ষুধানিবারণার্থে যে চুরি করে সেও যেমন চোর, পরকে বিতরণার্থে যে চুরি করে সেও তেমনি চোর। বরং দাতা চোরের অপেক্ষা ক্ষুধাতুর চোর মার্জ্জনীয়, কেন না সে কাতরতা বশতঃ, এবং অলঙ্ঘ্য প্রয়োজনের বশীভূত হইয়া চুরি করিয়াছে। তেমনি যে ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থ কপটতা করে, তাহার অপেক্ষা যে নিষ্প্রয়োজনে কপটতা করে, সেই অধিকতর নিন্দনীয়। যিনি এই পাপপূর্ণ মিথ্যাপরায়ণ, মনুষ্যজাতিকে এমত শিক্ষা দেন, যে সদনুষ্ঠানের জন্য প্রতারণা এবং কপটাচারও অবলম্বনীয়, তাঁহাকে আমরা মনুষ্যজাতির পরম শত্রু বিবেচনা করি। তিনি কুশিক্ষার পরম গুরু।

আমরা একথা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলিতেছি না। আমরা এমত বলিতেছি না যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্রে স্বয়ং বিশ্বাসবিহীন বা ভক্তিশূন্য। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি গদ্গদ চিত্ত হইয়া তৎ প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা ইহাও বলিতেছি যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় উদার চরিত্রে কপটাচরণ কখনই স্পর্শ করিতে পারে না—তিনি স্বয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রে অবিচলিত ভক্তিবিশিষ্ট সন্দেহ নাই। কেবল আমাদিগের কপালদোষে বহুবিবাহ নিবারণের সদুপায় কি, তৎসম্বন্ধে তিনি কিছু ভ্রান্ত। ইহার অধিক আর কিছুই আমাদিগের বলিবার নাই।

এতদিনের পর যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন বিষয়ে ভ্রান্তি দেখি, তবে কথা কহিতে পারি না। চিরকাল অভ্রান্ত কেহ নহে। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে ভ্রান্তির একটু আধিক্য হইয়াছে, বিবেচনা করিতে হয়। এমত হইতে পারে, যে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীমধ্যে যে কয়জন পণ্ডিত আছেন, তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশারদ। কিন্তু সে কথা পরের মুখেই ভাল শুনায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ততক্ষণ বিলম্ব করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শ্রীযুক্ত রাজকুমার ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী, ও শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর কবিরাজ কবিরত্ন তাঁহার প্রতিবাদী। বিদ্যাসাগর মহাশয় একে একে পাঁচ জনকেই বলিয়াছেন যে তাঁহারা ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই।* গ্রন্থমধ্যে এই কথা স্থানে স্থানে, নানাবিধ অলঙ্কার বিশিষ্ট হইয়া পুনরুক্ত হইয়াছে। প্রতিবাদী পণ্ডিতেরা এ কথার এই অর্থ করিবেন, যে বিদ্যাসাগর বলিয়াছেন, "তোমরা কেহ কিছু জান না,

* ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্নকে একটু ক্ষমা করিয়া স্পষ্ট বলেন নাই।

ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা কিছু জানি তা আমিই।" আমরা ইহাতে দুঃখিত হইলাম। কেননা আমাদিগের নিতান্ত বাসনা ছিল, যে আমরা ঐ পণ্ডিতদিগকে বলিব, যে "মহাশয়েরা কোন সাহসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রে অভ্রান্ত, আপনারা কিছু জানেন না।" আমাদিগের আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে সে কথা বলিতে অবকাশ দিলেন না, আপনি সকল কথা বলিয়া রাখিয়াছেন।

ইহা অপেক্ষা আর একটি গুরুতর দোষের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। প্রাচীন বাঙ্গালীদিগের নিয়ম ছিল, এবং এখনও শ্রেণী বিশেষের লোক ভিন্ন সকল বাঙ্গালীদিগের নিয়ম আছে, যে কোন বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, বিচারকেরা পরস্পর পূর্ব্বপুরুষের উল্লেখ করিয়া গালি না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না বা পারেন না। রাম যদি বলিল, যে এটা ঘট, শ্যাম যদি বলিল, না এটা পট, তবে রাম বলিবে, "শ্যালা, তুই কি জানিস্"—অমনি শ্যাম তদনুরূপ মধুবৃষ্টি করিবে। বাঙ্গালী লেখক ও বাঙ্গালী অধ্যাপকেরা এক্ষণেও সেই রীতির অনুবর্ত্তী। অধ্যাপকেরা বিদায়ের আশায় সভাস্থ হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, দুই চারি কথার পর পরস্পরকে "পাষণ্ড" "ব্যালীক" "নরাধম" বলিয়া সম্বোধন করেন। বাঙ্গালীর নিম্ন শ্রেণীর লেখকেরাও পরস্পরের মতভেদ দেখিলে অমনি, ভিন্ন মতাবলম্বীকে "মূর্খ" "ধৃষ্ট" "অসৎ" "মিথ্যাবাদী" এবং অন্যান্য উচ্চার্য্য এবং অনুচ্চার্য্য কথায় অভিহিত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদিগের শিক্ষা ও সংসর্গ বিবেচনা করিলে তাঁহাদিগের নিকট অন্য ভাষার প্রত্যাশা করা যায় না; ইতরে ইতরের ব্যবহার্য্য ভাষাই ব্যবহার করিবে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আমরা বিচারকালে ভদ্রের ব্যবহার্য্য ভাষারই প্রত্যাশা করি। ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও দূষণীয়া ভাষা ব্যবহার করেন নাই—এ সম্বন্ধে তাঁহার রচনা পূর্ব্বাবধি কলঙ্কশূন্যা। কিন্তু এই পুস্তকে দেখিলাম যে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। সভারূঢ় বিচারমত্ত তৈলোজ্জ্বলললাট বিশিষ্ট নৈয়ায়িক দিগের ন্যায় তিনি প্রতিবাদীগণকে গালি দিয়াছেন। কিন্তু যদি এইরূপ ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রীতির এই একটি মাত্র চিহ্ন দেখিতাম, তাহা হইলে মনে করিতাম, দৈবনিগ্রহে এরূপ একবার ঘটিয়াছে। কিন্তু ইদানীন্তন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপসাকদিগের মধ্যে এইরূপ ভাষার অতিশয় আধিক্য দেখিতেছি। ইদানীং এইরূপ ভাষাতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্তব লিখিত ও পঠিত হইয়া থাকে। উপাসকদিগের নিয়ম এই যে যাহাতে উপাস্য দেবতার প্রীতি জন্মে তাহাই তাঁহাকে উপহার দিয়া থাকে—নারায়ণকে তুলসীচন্দন, ঘেঁটুকে ঘেঁটুফুল, ছেঁড়াচুল, এবং গোময়। অতএব যাহা উপাসক নিবেদন করিতেছেন, উপাস্য তাহাই উৎসৃষ্ট করিতেছেন, দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন যে উপাস্যের তাহাতেই আন্তরিক প্রীতি, তবে তিনি মার্জ্জনীয় সন্দেহ নাই। উপাসক সম্প্রদায় আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, আমরা তাঁহাদিগের নিন্দা করিতেছি না। অন্নের দায় ভদ্রলোকেও দাস হয় উপাসক জাতি কোন ছার! কেন তাঁহারা এরূপ আচরণে প্রবৃত্ত, তাহা বুঝিয়া কেহই তাঁহাদের অপরাধ লইবে না। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এইরূপ রুচির পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলেই দুঃখিত হইবে সন্দেহ নাই। গালি দিলেই যে বিচারে জয়ী হওয়া যায় না, গালিতে বাক্যের সারবত্তা বাড়ে না, সত্য নির্ণয় পক্ষে কটু কথার প্রয়োজন মাত্র নাই—তাহাতে যে লেখকের প্রতি পাঠকের অভক্তি জন্মে মাত্র, ইহা বিদ্যাসাগর

মহাশয়কে বুঝাইতে হইবে না। যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ পুস্তক পড়েন নাই, তাঁহাদিগের কৌতূহল নিবারণার্থ দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি;—

৩ পৃষ্ঠায় পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;

"অনেকে বলিয়া থাকেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বুদ্ধি আছে, কিন্তু বুদ্ধির স্থিরতা নাই; নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে কিন্তু কোন শাস্ত্রে প্রবেশ নাই; বিতণ্ডা করিবার বিলক্ষণ শক্তি আছে, কিন্তু মীমাংসা করিবার তাদৃশী ক্ষমতা নাই। বলিতে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইতেছে, তিনি বহুবিবাহ বাদ পুস্তক প্রচার দ্বারা এই কয়টি কথা অনেক অংশে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।"

পুনশ্চ ৬ পৃষ্ঠায়,—

"ফলতঃ, এই অলৌকিক আচরণ দ্বারা তর্কবাচস্পতি মহাশয় যে রাগদ্বেষের নিতান্ত বশীভূত ও নিতান্ত অবিমৃশ্যকারী মনুষ্য, ইহারই সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে।"

তর্কবাচস্পতি যেমন ইচ্ছা তেমন মনুষ্য হউন, সাধারণের তাহাতে ইষ্ট বা অনিষ্ট নাই। তিনি কুলোক হইলেও, বিচার্য্য বিষয় কেবল এই যে তাঁহার উক্ত কথাগুলি যথার্থ, না অযথার্থ? যদি সেগুলি অযথার্থ হয়, তবে তাঁহার চরিত্রের কথা উল্লেখ না করিয়াও তাঁহার মত খণ্ডন করা যাইতে পারে। আর যদি সে কথাগুলি যথার্থ হয়, তবে প্রতিপক্ষ যেমন চরিত্র হউন না কেন, তাহা যথার্থই থাকিবে। রাগ, দ্বেষ এবং অবিমৃশ্যকারিতা বোধহয় পৃথিবীতে এত সুলভ, যে আমরা অন্যের প্রতি তাহার আরোপণ না করিলেই ভাল করিব। এই নৈতিক উক্তির প্রমাণস্বরূপ, গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা পাঠকমহাশয়কে উপহার দিব।

"যদি এরূপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত থাকিত, পূর্ব্বে বঙ্গদেশ বাসী অধুনা মুরসিদাবাদনিবাসী, সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, চিকিৎসাব্যবসায়ী, শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর রায় কবিরাজ কবিরত্ন মহোদয় যে স্মৃতিবচনের যে অর্থ যথার্থ বা অযথার্থ বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন; অদ্যাবধি দ্বিরুক্তি না করিয়া ঐ অর্থ যথার্থ বা অযথার্থ বলিয়া ভারতবর্ষবাসী লোকদিগকে শিরোধার্য্য করিতে হইবেক; তাহা হইলে আমি যে সকল ব্যাখ্যা লিখিয়াছি, সে সমস্ত যথার্থ নহে, তদীয় এই সিদ্ধান্ত নির্ব্বিবাদে অঙ্গীকৃত হইতে পারিত। কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে, সে রূপ রাজাজ্ঞা প্রচারিত নাই; সুতরাং অকুতোভয়ে নির্দ্দেশ করিতেছি, আমি, শাস্ত্রের অযথার্থ ব্যাখ্যা লিখিয়া, লোককে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাই নাই। পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি, এবং এক্ষণেও নির্দ্দেশ করিতেছি, কবিরাজ মহাশয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, চিকিৎসা বিষয়ে কিরূপ বলিতে পারি না, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র নাড়ীজ্ঞান নাই; এজন্যই নিতান্ত নির্ব্বিবেচক হইয়া এরূপ গর্ব্বিত বাক্যে, এরূপ উদ্ধত, এরূপ অসঙ্গত নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"

পুনশ্চ, ২৩৯ পৃষ্ঠায়,

"ফলকথা এই, কবিরত্ন মহাশয় ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; ***, এজন্যই এরূপ অসঙ্গত ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন। যাহার যে শাস্ত্রে বোধ ও অধিকার না থাকে, নিতান্ত অর্ব্বাচীন না হইলে সে ব্যক্তি সাহস করিয়া সে শাস্ত্রের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করে না। কবিরত্ন মহাশয়, প্রাচীন ও বহুদর্শী হইয়া কি বিবেচনায় অনধীত অননুশীলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করিলেন, বুঝিতে পারা যায় না।"

এই বলিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় উদাহরণ স্বরূপ, প্রবোধচন্দ্রিকা নামক অশ্লীলতার ভাণ্ডার হইতে একটি অশ্লীল উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়া* স্বীয় গ্রন্থকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। সে উপাখ্যানটি এরূপ অশ্লীল, যে বোধ হয় সামান্য ইতর লেখকও তাহা উদ্ধৃত করিতে সাহস করিতেন না, কেননা তাঁহাদের লজ্জা না থাকুক, রাজদণ্ডের ভয় আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও, তাহার একটি শব্দ পরিবর্ত্তিত করিয়া লজ্জানুরোধের প্রমাণ দিয়াছেন—আর একটি শব্দ মৃত্যুঞ্জয় তর্কলঙ্কারের লজ্জাহীনা লেখনী হইতে যেমন বাহির হইয়াছিল, বোধহয় তেমনই আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এরূপ অশ্লীল উপাখ্যান স্বীয় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, ইহা অনেকে বিশ্বাস করিবেন না। যাঁহারা বিশ্বাস না করিবেন, তাঁহাদের প্রবৃত্তি থাকিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকের ২৪০ পৃষ্ঠায় সন্ধান করিবেন, আমরা সে উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়া ভদ্রলোকের পাঠ্য বঙ্গদর্শন কলুষিত করিতে পারি না।

বিদ্যাসাগর এই পুস্তকে উপাখ্যান প্রিয়তার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। নেত্ররোগীর উপাখ্যান ভিন্ন, গ্রন্থমধ্যে আরও একটি উপাখ্যান ২২৭ পৃষ্ঠায় আছে। যে সকল উপাখ্যান নীতিবিরুদ্ধ, বা অশ্লীল, বা অন্য কারণে ভদ্রের অনাদরণীয়, তাহা কদাচিৎ রসবাহুল্যের অনুরোধে সহ্য যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচার মধ্যে যদি উপন্যাস ন্যস্ত হইল, তবে তাহা একটু সরস হইলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এক শ্বাশুড়ী কুন্তীর দৃষ্টান্তানুবর্ত্তিনী, তাঁহার বধূ দ্রৌপদীর দৃষ্টান্তানুকারিণী, এরূপ উপাখ্যান বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিপি কৌশলেও সরস হয় নাই, অথবা তাঁহার নামের বা বয়সের গুণেও নীতিগর্ভ বা ভদ্রলোকের পাঠ্য বলিয়া গৃহীত হইবে না।

একজন সামান্য ব্যক্তি এরূপ লিখিলে, আমরা তাহাকে ভর্ৎসনা করিবার জন্য বঙ্গদর্শনের এতটা স্থান নষ্ট করিতাম না। কটুবাক্যে আনুরক্তি, অশ্লীলতাকে রসিকতা জ্ঞান, ইহা বঙ্গীয় লেখকদিগের মধ্যে সর্ব্বদা দেখা যায়। আমরা তাহার শাসনের জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়া থাকি না, কেননা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে সাধারণ পাঠকের রুচির দৈনন্দিন উৎকর্ষ সিদ্ধি হইতেছে, কদর্য্যভাষী লেখকদিগের ব্যবসায় শীঘ্র লোপ পাইবে। কিন্তু যেখানে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায়, বিজ্ঞ, মান্য, এবং সুপণ্ডিত লেখকের এরূপ প্রবৃত্তি, তখন বঙ্গীয় সাধারণ লেখক ও পাঠকের মঙ্গল কামনায়, বাঙ্গালা সাহিত্যে কোন ভবিষ্যৎকালে ভদ্রতা ও সভ্যতা স্থান পাইতে পারে, এই বাসনায়, ভিন্নজাতীয়গণের নিকট চিরকাল আমরা ইতরজাতি বলিয়া পরিচিত না থাকি, এই ইচ্ছায়, আমরা এই কুপ্রথার নিন্দা করিলাম। আমাদিগের এই বিশেষ আশঙ্কা যে বিদ্যাসাগর মহাশয় কতকগুলি লেখকের আদর্শ স্বরূপ, তাঁহারা এ নজির দেখিয়া অপরিমিত রসিকতা উদ্গীর্ণ করিতে আরম্ভ করিবেন। সেই আশঙ্কাতেই আমরা এত কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। নচেৎ যে বাক্য উপদেশ বাক্যের ন্যায় শুনায়, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি প্রয়োগ করিতে আমাদের লজ্জা করে। বিদ্যাসাগর মহাশয়, সদনুষ্ঠান প্রিয়তা গুণে আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। যাহাদিগকে তিনি কটুকথা বলিয়াছেন—তারানাথ তর্কবাচস্পতি বা গঙ্গাধর রায় কবিরাজ, ইঁহাদিগকে আমরা চিনি না; তাঁহাদিগের পক্ষতাবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগরের প্রতি দোষারোপ করিব এমত

* বহুবিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক, ২৪৯-২৫০ পৃষ্ঠা।

কোন কারণই নাই। তাঁহার প্রথম পুস্তকের উত্তরে ইঁহারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহাদিগের লিপিপ্রণালীরও প্রশংসা করিতে পারি না। তাঁহারাও বিদ্যাসাগরকে কটু বলিতে ত্রুটি করেন নাই। গালি খাইয়া বিদ্যাসাগর গালি দিয়াছেন। কিন্তু যাহারা লিপিকার্য্যের সুসভ্য প্রণালী তাদৃশ অবগত নহেন, বিদ্যাসাগর যে তাঁহাদিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহারই জন্য এত কথা বলিলাম। কেবল বঙ্গীয় সাহিত্য হইতে অসভ্যতা কলঙ্ক দূর করিবার প্রয়োজনানুরোধেই, এসকল কথা বলিতে হইল। বহুবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে ভদ্রসমাজে বিচার চলিতে পারে না। ভদ্র লেখকে বিদ্যাসাগরকে বলিতে পারেন, "আপনার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। যিনি ভদ্রলোকের ব্যবহার্য্য ভাষা ব্যবহার না করিয়া কটূক্তি করেন, তাহার সহিত বিচার করিতে ঘৃণা করি।"

যে কয়টিকথা বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি।

১। বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা; যিনি তাহার বিরোধী তিনিই আমাদিগের কৃতজ্ঞতার ভাজন।

২। বহুবিবাহ এ দেশে স্বতই নিবারিত হইয়া আসিতেছে; অল্পদিনে একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা; তজ্জন্য বিশেষ আড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় না। সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে।

৩। এ কথা যদিও সত্য বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তথাপি ইহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়া কোন ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করা যাইতে পারে না।

৪। আমাদিগের বিবেচনায় বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি প্রজার হিতার্থ, আইনের আবশ্যকতা আছে, ইহা স্থির হয়, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যক নাই।

৫। যে শাস্ত্রীয় বিচারে ভদ্রলোকের বর্জ্জনীয় ভাষার অনুশীলন হয়, তাহা পরিহার্য্য।

উপসংহার কালে, আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তিনি বিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, দেশহিতৈষী, এবং সুলেখক, ইহা আমরা বিস্মৃত হই নাই। বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট অনেক ঋণে বদ্ধ। এ কথা যদি আমরা বিস্মৃত হই তবে আমরা কৃতঘ্ন। আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহা কর্ত্তব্যানুরোধেই লিখিয়াছি। তিনি যদি কর্ত্তব্যানুরোধে বহুবিবাহের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে আমাদের এ কথা সহজে বুঝিবেন।"

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র উগ্র মন্তব্য করেছেন বলে কেউ-কেউ বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে অপ্রিয় মন্তব্য করেছেন সেসময়ে।

'হালিসহর পত্রিকা' লিখেছে :

"যারে পায় তারে ধরে দিগাদিগ্ নাই,
বাহবা বুকের পাটা বলিহারি যাই।
আবোল তাবোল বকে সকলই নীরস,
সাগরে সাঁতার দিতে করেছে সাহস।
কাল চোখে কচি খোকা পরিয়া কাজল
আপন রূপেতে হন আপনি পাগল।
ঈশ্বরচন্দ্রেতে দিতে কলঙ্কের রেখা,
সে দিন সহরে আসি দিয়াছিল দেখা।..."

প্যারী কবিরত্ন ছড়া বেঁধেছেন :

"বঙ্গদর্শনের দর্শনশক্তি চমৎকার,
এ দোষ দর্শনে রোষ হয় না কা'র?
অন্ধ যে জন, নাইকো লোচন,
সমালোচন কেন তা'র?
পদে পদে দেখ্‌তে পাই.
কর্ম্ম কর্ত্তা বোধ নাই,
ভাবরসের মা গোঁসাই,
কেন লেখার ছল ধরে?
দুটো একটা গল্প লিখে,
রাধাকৃষ্ণ বল্‌তে শিখে,
ধরাটাকে সরাসম জ্ঞান করে।
এ আস্পর্দ্ধা ক'ব কা'রে
গোষ্পদ বলে না যা'রে,
ডাগর সাগরে খোঁচা দিতে ভয় হল না তা'র?
হ'তেন যদি কূপ কি ডোবা,
তা হলেও ত পেতো শোভা,
নদ নদী মধ্যে খুঁজে মেলা ভার।
মরি আপ্‌শোষে,
কোন্‌ সাহসে,
কি জিনিষ বেরুলো দেশে,
কিসের এত অহঙ্কার?...
এখন গ্রন্থকর্ত্তা ঘরে ঘরে,
এডিটর বহু নরে,
কিন্তু কলম যে কিরূপে ধরে,
তা অনেকে জানে না।
ভূষিমাল গর্দ্দাভরা,
ভেতরেতে ময়লা পোরা,
কাগজগুলা কেবল ভাল,
বাইণ্ডিং পরিপাটি;
একখানা বিকোয় না দেশে,
মসলা বান্ধে অবশেষে,
তবু কত সর্ব্বনেশে
কলম ধরতে ছাড়ে না।
অতি যা'চ্ছে তাই,
যা' দেখ্‌তে পাই,
'সাগর' বৈ কে লিখ্‌তে জানে,
কার লেখায় কি উপকার?
হুতোম প্যাঁচা বলেছিল,
(বল্‌তে বল্‌তে মনে হোলো)
বেওয়ারিশ বাঙ্গালা ভাষা,
যা'র যা' ইচ্ছা তা'ই করে।

ওয়ারিশ কেউ থাক্‌লে পরে
অনেকে ঝুম্‌ঝুমি পোরে,
লেখার গুণে প্রায় যেতো দেশান্তরে।
কেউ শত্রু নাই,
এরা বাঁচে তাই,
যে যা' করে তাই শোভা পায়,
মগের মুল্লুক অবিচার।
গানি ক্লথ যারা বোনে,
তারা ভাবে মনে মনে,
কিংখাপ কাশ্মীর শাল সে অতি সহজে হয়।..."[২৮]

১৮৭৩ সালের ২৬-জুন 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লিখেছে :

"বহুবিবাহ সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের মতামতকে আমরা সমর্থন করি।... বহুবিবাহ দিন দিন বৃদ্ধি হয়ে সমাজকে পাপে কলুষিত করলেও তাকে উঠিয়ে দেবার জন্য আমরা রাজব্যবস্থার প্রার্থী হতাম না। আমাদের বিশ্বাস ধর্ম বা সামাজিক বিষয়ে রাজা, বিশেষত বিদেশী রাজার হস্তক্ষেপ রাজনীতি বিরুদ্ধ।

বঙ্গদর্শন বিদ্যাসাগর মশাই সম্বন্ধে যে লিখেছেন তা পাঠ করে আমরা দুঃখিত হলাম। শাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকলেও শাস্ত্রবচন দ্বারা কোন ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা কপটাচার নয়। বিদ্যাসাগর মশাই শাস্ত্রবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে অথবা তাঁর মতে শাস্ত্রের পোষকতা আছে এটা গবর্ণমেণ্টকে দেখাবার জন্যে তিনি পুস্তক রচনা করেছিলেন। ধর্মশাস্ত্রে তাঁর বিশ্বাস অবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর পুস্তকের কোন সম্বন্ধ নেই। অতএব তিনি মনে একরূপ বিশ্বাস করে লোককে আর এক কথা জানিয়ে কপটাচারী হতেন না। দ্বিতীয়তঃ আমরা স্বীকার করি যে তিনি তাঁর প্রতিবাদীদের সঙ্গে বিচারে তত শান্ত ভাব দেখান নি। আমাদের অনুমান পুস্তক প্রকাশের পর সেজন্য তিনি দুঃখিত হয়ে থাকবেন। বঙ্গদর্শনে এ সম্বন্ধে এতটা না লিখে শুধু তার উল্লেখমাত্র করলেই যথেষ্ট হত। বিদ্যাসাগর মশাই দেশপূজ্য ব্যক্তি, তাঁর কোন ভ্রান্তি দেখলে আমরা দুঃখিত হয়ে তাঁকে বড়জোর দেখিয়ে দিতে পারি, সেজন্য তাঁকে ছলে কৌশলে লম্বা উপদেশ দিতে পারি না।"

কারো কারো ধারণা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটির মূলে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র হাত আছে।

১৮৭৩ সালের ৩-জুলাই 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লিখেছে : "কলকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের বিশ্বাস যে, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটি আমাদের লেখা। বিশ্বাসের কারণ, পূর্ব্বে বহুবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে অনৈক্য এবং সম্প্রতি বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠপোষকতা। বঙ্গদর্শনের সঙ্গে মতৈক্য হলেও বঙ্গদর্শনে বিদ্যাসাগরের প্রতি ব্যবহার অত্যন্ত দুঃখের। সম্পাদকীয় কার্য্যে যাঁদের কিছু মাত্র প্রাজ্ঞতা জন্মেছে তাঁরা কখনই দেশের অধিকাংশ লোকে যাঁকে দেবতার মত ভক্তি করেন সেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি কখনই ত্রুটি করবেন না। বঙ্গদর্শন সম্পাদক নতুন লেখক, সুতরাং তাঁর সহস্র অপরাধ মার্জ্জনীয়। আমাদের ভরসা, তাঁর

মত সুবোধ সম্পাদক আরো একটু শিক্ষিত হলে এ ভ্রমের পুনরাবৃত্তি হবে না।"

অত্যন্ত স্বাভাবিক, বঙ্কিমচন্দ্রের তীব্র সমালোচনায় বিদ্যাসাগর কিছু বিরক্ত হয়েছিলেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র ওই প্রবন্ধ বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় পুনর্মুদ্রিত করেননি।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর, ১৮৯২ সালে, প্রকাশিত হল বঙ্কিমচন্দ্রের "বিবিধ প্রবন্ধ। দ্বিতীয় ভাগ।" এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র বহুবিবাহবিষয়ক প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করলেন। কিন্তু প্রবন্ধটি অখণ্ড পুনর্মুদ্রিত করেননি।

"বিবিধ প্রবন্ধ। দ্বিতীয় ভাগে"র 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত প্রবন্ধটি সম্পর্কে লিখেছেন :"......বহুবিবাহবিষয়ক প্রবন্ধটি অখণ্ড পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক্ষণে স্বর্গারূঢ়, তীব্র সমালোচনায় তাঁহার আর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁহার গ্রন্থ যেরূপ তীব্রতার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলাম, এখন আর তাহা পারা যায় না। কেন না, এখন তাঁহার শোকে আমরা সকলেই কাতর। যাঁহার জন্য সকলেই রোদন করিতেছি, তাঁহার কোন ত্রুটির সমালোচনা এ সময়ে সাধারণ সমীপে উপস্থিত করিতে পারা যায় না। অতএব যেটুকু তাঁহার গ্রন্থের সমালোচনা, এবং যাহা মল্লিখিত প্রবন্ধের তীব্রাংশ, তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি। যাহা পুনর্মুদ্রিত করিলাম, তাহা যাঁহারাই রাজব্যবস্থার দ্বারা অথবা প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারের দ্বারা সমাজসংস্কার বা সমাজবিপ্লব উপস্থিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষেই খাটে। তাঁহাদের দল এখনও অপরাজিত ও অক্ষুণ্ণ। সেই সম্প্রদায়ভুক্ত খ্যাতি বা অখ্যাতির জন্য লালায়িত মালাবরী নামে একজন পারসী সে দিন একটা হুলস্থূল উপস্থিত করিয়াছিল। অতএব স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন হইয়াও এ প্রবন্ধের সম্পূর্ণ বিলোপও করিতে পারিলাম না।"

এখানেই ক্ষান্ত হননি বঙ্কিমচন্দ্র। 'বিবিধ প্রবন্ধ। দ্বিতীয় ভাগে'র অন্তর্ভুক্ত আলোচ্য প্রবন্ধের আরম্ভে বঙ্কিমচন্দ্র নিবেদন করেছেন : "স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রবর্ত্তিত বহুবিবাহবিষয়ক আন্দোলনের সময়ে বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বহু-বিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের কিছু তীব্র সমালোচনায় আমি কর্ত্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি কিছু বিরক্তও হইয়াছিলেন। তাই আমি এ প্রবন্ধ আর পুনর্মুদ্রিত করি নাই। এই আন্দোলন ভ্রান্তিজনিত, ইহাই প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল, সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশায় ইহা পুনর্মুদ্রিত করিয়া দ্বিতীয় বার তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে আমি ইচ্ছা করি নাই। এক্ষণে তিনি অনুরক্তি বিরক্তির অতীত। তথাপি দেশস্থ সকল লোকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, এবং আমিও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, এজন্য এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত করার ঔচিত্য বিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছি। বিচার করিয়া যে অংশে সেই তীব্র সমালোচনা ছিল, তাহা উঠাইয়া দিয়াছি। কোন না কোন দিন কথাটা উঠিবে, দোষ তাঁহার, না আমার। সুবিচার জন্য প্রবন্ধটির প্রথমাংশ পুনর্মুদ্রিত করিলাম। ইচ্ছা ছিল যে, এ সময়ে উহা পুনর্মুদ্রিত করিব না, কিন্তু তাহা না করিলে আমার জীবদ্দশায় উহা আর পুনর্মুদ্রিত হইবে কি না সন্দেহ। উহা বিলুপ্ত করাও অবৈধ; কেন না, ভাল হউক, মন্দ হউক, উহা আমাদের দেশে আধুনিক

সমাজসংস্কারের ইতিহাসের অংশ হইয়া পড়িয়াছে—উহার দ্বারাই বহু-বিবাহবিষয়ক আন্দোলন নির্ব্বাপিত হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি। আর এখনও Malabari সম্প্রদায় প্রবল—তাঁহারা না পারেন, এমন কাজ নাই।”

বিশ বছর পরে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে একজন বহুবিবাহকারী কুলীন ভারি বিপদে পড়েছিলেন।

শ্বশুরবাড়িটা ঠিক চিনে ওঠা যাচ্ছে না। এই বাড়িটাই কি? বাড়ির সামনে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, কুলীন ভদ্রলোক তাঁকে বললেন—মাগো! বিশ্বনাথ বাড়ুড়ী মশায়ের বাড়িতে কোন পথে যাব? প্রায় বিশবছর আগে একবার সেই বাড়িতে এসেছিলাম। যাদের ছোটো ছেলেমেয়ে দেখে গিয়েছিলাম এতদিনে নিশ্চয় তাদেরও ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে। আমার স্মরণ হয় যেন এই বাড়িখানার মতো সেই বাড়িখানারও উত্তরদিকে একখানা সুপুরিবাগান ছিল।

মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন—সেই বাড়িতে আপনার কী দরকার?

—আমি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করেছি।

শুনে মহিলাটি ম্লানমুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চকিতে বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখেই কুলীন ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন, সর্বনাশ, নিজের বৌকে ‘মাগো’ বলে সম্বোধন করে ফেলেছেন! লজ্জায় সেখান থেকে প্রস্থান করলেন কুলীন ভদ্রলোক।

ঘটনাটা ওই কুলীন ভদ্রলোকের মুখেই শুনেছেন রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। এবং রাসবিহারী তখনি একটি গান রচনা করে শোনালেন :

বহুদিন পরে এসেছি চিনি না শ্বশুরবাড়ী,
কোন পথে যাইব মাগো, বিশ্বনাথ বাড়ুড়ীর বাড়ী॥
যারা ছিল ছেলেপিলে, তাদের হল ছেলেপিলে,
বিয়ে করে গেলেম ফেলে, বয়ে গেল বছর কুড়ি॥
বাড়ীঘর তাঁর নাহি চিনি (কেবল) শ্বশুরের নামটি জানি,
উত্তরেতে বাগানখানি সুপারি সব সারি সারি॥
দ্বিজ রাসবিহারী বলে আর ত হাসি রাখ্‌তে নারি।
তুমি যারে মা বলিলে, সে বটে তোমারি নারী॥[২৯]

বহুবিবাহ নিবারণ প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে বিক্রমপুরের রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নাম এসে পড়ে।

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : “আমি ফুলিয়ার মুখোটী বিষ্ণু-ঠাকুরের বংশোদ্ভব। এবং কাঁচাদিয়ার কুলাচার্য্য মহামান্য °বৈদ্যনাথ বিদ্যাভূষণ ঘটক মহাশয়ের দৌহিত্র। পিতৃকুল বহুবিবাহ করিয়া প্রতিপালন হইতেছেন। মাতৃকুল বর্ত্তমান কৌলীন্য দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। অভি-ভাবক মহাশয় আমাকে বহুবিবাহ করাইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। আমিও সন্তানগণকে বহুবিবাহ করাইলেই একপ্রকার জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারি। কিন্তু এই পাপপ্রথা আমাদের ঐহিক ও পারত্রিকের অনিষ্টকর বলিয়াই আমি কৌলীন্য সংশোধিনী পুস্তকে ও সংগীতাদিতে ইহার সবিস্তর দোষ প্রকাশ করিয়া সংশোধনের প্রার্থনা করি।”[৩০]

বহুবিবাহ প্রসঙ্গে অনেক গান লিখেছেন রাসবিহারী।

রাসবিহারীর লেখা একটি গান এখানে তুলে দিচ্ছি :

(বহুবিবাহকারী স্ত্রীগণের উক্তি মহারাণীর প্রতি)
রাণি গো আমরা নালিশ করি,
এত অবিচার তো সৈতে নারি,
পিতা প্রতিবাদী হয়ে রাখলে ঘরে কয়েদ করি,
(মোদের) পতিধনকে লুটে নিলে সতিনীরা চোদ্দবুড়ি।

স্বামী সব আসামী হয়ে,
মনাগুণে মারে পুড়ি,
(তারা) পলায়ে পলায়ে ফিরে,
যুগান্তে ধরিতে নারি।
তোমার কাছে মাগো ওদের গ্রেপ্তারি প্রার্থনা করি,
(মোদের) উকীল আছেন বিদ্যাসাগর, মোক্তারীতে রাসবিহারী।

রাসবিহারীর লেখা আরেকটি গান :

(কুলীন তনয়াগণের উক্তি)
(হায়) কি বিপদ্সাগর মোদের বিদ্যাসাগর কাতর হল।
হারে নিদারুণ বিধি আর বা কি বাকি রল।
লর্ড মেও উৎসাহী ছিল, (তারে) অকালে কালে হরিল,
কালীকৃষ্ণ কৃষ্ণ পেল,
(মোদের) কপালেই সকল হল।

আমাদের যে দুঃখের সারি,
গেয়ে বেড়ায় বাড়ী বাড়ী,
(হায়) আমাদের সে রাসবিহারী,
আকালের কবলে পল।
কত কত সভা হল,
লোকে বলে হল, হল,
(মোদের) মনে যত আশা হল,
সকলি মনেত রল।

কোথা হে জগদীশ্বর,
(মোদের) ঈশ্বরে আরোগ্য কর,
দুখিনীদের দুঃখ হর,
অবলারা মল-মল।

রাসবিহারী প্রণীত কৌলীন্যবিষয়ক একখণ্ড পুস্তক পেয়ে বিদ্যাসাগর রাসবিহারীকে একখানা চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা তুলে দিচ্ছি :

"অশেষ গুণালংকৃত শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় মদেকসদয়েষু
সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্। আপনকার প্রণীত কৌলীন্যবিষয়ক একখণ্ড পুস্তক পাইয়াছি। আমার পুস্তক মুদ্রিত হওয়ার পূর্ব্বে এই পুস্তক পাইলে আমি

তন্মধ্যে ইহার আদ্যন্ত সন্নিবেসিত করিতাম, এবং আপনকার পুস্তক আদ্যন্ত পাঠ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছি ও তাহার ইংরেজী অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছি। আমার পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদের সঙ্গে এই অনুবাদও মুদ্রিত হইবে। ইংরেজী অনুবাদ কর্ত্তৃপক্ষীয় সাহেববর্গের অবগতির জন্য মুদ্রিত হইতেছে। তাঁহারা আপনকার পুস্তকের অনুবাদ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। এক ব্যক্তি বহুবিবাহকারী কুলীন বহুবিবাহ প্রথায় বিরক্ত হইয়া যাহা বলিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের মনে এতদ্বিষয়ক অন্যায় ও অত্যাচারের বিষয় যত প্রতীতি জন্মিবে, অন্য লোকের কথায় তত হইবার সম্ভাবনা নহে।

গবর্নর জেনেরল বাহাদুর আগামী নবেম্বর মাসে কলিকাতা প্রত্যাগমন করিবেন। ঐ সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাদের অভিপ্রেত বিষয়ের সবিশেষ সমস্ত জানাইব এবং যাহাতে তিনি এতদ্বিষয়ে অনুকূল হন তাহার যথোচিত চেষ্টা করিব। ইতিমধ্যে আবেদন পত্র স্বাক্ষর করাইয়া প্রস্তুত হইতে হইবে। এ অঞ্চলের স্বাক্ষর কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। যাহাতে সকলে মনোযোগী হইয়া অধিক স্বাক্ষর করেন, তাহার চেষ্টা দেখিতেছি এবং তজ্জন্য সকল স্থানে যাইতেও হইতেছে। এ অঞ্চলের নাম স্বাক্ষরের বন্দোবস্ত শেষ হইলে আপনাদিগের অঞ্চলে যাইবার ইচ্ছা আছে। যদি নিতান্ত অসুবিধা না হয়, পূজার পর যাইব স্থির করিয়াছি। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর যত অধিক হইবে ইষ্টসিদ্ধির ততই সম্ভাবনা। এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ মনোযোগী না হইলে ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষের গোচর না করিয়া এবার ক্ষান্ত হওয়া যাইবে না।

বহুবিবাহকারী কুলীনদিগের নামাদি সংগৃহীত হইলেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠাইয়া দিবেন, কোজাগর পূর্ণিমার মধ্যে না পাইলে কোনও উপকার হইবে না।

সর্ব্বসাধারণের জন্য যে আবেদনপত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে আর কিছু পরিবর্ত্তিত করিবেন না। যেরূপ হইলে কর্ত্তৃপক্ষের অভিমত হইবে তদনুরূপ করা হইয়াছে। কুলীনদিগের আবেদন পত্র পরিবর্ত্তন আবশ্যক বোধ হইলে করিতে পারেন। অত্রত্য সমস্ত মঙ্গল মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সংবাদ দ্বারা পরিতোষ প্রদানে আজ্ঞা হয়। ব্যস্ততাবশতঃ ভাল করিয়া পত্র লিখিতে পারিলাম না। ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না, কিমধিকমিতি।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।"[১১]

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করেছেন রাসবিহারী। এবং রাসবিহারীকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেছেন বিদ্যাসাগর।

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : "আমি পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করাতে তিনি আমাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং আমি যে মেলভঙ্গ করিয়া পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহা শুনিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। আমি ঐ কার্য্যকালীন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া বলিলাম যে, যেমন কপিলের অভিশাপে সগরসন্তান সমুদয়ের অধঃপতন হইয়াছিল, সেই-রূপ দেবীবরের কুপ্রথাতেও আমার পূর্ব্ব পিতামহ সকলের অধঃপতন হইতেছে। সগরবংশোদ্ভব মহামতি ভগীরথ পতিতপাবনী গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিয়া স্বীয় পিতৃপুরুষদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, আমিও তদ্রূপ

একটি সাগর আনয়ন মানসে, কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছি। যদি দেবীবরের কলুষিত প্রথা পরিত্যাগ করিয়া পুত্র কন্যার আদান প্রদান কালীন এই সাগর নিয়া উপস্থিত হইতে পারি, তবে আমার পিতৃদেবেরাও যে অপত্যকৃত পাপের ভোগ হইতে মুক্ত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। আমি এই কথা বলিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে উপস্থিত হইবেন এবং উক্ত কার্য্যের সাহায্যার্থে ২০০ শত টাকা প্রদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।"[৩২]

ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ রায়কে লেখা বিদ্যাসাগরের একখানা চিঠি উদ্ধৃত করি :

"নানা গুণালঙ্কৃত

শ্রীযুত রাজা কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর মহাশয়

মদনুগ্রাহকেষু

জয়দেবপুর, ভাওয়াল, ঢাকা

বিনয়বহুমাননমস্কারপুরঃসরং নিবেদনমিদম্ তারপাশা নিবাসী শ্রীযুত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম কুলীনদিগের মধ্যে সার্ব্বদ্বারিক বিবাহ প্রচলিত করিবার নিমিত্ত তিনি উদ্যোগী হইয়াছেন এবং স্বয়ং সর্ব্বাগ্রে সেই প্রথা অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইবেন স্থির করিয়াছেন। তিনি কহিতেছেন এবিষয়ে মহাশয়ের সম্পূর্ণ যত্ন উৎসাহ ও মনোযোগ আছে। এই ব্যাপার সম্পন্ন হইবার বিষয়ে মহাশয় যে সবিশেষ যত্ন করিবেন সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিপ্রায় এই, উল্লিখিত কার্য্য সমাধা কালে আমি উপস্থিত থাকি। আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত আছি কিন্তু মহাশয়ের অভিপ্রায়সূচক পত্র না পাইলে, আমার তথায় যাইতে সাহস হইবেক না। মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলে, আমি তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইব। আমি আর ১০।১২ দিন কলিকাতায় আছি, তৎপরে কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে যাইব। আমার অভিলাষ এই যাইবার পূর্ব্বে মহাশয়ের অভিপ্রায়সূচক অনুগ্রহ লিপি প্রাপ্ত হই।

আমি আষাঢ় মাসে অতিশয় অসুস্থ হইয়াছিলাম, এক্ষণে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছি। মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সংবাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে আজ্ঞা হয়, কিমধিকমিতি ১৯এ পৌষ ১২৮২ সাল।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।"

একই চিঠি পাঠালেন আরো তিনজনকে : জাজিপাড়ার তারাপ্রসন্ন রায়কে, মাহুতটুলীর রাসবিহারী রায়কে, কালীপাড়ার শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরীকে।[৩৩]

বহুবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি, বহুবিবাহের বিরুদ্ধে কোনো সরকারী আইন পাশ হয়নি।

R. W. Frazer লিখেছেন :

"One task Vidyasagar had set his hand to he had to leave unaccomplished. He endeavoured in vain to put an end to the

system whereby the class known as the Kulin Brahmans of Bengal entered into marriages, sometimes formal, sometimes real, with daughters of those of their own class who, unable to obtain husbands, were glad to pay a Kulin Brahman large sums of money for forming a matrimonial alliance which left them free to abandon the numerous women they had thus married." ৩৪

সার্থক না হলেও এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার মূল্য অম্লান হয়ে আছে।

পনেরো

বিদ্যাসাগর প্রমাণ করেছেন, আমাদের শাস্ত্রে বিধবা-বিবাহের বিধি আছে এবং বহুবিবাহের বিধি নেই। আগেই বলা হয়েছে, বিধবা-বিবাহ এবং বহু-বিবাহ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর সাকুল্যে চারখণ্ড বই লিখেছেন।

অনেক পণ্ডিত একমত হতে পারেননি বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। কয়েকজন পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের লেখার প্রতিবাদ করেছেন। সেসব প্রতিবাদের উত্তরে বেনামীতে পাঁচখানা বই বেরিয়েছে : 'অতি অল্প হইল'; 'আবার অতি অল্প হইল'; 'ব্রজবিলাস'; 'বিধবাবিবাহ ও যশোহর-হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা'; 'রত্নপরীক্ষা'।

এখানে বলা দরকার, দ্বিতীয় সংস্করণে 'বিধবাবিবাহ ও যশোহর-হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষিণী সভা'র নতুন নাম হয়েছে। নতুন নাম : 'বিনয় পত্রিকা'।

যা-হোক, 'অতি অল্প হইল,' 'আবার অতি অল্প হইল' এবং 'ব্রজবিলাসে'র লেখক কে? ওই বই তিনখানায় লেখকের নাম লেখা আছে : 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য'।

'বিধবাবিবাহ ও যশোহর-হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা'র লেখক?—'কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ'।

'রত্নপরীক্ষা'র লেখক?—'কস্যচিৎ উপযুক্তভাইপোসহচরস্য'।

কিন্তু 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য', 'কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ' কিম্বা 'কস্যচিৎ উপযুক্তভাইপোসহচরস্য' তো আর সত্যি-সত্যি কোনো লেখকের নাম হতে পারে না। নিশ্চয় ওই বই পাঁচখানা কেউ বেনামীতে লিখেছেন।

কে লিখেছেন বেনামীতে?

এইরকম প্রসিদ্ধি চলে আসছে যে ওই পাঁচখানা বই স্বয়ং বিদ্যাসাগরের বেনামী রচনা।[১]

অগাধ-অপার শাস্ত্রজ্ঞান ছাড়া অমন বই লেখা চলে না। মজলিশী মেজাজে, হাল্কা চালে লেখা। রঙ্গরসে ভর্তি। সোনার সঙ্গে যেমন সোহাগা, শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে তেমনি এসেছে রঙ্গ-ব্যঙ্গ।

'ব্রজবিলাস' 'রত্নপরীক্ষা' ইত্যাদি গ্রন্থের রসিকতা সম্পর্কে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন : "এই রসিকতা সে কালের ঈশ্বর গুপ্ত বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যের মত গ্রাম্যতাদোষে দূষিত নহে; ইহা ভদ্রলোকের, সুসভ্য সমাজের যোগ্য; এবং পিতা পুত্রের একত্র উপভোগ্য। এরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই আছে, এবং ইহার গুণগ্রাহী পাঠকও বেশী নাই। যাঁহারা বিষয়ী লোক, তাঁহারা সংস্কৃতশাস্ত্রের কথা বড় একটা বুঝেন না; সুতরাং তাঁহারা বিদ্যাসাগরের এই রসিকতায় আমোদ পাইবেন না। আর ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বিদায় আদায় লইয়া এত ব্যস্ত যে, শাস্ত্রীয় রসিকতায় আমোদ করিবার সময়ই তাঁহাদিগের নাই। সুতরাং এ দেশে এই সকল গ্রন্থ রচনা করা বিদ্যাসাগরের একপ্রকার কচুবনে মুক্তাছড়ান হইয়াছে; যদি য়ুরোপে হইত, তাহা হইলে এ প্রকারের গ্রন্থ পাঠ করিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা হাস্য-পরিহাসের তরঙ্গ বহিয়া যাইত, এবং বিদ্যাসাগরের নাম এক্ষণে বিদ্যাবত্তার

জন্য যে প্রকার উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, রসিকতার জন্যও তদ্রূপ উচ্চ স্থান অধিকার করিত, সন্দেহ নাই।”[২]

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী লিখেছেন: “ঈশ্বরচন্দ্র কেবল বিদ্যাসাগর বা করুণাসাগর নন, রসসাগরও বটেন, বাংলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ Wit তিনি, আর Polemics রচনার যে তিনি রাজা—বোধ করি সে দাবী আজ আর কেহ অগ্রাহ্য করিবে না। রামমোহনকে অনেক Polemics লিখিতে হইয়াছে, বিদ্যাসাগরের Wit-এর কিছু পাইলে তাঁহার রচনা আজও উপভোগ্য হইয়া থাকিত।...বিদ্যাসাগরের বিরাট ও বিচিত্র মনঃপুরুষের একটি বিশিষ্ট রূপ এইসব রচনায় প্রকাশিত। খরশান নৈয়ায়িকী বুদ্ধির উপরে wit-এর দীপ্তি পড়িয়া রচনাগুলিকে নিষ্ঠুর ভাস্বরতা দান করিয়াছে। বিদ্যাসাগরের মনঃপুরুষের যে অংশ অশ্রুতে বিগলিত হইত—এইসব রচনায় তাহারই তুষারীভূত কঠিন রূপ। মজলিশী মেজাজ, ক্ষুরধার বুদ্ধি, শ্লেষচাতুর্য ও অগাধ শাস্ত্রজ্ঞানের সমবায়ে এগুলি রচিত। এ শ্রেণীর রচনা বাংলা সাহিত্যে লোপ পাইতে বসিয়াছে, কেননা এতগুলি শুভ যোগাযোগ প্রায় আকস্মিক ব্যাপার, সচরাচর ঘটে না। বিদ্যাসাগরচরিত্রের সমগ্রতা জানিবার পক্ষে এগুলি সত্যই অপরিহার্য।”[৩]

‘অতি অল্প হইল,’ ‘আবার অতি অল্প হইল,’ ‘ব্রজবিলাস’ ও ‘রত্নপরীক্ষা’ থেকে কয়েকটি হাস্যরসমধুর অংশ তুলে দিচ্ছি:

“কোনও বিখ্যাত অধ্যাপকের চৌপাড়ীতে দশ বার বৎসর থাকিয়া...এক ব্যক্তি সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি পাঠ সমাপ্ত করিয়া, স্বগ্রামে আসিলে, গ্রামস্থ ভদ্রলোকে, অনেক ব্যয় করিয়া, চৌপাড়ীঘর প্রস্তুত করিয়া দিলেন, এবং ছাত্রদের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, তাঁহাকে অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত করিলেন। তাঁহাদের এত করিবার উদ্দেশ্য এই যে, গ্রামে অধ্যাপক রহিলেন, ব্যবস্থার জন্য অন্য স্থানে যাইতে হইবেক না। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁর কাছে ব্যবস্থা চাহিলে, তিনি, পুঁথি হাঁট্‌কাইয়া, হয় ব্যবস্থা বলিতে পারিতেন না, নয় উল্টা ব্যবস্থা বলিয়া দিতেন। গ্রামস্থ লোকে, বিরক্ত হইয়া, তাঁর অধ্যাপকের নিকটে গেলেন, এবং সবিশেষ সমস্ত জানাইয়া, এই অনুযোগ করিতে লাগিলেন, বিদ্যালঙ্কারকে আপনি কি পড়াইয়াছেন; তাঁর কিছু মাত্র বিদ্যা জন্মিয়াছে, আমাদের এরূপ বোধ হয় না।

এই অনুযোগ শুনিয়া, অধ্যাপক ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, ‘মনে কর, তোমরা অন্ধকার ভাঁড়ারে, তাড়াতাড়ি, নানা দ্রব্যসামগ্রী আনিয়া ফেলিয়াছ; আলো দেওয়া হয় নাই; ও যে স্থানে যে দ্রব্য রাখা উচিত, সে ব্যবস্থা করা হয় নাই; এ অবস্থায়, কোনও একটা দ্রব্য শীঘ্র বাহির করিয়া আনিতে বলিলে, হয় তোমরা তৎক্ষণাৎ তাহা দিতে পারিবে না, নয় একটা উল্টা দ্রব্য আনিয়া দিবে। সেইরূপ বিদ্যালঙ্কারও, তাড়াতাড়ি, অনেক বিদ্যা পেটে পুরিয়া লইয়া গিয়াছেন, এখনও সব সাজান হয় নাই। যত দিন সাজান না হইতেছে, তত দিন এইরূপ হইবেক; সাজান হইলে, আর কোনও গোলযোগ থাকিবেক না’।”[৪]

“তহবিলে টাকা নাই, খাজনা দাখিল হইতেছে না; এজন্য, জমীদার দেওয়ানজিকে ডাকাইয়া কহিলেন, আর সময় নাই, খাজনা দাখিলের কি

করিতেছ। দেওয়ানজি কহিলেন, আপনি সেজন্য উদ্বিগ্ন হইবেন না। পরে, খাজনা দাখিল বিরহে, জমীদারী লাটবন্দী হইলে, জমীদার আবার দেওয়ানজিকে ডাকাইলেন; তিনি আবার অভয়প্রদান করিলেন। খাজনা দাখিল হইল না; জমীদারী যথাকালে নিলাম হইয়া গেল। নিলামের সংবাদ শুনিয়া, বিষণ্ণ ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া, জমীদার দেওয়ানজিকে ডাকাইলেন এবং কহিলেন, তুমি, পূর্ব্বাপর ভরসা দিয়া, অবশেষে আমার সর্ব্বনাশ করিলে। তখন দেওয়ানজি কহিলেন, আপনি অকারণে উদ্বিগ্ন হইতেছেন কেন। কালেক্টর সাহেব নিলাম করিয়াছেন, করুন; গোলাম দখল দিবে না।"[৫]

"এক বড় মানুষের কতকগুলি উমেদার ছিলেন। আহার প্রস্তুত হইলে, বাবু, পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে গিয়া, আহার করিতে বসিলেন; উমেদারেরাও, সঙ্গে সঙ্গে, তথায় গিয়া, বাবুর আহার দেখিতে লাগিলেন। নূতন পটোল উঠিয়াছে; পটোল দিয়া মাছের ঝোল করিয়াছে। বাবু দুই চারি খান পটোল খাইয়া বলিলেন, পটোল অতি জঘন্য তরকারি; ঝোলে দিয়া, ঝোলটাই খারাপ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া, উমেদারেরা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, কি অন্যায়! আপনকার ঝোলে পটোল!! পটোল ত ভদ্র লোকের খাদ্য নয়। কিন্তু, ঝোলে যতগুলি পটোল ছিল, বাবু ক্রমে ক্রমে সকল গুলিই খাইলেন, এবং বলিলেন, দেখ, পটোলটা তরকারি বড় মন্দ নয়। তখন উমেদারেরা কহিলেন, পটোল তরকারির রাজা; পোড়ান, ভাজুন, সুক্তায় দেন, ডালনায় দেন, চড়চড়িতে দেন, ঝোলে দেন, ছোকায় দেন, দম্ করুন, কালিয়া করুন, সকলেই উপাদেয় হয়; বলিতে কি, এমন উৎকৃষ্ট তরকারি আর নাই। বাবু কহিলেন, তোমরা ত বেস লোক; যেই আমি বলিলাম, পটোল ভাল তরকারি নয়, অমনি তোমরা পটোলকে নরকে দিলে; যেই আমি বলিলাম, পটোল বড় মন্দ তরকারি নয়, অমনি তোমরা পটোলকে স্বর্গে তুলিলে। উমেদারেরা কহিলেন, মহাশয়, আপনি অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন; আমরা ঝোলেরও উমেদার নই, পটোলেরও উমেদার নই, উমেদার আপনকার; আপনি যাহাতে খুসি থাকেন, তাহাই আমাদের সর্ব্ব প্রযত্নে কর্ত্তব্য। এই উত্তর শুনিয়া, বাবু নিরুত্তর হইলেন।"[৬]

"এক গ্রামে দুই বিদ্যাবাগীশ খুড় ছিলেন। ইঁহারা দুই সহোদর। জ্যেষ্ঠ নৈয়ায়িক, কনিষ্ঠ স্মার্ত্ত। এক দিন, এক ব্যক্তি ব্যবস্থা জানিতে গিয়াছিলেন। স্মার্ত্ত বিদ্যাবাগীশ বাটীতে নাই শুনিয়া, তিনি চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া, নৈয়ায়িক বিদ্যাবাগীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্যে আসিয়াছ। তিনি কহিলেন, আমার একটী তিন বৎসরের দৌহিত্র মরিয়াছে; তাহাকে পুতিব বা পোড়াইব, ইহার ব্যবস্থা জানিতে আসিয়াছি। নৈয়ায়িক অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন, তাহাকে পুতিয়া ফেল। সে ব্যক্তি জানিতেন, তিন বৎসরের ছেলেকে পোড়াইতে হয়, পুতিতে হয় না; তথাপি, সন্দেহ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলেন। এক্ষণে, পুতিতে হইবে, এই ব্যবস্থা শুনিয়া, তিনি সন্দিগ্ধ মনে ফিরিয়া যাইতেছেন; এমন সময়ে, পথিমধ্যে, স্মার্ত্তের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, জিজ্ঞাসিলেন, পুতিব না পোড়াইব। তিনি পোড়াইতে বলিলেন। তখন সে ব্যক্তি কহিলেন, তবে বড় মহাশয় পুতিতে বলিলেন, কেন। স্মার্ত্ত, জ্যেষ্ঠের মান রক্ষার জন্য, কহিলেন, তিনি পরিহাস করিয়াছেন। অনন্তর তিনি, বাটীতে গিয়া, জ্যেষ্ঠকে কহিলেন, কি বুঝিয়া আপনি এমন ব্যবস্থা দিলেন;

পোড়াইবার স্থলে পুঁতিতে বলা অতি অন্যায় হইয়াছে। নৈয়ায়িক কহিলেন, আমি, অনেক বিবেচনা করিয়াই, পুঁতিতে বলিয়াছি। পুঁতিয়া রাখিলে, যদি পোড়াইবার দরকার হয়, তুলিয়া পোড়াইতে পারিবেক; কিন্তু, যদি পোড়াইতে বলিতাম, তখন পোড়াইয়া ফেলিলে, যদি পুঁতিবার দরকার হইত, তখন কোথায় পাইত।"[৭]

"এক বিদ্যাবাগীশ, কোনও বিষয়ে, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যদি কেহ আমাকে বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহাকে সর্ব্বস্ব দিব। এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া, বিদ্যাবাগীশের ব্রাহ্মণী, নিরতিশয় ব্যাকুলা হইয়া, কাতর বচনে কহিলেন, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ওরূপ সর্ব্বনাশিয়া প্রতিজ্ঞা করিও না; এখনই কেহ বুঝাইয়া দিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া যাইবেক; ছেলেগুলি খেতে না পাইয়া মারা পড়িবেক। তখন বিদ্যাবাগীশ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, আরে হাবি, তুই সে জন্যে ভাবিস্ কেন; আমি যদি না বুঝি, কার বাপের সাধ্য, আমায় বুঝায়।"[৮]

"সকল লোকেই অবাক হয়েছে ও কহিতেছে, তাইত হে! তারানাথটা কি! কিসের জারি করিয়া বেড়ায়। কথায় কথায় বলে, দুনিয়ার মধ্যে পণ্ডিত আমি; আমার সমান কে আছে; আমি বই, সংস্কৃত আর কে জানে? যাঁহারা বিশেষ জানেন, তাঁহারা কিন্তু বলেন, তারানাথ কেবল মুখে পণ্ডিত; তাঁর মুখের জোর যত, বিদ্যার জোর তত নয়।"[৯]

"খুড় পৃথিবীর মধ্যে কাহাকেও মানুষ জ্ঞান করেন না। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, সংস্কৃতবিদ্যা কেবল তাঁর পেটেই অন্তঃসলিলা বহিতেছে। খুড় অনেক আহার অর্থাৎ সংগ্রহ করিয়াছেন, যথার্থ বটে; কিন্তু সংস্কৃতবিদ্যা নিরতিশয় গুরুপাক দ্রব্য, হজম করিতে পারেন নাই; সুতরাং, অপচার ও উদরাধ্মান হইয়া রহিয়াছে; মধ্যে মধ্যে যে নিঃসরণ হইতেছে, তাহার সৌরভে সমস্ত দেশ আমোদিত করিতেছে।"[১০]

"কিছু দিন পূর্ব্বে, কলিকাতায় এক ভদ্রসন্তান বেয়াড়া ইয়ার হইয়াছিলেন। তিনি এক বারে উচ্ছন্ন যাইতেছেন ভাবিয়া, তাঁহার গুরুদেব, উপদেশ দিয়া, তাঁহাকে দুরস্ত করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। 'তোমার কি নরকে যাইবার ভয় নাই', গুরুদেব এই কথা বলিলে, সেই সুবোধ, সুশীল, বিনয়ী ভদ্রসন্তান কহিয়াছিলেন, 'আপনি দেখুন, যত প্রবলপ্রতাপ রাজা রাজড়া, সব নরকে যাইবেন; যত ধনে মানে পূর্ণ বড় লোক, সব নরকে যাইবেন; যত দিলদরিয়া, তুখড় ইয়ার, সব নরকে যাইবেন; যত মৃদুভাষিণী, চারুহাসিনী বারবিলাসিনী, সব নরকে যাইবেন; স্বর্গে যাইবার মধ্যে, কেবল আপনাদের মত টিকিকাটা বিদ্যাবাগীশের পাল। সুতরাং, অতঃপর নরকই গুল্‌জার; এবং, নরকে যাওয়াই সর্ব্বাংশে বাঞ্ছনীয়'।"[১১]

"আমি এ স্থলে, শ্রীমান্ ব্রজনাথ বিদ্যারত্নকে নদিয়ার চাঁদ বলিলাম। কিন্তু, শ্রীমতী যশোহরহিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা দেবী, ইতিপূর্ব্বে, শ্রীমান্ ভুবনমোহন বিদ্যারত্নকে নবদ্বীপচন্দ্র অর্থাৎ নদিয়ার চাঁদ বলিয়াছেন। উভয়েই বিদ্যারত্ন উপাধিধারী, উভয়েই স্ব স্ব বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য, বিদ্যা বুদ্ধির

দৌড়ও উভয়ের একই ধরণের। সুতরাং, উভয়েই নবদ্বীপচন্দ্র অর্থাৎ নদিয়ার চাঁদ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য পাত্র, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু, এ পর্য্যন্ত, এক সময়ে দুই চাঁদ দেখা যায় নাই। সুতরাং, এক জন বই, দুজনের নদিয়ার চাঁদ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু, উভয়ের মধ্যে, এক জন এক বারেই বঞ্চিত হইবেন, সেটাও ভাল দেখায় না; এবং ঐ উপলক্ষে, দুজনে হুড়হুড়ি ও গুঁতগুঁতি করিয়া মরিবেন, সেটাও ভাল দেখায় না। এ জন্য, আমার বিবেচনায়, সমাংশ করিয়া, দুজনকেই, এক এক অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া, সন্তুষ্ট করিয়া, বিদায় করা উচিত।"[১২]

"কিছু কাল পূর্ব্বে, এই পরম পবিত্র গৌড়দেশে, কৃষ্ণহরি শিরোমণি নামে, এক সুপণ্ডিত অতি প্রসিদ্ধ কথক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার কথা শুনিতেন, সকলেই মোহিত হইতেন। এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী, প্রত্যহ, তাঁহার কথা শুনিতে যাইতেন। কথা শুনিয়া, এত মোহিত হইয়াছিলেন, যে তিনি, অবাধে, সন্ধ্যার পর, তাঁহার বাসায় গিয়া, তদীয় পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া, অবশেষে, ঐ বিধবা রমণী গুণমণি শিরোমণি মহাশয়ের প্রকৃত সেবাদাসী হইয়া পড়িলেন।

এক দিন, শিরোমণি মহাশয়, ব্যাসাসনে আসীন হইয়া, স্ত্রীজাতির ব্যভিচার বিষয়ে অশেষবিধ দোষ কীর্ত্তন করিয়া, পরিশেষে কহিয়াছিলেন, 'যে নারী পর পুরুষে উপগতা হয়, নরকে গিয়া, তাহাকে, অনন্ত কাল, যৎপরোনাস্তি শাস্তিভোগ করিতে হয়। নরকে এক লৌহময় শাল্মলি বৃক্ষ আছে। তাহার স্কন্ধ দেশ, অতি তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ কণ্টকে পরিপূর্ণ। যমদূতেরা, ব্যভিচারিণীকে, সেই ভয়ঙ্কর শাল্মলি বৃক্ষের নিকটে লইয়া গিয়া, বলে, তুমি, জীবদ্দশায়, প্রাণাধিকপ্রিয় উপপতিকে, নিরতিশয় প্রেমভরে, যেরূপ গাঢ় আলিঙ্গনদান করিতে; এক্ষণে, এই শাল্মলি বৃক্ষকে, উপপতি ভাবিয়া, সেইরূপ গাঢ় আলিঙ্গনদান কর। সে ভয়ে অগ্রসর হইতে না পারিলে, যমদূতেরা, যথাবিহিত প্রহার ও যথোচিত তিরস্কার করিয়া, বলপূর্ব্বক, তাহাকে আলিঙ্গন করায়; তাহার সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়; অবিশ্রান্ত শোণিতস্রাব হইতে থাকে; সে, যাতনায় অস্থির ও মৃতপ্রায় হইয়া, অতিকরুণ স্বরে, বিলাপ, পরিতাপ, ও অনুতাপ করিতে থাকে। এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া, কোনও স্ত্রীলোকেরই, অকিঞ্চিৎকর, ক্ষণিক সুখের অভিলাষে, পর পুরুষে উপগতা হওয়া উচিত নহে' ইত্যাদি।

ব্যভিচারিণীর ভয়ানক শাস্তিভোগবৃত্তান্ত শ্রবণে, কথকচূড়ামণি শিরোমণি মহাশয়ের সেবাদাসী, ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'যাহা করিয়াছি, তাহার আর চারা নাই; অতঃপর, আর আমি, প্রাণান্তেও, পর পুরুষে উপগতা হইব না।' সে দিন, সন্ধ্যার পর, তিনি, পূর্ব্ববৎ, শিরোমণি মহাশয়ের আবাসে উপস্থিত হইয়া, যথাবৎ আর আর পরিচর্য্যা করিলেন; কিন্তু অন্যান্য দিবসের মত, তাঁহার চরণসেবার জন্য, যথাসময়ে, তদীয় শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন না।

শিরোমণি মহাশয়, কিয়ৎক্ষণ, অপেক্ষা করিলেন; অবশেষে, বিলম্ব দর্শনে, অধৈর্য্য হইয়া, তাঁহার নামগ্রহণ পূর্ব্বক, বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন। সেবাদাসী, গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন; এবং, গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, গলদশ্রু লোচনে, শোকাকুল বচনে কহিলেন, 'প্রভো!

কৃপা করিয়া, আমায় ক্ষমা করুন। সিমুল গাছের উপাখ্যান শুনিয়া, আমি ভয়ে মরিয়া রহিয়াছি; আপনকার চরণসেবা করিতে, আর আমার, কোনও মতে, প্রবৃত্তি ও সাহস হইতেছে না। না জানিয়া যাহা করিয়াছি, তাহা হইতে কেমন করিয়া নিস্তার পাইব, সেই ভাবনায় অস্থির হইয়াছি।'

সেবাদাসীর কথা শুনিয়া, পণ্ডিতচূড়ামণি শিরোমণি মহাশয় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন; এবং দ্বারদেশে আসিয়া, সেবাদাসীর হস্তে ধরিয়া, সহাস্য মুখে কহিলেন, 'আরে পাগলি! তুমি এই ভয়ে আজ শয্যায় যাইতেছ না? আমরা, পূর্ব্বাপর, যেরূপ বলিয়া আসিতেছি, আজও সেইরূপ বলিয়াছি। সিমুল গাছ, পূর্ব্বে, ঐরূপ ভয়ঙ্কর ছিল, যথার্থ বটে; কিন্তু শরীরের ঘর্ষণে ঘর্ষণে, লৌহময় কণ্টক সকল ক্রমে ক্ষয় পাওয়াতে, সিমুল গাছ তেল হইয়া গিয়াছে; এখন, আলিঙ্গন করিলে, সর্ব্ব শরীর শীতল ও পুলকিত হয়।' এই বলিয়া, অভয়প্রদান ও প্রলোভনপ্রদর্শন পূর্ব্বক, শয্যায় লইয়া গিয়া, গুণমণি শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে, পূর্ব্ববৎ, চরণসেবায় প্রবৃত্ত করিলেন।"[১৩]

"দেখুন, আমি, ব্রজবিলাস লিখিয়া, বিদ্যারত্ন খুড়র মানবলীলাসংবরণের কারণ হইয়াছি। মদীয় বিষময়ী লেখনীর আঘাতেই, তদীয় জীবনযাত্রার সমাপন হইয়াছে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। আমাদের সমাজে, গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা অতি উৎকট পাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্য ক্রমে, ব্রজবিলাস লিখিয়া, কোন পাপে লিপ্ত হইয়াছি, বলিতে পারি না।"[১৪]

"এক দিন, বিদ্যাবাগীশের অধ্যাপক, নদীতে অবগাহন করিয়া, স্নান করিতেছেন; বিদ্যাবাগীশ নদীর তীরে দণ্ডায়মান আছেন। বিদ্যাবাগীশ দেখিতে পাইলেন, একটা কুমীর তাঁহার অধ্যাপককে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। তদ্দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, বিদ্যাবাগীশ স্বীয় অধ্যাপককে সতর্ক করিবার নিমিত্ত কহিলেন, গুরো, সাবধানো ভব, মহীলতা আয়াতি; গুরুদেব! সাবধান হউন, একটা মহীলতা আসিতেছে। বিদ্যাবাগীশের অধ্যাপক জানিতেন, মহীলতা শব্দের অর্থ কেঁচো; কেঁচো আসিতেছে, সে জন্য শঙ্কিত ও সাবধান হইবার আবশ্যকতা কি? এই ভাবিয়া তিনি, নিঃশঙ্ক চিত্তে, নদীতে স্নান করিতে লাগিলেন; ইত্যবকাশে, কুম্ভীর আসিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিল।

অদ্ভুত অভিধানবিদ্যার ঈদৃশ সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয় উৎকৃষ্ট উদাহরণ অতি বিরল।"[১৫]

"কোনও গ্রামে এক বিদ্যাবাগীশপরিবার ছিলেন। বিদ্যাবাগীশেরা চারি সহোদর। চারি সহোদরই বিদ্কুটে নৈয়ায়িক। জ্যেষ্ঠের স্বগ্রামেই চতুষ্পাঠী ছিল; মধ্যম, তৃতীয়, ও কনিষ্ঠ কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী গ্রামত্রয়ে, অধ্যাপনা করিতেন। তদীয় বাসগ্রামের সন্নিকটে, একটি ফৌজদারী আদালত ছিল। আদালতের সেরেস্তাদার ঐ গ্রামে বাসা করিয়া থাকিতেন, এবং বিদ্যাবাগীশদের বাটীর সম্মুখে যে গ্রাম্য রাস্তা ছিল, প্রায় প্রত্যহ, ঐ রাস্তা দিয়া, আদালতে যাতায়াত করিতেন।

এক দিন, জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশ, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, ধূম্রপান করিতেছেন, সেই সময়ে সেরেস্তাদার, আদালতের উপযোগী বেশে, কর্ম্মস্থানে

যাইতেছেন। ঈদৃশবেশধারী পুরুষ, ইতঃপূর্ব্বে, কখনও, জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশের নয়নগোচর হয় নাই; সুতরাং, তদ্দর্শনে তিনি চমৎকৃত হইলেন। সেই দিন, অপরাহ্ণেও, বিদ্যাবাগীশ, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, ধূম্রপান করিতেছেন, সেই সময়ে, সেরেস্তাদার, আদালত হইতে, বাসায় প্রতিগমন করিতেছেন।

এইরূপে, ক্রমাগত তিন দিন, সেরেস্তাদারকে, তাঁহার বাটীর সম্মুখ দিয়া, যাতায়াত করিতে দেখিয়া, বিদ্যাবাগীশের মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল, অঙ্গবস্ত্র অঙ্গে, উষ্ণীষ মস্তকে, চর্ম্মপাদুকা চরণে, ঈদৃশবেশভূষাবিশিষ্ট ব্যক্তির, অস্মদ্ভবনের সম্মুখ দিয়া, প্রত্যহ গতাগত, ইহার অভিষন্ধি কি। নৈয়ায়িক বিদ্যাবাগীশদিগের উদর তর্কশক্তিতে পরিপূর্ণ; তর্কশক্তিবলে, বিদ্যাবাগীশ সিদ্ধান্ত করিলেন, ঈদৃশ মনোহর বেশে, প্রত্যহ গতাগত করিবার অভিষন্ধি লাম্পট্য। তৎপরে, এই লাম্পট্যের স্থল কোথায়, এই প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, অপ্রতিহত তর্কশক্তিপ্রভাবে, অস্মদ্ভবনই এ ব্যক্তির লাম্পট্যের স্থল, এই সিদ্ধান্ত করিলেন। পরিশেষে, কোন ব্যক্তি ইহার লাম্পট্যের লক্ষ্য এই প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, বিদ্যাবাগীশ এই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, জ্যেষ্ঠা বধূ বৃদ্ধা হইয়াছেন, তিনি ঈদৃশবেশভূষাবিশিষ্ট ব্যক্তির লাম্পট্যের লক্ষ্য হইতে পারেন না; মধ্যমা তথৈব চ, তিনিও লক্ষ্য নহেন; তৃতীয়া রূপলাবণ্যশালিনী বটে, কিন্তু দুটি কন্যা ও একটি পুত্র প্রসব করিয়া, গলিতযৌবনা হইয়াছেন; সুতরাং, তিনিও ঈদৃশ ব্যক্তির লাম্পট্যের লক্ষ্য হইতে পারেন না; অবশেষে, কনিষ্ঠা পূর্ণযৌবনা ও বিলক্ষণ রূপলাবণ্যশালিনী; অতএব, তিনিই এ ব্যক্তির লাম্পট্যের লক্ষ্য, এই সিদ্ধান্ত করিলেন।

অপ্রতিহত তর্কশক্তির প্রভাবে, এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়া, বিদ্যাবাগীশ স্বীয় সহোদরদিগকে, এখানে ঘোর বিপদ উপস্থিত, তোমরা পত্র পাঠ বাটীতে আসিবে, কোনও মতে অন্যথাচরণ করিবে না, এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন। তাঁহারা বাটীতে উপস্থিত হইলে, চারি জনে কমিটি করিতে বসিলেন। জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশ, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত ও স্বকৃত সমস্ত সিদ্ধান্ত অনুজদিগের গোচর করিলেন। অনুজেরা জ্যেষ্ঠকৃত সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ সম্মতিপ্রদর্শন করিলে, জ্যেষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণকার কর্ত্তব্য কি, বল। কনিষ্ঠ, কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া, রোষরক্ত নয়নে, উদ্ধত বচনে কহিলেন, এক্ষণকার কর্ত্তব্য প্রহার। জ্যেষ্ঠেরা, তথাস্তু বলিয়া, তদীয় সিদ্ধান্তের সর্ব্বাঙ্গীণ অনুমোদন করিলেন।

পর দিন, চারি সহোদর, বদ্ধপরিকর হইয়া, সেরেস্তাদারের আগমন-প্রতীক্ষায়, যষ্টি হস্তে, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি যথাকালে উপস্থিত হইবামাত্র, আঃ! দুরাত্মন্, তোমার যদ্রূপ আচরণ, তদুপযুক্ত ফল-ভোগ কর, এই বলিয়া, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, চারি সহোদরেই, নিতান্ত নির্দ্দয় রূপে, তাঁহার উপর, অবিশ্রান্ত, যষ্টিপ্রহার করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে, ঘটনা ক্রমে, কতকগুলি ভদ্রলোক ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বিদ্যাবাগীশদিগকে প্রহারক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারিলে, সেরেস্তাদার, নিঃসন্দেহ, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেন।

এইরূপে, নিস্তার পাইয়া, সেরেস্তাদার, হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিলেন, তিনি, বিদ্যাবাগীশদিগকে আদালতে হাজির করিবার নিমিত্ত, দারোগাকে পাঠাইয়া দিলেন। দারোগা বিদ্যাবাগীশ-দিগকে হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা

করিলেন, আপনারা সেরেস্তাদারকে প্রহার করিলেন কেন। জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশ কহিলেন, ঐ দুরাত্মা অস্মদ্ভবনে লাম্পট্য করিয়াছে; সে জন্য প্রহার করিয়াছি। হাকিম শুনিয়া, সন্দিহান হইয়া, সেরেস্তাদারকে বলিলেন, এ বিষয়ে তোমার কি বক্তব্য আছে, বল। সেরেস্তাদার কহিলেন, ধর্ম্মাবতার, আমি ধর্ম্মপ্রমাণ বলিতেছি, আমি, কস্মিন্ কালেও উঁহাদের বাটীতে প্রবেশ করি নাই; গ্রামের যে সকল লোক আদালতে উপস্থিত আছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কিরূপ চরিত্রের লোক, জানিতে পারিবেন। হাকিম উপস্থিত গ্রামস্থ লোকদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র, তাঁহারা একবাক্য হইয়া কহিলেন, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়েরা যাহা বলিতেছেন, তাহা কখনই সম্ভব নহে। আমরা সেরেস্তাদার মহাশয়কে সবিশেষ জানি, উনি সেরূপ প্রকৃতির ও সেরূপ চরিত্রের লোক নহেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়েরা উঁহার উপর ওরূপ দোষারোপ করিতেছেন কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি উঁহাদের এ কথায়, কোনও মতে, বিশ্বাস করিবেন না।

এই সকল কথা শুনিয়া, হাকিম বিদ্যাবাগীশদিগকে বলিলেন, সেরেস্তাদার আপনাদের বাটীতে লাম্পট্য করিয়াছেন, ইহা প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করুন; নতুবা, কেবল আপনাদের কথায়, আমি উঁহাকে দোষী স্থির করিতে পারিব না। তখন, জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশ, যে অদ্ভুত তর্কপরম্পরা দ্বারা, স্বীয় কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর সহিত, সেরেস্তাদারের লাম্পট্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা হাকিমের গোচর করিলেন। হাকিম শুনিয়া, হাসিতে হাসিতে, জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার আর কোনও প্রমাণ আছে কি না; যে প্রমাণ দেখাইলেন, উহা দ্বারা, আপনাদের বাটীতে, সেরেস্তাদারের লাম্পট্য সিদ্ধ হইতে পারে না। এই কথা শুনিয়া, যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া, জ্যেষ্ঠ বিদ্যাবাগীশ হাকিমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ইহাতেও যদি লাম্পট্য সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে, ন্যায়শাস্ত্রের সমস্ত পুস্তক জলে ফেলিয়া দেওয়া উচিত; ঐ সকল পুস্তকের আর কোনও প্রয়োজন লক্ষিত হইতেছে না; আমরা চলিলাম। এই বলিয়া, চারি সহোদরে, ক্রোধভরে, কম্পিতকলেবরে, আদালত হইতে প্রস্থান করিলেন। হাকিম প্রভৃতি আদালতস্থ সমস্ত লোক, উচ্চৈঃ স্বরে, হাস্য করিতে লাগিলেন।”[১৬]

“রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুরের অধিকার কালে, নবদ্বীপে, কেনারাম ও কেবলরাম নামে, দুই সহোদর ছিলেন।...কোনও বিশিষ্ট কারণ বশতঃ, কেবলরাম, কেনারামের উপর অতিশয় কুপিত হইয়া, কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন, এবং রাজা বাহাদুরের সহিত সাক্ষাত করিয়া, নিবেদন করিলেন, মহারাজ, আমার জ্যেষ্ঠ আমার উপর, সর্ব্ব প্রকারে, অত্যাচার করিতেছেন; আপনি, দয়াপ্রদর্শন পূর্ব্বক, তাঁহাকে আনাইয়া, বিচার করুন; নতুবা আমায়, নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া, স্থানান্তরে যাইতে হইবেক; নিতান্ত অসহ্য না হইলে, আমি মহারাজকে বিরক্ত করিতে আসিতাম না।

কেবলরাম বিদ্যাবাগীশের প্রার্থনা শ্রবণ ও কাতরতা দর্শন করিয়া, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন, আপনি অদ্য রাজবাটীতে অবস্থিতি করুন; কল্য প্রাতে, আপনকার সঙ্গে, এক পদাতিক পাঠাইব। আপনি আপনকার জ্যেষ্ঠকে দেখাইয়া দিলে, পদাতিক তাঁহাকে লইয়া আসিবেক; ঐ সঙ্গে আপনিও আসিবেন; উভয়ের কথা শুনিয়া, যদি তাঁহার দোষ দেখিতে পাই, সমুচিত দণ্ডবিধান করিব।

পর দিন প্রাতঃকালে, কেবলরাম, পদাতিক সমভিব্যাহারে, নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়ৎ দূর গিয়া, প্রস্রাবের উদ্রেক হওয়াতে, পদাতিক রাস্তার ধারে প্রস্রাব করিতে বসিল; কেবলরাম সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। পদাতিকের উপবেশনস্থানটি প্রস্রাবপাতের স্থান অপেক্ষা নিম্ন; সুতরাং, প্রস্রাব নিম্নাভিমুখে আসাতে, পদাতিকের কাছা ভিজিয়া গেল। তদ্দর্শনে সাতিশয় কুপিত হইয়া, নৈয়ায়িক কেবলরাম কহিলেন, অহে পদাতিক, তুমি, জলের নিম্নগতি, ইহা অবগত নহ; সুতরাং, তুমি মূর্খের শিরোমণি; তোমা দ্বারা আমার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পন্ন হওয়া, কোনও মতে, সম্ভাবিত নহে। তুমি কি রূপে পদাতিকের কার্য্য সম্পন্ন কর, বুঝিতে পারিতেছি না। আমি তোমায় লইয়া যাইব না।

এই বলিয়া, সেই পদাতিককে লইয়া, কেবলরাম রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন; এবং প্রার্থনা করিলেন, মহারাজ, আমায় অন্য পদাতিক দেন, এ পদাতিকের বুদ্ধিশক্তি ও তর্কশক্তি নাই; সুতরাং, ইহা দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হওয়া, কোনও মতে, সম্ভাবিত নহে; এ অতি অকর্ম্মণ্য পদাতিক। রাজা, কেবলরাম বিদ্যাবাগীশের মুখে পদাতিকের প্রস্রাবকরণ প্রভৃতি সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, অন্য এক পদাতিককে নিযুক্ত করিয়া, তাহাকে বলিয়া দিলেন, যদি প্রস্রাব করিতে হয়, এমন স্থানে বসিবে, যেন বিদ্যাবাগীশ দেখিতে না পান। পদাতিক, যে আজ্ঞা মহারাজ, বলিয়া, কেবলরাম বিদ্যাবাগীশের সহিত প্রস্থান করিল।

কেবলরাম যে সময়ে বাটীতে উপস্থিত হইলেন, সে সময়ে কেনারাম স্নানান্তে আহ্নিক করিতে বসিয়াছিলেন। কেবলরাম পদাতিককে কহিলেন, "ভোঃ অয়ম্"। পদাতিক বুঝিতে পারিল না। তখন কেবলরাম বিরক্ত হইয়া কহিলেন, তুমি কেমন পদাতিক হে, শব্দপ্রয়োগ করিলেও ব্যক্তিগ্রহ করিতে পার না। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, পদাতিক বুঝিতে পারিল, যিনি আহ্নিক করিতেছেন, তিনিই তাহার আসামী। তখন সে কহিল, মহাশয়, অত ব্যস্ত হইতেছেন কেন; উঁহার আহ্নিক সমাপ্ত হইলে আমি রাজবাড়ীর হুকুম জারী করিব। এই কথা শুনিয়া, কেবলরাম অত্যন্ত কুপিত হইয়া কহিলেন, তুমি অতি অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি; তোমা দ্বারা আমার অভিপ্রেত সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। ইহা কহিয়া, বিদ্যাবাগীশ, পদাতিক সহিত, পুনরায় রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন, এবং রাজাকে কহিলেন, মহারাজ, যবন পদাতিক ব্যতিরেকে, আমার কার্য্য সম্পন্ন হইবেক না। রাজা, সবিশেষ অবগত হইয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, তদীয় প্রার্থনায় সম্মত হইলেন।

পর দিন প্রাতে, যবন পদাতিক লইয়া, কেবলরাম বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কেনারাম স্নানান্তে আহ্নিক করিতে বসিয়াছেন। পদাতিক আসামী দেখাইয়া দিতে বলিলে, কেবলরাম জ্যেষ্ঠের দিকে অংগুলিপ্রয়োগ করিলেন। পদাতিক কেনারামকে বলিল, ও ঠাকুর, নেমে এস, এখনই তোমায় রাজবাড়ী যাইতে হইবেক। কেনারাম, তাহার কথা গ্রাহ্য না করিয়া, আহ্নিক করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে পদাতিক, কুপিত হইয়া, কহিল, ও অমুকের ভাই, ভাল চাহিস্ তো নেমে আয়। অশ্লীল ভাষায় ভগিনী উচ্চারণ পূর্ব্বক, পদাতিক এই কথা বলাতে, কেনারাম, ক্রোধে অন্ধ হইলেন, এবং আহ্নিক পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পদাতিককে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কি কারণে তিনি, কুপিত হইয়া, পদাতিককে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন, কেবলরাম, সহসা তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; অবশেষে,

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের প্রকৃতিসিদ্ধ অদ্ভুত বুদ্ধিশক্তি ও অপ্রতিহত তর্কশক্তির প্রভাবে, পদাতিকের উচ্চারিত শব্দ গুলির অন্বয়যোজনা ও অর্থগ্রহ করিয়া, ক্রোধে অন্ধ হইলেন, এবং অরে দুরাত্মন্, নিরপরাধা ব্রজেশ্বরীর উপর তোমার আক্রমণ, এই বলিয়া, তিনিও পদাতিককে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

পদাতিক, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, অশ্লীলবাক্যবর্ষণ ও তাঁহাদের মুখে থুৎকারক্ষেপণ করিতে আরম্ভ করিলেন, স্মার্ত্ত, জাতিপাতভয়ে, সরিয়া গেলেন; তদ্দৃষ্টে কনিষ্ঠও প্রহারে বিরত হইলেন। তোদের দুই অমুকের ভাইকে দেখিয়া লইব, এই বলিয়া কটূক্তিবর্ষণ করিতে করিতে, পদাতিক প্রস্থান করিল। বিদ্যাবাগীশদের বিধবা ভগিনী ব্রজেশ্বরী ঠাকুরদের অন্ন পাক করিতেছিলেন। কেবলরাম তাঁহার নিকটে গিয়া কহিলেন, ভগিনি, যবনান্ত হইয়াছ, আপাততঃ স্নান ও বস্ত্রত্যাগ কর; পরে, দাদা যেরূপ ব্যবস্থা দিবেন, তদনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিলেই, তোমার পাপমোচন হইবেক; এ বলাৎকার, তোমার ইচ্ছাকৃত পাপ নহে, ইত্যাদি।"[১৭]

কেবল কলমের লেখায় নয়, মুখের কথায়ও বিদ্যাসাগর নিপুণ রঙ্গ-ব্যঙ্গ করতে পারেন।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন: "বিদ্যাসাগরকে সকলেই দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিয়াই জানেন; কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহার কথাবার্ত্তায় হাসি-তামাসার কি একটি অদ্ভুত শক্তি ছিল।"[১৮]

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী লিখেছেন: "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাদুড়বাগানের বাটীতে যাইয়া তাঁহার লাইব্রেরী দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম; কত যত্নে কত অর্থব্যয় করিয়া, কত সময় ও পরিশ্রম সাহায্যে যে সে অদ্ভুত লাইব্রেরী সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার ধারণা করা সম্ভব নহে। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, জার্ম্মান, ফ্রেঞ্চ সকল ভাষাতেই সর্ব্ব শাস্ত্রেরই গ্রন্থ সংগ্রহ হইয়াছিল; সকল গ্রন্থই বহু অর্থব্যয় করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বিলাত ও জার্ম্মানী হইতে বাঁধাইয়া আনিতেন। একবার তাঁহার অনুরাগী এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"এত খরচ করিয়া এ সকল বই বাঁধাইয়া আনিবার প্রয়োজন কি?" বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তর করিলেন—"ভালবাসি বলিয়া। তুমি তোমার কুরূপা স্ত্রীকে এত রত্নালংকারে ভূষিতা করিয়া অর্থ নষ্ট কর কেন?" বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন রহস্যপ্রিয় ছিলেন তেমনই স্পষ্টবক্তা ছিলেন। তাঁহার গল্প করিবার ক্ষমতা, তাঁহার লোকপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। বিদ্যাসাগর মহাশয় গল্প আরম্ভ করিলে লোকে মুগ্ধ হইয়া শুনিত—মজলিস ভাঙিগত না।"[১৯]

ক্ষুদিরাম বসু লিখেছেন: "সে সময়ে Calcutta Reading Room বলে এক পাঠাগার ছিল। সেখানে নানা সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রাদি থাক্‌ত। ভৈরব বাঁড়ুজ্যে ম'শায় তার সম্পাদক ছিলেন। সেখানে এক দিন এক অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি Mr. W. C. Bonnerjee নামে বিশেষ পরিচিত, তিনি সে সভায় ছিলেন। তিনি এক জন সুপরিচিত বক্তা ছিলেন। ইংরাজী ভাষা তাঁর বিশেষরূপে আয়ত্ত ছিল, তাঁর ভাষার নৈপুণ্যও ছিল। তিনি অনর্গল সাধুভাষায় এমন বক্তৃতা দিতে পার্‌তেন যে, অনেক সাহেব তাঁর বক্তৃতার সুখ্যাতি কর্‌তেন। শুধু বক্তৃতা কেন, ইংরাজী চলন-বলনও বেশ নিখুঁতভাবে অনুকরণ করেছিলেন। তাঁর বন্ধু শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু

ম'শায় বলেছিলেন, "ইংরাজী ধরণ এমন সম্পূর্ণভাবে নিতে, বাঙ্গালীর মধ্যে আর কেউ পারে নি। রুমালে নাকঝাড়াও দস্তুর মত ইংরাজী কায়দায় কর্‌তেন। বিলাতে জন্মানর অধিকারে অধিকারী কর্‌বার জন্য তিনি এমন সব পন্থা অবলম্বন কর্‌তেন যাতে তাঁর সন্তান বিলাতে ভূমিষ্ঠ হয়। বাস্তবিক পক্ষে তখন সাহেবিয়ানারই যুগ ছিল। আমাদের ছাত্রজীবনে আমরা তখন ইংরাজী ছাড়া বাঙলা একরকম বল্‌তামই না। কোথাও কিছু বল্‌তে হলে সকলে মুখস্ত করে যেত, অন্য বই থেকে চুরি করে সকলে ব'ল্‌ত। তাতেই খুব বাহবা পাওয়া যেত। অনেকেই অবশ্য নিজে নিজেই কিছু বল্‌তে পার্‌তেন। এ হেন ইংরাজীয়ানার যুগের অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন—বিদ্যাসাগর ম'শায়। আমরা সব ইংরাজী-নবীশের দল সেখানে ছিলাম। আমরা আশা করেছিলাম বিদ্যাসাগর ম'শায়ের কাছ থেকেও ইংরাজী শুন্‌ব। কিন্তু তিনি সবাইকে সেখানে হাসাতে লাগলেন। এক এক জনের বক্তৃতা হয়ে যায় আর তিনি অন্য এক জনকে উদ্দেশ করে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "এইবার তুমি একটু বল বাবা, বল তুমি একটু বল!" তাঁর বলবার এমনি ভঙ্গিমা যে প্রতি কথায় হাসির ধূম পড়ে যেতে লাগল। তাঁর জন্য তামাক এল, তিনি মুহুর্মুহু তামাক খেতেন। আমার কিন্তু খুব বিরক্তিকর হয়েছিল। মনে হ'ল, ইনি পাগল না কি? সেই পোষাক, থেলো হুঁকো হাতে, উড়ের মত মাথা কামান, আর সেই লোক-হাসাবার ধূম। এমন কি Mr. W. C. Bonnerjee ও বাঙ্গালী রকমে হাস্‌তে লাগ্‌লেন।"[২০]

রসরাজ অমৃতলাল বসু বলেছেন: "বিদ্যাসাগর তাঁহার পিতৃদেবকে কাশীতে রাখিতে গিয়াছিলেন। লোকনাথবাবুর বাসাতেই তিনি উঠিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই লোকনাথবাবুকে হোমিওপ্যাথি শিখিতে বলেন। লোকনাথ-বাবু যথাসাধ্য তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তখন গঙ্গার উপরে সেতু নির্ম্মিত হয় নাই। ভোর রাত্রে নৌকাযোগে নদী পার করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে রাজঘাট ষ্টেশনে পোঁছাইয়া দিতে হইবে। সে কার্য্যের ভার আমারই উপর পড়িল। ঘুমাইয়া পড়িলে চলিবে না; যদি ভোর রাত্রে জাগিতে না পারি? স্থির করিলাম,—ঘুমাইব না; সতীর্থ বন্ধু মধুসূদন লাহিড়ীর ইঙ্গিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ধরিয়া বলিলাম—'গল্প বলিতে হইবে।' তিনি বলিলেন,—'গল্প শুন্‌বি? কি রকম গল্প বল্‌ব,—দুমিনিটের মত, না আধ ঘণ্টার মত?' ছোট বড় বিচিত্র রূপকথায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত নিশাযাপন করিলাম। গভীর নিশীথে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—'ওরে চুড়ী কিন্‌তে হবে।' এত রাত্রে দোকানদারকে পাওয়া যাবে কেমন করিয়া? তিনি বলিলেন—'পেতেই হবে; কাশীতে এসে চুড়ী না নিয়ে ফিরে যাব কি করে?' সেই রাত্রিতে চুড়ী কিনিয়া আনা হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় আবার গল্প বলিতে লাগিলেন। শেষ রাত্রে তাঁহাকে রেল ষ্টেশনে পোঁছাইয়া দিলাম। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সে রাত্রি ভুলিব না।"[২১]

অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ বিভ্রাটে'র দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কটি যতদূর মুখস্থ ছিল হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একদিন আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন বিদ্যাসাগরকে। শুনে বিদ্যাসাগর খুব হেসেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিদ্যাসাগরের হাসির মধ্যে একটু বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন: "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাসি একটু বিচিত্র ছিল। তিনি হাসিতে হাসিতে নাগিয়া পড়িতেন। এক এক সময় মনে হইত, তিনি বুঝি-বা চেয়ার হইতে পড়িয়া যান।"[২২]

নিজের হাতে অন্যকে রেঁধে খাওয়ানো বিদ্যাসাগরের একটা সখ। খেতে বসিয়ে প্রায়ই তিনি রঙ্গ করে বলতেন—

হুহু দেয়ং হাঁ হাঁ দেয়ং দেয়াঞ্চ করকম্পনে।
শিরসি চালনে দেয়ং ন দেয়ং ব্যাঘ্র ঝম্পনে॥"[২৩]

একটু-আধটু সংস্কৃত ভাষা শিখেই কেউ-কেউ নিজেকে দিগ্গজ ভাবে, সংস্কৃতে কথাবার্তা কইতে আরম্ভ করে। সেসব একেবারেই পছন্দ করেন না বিদ্যাসাগর।

একদিন একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। হিন্দুস্থানী পণ্ডিতজী সংস্কৃতে কথা বলতে লাগলেন। আর বিদ্যাসাগর সব কথার জবাব দিতে লাগলেন হিন্দীতে।

ভুল সংস্কৃত বলছেন কিন্তু পণ্ডিতজী। পাশেই বসে ছিলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। পণ্ডিতজীর সঙ্গে কথা কইতে-কইতে একফাঁকে বিদ্যাসাগর কৃষ্ণকমলকে বললেন—এদিকে কথায়-কথায় কোষ্ঠশুদ্ধি হচ্ছে, তবুও হিন্দী বলা হবে না![২৪]

ভাটপাড়ার কয়েকজন পণ্ডিত কলকাতায় এসেছেন। একজন বড়মানুষের কাছে বার্ষিক বৃত্তি আদায় করতে এসেছেন। আগের কালে বড়মানুষেরা সংস্কৃত পণ্ডিতদের অকাতরে বৃত্তি দিতেন, কিন্তু সেদিন আর নেই।

যা হোক, কাজ সেরে ফিরতি পথে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরা। কথায় কথায় একজন পণ্ডিত বললেন—আজকাল ব্রাহ্মণদের আর ব্রহ্মতেজ নেই।

প্রতিবাদে বিদ্যাসাগর রঙ্গ করে বললেন—সে কি কথা। না, আপনি ভুল বলছেন। আজকাল বরং ব্রহ্মতেজ অনেক বেড়ে গেছে। আগের কালে আপনারা কারো কাছাকাছি হলে তিনি আপনাদের তেজ টের পেতেন। কিন্তু আজকাল আপনাদের তেজ এত বেড়ে গেছে যে আপনারা কোনো বড়মানুষের দরজা পেরোলে সেই বড়মানুষও গরম হয়ে ওঠেন।

সকলে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন।[২৫]

যাঁদের মুখ থেকে কথায় কথায় সংস্কৃত শ্লোক বেরোয়, বিদ্যাসাগর তাঁদের ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে বিদ্যাসাগর বলেছেন—লোকটার রকম দেখছ? টুলো পণ্ডিতের মত কথায় কথায় ভট্টির শ্লোক quote করে।[২৬]

একটা কাহিনী আছে।

বিদ্যাসাগরকে একবার একটি ছাত্র জিজ্ঞেস করল—কী উপায়ে নির্ভুল লেখা যায়?

বিদ্যাসাগর বললেন—খুব সোজা একটা উপায় আছে। সে-উপায় মেনে চললে কখনো ভুল হবে না।

এমন কী উপায় আছে?

বিদ্যাসাগর বললেন—কখনো লিখো না।[২৭]

একটি এম. এ. পাশ অচেনা ছোকরা বিদ্যাসাগরের কাছে মাস্টারি চাইতে এসেছে। ছোকরা থিয়োসফিস্ট। মাথায় লম্বা চুল রেখেছে। বিদ্যাসাগর বললেন—আরে, তোকে মাস্টারি দেব কি। তুই মেয়েমানুষ কি পুরুষমানুষ আগে বিবেচনা করে বুঝি।[২৮]

একেকদিন সন্ধ্যার সময় বিদ্যাসাগরের বসবার ঘরে পরিবারের সকলে একত্র

হতেন। কন্যারা একেক জন একেক কোণে দাঁড়াতেন, দৌহিত্রেরা এখানে-ওখানে ছড়িয়ে দাঁড়াত। সকলকে নিয়ে বিদ্যাসাগর গল্প করতেন। মাঝে-মাঝে সকলেই বিদ্যাসাগরের মুখের পানের উমেদার, সকলেই বিদ্যাসাগরের প্রসাদী পানের প্রার্থী, সকলকে একেবারে দেওয়া সম্ভব হত না।* বিদ্যাসাগর প্রার্থীকে বলতেন—আচ্ছা একটু বিলম্ব কর, পানে 'সম্বরা' দিই।

অর্থাৎ, পান খেতে-খেতে একবার তামাক খেতে হবে।[২৯]

একজন পণ্ডিত এসে উদয় হয়েছেন। পণ্ডিত বলে খুব গর্ব তাঁর। চতুর্দিকে তিনি পাণ্ডিত্য জাহির করে বেড়ান। তিনি বললেন—কলকাতায় পণ্ডিতেরা আমাকে 'ঠাকুরদাদা' বলে ডাকে।

বিদ্যাসাগর বলে উঠলেন—আমি জেঠামশায়ের উপরে আর উঠতে পারি না।[৩০]

বিদ্যাসাগরের কাছে একজন বামুন এসেছে। কিছু ভিক্ষে চাইতে এসেছে। বলল—মশায়, বড়ো দুরাবস্থা।

'দুরাবস্থা' কথাটা ভুল। র-এর পর া হবে না; অর্থাৎ, আকার হবে না। আকার বদলাতে হবে। অকার করতে হবে। নির্ভুল করতে হলে 'দুরবস্থা' বলতে হবে।

বিদ্যাসাগর বললেন—আকার বদলে এস।

বিদ্যাসাগরের কথার ভুল মানে করল বামুনটি। ভাবল, তাকে বুঝি সাজ-পোষাক বদলে আসতে বলা হচ্ছে। তাই করল সে। পোষাক-আষাক বদলে এল। এসে সেই এক কথা—মশায়, বড়ো দুরাবস্থা।

যতদিন আসছে, ওই 'দুরাবস্থা' বলছে, আর বিদ্যাসাগরের মুখে শুনে যাচ্ছে—আকার বদলে এস।

শেষপর্যন্ত রামসর্বস্ব পণ্ডিতের কাছে গেল ওই বামুন। প্রত্যেকবার আকার বদলে গিয়েও কেন বিদ্যাসাগরের মুখে একই কথা শুনতে হচ্ছে?

রামসর্বস্ব বুঝিয়ে দিলেন, ওই 'দুরাবস্থা' বলার জন্যই এমন হচ্ছে। বলে দিলেন, 'দুরবস্থা' বলতে হবে।

এবার আর বামুনটি ভুল করল না। বিদ্যাসাগরকে এসে বলল—মশায়, আমার বড়ো দুরবস্থা।

বিদ্যাসাগর বললেন—তুমি আকার বদলেছ, এবার তোমার কথা শুনব।[৩১]

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে কার্মাটাড়ে গিয়েছেন। তাঁর মলমূত্রাদি স্বহস্তে পরিষ্কার করার ভার নিয়েছেন বিদ্যাসাগর। তাতে লজ্জিত হয়েছেন ন্যায়ালঙ্কার, কিন্তু বিদ্যাসাগর বলেছেন—এর জন্য লজ্জা কি? বায়না দিয়ে রাখলাম।[৩২]

রামকৃষ্ণ লাহিড়ী খুব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। মস্ত কুলীনের বংশ, সেদিকে খুব মান-মর্যাদা। রামকৃষ্ণের দু-গাছা পৈতে—একটা হরিণের চামড়ার, আরেকটা সুতোর।

রামকৃষ্ণ লাহিড়ী খুব বিখ্যাত কেউ নন, কিন্তু তাঁর এক ছেলে স্বনামধন্য। রামতনু লাহিড়ী।

---

* এই বিবরণের প্রতিবাদ করে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "ইহা সত্য নহে। কেবল কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র গুজে (বা রামকমল) হাত পাতিলে তিনি (বিদ্যাসাগর) চর্ব্বিত তাম্বুল ছোট দৌহিত্রকে দিতেন।" (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন: ভ্রমনিরাস, পৃ. ৭১।)

রামতনু ব্রাহ্ম হয়ে গেলেন।

ব্রাহ্ম হয়েছেন যখন, গলায় একগাছা পৈতে টাঙিয়ে রাখার কোনো অর্থ হয় না। অন্তত রামতনুর সেইরকম বিশ্বাস। অতএব তিনি পৈতে ফেলে দেবেন। রামতনুর বাবা বারংবার বারণ করলেন। কিন্তু বারণ শোনে কে। পৈতের অসারত্ব নিয়ে তিনি বাবার সঙ্গে তর্ক করতে লাগলেন। তারপর কাশী গিয়ে রামতনু পৈতেটি ফেলে দিয়ে এলেন। শোনা যায়, বাবা বিশ্বেশ্বরের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে এসেছেন।

কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন :

"তাঁহার (রামতনু লাহিড়ীর) উপবীত পরিত্যাগ সম্বন্ধে দুই প্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। প্রথম এই, তিনি কৃষ্ণনগরের বাটীতে তাঁহার জননীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছিলেন, এমন সময় একটী বালক দূরে দাঁড়াইয়া বলিতেছিল,—"এদিকে ত বলা হয় কিছু মানি না, ওদিকে শ্রাদ্ধ কর্ত্তে বসা হয়েছে, পৈতাটী বেশ ঝুল্‌চে, বামনাই দেখান হচ্ছে।" এই বাক্যগুলি লাহিড়ী মহাশয়ের কর্ণগোচর হইলে তিনি মর্ম্মান্তিক লজ্জা পাইলেন। ঐ বালকের বাক্যগুলি তাঁহার অন্তরে শেলসম বিদ্ধ হইল। বাক্য ও কার্য্যের একতা যাঁহার জীবনের মহামন্ত্রের ন্যায় ছিল, তাঁহার পক্ষে এই ব্যঙ্গোক্তি কি ক্লেশকর হইবার সম্ভাবনা তাহা আমরা সকলেই অনুমান করিতে পারি। এরূপ কথিত আছে যে ইহা হইতেই উপবীত পরিত্যাগের সংকল্প তাঁহার মনে উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয় বিবরণটি এই;—১৮৫১ সালের পূজার ছুটীর সময় লাহিড়ী মহাশয় নৌকাযোগে কতিপয় বন্ধুসহ গাজিপুরে গমন করিতেছিলেন। তাঁহার প্রিয়বন্ধু রামগোপাল ঘোষ তখন গাজিপুরে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার নিমন্ত্রণে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই, তাঁহারা গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে নৌকার মাল্লাদিগের দ্বারাই পাকাদি কার্য্য করাইয়া আহারাদি চলিতেছিল। একদিন সহচরদিগের মধ্যে একজন কৌতুক করিয়া বলিলেন— "এদিকে ত মাল্লাদের হাতে খাইতেছি, অথচ পৈতাটা রাখিয়া ব্রহ্মণ্য দেখাইতেছি, কি ভণ্ডামই করিতেছি!" বাক্যগুলি কৌতুকচ্ছলে কথিত হইল বটে, কিন্তু তাহা লাহিড়ী মহাশয়ের চিত্তে বিষম গ্লানি উপস্থিত করিল। তিনি তৎপূর্ব্বে আপনার উপবীতটী নৌকার ছত্রীতে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন; তাহা আর গ্রহণ করিলেন না।

পূর্ব্বোক্ত উভয় বিবরণের মধ্যে কোনও বিবাদ দৃষ্ট হইতেছে না। ইহা সম্ভব যে গাজিপুর যাত্রার পূর্ব্বে তিনি জননীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য কৃষ্ণনগরে গমন করেন। সেখানে পূর্ব্বোক্ত বালকটীর বিদ্রূপোক্তি শুনিতে পান। তাহা হইতেই উপবীত পরিত্যাগের সংকল্প তাঁহার অন্তরে উদিত হয়। তৎপরে গাজিপুর যাত্রা কালের ঘটনাটী ঘটে যাহাতে সেই সংকল্পকে দৃঢ়ীভূত করে। এরূপ একটী গুরুতর পরিবর্ত্তন যে একদিনে ঘটিয়াছিল তাহা মনে হয় না।"[৩৩]

যা হোক, তারপর আর পৈতৃক বাড়িতে জায়গা হল না। রামতনুকে আলাদা বাড়িতে থাকতে হল।

কিন্তু একগাছি পৈতে গলায় রাখলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত? বাবার কথায় পৈতেগাছা গলায় রাখলে কী এমন ক্ষতি হত?

পৈতের উপর রামতনুর অণুমাত্র বিশ্বাস নেই। তাই তিনি ও-বস্তু গলায়

রাখতে পারেননি। রামতনু লাহিড়ী বলেছেন—আমার Conviction -এর বিরুদ্ধে আমি কাজ করতে পারি না।

একেবারেই পারেন না? পারেন বৈকি।

রামতনু লাহিড়ী একদিন বিদ্যাসাগরকে বললেন—ওহে, আমাকে একটি রাঁধুনি বামুন যোগাড় করে দিতে পারো?

বিদ্যাসাগর বললেন—কেন হে, আবার বামুনের দরকার কি? বাবুর্চি-খানসামা হলেই তো চলে।

—হ্যাঁ, আমার কোনো আপত্তি নেই—রামতনু আস্তে-সুস্থে বললেন—কিন্তু বাড়ির ভেতরে যে বামুন ছাড়া চলে না।

বিদ্যাসাগর হাসলেন। বললেন—বাপের কথায় পৈতেগাছটি রাখতে পারলে না; এখন পরিবারের কথায় বামুন খুঁজতে বেরিয়েছ!

এ-কথার আর জবাব নেই। রামতনু লাহিড়ী অগত্যা মাথা চুলকোতে লাগলেন।[৩৪]

বড়মানুষের বাড়িতে নেমন্তন্ন। অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক এসেছেন। তাঁদের মধ্যে দুজন স্বনামধন্য মানুষ আছেন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর দীনবন্ধু মিত্র।

বড়মানুষের বাড়িতে নেমন্তন্ন, অতএব ভুরিভোজনের বন্দোবস্ত। রকমারি খাবার-দাবার তৈরি হচ্ছে। প্রায় সব রান্নাই হয়ে গেছে, আর আধঘণ্টা খানেক সময় পেলেই সব নিখুঁত হয়ে যাবে।

কিন্তু বড়ো বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে। দেরি দেখে কেউ-কেউ কেটে পড়বার চেষ্টা সুরু করলেন।

তা এটা খুব দুঃখের কথা। যাঁর বাড়িতে নেমন্তন্ন তাঁর পক্ষে নিশ্চয়ই দুঃখের কথা। নিরুপায় হয়ে তিনি এসে বিদ্যাসাগরকে ধরলেন। বললেন—আপনি যদি দয়া করে কোনোরকমে ভদ্রলোকদের আধ ঘণ্টাখানেক আটকে রাখতে পারেন।

গায়ের জোরে আটকে রাখার কথা নয় নিশ্চয়ই। গল্পের জোরে আটকে রাখার কথা।

বিদ্যাসাগর দীনবন্ধুকে বললেন—দীনবন্ধু, আমি একটা করে গল্প বলব, আর তোমাকেও আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে।

বিদ্যাসাগর গল্প আরম্ভ করলেন :

“একদিন একজন লোক তার বন্ধুকে গিয়ে বললেন, ‘ভাই, আমি বিষম অন্যমনস্ক। সেদিন কী করেছি জানো? সামান্য কাগজ মনে করে সেদিন একখানা হাজার টাকার নোট ছিঁড়ে ফেলেছিলাম, ছেঁড়া নোট দিয়ে কান চুলকোচ্ছিলাম। ভাগ্যিস আমার স্ত্রীর চোখে পড়েছিল ব্যাপারটা, তাই শেষরক্ষা হল, নয়তো হাজারটি টাকা লোকসান হত।’

কিন্তু বন্ধুও কম যান না। তিনি বললেন, ‘আর ভাই, অন্যমনস্কতার কথা আর বলো না। অন্যমনস্কতার জ্বালায় জ্বলে মরছি। সেদিন রাত্রে একগাছা লাঠি নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। বাড়িতে ফিরে মনের ভুলে খাওয়া-দাওয়া না করে সটান শোবার ঘরে চলে গেছি। তারপর কী হল শোনো, কোথায় লাঠিগাছা ঘরের কোণে রেখে আমি বিছানায় শোবো, তার বদলে কিনা, লাঠিগাছাকে বিছানায় শুইয়ে আমি নিজে সারারাত ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভোর-বেলা আমার স্ত্রীর চোখে পড়ল সব, তিনি আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন,

লাঠিগাছাকে ঘরের কোণায় রেখে দিলেন। ভাগ্যিস ভোরবেলা আমার স্ত্রীর চোখে পড়েছিল, তাই খানিকক্ষণ অন্তত ঘুমোতে পেলাম। নয়তো আমাকে না ঘুমিয়ে ঠায় ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে হত।'

বিপুল হাস্যরোল।

এবার দীনবন্ধু মিত্রের পালা। দীনবন্ধুও একটি গল্প বললেন। বিপুল হাস্যরোল।

আসর জমে উঠেছে। গল্পে মশগুল হয়ে আছেন সকলে। ওদিকে রান্না-বান্না শেষ হয়ে গেছে, আসন পড়েছে, কিন্তু সেদিকে যেন কারো গরজ নেই। গল্প শুনেই যেন সকলের পেট ভরবে। গল্পের আসর ছেড়ে কেউ আর উঠতে চান না।

বাড়ির যিনি কর্তা তিনি পড়লেন আরেক বিপদে। হাতজোড় করে তিনি বিদ্যাসাগরকে বললেন—মশাই, এক বিপদ থেকে বাঁচিয়ে আপনি দেখছি আমাকে আরেক বিপদে ফেললেন। সব খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে, কেউ আর খেতে যাচ্ছেন না, সকলেই গল্পে মজে আছেন। দয়া করে গল্প বন্ধ করুন।

সহাস্যমুখে বিদ্যাসাগর গল্প বন্ধ করলেন। হাসতে-হাসতে খেতে গেলেন সকলে।[৩৫]

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন: "কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ডাক্তার জনসনের অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।...যিনি লিখিবার সময় গম্‌গমে Johnsonese ও Latinisms ছাড়া কিছুই লিখিতে পারিতেন না, তিনি কিন্তু সাধারণ কথাবার্ত্তায় একটিও ল্যাটিন কথা ব্যবহার করিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সাধারণ কথাবার্ত্তায় সংস্কৃত শব্দ আদৌ ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার লেখা পড়িলে মনে হয় যে, যেন তিনি সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না; কিন্তু লোকের সঙ্গে মজ্‌লিসে কথা কহিবার সময় এমন কি বাঙ্গালা Slang শব্দ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না—'ফ্যাপাতুড়ো' খাওয়া (to be confounded) 'দহরম মহরম', 'বনিবনাও' 'বিধঘুটে', 'বাহবা লওয়া'—এই রকমের ভাষা প্রায়ই তাঁহার মুখে শুনা যাইত। যাহাকে সাধু ভাষা বলে তিনি সে দিকেই যাইতেন না।"[৩৬]

অনেকদিন বাদে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে একজন সাবজজ সাহেবের দেখা। কথায়-কথায় জানা গেল, সাবজজ সাহেব বুড়ো বয়সে দু-নম্বর বিয়ে করেছেন। হ্যাঁ, প্রথম পক্ষের বৌ মারা গেছেন। সাবজজ সাহেব ঘর খালি রাখেননি। বুড়োবয়সে দ্বিতীয়াকে ঘরে এনেছেন।

খবর শুনে বিদ্যাসাগর সাবজজ সাহেবকে বললেন—তবে তো তোমার স্বর্গের দোর একেবারেই খোলা হে!

চমকে উঠবার মতো কথা। দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে স্বর্গলাভ অবশ্যম্ভাবী, এমন কথা ভূ-ভারতে কেউ কখনো শোনেনি। সাবজজ সাহেবও শোনেননি নিশ্চয়ই।

সাবজজ সাহেব বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞেস করলেন—সে কী রকম, মশায়?

বিদ্যাসাগর তখন সবিস্তারে বললেন:

"শোনো।

মরণের পর সকলেই স্বর্গের দরজায় হুড়োহুড়ি করে। দারোয়ান প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করে—তুমি পৃথিবীতে কী কাজ করে এসেছ, শুনি?

যে যেমন কাজ করে এসেছে, সে তেমনি বলে। কেউ পুণ্য করে এসেছে,

কেউ পাপ করে এসেছে। যে পুণ্য করে এসেছে সে স্বর্গে ঢুকে যায়। যে পুণ্য করে আসেনি, হিসেব কষে তাকে নরকে পাঠানো হয়।

এখন দারোয়ানের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে একজন একটু মুশকিলে পড়েছেন। পৃথিবীতে ইনি বিশেষ কোনো পাপ বা পুণ্য করে আসেননি। এঁকে নিয়ে এখন কী করা।

কথায়-কথায় স্বর্গের দারোয়ান জানতে পারল, ইনি বুড়োবয়সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন। তখন দারোয়ান বলল—তুমি এক্ষুনি স্বর্গে ঢুকতে পারো। পৃথিবীতেই তোমার নরকভোগ হয়ে গিয়েছে!"[৩৭]

বিদ্যাসাগরের 'উপক্রমণিকা'তে শব্দরূপের উদাহরণে 'নর' শব্দ ছিল। পরে বিদ্যাসাগর 'নর' তুলে দিয়ে 'গজ' বসালেন। 'নরে'র বদলে 'গজ' কেন? সেই কথাই একদিন সুরেশ সমাজপতি জিজ্ঞেস করল।

সুরেশের ভাইয়ের নাম যতীশ। এরা বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র।

বিদ্যাসাগর সুরেশকে বললেন—আগে ভেবেছিলাম, তোরা দু-ভাই নর; এখন দেখছি, তোরা দুটি গজ। তাই 'নর' তুলে 'গজ' করে দিলাম।[৩৮]

এককালে বেথুন স্কুল কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন বিদ্যাসাগর। অনেক সাহেব সেই কমিটির মেম্বর ছিলেন।

সেসময়ে হেডমিস্ট্রেস ছিলেন একজন মেমসাহেব। কে জানে কেন, মেম-সাহেব স্কুলের একজন পণ্ডিতের উপর খুব চটে গেলেন। পণ্ডিতের নামে কমিটির কাছে নালিশ করলেন মেমসাহেব। পণ্ডিতের এই দোষ, পণ্ডিতের ওই দোষ, পণ্ডিতকে বরখাস্ত করা হোক।

তদন্তের ভার পড়ল বিদ্যাসাগরের উপর। বিশেষ খোঁজ-খবর নিয়ে বিদ্যাসাগর জানতে পারলেন, পণ্ডিতের কোনো দোষ নেই।

দোষ থাক আর না থাক, মেমসাহেব নালিশ করেছেন যখন, বিচার হবে বৈকি। বিচারের জন্য কমিটির বৈঠক বসল। সাহেব মেম্বরেরা আছেন, বিদ্যাসাগরও আছেন।

সেই বৈঠককে বিদ্যাসাগর বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন—পণ্ডিতের কোনো দোষ নেই।

কিন্তু কমিটির কয়েকজন মেম্বরই সাহেব। সাহেবেরা ভাবলেন, পণ্ডিতকে যদি একেবারে নির্দোষ বলে ছেড়ে দেওয়া হয় তো মেমসাহেবের মান থাকে না। সাহেবেরা তাই বললেন—তবে না হয় দু-একমাসের জন্য পণ্ডিতকে সাসপেণ্ড করা যাক। কেমন, বিদ্যাসাগর, তুমি কি বলো?

বিদ্যাসাগর একটি চতুর উত্তর দিলেন—

Yes, do it, if you think some sacrifice is necessary to appease her.

অর্থাৎ—আচ্ছা, কিছু বলিদান না করলে দেবী যদি তুষ্ট না হন তো তাই করো।[৩৯]

বিদ্যাসাগরের ছোটভাইয়ের নাম ঈশানচন্দ্র, ছেলের নাম নারায়ণচন্দ্র।

বিদ্যাসাগরের বাবা খুব ভালোবাসতেন ঈশান আর নারায়ণকে। এত ভালোবাসতেন যে ওরা দুজন, বলতে গেলে, অন্যের শাসনের বাইরে।

বিদ্যাসাগর একদিন বাবাকে বললেন—আপনি না নিরামিষাশী? আপনাকে কে নিরামিষাশী বলে? আপনি দুটি বেলা ঈশান আর নারায়ণের মাথা খাচ্ছেন। তবুও আপনি নিরামিষাশী![৪০]

বিদ্যাসাগরের মুখ থেকে গুলির আড্ডার দু-একটি গল্প শোনা যেতে পারে :

"...সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দুস্কুল একই হাতার মধ্যে। হিন্দুস্কুলের ছেলেরা প্রায়ই বড়মানুষের ছেলে, তারা মদ খাইত; আমরা দেখিতাম, আমাদের পয়সা ছিল না, মদ খাইতে পারিতাম না। দেখিয়া দেখিয়া আমাদের একটা নেশা করার ঝোঁক হইল। আমরা কতকগুলি উপর-ক্লাসের ছেলে ছিটে ধরিলাম। অল্প পয়সায় বেশ নেশা হইত। ক্রমে একটু পাকিয়াও উঠিলাম। আট-দশ ছিটে পর্য্যন্ত আমরা একটানে খাইতে পারিতাম; তখন আমাদের একটা সখ হইল—বাগবাজারের আড্ডায় গিয়া বড় বড় গুলিখোরের সঙ্গে টক্কর দিব। আট মূর্ত্তি সাজিয়া-গুজিয়া বাহির হইলাম; বাগবাজারে গুলির আড্ডায় যাইতে গেলে একটি গলির মধ্যে দিয়া যাইতে হয়, গলির সম্মুখেই আড্ডার দরজা। আমরা গলির আর এক মুড়ায় ঢুকিতেই আড্ডাধারী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইলেন। ভাবিলেন এতগুলো ফরসা কাপড়ওয়ালা লোক আসিতেছে, আমার বুঝি আজ কপাল ফিরিবে। আমরা কাছে গেলে খুব আদর করিয়া তিনি অভ্যর্থনা করিলেন ও ভিতরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম একটি খোলায়-ছাওয়া হল, তার কিন্তু ওই একটি দরজা, পাছে গুলিখোররা পয়সা না-দিয়া পালায় সেইজন্য ওই একটি দরজা রাখা হইয়াছে, আড্ডাধারী সেইখানে থাকেন। আমাদের কিন্তু আড্ডাধারী খুব খাতির করিলেন। আমরা যতক্ষণ ছিলাম, সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। দেখিলাম প্রায় দুশো আড়াইশো গুলিখোর বসিয়া আছে; সকলেরই সাম্‌নে একটা কল্‌সীর কানা, তার উপর একটা থেলো হুঁকো, নল্‌চেটি ছোট, নলটা খুব লম্বা; নল্‌চের উপর একটা কলিকা, কিন্তু উপরভাগটা ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছে। গুলিখোরেরা সেই ভাঙা কলিকার উপর ছিটা বসাইতেছে, চিমটা করিয়া আঙরার কয়লা তার উপর দিতেছে, নল দিয়া টানিয়া সেই ধোঁয়া গিলিবার চেষ্টা করিতেছে ও এক-একবার একটু একটু চাট মুখে দিতেছে। এ চাট আর কিছু নয়,—সামনে মাল্‌সায় একটু গুড়ের জল আছে ও তাহাতে এক টুকরা সোলা ফেলা আছে। ধোঁয়া টানিয়াই এই সোলাখানা চুষিতেছে। আমরা দেখিলাম—হলের পূব দিকে সবাই মাটিতে বসিয়া গুলি খাইতেছে, উত্তর দিকেও তাই, পশ্চিম দিকেও তাই। কেবল দক্ষিণ দিকে যাহারা গুলি খাইতেছে, তাহারা ইটের উপর বসিয়া আছে। আমরা আড্ডাধারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ইহারা ইটের উপর বসিয়া আছে কেন? তিনি বলিলেন—আমাদের এ আড্ডার নিয়ম এই যে, যে-কেহ একটানে ১০৮টা ছিটে খাইতে পারিবে, তাহাকে একখানা ইট দেওয়া হইবে। কথাটা শুনিয়াই আমাদের যে উচ্চ আশা ছিল, তাহা একেবারেই উপিয়া গেল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম— ওই যে একজন লোক আটখানা ইটের ওপর বসিয়া আছে, ও কত ছিটে খাইতে পারে? আড্ডাধারী বলিল—৮৬৪। আমাদের সকলের মুখ পাংগাস বর্ণ হইয়া গেল। মদন আমার কানে কানে বলিল—টক্কর দেওয়া ত হ'ল না, কিন্তু একবার এইসব গুলিখোরেরা কি গল্প করে শোনা যাক্। তাই আমরা তাহাদের কাছ ঘেঁষিয়া গেলাম। পাছে ধোঁয়া বাহির হইয়া যায়, সেইজন্য গুলিখোরেরা অতি আস্তে আস্তে কথা কয়, হাত-পা নাড়িয়াই কথা কওয়ার কাজ সারে। তাই আমরা খুব কাছে গেলাম। শুনিলাম তাহারা কলের গল্প করিতেছে।

যে একখানি ইটের উপর বসিয়াছিল, সে বলিতে লাগিল—চাণক চাণক।

গোল করাত—মস্ত গোল, তার ওপর বাহাদুরি কাঠ ফেলিয়া দিতেছে; ফর ফর ফর ফর করিয়া কাঠ চিরিয়া যাইতেছে। আর সেই সঙ্গে কোথাও কড়ি, কোথাও বরগা, কোথাও দোর, কোথাও জানালা, কোথাও টেবিল, কোথাও কোচ, কোথাও কেদারা—এই সব বাহির হইতেছে।

যে দুখানা ইটের উপর বসিয়াছিল, সে হাত নাড়িয়া বলিল—ও কি কল! কল ত গরফের। একখানা পাথরের বারকোশ—মস্ত—ঘর-জোড়া, তার ওপর দুখানা মোটা পাথরের চাকা আড়ে ঘুরিতেছে। আর সাহেবরা বস্তা বস্তা মসিনা সেখানে ফেলিয়া দিতেছে; কলের দুটো মুখ, একটা দিয়া পিপে পিপে তেল বাহির হইতেছে, আর একটা দিয়া থান থান খোল বাহির হইতেছে।

তিনখানা ইটের ওপর যিনি বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—ও-বা কি কল! আকড়ায় দেখিলাম—পাঁজায় পাঁজায় মাঠ ছাইয়া গিয়াছে, কলের ভেতর সেই ইট ঢোলাই করিয়া দিতেছে। কলের সামনে এক আকাশপাতাল ছাঁকনি। কলের গুঁড়া গিয়া তার উপর পড়িতেছে। কোথাও ১নং, কোথাও ২নং, কোথাও ৩নং সুরকী, কোথাও কুরুই পড়িতেছে।...”[৪১]

বিদ্যাসাগর একটা ভোজন-সমিতির সভ্য। মাত্র ন-দশজন সভ্য ওই সমিতিতে। সভ্যেরা দল বেঁধে মাঝে-মাঝে হঠাৎ একেক স্বজন-বান্ধবের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে আমোদ করে খাওয়া-দাওয়া করতেন।

একবার জাঁকালো গোছের খাওয়া-দাওয়া করে সমিতির একজন সভ্যের পেটের অসুখ হল। কেউ-কেউ বললেন—এঁর পেটের দোষ আছে, এঁকে আর সভ্য রাখা চলবে না, এঁকে ভোজন-সমিতি থেকে খারিজ করে দিতে হবে।

বিদ্যাসাগর আপত্তি করে বললেন—না হে, ওকে খারিজ করলে অধর্ম হবে। খেয়ে যে প্রাণ দিতে পর্যন্ত রাজি তাকে বিদায় করে দিলে কাকে নিয়ে থাকবে?[৪২]

কৃষ্ণদাস পালকে সুপুরুষ বলা চলে না। দ্বারকানাথ মিত্রকেও না। কিন্তু এই দু-জনের মধ্যে তুলনায় কার চেহারা বেশি বিশ্রী? বিদ্যাসাগর কী বলেন?

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাইরের ঘরে একদিন গল্প-গুজব হচ্ছে। সেখানে আছেন বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস পাল, দ্বারকানাথ মিত্র এবং আরো অনেকে।

কে একজন লোক জানালায় উঁকি দিচ্ছে। বারংবার উঁকি দিচ্ছে কেন? লোকটিকে ডেকে আনা হল। ঘরের মধ্যে এসে মাথা নিচু করে জড়োসড়ো হয়ে রইল সে।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—বাপু, অত উঁকিঝুঁকি মারছিলে কেন?

ভয়ে-ভয়ে সে বলল—জজ দ্বারিক মিত্তির এসেছেন শুনে তাঁকে দেখবার জন্য উঁকি মারছিলাম।

বিদ্যাসাগর বললেন—দেখবার জন্য উঁকি মারবার দরকার কি? তাঁকে চেন?

বলে কৃষ্ণদাসকে দেখালেন। তারপর বললেন—এঁর নাম কৃষ্ণদাস পাল। এখানে এঁর চেয়ে যেটি সুন্দর সেটিই দ্বারিক মিত্তির।[৪৩]

তিনচারজন পণ্ডিতকে নিয়ে একবার লাটদরবারে গিয়েছেন বিদ্যাসাগর। পণ্ডিতেরা দেখলেন, বাঙালী ছাড়া আর সকলের মাথায় উষ্ণীষ।

পণ্ডিতেরা জিজ্ঞাসু হলেন—বাঙালী ছাড়া সকলের মাথায় উষ্ণীষ, এর কারণ কী?

বিদ্যাসাগর সহাস্যে বললেন—বাঙালী মাতৃভূমির আর কোনো কাজ করতে পারেনি; মাথার উষ্ণীষ ত্যাগ করে মাতৃভূমির ভার কমিয়েছে।[৩৪]

বিদ্যাসাগরের দু-একটি রঙ্গকথা কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মুখে শোনা যেতে পারে: "একবার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা গবর্ণমেন্টের কাছে কোনও এক বিষয়ে দরখাস্ত করিয়া বিলক্ষণ অপমানিত হইয়াছিল; বিদ্যাসাগর তাঁহাদের বিষম বিমর্ষভাব দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—'ওহে, আজকে political world -এ যে বড়ই gloom দেখে এলুম।' এই gloom কথাটা তিনি এমন মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার শ্রোতৃবর্গ হাসিয়া উঠিল। বিদ্যাসাগর একবার তাঁহার কোনও এক বিশেষ আত্মীয় বন্ধুর বাটীতে গিয়াছিলেন; বন্ধুটি কিছু অধিক বয়সে দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিয়াছিলেন। আমিও সেখানে গিয়াছিলাম। বিদ্যাসাগর আসাতে তিনি বাহিরে আসিলেন বটে, কিন্তু অন্যমনস্কভাবে তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ এই প্রকার ভাবগতিক দেখিয়া বিদ্যাসাগর অবশেষে বলিয়া উঠিলেন, 'যাও, আর উস্‌খুস্‌ কোর্‌চ কেন? বাড়ীর ভেতরেই যাও।' এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার এই বন্ধুটি অবসর পাইলেই শ্বশুরবাড়ী যাইতেন; এবং তাঁহার এক কনিষ্ঠভ্রাতা ছিলেন, তিনিও প্রায় শ্বশুরবাড়ীতে থাকিতেন। বিদ্যাসাগর এক দিন একত্রে দু'জনের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—'হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহোদধৌ'।"[৩৫]

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আপিস থেকে দীর্ঘকালের জন্য ছুটি নিয়েছেন।

বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এলেন চণ্ডীচরণের কাছে। বললেন—দাদামশাই বলেছেন যদি আপনার উঠবার শক্তি থাকে, তবে একবার যাবেন, তিনি শয্যাগত, তা না হলে, তিনি নিজেই আপনাকে দেখতে আসতেন।

চণ্ডীচরণ গেলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগর বিছানার পাশে একখানা চেয়ারে বসতে বললেন চণ্ডীচরণকে। অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে চণ্ডীচরণকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার কি খুব বেশি অসুখ?

--হ্যাঁ।

--ছুটি নিয়েছ, বেতন পাও তো?

—অর্ধেক।

—চলে কি রকমে?

—ঋণ করে।

—মাসে কত টাকা ঋণ হচ্ছে?

—মাসে তিরিশ-চল্লিশ টাকা।

—এ টাকার সুদ দিতে হয়?

—হ্যাঁ, হয়।

—তোমরা আজকালকার ছেলে, কোনো কথা বলতে ভয় হয়, শেষে কোন কথায় ইনসল্ট (insult) হবে তার তো ঠিক নেই।

নিতান্ত অপ্রতিভ হয়ে চণ্ডীচরণ বললেন—আমায় যা জিজ্ঞেস করবার করুন। আমাকে অমন করে বললে আমার পক্ষে খুব কষ্টের কথা।

বিদ্যাসাগর বললেন—সুদ দিয়ে অন্যত্র টাকাটা কর্জ করার চেয়ে বিনাসুদে আমার কাছ থেকে দরকারমতো টাকা মাসে মাসে নিলে হত না? যখন সুবিধে হবে দু-চার টাকা করে শোধ করলেই তো হতে পারে।

চণ্ডীচরণ বললেন—আপনার মতো মহাজনের কাছে ওরকম কড়ারে টাকা নিলে সে-টাকা কি আর শোধ করতে পারব?

—না-ই পারলে।

—আপনার টাকায় আমার চেয়ে অনেক গরীবের অন্নসংস্থান হয়, তাদের বঞ্চিত করা কি উচিত?

সরস মুখভঙ্গিতে বিদ্যাসাগর ঠাট্টা করে বললেন—আমি বুঝতে পারিনি, তুমি যে হে বড়লোক।

নিতান্ত কুণ্ঠিত হয়ে চণ্ডীচরণ বললেন—না, আমি তা বলিনি।

—তা হোক, না হয় তুমিও আমার কিছু খেলে!

—দেখি, আমার নিতান্ত অচল হলে আমিই আপনাকে বলব।

—বলি, অচল আর কাকে বলে?

—যে কদিন চলে চলুক।

—তারপর সাবাড় হয়ে যাবে যে।

—সাবাড় হবার মতো হয় তো আমিই আপনাকে বলব।

হাসতে হাসতে বিদ্যাসাগর বললেন—হ্যাঁ, সাবাড় হবার অবস্থা বুঝে আমার টাকাটা নিও, তাহলে আর শোধ দেবার নাম করতে হবে না। তা হবে না বাপু, তুমি যদি এখন জ্যান্ত থাকতে থাকতে না লও তো সাবাড় হবার সময় আমি কিছু করব না। তখন কিছু করা আর জলে ফেলে দেওয়া এক কথা। তা হবে না। বাড়ি গিয়ে হিসেব করে কতগুলি টাকা মাসে বেশি লাগছে আমাকে জানাবে, আমি মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে দেব।

বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন চণ্ডীচরণ। দীর্ঘকালের জন্য গা ঢাকা দিলেন। অসুখ সেরে যাবার পর সকলের আগে দেখা করতে এলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করে চণ্ডীচরণ বললেন—আমি শিগ্‌গিরই কাজকর্ম আরম্ভ করব, অসুখ সেরেছে।

বিদ্যাসাগর একটু হেসে বললেন—তুমিও বাঁচলে, আমিও বাঁচলাম।[৪৬]

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন : "(অঘোরনাথ) শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে বর্ষার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের Diabetis প্রকোপ বাড়িত। নীচের ঘরে তাঁর দৌহিত্ররা ও আর কেহ কেহ ছিল। তিনি প্রস্রাব করিতে যাইবার সময় দৌহিত্রদের জিজ্ঞাসা করিলেন "বল্ দেখি শালারা এখন কি ভাল লাগে"? এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। প্রস্রাবের পর ফিরিবার পথে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বংশীয় (বিনোদ বাবুকে) জিজ্ঞাসা করিলেন "বল্ দেখি এখন কি ভাল লাগে"? বিনোদ বড় রসিক ছিল, উত্তর দিল "ঠাকুরদাদা যা ভাল লাগে তাত তোমার নাই, আমার ও এখানে নাই। যা ভাল লাগে তা পাবার উপায় নাই।" বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎক্ষণাৎ তাহাকে ১০টা টাকা দিয়া বলিলেন "যা শালা এখুনি শ্বশুর বাটী যা, তোর বিরহ লেগেছে। এখুনি যা নইলে ট্রেন পাবি না।"[৪৭]

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মাকে একবার একটা আশ্চর্য সুন্দর কথা বলেছেন বিদ্যাসাগর। সে-ঘটনা বলতে গেলে দুঃখের কথা থেকে আরম্ভ করতে হয়। মজার কথা আছে ঘটনার একেবারে শেষের দিকে।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিদ্যাসাগরের বন্ধু। কিন্তু সেই বন্ধুত্ব চিরকাল রইল না। কয়েকটি জটিল কারণে বিদ্যাসাগর মদনমোহনের উপর বিরূপ হলেন। বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন।

কিছুকাল পর মদনমোহন মারা গেলেন।

মদনমোহনের মা তখনো বেঁচে আছেন। তিনি বিল্বগ্রামে থাকেন। মদনমোহনের মৃত্যুর কিছুকাল পর বিল্বগ্রাম থেকে দিনকয়েকের জন্য কলকাতায় এলেন তিনি। উপযুক্ত ছেলে মারা গেছে, তিনি শোকে-দুঃখে কাতর। কেঁদে আকুল।

দু-তিনদিন পর বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—তর্কালঙ্কার আপনার কী রকম ব্যবস্থা করে গিয়েছেন?

তিনি বললেন—মদন আমার কোনো ব্যবস্থা করে যায়নি। আমার দিন চলার কোনো উপায় নেই। তাই তোমার কাছে এসেছি। যদি তুমি দয়া করে খেতে-পরতে দাও, তবেই আমার রক্ষা। নয়তো আমাকে না খেয়ে মরতে হবে।

মদনমোহনের মা কাঁদতে লাগলেন।

বিদ্যাসাগর কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বিশ্বস্তসূত্রে বিদ্যাসাগর শুনেছেন, তর্কালঙ্কার বিস্তর টাকাকড়ি রেখে গিয়েছেন। অথচ, তাঁর মাকে কিনা ভাত-কাপড়ের জন্য অন্যের কাছে ভিক্ষে করতে হচ্ছে!

যা-হোক্, কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মদনমোহনের মা বললেন—মাস-মাস দশ টাকা পেলে আমার চলে যায়।

খাওয়া-পরার অভাবে, রোগে-শোকে মদনমোহনের মায়ের শরীর অত্যন্ত কাহিল হয়েছে। যেন কয়েকখানা শুকনো হাড়। তারপর, আবার চোখের অসুখ। চোখে ভালো দেখতে পান না।

মদনমোহনের মা বললেন—শরীর যদি আমার সুস্থ থাকত, চোখে যদি আমার অসুখ না থাকত, তাহলে পাঁচ টাকাতেই আমার চলে যেত। কিন্তু শরীর আর চোখের যা দশা, একটি বামুনের মেয়ে না রাখলে কিছুতেই আমার চলবে না। আমার এখন যে-রকম অবস্থা, বেশি দিন আমি বাঁচব না। বেশি দিন তোমাকে আমার ভার বইতে হবে না।

বিদ্যাসাগর মাসে-মাসে দশ টাকা দিতে রাজি হলেন। মাসে-মাসে দশ টাকা পাঠাতে লাগলেন মদনমোহনের মাকে। বিল্বগ্রামের ঠিকানায়।

কিছুদিন পর মদনমোহনের মা আবার কলকাতায় এলেন। বিদ্যাসাগরকে বললেন—বাবা! তুমি আমার ভাত-কাপড়ের কষ্ট দূর করেছ। আরেক বিপদে পড়ে আবার তোমায় জ্বালাতন করতে এসেছি।

কিন্তু এ-বিপদে বিদ্যাসাগর কিছু করতে পারেন না। কেননা, এ-বিপদ ঘটছে একেবারে তাঁদের আপন সংসারে। নিতান্ত আপনাআপনির মধ্যে। সংসারে বসে তাঁকে নানা রকম গঞ্জনা সইতে হচ্ছে, অপমান সইতে হচ্ছে।

বিদ্যাসাগর বললেন—মা! এ-ব্যাপারে তো আমার কিছু করার সাধ্য নেই। আপনার মুখে যা শুনলাম, আপনার আর সংসারে থাকার দরকার কি। আমার বিবেচনায়, কাশীতে গিয়ে বাস করাই আপনার পক্ষে সবচেয়ে ভালো। আমার বাবা কাশীতে আছেন। আপনি যদি মত করেন তো আপনাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিই, আমার বাবা আপনার বাসা ঠিক করে দেবেন, সবসময় দেখাশোনা করবেন। তাঁর কাছে মাসে-মাসে আপনি দশ টাকা পাবেন। যা শুনি, মাসে দশ টাকায় সেখানে সচ্ছন্দে চলে যাবে।

তিনি রাজি হলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে কাশীতে পাঠিয়ে দিলেন।*

কাশীতে গিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর শরীর ভালো হয়ে গেল। চেহারা এমন বদলে গেল, এমন হৃষ্টপুষ্ট হয়ে গেল যে বছর খানেক বাদে কাশীতে গিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁকে চিনতে পারলেন না। সত্যি-সত্যি চিনতে পারলেন না।

তিনি নিজেই তখন বিদ্যাসাগরকে বললেন—বাবা! তুমি আমাকে চিনতে পারলে না, আমি মদনের মা।

খানিকক্ষণ ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন বিদ্যাসাগর। চিনতে পারলেন। তারপর বললেন—আপনি জুয়াচুরি করে আমাকে বিলক্ষণ ঠকিয়েছেন!

জুয়াচুরি! শুনে মদনমোহনের মা একটু ভয় পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন—বাবা! আমি কী জুয়াচুরি করেছি?

বিদ্যাসাগর বললেন—শুকনো হাড় আর কানা চোখ দেখিয়ে আপনি বলেছিলেন, 'আমার যা অবস্থা, তাতে আমি বেশিদিন বাঁচব না, বেশিদিন তোমাকে আমার ভার বইতে হবে না।' কিন্তু এখন যা দেখছি, তাতে অন্তত আরো বিশবছর আপনি বাঁচবেন। আগে যদি বুঝতে পারতাম, আমি আপনাকে মাসে-মাসে দশ টাকা দিতে রাজি হতাম না!

না, ভয় পাবার মতো কথা নয়, হেসে ওঠার মতো কথা। মদনমোহনের মা হাসতে লাগলেন।[৪৮]

---

* শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "মৃত মদনমোহন তর্কালঙ্কার দাদার (বিদ্যাসাগর) বাল্যবন্ধু ও সহধ্যায়ী ছিলেন। এজন্য তাঁহার জননী বিশ্বেশ্বরীদেবীকে দাদা (বিদ্যাসাগর) মাতৃ সম্বোধন করিতেন, তর্কালঙ্কারের পত্নী সহ তাঁহার মনের মিল হইত না সুতরাং সর্ব্বদা বিবাদ হইত একারণ তর্কালঙ্কারের জননী কলিকাতায় বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে আসিয়া দাদার (বিদ্যাসাগর) নিকট রোদন করেন। তিনি তাঁহাকে অতি শীর্ণকায় দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, মা! তোমার উপযুক্ত সন্তান লোকান্তরিত হইয়াছেন, এক্ষণে তোমার বধূর সহিত যেরূপ অসদ্ভাব দেখিতেছি, তাহাতে আপনার উহার সংস্রবে থাকা বিধেয় নহে, আমি আপনার জীবদ্দশায় মাসিক দশ টাকা দিতে পারি, আপনি কাশীতে অবস্থিতি করুন। ইহা শুনিয়া তর্কালঙ্কারের জননী বিশ্বেশ্বরীদেবী আহ্লাদিত হইয়া স্বতন্ত্র পাথেয় গ্রহণ পূর্ব্বক কাশীবাস করিলেন।" (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত, কলকাতা, ১৮৯১, পৃ. ২১৯-২০।)

দেখি কোথাও ঘরটর নেই, গাছপালা নেই, কিছু নেই, কেবল মাঠ, কেবল মাঠ, সব মাঠ হয়ে গেছে। ছিরামপুর থেকে চুঁচড়ো পর্যন্ত সব ধু-ধু করছে মাঠ। আর দেখি ছিরামপুরের গঙ্গার ধার থেকে একটা সুড়ঙ্গ। একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে পালে-পালে-পালে গোরু যাচ্ছে, আরেকটা সুড়ঙ্গ দিয়ে গাড়ি-গাড়ি-গাড়ি আক যাচ্ছে। এত গোরু এত আক মাটির ভেতর কোথায় যায় কিছুই বুঝতে পারলাম না। বিস্তর খোঁজ-টোঁজ করে বুঝলাম, মাটির ভেতরে কল আছে, কলের একশোটা মুখ তারকেশ্বরের কাছে গিয়ে বেরিয়েছে; একেকটা মুখ থেকে একেক রকম মিঠাই বেরোচ্ছে—কোনোটা থেকে রাতাবি, কোনোটা থেকে মনোহরা, কোনোটা থেকে কাঁচাগোল্লা, কোনোটা থেকে রস-গোল্লা, কোনোটা থেকে ছানাবড়া, কোনোটা থেকে পান্তুয়া। কিন্তু ভাই, খেয়ে দ্যাখো, সবই একরকম তার। এক পাকের তৈরি কিনা!

গল্প শেষ করে বিদ্যাসাগর বললেন—তাই বলি পূর্ণচন্দ্র, আমাদের যেসব ছেলে আছে, তাদের কাছ থেকে আমরা মাইনে নিই, পাংখা ফি নিই, একজামিনে-শন ফি নিই, নিয়ে কলের দোর খুলি। বলে দিই, এখানে মাষ্টার আছে, এখানে পণ্ডিত আছে, এখানে বই আছে, এখানে বেঞ্চি আছে, এখানে চেয়ার আছে, এখানে কালি-কলম দোয়াত-পেন্সিল সবই আছে। বলে তাদের কলের ভেতর ফেলে চাবি ঘুরিয়ে দিই। কিছুকাল পরে কলে তৈরি হয়ে তারা কেউ সেকেন ক্লাস দিয়ে, কেউ এন্ট্রেন্স হয়ে, কেউ এল. এ. হয়ে, কেউ বি. এ, হয়ে, কেউ বা এম. এ. হয়ে বেরোয়। কিন্তু সবাই লেখে I has; এক পাকের তৈরি কিনা!

তারপর পূর্ণচন্দ্রের আরো একটি প্রশ্ন আছে—আচ্ছা, আপনারা তো ছেলেদের কাছ থেকে মাইনে নেন, নানারকম ফি নেন; বই, কাগজ, খাতাপত্র, ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স, রঙের বাক্স এসব কেনান। কিন্তু তাদের শেখান কী, দেন কী?

নিজস্ব ভঙ্গিতে একটি অপূর্ব উত্তর দিয়েছেন বিদ্যাসাগর :

"পূর্ণবাবু, আপনি কখনো আমাদের দেশে যাননি। মাঝে-মাঝে বন্যার আমাদের দেশের ঘরবাড়ি, মাঠ-ঘাট, ক্ষেত-খামার, বাগান-বাগিচা সব জলে জলময় হয়ে যায়। সব তো জলে জলময়, যারা গ্রাম থেকে ঘাটালে যাবে তাদের উপায় কি। তারা মনের আটকালে রাস্তাটা এঁচে নেয়, তারপর সেই রাস্তায় চলতে থাকে। পায়ের তেলো জলে ডুবে যায়। ডাঙাজমি দেখা যায় না। কোথাও হাঁটুজল, কোথাও কোমরজল। জল ভেঙে-ভেঙে প্রায় চার ক্রোশ রাস্তা পার হয়ে এলে তবে একটা বাঁশের টং চোখে পড়ে। টঙে একখানা মই লাগানো, টঙের মাথায় ঘাটমাঝি-মশাই বসে আছেন।

অনেক কষ্টে টঙের কাছে এসে কেউ হয়তো ঘাটমাঝিকে বলল—মাঝি, আমায় পার করে দাও।

ঘাটমাঝি বলল—মশাই, আপনি উপরে আসুন।

মশাই উপরে এলে ঘাটমাঝি বলল—পারের কড়ি রাখুন। অন্য সময় যা রাখেন, এখন তার আটগুণ রাখতে হবে।

এসময়ে ঘাটমাঝির কথার উপর আর কথা চলে না। ঘাটমাঝির কথামতো গুণে-গেঁথে কড়ি রাখতে হল।

তখন ঘাটমাঝি বলল—ওই দেখুন নৌকো আছে। নৌকোয় বোটে আছে, দাঁড় আছে, হাল আছে, লগি নেই। বন্যার নদীতে লগি দিয়ে থই পাওয়া যায় না। আপনি বোটে বাইতে-বাইতে ওই ওপারে চলে যান। ওপারে যে টঙ দেখছেন ওর কাছে নৌকো রেখে যেখানে ইচ্ছা চলে যান।

ষোলো

নতুন চরিত্র, নতুন সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছেন বিদ্যাসাগর। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন : "তিনি (বিদ্যাসাগর) প্রতীচ্য সভ্যতার সকল বিভাগই সমুচিতরূপে অনুশীলন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতীচ্য জগৎ হইতে যে কিছু জীবনের আদর্শ পাইয়াছিলেন, তাহা প্রাচ্যভাব ও প্রাচ্যজীবনের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা করিতেন; প্রাচ্য প্রীতি, ভক্তির উপরে প্রতীচ্য কর্ম্ম-শীলতা স্থাপন করিবার প্রয়াস করিতেন।...বিদ্যাসাগর মহাশয় মানব চরিত্রের আদর্শে প্রাচ্য প্রতীচ্যের সমাবেশ করিয়া নবচরিত্র ও নবসমাজ গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন।"[১]

শিক্ষা ছাড়া নতুন চরিত্র, নতুন সমাজ গড়ে তোলা যায় না। বিদ্যাসাগর সারাজীবন এদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য কাজ করেছেন। সরকারী কর্মচারী হিসেবেও করেছেন, স্বাধীনভাবেও করেছেন। শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিদ্যাসাগর যা করেছেন, তার কোনো তুলনা নেই।

সংস্কৃতবিদ্যার সঙ্গে ইংরেজিবিদ্যাকে তিনিই মিলিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের পোষাক-আষাক নতুন নয়, নতুন তাঁর মন-বুদ্ধি, নতুন তাঁর ক্রিয়া-কর্ম। নতুন এবং সফল। তা যদি না হত তো এই বিদ্যাসম্মিলনের কাজ তিনি করতেন না, এ-ভার তিনি নিতেন না।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"এই বিদ্যাসম্মিলনের ভার নিয়েছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁর বাইরের ব্যবহার বেশভূষা প্রাচীন কিন্তু যাঁর অন্তর চির-নবীন। স্বদেশের পরিচ্ছদ গ্রহণ করে তিনি (বিদ্যাসাগর) বিদেশের বিদ্যাকে আতিথ্যে বরণ করতে পেরেছিলেন এইটেই বড় রমণীয় হয়েছিল।...

তিনি নবীন ছিলেন এবং চিরযৌবনের অভিষেক লাভ করে বলশালী হয়েছিলেন। তাঁর এই নবীনতাই আমার কাছে সব চেয়ে পূজনীয় কারণ তিনি আমাদের দেশে চলবার পথ প্রস্তুত করে গেছেন।"[২]

সরকারী চাকরি ছেড়ে দেবার পর বিদ্যাসাগরের একটা মস্ত কীর্তি মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিটুশ্যন। মেট্রোপলিটনের ইতিবৃত্ত বলার আগে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে দুটো গল্প বলা যেতে পারে। বিদ্যাসাগরের নিজের মুখের গল্প।

একবার দিনকয়েকের জন্য লক্ষ্মৌ গিয়েছেন বিদ্যাসাগর। সেখানে পূর্ণ-চন্দ্র নামে একজন বাঙালী বললেন—বিদ্যাসাগর মশায়, আপনি তো কলকাতা ইউনিভার্সিটির সিনিয়র ফেলো। ইউনিভার্সিটির যে-ছেলেটা সেকেন ক্লাস থেকে বের হয়ে যায়, সেও লেখে I has; যে এন্ট্রেন্স পাশ করে, সেও লেখে I has; যে এল. এ. পাশ করে, সেও লেখে I has; যে বি. এ. পাশ করে, সেও লেখে I has; যে এম. এ. পাশ করে, সেও লেখে I has; আচ্ছা, এটা কেন হয় বলুন দেখি।

উত্তরে বিদ্যাসাগর পূর্ণচন্দ্রকে কয়েকটা গুলিখোরের গল্প শুনিয়েছেন। শেষ গুলিখোরের গল্পে পূর্ণচন্দ্রের কথার জবাব আছে।

গল্পের শেষ গুলিখোর বলছে—আমার বাড়ি ফরাসডাঙা। বাড়ি গিয়ে

Awarded
to Jogindra Chunder Bose
at the close of his brilliant
Career as a Student
in the Metropolitan Institution
Issarachundra Sarma
8th January 1875

যোগেন্দ্রচন্দ্রের বাড়িতে। যোগেন্দ্রচন্দ্রকে বললেন—কি রে, ভয় পেয়েছিলি যে।...তুই আমার বাড়ি যাস।

তারপর যোগেন্দ্রচন্দ্র এলেন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে। নিজের লাইব্রেরি থেকে বিদ্যাসাগর একখণ্ড সুন্দর করে বাঁধানো "ওয়েভার্লি উপন্যাসাবলী" উপহার দিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্রকে। নিজের হাতে লিখে দিলেন :

awarded
to Jogindra Chandra Bose
at the close of his brilliant
career as a student
in the metropolitan Institution

Iswarachandra Sarma
8th January 1875 [৭]

এই কলেজের প্রথম বছরের পরীক্ষাতেই এমন সুফল হল যে সকলে অবাক হয়ে গেলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সার্টক্লিফ সাহেব বললেন—The Pandit has done wonders.

সূর্যকুমার অধিকারীর কন্যা সরযূবালা দেবী লিখেছেন : "বিদ্যাসাগর কালেজে বি, এ, বি, এল, এম, এ, এবং সায়েন্স প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ বিভাগগুলি পিতার একমাত্র চেষ্টা, যত্ন, অধ্যবসায়, ও পুরুষকার বলেই সংসাধিত হয়। ইহা তাঁহার আমলের ছাত্রমণ্ডলী সকলেই বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন। সর্ব্বপ্রথমে যে বৎসর ঐ কালেজ হইতে বি, এল, পরীক্ষার্থীগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এল, পরীক্ষায় প্রেরিত হন, সেই বৎসর বি, এল, পরীক্ষার ১৫।১৬ দিন পরেই পিতা স্বপ্নে দেখেন যে কলিকাতা গেজেটে বি, এল, পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে, এবং বিদ্যাসাগর কালেজেরই তিনটী পরীক্ষার্থী পারদর্শিতা অনুসারে প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন, এবং পাশের সংখ্যাও এই কালেজেরই অন্যান্য কালেজ অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। এ স্বপ্নবৃত্তান্ত পরদিন প্রাতে পিতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গোচর করায়, তিনি ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন, তোমার মনের বাসনানুসারেই এরূপ স্বপ্নদর্শন হইয়াছে; কিন্তু এ স্বপ্নবৃত্তান্ত এখন আর অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। অনন্তর যথাসময়ে, কলিকাতা গেজেটে ঠিক অবিকল এরূপ ফলই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে দেখা গেল। গেজেট দৃষ্টে আমার মাতামহ বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতাকে বলিলেন, "হাঁ এখন বুঝিলাম, স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তা বলিয়া উড়াইয়া দিবার নহে।"[৮]

উত্তরকালে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন : "এই মহাপুরুষ (বিদ্যাসাগর) সর্ব্ব প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, ইংরাজের শিক্ষা ও ইংরাজের সাহায্য ব্যতীতও এ দেশে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। অতি স্বল্প ব্যয়ে উচ্চ শিক্ষা বিধানের ব্যবস্থাও সর্ব্ব প্রথম তিনি করিয়াছেন। এ পথ তিনি না দেখাইলে উচ্চশিক্ষা বোধ হয় এতদিন অতি অল্প সংখ্যক লোকে আবদ্ধ থাকিত। তাঁহার মেট্রোপলিটান্ হইতে বৎসর বৎসর অসংখ্য ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহার মহিমা প্রচার করিতেছেন। প্রেসিডেন্সি কালেজ আমাদের দেশের যত উপকার না

জন্য আপনাদের নিকট অকপট হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ঐ গুরুতর ভার বহন করিয়া যতদিন এই ফণ্ডের সংস্রবে ছিলাম, সেই সময় মধ্যে অবশ্যই আমি অনেক দোষে দোষী হইয়াছি, দয়া করিয়া, আপনারা আমার সকল দোষের মার্জ্জনা করিবেন। যতদিন আপনাদের ট্রষ্টি ছিলাম, সাধ্যানুসারে ফণ্ডের হিতচেষ্টা করিয়াছি; জ্ঞানপূর্ব্বক বা ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনও সে বিষয়ে অযত্ন, উপেক্ষা বা অমনোযোগ করি নাই। এক্ষণে আপনারা প্রসন্ন হইয়া বিদায় দেন, প্রস্থান করি।

কলিকাতা,
১০ ফাল্গুন, ১২৮২ সাল।

ভবদীয়স্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ"[১২]

আবার মেট্রোপলিটনে ফিরে আসা যাক।

১৮৭৯ সালে ফার্স্ট গ্রেড কলেজ হয়ে গেল মেট্রোপলিটন। ১৮৮১ সালে মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে ছাত্রেরা বি. এ. পরীক্ষা দিল।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "সংস্কৃত কলেজের কর্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিটুশ্যন। বাঙালির নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি দরিদ্র ছিলেন, তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন; যিনি লোকাচাররক্ষক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন, এবং সংস্কৃত বিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না, তিনিই ইংরেজি বিদ্যাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন।"[১৩]

কলেজ-ক্লাশ খোলার পর মেট্রোপলিটনের কাজ-কর্মে কোথাও কোনো বাধা-বিঘ্ন হয়নি, একথা মনে করলে ভুল হবে। পদে-পদে বাধা পেয়েছেন বিদ্যাসাগর।

নিতান্ত বিরক্ত হয়ে বিদ্যাসাগর একবার কলেজের সব ছাত্রকে ডেকে বললেন—দ্যাখ, রোজ-রোজ গোলমালে দরকার নেই। তোরা কে-কে চলে যেতে চাস, বল। এখনই চলে যা, আমি কলেজ-ক্লাশ চাই না। কেউ না থাকে সেও ভালো, তবু গোলমাল চাই না। আজ বল, কে-কে যাবি?

ছাত্রেরা চুপ।

তখন বিদ্যাসাগর ঠিক করলেন, একেকজন করে সকলকে জিজ্ঞেস করবেন, কে কে এ-কলেজ থেকে চলে যেতে চায়।

প্রথম যাকে জিজ্ঞেস করলেন, সে বলল—আমি আর-কোথাও যাব না।

একে-একে সব ছাত্রই তখন বলল—পাশ হই আর ফেল হই, এখানেই থাকব, অন্য কোথাও যাব না।

বিদ্যাসাগর খুশি হয়ে বললেন—তোদের জন্য আমার কি ভাবনা নেই? অন্য কলেজে পড়লে যেমন পড়া হত, এখানেও যাতে তা হয়, সে-পক্ষে কোনো অভাব হবে না। তোরা লোকের কথায় নাচিস না।[১৪]

মেট্রোপলিটনে একেকটি ছাত্রের তিনটাকা মাইনে লাগে। বিনা মাইনেতেও পড়ত অনেক ছাত্র। কোনো-কোনো ছাত্রের খাওয়া-পরার খরচও বিদ্যাসাগর দিতেন।

মফস্বল থেকে একটি গরীব ছেলে দরখাস্ত করেছে। সে বিনে মাইনের মেট্রোপলিটনে পড়তে চায়।

তা পড়ুক। প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন বিদ্যাসাগর। তারপর ওকে জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু এখানে তুমি থাকবে কোথায়? তোমার খাওয়া-পরার কি ব্যবস্থা হবে? তাছাড়া বই কিনতে টাকা লাগবে, অন্যান্য খরচ আছে—কোথায় পাবে সেসব?

ছেলেটি বলল—কলকাতায় অনেক দয়ালু বড়োমানুষ আছেন। আমি তাঁদের কয়েকজনের কাছে যাব, সামান্য মাসহারা চাইব। সেই মাসহারাতেই আমার সব খরচ চলে যাবে। আশা করি, কলকাতার কয়েকজন বড়োমানুষ আমাকে কিছু-কিছু সাহায্য করবেন।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কলকাতার দয়ালু বড়োমানুষদের নাম জানো?

—না। খোঁজ-খবর নিয়ে আমি একটা নামের ফর্দ করব।

বিদ্যাসাগর একখানা কাগজ এগিয়ে দিলেন ছেলেটির দিকে। একটা পেন্সিল দিলেন। বললেন—এখনি ফর্দ করো। আমি বলে যাচ্ছি, তুমি নাম-ঠিকানা লিখে যাও।

বড়োমানুষদের নাম-ঠিকানা বলে যেতে লাগলেন বিদ্যাসাগর। ছেলেটি ফর্দ লিখে ফেলল। ফর্দ পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

কিন্তু, হায়, যা আশা করেছিল ছেলেটি, তা হল না। কোথায় সাহায্য? কোথাও আশা নেই, ভরসা নেই, কিছু নেই। কেউ-কেউ ছেলেটিকে হাঁকিয়ে দিয়েছে, কেউ-কেউ অবশ্যি অনেকক্ষণ বাদে—না, হাতে-নাতে কিছু দেয়নি—পরের মাসে আসতে বলে দিয়েছে। পরের মাসে দেবে।

ছেলেটি গেল পরের মাসে। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না।

ছেলেটির প্রায় উপোস করার দশা। মন ভেঙে গেছে। নিরুপায় হয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে চলে এল ছেলেটি। ওকে দেখে খুশি হলেন বিদ্যাসাগর। বললেন—কি হে, পেয়েছ? আশা করি, তুমি যেমন চেয়েছ কলকাতার দয়ালু বড়োমানুষদের কাছে তেমনি সাহায্য পেয়েছ।

মাথা নিচু করে রইল ছেলেটি। নিজের দুঃখের কথা বলল।

—আমি একবিন্দু অবাক হইনি—বিদ্যাসাগর বললেন—কলকাতার পয়সা-অলা, অলস, বাজে লোকদের মনে দয়া আছে, তোমার এই ভুল ধারণা ভেঙে গেল, ভালোই হল।

সেদিন থেকে ছেলেটির সব খরচ জুগিয়েছেন বিদ্যাসাগর।[১৩]

১৮৭৮ সালে কুমারখালি হাইস্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেছে জলধর সেন। মাসিক দশ টাকা বৃত্তি পেয়েছে।

ঘোর দারিদ্র্য সংসারে। দারিদ্র্যের সঙ্গে বিপুল সংগ্রাম করতে হয়েছে জলধর সেনকে।

এন্ট্রান্সের ফল বেরল ডিসেম্বরে, মাস কয়েক পরে জলধর কলকাতায় চলে এল। শুনেছে, কলকাতায় গিয়ে বিদ্যাসাগরকে ধরতে পারলে তাঁর কলেজে বিনা মাইনেয় ভর্তি হবার আশা আছে।

কলকাতায় যেদিন এল, তার পরদিনই জলধর গেল বাদুড়বাগানে, বিদ্যাসাগরের বাড়িতে। পরনে ময়লা ধুতি-চাদর, পায়ে নতুন চটি। জীবনে সেই প্রথম জুতো পায়ে দিয়েছে।

এককথায় ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ার সাহস হল না জলধরের। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরের মধ্যে বিদ্যাসাগর যেন কার সঙ্গে কথা বলছিলেন। কথা শেষ হতেই বিদ্যাসাগর কাকে যেন বললেন—ওহে, দ্যাখো তো, বারান্দায় একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ভেতরে আনো।

জলধর চট করে ঘরে ঢুকল। একটা টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বিদ্যাসাগর সোজা হয়ে বসে আছেন। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করল জলধর। কিন্তু সাহস করে বিদ্যাসাগরের পায়ে হাত দিতে পারল না।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—কি রে, কি চাস?

জলধর হাতজোড় করে বলল—আজ্ঞে, আমি কলেজে পড়তে চাই।

—এবার বুঝি পাশ করেছিস?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। এবারেই সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করেছি, দশটাকা স্কলারশিপও পেয়েছি।

বিদ্যাসাগর হাসলেন। বললেন—এতটুকু ছেলে স্কলারশিপ পেয়েছিস, বেশ! তোর বাড়ি কোথায়?

কুমারখালি। শুনে বিদ্যাসাগর বললেন—ওঃ, পাংশার কাছে। পাংশায় যে আমাদের সূর্যিদের বাড়ি।

সূর্যি মানে সূর্যকুমার অধিকারী। বিদ্যাসাগরের জামাই। তিনি তখন মেট্রোপলিটন কলেজের সুপারিন্টেন্ডেন্ট।

বিদ্যাসাগর বললেন—এগজামিনের রেজাল্ট তো ডিসেম্বর মাসে বেরিয়েছে, তুই এই এপ্রিল মাস পর্যন্ত কি করছিলি?

অনেক দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা বলতে হল। সব কথা স্তব্ধ হয়ে শুনলেন বিদ্যাসাগর। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন—তাই তো রে, আমার কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে বোধহয় জায়গা নেই, সব ভর্তি হয়ে গিয়েছে।

ডেকে পাঠালেন সূর্যকুমারকে। বললেন—দ্যাখো সূর্যি, এ-ছেলেটি তোমাদের দেশের। এর বাড়ি কুমারখালি। এ ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হতে চায়। ভালো ছেলে হে, স্কলারশিপ পেয়েছে।

সূর্যকুমার বললেন—আর ছেলে নেবার উপায় নেই। সব ভর্তি হয়ে গিয়েছে।

বিদ্যাসাগর তাকালেন জলধরের দিকে। বললেন—শুনলি তো। এ-বছর আর আমার কলেজে জায়গা হবে না। এ-বছরটা অন্য কলেজে ভর্তি হ, আসছে বছর তোকে সেকেন্ড ইয়ারে নেব। মাইনে-টাইনে কিছু দিতে হবে না।

একটুকাল থামলেন। তারপর আবার বললেন—দ্যাখ, তোর কথা যা শুনলাম, তোর খরচ চলবে কেমন করে? এই ধর না কেন, জেনারেল এসেমব্লিতে যদি ভর্তি হতে পারিস, তাহলে তারা পাঁচটাকা মাইনে নেবে—স্কলারশিপ-ওয়ালাদের একটাকা রেহাই দেয়। তাহলে তোর আর পাঁচটাকা থাকল, তাতে চলবে কি করে রে?

সত্যি, কেমন করে চলবে। বলবার মতো কিছু নেই, জলধর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

বিদ্যাসাগর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন—কিছু মনে করিস না, এ-বছর তোর কলেজের মাইনে আমি দেব। তারপর সেকেন্ড ইয়ারে তো

এখানেই আসছিস। তাই যা, জেনারেল এসেম্বলিতে খোঁজ নে গিয়ে। শুনেছি তারা ভর্তি করে, তাদের বেশি ছেলে হয়নি। আজই সেটা ঠিক করে কাল সকালে আবার আমার এখানে আসিস—বুঝলি?

এমন হৃদয়ও হয় মানুষের! চোখের সামনে জলজ্যান্ত একজন মানুষের! জলধর আর নিজেকে সামলাতে পারল না, দু-চোখ জলে ভরে উঠল তার।

বিদ্যাসাগর উঠে এলেন। জলধরের মাথায় হাত রাখলেন। বললেন—ওরে পাগল, দারিদ্র্য অপরাধ নয়। আমিও তোর মতো দরিদ্র ছিলাম। যা, কাল আসিস।[১৬]

উত্তরকালে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছেন জলধর সেন। জীবনে কোনোদিন তিনি বিদ্যাসাগরের অপার করুণার কথা ভুলতে পারেননি।

স্কুল-কলেজের ছেলেদের বড়ো ভালোবাসেন বিদ্যাসাগর। বাড়িতে যেতে বলেন। ওদের জন্য ভালো-ভালো খাবার কিনে আনান। ছেলেদের ধাতুর লুঙ্ জিজ্ঞেস করেন। ছেলেদের পদ ও ধাতু সাধতে দেন।

যে ছাত্র যতগুলো প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে পারত, সে ততগুলি সন্দেশ পেত। যে ছাত্র একটা প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারত না, তাকে সন্দেশ ভিক্ষা করতে হত। বিদ্যাসাগর বলতেন—তুই এদের প্রত্যেকের কাছ থেকে চেয়ে নে। প্রত্যেকে একটা করে সন্দেশ দিত তাকে।[১৭]

ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন বি. এ. পাশ করেছেন ১৮৮৯ সালে। তারপর কুমিল্লা শম্ভুনাথ ইনস্টিটিউশনে হেডমাস্টার হয়ে এলেন। অল্পদিন বাদেই চলে গেলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলে।

আচ্ছা, কলকাতায় বিদ্যাসাগরের স্কুলে একটা কাজ পাওয়া যায় না? কলকাতায় গিয়ে একবার দেখা করলে হয় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়।

সেই চেষ্টায় একবার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন দীনেশচন্দ্র। জ্যৈষ্ঠমাসের একদিন দীনেশচন্দ্র বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে চলে এলেন। একা এলেন না, সঙ্গে মামাতো ভাই মতিলাল আছেন।

দোতলার একখানা ঘর; চারদিকে বইয়ের আলমারির মধ্যে একখানা টেবিল, টেবিলের ধারে কয়েকখানা চেয়ার, একখানা চেয়ারে বসে বিদ্যাসাগর কাগজ-পত্র দেখছেন।

দুই ভাই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেলেন বিদ্যাসাগরকে। যেন একটু সন্ত্রস্ত হয়ে পা সরিয়ে নিতে লাগলেন বিদ্যাসাগর, কিন্তু তার মধ্যেই দুজনের পায়ের ধুলো নেওয়া হয়ে গেছে।

বিদ্যাসাগর বললেন—কি চাস?

আর কি, চাকরি। বিদ্যাসাগরের স্কুলে চাকরি চাইতে এসেছেন দীনেশচন্দ্র।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—বাড়ি কোথায়?

দীনেশচন্দ্রের বাড়ি ঢাকা জেলায়। অর্থাৎ, দীনেশচন্দ্র বাঙাল।

বিদ্যাসাগর বললেন—তাই তো, তুই যে বাঙাল, তা তো তোর কথার টানেই বুঝতে পেরেছি। এখানকার ছাত্র তোর টিপ্রা জেলার ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্র নয় যে তুই অনার পাশ শুনে চমকে উঠবে। এখানে বড়ো-বড়ো ওস্তাদ শিক্ষকেরা ঘায়েল হয়ে যায়, তারা ক্লাশ সামলে উঠতে পারে না; তুই বাঙাল তোকে তো একদিনে পাগল করে ছাড়বে।

দীনেশচন্দ্র বললেন—ক্লাশ পড়াতে দিয়ে দেখুন না, বেশ তো, দেখি আপনার ছেলেরা বাঙালকে কি করে ঘায়েল করতে পারে?

বিদ্যাসাগর বললেন—তোর তো বেশ সাহস আছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না, তুই পারবি। বাঙালের কর্ম নয়। যা হোক, তুই যখন চাচ্ছিস, আজ শনিবার, তুই সোমবার দিন এগারোটার সময় মেট্রোপলিটন স্কুলে যাস, আমি সেই সময় যাব, তোকে ক্লাশ পড়াতে দেব।

দীনেশচন্দ্র শুনেছেন, বাঙাল মাস্টার মেট্রোপলিটনে বড়ো আমল পায়নি, তবু তাঁর এককণা ভয় হল না।

যা কথা ছিল, সোমবার ঠিক সময়ে মেট্রোপলিটন স্কুলে গিয়ে হাজির হলেন দীনেশচন্দ্র। প্রায় পনেরো মিনিট পরে একখানা পাল্কি এসে স্কুলের গেটে থামল, পাল্কির ভেতর থেকে চটি পায়ে বিদ্যাসাগর বেরিয়ে এলেন। দীনশচন্দ্রকে বললেন—চল, তোকে হেডমাস্টার মশায়ের সঙেগ দেখা করিয়েই দি।

লাইব্রেরি রুমে ডাকিয়ে আনলেন হেডমাস্টার মশাইকে। তাঁর সঙেগ দীনেশচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁকে বললেন—তুমি একে প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়াতে দাও।

হেডমাস্টার মশাই দীনেশচন্দ্রকে বললেন—আপনি দেখছি ছেলেমানুষ। কি পড়াবেন?

দীনেশচন্দ্র বললেন—ইংরেজি আর ইতিহাস।

প্রথম শ্রেণীতে ইংরেজি পড়ালেন। ছাত্রেরা স্তব্ধ হয়ে শুনল। শেষকালে দীনেশচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের বললেন—তোমাদের পড়া দেখছি খুব কমই হয়েছে। সামনে পরীক্ষা, কি করে সবটা শেষ করবে? ইংরেজি যিনি পড়িয়েছেন, তিনি বেশ হিসেব ঠিক করে পড়াননি।

বলে যেই ক্লাশ থেকে বেরোবেন, দেখলেন, দরজার পাশে হেডমাস্টার চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছেন, দীনেশচন্দ্রের পড়ানো শুনছিলেন। প্রথম শ্রেণীতে ইংরেজি পড়ান স্বয়ং হেডমাস্টার মশাই। 'ইংরেজি যিনি পড়িয়েছেন, তিনি বেশ হিসেব ঠিক করে পড়াননি,'—দীনেশচন্দ্রের একথা হয়তো হেডমাস্টার মশাই শুনতে পেয়েছেন এবং শুনতে পেলে নিশ্চয়ই তিনি খুশি হননি। দীনেশচন্দ্রের একটু ভয় হল।

পরের ঘণ্টায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইতিহাস পড়ালেন দীনেশচন্দ্র।

খোঁজ-খবর নিয়ে দীনেশচন্দ্র জানলেন, দুই শ্রেণীর ছাত্রেরাই দীনেশচন্দ্রের পড়ানো খুব পছন্দ করেছে।

পরদিন দীনেশচন্দ্র গেলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগর টেবিলের দেরাজ থেকে একখানা কাগজ বের করে দীনেশচন্দ্রকে দেখালেন। হেডমাস্টার মশাই রিপোর্ট দাখিল করেছেন; জানিয়েছেন যে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা খুশি হয়নি, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা ভালোই বলেছে।

দীনেশচন্দ্র রাগ করে বিদ্যাসাগরকে বললেন—এসব আপনার হেডমাস্টারের চালাকি, চলুন, আপনি নিজে ছাত্রদের জিজ্ঞেস করবেন, তারা যদি না বলে যে আমি আপনার হেডমাস্টারের চেয়ে ইংরেজি ভালো পড়িয়েছি—তবে আমি কোনো কাজ চাই না। 'ইংরেজি যিনি পড়িয়েছেন তিনি বেশ হিসেব ঠিক করে পড়াননি'—ক্লাশে আমি একথা বলেছিলাম। তাই উনি রাগ করে অমন রিপোর্ট দিয়েছেন। হেডমাস্টার যে দূতির মতো কপাটের আড়াল থেকে আমার কথা শুনবেন, এ আমি জানতাম না।

বিদ্যাসাগর বললেন—তোর ভেতর তেজ আছে। তুই পারবি। অন্তত একটা ক্লাশ তো খুশি করেছিস। হেডমাস্টার নিজে লিখেছে—আমি তা আশা করিনি। বাঙাল মাস্টার পেলে তো ছেলেরা তাকে লাড্ডুর মতো ব্যবহার করে। যা হোক, আমি আর কোনো খোঁজ নেব না, তোকে যোগ্য মনে করলাম। কিন্তু তোর আগে পাঁচ-ছজন যোগ্যতা দেখিয়েছেন—এই দ্যাখ তাদের নাম। এরা কাজ পেলে তুই পাবি। আর দেড়মাস কি দু-মাস পরে আমি তোকে নিতে পারব। তুই মাঝে-মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করিস।

দীনেশচন্দ্র বললেন—আমার যে কুমিল্লার স্কুল খুলেছে। দু-একদিনের মধ্যেই আমাকে যেতে হবে। আপনি আমায় কাজ খালি হলে চিঠি লিখবেন।

—তা হবে না।—বিদ্যাসাগর ঘাড় নেড়ে বললেন—তোর এখানে থাকতে হবে। এখানে কর্মপ্রার্থী এত লোক আছে যে কাজ খালি হলে তোকে কুমিল্লা থেকে চিঠি লিখে আনানোর সবুর সইবে না। ওরকম করতে হলে ক্লাশে দশ-পনেরো দিন পড়া বন্ধ রাখতে হয়, তা পারব না। তুই সেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে যদি এখানে থাকতে পারিস, তবে দু-মাসের মধ্যে কাজ পাবি, এটি আমি বলতে পারি।

দীনেশচন্দ্র বললেন—আগেই সেখানকার কাজ আমি ছেড়ে দিতে পারব না। সেখানে আমার একটা দায়িত্ব আছে। সেখানকার একটা ব্যবস্থা করে তো ছেড়ে দিতে হবে।

বিদ্যাসাগর বললেন—তবে আমি আর কি করব?

বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করে চলে গেলেন দীনেশচন্দ্র।[১৮]

কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে মেট্রোপলিটন কলেজে কাজ দিলেন বিদ্যাসাগর। বললেন—যাও, পড়াশোনা করোগে। ভেতরে-ভেতরে টেক্কা হয়ে থেকো না যে আমি খুব জানি।

একদিন নয় দুদিন নয়, সাতদিন বিদ্যাসাগর কালীকৃষ্ণের পিরিয়ডে কালীকৃষ্ণের পিছনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কেন? কালীকৃষ্ণ একদিন জিজ্ঞেস করলেন।

উত্তরে বিদ্যাসাগর কয়েকখানা স্লিপ বের করে দেখালেন। কালীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরকে স্লিপ দেওয়া হয়েছে : এঁর পিরিয়ডে ছেলেরা গোলমাল করে, ইনি ভালো পড়াতে পারেন না ইত্যাদি। স্লিপ দেখিয়ে বিদ্যাসাগর বললেন—আমার বোধ হয় কলেজের উপরালাদের কারো কোনো লোকের কাজের দরকার হয়েছে, তাই এইরকম স্লিপ। আমি তো তোমার পড়ানো শুনলাম। তুমি নির্ভয়ে কাজ করোগে।[১৯]

কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য লিখেছেন : "মেট্রোপলিটান কলেজ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণ ছিল। তিনি প্রায়ই প্রতিদিন কলেজ ও স্কুল দেখিতে আসিতেন। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতে পাইলেই তাঁহার নিকট আনন্দে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিত ও নানারূপ আনন্দ প্রকাশ করিত। তিনিও তাহাদিগকে লইয়া মহা আনন্দিত হইতেন। তিনি শিক্ষক ও অধ্যাপকদিগের পশ্চাৎ দাঁড়াইয়া তাঁহাদের অধ্যাপনা শুনিতেন। দোষ দেখিলে তাহার শোধন করিয়া দিতেন। ছাত্রদিগের যাহাতে সম্মান রক্ষা হয়, সে বিষয়ে শিক্ষক ও অধ্যাপকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। একদিন আমি অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া একটী ছাত্রকে একটী প্রশ্ন করি, সে তাহার উত্তর দিতে অসমর্থ হওয়াতে আমি অন্য ছাত্রকে তাহার প্রকৃত উত্তরের

জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু পর ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করা ভাল বোধ হইল না। পুনরায় পূর্ব্বছাত্রকে প্রষ্টব্য বিষয়ের আভাস দিয়া ক্রমে তাহার মুখ হইতেই সম্পূর্ণ উত্তর বাহির করাইয়া লইলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় পশ্চাৎ দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। তিনি আমাকে গোপনে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, এক ছাত্র একটা বিষয়ে বলিতে না পারিলে তজ্জন্য অন্য ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিতে নাই। ইহাতে পূর্ব্বছাত্রের অবমাননা করা হয়। যেমন করিলে, এইরূপে যাহাতে ছাত্রের মুখ দিয়া প্রকৃত উত্তর বাহির হয় তাহার আভাস দিবে ও তাহার মুখ দিয়া বাহির করাইয়া লইবে।"[২০]

মেট্রোপলিটনের জন্য ভালো শিক্ষকের খোঁজ করতেন বিদ্যাসাগর। কোথাও ভালো শিক্ষকের খোঁজ পেলে তাঁকে মেট্রোপলিটনে নিয়ে আসতে চাইতেন। একদিন শুনলেন, গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সুশিক্ষক। বিদ্যাসাগর ডেকে পাঠালেন গঙ্গাধরকে।

গঙ্গাধর এলেন। হ্যাঁ, বিদ্যাসাগর গঙ্গাধরকে মেট্রোপলিটনে নিতে চান। গঙ্গাধর রাজি?

গঙ্গাধর বললেন—আপনার হাতে আসতে পারলে আমার বিশেষ লাভ হবে। কিন্তু যেখানে এখন কাজ করছি সেখান থেকে হঠাৎ অসময়ে চলে এলে সেখানকার ছাত্রদের বিশেষ ক্ষতি হবে। সুতরাং, এখন পারব না। যখন বুঝব আমি ছেড়ে এলে সেখানে বিশেষ ক্ষতি হবে না, তখন আসতে পারি। কেবল টাকার দিকে তাকালে মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিতে হয়।

গঙ্গাধরের কথা শুনে বিশেষ খুশি হলেন বিদ্যাসাগর। বললেন—ভাই গঙ্গাধর, আমি তোমার এই কথায় খুব খুশি হলাম। তোমাদের মতো লোক দিয়েই বাঙলার গৌরব। তুমি টাকার খাতিরে অসময়ে সে-বিদ্যালয় ছেড়ে আসো, একথা কিছুতেই বলতে পারব না। আমি তোমাকে তাদের সম্বন্ধে 'পেজোমি' করতে বলতে পারব না।[২১]

মেট্রোপলিটনের অধ্যাপকদের মাইনে খুব ভালো।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন একদিন মেট্রোপলিটনের একজন অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কী বেতন পাও?

বেতনের অঙ্ক শুনে মহেশচন্দ্র অবাক হয়ে বললেন—বলো কি? তুমি এত টাকা পাও! বিদ্যাসাগর মশায় কি টাকা ঢেলে দেন?[২২]

কোনো শিক্ষক বা অধ্যাপক নিজেকে বিদ্যাসাগরের ভৃত্য বলে পরিচয় দিলে বিদ্যাসাগর সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলতেন—তোমরা আমার সহকারী। আমি সকল কাজ করতে অক্ষম বলেই তোমাদের সহকারী করেছি। ভৃত্য বলো কেন? তোমাদের অধ্যাপনায় যে টাকা আসে তা ধরতে গেলে তোমাদেরই। আমি কেবল ভাগ করে দিই।[২৩]

নিচু ক্লাশের একজন মাষ্টারমশাই ক্লাশের মধ্যে চেয়ারে বসে ঢুলছেন। বিদ্যাসাগরের চোখে পড়ে গেল। মহাবিরক্ত হয়ে মাষ্টারমশাইকে জাগিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর।

নির্ঘাত চাকরি চলে যাবে। মুখে কথা নেই, বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মাষ্টারমশাই।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—তুমি দিনের বেলা ঘুমোচ্ছ কেন? তুমি কি কাল রাত্রে ঘুমোওনি?

ভয়ে-ভয়ে মাষ্টারমশাই বললেন—আমাকে অনেক খাটতে হয়। মস্ত সংসার,

দু-তিনটে টুইশন করে চালাতে হয়। তাই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে, সেজন্যে প্রায়ই দাঁড়িয়ে পড়াই। আজ বসে পড়াতে গিয়ে বিপদে পড়েছি।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—তুমি টুইশন করে কতটাকা পাও?

টাকার অঙ্ক বললেন মাষ্টারমশাই।

বিদ্যাসাগর বললেন—তুমি এখন হতে এই টাকাটা এখান থেকে পাবে। আজি টুইশনগুলি ছেড়ে দাও।[২৪]

কিছুকাল মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন সূর্যকুমার অধিকারী। কলেজের খরচ কমানোর চেষ্টা করেছেন সূর্যকুমার, বিদ্যাসাগর মহা বিরক্ত হয়ে বলেছেন—আমি কি তোমাকে তিল-কাঞ্চনে কাজ সারতে বলেছি?[২৫]

অপরাধ যদি ক্ষমার অযোগ্য হয় তো বিদ্যাসাগর ক্ষমা করেন না, ক্ষমা করেননি।

একটি কাহিনী আছে।

মেট্রোপলিটন কলেজের পশ্চিমদিকে সেসময়ে ব্রাহ্মবালিকাদের 'অবলা-ব্যারাক'। কলেজের কয়েকটি ছাত্র মাঝে-মাঝে এমন কান্ড করে যা মেয়েদের প্রতি শিষ্টাচার নয়।

বিদ্যাসাগরকে এই খবর দিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী।

একদিন 'অবলা-ব্যারাকে' ঢুকে বিদ্যাসাগর আড়ি পেতে রইলেন। নিজের চোখে মেট্রোপলিটনের কয়েকটি অশিষ্ট ছাত্রের কীর্তি দেখলেন।

এবং সেই মুহূর্তে কলেজে এসে অশিষ্ট ছাত্রদের নাম কেটে বিদায় করে দিলেন।[২৬]

সরযূবালা দেবী লিখেছেন : "কলিকাতা মহানগরীর প্রসিদ্ধ "বিদ্যাসাগর কলেজ" পূর্ব্বে ২৪নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, ৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, এবং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনস্থিত ২৭নং একটী ভবনে অবস্থিত ছিল। এই তিনটী ভাড়াটিয়া বাড়ীর মধ্যে ২৪নং সুকিয়া স্ট্রীটস্থিত বাড়ীখানিই সুবৃহৎ ও প্রশস্ত। এই বাড়ীখানি পরলোকগত বাবু জয়গোবিন্দ লাহা মহাশয় খরিদসূত্রে দখল করিয়া স্কুল কালেজ ঐ বাড়ী হইতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য নোটিস দেওয়ায়, উপযুক্ত গৃহের অভাবে স্কুল কালেজ উঠিয়া যাইবে পিতার (প্রিন্সিপাল সূর্য্যকুমার অধিকারী মহাশয়ের) মনে বিষম এক আশঙ্কার উদ্রেক হয়। তিনি উক্ত কালেজের উন্নতিকল্পে নিজের দেহ, মন, প্রাণ উৎসর্গিত করিয়াছিলেন। এরূপ মানসিক অবস্থায় পিতা এক রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি যেন প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার শঙ্কর ঘোষের লেনস্থিত জমি ক্রয়ের ব্যবস্থা করিলেন, এবং স্বর্গীয় কাশীমবাজারের মহারাণী শ্রীমতী স্বর্ণময়ীর, এবং হাটখোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজা শ্রীনাথ রায় এবং তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায় এবং রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর দিগরের নিকট হইতে ঋণ (Loan) স্বরূপ টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা করিলেন, এবং স্বর্গীয় টালানিবাসী বিখ্যাত ইন্জিনিয়ার নীলমণি মিত্র মহাশয়ের সহায়তায় প্রকাণ্ড ত্রিতল স্কুল ও কালেজের মনোহর হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইল এবং সেই নবনির্ম্মিত অট্টালিকায় স্কুল ও কালেজের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে লাগিল এবং পিতা সেই কালেজ বাটীতেই স্কুল কালেজ পরিচালন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যকলাপ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে

লাগিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই যেন কোনও অব্যক্ত কারণে পিতার সহিত উক্ত স্কুল কালেজের সমস্ত সংশ্রব রহিত হইল এবং তিনি সপরিবারে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া উদরান্নের জন্য ভিন্ন দেশে ভিন্ন স্থানে এবং ভিন্ন লোকজন-মণ্ডলী মধ্যে যাত্রা করিলেন। এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত, পর দিন, পিতা আমার মাতামহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আদ্যোপান্ত বর্ণন করায়, তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন মনের আবেগ ও চঞ্চলতা নিবন্ধন এবং আশা ও দুরাশার কুহকে এরূপ বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন হইয়াছে। তবে স্বপ্ন নির্দ্দিষ্ট স্থল সমূহে চেষ্টা করিয়া দেখ যে যদি স্কুল ও কালেজের বাটী নির্ম্মিত হইয়া উহা স্থায়ী হয় এবং আমার আশা এবং তোমার সকল পরিশ্রম সার্থক ও সফল হয়। কিন্তু তখন এবং বাটী প্রস্তুত ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়াও পিতা কখনও একবারও ভাবেন নাই যে তাঁহার এই বিচিত্র স্বপ্নটী বর্ণে বর্ণে ফলিবে এবং সর্ব্বতোভাবে সত্য হইবে।”[২৭]

হ্যাঁ, সূর্যকুমার মেট্রোপলিটন থেকে বরখাস্ত হয়েছেন। কী কারণে বরখাস্ত হয়েছেন? সে-বিষয়ে একটি কাহিনী আছে।

কলেজের আয়-ব্যয়ের খাতা দেখতে-দেখতে বিদ্যাসাগর একদিন লক্ষ্য করলেন, হাজার দু-তিন টাকা ঘাটতি পড়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ তখন সূর্য-কুমার অধিকারী।

বিদ্যাসাগর বললেন—সূর্যি, হিসেবটা একবার দেখ তো? আমি তিনদিন বাদে আবার আসব।

তিনদিন বাদে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন—সূর্যি, হিসেবটা মিলল?

অধ্যক্ষ মাথা চুলকোতে লাগলেন। কোনো সদুত্তর দিতে পারলেন না।

বিদ্যাসাগর বললেন—টাকার যদি দরকার ছিল তো আমায় বললে না কেন? একি আমার বাপের টাকা? এ যে ছেলেদের টাকা। থাক, আজ থেকে তোমায় আর প্রিন্সিপালগিরি করতে হবে না।

তারপর উচ্চকণ্ঠে হাঁকলেন—বদ্দিনাথ।

বৈদ্যনাথ বসু হাজির হলেন। বিদ্যাসাগর বললেন—আজ থেকে তুই কলেজের প্রিন্সিপাল।[২৮]

বিদ্যাসাগরের জামাই হয়েও সূর্যকুমার নিস্তার পেলেন না।

গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মেট্রোপলিটনের ছাত্র। কী একখানা বইয়ের দরকার হয়েছে তার। কলেজের লাইব্রেরিতে বইখানা আছে।

প্রিন্সিপাল বৈদ্যনাথ বসু একখানা অনুমতিপত্র দিলেন গোপালচন্দ্রকে। সেখানা লাইব্রেরিয়ানকে দিলেই বইখানা পাওয়ার কথা।

কলেজের লাইব্রেরিয়ান তখন শশীবাবু। বিদ্যাসাগরের বন্ধুপুত্র।

প্রিন্সিপালের অনুমতিপত্রখানা শশীবাবু হাত পেতে নিলেন। তারপর গোপালচন্দ্রকে বললেন—এখন বই হবে না, যাও।

খবরটা একজন বেয়ারা বিদ্যাসাগরের কানে তুলে দিল।

গোপালচন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন বিদ্যাসাগর। জানতে চাইলেন: শশীবাবু কী বলেছেন?

গোপালচন্দ্র পড়লেন মহামুস্কিলে। ব্যাপারটাকে তিনি লঘু করার চেষ্টা করলেন।

শশীবাবু প্রিন্সিপালকে অপমান করেছেন, ছাত্রের প্রয়োজন উপেক্ষা করেছেন। বিদ্যাসাগরের বিবেচনায় শশীবাবুর অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।

বিদ্যাসাগরের বন্ধুপুত্র বলে শশীবাবু রেহাই পেলেন না। সেই মুহূর্তে শশীবাবুকে বরখাস্ত করে দিলেন বিদ্যাসাগর।[২৯]

তাহলে মেট্রোপলিটনে যাঁরা আছেন তাঁরা সকলেই কি ষোলোআনা সাধুপুরুষ, সকলেই কি সমস্ত সন্দেহের ঊর্ধ্বে? না, তা নয়।

মেট্রোপলিটনে অতি ভয়ানক-ভয়ানক লোক আছেন, বিদ্যাসাগর জানেন। জেনে-শুনেও বিদ্যাসাগর তাঁদের মেট্রোপলিটনে রেখেছেন কেন? এ-প্রশ্নের উত্তর—কাজ পাই বলে।[৩০]

কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ার অন্ত নেই। সেই সুযোগে কেউ-কেউ বিদ্যাসাগরকে অবাধে বঞ্চনা করেছেন।

একবার একজন লক্ষপতি ভদ্রলোক বিদ্যাসাগরকে বলে-কয়ে একটি গরীবের ছেলেকে বিনে মাইনেয় মেট্রোপলিটনে ভর্তি করে দিয়ে গেলেন। কিছুদিন পর বিদ্যাসাগরের চোখে পড়ল, ছেলেটির গায়ে চমৎকার পোষাক-আষাক, ছেলেটি রসগোল্লা-টসগোল্লা খাচ্ছে টিফিনে। ভারি আশ্চর্য তো। গরীবের ছেলে এত সব পোষাক-টোষাক পায় কোথায়, গরীবের ছেলের টিফিনে পান্তুয়া-রসগোল্লা আসে কোত্থেকে?

খোঁজ-খবর নিলেন বিদ্যাসাগর। জানতে পারলেন, ছেলেটি ওই লক্ষপতি ভদ্রলোকের আত্মীয়। ওই লক্ষপতি ভদ্রলোক এই ছেলেটির জামাইবাবু।

লক্ষপতি ভদ্রলোককে ছাড়লেন না বিদ্যাসাগর। গিয়ে তাঁর মুখের উপর বললেন—আমার সঙ্গে বঞ্চনা! তোমায় ধিক! কি করে তুমি নিজের শালাকে বিনা মাইনেয় ভর্তি করালে?[৩১]

কারো অন্যায় একবিন্দু সহ্য করতে পারেন না বিদ্যাসাগর।

মেট্রোপলিটনের শ্যামবাজার ব্রাঞ্চের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা কী একটা অন্যায় করেছে। ক্লাশের সমস্ত ছাত্রকে একদিন তাড়িয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর।

পরদিন ওরা বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে গিয়ে উঠল। কাতর হয়ে ক্ষমা চাইল। বিদ্যাসাগর বললেন—যা, আর একাজ করিস না। এবার মাপ করলাম।

দুপুর তখন বারোটা বাজে।

হাসতে-হাসতে ছাত্রের দল সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। একজন ছাত্র আস্তে-আস্তে বলল—কী কঠোর প্রাণ! এতখানি বেলা হল তা একবার বললে না, একটু জল খেয়ে যা।

কথাটা বিদ্যাসাগরের কানে গেল। সেই মুহূর্তে সিঁড়িতে নেমে এলেন তিনি। বললেন—ঠিক বলেছিস, আমার কঠোর প্রাণ বটে, মনের ভুলে তোদের একটু জল খেতেও বলিনি। আয়, আয়, একটু-একটু জল খেয়ে যা।

ছাত্রেরা তো মহা অপ্রস্তুত। কেউ-কেউ হাতজোড় করে ক্ষমা চাইল। পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল কেউ-কেউ।

কিন্তু কেউই যেতে পারল না। সকলকে ধরে উপরে নিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর। কিছু না খেয়ে কাউকেই যেতে দিলেন না।[৩২]

সারদাচরণ মিত্র স্বনামধন্য পুরুষ। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সারদাচরণের খুব ঘনিষ্ঠতা।

সারদাচরণের মেজোছেলের নাম শরৎকুমার। শরৎ তখন মেট্রোপলিটনের শ্যামবাজার ব্রাঞ্চে ষষ্ঠশ্রেণীতে পড়ে। সারদাচরণের সঙ্গে শরৎ একদিন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে গেল।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—কি পড়িস? কোথায় পড়িস?

শরৎ বলল—আপনারই স্কুলে শ্যামবাজারে, ষষ্ঠশ্রেণীতে পড়ি।

—তোর কিছু নালিশ আছে?

—হ্যাঁ, আছে। আমাদের পণ্ডিতমশায় আমাকে বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

—কেন?

—বর্ণের উচ্চারণস্থান মুখস্থ বলতে পারিনি।

—বটে। তোদের হেডমাস্টার তো মহেন্দ্র গুপ্ত।

—হ্যাঁ।

পরদিনই বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটনের শ্যামবাজার ব্রাঞ্চের ষষ্ঠশ্রেণীতে গিয়ে উপস্থিত। তারানাথ পণ্ডিত পড়াচ্ছেন তখন। শরৎও ক্লাশে আছে। বিদ্যাসাগর তারানাথকে জিজ্ঞেস করলেন—বর্ণের উচ্চারণস্থান মুখস্থ বলতে পারেনি বলে একে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলি?

—হ্যাঁ।

—বর্ণের উচ্চারণস্থান কি এই ক্লাশের ছেলেরা বুঝতে পারে?

—আপনার উপক্রমণিকা তো পাঠ্য। তার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বর্ণের উচ্চারণস্থান।

—তুমি অতি নির্বোধ। পাণিনি অনুসরণে উপক্রমণিকা লেখা। তাই বর্ণমালার পরেই বর্ণের উচ্চারণস্থান আছে। তোমার বোঝা উচিত ছিল যে এই ক্লাশে ওটা বাদ দিতে হবে।

বিদ্যাসাগর তারপর ক্লাশের ছাত্রদের বললেন—মাষ্টারদের নামে যদি তোদের কিছু নালিশ থাকে, হেডমাষ্টারকে বলে দিবি।

আর শরৎকে বললেন—দিনকয়েক পরে তুই আবার আমার কাছে আসিস।

মাসখানেক পরে বাবার সঙ্গে আবার বিদ্যাসাগরের বাড়িতে গেল শরৎ।

সেবার বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—আর মাষ্টাররা জ্বালাতন করছেন না?

চতুর্দিকে আলমারি ভর্তি বই। সব বই ভালোরকম বাঁধানো। সব একরকম বাঁধাই। বইয়ের আলমারি দেখতে-দেখতে শরতের জবাব দিতে বুঝি দু-এক সেকেণ্ড দেরি হল—না।

বিদ্যাসাগর বললেন—মাষ্টারদের নামে শুধু নালিশ করলে চলবে না। তাঁরা যা বলবেন বা পড়াবেন তা কিন্তু মন দিয়ে শুনতে হবে। চারদিকে কি দেখছিস?

চারদিকে বই। আলমারি ভর্তি বই। শরৎ বলল—এত বই কি আপনি পড়েন? কখন পড়েন? আপনি খেলা করেন না?

বিদ্যাসাগর হাসলেন। বললেন—ওসব কি পড়ি? কিন্তু বইর হাওয়া ভালো। খেলি বৈকি। এই তো তোর সঙ্গে খেলা করছি।

—কি হয় এত বই পড়ে?

—তোর বাবাও অনেক বই পড়ে—পড়ে-পড়ে দশহাজার টাকা পেয়েছে। তা বলে মনে করিসনি যে তোর বাবা আমার চেয়ে পণ্ডিত। আমি দশ হাজার টাকা পাইনি, কিন্তু তোর বাবাকেও পরীক্ষা করি।

সারদাচরণের দিকে তাকিয়ে বিদ্যাসাগর বললেন—ছেলেদের মারা আমি পছন্দ করি না। আমার স্কুলে মারা তুলে দিয়েছি।[৩৩]

নরেন্দ্রনাথ দত্ত—উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ—মেট্রোপলিটন স্কুলের ছাত্র।

কি একটা কান্ড দেখে নরেন একদিন ক্লাশের মধ্যে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হেসে উঠেছে। মাস্টারমশাই রাগ করে নরেনের কান মলতে লাগলেন। এমনভাবে মললেন যে নরেনের কান থেকে রক্ত পড়তে লাগল।

সেই মুহূর্তে বই নিয়ে ক্লাশের বাইরে চলে যাচ্ছে নরেন, হঠাৎ বিদ্যাসাগর এসে উপস্থিত। ব্যাপার কি? ক্লাশের মধ্যে ঢুকে পড়লেন বিদ্যাসাগর।

সমস্ত ঘটনা শুনলেন। মাস্টারমশাইকে গালমন্দ করলেন বিদ্যাসাগর। বললেন—আমি জানতাম, তুমি একজন মানুষ। এখন দেখছি, তুমি একটা পশু।

নরেনকে আশ্বস্ত করেছেন বিদ্যাসাগর।[৩৪]

বিদ্যাসাগরের বাড়িতে নেমন্তন্নও খেয়েছে ছাত্রেরা। সে এক আশ্চর্য নেমন্তন্ন।

মেট্রোপলিটনের ছাত্রেরা একবার বিদ্যাসাগরের কাছে পৌষ-পার্বণের ছুটি চাইল। ছুটি মঞ্জুর করে দিলেন বিদ্যাসাগর। তারপর ছাত্রদের বললেন—তোমাদের অনেকের তো বিদেশে বাড়ি। কলকাতার বাসায় পিঠে পাবে কোথায়?

ছাত্রেরা বলল—আপনার বাড়িতে।

বিদ্যাসাগর হেসে বললেন—ভালো। তাই হবে।

তাই হল। বিদ্যাসাগরের বাড়িতে ছেলেদের জন্য বিস্তর পিঠের ব্যবস্থা হল।[৩৫]

ছাত্রদের জন্য যেমন, মাস্টারমশাইদের জন্যও তেমনি প্রাণের টান বিদ্যাসাগরের। ছাত্র কিম্বা মাস্টারমশাই—বাড়িতে কেউ দেখা করতে গেলে বিদ্যাসাগর সব কাজ ছেড়ে আগে তাকে কিছু খেতে দেন। নিজের হাতে আম কেটে দিয়েছেন পর্যন্ত।[৩৬]

মেট্রোপলিটন কলেজের দু-দল ছাত্রের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হয়েছে। একদল আরেক দলের পিছনে গুন্ডা লেলিয়ে দিয়েছে। কলেজের একদল ছাত্র সেদিন বাড়ি যেতে পারছে না। ছুটি হবার পরেও গুন্ডার ভয়ে কলেজের মধ্যেই আছে।

বিদ্যাসাগরের শরীর সেদিন অসুস্থ। কলেজে আসেননি। কে একজন গিয়ে বিদ্যাসাগরের কানে খবরটা তুলে দিয়ে এল।

খবর শুনেই একটা পাল্কিতে উঠলেন বিদ্যাসাগর। নামলেন এসে কলেজে। প্রথম যে-গুন্ডাটার সঙ্গে দেখা হল, তাকে ধমক দিয়ে বললেন—আমার কলেজের ছেলেদের তোরা মারবি?

পায়ের চটি বিদ্যাসাগরের হাতে উঠে এসেছে। গুন্ডার পিঠেই বুঝি বিদ্যাসাগরের চটির বাড়ি পড়ে!

বলা-কওয়া নেই, ঢিপ করে বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করল গুন্ডাটা। তারপর কেটে পড়ল। দেখাদেখি অন্য গুন্ডারাও উধাও হয়ে গেল।[৩৭]

নিয়ম ছিল, মেট্রোপলিটনে কোনো মাস্টারমশাই ছাত্রদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতে পারবেন না, ছাত্রদের গায়ে বেত মারতে পারবেন না, ছাত্রদের কোনো শারীরিক শাস্তিই দিতে পারবেন না।

মেট্রোপলিটনের শ্যামপুকুর শাখায় একদিন একটা কান্ড হয়ে গেল। বিদ্যাসাগরের স্পষ্ট নির্দেশ আছে, যেন ছাত্রদের কোনো শারীরিক শাস্তি দেওয়া না হয়। সেই নির্দেশ অমান্য করে হেডমাস্টার মশাই একটি ছাত্রকে বেঞ্চের

উপরে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আর সে-খবর, কেমন করে কে জানে, বিদ্যাসাগরের কানে চলে এল।

পাল্কির জন্য সবুর করতে পারলেন না, খবর পেয়েই বাসা থেকে পায়ে হেঁটে ঝড়ের মতো চলে এলেন বিদ্যাসাগর। একটি ছাত্রকে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, হেডমাস্টার মশাই সেকথা কবুল করলেন। সেই মুহূর্তে হেডমাস্টার মশাইকে বরখাস্ত করে দিলেন বিদ্যাসাগর।

হেডমাস্টার মশাইকে এভাবে বরখাস্ত করা হল, এই কারণে কয়েকজন মাস্টারমশাইও ইস্তফা দিয়ে দিলেন। অনেকেই বিদ্যাসাগরকে ব্যাপারটা আরেকবার বিবেচনা করে দেখতে বললেন, কিন্তু তিনি কারো কথায় কান দিলেন না। বরং স্কুল বন্ধ করে দেবেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের নির্দেশ অমান্য করা হলে বিদ্যাসাগর তা সহ্য করবেন না। শেষপর্যন্ত নতুন মাস্টারমশাই বহাল করে বিদ্যাসাগর স্কুল চালাতে লাগলেন।[৩৮]

জয়কৃষ্ণ সেন মেট্রোপলিটনের ছাত্র। সন্দেহ করে তার নামে কী একটা অপ্রিয় মন্তব্য করেছেন ব্রজনাথ দে। ব্রজনাথ দে তখন সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট।

মন্তব্য শুনে জয়কৃষ্ণ খুব রাগ করল, দারোয়ানের ঘর থেকে একখণ্ড জ্বলন্ত পোড়াকাঠ নিয়ে ব্রজনাথকে তাড়া করে গেল, বলতে লাগল—আজ ষাঁড়দাগা করে ছাড়ব।

ব্রজনাথ দৌড়ে পালালেন।

উপর থেকে বিদ্যাসাগর ডাকলেন জয়কৃষ্ণকে। সব শুনলেন। তারপর ব্রজনাথকে ডেকে বললেন—ব্রজ, ছেলেদের উপর সন্দেহ করে কোনো কথা বলো না।[৩৯]

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন :

"So long as the people of Bengal continue to cultivate learning through the medium of their ancient classical language or through the medium of their own vernacular or through the medium of the language of the great country with which the interests of their own are inseparably blended, the name of Pandit Iswar Chandra Vidyasagar will be remembered with gratitude from the substantial help rendered, and the great impetus given to study."[৪০]

সুরেশচন্দ্র আর যতীশচন্দ্র দু-ভাই। বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র। বিদ্যাসাগর ওদের মেট্রোপলিটনে ভর্তি করেননি। সেকথা শুনে বঙ্কিমচন্দ্র একদিন জিজ্ঞাসু হয়েছেন—কেন? তাঁর নিজের স্কুল কলেজ রয়েছে, নাতিদের স্কুলে পড়ান না? এর মানে কি?

সুরেশচন্দ্রের বন্ধু জ্ঞানেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে বললেন—তিনি ওদের সংস্কৃত পড়িয়েছেন। তাঁর মত, আগে সংস্কৃত পড়ে, পরে ইংরেজি পড়লে শীঘ্র শেখা যায়। ওরা বাড়িতে পড়ে। তিনি বলেন, ভালো করে পড়াশুনা করে ওরা বাঙলা লিখবে। তিনি নিজে সময় পাননি, যা সাধ ছিল, লিখতে পারেননি। ওদের দিয়ে লেখাবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—তবে ভালো।[৪১]

ভোলানাথ বসু নামে একটি ছেলে বিদ্যাসাগরের স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। হঠাৎ একদিন বিদ্যাসাগর এসে সেই ক্লাশে ঢুকলেন। ভোলানাথকে

বললেন—তোমার মতো ছাত্রকে আমার স্কুলে রাখতে পারব না। তুমি চলে যাও।

ভোলানাথকে চলে যেতে হল। কিন্তু ভোলানাথের অপরাধ কি?

একটু আড়ালে গিয়ে বিদ্যাসাগর মাস্টারমশায়দের বললেন—ভোলা ঠাকুর-বাড়িতে 'বিদ্যাসুন্দর' থিয়েটারে বিদ্যা সেজেছিল, 'রত্নাবলী'তেও ও সখী সাজে।[৪২]

আশ্চর্য স্বভাব বিদ্যাসাগরের, আগে কোনো খবর-টবর না দিয়ে হঠাৎ চলে আসেন মেট্রোপলিটনে। হয়তো একটা ক্লাশে এসে ঢুকে পড়লেন, আস্তে-আস্তে মাস্টারমশায়ের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন; হয়তো মাস্টারমশাই বিদ্যা-সাগরকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বিদ্যাসাগর তাঁকে বলতেন—তুমি পড়াতে-পড়াতে উঠো না। তোমার কাজ তুমি করে যাও। আমাকে খাতির করতে গিয়ে যেন তোমার কাজে ত্রুটি না হয়।

পরীক্ষার ফল যেন ভালো হয়। পরীক্ষার ফল যদি ভালো না হয় তো সব পণ্ড।

সেবার কলেজ থেকে বত্রিশটি ছাত্র বি. এ. পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। ক্ষুদিরাম বসু সেসময়ে মেট্রোপলিটনে পড়ান। বিদ্যাসাগর একদিন ক্ষুদিরামকে বললেন—দ্যাখো, পরীক্ষার ফল যদি ভালো না দাঁড়ায়, তাহলে সার্কুলার রোড ধরে বাগবাজার হয়ে ষ্ট্রাণ্ড রোড দিয়ে সেই যে কার্মাটাড়ে চলে যাব, কলকাতায় আর মুখ দেখাব না।

পরীক্ষার ফল অবশ্যি খারাপ হয়নি।

ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের বন্ধু। তাঁর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ বি. এ. পাশ করে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে বিলাত চলে গেলেন। সুরেন্দ্রনাথ বিলাতে গিয়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন, এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের খুবই উৎসাহ ছিল।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন সুরেন্দ্রনাথ। দেশে ফিরে এসে সিলেটের অ্যাসিষ্টান্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হলেন। বেশিদিন সুরেন্দ্রনাথকে সরকারী চাকরি করতে হল না, কী একটা কারণে সুরেন্দ্রনাথকে গভর্নমেণ্ট বরখাস্ত করে দিল।

আবার বিলাত গেলেন সুরেন্দ্রনাথ।

বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন: "১৮৭৫ ইংরেজীর মাঝামাঝি সুরেন্দ্রনাথ বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন। পদচ্যুত হইয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের রায়ের বিরুদ্ধে ভারত-সচিবের নিকটে আপীল করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ ঐবার বিলাত গিয়াছিলেন। কেবল তাঁহার এই আপীল অগ্রাহ্য হইল তাহা নহে, তিনি যে ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিবেন আশা করিয়াছিলেন, সে পক্ষেও বাধা পাইলেন। তাঁহার পদচ্যুতি নিবন্ধন কর্ত্তারা তাঁহাকে ব্যারিষ্টারের সনন্দ দিতে আপত্তি করিলেন। গভীর নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার জীবিকা অর্জ্জনের সকল পথই একরূপ বন্ধ হইয়া গেল। ইংরেজ আমলাতন্ত্র তাঁহাকে দাগিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল বলিয়া তাঁহার পক্ষে কোন বড় বে-সরকারী কর্ম্ম পাওয়াও অসম্ভব হয়। সেকালে আমাদের সমাজে ইংরেজ রাজপুরুষদিগের এমনই প্রভাব ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি সুরেন্দ্রনাথকে তাঁহার মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনে ইংরেজীর অধ্যাপক পদে নিযুক্ত না করিতেন, তাহা হইলে সুরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ জীবন

কি হইত তাহা বলা যায় না।"[৪৩]

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মেট্রোপলিটন কলেজে দু-ঘণ্টা করে সাহিত্য পড়াতেন। সেজন্য মাসে দুশো টাকা পেতেন তিনি। প্রত্যেকদিন ঠিক সময়ে গাড়ি করে আসতেন, ছুটে লাইব্রেরিতে যেতেন, ওয়েবস্টারের ডিকশনারিখানা সঙ্গে নিয়ে ছুটে ক্লাশে যেতেন।

আনন্দমোহন বসু সিটি কলেজ খুললেন।* আনন্দমোহনের সঙ্গে কথা হল, সুরেন্দ্রনাথ সিটি কলেজেও একঘণ্টা করে পড়াবেন, সেজন্য মাইনে পাবেন একশো টাকা।

বিদ্যাসাগরের কানে গেল একথা। তিনি মেট্রোপলিটন কলেজের প্রিন্সিপালকে ডেকে বললেন—সুরেনকে বলো, সিটি কলেজে সে পড়াতে পারবে না। আমি তাকে তিনশো টাকা করে দেব। আর তা যদি না হয় তো আমার এখানে কাল থেকেই আসা বন্ধ করতে বলো।

সুরেন্দ্রনাথকে যখন সব কথা জানানো হল, তিনি বললেন—তিনি একথা বললেন, তাই তো—কিন্তু আনন্দমোহনের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব আছে—তাকে কথা দিইছি—তাই তো—

মেট্রোপলিটন ছেড়ে চলে গেলেন সুরেন্দ্রনাথ। ছাত্রদের খুব প্রিয় ছিলেন তিনি। ছাত্রেরা তাই মনমরা হয়ে রইল।

বিদ্যাসাগর বললেন—এই কলেজে সুরেন্দ্র কতটুকু represent করে? সে যা পড়াত তাতে হিসেব করে দেখলে, যে কটা পেপার হয় এগজামিনের জন্য তাতে সে মাত্র ওয়ান-টেনথ represent করে। তা এতে করে যদি সুরেন্দ্র না হলে কলেজ না চলে, তাহলে বলতে হবে আমি কেউ নই, আমি তাহলে মরে গেছি! ছেলেদের বলে দাও সুরেন না থাকলে যারা এ-কলেজে থাকতে না চায় আমি তাদের সকলকে সার্টিফিকেট দেব।

নিজের উপর অগাধ বিশ্বাস বিদ্যাসাগরের।

তারপর সুরেন্দ্রনাথ একটা কলেজ খুললেন। রিপণ কলেজ। রিপণ সাহেব তখন বড়লাট।

দেখে-শুনে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন—সুরেনকে জিজ্ঞেস করো, আনন্দমোহনের প্রতি সেন্টিমেণ্ট এখন কোথায় গেল?[৪৪]

কলেজের একটি ছাত্র ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়েছে। ফলে বাবা তার কলেজের মাইনে-টাইনে বন্ধ করে দিলেন।

ছাত্রটি এল বিদ্যাসাগরের কাছে। সব কথা খুলে বলল।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কোন কলেজে পড়ো?

—আমি আপনারই মেট্রোপলিটান কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি।

বিদ্যাসাগর বললেন—বাপু, আমি তো ব্রাহ্ম নই, আর ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আমার কোনো যোগই নেই। যা হোক, তুমি ভালো বুঝে যে ধর্ম্ম ধরেছ তার উপর আমার কিছুই বলবার নেই।

ছাত্রটিকে বিদ্যাসাগর প্রত্যেক মাসে দশটাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। মাসে-মাসে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে ওই টাকা নিয়ে আসত ছাত্রটি।[৪৫]

---

* চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু, শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস, শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণের উদ্যোগে ও পরিশ্রমে সিটি কালেজের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে।" (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৩৮৩)

অত্যন্ত আশ্চর্য পথে কিছুদিনের জন্য একটি মান্দ্রাজী ছেলে এসেছিল মেট্রোপলিটনে।

হ্যাঁ, একটি মান্দ্রাজী ছেলে। মা-বাপ নেই। ছেলেটির লেখাপড়া শেখার খুব ইচ্ছা। লেখাপড়া শিখতে টাকা লাগে। টাকা কই? যথাসর্বস্ব বেচে কিছু টাকা যোগাড় হল। কিন্তু, যা যোগাড় হল, তাতে লেখাপড়া হয় না।

সাহায্যের জন্য নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াল সে। কার পরামর্শে কে জানে, শেষপর্যন্ত চলে গেল সিংহলে। অনেক কষ্টে যে-টাকা যোগাড় করেছিল, দু-একদিনেই তা ফুরিয়ে গেল।

খাওয়া জোটে না। চোখে ঘুম নেই। সিংহলের পথে-পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল ছেলেটি। এখানে সে কাউকে চেনে না, এ-রাজ্যের সে কিছুই জানে না। অচেনা-অজানা জায়গায় কাউকে সে কিছু জিজ্ঞেস করতে ভরসা পায় না।

সিংহলের রাস্তায় একদিন জুড়িগাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছিলেন একজন মান্যগণ্য ভদ্রলোক। কী মনে হল কে জানে, ছেলেটি তাঁকে নমস্কার করল। ভদ্রলোকের দয়া হল। ছেলেটির সব কথা তিনি মন দিয়ে শুনলেন। ভদ্রলোক ওকে নিজের জুড়িগাড়িতে তুলে নিলেন, নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

দুনিয়ায় এমন কি কেউ নেই যে এই ছেলেটির ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে? ওর লেখাপড়া শেখার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারে?

সেই ভদ্রলোক বললেন—তুমি যেমন মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছ, তেমনি মানুষ এদেশে কোথাও নেই। শুনেছি, কলকাতায় বিদ্যাসাগর নামে একজন মহৎ মানুষ আছেন। যদি তুমি তাঁর কাছে গিয়ে চাইতে পারো, হয়তো যা চাও তাই পাবে।

ভদ্রলোক ছেলেটিকে কিছু টাকা-পয়সা দিলেন।

বহুকষ্টে ভারতবর্ষে এল ছেলেটি। চলল কলকাতার দিকে। পথে শুনল, বিদ্যাসাগর তখন কাশীতে। তাহলে আর কলকাতায় গিয়ে লাভ কি, কাশীর দিকে চলল ছেলেটি। কিন্তু কাশীতে পেঁছে, হা ঈশ্বর, শুনল, বিদ্যাসাগর কাশী ছেড়ে চলে গেছেন। কার্মাটাড়ে গেছেন।

সিংহলী ভদ্রলোক যা টাকাকড়ি দিয়েছিলেন, এতদিনে তা শেষ হয়ে গেছে। দু-তিনদিন কাশীতেই কাটাল ছেলেটি। অন্নছত্রে খেল, ঘুমোলো নদীর পাড়ে। তারপর কার্মাটাড়ের দিকে হাঁটাপথ ধরল।

একদিন দুপুরে ছেলেটি কার্মাটাড়ে এসে পেঁছল। বিদ্যাসাগরের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। যাক, এতদিনে তবু আসা গেছে।

বাড়ির চারদিকে বেড়া। একটিমাত্র দরজা। কেন কে জানে, বাড়ির চাকর তখন কাউকে দরজা পার হয়ে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না।

রোদের মধ্যে সর্বস্বান্তের মতো দাঁড়িয়ে রইল ছেলেটি। জানালার দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

হঠাৎ দেখতে পেল, হাতের ইশারায় ঘরের ভেতর থেকে কে যেন ডাকছেন। ডাক যখন পাওয়া গেছে তখন আর কথা কি, ছেলেটি দরজা পার হয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল। দরজায় কেউ বারণ করল না।

যিনি ডেকেছিলেন, তিনিই বসতে বললেন। জিজ্ঞেস করলেন—রোদের মধ্যে তুমি এমন করে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন? তোমার কি খাওয়া হয়েছে?

হ্যাঁ, বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর ছাড়া এমনভাবে আর কে ডাকবেন, এমন করে আর কে কথা বলবেন!

কত দেশ-দেশান্তর ছেলেটি ঘুরে এসেছে, কই, এমন করে কেউ তো তাকে কিছু বলেনি। দু-চোখ তার জলে ভরে উঠল। বিদ্যাসাগরের প্রশ্নের জবাব সে মুখের কথায় দিল না, চোখের জলে দিল।

সেই মুহূর্তে ছেলেটির স্নানাহারের ব্যবস্থা হল। তারপর ছেলেটির মুখে তার আদ্যন্ত ইতিহাস শুনলেন বিদ্যাসাগর।

নিজের সঙ্গে কলকাতায় নিয়ে এলেন ছেলেটিকে। ভর্তি করে দিলেন মেট্রোপলিটনে।

কিন্তু বাঙলাদেশের জল-হাওয়া ছেলেটির সহ্য হল না।

তাই কিছুদিন পর মান্দ্রাজের ছেলেকে মান্দ্রাজে পাঠিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর। দরকারী জিনিসপত্র ওর সঙ্গে দিয়ে দিলেন। ব্যবস্থা হয়ে গেল, বিদ্যাসাগর মাসে-মাসে ওকে পনেরো টাকা পাঠাবেন। ও মান্দ্রাজে গিয়ে পড়াশোনা করুক।

চোখের জল মুছতে-মুছতে ছেলেটি মান্দ্রাজের গাড়িতে উঠল।[৪৬]

জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত মেট্রোপলিটন বিদ্যাসাগরের ধ্যানজ্ঞান ছিল। মৃত্যুর কিছুকাল আগে বিদ্যাসাগর বলেছেন—এখন জীবনের শেষ হওয়াই ভালো। তবে কলেজের একটা ব্যবস্থা করে যেতে পারলাম না, এই যা দুঃখ। আর একটি মর্মান্তিক দুঃখ এই, যাঁরা আমার বিদ্যালয়ের জন্য জীবনাতিপাত করেছে, তাঁদের বৃত্তির কোনো ব্যবস্থা করে যেতে পারলাম না।[৪৭]

সতেরো

মাইকেল মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৮৬০ সালের মে-মাসে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে সেই প্রথম বাঙলা ভাষায় কাব্য লেখা হল।

গোড়ার দিকে বিদ্যাসাগর মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ পছন্দ করেননি। ঠাট্টা করে বলেছেন :

তিলোত্তমা বলে ওহে শুন দেবরাজ,
তোমার সঙ্গেতে আমি কোথায় যাইব।[১]

কিন্তু কিছুদিন পরেই বিদ্যাসাগরের মত বদলে গেল। মাইকেল যা লিখেছেন তার মধ্যে 'Great merit' দেখতে পেলেন বিদ্যাসাগর। মাইকেল একখানা চিঠিতে তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে জানিয়েছেন : "The renowned Vidyasagar has at last condescended to see "Great merit" in it. . ."

দু-বছরের মধ্যেই দেখা গেল মাইকেলের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বন্ধুত্ব নিবিড় হয়ে উঠেছে। ১৮৬২ সালের গোড়ার দিকে মাইকেল একখানা চিঠিতে রাজনারায়ণকে লিখেছেন : "The great Vidyasagar is almost a convert to the new poetical creed and is beginning to treat the 'apostle' who has propagated it with great attention, kindness, and almost affection!"

মাইকেলের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' বেরিয়েছে ১৮৬২ সালে। 'বীরাঙ্গানা কাব্য' মাইকেল উৎসর্গ করেছেন বিদ্যাসাগরকে। উৎসর্গপত্রে মাইকেল লিখেছেন : "বঙ্গকুলচূড় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের চিরস্মরণীয় নাম এই অভিনব কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে স্থাপিত করিয়া, কাব্যকার ইহা উক্ত মহানুভবের নিকট যথোচিত সম্মানের সহিত উৎসর্গ করিল। ইতি। ১২৬৮ সাল। ১৬ই ফাল্গুন।"

ঠিক হল মাইকেল মধুসূদন বিলাত যাবেন, ব্যারিষ্টারি পড়বেন। সে-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে উৎসাহ পাওয়া গেল। শুধু মুখের কথায় উৎসাহ দেননি বিদ্যাসাগর, কাজেও মাইকেলকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন।

মহাদেব চাটুয্যের স্ত্রী মোক্ষদা দেবীকে মাইকেল পত্তনি দিয়ে দিলেন সুন্দরবন অঞ্চলের চক মুনকিয়া আর গদারডাঙা। চুক্তি হয়ে রইল, মাইকেলের প্রাপ্য টাকা মোক্ষদা দেবী চার কিস্তিতে মাইকেলকে ইউরোপে পাঠাবেন; আর মোক্ষদা দেবী মাসে-মাসে কলকাতায় দেড়শোটাকা দেবেন মাইকেলের স্ত্রী হেনরিএটাকে। মাইকেলের মেয়ে শর্মিষ্ঠা আর ছেলে মিল্টন দত্ত মায়ের সঙ্গে কলকাতায় থাকবে।

মাইকেল যাতে চুক্তিমতো টাকাকড়ি পান, তা দেখাশোনা করার দায়িত্ব নিলেন দিগম্বর মিত্র আর বৈদ্যনাথ মিত্র।

তারপর ১৮৬২ সালের ৯-জুন মাইকেল মধুসূদন 'ক্যাণ্ডিয়া' নামে একটা জাহাজে উঠে ইউরোপের দিকে পাড়ি দিলেন। জুলাই মাসের শেষাশেষি

বিলাতে পৌঁছলেন। ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য ঢুকে পড়লেন গ্রেজ্ ইন্-এ। কিছুদিন নির্ভাবনায় কেটে গেল।

তারপর আরম্ভ হল দুর্দশা।

যাঁদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, কিছুকাল পরে তাঁদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা আসা বন্ধ হয়ে গেল। এমন কি, কলকাতায় হেন্‌রিএটাকেও তাঁরা টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। বহুকষ্টে কিছু টাকা-পয়সা যোগাড় করে হেন্‌রিএটা ১৮৬৩ সালের মে-মাসে ছেলেমেয়ে নিয়ে মাইকেলের কাছে চলে এলেন। সুদূর বিদেশে টাকার অভাবে মাইকেল বিপদে পড়ে গেলেন।

পর-পর কয়েকখানা চিঠি লিখলেন দিগম্বর মিত্রকে। কিন্তু কোনো ফল হল না। আর বৈদ্যনাথ মিত্র? তাঁর বিষয়ে কিছু না বলাই ভালো।

১৮৬৩ সালের মাঝামাঝি মাইকেল বিলাত থেকে ফরাসী দেশে চলে এলেন। প্যারিসে। ভের্সাইয়ে।

বছরখানেক হল দেশ থেকে একটি কানাকড়িও আসেনি। মাইকেলের অতএব চূড়ান্ত দুর্দশা। জিনিসপত্র বন্ধক দিতে হল। ধার-দেনা করতে হল। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াল যে মাইকেলের প্রায় জেলে যাবার দশা।

তখন মাইকেলের বিদ্যাসাগরের কথা মনে হল। মাইকেল বিদ্যাসাগরের শরণ নিলেন। পর-পর দু-খানা চিঠি লিখলেন। প্রথম চিঠির তারিখ ১৮৬৪ সালের ২-জুন; দ্বিতীয় চিঠির তারিখ ১৮৬৪ সালের ৯-জুন।

প্রথম চিঠিখানার প্রথম দুটি বাক্য উদ্ধার করি :

"My dear Sir, If you had been an ordinary man, I should begin this letter with a well-worded apology for not having written to you so long. But you know well that we never fly to a man in the hour of distress unless we regard that man as the truest and sincerest of our well-wishers and friends."

সমস্ত চিঠিখানা জুড়ে অতঃপর দুর্দশার বিস্তারিত বর্ণনা। পরিশেষে সাহায্যের প্রার্থনা।

দু-খানা চিঠি লিখেও মাইকেল নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। কে জানে, যদি একখানা চিঠিও বিদ্যাসাগরের হাতে না পড়ে। তাই ১৮৬৪ সালের ১৮-জুন বিদ্যাসাগরকে আরো একখানা চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন কলকাতা পুলিশ আপিসের প্রাণকৃষ্ণ ঘোষের মারফৎ।

মাইকেলের তখন দারুণ দুর্দশা। স্ত্রীপুত্রকন্যা সমেত প্রায় উপোস করার অবস্থা। নিরুপায় হয়ে মাইকেল একজন পাদরীর কাছে ধার চাইলেন; পুওর-ফণ্ড থেকে পাদরী ধার দিলেন পঁচিশ ফ্রাঙ্ক (আমাদের সেকালের হিসেবে প্রায় ন-টাকা)।

দিন কয়েকের মধ্যে দিগম্বর মিত্রের কাছ থেকে আটশো টাকা এল। কিন্তু, মাইকেলের যা ধার-দেনা তখন, ওই আটশো টাকা তার কাছে কিছুই নয়।

২৮-আগস্ট, ১৮৬৪ সাল। রবিবার। সকালবেলা। মাইকেল পড়ার ঘরে বসেছিলেন। হেন্‌রিএটা এসে কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—ছেলেমেয়েরা মেলায় যেতে চাইছে। কিন্তু আমার কাছে মাত্র তিন ফ্রাঙ্ক আছে। দেশের লোকেরা আমাদের সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহার করছে কেন?

মাইকেল বললেন—আজই ডাক আসবার কথা। নিশ্চয়ই আজ সুখবর আসবে। কেননা, যাঁর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি তাঁর প্রতিভা আর জ্ঞান প্রাচীন

কালের ঋষির মতো, তাঁর শক্তি-সামর্থ্য ইংরেজের মতো, তাঁর প্রাণ বাঙালী মায়ের মতো।

মাইকেল ভুল বলেননি। একঘণ্টা বাদেই বিদ্যাসাগরের চিঠি এল। দেড়-হাজার টাকা এল। বিদ্যাসাগর পাঠিয়েছেন। মাইকেলের চিঠি পেয়েই বিদ্যাসাগর, ১৮৬৪ সালের ২-আগস্ট, মাইকেলকে দেড় হাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। সুদূর বিদেশে মাইকেলের দারুণ দুর্দিনে বিদ্যাসাগরই তাঁকে বাঁচিয়েছেন।

নিজের দায়িত্বে বিদ্যাসাগর অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ধার নিলেন তিন হাজার টাকা; আর শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা। ধার করে টাকা পাঠালেন মাইকেলকে।

বিদ্যাসাগরকে যত চিঠি লিখেছেন মাইকেল, সবই ইংরেজিতে। বাঙলায় লেখেননি, কেননা, মাইকেল নিজেই বলেছেন, তিনি বিদ্যাসাগরের মতো বাঙলা লিখতে পারেন না, অভ্যাসের অভাবে পারেন না।

প্যারিসের একটি দোকানে মাইকেল মধুসূদনের চোখে পড়ল বিদ্যাসাগরের বই। মাইকেল দোকানদারকে বললেন—এই লেখক আমার একজন মস্ত বন্ধু।

প্যারিসের দোকানে বিদ্যাসাগরের বই দেখতে পাওয়া অবশ্যই একটি দুর্লভ অভিজ্ঞতা। সমস্ত বৃত্তান্ত মাইকেল, ১৮৬৪ সালের ৩-নভেম্বর, একখানা চিঠিতে বিদ্যাসাগরকে জানিয়েছেন :

"I have seen one or two of your works in a shop in Paris. I told the shopkeeper, "This author is a great friend of mine." "Ah Sir" said he, "we thought he was dead." "God forbid" said I—"His country and friends cannot spare him." Fancy this on the banks of the famous Seine." [২]

১৮৬৪ সালের ১৮-ডিসেম্বর বিদ্যাসাগরকে লেখা মাইকেলের একখানা চিঠির মধ্যে বাঙলায় কয়েকটি লাইন আছে। বাঙলা অংশটুকু তুলে দিচ্ছি : "আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি যে, এ হতভাগার বিষয়ে হস্তনিক্ষেপ করিয়া আপনি এক বিষম বিপদজালে পড়িয়াছেন! কিন্তু কি করি? আমার এমন আর একটি বন্ধু নাই, যে তাহার শরণ লইয়া আপনাকে মুক্ত করি। আপনি এখন অভিমন্যুর মতন মহাব্যূহ ভেদ করিয়া কৌরবদলে প্রবেশ করিয়াছেন; আমার এমন শক্তি নাই যে আপনাকে সাহায্য প্রদান করি; অতএব আপনাকে স্ববলে শত্রুদলকে সংহার করিয়া বহির্গত হইতে হইবেক; এবং বাহিরে আসিয়া এ শরণাগত জনকে রক্ষা করিতে হইবেক! এ কথাটি যেন সর্ব্বদা স্মরণ-পথে থাকে!"[৩]

তারপর ১৮৬৫ সালের ১৮-মে বিদ্যাসাগরকে এজেন্ট নিযুক্ত করে ওকালতনামা পাঠালেন মাইকেল। মাইকেলের সম্পত্তি বন্ধক রেখে অনুকূল-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে বারো হাজার টাকা নিয়ে মাইকেলকে পাঠিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর।

১৮৬৫ সালের শেষভাগে মাইকেল আবার লণ্ডনে চলে এলেন। ১৮৬৬ সালের ১৭-নভেম্বর গ্রেজ্ ইন্ থেকে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় পাশ করলেন। পরীক্ষার পর আবার চলে এলেন ফরাসীদেশে। হেন্‌রিএটা আর ছেলেমেয়েদের ফরাসীদেশে রেখে ১৮৬৭ সালের ফেব্রুআরি মাসের গোড়ার দিকে কলকাতায় ফিরে এলেন মাইকেল।

মাইকেলের জন্য বিদ্যাসাগর সুকিয়া স্ট্রীটে একখানা বাড়ি সাহেবি কায়দায়

সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু মাইকেল সে-বাড়িতে উঠলেন না। উঠলেন গিয়ে স্পেনসেস হোটেলে। পুরোপাক্কা সাহেবি এলাকায়।

দিনকয়েক পরে রাস্তায় একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় বাসা নিলে?

মাইকেল হেসে বললেন—বামুনপাড়ায়, বামুনপাড়ায়।

—বামুনপাড়া কি হে?

—পাড়াগাঁয়ে যে-পাড়া সকল পাড়ার সেরা, সেই পাড়াকে বামুনপাড়া বলে। কলকাতার মধ্যে সাহেবপাড়াই শহরের মাথা। আমি সেখানেই আছি।

অনেকেই স্পেনসেস হোটেলে মাইকেলের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বিদ্যাসাগরও এলেন। বিদ্যাসাগরকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন মাইকেল, দু-হাতে গলা জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে মাইকেল বিদ্যাসাগরকে আলিঙ্গন করে নাচতে লাগলেন, বারংবার চুম্বন করলেন।

অনেক চেষ্টায় মাইকেলকে ক্ষান্ত করলেন বিদ্যাসাগর। চেয়ারে বসলেন। বললেন—এই হোটেলে অনেক খরচ। আপনার জন্য আমি একটা সুন্দর বাড়ি সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছি। আপনি সেখানে চলুন না, সুখে থাকবেন।

কিন্তু মাইকেল রাজি হলেন না। বললেন—এখানে বেশ আছি। এ নিয়ে আপনি আর ব্যস্ত হবেন না।

এ-বিষয়ে তখন আর কিছু বললেন না বিদ্যাসাগর। বিদায় নিলেন। আবার মাইকেল বিদ্যাসাগরকে আলিঙ্গন করে নৃত্য করলেন, চুম্বন করলেন।

পরেও বিদ্যাসাগর মাইকেলকে স্পেনসেস হোটেল থেকে সরিয়ে আনার জন্য বিস্তর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পারেননি।[৪]

কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করার অনুমতি প্রার্থনা করে মাইকেল, ১৮৬৭ সালের ২০ ফেব্রুআরি, প্রধান বিচারপতির কাছে আবেদন করলেন। প্রধান বিচারপতি মাইকেলের প্রতি অপ্রসন্ন নন, একাধিক বিচারপতি মাইকেলের প্রতি প্রসন্ন; কিন্তু জ্যাকসন ও ম্যাকফারসনের আপত্তিতে মাইকেল কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করার অনুমতি পেলেন না।

জ্যাকসন ও ম্যাকফারসন মাইকেলের চরিত্র বিষয়ে আপত্তি করেছেন। তাঁদের বিবেচনায় মাইকেলের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক নয়, আগে মাইকেলের চরিত্র সম্বন্ধে তদন্ত প্রয়োজন।

চরিত্র সম্বন্ধে কয়েকখানা উপযুক্ত সার্টিফিকেট যোগাড় করতে পারলে হয়তো আশা আছে।

বিদ্যাসাগর তখন কলকাতায় ছিলেন না। মাইকেল, ১৮৬৭ সালের ১১ এপ্রিল, বিদ্যাসাগরকে একখানা চিঠিতে লিখেছেন :

"I was detained a little at the station and reached home about 8½ P.M. This morning I called on the Punditjee who told me that my only chance was to get as many certificates as I could from the most known members of the native community. . . . Sumbhonauth says that our enemies seem to have won the ears of the Judges and that the antidote must be as strong as the poison. He wants you to come to Calcutta; I scarcely know what to say myself. I am sure I have given you too much troubles already. We must go up with our

papers early next week, for no time is to be lost. If you can't come, you had better send me a testimonial by return of post. . . ."[৫]

মাইকেল একাধিক প্রশংসাপত্র যোগাড় করেছেন। ১৮৬৭ সালের ২০-এপ্রিল বিদ্যাসাগর, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী একসঙ্গে মাইকেলকে একখানা প্রশংসাপত্র দিয়েছেন :

"MR. MICHAEL M. DATTA, Barrister at Law, is born of a very respectable and well-connected family. His father, the late Baboo Rajnarain Datta, was a distinguished Pleader of the late Sudder Court. Mr. Datta is a man of splendid talents and varied and extensive literary attainments, of which he has made an ample display in several of his Poems and Dramas in Bengali. These works have at once made his name dear and respected to his countrymen, and have secured him an enviable reputation as an author. His knowledge of the English Language and Literature is such as would do credit to an educated Englishman. He is, besides, well-acquainted with Sanskrit, Persian, Greek, Latin, French, German, and Italian. He is well known to be an honest, sincere, generous and high-minded gentleman. On the whole, he is, in our humble opinion, an ornament to his country. We shall be exceedingly delighted to see him admitted to the Bar of the Calcutta High Court."*

১৮৬৭ সালের ৩-মে জজেরা একমত হয়ে মাইকেলকে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করার অনুমতি দিলেন।

ব্যারিষ্টারি আরম্ভ করলেন মাইকেল। আস্তে-আস্তে বেশ টাকাকড়ি আয় করতে লাগলেন। আয় যা করেন, ব্যয় তার চেয়ে ঢের বেশি করেন। একা মানুষ, কিন্তু স্পেন্সেস হোটেলে তিনখানা বড়ো-বড়ো ঘর ভাড়া নিয়েছেন। ঢালাও হাতে খরচ করেন, বন্ধু-বান্ধবেরা ঘন-ঘন খাওয়া-দাওয়া করেন। মাসে হাজার টাকার কমে চলে না। তাছাড়া হেন্‌রিএটা আর ছেলেমেয়ের জন্যে মাসে-মাসে তিন-চারশ টাকা পাঠাতে হয় ইউরোপে। আগের ঋণ শোধ হওয়া তো দূরের কথা, নতুন করে ঋণ নিয়ে খরচ চালাতে হচ্ছে।

বিদ্যাসাগরের কাছে আবার সাহায্য চাইলেন মাইকেল।

আগেই বলা হয়েছে, মাইকেলের ঘোর দুর্দশার সময় অন্যের কাছ থেকে টাকা ধার করে বিদ্যাসাগর মাইকেলকে পাঠিয়েছিলেন। যাঁদের কাছ থেকে ধার নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দু-জন—শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন আর অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—টাকার জন্যে বারংবার তাগাদা দিতে লাগলেন বিদ্যাসাগরকে।

---

* মূল প্রশংসাপত্রখানা বর্তমান ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রক্ষিত আছে। এই প্রশংসাপত্রখানি সম্পর্কে ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন : "কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী মহোদয়ের সৌজন্যে এই পত্রখানি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। লেখাটি যে বিদ্যাসাগরের সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছি।" (রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত : মাইকেল ও বিদ্যাসাগর, 'দেশ', ২৮-জানুআরি, ১৯৫৬, পৃ. ৯৬৬-৬৭।)

বিদ্যাসাগর তখন অসুস্থ। উত্ত্যক্ত হয়ে তিনি মাইকেলকে একখানা চিঠি লিখলেন বর্ধমান থেকে। চিঠিখানা তুলে দিচ্ছি :

"সাদর সম্ভাষণমাবেদনম্—অদ্য সাত দিন হইল বর্দ্ধমানে আসিয়াছি, এ পর্য্যন্ত তাদৃশ উপকার বোধ হয় নাই। আসিবার পূর্ব্বে আপনাকে কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই, এজন্য লিপি দ্বারা জানাইতেছি। অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, আমি যাহা বলি, কোন ক্রমে তাহার অন্যথা ভাব ঘটে না, সুতরাং তাঁহারা অসন্দিগ্ধচিত্তে আমার বাক্যে নির্ভর করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। লোকের এরূপ বিশ্বাসভাজন হওয়া যে প্রার্থনীয় তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি অবিলম্বে সেই বিশ্বাসে বঞ্চিত হইব, তাহার পূর্ব্বলক্ষণ ঘটিয়াছে।

যৎকালে আমি অনুকূল বাবুর নিকট টাকা লই, অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, আপনি প্রত্যাগমন করিলেই পরিশোধ করিব; তৎপরে পুনরায় যখন আপনার টাকার প্রয়োজন হইল, তখন যথাকালে টাকা না পাইলে পাছে আপনার ক্ষতি বা অসুবিধা হয়, এই আশঙ্কায় অন্য কোন উপায় না দেখিয়া শ্রীশচন্দ্রের নিকট কোম্পানির কাগজ ধার করিয়া টাকা পাঠাইয়া দি। তাঁহার ধার ত্বরায় পরিশোধ করিব এই অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু উভয় স্থলেই আমি অঙ্গীকারভ্রষ্ট হইয়াছি এবং শ্রীশচন্দ্র ও অনুকূল বাবু সত্বর টাকা না পাইলে বিলক্ষণ অপদস্থ ও অপমানগ্রস্ত হইব, তাহার কোন সংশয় নাই।

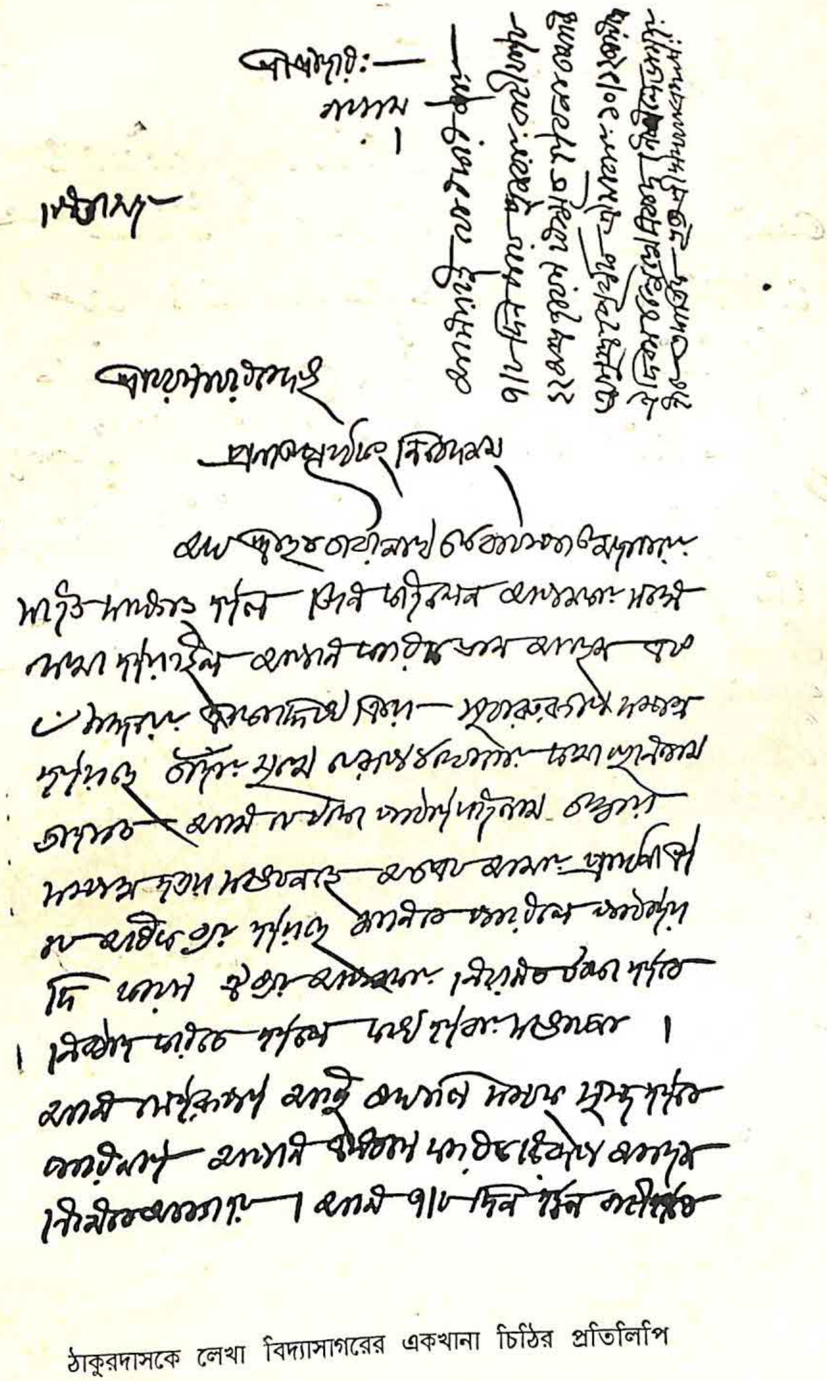
এক্ষণে কিরূপে আমার মান রক্ষা হইবেক, এই দুর্ভাবনায় সর্ব্বক্ষণ আমার অন্তঃকরণকে আকুল করিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে এত প্রবল হইতেছে যে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। অতএব আপনার নিকট বিনয় বাক্যে প্রার্থনা এই, সবিশেষ যত্ন ও মনোযোগ করিয়া ত্বরায় আমায় পরিত্রাণ করেন। পীড়া শান্তি ও স্বাস্থ্য লাভের নিমিত্ত পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া এবং অন্ততঃ ছয় মাস কাল তথায় থাকা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। আশ্বিনের প্রথম ভাগে যাইব স্থির করিয়াছি। কিন্তু আপনি নিস্তার না করিলে কোন মতেই যাইতে পারিব না। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া যাহা বিহিত বোধ হয় করিবেন, অধিক আর কি লিখিব, আমি নিজে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া কার্য্য শেষ করিয়া লইব, আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে সে প্রত্যাশা করিবেন না। অনেক লিখিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ পারিলাম না। কিমধিকমিতি—

ভবদীয়স্য—
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ"[৬]

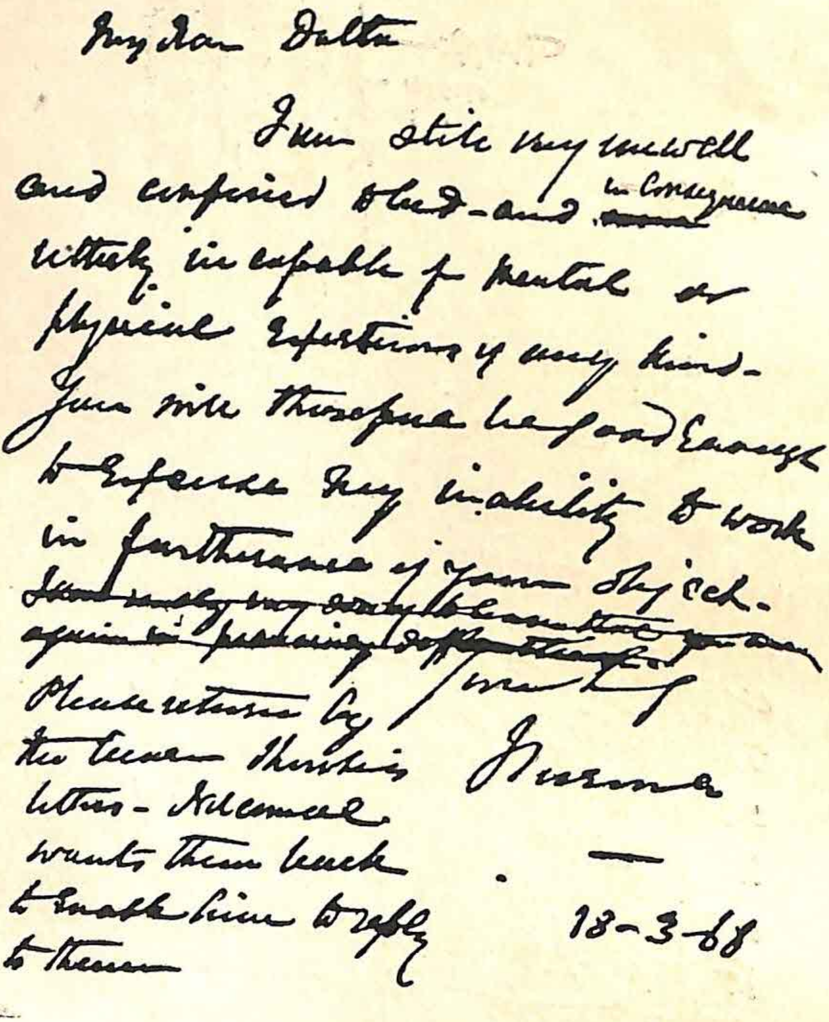
এই চিঠি পেয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন মাইকেল। সেই মুহূর্তে একখানা চিঠি লিখলেন বিদ্যাসাগরকে। মাইকেলের সেই চিঠিখানা থেকে একটুখানি তুলে দিচ্ছি :

"Your letter which reached me a few minutes ago, has given me great pain. You know that there is scarcely anything in this world that I would hesitate to do for you, of course you have my full permission to adopt any steps you think proper to relieve yourself of the unpleasant burden." [৭]

মাইকেলের অভাবের অন্ত হল না। আবার, আবার টাকার অভাব। ১৮৬৮ সালের ১৮-মার্চ বিদ্যাসাগর একখানা চিঠি লিখেছেন মাইকেলকে। স্পষ্ট



ঠাকুরদাসকে লেখা বিদ্যাসাগরের একখানা চিঠির প্রতিলিপি



My dear Dutta

I am still very unwell and confined to bed — and in consequence utterly incapable of mental or physical exertions of any kind. You will therefore be good enough to excuse my inability to work in furtherance of your object.

~~[illegible]~~

Yours truly

Isvara

Please return by the bearer Thackeray's letters — Nilcomal wants them back to enable him to reply to them

18-3-68

মাইকেল মধুসূদনকে লেখা বিদ্যাসাগরের একখানা চিঠির প্রতিলিপি

দেখা যাচ্ছে, চিঠিতে একটি লাইন— I am really very sorry to know that you are again in pecuniary difficulty— লিখেও বিদ্যাসাগর শেষপর্যন্ত কেটে দিয়েছেন।[৮] একবার লিখে আবার কেটেছেন কেন? হয়তো ভেবেছেন, দু-হাতে খরচ করার ফলে যাঁর অর্থাভাব হয় তাঁর অর্থকষ্টে দুঃখিত হবার কোনো অর্থ নেই; তাঁর অর্থকষ্টে দুঃখিত হবার কথা লিখলে সত্যকথা লেখা হয় না।

মাইকেল, সম্ভবত ১৮৬৮ সালের গোড়ার দিকে, একখানা চিঠিতে বিদ্যাসাগরকে লিখেছেন :

"You and I, my good vid.—have often done desperate things and looked to the chapter of accidents to neutralise the effect of our benevolent folly. What has been the result? You are the greatest Bengali that ever lived and people speak of you with glowing hearts and tearful eyes; and even my worst enemies dare not say that I am a bad fellow!. . ."*

বিদ্যাসাগরের মতো বন্ধু যে পরম মূল্যবান, এ-সত্য মাইকেল মুহূর্তের জন্যও ভোলেননি। বিদ্যাসাগরের বন্ধুত্ব চলে গেলে তো দুর্ভাগ্যের চূড়ান্ত। অন্তত মাইকেল সেইরকম কথাই বলেছেন। ১৮৬৮ সালের ১৭-অক্টোবর মাইকেল একখানা চিঠিতে বিদ্যাসাগরকে লিখেছেন : "If you have ceased to be my friend, the sooner I hear of the calamity the better."

অভাব, অভাব, মাইকেলের নিদারুণ অভাব। অভাবের কোনো ইতি-অন্ত নেই। দু-হাতে ঋণ করেছেন। চতুর্দিকে ঋণ। পাওনাদারদের ভয়ে অনেক সময় বাড়ির বাইরে বেরোনোর উপায় থাকে না।

অভাব মাইকেলের স্বভাবে।

একখানা ঠিকাগাড়িতে করে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে এসেছেন মাইকেল। কোচম্যানকে দিলেন—আধুলি নয়, টাকা নয়, আস্ত একটি মোহর। কোচম্যানকে এত বেশি দেবার কোনো মানে হয়? এমন অপব্যয় আর যাতে না করে সেজন্য বিদ্যাসাগর দু-চার কথা বললেন মাইকেলকে।

মাইকেল বললেন—বিদ্যাসাগর, আজ দুদিন যাবৎ এই কোচম্যান আমাকে নানা জায়গায় নিয়ে গিয়েছে। ওকে বেশি আর কী দিলাম![৯]

অনেক সময় বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে টাকা এনেছেন মাইকেল, কিন্তু সে-টাকায় সংসারের কোনো সুরাহা করেননি, সব টাকা আমোদ-আহ্লাদে উড়িয়ে দিয়েছেন।

ব্যারিষ্টারি ছেড়ে মাইকেল চাকরি করলেন কিছুকাল। অভাব কিছুতেই দূর হল না। এদিকে শরীর ভেঙে গিয়েছে। চাকরি ছেড়ে ১৮৭২ সালের

---

* ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন : "পত্রের এই অংশটিতে আত্মসম্ভ্রমতার এক মহৎ প্রকাশ। যাঁহাকে তিনি (মাইকেল) বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলিয়া অভিহিত করিলেন তিনি তাঁহারই ন্যায় আরেকজন ভাগ্য-তাড়িত সজ্জন একথা বলিতে তাঁহার সংকোচ নাই। আমরা দুজনেই 'desperate' এবং দুজনেই 'benevolent', দেশের হৃদয়ে তোমার আসন, কিন্তু আমিও বড় অল্প মানুষ নই। এক বিশিষ্ট আত্মপ্রত্যয় এখানে বিনয়ের ভাষায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।" (ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত : মাইকেল ও বিদ্যাসাগর, 'দেশ', ২৮-জানুআরি ১৯৫৬, পৃ. ৯৬৭)।

সেপ্টেম্বরে আবার ব্যারিষ্টারি আরম্ভ করলেন। কিন্তু তখন তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছে, নানা রকম অসুখ শরীরে। বিপুল ঋণ।

এখানে বিদ্যাসাগরকে লেখা মাইকেলের ক্লার্ক কৈলাসচন্দ্র বসুর একখানা চিঠি তুলে দিচ্ছি :

"ঈশ্বরঃ
শরণম্।

পিতঃ!

পঞ্চকোটের মহারাজার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বাধ্য হইয়া, অদ্য রাত্রিতেই আমাকে পুরুলিয়া যাত্রা করিতে হইল। সুতরাং মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অক্ষম হইলাম। ভরসা করি, আগামী সোমবার পুনরায় শ্রীচরণ সন্নিধানে উপস্থিত হইতে পারিব।

দত্তজ মহাশয়ের ঋণদাতৃগণের নামসংবলিত ঋণের 'তালিকা' এই সঙ্গে পাঠাইলাম। মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে বিনীত ভাবে আমি এই প্রার্থনা করি যে, যেরূপে পারেন, বিপন্ন দত্তজাকে এবারে রক্ষা করিয়া স্বীয় অপার করুণার আরও সুপরিচয় প্রদান করিবেন। ফলতঃ মহাশয়ের অনুগ্রহ ভিন্ন বর্ত্তমানে দত্তজার আর উপায়ান্তর নাই। নিবেদন ইতি।

১০ই আশ্বিন,
রাত্রি।

পদানত দাস
শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের দেনার হিসাব।

ট্রেড্স এসোসিয়াসন ৫০০৲, বাবু কালীচরণ ঘোষ ৫০০০৲, টালিগঞ্জের মথুর কুণ্ডু ৪০০০৲, গোবিন্দচন্দ্র দে বহুবাজার ৩০০০৲, দ্বারকানাথ মিত্র ২৫০০৲, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত শ্যামবাজার ১১০০৲, হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খিদিরপুর ১৬০০৲, রাজেন্দ্র দত্ত ডাক্তার চন্দননগর ২০০৲, কেদার ডাক্তার ২০০৲, গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী ১০০০৲, লালা বড়বাজার ৮৫০০৲, গমেজ সাহেব ৫০০৲, বিশ্বনাথ লাহা ১০০৲, দে কোং ১০০৲, মানভূম ৫০০৲, মনিরদ্দিন ৪০০৲, আমিরন আয়া ২০০৲, ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং ৩৬০০৲, বেনারসের রাজা ১৫০০৲, মতিচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০০৲, উমেশচন্দ্র বসু ও মুনসীর মিহি আনা ৫০০৲, বাটী ভাড়া ৩৯০৲, চাকরের মাহিনা ৭০০৲।"[১০]

১৮৭২ সালের ৩০-সেপ্টেম্বর মাইকেলকে লেখা বিদ্যাসাগরের একখানা চিঠি :

"My Dear Dutt,

I have tried my best and am sadly convinced that your case is an utterly hopeless one—no exertion of mine, or that of any body else who is not a moneyed man, however strenuous it may be, can save you. It is too late to mend matters by patch-works. I am very unwell and am therefore unable to write more.

30th Sept. 72

Yours sincerely,
Isvara Chandra Sarma" [১১]

এখানে বলে রাখা ভালো, মাইকেলের জন্য বিদ্যাসাগরকে কারো কাছে অপদস্থ হতে হয়নি। মাইকেলের জন্য বিদ্যাসাগর যত ঋণ করেছেন, সব টাকা মাইকেল নিজের সম্পত্তি বিক্রী করে শোধ করেছেন, বিদ্যাসাগরকে দায়মুক্ত করেছেন।[১২]

বিদ্যাসাগরের কাছে মাইকেলের দাবির অন্ত নেই। বিদ্যাসাগরকে লেখা মাইকেলের একখানা অত্যাশ্চর্য চিঠি উদ্ধার করি :

"Judge's Court

My dear vid:—

I am going to take with me to yours for প্রসাদ (Prasad) my learned co-adjutor Babu Mutty Lal Chowdry. You had be a little charitable and send for a bottle of Sherry.

Yours affectionately
Michael M. Datta."[১৩]

আপ্যায়ন করার জন্য বিদ্যাসাগর কি সত্যি-সত্যি মদের বোতল যোগাড় করে রেখেছিলেন? কাউকে আপ্যায়ন করার জন্য বিদ্যাসাগর কস্মিনকালেও মদের বোতল মজুত করেছেন, একথা কল্পনাতীত। মদের বোতলের জন্য বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করতে সাহস করেছেন মাইকেল, মাইকেল ছাড়া আর কারো পক্ষে এমন দুঃসাহস সম্ভব হয়নি।

বিদ্যাসাগর যেসময়ে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল, সেসময়ে, যতদূর জানা যাচ্ছে, সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ে তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন লিখেছেন : "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত-নাটক-অভিনয়ে বিশেষ আমোদ ছিল। নিকটবর্ত্তী বিশ্বাস-মহাশয়ের বাটী হইতে অলঙ্কার ও বস্ত্র আনিয়া তিনি ছাত্রদিগকে সাজাইতেন এবং কলেজের একটি গৃহে নেপথ্য করিতেন।"[১৪]

কয়েকবার বাঙলা নাটকের অভিনয় দেখেছেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫৮ সালের ২২-মার্চ বড়বাজারে গদাধর শেঠের বাড়িতে বিদ্যাসাগর 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের অভিনয় দেখতে এসেছেন। ১৮৫৮ সালের ৩১-জুলাই পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় বিদ্যাসাগর 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখেছেন।

পাথুরেঘাটার ঠাকুরদের পুরনো বাড়ির দোতলার নাচঘরে একটি রঙ্গ-মঞ্চ হল। ঠাকুরবাড়িতে থিয়েটারের জন্য কমিটিও ছিল একটি। সেই কমিটিই ঠিক করে দিত, কে কোন ভূমিকায় অভিনয় করবে। বিদ্যাসাগর সেই কমিটির একজন সভ্য।

১৮৫৯ সালের ২৩-এপ্রিল স্বনামধন্য কেশবচন্দ্র সেন আর তাঁর দলের যুবকদের উৎসাহে 'বিধবা বিবাহ' নাটকের প্রথম অভিনয় হল। বিদ্যাসাগর 'বিধবা বিবাহে'র অভিনয় দেখতে একাধিকবার এসেছেন; 'বিধবা বিবাহে'র অভিনয় দেখতে-দেখতে বিদ্যাসাগরের দু-চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়েছে।[১৫]

এসব ঘটেছে অ্যামেচার থিয়েটারে, সখের রঙ্গালয়ে। ইচ্ছা হলেই কেউ

এসে সখের রঙ্গালয়ে ঢুকতে পারেন না। কর্তারা যাঁদের নেমন্তন্ন করেন, তাঁরাই শুধু সখের থিয়েটারে ঢুকতে পারেন। ইচ্ছা হলেই পয়সা ফেলে টিকিট কেটে ঢুকতে হলে যেতে হবে সাধারণ রঙ্গালয়ে।

এবার তাহলে বেঙ্গল থিয়েটারে আসা যেতে পারে। বেঙ্গল থিয়েটার কিন্তু সখের রঙ্গালয় নয়।

বেঙ্গল থিয়েটারের ম্যানেজার শরৎচন্দ্র ঘোষ, অবৈতনিক সম্পাদক প্যারীমোহন রায়। বেঙ্গল থিয়েটারের আগে বাঙালীর আর কোনো সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনেত্রী দেখা যায়নি। বেঙ্গল থিয়েটার হবার আগে বাঙালীর সাধারণ রঙ্গালয়ে পুরুষমানুষেরাই স্ত্রীলোকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

শরৎচন্দ্র বেঙ্গল থিয়েটারের জন্য আগেই একটা কমিটি করেছিলেন। সেই কমিটির সভ্য ছিলেন বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন এবং আরো কেউ-কেউ।

মাইকেল মধুসূদন বেঙ্গল থিয়েটারকে পরামর্শ দিলেন—তোমরা স্ত্রীলোক নিয়ে থিয়েটার খোলো। আমি তোমাদের জন্য নাটক লিখে দেব। স্ত্রীলোক না নিলে কিছুতেই ভালো হবে না।[১৬]

বিস্তর তর্ক-বিতর্ক হল এ-বিষয়ে। অনেকেই রাজি হলেন শেষপর্যন্ত, কিন্তু বিদ্যাসাগর কিছুতেই এ-প্রস্তাবে সায় দিতে পারলেন না। এসব খুব সম্ভব ১৮৭৩ সালের গোড়ার দিকের কথা। বিদ্যাসাগর তারপর থিয়েটারের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখেননি।

বিদ্যাসাগরের নাট্যচিন্তার একটি চমৎকার নিদর্শন আছে। স্বসম্পাদিত 'উত্তরচরিত' ও 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা'য় বিদ্যাসাগর কয়েকটি নাটকপ্রযুক্ত পারিভাষিক শব্দের সুন্দর অর্থ লিখে দিয়েছেন :

"অঙ্ক—যে স্থলে নাটকীয় ইতিবৃত্তের এক অংশের শেষ হয়, তথায় পরিচ্ছেদ কল্পিত হইয়া থাকে; ঐ পরিচ্ছেদের নাম অঙ্ক। অঙ্কশেষে সমুদয় নট রঙ্গভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়; পর অঙ্কে নূতন নূতন নট প্রবিষ্ট হইয়া অভিনয়ের আরম্ভ করে।

অপবার্য্য—সন্নিহিত অন্য ব্যক্তিরা শুনিতে না পায়, এরূপ অনুচ্চ স্বরে গোপন করিয়া।...

আকাশে—নাটকে, স্থলে স্থলে, "আকাশে" এইরূপ লিখিত থাকে, তাহার অর্থ এই, কোনও নট রঙ্গভূমিতে প্রবেশ পূর্ব্বক, তথায় অনুপস্থিত ব্যক্তিবিশেষের কার্য্যদর্শন বা বাক্যশ্রবণের অভিনয় করিয়া, কিছু বলিতেছে।... অথবা, রঙ্গভূমিপ্রবিষ্ট অভিনয়কারীদিগের অদৃশ্য হইয়া, আকাশ হইতে কেহ বলিতেছে।...

আত্মগত, স্বগত—অভিনয় কালে কোনও নট, সন্নিহিত ব্যক্তিবর্গের নিকট গোপন করিবার নিমিত্ত, মনে মনে যে বিষয়বিশেষের আন্দোলন করে, তাহার নাম আত্মগত ও স্বগত।...

কঞ্চুকী—যে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, কার্য্যদক্ষ, বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি রাজকীয় অন্তঃপুরের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। অন্তঃপুরে বিশ্রামকালে, রাজাকে কোনও সংবাদ দিবার প্রয়োজন হইলে, কঞ্চুকী দ্বারা সম্পন্ন হইত।

জনান্তিক—সন্নিহিত অন্য অন্য ব্যক্তি শুনিতে না পায়, এরূপ গোপনভাবে পরস্পর কথোপকথন।...

নট—যে নৃত্য করে, অর্থাৎ রঙ্গভূমিতে নৃত্য, গীত, ও অভিনয় করা যাহার ব্যবসায়। সুতরাং, যাহারা নাটকের অভিনয় করে, তাহারা সকলেই

নটশব্দবাচ্য; কিন্তু প্রস্তাবনাতে যেখানে নটের প্রবেশ বর্ণিত থাকে, তথায় নটশব্দে সূত্রধারের সহকারী নটবিশেষ অভিপ্রেত।

নটী—যে স্ত্রীলোক নৃত্য করে, অর্থাৎ রঙ্গভূমিতে নৃত্য, গীত, ও অভিনয় করা যাহার ব্যবসায়। সুতরাং যে যে স্ত্রীলোক নাটকের অভিনয় করে, তাহারা সকলেই নটীশব্দবাচ্য। কিন্তু, প্রস্তাবনাতে যেখানে নটীর প্রবেশ বর্ণিত থাকে, তথায় নটীশব্দে সূত্রধারের সহকারী নটীবিশেষ অভিপ্রেত।

নান্দী—সূত্রধার, রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া, অভিপ্রেত অভিনয়কার্য্যের নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির নিমিত্ত, যে মঙ্গলাচরণ করে, তাহার নাম নান্দী। স্তবাদি দ্বারা দেবতাদিগকে আনন্দিত অর্থাৎ প্রসন্ন করে, এজন্য এই মঙ্গলাচরণ নান্দীশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। নাটকগ্রন্থের আরম্ভে যে এক বা তদধিক শ্লোক থাকে, তাহাকে নাটকের নান্দী বলে; নাট্যশাস্ত্রকারেরা নান্দীর যে যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, ঐ সকল শ্লোক সেই সমস্ত লক্ষণে আক্রান্ত নয়। বস্তুতঃ, ঐ সকল শ্লোক গ্রন্থকারের মঙ্গলাচরণ। "নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ" এই অবধি গ্রন্থের আরম্ভ। গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণের যে প্রথা আছে, তদনুবর্ত্তী হইয়া, কবিরা, স্বপ্রণীত নাটকের প্রারম্ভে, মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন। "নান্দ্যন্তে" নান্দীর পর, অর্থাৎ অভিনয়ের আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, দেবতাপ্রণামাদিরূপ নান্দী কীর্ত্তন করিয়া। এই নান্দী নাটকের অঙ্গ নহে, অভিনেতৃবর্গের অধিকারী সূত্রধারের কার্য্য। সেই কার্য্যের সম্পাদন করিয়া, সূত্রধার বলিয়া থাকেন, "অলমতিবিস্তরেণ" অতি বাহুল্যে প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ, নান্দীর অধিক আড়ম্বর করিয়া, সময় নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন।

নেপথ্য—যে স্থলে নাটকের অভিনয় হয়, তাহার নাম রঙ্গভূমি। রঙ্গভূমির কিঞ্চিৎ অন্তরে, যে স্থলে নটেরা বেশবিন্যাস করে, তাহার নাম নেপথ্য। নাটকের যে স্থলে "নেপথ্যে" এইরূপ লিখিত থাকে, তাহার অর্থ এই, কোনও নট, নাটকীয় ব্যক্তিবিশেষের বেশপরিগ্রহ করিয়া, রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, নেপথ্য হইতে কিছু বলিতেছে।...

প্রকাশ—অভিনয়কালে, কোনও নট, অন্যের নিকট গোপন করিবার নিমিত্ত, মনে মনে বিষয়বিশেষের আন্দোলন করিয়া, অথবা সন্নিহিত ব্যক্তিরা শুনিতে না পায় এরূপ অনুচ্চ স্বরে বলিয়া, পরে সকলের গোচরে যাহা বলে, তাহাকে প্রকাশ বলে।...

প্রবেশক—কখনও কখনও, কোনও অঙ্কের সমাপ্তির পর, পর অঙ্কের আরম্ভের পূর্ব্বে, নীচ পাত্র দ্বারা অতীত বিষয় উল্লিখিত অথবা ভবিষ্য বিষয় সূচিত হইয়া থাকে। নাটকের এই অংশকে প্রবেশক বলে। প্রবেশক পর অঙ্কের প্রস্তাবনাস্বরূপ।

প্রস্তাবনা—সূত্রধার, রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া, নান্দীসমাধানের পর, অনন্তরপ্রবিষ্ট নটবিশেষের সহিত কথোপকথনচ্ছলে, নাটকপ্রণেতা কবির ও অভিনেয়মাণ নাটকের উল্লেখ করে; এবং, প্রসঙ্গক্রমে, নাটকীয় ইতিবৃত্ত অবতীর্ণ করিয়া দিয়া, স্বীয়সহচর সমভিব্যাহারে, রঙ্গভূমি হইতে অপসৃত হয়; তৎপরে নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়। এই অংশকে নাটকের প্রস্তাবনা কহে।

বিদূষক—রাজসহচর। রাজার বিশ্রামকালে, এই ব্যক্তি তাঁহার সন্নিহিত থাকে, এবং ভাঁড়ামি করিয়া, চিত্তবিনোদন করে।

বিষ্কম্ভক—নাটকীয় ইতিবৃত্তের নীরস অংশ সকল, প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ণিত হইলে, সামাজিকবর্গের বিরক্তিকর হইতে পারে; এজন্য নাটককর্ত্তারা, অপ্রধান

ব্যক্তির মুখে সেই সেই অংশের সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়া, সরস অংশের অবতরণ করিয়া দেন। নাটকের এই অংশকে বিষ্কম্ভক বলে। বিষ্কম্ভক অঙ্কের প্রস্তাবনাস্বরূপ, অঙ্কের আদিতে গ্রথিত হইয়া থাকে। বিষ্কম্ভক দ্বিবিধ, শুদ্ধ ও মিশ্র; কেবল মধ্যম পাত্রে ঘটিত হইলে শুদ্ধ বিষ্কম্ভক, মধ্যম ও অধম পাত্রে ঘটিত হইলে মিশ্রবিষ্কম্ভক, বলে।

ভাব—প্রস্তাবনাতে, কথোপকথন কালে, অপর নট সূত্রধারকে ভাব শব্দে সম্বোধন করে। ভাব শব্দের অর্থ বিজ্ঞ, যোদ্ধা, বিদ্বান।

মারিষ—প্রস্তাবনাতে, কথোপকথনকালে, সূত্রধার অপর নটকে মারিষশব্দে সম্বোধন করে। মারিষশব্দের অর্থ আর্য্য, মাননীয়, আদরণীয়।

সূত্রধার—যে প্রধান নট সূত্র ধরে, অর্থাৎ নাটকের সূত্রপাত করে, তাহার নাম সূত্রধার। ইদানীন্তন যাত্রাসম্প্রদায়ের অধিকারী সূত্রধারশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।”

বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যে লেখা মাইকেলের দুটি কবিতা তুলে দিচ্ছি :

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহা পর্ব্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘ-শিরঃ তরু-দল, দাসরূপ ধরি;
পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে;
দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে!

*

পণ্ডিতবর
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি
হে ঈশ্বরচন্দ্র! বঙ্গে বিধাতার বরে
বিদ্যার সাগর তুমি; তব সম মণি,
মলিনতা কেন কহ ঢাকে তার করে?
বিধির কি বিধি সূরি, বুঝিতে না পারি,
হেন ফুলে কীট কেন পশিবারে পারে?

করমনাশার স্রোত অপবিত্র বারি
ঢালি জাহ্নবীর গুণ কি হেতু নিবারে?
বঙ্গের সুচূড়ামণি করে হে তোমারে
সৃজিলা বিধাতা, তোমা জানে বঙ্গজনে;
কোন্ পীড়ারূপ অরি বাণাঘাতে পারে
বিঁধিতে, হে রঙ্গরত্ন! এ হেন রতনে?
যে পীড়া ধনুক ধরি হেন বাণ হানে
(রাক্ষসের রূপ ধরি), বুঝিতে কি পার,
বিদীর্ণ বঙ্গের হিয়া সে নিষ্ঠুর বাণে?
কবিপুত্র সহ মাতা কাঁদে বারম্বার।

*

মাইকেল ও বিদ্যাসাগরের চরিত্রের অন্তর্গত সাদৃশ্যের সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত : "মাইকেল ও বিদ্যাসাগর আপাতদৃষ্টিতে দুই ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা বাংলার নতুন যুগের যমজ সন্তান। ইঁহাদের আচার ভিন্ন ধর্ম এক, পরিচ্ছদ ভিন্ন প্রকৃতি এক। ইঁহাদের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন, কিন্তু কর্মের উদ্দেশ্য ও পন্থা এক। উভয়েই শাস্ত্রবচন ছাড়িয়া মানুষের ভাগ্যচিন্তায় মগ্ন; উভয়েই নির্ভীক, আত্মপ্রত্যয়ে অনমনীয় এবং উভয়েই সরলস্বভাব, কোমলচিত্ত। একজন এক নতুন সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে তৎপর; আরজন এক নতুন সমাজ গড়িতে তৎপর। এবং উভয়েই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধ ভাবে অচঞ্চল।...একজন বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল, আশঙ্কায় প্রমত্ত; আরজন বিলাসিতাশূন্য, সংযত, নিরাসক্ত। কিন্তু এ বৈসাদৃশ্যকে আমি বাহিরের বৈসাদৃশ্য বলিয়া মনে করি।"

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাসাগর ও মাইকেল মধুসূদনের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে আছে।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী লিখেছেন : "পদ্যে মধুসূদন যাহা করিয়াছেন, গদ্যে তাহা করিয়াছেন বিদ্যাসাগর। তিনি গদ্যচ্ছন্দের মধুসূদন।"[১৭]

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা ভালো, বাঙলাভাষার মূর্তিনির্মাণে মাইকেল মধুসূদনের চেয়ে বিদ্যাসাগরের দান মহত্তর। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলেছেন : "মাইকেল মধুসূদন ধ্বনি-হিল্লোলের প্রতি লক্ষ রেখে বিস্তর নূতন সংস্কৃত শব্দ অভিধান থেকে সংকলন করেছিলেন। অসামান্য কবিত্বশক্তি সত্ত্বেও সেগুলি তাঁর নিজের কাব্যের অলংকৃতিরূপেই রয়ে গেল, বাংলাভাষার জৈব উপাদানরূপে স্বীকৃত হল না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দান বাংলাভাষার প্রাণ-পদার্থের সঙ্গে চিরকালের মতো মিলে গেছে, কিছুই ব্যর্থ হয়নি।"[১৮]

বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব মাইকেল মর্মে-মর্মে অনুভব করেছেন। ১৮৬০ সালেই মাইকেল বিদ্যাসাগরের একটা স্ট্যাচুর জন্য নিজের মাইনের অর্ধেক টাকা চাঁদা দিতে রাজি হয়েছেন। মাইকেল মধুসূদন, ১৮৬০ সালের ৩-আগস্ট, রাজনারায়ণ বসুকে একখানা চিঠিতে লিখেছেন :

"I have no objection to subscribe one half of my pay towards a statue for I. C. Vidyasagar as the promoter of Widow-Remarriage." [১৯]

বিদ্যাসাগরের উপর মাইকেলের অসীম বিশ্বাস। ১৮৬৬ সালের ২৫-ফেব্রুআরি মাইকেল লণ্ডন থেকে বিদ্যাসাগরকে লিখেছেন :

"My trust is in God and after God in you!"

মাইকেলের চিঠিপত্রে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিস্তর আশ্চর্য উক্তি ছড়িয়ে আছে। কয়েকটি তুলে দিচ্ছি :

A splendid fellow; The first man among us; Above flattering any man; one of Nature's noblemen; The greatest Bengali that ever lived; A real friend and righteous man; A tower of strength; Noble and friendly heart; A thoughtful man; Not only Vidyasagara but Karunasagara also।

১৮৭৩ সালের ২৯-জুন মাইকেলের মৃত্যু হল। পরদিন বিকেলে লোয়ার সার্কুলার রোড সমাধিক্ষেত্রে মাইকেলের মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হল।

মাইকেলের মৃত্যুর একযুগেরও কিছুকাল পর কয়েকজন ভদ্রলোক উদ্যোগী হলেন—মাইকেলের সমাধিস্থানের উপর কোনো স্মৃতি-স্তম্ভ নেই, কোনো স্মৃতি-চিহ্ন নেই, কিছুই নেই; অতএব চাঁদা তুলে একটা স্থায়ী স্মৃতি-স্তম্ভ নির্মাণ করে মাইকেলের অস্থি-পঞ্জর রক্ষা করতে হবে।

চাঁদার জন্য বিদ্যাসাগরের কাছেও লোক এল। মাইকেলের সমাধিস্থানে স্মৃতিস্তম্ভের জন্য চাঁদা, মাইকেলের অস্থি-পঞ্জর রক্ষার জন্য চাঁদা। মাইকেলের কথায় বিদ্যাসাগরের চোখে জল এসে গেল। বললেন—দ্যাখো, প্রাণপণ চেষ্টা করে যাঁর জান রাখতে পারিনি তাঁর হাড় রাখবার জন্য আমি ব্যস্ত নই।[২০]

আঠারো

১৮৬৫ সালের শেষদিকে ঠাকুরদাস একদিন স্বপ্ন দেখলেন যে তাঁর বাসভূমি অবিলম্বে শ্মশান হয়ে যাবে। স্বপ্ন দেখে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলেন ঠাকুরদাস। গঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্যকে ডাকিয়ে আনলেন। গঙ্গানারায়ণকে কোষ্ঠী দেখালেন। কোষ্ঠীর ফল গঙ্গানারায়ণ যা বললেন তা স্বপ্নের সঙ্গে মিলে গেল। অধিকন্তু গঙ্গানারায়ণ বললেন—অবিলম্বে বিদ্যাসাগর মশায়ের শনির দশা উপস্থিত হবে। তাঁর আত্মবিচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদ ও ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটবে, তাঁকে দেশত্যাগী হতে হবে। একদিনের জন্যও সুখী হবেন না, একস্থানে স্থায়ী হবেন না, নতুন নতুন স্থানে গিয়ে বাস করার ইচ্ছা হবে। একথা অন্যের কাছে ব্যক্ত করবেন না। বিশেষত, বিদ্যাসাগর বাবাজীর কাছে ব্যক্ত করলে তিনি আমায় তিরস্কার করতে পারেন।

ঠাকুরদাসের অত্যন্ত দুর্ভাবনা হল। তাঁর আর বীরসিংহে থাকতে ইচ্ছা রইল না। দিনকয়েক পরে কাশীবাসী হওয়ার কথা ব্যক্ত করলেন ঠাকুরদাস। বিদ্যাসাগর তখন মুর্শিদাবাদের কাছে কান্দীতে আছেন। শম্ভুচন্দ্র একখানা চিঠি লিখে বিদ্যাসাগরকে খবর দিলেন। সেই চিঠি পেয়েই বিদ্যাসাগর শম্ভুচন্দ্রকে লিখেছেন : "তিনি (ঠাকুরদাস) বিদেশে একাকী অবস্থিতি করিবেন তাহা কোনক্রমেই পরামর্শসিদ্ধ নহে; স্বয়ং সমুদায় আহরণ করিয়া আপনার আহারাদি নির্ব্বাহ করিবেন, তাহাতে কষ্টের একশেষ হইবেক। যে ব্যক্তির পুত্র পৌত্রাদি এত পরিবার, তিনি শেষ বয়সে একাকী বিদেশে কালহরণ করিবেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও আক্ষেপের বিষয় কি হইতে পারে। সুতরাং এ অবস্থায় তিনি একাকী কাশীতে বাস করিবেন ইহা আমি কোনও মতে সহ্য করিতে পারিব না। সেরূপ করিলে তাঁহার কষ্টের সীমা থাকিবে না। যদি তাঁহার সেবা ও পরিচর্য্যার নিমিত্ত কেহ কেহ সঙ্গে যাইতে পারেন, তাহা হইলেও আমি কথঞ্চিৎ সম্মত হইতে পারি, নতুবা তাঁহাকে একাকী পাঠাইয়া দিয়া আমরা এখানে নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে কালযাপন করিব ইহা কোনও ক্রমেই ধর্ম্ম নহে। অন্যের কথা বলিতে পারি না, আমি কোনও মতেই আমার মনকে প্রবোধ দিতে পারিব না। যদি নিতান্তই তাঁহার যাইবার মানস হইয়া থাকে, এইরূপ তাড়াতাড়ি করিলে চলিবে না। তুমি তাঁহার চরণারবিন্দে আমার প্রণিপাত জানাইয়া কহিবে, যে পাছে আমার মনে দুঃখ হয় এই খাতিরে তিনি অনেকবার অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন এক্ষণেও সেই খাতিরে আর কিছু কষ্ট সহ্য করুন; আমি সত্বর বাটী যাইবার চেষ্টায় রহিলাম। সেখানে পঁহুছিলে পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিব নতুবা অকস্মাৎ এরূপে সংসার ত্যাগ করিয়া আসিলে এবং উপযুক্ত বন্দোবস্ত না করিয়া কাশীবাস করিলে আমি মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইব। যাহা হউক যেরূপে পার আপাততঃ তাঁহার এ অভিপ্রায় রহিত করিবে এবং তিনি আপাততঃ ক্ষান্ত হইলেন এই সম্বাদ সত্বর কান্দীতে আমার নিকট পাঠাইবে। যাবৎ এ সংবাদ না পাইব তাবৎ আমার দুর্ভাবনা দূর হইবে না। ২।৪ দিন কোন মতে এখান হইতে যাইতে পারিব না, নতুবা অদ্যই আমি প্রস্থান করিতাম। যাহা হউক যেরূপে পার তাঁহায়

কোন মতে আপাততঃ ক্ষান্ত করিবে, নিতান্ত ক্ষান্ত না হন এই রবিবারে বাটী হইতে আসিতে না দিয়া আমাকে সংবাদ লিখিলে আমি যেরূপে পারি বাটী যাইব। আমি কায়িক ভাল আছি, ইতি তারিখ ৩০এ অগ্রহায়ণ।...”

এই চিঠিতেও কোনো কাজ হল না। ঠাকুরদাস অবিচলিত রইলেন। কাশী যাবার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

আবার বিদ্যাসাগরকে চিঠি লেখা হল।

চিঠি পেয়েই বিদ্যাসাগর বর্ধমানে এলেন, বর্ধমান থেকে রাত্রে পাল্কি করে জাহানাবাদে, সেখান থেকে হেঁটে বীরসিংহে। বিদ্যাসাগর ঠাকুরদাসকে অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন, কাঁদাকাটা করলেন, কিন্তু সবই বিফল হল। ঠাকুরদাস আর বীরসিংহে থাকবেন না।

দিনকয়েক পরে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ঠাকুরদাস কলকাতায় গেলেন। কিছু-দিন কলকাতায় থাকলেন। সেখানে বিদ্যাসাগরের অনেক অনুনয়-বিনয়ে ঠাকুর-দাস বীরসিংহে ফিরে যেতে রাজি হলেন।

কনিষ্ঠপুত্র ঈশানকে ঠাকুরদাস একদিন কথায়-কথায় জিজ্ঞেস করলেন—ঈশ্বর আমায় দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছে, তোমার মত কী?

ঈশান বলল—আমার মতে দেশে গিয়ে সংসারীভাবে থাকা আর আপনার উচিত নয়, এই সময় আপনার কাশীধামে গিয়ে বাস করাই উচিত।

ঈশানের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন বিদ্যাসাগর। ঠাকুরদাসকে বললেন—আপনি গৃহস্থের মধ্যে থেকে দিন কাটালেন। এখন আপনাকে কিছুতে একাকী কাশী যেতে দেব না। বাড়ির কেউ আপনার সঙ্গে না থাকলে নিজে বৃদ্ধবয়সে রান্নাবান্না করে চালাতে আপনার খুব কষ্ট হবে।

সেকথায় কান দিলেন না ঠাকুরদাস। অতএব ঠাকুরদাস যাতে কাশীতে সুখস্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন সেইরকম বন্দোবস্ত হল।

তারপর বিদ্যাসাগর বললেন—আপনি গেলে আমাদের মন অত্যন্ত ব্যাকুল হবে। আমাদের জন্য কোনো চিত্তবিনোদনের উপায় নেই। অতএব, আপনি রাজি হলে হডসন সাহেবকে দিয়ে আপনার ছবি আঁকিয়ে নেব। সেজন্য আপনাকে আর পনেরো দিন কলকাতায় থাকতে হবে।

ঠাকুরদাস রাজি হলেন। তাঁর ছবি হল। সেজন্য তিনশো টাকা খরচ হল।[১]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : “(বিদ্যাসাগর) ৭৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বীরসিংহার বাটীর নূতন বন্দোবস্ত করেন। মধ্যম ও তৃতীয় সহোদরের ও স্বীয় পুত্রের পৃথক্ পৃথক্ ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। সকলেরই মাসিক ব্যয়ের নিমিত্ত যাহার যেরূপ টাকার আবশ্যক সেইরূপ ব্যবস্থা হইল। এইরূপ করিবার কারণ এই একত্র অনেক পরিবার থাকিলে কলহ হইবার সম্ভাবনা, বিশেষতঃ বহুপরিবার একত্র অবস্থিতি করিলে সকলেরই সকল বিষয়ে কষ্ট হয়। ইতিপূর্ব্বে ভগিনীদ্বয়ের পৃথক্ বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বিদেশীয় যে সকল বালকগণ বাটীতে ভোজন করিয়া বীরসিংহা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবে তাহাদের মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহের সমস্ত টাকা দিয়া পাচক ও চাকর দ্বারা স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করেন। ৭৫ সালে আমার স্বতন্ত্র বাটী প্রস্তুত করিয়া দেন। ইহার কিছু দিন পরে তাঁহার পুত্র নারায়ণের পৃথক্ বাটী প্রস্তুত হয়। এবং নিজের নিকট জননীদেবীর অবস্থিতি করিবার ব্যবস্থা হইল।”[২]

বিদ্যাসাগরের বাবা তখন কাশীতে। বিদ্যাসাগর ঠিক করলেন, দিনকয়েকের জন্য কাশীতে বাবার কাছে যাবেন।

কে একজন বারণ করল। বলল—বিদ্যাসাগর, এমন গরমের দিনে কাশী যাবে, বড় ভয়ের কথা।

কিন্তু বিদ্যাসাগর একবিন্দু ভয় পেলেন না। বললেন—ডিউটি করতে যাব, তাতে প্রাণের ভয় করলে চলবে কেন।°

বিদ্যাসাগর নির্ভয়ে সারাজীবন আপন কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন। তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের কি কোনো তুলনা আছে! 'দয়ার সাগর' বিদ্যাসাগরের কর্ুণার কথা সকলেই জানে। রাস্তা থেকে কলেরা রোগীকে কোলে করে ঘরে নিয়ে এসেছেন বিদ্যাসাগর, অচেনা-অজানা মানুষের দুঃখে অস্থির হয়ে দু-হাত ভরে সাহায্য করেছেন তাকে। বিস্তর অনাথা বিধবার সংসার চলেছে বিদ্যাসাগরের টাকায়। অসংখ্য গরীব ছাত্রের খাওয়া-পরা লেখাপড়ার খরচ জুগিয়েছেন বিদ্যাসাগর। যা আয় করেছেন বিদ্যাসাগর, তার অধিকাংশই ব্যয় করেছেন গরীব-দুঃখীদের জন্য।

১৮৯১ সালের ৩-আগস্ট 'ইণ্ডিয়ান নেশন' লিখেছেন :

"He (বিদ্যাসাগর) had a magnificent income from his books; and the whole of it, reserving only a small portion for the ordinary comforts of himself and his family, he bestowed on others as charity. The charity was administered not as daily alms to passing mendicants, but to a large extent as monthly allowances to men and women who were known to be deserving objects. Helpless widows and orphans, needy students, disabled people, retired servants of special merit, were regularly maintained by him. The casual objects of his bounty were many and various. That a man was in distress was reason enough for his receiving charity from Vidyasagar. . . He never went out into the street without a few coins in his purse and never returned home without having distributed them. Often was he heard to observe in a general way that the money which he earned was really not his, that he could claim to use only as much as he required for his ordinary needs, and that the rest was the property of such of his fellow-men as wanted it more than he did."

ইতিহাসের একটি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ এই যে, যাঁর দান ও দয়া তুলনাহীন তাঁর মৃত্যুর প্রায় তিনযুগ বাদে তাঁর দুই কন্যা ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়েছেন।

১৯২৫ সালের ১৯-এপ্রিল 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে :

"শ্রীমতী বিধুমুখী বসু এম, বি, (৯৩।১নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।) পত্রান্তরে এক মর্ম্মবিদারক কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার তৃতীয়া ভগ্নী উভয়েই অত্যন্ত কষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন। তিনি তাঁহার কয়েকটী বন্ধুর দান মাত্র ১৫৲ টাকায় নিজের, কন্যার ও দুইটি দৌহিত্রের ভরণপোষণ করিয়া থাকেন। তিনি বর্ত্তমানে কাশীতে

বাস করিতেছেন, কারণ সেখানে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় অপেক্ষাকৃত অল্প। দ্বিতীয়তঃ তিনি সেখানে শারীরিক পরিশ্রম করিয়াও কিঞ্চিৎ আয় করিয়া থাকেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয়া* কন্যার অবস্থা ততোধিক শোচনীয়; সংসারে তাঁহার একটী পঙ্গু পুত্র ভিন্ন আপনার বলিতে আর কেহ নাই। তিনি বর্ত্তমানে তাঁহাদের পুরাতন মালীর গৃহে একটি বারান্দায় বাস করিতেছেন! কিছুদিন পূর্ব্বে যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা জনসাধারণের নিকট ভিক্ষা করিতে অগ্রসর হন, তখন কয়েকজন আত্মীয় তাঁহাকে সাহায্য দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া এই লজ্জাজনক সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা কেহই কিছু সাহায্য করেন নাই। এই কারণেই বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা ও তেজস্বী ব্যক্তির কন্যা হইয়াও তাঁহাকে এই সাহায্য ভিক্ষা করিতে হইতেছে। এখনও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্নে পরিপুষ্ট ব্যক্তির বংশধর বাঙ্গলাদেশে অনেকেই আছেন।

অন্নে পরিপুষ্ট না হইলেও বঙ্গদেশে এমন লোক খুবই বিরল যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋণী নন; অতএব আশা করা যায়, প্রত্যেকেই সেই মহাপুরুষের স্মৃতি মনে রাখিয়া তাঁহার সন্তানগণকে এই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবেন। যাঁহারা উপরোক্ত মহদুদ্দেশ্যে কিছু সাহায্য করিতে চান, তাঁহারা শ্রীমতী বসুকে জানাইলে তিনি বাধিত হইবেন।"

১৯২৫ সালের ২১-এপ্রিল 'আনন্দবাজার পত্রিকা' মন্তব্য করেছে : "সম্প্রতি আর এক লজ্জার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া কন্যা এখন যারপর নাই দুর্দ্দশাগ্রস্তা, তাঁহাদের অন্ন জুটে না। পরের আশ্রয়ে কোনরূপে জীবন কাটাইতে হয়। দ্বিতীয়া কন্যা সন্তানাদি লইয়া কাশীতে অতি দীনভাবে কোনরূপে আছে। তৃতীয়া কন্যা একটী মালীর বাড়ীর একপার্শ্বে তাহারই দয়ায় স্থান পাইয়া বাস করিতেছেন। যিনি দয়ার সাগর বলিয়া পরিচিত,—কত দীন-দুঃখীর অশ্রুজল যিনি মুছাইয়াছেন, যাঁহার অনুগ্রহে বাঙ্গলাদেশে আজ অনেকে গণ্যমান্য ও পদস্থ, তাঁহার কন্যাদের এই শোচনীয় দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া বুক ফাটিয়া কান্না আসে। বাঙ্গালী কি বিদ্যাসাগরের কন্যাদের জন্য কিছুই করিবে না? যাঁহারা বিদ্যাসাগরের প্রসাদে আজ ধনী ও পদস্থ, তাঁহারা কি এইবার একটু কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিবেন না? বিদ্যাসাগর কলেজের কর্ত্তারা ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে একটা কিছু করিতে পারেন না কি? বাঙ্গলার ধনী ও হৃদয়বানেরা এ ঘোর কলঙ্ক হইতে বাঙ্গালীকে মুক্ত করিবার জন্য অগ্রসর হউন।"

পরম সান্ত্বনার কথা, এই আবেদন ব্যর্থ হয়নি।

১৯২৫ সালের ১০-জুন 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখেছে :

"ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দেবী এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দেশের সুসন্তানেরা আমাদের যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা দুই ভগ্নী কৃতজ্ঞ। আমরা সহৃদয় সন্তান-

---

* প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানে যতদূর জানা যাচ্ছে, বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয়া ও কনিষ্ঠা কন্যা (তৃতীয়া কন্যা নয়) দুরবস্থায় পড়েছিলেন। এখানে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' সম্ভবত ঈষৎ ভুল করেছে।

দিগকে আমাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি। আমরা এইবার বুঝিতে পারিতেছি যে, আমরা নিরাশ্রয় নহি, বরং আমরা এই ভাবিয়া সুখ পাইতেছি যে, আমাদের বহু সহৃদয় সন্তান দেশে আছেন। আমরা সকলের উন্নতির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

যাঁহাদের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, শ্রীমতী বিধুমুখী বসু তাহার একটী তালিকা 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় দিয়াছেন।"

বিশাল হৃদয় বিদ্যাসাগরের। তবু অথবা সেইজন্যই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বঞ্চনা করেছে অনেকে।

উত্তরপাড়া স্কুলের একটি বালকের চিঠি এল একদিন বিদ্যাসাগরের কাছে। চিঠির সারমর্ম অত্যন্ত করুণ। পিতৃমাতৃহীন, সহায়সম্বলশূন্য দরিদ্র বালক। পরের বাড়িতে একমুঠো খেয়ে অনেক কষ্টে স্কুলে পড়ছে। বিদ্যাসাগর যদি দয়া করে পাঠ্যপুস্তকগুলি পাঠিয়ে দেন তো ছেলেটি নিশ্চিন্ত হয়ে পড়াশোনা করতে পারে।

আর কথা কি। বিদ্যাসাগর দরকারী বইগুলি পাঠিয়ে দিলেন ডাকে, ছেলেটির নামে, স্কুলের ঠিকানায়। তারপর বছর-বছর চিঠি আসে—আজ্ঞে, নতুন ক্লাশে উঠেছি, আবার নতুন বই দরকার।

বিদ্যাসাগর বছর-বছর ছেলেটিকে ডাকে নতুন-নতুন বই পাঠিয়ে দেন।

কয়েক বছর পরের কথা। উত্তরপাড়া স্কুলের হেডমাস্টার মশাই দেখা করতে এসেছেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। কথায়-কথায় বিদ্যাসাগর সেই ছেলেটির কথা তুললেন। জিজ্ঞেস করলেন—তোমার স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। ছেলেটি কেমন পড়াশোনা করে বলো তো।

কিন্তু নাম শুনে ছেলেটিকে ঠাহর করতে পারলেন না হেডমাস্টার মশাই। বললেন—আমার স্কুলের প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ও-নামের কোনো ছেলে নেই তো।

ও-নামের কোনো ছেলে নেই কি? বিদ্যাসাগর বললেন—তুমি দিব্যি মাস্টার তো হে। একটা ছেলে পঞ্চম শ্রেণী থেকে পড়ছে তোমার স্কুলে, বছর-বছর ক্লাশে উঠছে, চিঠি লিখে আমার থেকে বই নিচ্ছে বছর-বছর, ডাকে বই পাঠাচ্ছি, সে-ও ঠিকঠাক বই পেয়ে যাচ্ছে, আর তুমি বলছ কি না ও-নামের কোনো ছেলেই নেই তোমার স্কুলে! সব ছেলেকে তুমি চেনো না নাকি?

ভালোমানুষ হেডমাস্টার মশাই সেদিন চুপ করে গেলেন। পরদিন স্কুলে গিয়ে খোঁজ-খবর নিতে আরম্ভ করলেন। সব ক্লাশ তন্ন-তন্ন করে খুঁজলেন, কিন্তু কোথায় কে। এ-স্কুলে ও-নামের কোনো ছেলে নেই। বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখে এ-স্কুলের কোনো ছেলে বই যোগাড় করেনি। তাহলে ব্যাপার কি?

ব্যাপার গুরুতর। অত্যন্ত জটিল সমস্যা। সেই সমস্যার সমাধান হল শেষ পর্যন্ত।

উত্তরপাড়া স্কুলের কাছেই একখানা বইয়ের দোকান। সব সেই দোকানদারের কীর্তি। বছর-বছর কাতর ভাষায় অব্যর্থ চিঠি লিখে বিদ্যাসাগরের থেকে নতুন-নতুন বই এনেছে, বিক্রী করেছে।

অচেনা-অজানা মানুষ তো দূরের কথা, নিতান্ত আত্মীয়-স্বজনও বিদ্যাসাগরকে বঞ্চনা করতে ছাড়েনি।

একখানা খাতায় নাম-ঠিকানা লেখা আছে। মাসে-মাসে কাকে কত টাকা

পাঠাতে হবে, সেসব কথা লেখা আছে। সেই খাতা দেখে বিদ্যাসাগর টাকা পাঠান, প্রত্যেক মাসে এ-বাবদে বিদ্যাসাগরের খরচ হয় আটশো টাকার কিছু বেশি।

একবার একটানা তিনমাসের জন্য বিশ্রাম করতে কার্মাটাড়ে গিয়েছেন বিদ্যাসাগর। যাবার আগে একজন আত্মীয়ের হাতে আড়াই হাজার টাকা দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন—মাসে-মাসে যাকে যা দেবার, ঠিকমতো দেবে।

বিদ্যাসাগর তিনমাস কার্মাটাড়ে কাটাবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু একমাসও কাটল না, দিগ্বিদিক থেকে বিদ্যাসাগরের কাছে খবর আসতে লাগল—আমাদের পেটে ভাত নেই, উনুনে হাঁড়ি চড়ে না, মাসহারার টাকা পাইনি।

কেউ মাসহারার টাকা পায়নি কেন? সেই আত্মীয়কে চিঠি লিখলেন বিদ্যাসাগর। কিন্তু সে-চিঠির কোনো জবাব এল না।

দিগ্বিদিক থেকে তাগাদার পর তাগাদা। মাসহারার টাকা কই? মাসহারার টাকা কই? অস্থির হয়ে কার্মাটাড় থেকে কলকাতায় ছুটে এলেন বিদ্যাসাগর। সেই আত্মীয়কে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—লোকে মাসহারা পায়নি কেন?

আত্মীয়টি জবাব দিল—অন্য কাজের বড়ো ভিড় ছিল, তাই পেরে উঠিনি।

বিদ্যাসাগর বললেন—আচ্ছা, না পেরেছ, টাকাগুলি এনে দাও, যাকে যা দেবার আমি নিজে দিয়ে যাই।

আত্মীয়টি আমতা-আমতা করে বলল—হ্যাঁ—তা—টাকা—টা—অন্য---বাবদে খরচ হয়ে গেছে।

কী আর বলবেন বিদ্যাসাগর। তখনই আড়াই হাজার টাকা ধার করে আনলেন, হিসেব করে তিনমাসের টাকা দিয়ে দিলেন সকলকে, তারপর কার্মাটাড়ে চলে গেলেন।[৪]

টাকা, টাকা, টাকার জন্য অনেকে মুখে বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা-ভালোবাসা দেখিয়েছেন। বিদ্যাসাগর কি তা বোঝেননি? বুঝেছেন, মর্মে-মর্মে বুঝেছেন।

রামকমল ওরফে গুজে নামে একটি শিশু দৌহিত্রকে খুব ভালোবাসতেন বিদ্যাসাগর। গুজে চাইলেই তার হাতে দিতেন নতুন-নতুন সিকি, দুআনি, আধুলি, টাকা।

বিদ্যাসাগর গুজেকে জিজ্ঞেস করতেন—দাদা, তুমি কাকে ভালোবাসো?

গুজে বলত—দাদামশাই, তোমাকেই খুব ভালোবাসি। আর তোমার চেয়েও তোমার ওই নতুন-নতুন সিকি-দুআনিকে বেশি ভালোবাসি।

বিদ্যাসাগর বলতেন—সকলেই তাই ভালোবাসে। তবে তুমি শিশু কি না, বোঝো না, তাই আসল কথাটি বলে ফেলো। অন্যেরা মুখে বলে না।

বিদ্যাসাগর সংসারে সুখ পাননি, শান্তি পাননি। সকলকে সন্তুষ্ট করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সে-চেষ্টা ষোলোআনা সার্থক হয়নি।

বিদ্যাসাগরের পাঁচটি সন্তান : এক পুত্র, চার কন্যা। সন্তানদের মধ্যে পুত্রটিই সকলের চেয়ে বড়ো।

১২৭৪ সালের শ্রাবণমাসে গোপালচন্দ্র সমাজপতির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতার বিবাহ হয়। বাঙলা ১২৭৯ সনের ২৩-মাঘ গোপালচন্দ্রের মৃত্যু হয়। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "দাদা গোপাল জামাতার মৃত্যুর পর তাহার মাতা ভগিনী ও ভ্রাতাকে কলিকাতায় আনিয়া স্বতন্ত্র বাটীভাড়া করিয়া রাখিলেন; এবং নিজ হইতে সমস্ত ব্যয় দিয়া তাহাদের

রীতিমত তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন…। ঐ কন্যার পুত্রদ্বয়কে এরূপ ভাবে লালন পালন ও শিক্ষিত করিলেন যে উহারা পিতৃহীন হইয়াও উহাদিগকে একদিনের জন্যেও কোন ক্লেশ অনুভব করিতে হইল না। এবং ঐ কন্যার দেবরের পালন ও শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন…।”[৫]

গোপালচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র সুরেশচন্দ্র বিলেত যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। ঠিক করলেন, বিদ্যাসাগরকে না জানিয়ে গোপনে মায়ের অনুমতি নিয়ে চলে যাবেন।

গোপন আয়োজন দেখে হেমলতা সুরেশচন্দ্রকে বললেন—তুমি ছেলে হয়ে যেমন আমাকে না বলে যেতে পারছ না, তোমাকে যেতে দেবার আগে মেয়ে বলে আমারও কি বাবাকে একথা জিজ্ঞেস করা উচিত নয়?

অর্থাৎ, বিদ্যাসাগরের অনুমতি ছাড়া যাওয়া হবে না। কথাটা বলার জন্য অনেকবার সুরেশচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সামনে গেছেন, কিন্তু বলে উঠতে পারেননি। সুরেশচন্দ্রের ভাবগতিক দেখে বিদ্যাসাগরের সন্দেহ হল। একদিন সুরেশচন্দ্রকে বললেন—তোর কিছু দরকারী কথা আছে বলে বোধ হয়, তা কিছু থাকে তো বল না।

সুরেশচন্দ্র বললেন—আমি বিলেত যাব?

বিদ্যাসাগর রঙ্গ করে বললেন—কি? ব্যারিষ্টার হয়ে এসে চাকরির জন্য আমারই উমেদারি করবি তো?

তারপর রঙ্গ ছেড়ে বললেন—টাকাকড়ির বড় অনটন হয়ে পড়েছে, এ-অবস্থায় আর হয় না।

পরে একদিন বাড়ির মধ্যে কথায়-কথায় সুরেশচন্দ্র মাকে বললেন—আমার বাবা থাকলে কি আর তোমার বাবার কাছে আবদার করতে যেতাম?

উপরের ঘরে বিদ্যাসাগরের কানে গেল কথাটা। সুরেশচন্দ্রকে ডাকলেন। ওই কথায় বিদ্যাসাগরের দু-চোখ জলে ভরে উঠেছে। বিদ্যাসাগর বললেন—তোরা আমাকে পর ভাবিস। সে থাকলে তোদের জন্য যা করত, আমি তার চেয়ে কি কম করছি?[৬]

১২৭৯ সনের আষাঢ় মাসে বিদ্যাসাগরের মধ্যমা কন্যা কুমুদিনীর সঙ্গে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়।

১২৮২ সনের ৩০-আষাঢ় বিদ্যাসাগরের তৃতীয়া কন্যা বিনোদিনীর সঙ্গে সূর্যকুমার অধিকারীর বিবাহ হয়।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: “ইনি (সূর্যকুমার অধিকারী) ২১ বৎসর বয়সের সময় হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, বিবাহের পর অগ্রজ মহাশয় সূর্য্যবাবুকে ঐ পদ পরিত্যাগ করাইয়া মেট্রপলিটানে সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, এবিষয়ে সূর্য্যবাবু প্রথমতঃ অসম্মতি প্রকাশ করেন, অনেক বাদানুবাদের পর দাদার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া ও অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া দাদার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। হেয়ার স্কুলের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মেট্রপলিটানে সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হইলেন।”[৭]

কিন্তু, শেষপর্যন্ত, সূর্যকুমারকে মেট্রোপলিটান থেকে বরখাস্ত করে দিতে বাধ্য হয়েছেন বিদ্যাসাগর।

১২৮৪ সনের বৈশাখ মাসে বিদ্যাসাগরের কনিষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারীর সঙ্গে কার্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়।

বিদ্যাসাগর একদিন দীনবন্ধু ন্যায়রত্নকে বললেন—তুমি বিষয় সম্বন্ধে আমার নিন্দা করেছ? তুমি বলে বেড়াও যে সংস্কৃত প্রেস আর ডিপজিটারী আমাদের দু-জনের সম্পত্তি? ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে ঐ ডিপজিটারী দান সম্পর্কে তুমি নানারকম কথাবার্তা বলে থাকো?

দীনবন্ধু বললেন—বিধবাবিবাহাদি কাজে আপনার প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ আছে। অন্য লোকে যখন ত্রিশ বা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে সংস্কৃত ডিপজিটারী নিতে উমেদার, তখন ব্রজবাবুকে বিনা টাকায় কেন দেওয়া হল? অন্যকে দিলে সে-টাকায় আপনার অনেক ঋণ শোধ হত। লোকের কাছে এই কথাই আমি বলেছি। আপনি যেমন উদারপ্রকৃতি তাতে সমস্ত বিষয়ই নষ্ট করতে পারেন।...সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটারী আপনার একার সম্পত্তি নয়, সুতরাং ওতে আপনার একলার স্বত্ব নেই। ওতে আমার স্বত্ব আছে। কারণ আমাদের দুজনের টাকায় আর পরিশ্রমে ওই দুই সম্পত্তি অর্জিত হয়েছে।

বিদ্যাসাগর বললেন—ও আমি ব্রজবাবুকে দিয়েছি।

দীনবন্ধু বললেন—আপনার অংশ আপনি যা-খুশি করতে পারেন, আমার অর্ধেক অংশ আপনি দান করতে পারবেন না।

বিদ্যাসাগর বললেন—তোমাকে অর্ধেক দিতে পারি না। চারভাই ও পিতা-মাতা বর্তমান, অতএব ঐ সম্পত্তি যুক্তি অনুসারে ছ-ভাগ হতে পারে।[৮]

আদালতে যাবার কথা হয়েছিল। শেষপর্যন্ত আদালতে না গিয়ে সালিসী মানা হল। সালিসী হলেন দ্বারকানাথ মিত্র আর দুর্গামোহন দাস।

দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন লিখেছেন: "তিনি (বিদ্যাসাগর) দুইশত টাকা কর্জ্জ করিয়া আনিয়া দেন, সেই দুইশত টাকা অবলম্বন করিয়া পুরাতন অক্ষর ও একটী অকর্ম্মণ্য কাষ্ঠের প্রেস ক্রয় করিয়া মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও আমি উভয়ে প্রতিদিন প্রাতঃকালাবধি বেলা নয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত, অপরাহ্নে পাঁচটার পর রাত্রি নয় দশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া ছাপাখানার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলাম।"

বিদ্যাসাগর লিখেছেন: "...ঐ যন্ত্রের সহিত শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বন্দ্যো-পাধ্যায়ের কখন কোন সংস্রব নাই। তিনি কহিতেছেন সংস্কৃত যন্ত্রের সংস্থাপনে ও উন্নতি সাধনে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন এজন্য উহাতে তাঁহার অংশ আছে, কিন্তু আমি তাঁহাকে কখনও উক্তরূপ পরিশ্রম করিতে বলি নাই ও দেখি নাই।..."

দুই ভাইয়ের এই বিবাদে একজন সাক্ষী ছিলেন গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। দীনবন্ধুকে এ-ব্যাপারে তিনি কখনো পরিশ্রম করতে দেখেননি। গিরিশচন্দ্র সাক্ষ্য দিয়েছেন যে সংস্কৃত প্রেসে দীনবন্ধুর অংশ থাকার কথা তিনি দীনবন্ধু কি বিদ্যাসাগর কি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মুখে শোনেননি।

শেষপর্যন্ত অবশ্য দাবি ত্যাগ করেছেন দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন। ১৮৬৮ সালের ১৭-অক্টোবর দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন লিখেছেন: "...সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত সহোদরে সহোদরে বিরোধ করা নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য বিবেচনা করিয়া লিখিয়া দিতেছি যে সংস্কৃত যন্ত্র বা তৎসংক্রান্ত পুস্তকালয়ে আমার স্বত্ব ও অংশ থাকার যে দাবী করিয়াছিলাম আমি সে দাবী পরিত্যাগ করিলাম।..."[৯]

বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে মাসে-মাসে টাকা পেতেন দীনবন্ধু। অতঃপর সে-টাকা নেওয়া দীনবন্ধু বন্ধ করে দিলেন।

বিদ্যাসাগর গিয়ে গোপনে একদিন দীনবন্ধুর স্ত্রীর আঁচলে টাকা বেঁধে দিয়ে বললেন—মা, এই নাও, দীনোকে বলো না, আমি জানি, তোমাদের কষ্ট হচ্ছে, এই টাকায় সংসার খরচ চালাবে।

দীনবন্ধু জানতে পারলেন। এবং ঐ টাকা সেবার দীনবন্ধুর স্ত্রী ফেরত দিলেন। বিদ্যাসাগরকে ফেরত নিতে হল।

পরে আবার বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে মাসে-মাসে টাকা নিতে রাজি হয়েছেন দীনবন্ধু। এবং নিয়েছেন।

বছরখানেক বাদে মনোমোহিনী নামে একটি বিধবার বিবাহ হল। সেই বিধবাবিবাহের ফলেই বিদ্যাসাগরকে চিরকালের জন্য বীরসিংহ ছেড়ে চলে আসতে হল। ঘটনাটি গোড়া থেকে বলা যেতে পারে।

কলকাতা থেকে মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় আর মনোমোহিনী এলেন বীরসিংহে, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছে। সঙ্গে নারায়ণচন্দ্রের চিঠি নিয়ে এসেছেন। চিঠিতে নারায়ণচন্দ্র শম্ভুচন্দ্রকে যা লিখেছেন তার সারমর্ম: "ক্ষীরপাই-নিবাসী মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মনোমোহিনী নাম্নী একটি বিধবা কন্যা সঙ্গে করিয়া এখানে বিবাহ করিবার মানসে আসিয়াছিলেন। পিতৃদেব মহাশয় আপাততঃ ইহাদিগকে বাটী যাইতে বলিলেন। পিতৃদেব ত্বরায় বীরসিংহার বাটীতে যাইবেন, তথায় যাইয়া যাহা হয় করিবেন। ইহারা ক্ষীরপাই যাইতে ভয় পায়, যেহেতু তথায় অনেকেই বিধবাবিবাহের দ্বেষ্টা। কিন্তু ইহারা আপনাকে না জানাইয়া এখানে আসিয়াছিলেন, এজন্য আমার পত্র সহ আপনার নিকট যাইতেছেন। পিতৃদেব যে পর্য্যন্ত বাটী না যান, সেই পর্য্যন্ত যাহাতে ইহারা নিরাপদে থাকিতে পায়, তদ্বিষয়ের ব্যবস্থা করিবেন।"[১০]

শম্ভুচন্দ্র আশ্রয় দিলেন মনোমোহিনীকে।

যথাসময়ে বিদ্যাসাগর বীরসিংহে এলেন। ক্ষীরপাইয়ের হালদারবাবু বিদ্যাসাগরের কাছে সকাতরে প্রার্থনা করলেন মুচিরামের এই বিবাহ যেন না হয়।

হালদারবাবুদের প্রার্থনা পূর্ণ করতে রাজি হলেন বিদ্যাসাগর।

বললেন—আপনাদের অনুরোধে আমি এই বিবাহের কোনো সংস্রবে থাকব না।*[১১]

---

* চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "তিনি (বিদ্যাসাগর) বাটী পৌঁছিলে ক্ষীরপাই-বাসী হালদার মহাশয়েরা এবং অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিতে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সহজে এরূপ ভাবে এক ব্যক্তিকে সহায়তা হইতে বঞ্চিত করিতে সম্মত হইবার লোক ছিলেন না। কিন্তু যাঁহারা ইতি পূর্ব্বে বহুবার বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়াছেন, এরূপ বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক বহুবিধ কারণ দর্শাইয়া এই কার্য্যের সহায়তায় বিরত থাকিতে বহু সাধ্য সাধনা করায়, অগত্যা বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ বিবাহে কোন সংস্রব রাখিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করেন।" (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ ৪১০)

এইরকম অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে যে মুচিরামের বিবাহের আগে অন্ততপক্ষে একবার ক্ষীরপাইবাসী হালদারবাবুরা বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানে সহায়তা করেননি। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "ক্ষীরপাই নিবাসী °হারাধন চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যার বিবাহ সভায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্বশুর °শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রামের প্রধান লোক বলিয়া মালা গ্রহণ করেন এই অপরাধে, ঐ গ্রামের সম্ভ্রান্ত হালদার বাবুরা দলের আঁটাসাঁটী করিয়া ঐ মালা লওয়া অপরাধে উক্ত শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্যকে প্রায়শ্চিত্ত করান।" (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন: ভ্রমনিরাস, পৃ. ৫৭)

অগত্যা এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হল মনোমোহিনীকে। চলে গেল সনাতন বিশ্বাসের বাড়িতে। কাছেই সনাতন বিশ্বাসের বাড়ি। সেখানে মনোমোহিনীকে সঙ্গে নিয়ে গেল দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের পুত্র গোপালচন্দ্র। রাধানগরের কৈলাসচন্দ্র মিশ্র আর বিদ্যাসাগরের আরেক ভাই ঈশানচন্দ্রের পরামর্শে।

শম্ভুচন্দ্র আর রাধানগরের চৌধুরী বাবুদের নায়েব উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের কাছে বসে ছিলেন। বিদ্যাসাগরের ইচ্ছায় শম্ভুচন্দ্র লোক পাঠিয়ে সনাতন বিশ্বাসকে ডাকিয়ে আনলেন। সনাতন মনোমোহিনীকে তাঁর বাড়ি থেকে বের করে দিতে রাজি হলেন না।

উমেশচন্দ্র তখন সনাতন বিশ্বাসকে বললেন—তোমরা এঁর মাসহারা খাও, একটা কথা শুনলে না।

সনাতন বিশ্বাস বললেন—আমরা পুরুষানুক্রমে কৈলাস মিশ্রের বাড়িতে চাকরি করে আসছি। তিনি নিজে আমাকে এইমাত্র বলেছেন, 'তুমি মেয়েটিকে বাড়িতে রাখো, কারো কথায় বের করে দিও না। আমি কাল সন্ধ্যার আগে এসে এই বিধবার বিবাহ দেব।' আমি কোনো মতে তাঁর কথার অবাধ্য হতে পারব না। বরং যে-কটাকা মাসহারা দিয়েছেন তা ফেরত দিতে রাজি আছি।

সনাতন বিশ্বাস চলে গেলেন।

গোপালচন্দ্র আর ঈশানচন্দ্র চাঁদা করে বিবাহের সমস্ত আয়োজন করল। বিবাহ হয়ে গেল।[১২]

১২৭৬ সনের আশ্বিনে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' লিখেছে: "সম্প্রতি জাহানাবাদে একটী বিধবাবিবাহ হইয়াছে। বর কেচকাপুর স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস ক্ষীরপাই। পাত্রী কাশীগঞ্জ নিবাসী শ্রীকাশীনাথ পালধির কন্যা শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী।"

উত্তরকালে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিদ্যাসাগরের নামে অভিযোগ করেছেন: "মুচিরামের বিবাহের সময় উক্ত বিবাহ ন্যায্য ও শাস্ত্রসম্মত স্বীকার করিয়াও বিধবাবিবাহবিদ্বেষী ক্ষীরপাইনিবাসী হালদারবাবুদের অনুরোধে (বিদ্যাসাগর) পশ্চাৎপদতার ও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই বরং ঐ সময়ে তিনি ঐ বিবাহের প্রতি যারপরনাই বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন।"*[১৩]

বিবাহের পরদিন সকালে বিদ্যাসাগর ঈশানচন্দ্রকে বললেন—ঈশান, তুমি কেন বিবাহ দেওয়ালে, এতে আমার বড়ো অপমান হয়েছে।

ঈশান বলল—কৈলাস মিশ্র ও আমি গত পরশু আপনাকে জিজ্ঞেস করি, 'এই বিধবাবিবাহ ন্যায্য কি না?' আপনি উত্তর দিয়েছেন, 'এ শাস্ত্রসম্মত ও ন্যায্য বলে আমি স্বীকার করি, কিন্তু হালদারবাবুদের মনে দুঃখ হবে।' লোকের খাতিরে এই সকল বিষয়ে ক্ষান্ত হওয়া আপনার মতো মানুষের পক্ষে দোষের কথা।

---

* আজীবন বিদ্যাসাগরের স্নেহে পালিত হয়েও বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁকে অনায়াসে অশালীন ভাষায় নিন্দা করতে পেরেছেন। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের আগে কিংবা পরে আর কেউ অদ্যাবধি বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে কোনো বিষয়ে 'পশ্চাৎপদতার ও কাপুরুষতার' অভিযোগ উত্থাপন করেননি। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবদ্দশায় যথার্থ মন্তব্য করেছেন: "আজীবন জ্যেষ্ঠের অন্নে পালিত হইয়া এখনও তাঁহারই আনুকূল্যে দেহধারণ করিয়া তাঁহাকে ঐরূপ মধুর বিশেষণে অভিহিত করিয়া আত্মীয়গণের নিকট ও জনসাধারণ সমীপে অব্যাহতি পাওয়া কেবল আমাদের দেশেই সম্ভব!" (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: বিদ্যাসাগর, দ্বিতীয় সংস্করণ, Appendix D, পৃ. xviii)

বিদ্যাসাগর রাগ করে বললেন—তুই কি এখনো সেইরূপ দুর্মুখ আছিস এবং এইরূপই কি চিরকাল থাকবি?

আরো দু-চার কথার পর বিদ্যাসাগর বললেন—আমি আর দেশে আসব না।*

বিদ্যাসাগরের অন্নে প্রতিপালিত তাঁরই একজন অতি অন্তরঙ্গ আত্মীয় সেসময়ে বিদ্যাসাগরের নামে বলেছেন—জানেন, এখনই তাঁর ধোপা-নাপিত বন্ধ করে দিতে পারি; তাঁকে এখানে চেনে কে?[১৪]

কয়েকদিন বীরসিংহে থেকে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, রাখালস্কুল, বালিকা-বিদ্যালয় প্রভৃতি সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করে বিদ্যাসাগর চিরদিনের জন্য বীরসিংহ ত্যাগ করলেন।[১৫]

কলকাতায় আসার সময় ভাইদের আর সম্ভ্রান্ত গ্রামবাসীদের বললেন—তোমরা আমাকে দেশত্যাগী করালে![১৬]

সত্যিই দেশত্যাগী হয়েছেন বিদ্যাসাগর। জীবনে আর কখনো বীরসিংহে যাননি।

উত্তরকালে শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন: "অগ্রজ মহাশয়ের অসন্তোষের ভয়ে আমি আর ঐ বিষয়ে (মুচিরামের বিবাহ) লিপ্ত রহিলাম না...।[১৭] কিন্তু, শম্ভুচন্দ্র যাই বলুন, মুচিরামের বিবাহের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব বা অকৃতিত্ব শম্ভুচন্দ্রের। কেননা উত্তরকালে স্বয়ং মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "আমি ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি যে কেবল উক্ত মহাশয়েরই (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন) সম্পূর্ণ যত্ন এবং অনুগ্রহেই উহা (আমার বিবাহ) নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। তিনি যেরূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা আমার চিরকালই মনে থাকিবে।"[১৮]

[শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন একথা প্রমাণ করতে অতিশয় ব্যস্ত যে মুচিরামের বিবাহের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না। প্রমাণস্বরূপ শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন: "...আমিই যদি মুচিরামের বিবাহ দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেশত্যাগী করিয়াছি, তাহা হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশের তাঁহার যাবদীয় কার্য্যভার আমার হস্তে কেন ন্যস্ত করেন? এবং মুচিরামের বিবাহের পর আমাকেই কেন নানা বিষয়ে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতেন? বিবাহ সম্পাদনার্থ কন্যা পাঠাইবার জন্য আমাকেই কেন পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতেন।" (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন: ভ্রমনিরাস, পৃ. ৬৯)

মুচিরামের বিবাহের পরেও বিদ্যাসাগর নানা ব্যাপারে শম্ভুচন্দ্রের প্রতি আস্থা রেখেছেন, এই ঘটনায় মুচিরামের বিবাহ বিষয়ে শম্ভুচন্দ্রের গোপন ভূমিকা অপ্রমাণ হয় না।

শম্ভুচন্দ্র আজীবন বিদ্যাসাগরের কাছে মাসহারা পেয়েছেন, বিদ্যাসাগরকে

---

* শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "প্রকৃত কথা এই যে, মধ্যম সহোদর (দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন) মোকদ্দমার ফারখৎ করিয়া মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসহারার টাকা গ্রহণ না করায় তাঁহার মনে বড় কষ্ট হইয়াছিল এবং মোকদ্দমা দরুণ লোকে নানা কথা কহিত তজ্জন্যই তাঁহার মনে ঐরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল।" (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন: ভ্রমনিরাস, পৃ. ৬৯)

সংস্কৃত প্রেস ও ডিপজিটারী নিয়ে দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিবাদের নিষ্পত্তি হয়ে গেছে মুচিরামের বিবাহের বছরখানেক আগে। বছরখানেক আগের সেই বিবাদের সূত্রে মুচিরামের বিবাহের পরদিন বিদ্যাসাগরের মনে দেশত্যাগের সঙ্কল্প উদিত হয়েছিল, একথা কণামাত্র বিশ্বাসযোগ্য নয়।

নানা কাজে সাহায্য করেছেন এবং বিদ্যাসাগরের প্রসাদে বীরসিংহে একাধিপত্য করেছেন। কোনো সন্দেহ নেই, শম্ভুচন্দ্রকে অত্যধিক স্নেহ করতেন বিদ্যাসাগর। শম্ভুচন্দ্রের জন্য বিদ্যাসাগর স্ত্রীর সঙ্গে পর্যন্ত মনান্তর করেছেন। (দ্রষ্টব্য : চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বিদ্যাসাগর', ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪২০)

মুচিরামের বিবাহে শম্ভুচন্দ্রের গোপন ভূমিকার কথা হয়তো বিদ্যাসাগরের অগোচর ছিল। কিংবা গোচরে এলেও শম্ভুচন্দ্রের প্রতি অত্যধিক স্নেহবশত সেকথা হয়তো তিনি বিশ্বাস করেননি। বিদ্যাসাগরের ভাষা কেড়ে এনে বলা যেতে পারে : স্নেহ অতি বিষম বস্তু।

মুচিরামের বিবাহের কয়েকমাস পরে বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিধবাবিবাহ করেছেন। সেই বিবাহকালে শম্ভুচন্দ্র অনুপস্থিত, কারণ বিদ্যাসাগর পরম স্নেহের সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে সমাচার দেননি। নারায়ণচন্দ্রের বিবাহের দিনকয়েক পরে শম্ভুচন্দ্র, ১২৭৭ সালের ৪ ভাদ্র, বিদ্যাসাগরকে একখানা চিঠিতে লিখেছেন : "...দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত বিবাহের সময় যাইতে পারি নাই সমাচার পাইলে অবশ্য উপস্থিত হইতাম।" (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, দ্বিতীয় সংস্করণ, Appendix D, পৃ. xxi)। এই ঘটনাটির নিঃসন্দেহে গুরুত্ব আছে।

শম্ভুচন্দ্রের জীবদ্দশায় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "নারায়ণ বাবুর বিবাহের পর শম্ভুচন্দ্র নিজ পুত্রের বিবাহের সময় জ্যেষ্ঠের (বিদ্যাসাগরের) নিকট আনুকূল্য গ্রহণ করিয়াও সে সময় (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশাতেই) তাঁহার ভাবী কুটুম্বের নিকট শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন যে জ্যেষ্ঠ ও তাঁহার পরিবার বর্গের সহিত সামাজিক সংস্রব রাখেন না...।" (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, দ্বিতীয় সংস্করণ, Appendix D, পৃ. xx)। চণ্ডীচরণের এই অভিযোগের শম্ভুচন্দ্র কোনো প্রতিবাদ করেননি।]

তারপর তিন ভাইয়ের প্রত্যেককে আলাদা করে চিঠি লিখেছেন বিদ্যাসাগর। প্রত্যেক চিঠিরই মূল সুর : "নানাকারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। আর আমার ক্ষণকালের জন্যেও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই।"[১১]

কারো সঙ্গে আর কোনো সংস্রব রাখতে অনিচ্ছুক হয়েও বিদ্যাসাগর ভাইদের মাসহারা বন্ধ করেননি।

মাকে একখানা চিঠি লিখেছেন বিদ্যাসাগর :

"শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মাতৃদেবী শ্রীচরণারবিন্দেষু—

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনমিদম্—

নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্যেও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে পূর্ব্বের মত নানা বিষয়ে সংসৃষ্ট থাকিলে অধিক দিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয় না। এজন্য স্থির করিয়াছি যতদূর পারি

নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃত ভাবে অতিবাহিত করিব। এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি। মাতার নিকট পুত্রের পদে পদে অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং আপনকার শ্রীচরণে কতবার কত বিষয়ে অপরাধী হইয়াছি তাহা বলা যায় না। এজন্য কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত বচনে প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া এ অধম সন্তানের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আপনকার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত মাস মাস যে ত্রিশ টাকা পাঠাইয়া থাকি আপনি যতদিন শরীর ধারণ করিবেন কোন কারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবেক না। তদ্ব্যতিরিক্ত আপনকার পিতৃকৃত্য ও মাতৃকৃত্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে বার্ষিক দুই শত টাকা প্রেরিত হইবেক। যদি কখন কোন বিষয়ে আমায় কিছু বলা আবশ্যক বোধ করেন পত্র দ্বারা লিখিয়া পাঠাইবেন। আমি অনেকবার আপনকার শ্রীচরণে নিবেদন করিয়াছি এবং পুনরায় শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি যদি আমার নিকট থাকা অভিমত হয় তাহা হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব এবং আপনকার চরণ সেবা করিয়া চরিতার্থ হইব ইতি ১২ই অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল।

ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ—"[২০]

একই দিনে স্ত্রীকে একখানা চিঠি লিখেছেন বিদ্যাসাগর :

"শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

গুণালঙ্কৃত শ্রীমতী দিনময়ী দেবী
কল্যাণনিলয়েষু—

শুভাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক মাবেদনমিদম্

আমার সাংসারিক সুখভোগের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে আর আমার সে বিষয়ে অণুমাত্র স্পৃহা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে...। এক্ষণে তোমার নিকট এ জন্মের মত বিদায় লইতেছি এবং বিনয় বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যদি কখন কোন দোষ বা অসন্তোষের কার্য্য করিয়া থাকি, দয়া করিয়া আমায় ক্ষমা করিবে। তোমার পুত্র উপযুক্ত হইয়াছেন, অতঃপর তিনি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তোমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহের যে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি, বিবেচনা পূর্ব্বক চলিলে, তদ্দ্বারা সচ্ছন্দরূপে যাবতীয় আবশ্যক বিষয় সম্পন্ন হইতে পারিবেক। পরিশেষে আমার সবিশেষ অনুরোধ এই সকল বিষয়ে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া চলিবে, নতুবা স্বয়ং যথেষ্ট ক্লেশ পাইবে এবং অন্যেরও বিলক্ষণ ক্লেশদায়িনী হইবে। ইতি ১২ অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ—
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ—"[২১]

একই দিনে বিদ্যাসাগর বীরসিংহের গদাধর পালকে লিখেছেন :

"নানা গুণালঙ্কৃত শ্রীযুত গদাধর পাল ভাইজী
কল্যাণভাজনেষু

শুভাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক মাবেদনমিদম্

নানা কারণ বশতঃ স্থির করিয়াছি আর আমি বীরসিংহায় যাইব না। তুমি গ্রামের প্রধান, এজন্য তোমাদ্বারা গ্রামস্থ সর্ব্বসাধারণ লোকের নিকট

এজন্মের মত বিদায় লইতেছি এবং সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ জানাইয়া বিনয় বাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি যদি কখনও কোন দোষ করিয়া থাকি, সকলে দয়া করিয়া আমায় ক্ষমা করিবে। সাধারণের হিতার্থে গ্রামে যে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপিত আছে এবং গ্রামস্থ লোকদিগের মাস মাস যে কিছু কিছু আনুকূল্য করিয়া থাকি, আমার শক্তি থাকিতে ঐ সকল বিষয় রহিত হইবে না। কিছু কাল হইল আমার মনের ও শরীরের অবস্থা অতি মন্দ হইয়াছে। সুতরাং অধিক দিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয় না। যতদিন বাঁচিব, যদি শুনিতে পাই, তোমরা সকলে সচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছ, তাহা হইলে যারপর নাই সুখী হইব। ইতি ১২ অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ—"[২২]

পুত্রবধূ ভবসুন্দরীকে বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

"শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

ভবসুন্দরি

আমি তোমাদের নিকট এ জন্মের মত বিদায় লইলাম। তোমাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত, আপাততঃ মাসিক ১৫০৲ একশত পঞ্চাশ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলাম। ইতি

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা"[২৩]

বিদ্যাসাগর বাবাকে লিখেছেন :

"শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পিতৃদেব শ্রীচরণারবিন্দেষু—

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—

নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, আর আমার ক্ষণকালের জন্যেও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে সাংসারিক বিষয়ে সংসৃষ্ট থাকিলে অধিক দিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয় না। এজন্য স্থির করিয়াছি, যতদূর পারি নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃত ভাবে অতিবাহিত করিব। এই সংকল্প করিয়া শ্রীমতী মাতৃদেবী প্রভৃতিকে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহার প্রতিলিপি শ্রীচরণসমীপে প্রেরিত হইতেছে, যদি ইচ্ছা হয় দৃষ্টি করিবেন।

সাংসারিক বিষয়ে আমার মত হতভাগ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিয়াছি, কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছি সে বিষয়ে কোন অংশে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। 'যে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পায়, সে কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না।' এই প্রাচীন কথা কোন ক্রমেই অযথা নহে, সংসারী লোকে যে সকল ব্যক্তির কাছে দয়া ও স্নেহের আকাঙ্ক্ষা করে, তাঁহাদের এক জনেরও অন্তঃকরণে

যে আমার উপর দয়া ও স্নেহের লেশমাত্র নাই সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। এরূপ অবস্থায় সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া ক্লেশ ভোগ করা নিরবচ্ছিন্ন মূর্খতার কর্ম্ম। যে সমস্ত কারণে আমার মনে এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে, আর তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

এক্ষণে আপনকার শ্রীচরণে আমার বক্তব্য এই পিতার নিকট পুত্রের পদে পদে অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা, সুতরাং আপনকার শ্রীচরণে কতবার কত বিষয়ে অপরাধী হইয়াছি তাহা বলা যায় না। তজ্জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর-বচনে শ্রীচরণে প্রার্থনা করিতেছি কৃপা করিয়া এ অধম সন্তানের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

কার্য্যগতিকে ঋণে বিলক্ষণ আবদ্ধ হইয়াছি। ঋণ পরিশোধ না হইলে, লোকালয় পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে যাহাতে সত্বর ঋণমুক্ত হই, তদ্বিষয়ে যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছি। ঋণে নিষ্কৃতি পাইলেই কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিব।...আপনকার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়-নির্ব্বাহার্থে যাহা প্রেরিত হইয়া থাকে, যতদিন আপনি শরীর ধারণ করিবেন, কোন কারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবেক না। ইতি ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সাল।

ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ—"[২৪]

ঠাকুরদাসের চিঠির উত্তরে লেখা বিদ্যাসাগরের আরেকখানা চিঠির অংশ-বিশেষ তুলে দিচ্ছি: "আপনি লিখিয়াছেন, 'তুমি যে চোরের উপর অভিমান করিয়া ভূমিতে ভাত খাও, এ অতি অনুচিত। আর তুমি যে এমন সময়ে বৈরাগ্য অবলম্বন কর, সে কেবল আমার মনে বেদনা জন্মান মাত্র।' এ বিষয়ে আমার নিবেদন এই যে সংসারের সংস্রব পরিত্যাগ করাতে আমার কোন অংশে অণুমাত্রও ক্ষতি বোধ না হইয়া বরং সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ লাভ বোধ হইয়াছে। এতদিন অশেষ প্রকারে লাঞ্ছনা ভোগ ও অহোরাত্র আন্তরিক যাতনা ভোগ করিতেছিলাম, এক্ষণে সকল প্রকারে পরিত্রাণ পাইয়াছি। অধিক আর কি নিবেদন করিব, আমার যেন নরকভোগের পর স্বর্গবাস লাভ হইয়াছে। এমন স্থলে আমার চোরের উপর অভিমান করিয়া ভূমিতে ভাত খাওয়া হইতেছে, একথা সঙ্গত হইতে পারে না। যাহা হউক এবিষয়ে আপনি আমার জন্য কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা উদ্বিগ্ন হইবেন না। অতঃপর আমি অনেক অংশে মনের সুখে কাল যাপন করিতে পারিব তাহার সন্দেহ নাই, তবে আমি এরূপ করাতে আপনকার মনে বেদনা জন্মান হইয়াছে লিখিয়াছেন, ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইতেছি, আমি বহুদিন অবধি সাংসারিক বিষয়ে সম্পূর্ণ বিরক্ত হইয়াছি। তথাপি আমার নিতান্ত মানস ছিল, আপনকার ও জননী-দেবীর জীবদ্দশা পর্য্যন্ত সংসারে লিপ্ত থাকিয়া কালযাপন করিব। কিন্তু উত্তরোত্তর সকলেই আমার উপর এত নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং সকল পক্ষ হইতেই এত অত্যাচার হইতে লাগিল যে, আমার ক্ষমতায় আর সে সকল সহ্য করিয়া কাল হরণ করা হইয়া উঠিল না। আমি আপনকার শ্রীচরণে অকপটহৃদয়ে নিবেদন করিতেছি, নিতান্ত অসহ্য না হইলে, আপনাদিগের জীবদ্দশায় কদাচ সংসারযাত্রায় বিসর্জ্জন দিতাম না। কিন্তু সকল বিষয়ে সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আপনকার ক্ষোভ করিবার তাদৃশ কোন কারণ নাই। পুত্রের ক্লেশ নিবারণ হইয়াছে এবং পুত্র মনের সুখে কালহরণ

করিতেছে, ইহা শ্রবণ করিলে, পিতার অন্তঃকরণে নিঃসন্দেহ আনন্দ জন্মিয়া থাকে। আমি অসহ্য ক্লেশ হইতে নিস্তার পাইয়াছি এবং মনের সুখে কালহরণ করিতে পারিব, তাহার উপায় করিয়াছি সুতরাং এবিষয়ে আপনার দুঃখিত না হইয়া বরং আহ্লাদিত হওয়াই সম্ভব।"[২৫]

সাংসারিক জীবনে বিদ্যাসাগর অসামান্য দুঃখী। অন্যের কথা কী, একমাত্র পুত্রের প্রতিও বিদ্যাসাগর নিদারুণ বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। ১২৮২ সনের ১৮-জ্যৈষ্ঠ বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী এজন্য ও অন্য অন্য গুরুতর কারণ বশতঃ আমি তাঁহার সংস্রব ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি...।"*

পুত্রের আচার-ব্যবহারে কী পরিমাণ ব্যথিত হলে বিদ্যাসাগরের মতো মানুষ এমন কথা লিখতে পারেন তা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়।

বিহারীলাল সরকার লিখেছেন : "কর্ত্তব্য-ত্রুটীহেতু একেবারে পুত্র-বিসর্জ্জন এ সংসারে বিরল। বিদ্যাসাগর মহাশয় পুত্র-বর্জ্জনের একটী প্রকট দৃষ্টান্ত ফল।...নারায়ণের প্রতিগৃহীত হইবার বড় আশাও ছিল না। অনেকে তাঁহার বিপক্ষে প্রায় গুরুতর অভিযোগ আনিত। তাহাতে পুত্রকে পুন-গ্রহণের প্রবৃত্তি আর জাগিতে পারিত না।"[২৬]

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "...একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র নিজ দোষে দীর্ঘকাল পিতার স্নেহ ও মমতায় বঞ্চিত ছিলেন। পিতা পুত্রের এই দীর্ঘকালব্যাপী বিচ্ছেদের মধ্যে, পুত্র অনেক সময়ে পিতার প্রিয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন চেষ্টাই স্থায়ী ফলের প্রসূতি হয় নাই।"†[২৭]

বিহারীলাল সরকার লিখেছেন : "পত্নী দীনময়ী প্রকৃত গৃহিণী ছিলেন। তিনি শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ন্যায় স্বহস্তে রন্ধন করিয়া লোকজনকে খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন। দানধ্যানেও তাঁহার পূর্ণ প্রবৃত্তি ছিল। বর্জ্জিত পুত্র নারায়ণের জন্য পতির সহিত তাঁহার অনেক সময় বাদবিসংবাদ ঘটিত। এই বাদবিসংবাদই সদ্ভাবত্রুটীর মূল কারণ হইয়াছিল। অনেক সময় তিনি গোপনে পুত্রকে অর্থসাহায্য করিতেন; এমন কি নিজের অলঙ্কার পর্য্যন্ত বন্ধক দিতেন।

---

* প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন : "বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার অনেকগুলি ক্লাস একেবারে dismiss করিয়া দেন। সেই সব ছাত্রদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ও একজন। পরে প্রত্যেক ছাত্রকে জরিমানা দিয়া পুনরায় ভর্ত্তি হইতে হইবার আদেশ দেওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে দ্বিজেন্দ্রবাবুর পিতা দেওয়ান কার্ত্তিকেয়-চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন "কি হে কার্ত্তিক কি মনে করে?" কার্ত্তিকেয় বাবু সব খুলিয়া বলিলেন, শেষে বলিলেন "এ জরিমানাটা ছেলেকে না ছেলের বাপ্‌কে?" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন "ছেলের বাপ্‌কে, এ সব ছেলে জন্ম দেয় কেন?" তাহাতে তিনি বলিলেন "তা যদি ঠিক, তবে তুমি নিজে শাস্তি না নিয়ে তোমার ছেলে নারাণকে শাস্তি দিলে কেন?" বিদ্যাসাগর বলিলেন "থাক্ বারেন্দ্র বামুন এসে সব গুলিয়ে দিলে"। দ্বিজেন্দ্রলালকে জরিমানা না নিয়ে ভর্ত্তি করা হল, এবং যাহারা যাহারা জরিমানা দিয়াছিল তাহাদের জরিমানার টাকা ফিরাইয়া দেওয়া হইল।" (মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : শ্রুতি-স্মৃতি, পৃ. ৯৮-৯৯।)

কিন্তু এটি নিছক গল্প। কেননা দ্বিজেন্দ্রলাল কস্মিনকালেও মেট্রোপলিটনে পড়েননি।

† বিহারীলাল সরকার লিখেছেন : "নারায়ণ পিতা কর্ত্তৃক পরিবর্জ্জিত হইয়া স্বকীয় চেষ্টায় সবরেজিষ্টরের কার্য্যে নিযুক্ত হন।" (বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৪৯)

এজন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে টাকা কড়ি দেওয়া বন্ধ করিতেন। পিতা শত্রুঘ্ন যেমন তেজস্বী ছিলেন, কন্যা দীনময়ীও তেমনি তেজস্বিনী ছিলেন। স্বামীর নিকট একবার কোন জিনিষ চাহিয়া না পাইলে, তিনি দুর্জ্জয় অভিমানে অভিভূত হইতেন। তেজস্বী বিদ্যাসাগর তাহার জন্য বিচলিত হইতেন না। এইরূপে মনোবাদ ঘটিত। দীনময়ী তেজস্বিনী ছিলেন; কিন্তু পিতার ন্যায় তাঁহার যথেষ্ট উদারতা ছিল।"[২৮]

কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য লিখেছেন :

"ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র 'নেশনের' ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (এন্. ঘোষ) বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন। বক্তৃতাশক্তি বিশেষ থাকিলেও তিনি শিক্ষা বিভাগে থাকিয়া জীবনাতিপাত করিতে ইচ্ছা করেন ও তদনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রপলিটন্ কলেজে (বিদ্যাসাগর কলেজে) শিক্ষাদানার্থ নিযুক্ত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় দেখিতেন, তিনিও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পিতৃবৎ দেখিতেন ও তাঁহার পত্নীকে মাতৃবৎ ভক্তি করিতেন। ক্রমে এতই আনুগত্য হইতে লাগিল যে, তাঁহারা যেন এক-পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িলেন। নগেন্দ্রনাথের পত্নী কোন কার্য্যোপলক্ষে যেরূপ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে আসিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্ত্রীও সেইরূপ নগেন্দ্রনাথের বাটীতে যাইতে দ্বিধা বোধ করিতেন না।

একদিন কোনও কার্য্যোপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী নগেন্দ্র-নাথের বাটীতে গমন করেন ও সমস্ত দিন নগেন্দ্রনাথের মাতা ও স্ত্রী পুত্র-দিগের সহিত সানন্দে দিনপাত করেন।

অপরাহ্নে নগেন্দ্রনাথ পাঠনা কার্য্য সমাপ্ত করিয়া মেট্রপলিটান কলেজ হইতে নিজ ভবনে উপস্থিত হইলেন ও পরিচ্ছদাদি উন্মোচন করিয়া হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিবার জন্য জল চাহিলেন। নগেন্দ্রনাথের মাতা ও পত্নী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্ত্রীর সহিত কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত থাকাতে তাঁহারা দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, ঝি, জল আনিয়া দে। দাসী অন্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকাতে নগেন্দ্রনাথের জল মিলিল না। নগেন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু জল আসিল না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্নী আর থাকিতে পারিলেন না, গাত্রোত্থান করিলেন ও গাড়ুতে জল লইয়া নগেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া সহাস্যবদনে বলিলেন, "বাবা, হাত পাত, আমি তোমার হাতে জল ঢালিয়া দিতেছি।" নগেন্দ্রনাথ একেবারে জড়সড় হইয়া, "একি মা, আপনিই জল আনিয়াছেন? দাসী এক্ষণেই আনিবে, আপনি ব্যস্ত হইবেন না। কি সর্ব্বনাশ! আপনার জলে আমি হাত মুখ ধুইব! আপনি ব্রাহ্মণকন্যা, আমি দাসানুদাস, আপনার জলে আমি মুখ হাত ধুইব! এ যে আমার পক্ষে বড়ই আস্পর্দ্ধার কাজ!!"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্নী ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিলেন, "বৎস, সন্তানের সমস্ত কাজ জননীই ত করিবেন। তুমি যখন আমাকে মায়ের মত দেখ, তখন তোমার ফরমাস খাটা আমার একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনীয় হইয়াছে। অতএব তুমি দ্বিধা করিও না, হাত পাতিয়া ধর, আমি জল ঢালিয়া মায়ের কার্য্য করি।"

নগেন্দ্রনাথ, তাঁহার মাতা ও পত্নী সকলেই অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কাহারই মুখে বাক্য সরিল না।..."

১২৯৫ সনের ৩০-জ্যৈষ্ঠ নারায়ণচন্দ্র ব্যাকুল ভাষায় একখানা চিঠি লিখেছেন বিদ্যাসাগরকে। চিঠিখানা প্রায় সম্পূর্ণ উদ্ধার করি :

"শ্রীচরণারবিন্দেষু—প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্—

আপনার চরণ-কৃপায় আমার সকলই হইয়াছে। যেমন হউক দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছি, সম্মানেরও অভাব নাই, বাহিরে দেখিতে আমি পরম সুখে আছি। কিন্তু আমার অন্তরে অহরহঃ বিষম কীট দংশন করিতেছে। বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়াছি, অপর কোন কামনাই মনোমধ্যে উদয় হয় না, কেবল মাত্র আপনার চরণ সেবাই এ দাসের মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বকৃত পাপগুলি স্মরণ হইতেছে ও মন অনুতাপে বিকৃত হইতেছে, কেবল মনে হইতেছে হায়! যদি সে সকল পাপ কার্য্য দ্বারা পিতৃচরণে অপরাধী না হইতাম! যেমন পাপ করিয়াছিলাম তেমন প্রতিফলও প্রাপ্ত হইয়াছি, আজ আপনার চরণতলে থাকিলে কি বলিয়া গণ্য হইতাম, আর এখনই বা কেমন হইয়া আছি। জনসমাজে হেয় হইয়া আছি। এ সকলও সহ্য করিতে পারিয়াছি, কিন্তু আপনার এ বয়সে পীড়ার সময়ে আমি আপনার চরণ সেবা করিতে পারিলাম না, ইহা অপেক্ষা আমার আর কি দুর্ভাগ্যের বিষয় হইতে পারে।...

আমি এখন আপনার নিকটে যাইতে চাই না। যখন আপনি এ অধমের মুখের দিকে তাকাইতেও অনিচ্ছুক, তখন আমি কোন্ সাহসে আপনার নিকটে বা সম্মুখে দাঁড়াইতে যাইব। আমি অন্তরালে থাকিব। চাকরের দরকার হইলে চাকর ডাকিয়া দিব, কোথাও যাইতে হইলে চাকরের মত যাইব। চাকরের মত থাকিব, ক্রমে অনুগ্রহ হয়, অনুমতি হয়, নিকটে যাইবে। নচেৎ একধারে কুকুরের মত থাকিব। আমি যেমনই হই আপনার পুত্র। আমারও অর্দ্ধেক বয়স গত হইল। যেমন হউক আপনার একটি পৌত্র আছে। যদি বাঁচিয়া থাকে তাহাকে মহাশয়ের পরিচয় দিতে হইবে। যদি পুত্রকে পা দিয়া ঠেলিয়া গেলেন, তবে পৌত্রটী জনসমাজে কি বলিয়া মুখ দেখাবে, তাহা অপেক্ষা আমার গলায় পা দিয়াছেনই, তাহারও গলায় পা দিয়া মারিয়া ফেলুন। ধিক জীবন লইয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল, আমি এতদিন মৃত্যুর আশ্রয় লইতাম, তবে মধুরভাষিণী আশা আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। বাপ মায়ের নিকট ক্ষমা পাইবার আশা কখনই ছাড়া যায় না। এ কালে ত আমার অদৃষ্টে এই হইল, কিন্তু আমার পরকালের পথটা রুদ্ধ করিবেন না। যদি আপনার চরণ সেবা করিতে না পাইলাম, তবে কিসে পরকালে উদ্ধার পাইব? আপনি একবার রাগদ্বেষ বর্জ্জিত মনে— আপনার ঋষিতুল্য মাধুর্য্য ও মনের উচ্চতায় তদ্গতচিত্ত হইয়া ভাবিয়া দেখুন দেখি, আপনার অধম সন্তানকে ভাসাইয়া দিলে মহাত্মার পৃথিবীব্যাপী সুনামে একটু কলঙ্ক স্পর্শিবে কি না? যে ব্যক্তি সহিষ্ণুতার আধার, যাঁহার দেহ ক্ষমার বাসস্থান, যাঁহার শরীরে মায়াদেবী চির বিরাজিতা, পরের দুঃখ শুনিলে যাঁহার চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রুজল বিগলিত হইতে থাকে, সেই দয়াশীল মহাপুরুষ নিজের হতভাগ্য অনুতাপানলে দগ্ধ, ভগ্ন-হৃদয় একমাত্র পুত্রকে অসঙ্কোচে ভাসাইয়া দিবেন এ কথা ভ্রমক্রমেও মনে স্থান দিতে ইচ্ছা হয় না।

পিতঃ, একদিনের জন্যও আমার জীবন সার্থক হইয়াছে। আমার বিবাহের পর মহাশয় আপনার তৃতীয় সহোদরের পত্রের উত্তরে লিখিয়াছিলেন, "নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে, অধিক

কি নারায়ণ এই বিবাহ করাতে আমি চরিতার্থ হইয়াছি।" পিতঃ, ইহ জন্মে আমার আর ইহা অপেক্ষা সুখ সৌভাগ্য কি বাঞ্ছনীয়? ইহাই আমার স্বর্গসুখ। আপনি রাজাধিরাজ জগন্মান্য বাপ, আর আমি কীটানুকীট ছেলে; আমার কৃত কার্য্যের দ্বারা এক্ষণের জন্যও যদি মহাত্মার মনে অণুমাত্রও সন্তোষ জন্মাইতে পারিয়াছিলাম, তাহাই আমার পরম সৌভাগ্য, গুরুতর তপস্যার ফল। পিতঃ! হায় আমি এই যে পত্রে বারম্বার পিতঃ পিতঃ পিতঃ বলিয়া সম্বোধন করিতেছি, ইহাতেই আমার রোমাঞ্চ হইতেছে, কিন্তু অভাগার জীবনে "বাবা" এই মধুর শব্দে ডাকা হইল না। প্যারী যখন আমাকে বাবা বলিয়া ডাকে, তখন আমার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে, আর পরক্ষণেই সেই আনন্দ বিষাদ-সাগরে পরিণত হয়, আমারও অমনই তখনই তাহার মত বাবা বলিয়া ডাকিতে সাধ যায়, কিন্তু ডাকিতে পাইব না, বৃথা আশা, এই ভাবিয়া অমনই মৃতকল্প হই। আর ভাবি যদি আমি হতভাগা আপনার পুত্র না হইয়া, মনের মত পুত্র থাকিত, তাহা হইলে সেও প্যারীর মত বাবা বলিয়া ডাকিলে আপনারও কত আনন্দ জন্মিত। কিন্তু আমি হতভাগা জন্মিয়া আপনকার সকল সুখে ব্যাঘাত জন্মাইয়াছি। যদিও হইয়াছিলাম মরিয়া যাই নাই কেন?

মহাশয় একাকী বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন।...বহু পরিবার পরিবৃত হইয়াও আপনি একাকী; ছেলে, জামাই, ভাই একজনও মনের মত হইলে, তাহার উপর ভার ফেলিয়া পীড়ার সময় দশ দিন নিভৃতভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিতেন। যখন যখন আপনার শীর্ণ দেহ, শুষ্ক মুখ ও ক্ষীণ স্বরে কথা কহা আমার মনে উদয় হয়, তাহার উপরে সকল ঝনঝাট পোয়ানো মনে পড়ে, অথবা পীড়িত হইয়া একমাত্র চাকর সহায় লইয়া কর্ম্মাটাড়ে যাওয়া মনে হয়, তখন ভাবি, এখনও কেন বাঁচিয়া আছি। আর নিজ কর্ম্মদোষের জন্য জিহ্বা টানিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়।

এক কালে যে মহাপুরুষ, যে ধৈর্য্যগুণের আধার, যে great peerless man (তুলনারহিত মহাপুরুষ) যে Demigod (মানব-দেবতা) আহারকালে আরশোলা চিবাইয়া গিলিয়া অসাধারণ সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছিলেন, কেননা আরশোলা জানিলে অপরের খাওয়া হইবে না, সেই মহাত্মা এমন অমানুষী শক্তি ধরিয়াও নিজের ছেলেকে ক্ষমা করিলেন না! দোষ যত গুরুতর হউক না কেন, ক্ষমার নিকট সকলই তুচ্ছ, তাতে আবার বাপ মায়ের কাছে। আমাকে চরণে আশ্রয় দিলে কেহ দোষ দিবে না, বরং মহাপুরুষের মহত্ত্বেরই পরিচয় দেওয়া হইবে। কি আর অধিক জানাইব, আর একবার কৃপা করিয়া অমানুষ ঔদার্য্য গুণের পরিচয় দিয়া নিজের হতভাগ্য পুত্রকে চরণ-সেবায় নিযুক্ত করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, সর্ব্বপ্রকারে পিতৃদেবের মনের মত হইতে পারি কি না, ভাল হই আর মন্দ হই, সম্বন্ধ বিশিষ্ট লোকের মধ্যে এ হতভাগ্যই প্রথম। কাহার জন্য কি না করিয়াছেন, আমার জন্য একবার শেষ পরীক্ষা করুন, সাহস করিয়া বলিতে পারি, এক্ষণের জন্য, কোন বিষয়ে অণুমাত্রও আপনার অসন্তোষের কাজ করিব না। সংসারে সকল সুখে জলাঞ্জলি দিব, এক মুষ্টি আহার করিয়া আপনার চরণসেবার জন্য জীবন রক্ষা করিব। কুকুর যেমন অন্নমুষ্টি খাইয়া নিরন্তর প্রভুর চিত্তানুবর্ত্তন করে, এ হতভাগাও কুকুরের অধম হইয়া প্রভুর পদতলে পড়িয়া থাকিবে।..."

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "এই পত্র পাঠে বিদ্যাসাগর মহাশয়

একমাত্র পুত্রের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কিছুকাল পুত্রকে সপরিবারে কলিকাতায় ও ফরাসডাঙ্গায় আপনার নিকটে আনিয়া রাখিয়াছিলেন। তৎপরে শেষ পীড়ার সময়েও নিকটে থাকিয়া পরিচর্য্যা করিতে ডাকিয়াছিলেন।"[২৯]

১৮৮৮ সালের মাঝামাঝি দিনময়ীর রক্তাতিসার হল। দিনে দিনে অসুখ বেড়ে চলল, চিকিৎসায় কোনো সুফল হল না।

অন্তিমকালেও দিনময়ী দেবী একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের কথা ভেবে ব্যাকুল হয়েছেন। বলেছেন—কর্তাকে ডাক, কর্তাকে ডাক, দশ-বারো বছরের মনের দুঃখের কথা বলে যাই—আমার নারায়ণকে দিয়ে যাই।[৩০]

মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে দিনময়ী দেবী কপালে করাঘাত করতে আরম্ভ করলেন। বড়ো মেয়ে হেমলতা বিদ্যাসাগরকে ডেকে বললেন—বাবা, মা কী বলছেন শুনুন।

কপালে করাঘাতের অর্থ কী? পুত্রের জন্য করুণাভিক্ষা। বিদ্যাসাগর বললেন—বুঝেছি, তাই হবে; তার জন্য আর ভাবতে হবে না।[৩১]

১৮৮৮ সালের ১৩-আগস্ট রাত নটায় দিনময়ী লোকান্তরিত হলেন।

ক্ষুদিরাম বসু লিখেছেন : "(বিদ্যাসাগর) শেষ জীবনে গার্হস্থ্য-ব্যাপারে মতের অমিল হওয়ায় স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতেন। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুকালীন অসুখের সময় যথেষ্ট শুশ্রূষা করেন ও তাঁর মৃত্যুতে মুষ্‌ড়ে পড়েছিলেন। স্ত্রীর চতুর্থী শ্রাদ্ধের দিন আমরা গিয়ে তাঁর চেহারা দেখে বুঝ্‌লাম যে, তাঁর মনে বেশ আঘাত লেগেছে। খেতে বসে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল যে, কি রকম লাগ্‌ছে, তিনি বললেন—'রকম আর কি, ছাই ছাই লাগ্‌ছে। দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণে 'কান্না যাবে, অন্ন খাবে অনায়াসে।'"[৩২]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "(বিদ্যাসাগর) শোকে অধীর হইয়াও স্বীয় ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য গুণে শোকদুঃখাদি প্রকাশ না করিয়া একমাত্র পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিকাদি কার্য্য সমাধার পর কলিকাতায় শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সমাধা করিলেন। ঐ বৎসর পৌষমাসে পুত্রের হাতে খরচপত্র দিয়া দেশে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগের ভোজন ও সম্বর্দ্ধনাদি কার্য্য করিবার জন্য বীরসিংহায় পাঠাইয়াছিলেন, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বীরসিংহায় গিয়া গ্রামস্থ সমুদায় স্ত্রীপুরুষদিগকে ও নিকটবর্ত্তী জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া রীতিমত সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন ইহাতে যথেষ্ট ব্যয় হয়।"[৩৩]

দিনময়ী দেবীর মৃত্যুর মাসখানেক বাদে, ১২৯৫ সনের ২৮-ভাদ্র, নারায়ণচন্দ্র একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখেছেন বিদ্যাসাগরকে। চিঠিখানা প্রায় সম্পূর্ণ উদ্ধার করি :

"শ্রীঃ—

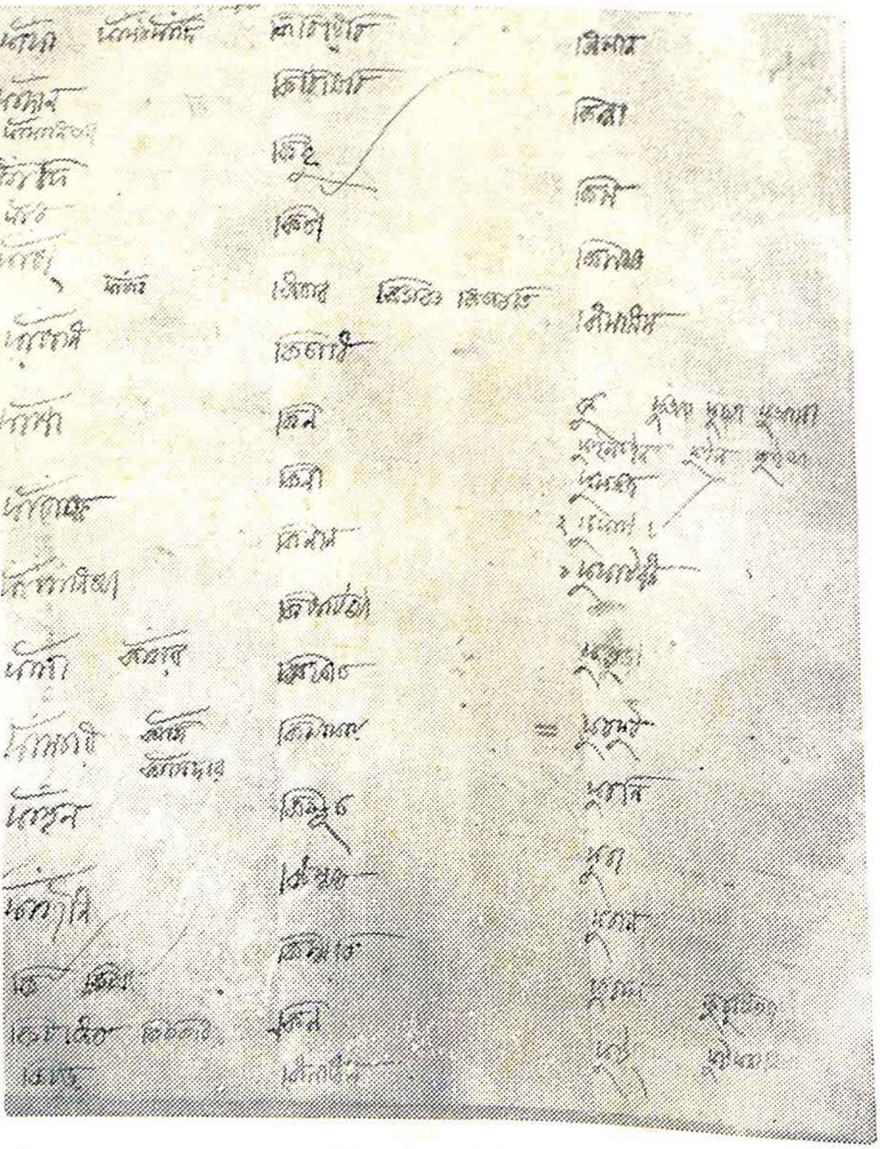
শ্রীচরণারবিন্দেষু—

প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনম্—

পিতৃদেব, এবার মনে করিয়াছিলাম, যে আমার সমস্ত দুঃখের কথা জানাইয়াছি, এক বার মহাশয়ের পদতলে নিপতিত হইয়া আমার ভাঙ্গা কপালের শুভাশুভ ফল স্থির করিয়া লইব। কিন্তু নিষ্ঠুর দৈব হতভাগ্যের ভাঙ্গা কপালকে শতধা বিচূর্ণিত করিয়া দিল।



দিনময়ী দেবী



বিদ্যাসাগর কৃত শব্দ-সংগ্রহের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি। পাণ্ডুলিপিটি বর্তমানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

স্নেহময়ী জননীদেবীকে এ জন্মের মত হারাইয়া সংসারে একবারে অসহায় হইতে হইত, মা মরা ছেলের মত কাঁদিয়া বেড়াইতে হইত, কেবল, দয়াময় পিতৃদেবের সদয় ব্যবহারে প্রকৃতিস্থ হইয়া আছি। মহাশয়ের চরণ ছাড়া হওয়া অবধি মাতৃদেবীর চরণাশ্রিত হইয়া কালযাপন করিতেছিলাম, সুমধুর 'মা' বলিয়া মাকে ডাকিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিতেছিলাম, কিন্তু যখন মা আমার হতভাগ্য পুত্রকে নিরাশ্রয় রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন, যখন সংসার অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলাম, সেই দুঃসময়ে, পিতৃদেব কৃপা বিতরণ করিয়া হতভাগ্য সন্তানকে চরণে আশ্রয় দিলেন। সেই কৃপাবলে এই হতভাগ্য মাতৃশোক সহ্য করিতে পারিতেছে। হতভাগ্যের প্রতি যে এত দূর কৃপা করিবেন, তাহা কি স্বপ্নেও কখনও আশা করিয়াছি? জানিতাম এ জন্মের মত এ হতভাগ্যের ভাগ্যদীপ নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছিল। এবার, আপনার সম্মুখে সাহস করিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি, দোতলার উপরে শুইবার অনুমতি পাইয়াছি, ভরসা করিয়া মহাশয়ের সহিত দুই একটা কথা কহিয়াছি, এক দিন সন্ধ্যার সময় জল খাবার চাহিতেছিলাম, মহাশয় নীচে ছিলেন, শুনিতে পাইয়া হেমলতাকে কহিলেন, ও ভীমি, তোর দাদা জলখাবার চাহিতেছে, কথাগুলি শুনিয়া আমার বিষাদপূর্ণ হৃদয়ও আনন্দে নাচিয়া উঠিল। এই সকল কৃপাদৃষ্টিতে এ হতভাগ্য চরিতার্থ ও কৃতকৃতার্থ হইয়াছে। অন্তরে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহাকে বলে intoxicated with joy আমার তাই হইয়াছে। বহুদিন অনাহারের পর উপাদেয় আহার পাইলে লোকের অন্তরে যেমন একটা অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি জন্মে, ১৪ বৎসরের পর মহাশয়ের শ্রীমুখের বচনামৃত পান করিয়া হতভাগ্যের অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছে। এক একটী কৃপার পরিচয় পাইয়াছি আর আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি। আর কেবল সেই সময় এই ভাবিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে যে যদি এই কৃপাদৃষ্টি আমার দুঃখিনী মা দেখিতে পাইতেন তবে আমার জীবন সার্থক হইত। মা গো! একবার চাহিয়া দেখ মা! তোমার হতভাগা নারায়ণ পিতৃচরণে আশ্রয় পাইয়াছে।...এখন একবার দেখ মা! দয়াময় কর্ত্তা তোমার অন্তিম অনুরোধ রক্ষা করিতেছেন। মা! একবার দেখ, বাবা তোমার জন্য কত ব্যাকুল হইয়াছেন। যতই জননীর স্নেহ ভাবিতেছি ততই হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইতেছে।

আপনি আমার প্রতি যতটুকু কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতেই আমি চরিতার্থ। মরণ কালে ইহা ভাবিয়াও সুখে মরিব, যে পিতৃদেব অপরাধী অনুতাপযুক্ত সন্তানকে ক্ষমা করিয়াছেন, আপনার চরণে ক্ষমারই ভিখারী ছিলাম, কতবার পদতলে পড়িয়া কাঁদিবার বাসনা করিয়াছি। কিন্তু মহাশয় শোকসন্তপ্ত বলিয়া সাহস করি নাই। আমি আর ঐ চরণ ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। আমার হৃদয়ে যে ভাবটী শুষ্ক হইয়াছিল, সেই ভাবটী মহাশয়ের কৃপাদৃষ্টিতে সরস ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। আর কি ছাড়িয়া থাকিতে পারি? আপনাকে কিছুমাত্র বিরক্ত করিব না, কর্ত্তৃত্ব, ধন কিছুরই আশা নাই, আশা, পদতলে পড়িয়া থাকিব। মহাশয়ের তামাক সাজিব, বিছানা করিয়া দিব, জুতো মুছিব, বিদেশ গমন করিলে সঙ্গে মোট বহিয়া যাইব। পবিত্রতম আপনার চরণ ও স্বর্গীয় মাতৃদেবীর চরণ স্মরণ করিয়া জানাইতেছি, আমার মনের অপর বাসনা নাই। মাতাদিনের মত থাকিয়াই আমি সুখী হইব। আপনার বাটীতে যাহাই হউক, আমাকে কেহ লাঞ্ছনা করুক, কাণ

অভাগিনীকে ভুলিয়া গেলে? বাপ্‌রে, এ কথা ভাবতে গেলে যে আমার বুক ফেটে যায়। বাবা ঈশ্বর, আমি যে আর চাতকিনীর মত কোল্‌কেতা থেকে আস্‌বার পথের দিকে চেয়ে থাক্‌তে পারি নাই। আজ ১৮।১৯ বছর হোল তুমি আমাকে ভুলে আছ। আজ ১৮।১৯ বছর তোমার চাঁদ মুখটি দেখ্‌তে পাই নি। বাবা, সকলেই বল্‌ছে বিদ্যাসাগর আর দেশে আস্‌বেন না। তবে কি বাবা, সত্য সত্যই তুমি আমাকে ভুলে গেছ? ঈশ্বর, প্রাণের ধন আমার, তবে কি আমি সত্যই তোমাহারা হোলাম্‌? এতদিন ত' বাপ্‌, তোকে কিছু বলি নি, সবার কথা শুনে শুনে আর যে প্রাণ ধরতে পারি নি বাবা। ঈশ্বর, বাপ্‌ আমার, একবার কোলে এস, মনের সাধ মিটিয়ে চক্ষু ভোরে তোর মুখটি দেখি, ঈশ্বর রে—এ!

বাবা, তোমার দুঃখিনী মায়ের এমন কি দোষ দেখ্‌লে যে, একেবারে নিষ্ঠুর হোয়ে ভুলে বোসে আছ? ঈশ্বর, ছেলের নিকটে আবার মায়ের দোষ আছে কি বাবা? তোর মত দিগ্‌বিজয়ী ছেলে যদি মায়ের দোষকে দোষ বোলে রাগ করে, তবে আর যারা কুপুষ্যি নিয়ে ঘর করে তাদের কি দশা হবে বল্‌ দেখি? বাপ্‌, তুমিই ত' বহিতে লিখে ছেলেদের শিক্ষা দাও, কে একজন দিগ্‌বিজয়ী রাজা মাকে অবোধ ও প্রখরা জেনেও পাছে মায়ের চোখে জল পড়ে, এই জন্য সত্‌ মন্ত্রীর সুমন্ত্রণাও শুন্‌তেন না। তুমি যে, আমার তাদের চেয়েও সদ্‌ গুণের আধার।

আহা। এখন কেবল তোমার জন্যে কাঁদি, আর আগেকার সকল কথা ভাবি। এককালে বাবা, তুমি আমাকে কি সুখীই না করেছিলে? কি ছিলাম আর কি না হয়েছিলাম, যেমন দুঃখ থাকতে হয় তা ছিল, ঈশ্বর আমার সকল দুঃখ ঘুচিয়ে যেমন সুখী কোরতে হয়, তা করেছিল। পরবার কাপড়টুকু পর্যন্ত ছিল না, ঈশ্বর আমার চিরজীবী হোয়ে থাকুক, কত অলঙ্কার পর্যন্ত পরিয়ে ছিল। তা অভাগিনীর কপালে কতদিন সুখ থাকে? আবার যে কাঙ্গালিনী সেই কাঙ্গালিনী হোয়ে বোসে আছি। ঈশ্বর মনে পড়ে কি? প্রথম বারেই কেমন একখানা দামী গয়না দিয়েছিলে? তার জেল্লা কত, গুণ কত। দেশ চাউর হোয়ে গেল, কত লোক, কত সাহেব, কত জমিদার, দেখতে এল। আমার শরীরে আর আহ্লাদ ধরে না, গাঁয়ের মেয়েরা গয়নার নাম জিজ্ঞাসা করে, তা কি কোরে জানব, এ দেশে ত' তখনও সে গয়না ওঠেনি, তুমি কেবল যা একখানি আমাকে দিয়েছিলে। তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে তুমি হাসতে হাসতে বললে, খেপাবেটি। ওর নাম ইস্কুল। ঈশ্বর, মায়ের মাথায় ইস্কুল নামে যে উজ্জ্বল মুকুট পরিয়েছিলে, তার গরবে আমি অঞ্চলটার মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলাম, অঞ্চলশুদ্ধ আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত। আর আর বোনেরা বোলত সার্থক বীরসিংহ। যা হোক বেটা পেটে ধরেছিলি? দিগ্‌বিজয়ী বেটা। তারপর বাবা, বছরকতক পরে দু হাতের দুখানি গয়না দিয়েছিলে। একটির নাম ডাক্তারখানা, আর একটির নাম মেয়ে ইস্কুল। তারপর রাত্রি ইস্কুল প্রভৃতি কত কুচো গয়নাই দিয়েছিলে, তার ঠিকানা নাই। আহা। বাবা, সে এক দিনই গিয়েছে। এক সময় চাষীরা ধান নিড়তে নিড়তে খেনে বনের ভিতরে সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা কোরে অপর চাষীদিগে শুনিয়েছে, বাড়ী বাড়ী পোড়ো ছেলেতে গিস্‌ গিস্‌ কোরত, যেদিকে চাও, সেই দিকেই লেখাপড়ার চর্চা, যেন চারিদিকেই দুর্গোত্‌সবের মেলা। ডাক্তার, মাস্টার, পণ্ডিত হোই হোই কোরত। আর এখন। এখন সকলই অন্ধকার। আমার

থাকিতে শুনিব না, চক্ষু থাকিতে দেখিব না, মা আমাকে কাঙ্গালী করিয়া গিয়াছেন, আমি কাঙ্গালী বেশেই আছি, আর সেই ভাবেই কালযাপন করিব। আপনার পদসেবার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইব, সকল সুখে জলাঞ্জলি দিব, পূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য দেহ ও প্রাণ আপনার চরণে উৎসর্গ করিয়া রাখিব।

আমি আপনাকে আর একটী নিবেদন করিব। যদি এক্ষণে একেবারে নিজের নিকট রাখিতে সম্মত না হয়েন, তবে আপাততঃ অপরের মত আমাকে স্কুলে একটী কিছু হউক কর্ম্ম করিয়া দিন। কর্ম্মপারগতা, ব্যবহার ও চরিত্র দেখিয়া যদি সন্তুষ্ট হয়েন, তখন চরণসেবার অনুমতি করিবেন, আমার তাহা হইলেই দুই বেলা শ্রীচরণ দর্শন ঘটিবে। ফলকথা আমাকে যেরূপে হউক চরণে আশ্রয় দিতেই হইবে। আমার নিজের আফিস্ ও লোকেল বোর্ড আফিস দুইটা আফিসের কার্য্য সুচারুরূপে চালাইয়া মায়ামমতাশূন্য বিদেশীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের মনে সন্তোষ জন্মাইতে পারিতেছি, আর দয়াময় পিতৃদেবের সন্তোষ জন্মাইতে পারিব না? নিষ্কর্ম্মা থাকিতে আমার আর সাহস হয় না। মহাশয়কে ছাড়িয়াও আর থাকিতে পারিব না।

হেমলতা, মাতৃদেবীর গহনা ও বাসনের চাবীকাঠি আমাকে দিতেছিলেন, কিন্তু সে সমস্ত মহাশয়ের চরণে পঁহুছাইয়া দিতে হেমলতাকে বলিয়াছি। ইতি তারিখ ২৮শে ভাদ্র ১২৯৫ সাল।

হতভাগ্য ভৃত্য—
শ্রীনারায়ণ শর্ম্মণঃ"[৩৪]

জীবনের শেষপর্বে বীরসিংহের কথা ভেবে বিদ্যাসাগরের দু-চোখ থেকে ধারায় জল পড়েছে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিদ্যাসাগর বলেছেন—আর সব শেষ হয়েছে।

ডাকে একদিন 'বীরসিংহ-জননীর পত্র' নামে একটি পুস্তিকা এল বিদ্যাসাগরের হাতে। পুস্তিকায় রচয়িতার নাম নেই।*

'বীরসিংহ-জননীর পত্র' আদ্যন্ত উদ্ধার করি :

"স্বস্তি

পরম কল্যাণীয় প্রাণাধিক
শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
জ্যেষ্ঠপুত্র বাবাজীউ চিরজীবিষু।
কলিকাতা।

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং।

শুভাশীর্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ।

বাবা ঈশ্বরচন্দ্র, তুমি কি স্নেহ ও মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া একবারে এ

---

* চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "সেই স্বাক্ষরবিহীন পুস্তিকা নারায়ণ বাবুর রচিত ও প্রেরিত বলিয়া জানা গিয়াছে।" (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪১৩)

ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সকলই গেল। যে সকল বোনেরা আমার সুখের দশা দেখেছিল, গয়না-কাপড় দেখে হিংসাতে ফেটে গেছল, যাদের কাছে মাথা খাড়া কোরে দাঁড়াতাম, সেই বোনেরা আজ আমার দুঃখের দশা দেখে কত বলে। আজ নাকি তাদের ছেলেরা যোগ্যি হয়েছে, দু টাকা রোজকার কোর্তে শিখেছে, গায়ে দুখানা গয়না দিয়েছে, তাই আমার এখন শুধু হাত, ছেঁড়া কাপড়, খড়ি উড়ো গা দেখে বলে, কেন গো বীরসিংহে, তোর সে সব কোথা গেল? তোর ঈশ্বর বরং আগেকার চেয়ে বড় মানুষ হোয়েছে, তার যেমন টাকা তেমনই আছে। তবে তোর এমন দশা কেন গো?

বাবা ঈশ্বর, তুমি আমার অতিশয় মাতৃভক্ত ছেলে ছিলে। আমার কপালের দোষেই আজ তোমাকে হারিয়েছি। আমারই কপালের দোষ নয় ত' কি? তুমি যাদের জন্য জ্বালাতন হোয়ে আমাকে অভাগিনী কোরে গেলে তারা তোমার কাছে যাচ্ছে আসছে, টাকা আনছে, কাপড় আনছে, তাদিগে নিয়ে ত' বেস্ আমোদ আহ্লাদ কোচ্ছ, কেবল কাঙ্গালিনী মাকেই কাঁদিয়ে গেলে? তা তোমার ভাইভগিনীদের প্রতি, তোমার স্নেহমমতার জন্য আমি অসুখী নই, বরং বেঁচেছি। কেন না, তুমি তাদের প্রতিপালন না করলে আমি তাদিগে নিয়ে জড়িয়ে সড়িয়ে মারা পড়তাম। আমি তোমাকে গর্ভে ধোরেই ধরায় ধন্যা হোয়েছি। সেই জন্যেই সময়ে সময়ে বড় বড় সাহেব পর্যন্ত তোর এ অভাগিনী মাকে দেখতে আসে। এখন আমার দেখাবার জিনিষ শোকসন্তপ্ত জীর্ণশীর্ণ কলেবর। বাবা, আয় না, আবার তোকে কোলে কোরে বোসে ছোট বড় সকল লোককে দেখাই।

বাপ্‌রে, যে স্কুলডাঙ্গায় একদিন বেদ পাঠ হোয়েছে, ফুল বাগানে ঝল্‌মল্ কোরেছে, কত সাহেব-সুবো বেড়িয়েছে, তুমি আমার পাত্রমিত্র নিয়ে আলো কোরে বোসেছ, আজ সেই স্কুল-ডাঙ্গা বিষ্ঠা ও গোহাড়ে পরিপূর্ণ। যে বারাণ্ডা বাড়ীতে তুমি আমার দরবার কোরে বোসতে, যেখানে প্রতিদিন শত শত লোককে অকাতরে অন্নদান কোরেছো, যে বাড়ীতে তোমার স্বর্গীয় পিতৃদেব জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে মহোৎসব কোরে গেছেন, সেই ভিটা আজ বাবলা গাছে পরিপূর্ণ।

বাবা, শুনতে পাই যে, অভাগিনী বীরসিংহা মায়ের নাম কোরে নাকি তোমার চক্ষু দিয়া জল পড়ে? বাবা, শুনেও যে কাঙ্গালিনীর প্রাণ ঠাণ্ডা হয় রে। তবে আমার ঈশ্বর আমাকে এখনও ভুলেনি। বাবা, এতদিন ত' চুপ কোরেই কাঁদছিলাম, কিছু ত' বলিনি, তা আর যে, মায়ের প্রাণ থামে না বাপ্। বাবা, পেটের অসুখে নাকি বড় কষ্ট পাচ্ছ, না খেয়েদেয়ে রোগা হয়ে গেছ, মুখটি একবারেই শুকিয়ে গেছে? মা-মাসী-পিসির মায়া ছেড়ে একবার মায়ের কোলে এস না বাবা। মাসী-পিসির ঘরে যতই আদর হোগ, বাবা, মায়ের গুণ দুগ্ধের মত মিষ্ট ও গুণকারী আর কিছুই নাই জানবে। একবার এস বাপ্। দশ দিন আমার কাছে থেকে দেখ না, তোমার ঢের অসুখ সেরে যাবে। আমি তোমার ধাতু নাড়ী যেমন জানব তেমন তোমার কলিকাতা মাসী কি জানবে?

বাবা ঈশ্বর, তুমি যে আমার এ পুকুর ও পুকুর দেখতে, এ গাছতলায় ও গাছতলায় বোসতে ভালবাসতে, সে সব একবারে কি কোরে ভুলে আছ বাবা? বাবা, সে সকলই আছে, কেবল তোমা বিনে আমার সকলই আঁধার। বাবা রামচন্দ্র, তোমার অযোধ্যাপুরী একবারে যে অন্ধকার বাবা, আর

বনবাস কেন বাপু, চোদ্দ বছর ছেড়ে আজ যে ১৮।১৯ বছর হোয়ে গেল। এবার এস বাপু, একবার অক্ষম অকৃতজ্ঞ ভাইগুলোকে চারিদিকে নিয়ে বোস, দেখে চক্ষুসার্থক করি। বাবা, ভাগ্যবান দশরথ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু পাষাণী কৌশল্যা মরেনি, পতিশোক পর্যন্ত পাসরে ছেলের চাঁদমুখটি মাত্র দেখবার জন্য বেঁচেছিল। বাবা, আমি কোন্ মহাপাপে তোর চাঁদমুখ দেখতে বঞ্চিত থাকব?

মেয়েমানুষের মন, চুপ কোরে থাকতে পারিনি; বলি বাবা, তোমার কোলকেতা মাসীকে নাকি একখানা ভারি জড়োয়া গয়না দিয়েছ? তার নামটি নাকি, কালেজ বিল্ডিং? তা বেশ কোরেছ। তুমি যাতে মনের সুখে থাকবে তাই আমার ভাল, তা ছাড়া যে যেমন তপিস্যি করেছে। তা বাবা, বলি কি আর কিছু নয়, কাঙালিনী মাকে কি একজোড়া শাঁকা দিয়েও ভরম রাখতে নাই। বাবা, তুমি সুপণ্ডিত, দেশে-বিদেশের লোকে তোমার নিকটে সুপরামর্শ লইতে আসে। দেখ, এক মায়ের গর্ভে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির সন্তান জন্মে, কেহ দেবতুল্য হয়, কেহ কেহ বা অধম পশুবত্ হয়, আর ভাই ভাই বিবাদও চিরকালই আছে, তা বোলে বাবা, কোন্ ছেলে কোন কালে ভেয়েদের উপর রাগ কোরে মাকে পরিত্যাগ করে যায়? তোমার মত পণ্ডিত বিশ্ব বাঙ্গালায় নাই। তোমরাই বল জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়।

বাবা ঈশ্বর, বোলতে বোলতে পাগলের মত কত কি বোলে ফেলেছি। রাগ কোরিস নি বাবা, তোর জন্য ভেবে ভেবে আমার আর সামাই সুসার নাই। আমার কপালে যাই থাকুক, তোর ভাই-ভগিনীদিগে যে প্রতিপালন করছিস, তাই আমার পরম ভাগ্য। এখন বাপ, একবার এসে দেখা দে। এই সময় আয় বাবা। এরপর এলে আর চোখে দেখতে পাব না। তোর জন্য কেঁদে কেঁদে এখনই দেখতে পাইনি; যে মেয়ে দিগ্‌বিজয়ী বেটা পেটে ধোরেছে, সেই অভাগিনীকেই বেটার জন্য কাঁদতে হোয়েছে। সুনীতি ধ্রুবের জন্য কেঁদেছে, কৌশল্যা রামের জন্য কেঁদেছে, আমাকেও তোমার জন্য কাঁদতে হোচ্ছে। তাদের ছেলেরা তাদের মাকে একবারে বিসর্জন দিয়ে কাঁদায় নি, তাদের ছেলেরা মা-বাপের কথা ঠেলতে পারে নাই, তুমি বাবা, আমার এই কথাটি রাখ, এক এক বার আমাকে দেখা দিয়ে যাও। আমি গয়নাপাতির জন্য তোমাকে বিরক্ত কোরব না। কেবল কোলে কোরে প্রাণ শীতল কোরব।

জগদীশ্বর! আমার কপালে যাই কর, আমার প্রাণের ঈশ্বরকে চিরজীবী কোরে রাখ। কল্যাণর্মিতি। সন ১২৯৬ সাল, তাং ১৫ই অগ্রহায়ণ।

শুভাকাঙ্ক্ষণী কাঙালিনী
তোমার বীরসিংহা জননী।”[৩৩]

চিরদিনের জন্য বীরসিংহ ছেড়ে এসেছেন বিদ্যাসাগর, কিন্তু একদিনের জন্যও বীরসিংহের কথা ভোলেননি। বিহারীলাল সরকার লিখেছেন: “বিদ্যাসাগর একদিনের জন্য জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রাম বিস্মৃত হন নাই। ১৮।১৯ বৎসর তিনি বীরসিংহ গ্রামে গমন করেন নাই বটে; কিন্তু বীরসিংহের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এক দিন তিনি কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, উপরে উঠিতেছিলেন, সে সময় বীরসিংহ গ্রাম হইতে প্রেরিত একখানি মুদ্রিত ক্ষুদ্র পুস্তক তাঁহার হস্তগত হয়। স্বয়ং বীরসিংহের জননী যেন কাতর-কণ্ঠে বিদ্যাসাগরকে উদ্দেশ করিয়া সেই পুস্তক লিখিয়াছেন।

সে পুস্তক পাঠ করিতে করিতে বিদ্যাসাগর অজস্রধারে অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন।"[৩৬]

কেবল জন্মভূমি বীরসিংহ নয়, বিদ্যাসাগর একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রকেও ত্যাগ করেছেন। কিন্তু এই সূত্রে অন্ততপক্ষে একদিনের একটি করুণ ঘটনা আছে। নারায়ণচন্দ্রের ফটো দেখে একদিন চোখের জলে আকুল হয়েছেন বিদ্যাসাগর।[৩৭]

উনিশ

না, আত্মীয়-বান্ধবের কাছে সহৃদয় ব্যবহার বিদ্যাসাগর পাননি। ১৮৮১ সালের ২৭-জানুআরি প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর কাছে একখানা চিঠিতে আক্ষেপ করে লিখেছেন: "আমার আত্মীয়েরা আমার পক্ষে বড় নির্দয়; সামান্য অপরাধ ধরিয়া অথবা অপরাধ কল্পনা করিয়া আমায় নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন।"[১]

বিদ্যাসাগরের দয়ায় একজন বাবু উঁচুদরের সরকারী চাকরি পেয়েছেন। নামডাক আছে সেই বাবুর, কিন্তু তাঁর নাম বলা যাবে না। তাঁর কাছে বিদ্যাসাগরের চিঠি নিয়ে একটি লোক এসেছে।

বাবু তখন সোফায় বসে আলবোলায় তামাক খাচ্ছিলেন। ইয়ার-বন্ধুরা বসে আছেন চারদিকে। বিদ্যাসাগরের চিঠিখানা পড়ে বাবু তামাক টানতে-টানতে একটুখানি হাসলেন।

ইয়ার-বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলেন—ব্যাপার কি?

বাবু বললেন—ব্যাপার আর কি। বিদ্যাসাগর ব্যবসা ধরেছে। চাকরি করে দাও!

বিদ্যাসাগরের চিঠি নিয়ে যে এসেছে, বাবুর কথা শুনে সে অবাক হয়ে রইল। তারপর চুপচাপ চলে গেল।

সব কথা শুনলেন বিদ্যাসাগর।

এক সরকারী আপিসে লোক নেবে। প্রিয়নাথ দত্ত সেই আপিসের একজন বড়বাবু। উঁচুদরের সরকারী চাকুরের কাছে বিদ্যাসাগরের চিঠি নিয়ে চাকরির উমেদারি করতে গিয়ে যে-লোকটি চুপচাপ ফিরে এসেছিল, সে আবার এল বিদ্যাসাগরের কাছে। আবার একখানা চিঠি চাই, বিদ্যাসাগরের একখানা চিঠি নিয়ে সে এবার প্রিয়নাথ দত্তের কাছে চাকরির উমেদারি করতে যাবে।

কিন্তু প্রিয়নাথ দত্তকে একবিন্দু চেনেন না বিদ্যাসাগর, এক কণা আলাপ নেই তাঁর সঙ্গে। কেমন করে বিদ্যাসাগর তাঁকে চিঠি লিখবেন, এই লোকটিকে চাকরি দিতে বলবেন।

কিন্তু লোকটি নিতান্ত নাছোড়বান্দা। অগত্যা বিদ্যাসাগর অচেনা-অজানা প্রিয়নাথ দত্তকে একখানা চিঠি লিখে দিলেন।

আশ্চর্য কান্ড, এবার কাজ হল। উপরালাকে বলে-কয়ে প্রিয়নাথ দত্ত সেই লোকটিকে একটা চাকরি দিলেন।

খবর শুনে বিদ্যাসাগর বললেন—বিচিত্র সংসার! যার উপকার করেছি সে আমার কথা রাখল না। আর, উপকার করা তো দূরের কথা, যাঁর সঙ্গে আমার আলাপ পর্যন্ত নেই, তিনি আমার মান রাখলেন।[২]

তারানাথ তর্কবাচস্পতির নাম মনে এসে যাচ্ছে। বিদ্যাসাগরের দৌলতেই সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের তক্তে বসেছেন তারানাথ তর্কবাচস্পতি। সেসব কথা তর্কবাচস্পতি এককালে বিন্দুমাত্র মনে রাখেননি।

পাইকপাড়ার রাজবাড়িতে খুব জাকজমক করে একটা শ্রাদ্ধ হচ্ছে। সেই শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণপন্ডিত বিদায়ের কর্তা হলেন তারানাথ তর্কবাচস্পতি।

পণ্ডিতবিদায়ের ফর্দে রাজকুমার ন্যায়রত্নের নামে আট টাকা লিখে রাখলেন তারানাথ। অর্থাৎ, রাজকুমার ন্যায়রত্ন আট টাকা বিদায় পাবেন।

ফর্দ দেখে বিদ্যাসাগর বললেন—ন্যায়রত্নের পক্ষে অবিবেচনা হয়েছে।

বলে বিদ্যাসাগর আট টাকার জায়গায় বারো টাকা করে দিলেন। অর্থাৎ, রাজকুমার ন্যায়রত্ন বারো টাকা বিদায় পাবেন।

বিদায়কালে রাজকুমার ন্যায়রত্ন বারো টাকা পেলেন। বারো টাকা পেয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন—উচিত বিবেচনা হয়নি।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি তখন একটা আশ্চর্য কথা বললেন। বললেন—বললে বিদ্যাসাগর বিরক্ত হবেন, কিন্তু না বললে নয়, এজন্য বলতে হল। আমার বিবেচনায় ন্যায়রত্ন এর চেয়ে বেশি পেতে পারেন। কিন্তু আমি যে-পক্ষ, ন্যায়রত্নও সেই পক্ষ; অর্থাৎ আমি বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ বইয়ের উত্তর লিখেছি, ন্যায়রত্নও লিখেছেন। সেই অপরাধে বিদ্যাসাগর রাগ করে ন্যায়রত্নের বিদায় কমিয়ে দিয়েছেন।[৩]

বিদ্যাসাগরের নামে অক্লেশে ডাহা মিথ্যেকথা বললেন তারানাথ তর্কবাচস্পতি। অথচ, এই তারানাথ তর্কবাচস্পতির জন্য এককালে বিপুল স্বার্থত্যাগ করেছেন বিদ্যাসাগর।

সেসময়ে বিদ্যাসাগর পঞ্চাশ টাকা মাইনেয় চাকরি করেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের চাকরি খালি হল একটা। মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরকে সেই চাকরি নিতে বলেছেন। সেই চাকরি নিলে মাইনে অনেক বেড়ে যেত, কিন্তু বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সেই চাকরি নেননি। তারানাথ তর্কবাচস্পতি যাতে সেই চাকরিতে বহাল হতে পারেন, বিদ্যাসাগর বরং সেই চেষ্টা করেছেন।

তারানাথ তখন কলকাতায় ছিলেন না, অম্বিকা-কালনায় ছিলেন। চিঠি লিখলে পাছে দেরি হয়ে যায়, বিদ্যাসাগর তাই সারারাত হেঁটে কলকাতা থেকে কালনায় তারানাথ তর্কবাচস্পতির বাড়িতে গিয়েছিলেন।[৪] বিদ্যাসাগরের অদ্ভুত চেষ্টা ও কষ্টের ফলেই তারানাথ তর্কবাচস্পতি অধ্যাপকের তক্তে বসেছেন। তারানাথের মান-সম্ভ্রম খ্যাতি-প্রতিপত্তি—সকলের মূল বিদ্যাসাগর।

সেসব পুরোনো কথা তারানাথ ভুলে গেছেন। বিদ্যাসাগরের যাতে মর্মান্তিক হয়, সে-চেষ্টায় এককালে তাঁর বিন্দুমাত্র আলস্য দেখা যায়নি।*[৫]

---

* তারানাথ তর্কবাচস্পতি ১৮৪৫ সালের ২৩-জানুআরি নব্বুই টাকা মাইনেয় সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন। ১৮৭৩ সালের ৩১-ডিসেম্বর পর্যন্ত অধ্যাপনা করে তারানাথ বাষট্টি বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর নিয়েছেন, সেসময়ে তাঁর মাইনে ছিল দেড়শো টাকা। তাছাড়া তারানাথ ১৮৪৭ সালের ১৭-জুলাই থেকে ৩০-নভেম্বর পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজে অস্থায়ীভাবে সহকারী সম্পাদকের কাজ করেছেন। ১৮৮৫ সালের ২০-জুন তারানাথ লোকান্তরিত হয়েছেন। ১৮৭৪ সালের ১-জানুআরি থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তারানাথ মাসিক ৭০৲১০ পেনসন পেয়েছেন।

বিদ্যাসাগর 'অতি অল্প হইল' ও 'আবার অতি অল্প হইল' নামক বেনামী রচনায় তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবদ্দশায় তারানাথ তর্কবাচস্পতি সম্পর্কে বিস্তর কটূক্তি করেছেন: অহঙ্কারী; পণ্ডিতমূর্খ; বুদ্ধিশুদ্ধিহীন; অতি অপদার্থ; অতি অর্বাচীন; বেহুদা পণ্ডিত; দুইপদবিশিষ্ট জন্তু; লজ্জা সরম কম; গায়ে মানুষের চামড়া নাই; মানুষকে মানুষ জ্ঞান করেন না; লঘুচিত্ত ও বক্কেশ্বর; প্রকৃত বক্কেশ্বর; প্রকৃতরূপ বিদ্যা ও ব্যুৎপত্তি নাই, কেবল লোকের চক্ষে ধূলিপ্রক্ষেপ করিয়া, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছেন।

সূর্যকুমার সর্বাধিকারী বলেছেন—বিদ্যাসাগর মশাই না থাকলে আমি ডাক্তার হতে পারতুম না।

কথাটা বিদ্যাসাগরের কানে গেল। শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন—আমি আশা করিনি যে সে একথা বলবে।[৬]

কারো মুখ থেকে বিদ্যাসাগর কৃতজ্ঞতার ভাষা আশা করতে ভুলে গিয়েছিলেন।

কত মানুষের কত উপকার করেছেন বিদ্যাসাগর। যাঁদের উপকার করেছেন, তাঁদের মধ্যেও বিদ্যাসাগরের নিন্দুকের অভাব হয়নি। জীবনের শেষ দশায় বিদ্যাসাগরের মনে হয়েছে, যাঁরা উপকৃত হয় তাঁরাই নিন্দা করে।

মানবচরিত্র বিষয়ে বিদ্যাসাগরের বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে আছে। সেই অভিজ্ঞতার কথা তাঁর রচনাতেও প্রতিফলিত : “মানবজাতি নিরতিশয় কুৎসাপ্রিয়; লোকের কুৎসা করিবার নিমিত্ত কত অমূলক গল্পের কল্পনা করে, এবং কল্পিত গল্পের আকর্ষণীশক্তির সম্পাদনের নিমিত্ত উহাতে কত অলঙ্কার যোজিত করিয়া দেয়। যদি কোনও ব্যক্তির প্রশংসা করিবার সহস্র হেতু থাকে, অধিকাংশ লোকে ভুলিয়াও সেদিকে দৃষ্টিপাত করে না; কিন্তু কুৎসা করিবার অণুমাত্র সোপান পাইলে মনের আমোদে সেই দিকে ধাবমান হয়। আপনি নিতান্ত অমায়িক; মনে ভাবেন কখনও কাহারও অপকার করেন নাই, যথাশক্তি সকলের হিতচেষ্টা করিয়া থাকেন; সুতরাং কেহ আপনকার বিপক্ষ ও বিদ্বেষী নাই; সকলেই আপনকার আত্মীয় ও হিতৈষী। কিন্তু আপনকার সে সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। আপনি প্রাণপণে যাঁহাদের উপকার করিয়াছেন, এবং যে-সকল ব্যক্তিকে আত্মীয় বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই আপনকার বিষম বিদ্বেষী। ঐসকল ব্যক্তি আপনকার যার পর নাই কুৎসা করিয়া বেড়ান।”[৭]

কে একজন নিন্দা করেছে বিদ্যাসাগরের নামে? সে-খবর কানে এলে বিদ্যাসাগর রঙ্গ করে বলতেন—রও, ভেবে দেখি, সে আমার নিন্দা করবে কেন? আমি তো কখনো তার কোনো উপকার করিনি![৮]

বিদ্যাসাগরের ‘কথামালা’য় ‘অশ্ব ও বৃদ্ধ কৃষক’ নামে একটি রচনা আছে :

“এক কৃষকের এক টাটু ঘোড়া ছিল। সে, একদিন আপন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ঐ ঘোড়া বাজারে বেচিতে যাইতেছে। সে সময়ে ঐ পথ দিয়া কতকগুলি বালক হাস্য ও কৌতুক করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন, কৃষক ও তাহার পুত্রের উল্লেখ করিয়া, আপনার সহচরদিগকে বলিল, তোমরা ইহাদের মত নির্বোধ কখনও দেখ নাই। অনায়াসে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে পারে; না যাইয়া আপনারা ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতেছে।

বৃদ্ধ, বালকের উপহাসবাক্য শুনিয়া, পুত্রকে ঘোড়ায় চড়াইয়া দিল, আপনি সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পথের ধারে কয়েকজন বৃদ্ধ, কোনও বিষয়ে, বাদানুবাদ করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন, কৃষকের পুত্রকে ঘোড়ায় চড়িয়া আর কৃষককে ঘোড়ার সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতে দেখিয়া, বলিলেন, দেখ, আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহা যথার্থ কি না। এ কালে বৃদ্ধের সম্মান নাই; ঐ দেখ, বেটা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে, আর বুড়া বাপ সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া যাইতেছে। এই বলিয়া, তিনি কৃষকের পুত্রকে ধমকাইয়া বলিলেন, আরে পাপিষ্ঠ, বৃদ্ধ পিতা চলিয়া যাইতেছেন, আর তুই ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিস; তোর কিছুই বিবেচনা নাই?

কৃষকের পুত্র অতিশয় লজ্জিত হইল, এবং আপনি ঘোড়া হইতে নামিয়া, পিতাকে চড়াইয়া লইয়া চলিল। খানিক দূর গেলে পর কতকগুলি স্ত্রীলোক উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল, কে জানে এ মিন্সের কেমন আক্কেল; আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে, আর ছোট ছেলেটিকে হাঁটাইয়া লইয়া যাইতেছে। বৃদ্ধ শুনিয়া, লজ্জিত হইয়া, পুত্রকে ঘোড়ায় চড়াইয়া লইল।

এইরূপে খানিক দূরে গেলে পর এক ব্যক্তি কৃষককে বলিল, অহে ভাই, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, এ ঘোড়াটি কার? কৃষক বলিল, ও আমার ঘোড়া। তখন সেই ব্যক্তি বলিল, তোমার আচরণ দেখিয়া তোমার বোধ হইতেছে না। তোমার হইলে, তুমি উহার উপর এত নির্দ্দয় হইতে না। কোন বিবেচনায়, এমন ছোট ঘোড়ার উপর দুইজনে চড়িয়া বসিয়াছ? ঘোড়াকে এতক্ষণ যেমন কষ্ট দিয়াছ, অতঃপর উহাকে কাঁধে করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত।

এই ভর্ৎসনা শুনিয়া, তাহারা পিতা পুত্রে ঘোড়া হইতে নামিল, দড়ি দিয়া ঘোড়ার পা বাঁধিল, এবং পায়ের ভিতর বাঁশ দিয়া, কাঁধে করিয়া লইয়া চলিল। বাজারের নিকট একটি খাল ছিল। তাহারা ঐ খালের পুলের উপর উঠিলে, বাজারের লোকে এই তামাসা দেখিতে উপস্থিত হইল। মানুষে জীয়ন্ত ঘোড়া কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়া, সকল লোকে এত হাসি তামাসা করিতে ও হাততালি দিতে লাগিল যে, ঘোড়া ভয় পাইয়া, জোর করিয়া, পায়ের দড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিল, এবং দড়ি ছিঁড়িবামাত্র, খালের জলে পড়িয়া, অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিল।

কৃষক লোকের ঠাট্টা তামাসায় যৎপরোনাস্তি বিরক্ত ও লজ্জিত হইল, এবং হতবুদ্ধি হইয়া, কিয়ৎক্ষণ সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে, এই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল, আমি সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পাইয়া, কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না; লাভের মধ্যে ঘোড়াটি গেল।"

এই রচনার কথা তুলে বিদ্যাসাগর এককালে দুঃখ করে বলেছেন—সন্তুষ্ট কাউকেই করতে পারলাম না। আমার কথামালায় যে বৃদ্ধ ও ঘোটকের গল্প আছে, আমি সেই বৃদ্ধ।[৯]

C. E. Buckland লিখেছেন: "Though persecuted for his reform movements he (Vidyasagar) never lost heart but maintained his faith in the ultimate triumph of Truth and Justice." [১০]

উত্তরকালে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ লিখেছেন: "আসলে বিদ্যাসাগর দেবত্ব ও ব্রাহ্মণ্যের সকল গৌরব-বর্জ্জিত ভাবে মানুষকে মানুষরূপেই মহৎ ও মহনীয় দেখিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাহা চাহিয়াছিলেন বলিয়াই এই গুরু ও শালগ্রামশিলার দেশে তাঁহাকে অপরিসীম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। অকারণ আঘাতে আঘাতে তাঁহার কুসুম-কোমল মন পাষাণ-কঠোর হইয়া উঠিয়াছে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে সন্দেহ ও অবিশ্বাস করিয়াছেন, কিন্তু এই অসহায় নিপীড়িত সমাজের জন্য তাঁহার কল্যাণ-হস্তকে নিরস্ত করেন নাই; বিদ্যাসাগর-চরিত্রে এই মানব-প্রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বস্তু।"[১১]

কত লোক 'দেব' বলে টাকা নিয়ে চলে গেছে, টাকা ফেরত দেওয়া তো দূরের কথা, আর দেখা পর্যন্ত দেয়নি। ফেরত দেবার যাঁদের সামর্থ্য নেই তাঁদের কথা না হয় ছেড়ে দেওয়া গেল, যাঁদের সামর্থ্য আছে তাঁরাও সবসময় বিদ্যাসাগরের ধার শোধ করেননি।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন :

"...গঙ্গাদাসপুর নিবাসী তারাচাঁদ সরকার, রাধানগর নিবাসী বাবু রামকমল মিশ্রের ও গঙ্গাদাসপুর নিবাসী বাবু গোরাচাঁদ দত্তের নামে কলিকাতাস্থ আদালতে অভিযোগ করিয়া ৫০০৲ টাকা আদায় করেন। যে দিবস উহাদিগকে ওয়রেণ্টদ্বারা গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়, উহারা নিরুপায় হইয়া পিয়াদা সহ পটলডাঙ্গাস্থ বাবু শ্যামাচরণ বিশ্বাসের ভবনে অগ্রজের (বিদ্যাসাগর) সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে ঐ দায় হইতে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। অগ্রজ মহাশয় নিজের টাকা না থাকা প্রযুক্ত তৎক্ষণাৎ তথায় উপবিষ্ট বাবু রাখাল মিত্রের নিকট খত লেখাইয়া ও স্বয়ং সাক্ষী হইয়া ৫০০৲ টাকা উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে দেওয়াইয়া তাহাদিগকে ঋণদায় হইতে মুক্ত করেন। পরে ইহারা ঐ টাকা পরিশোধ না করাতে রাখাল বাবুর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে অগ্রজ সুদসহ ৮০০৲ টাকা তাঁহার পত্নীকে পরিশোধ দিয়া ঐ খত খালাস করেন। দাদা খতে কেবল সাক্ষী মাত্র ছিলেন, উত্তমর্ণ দাদার খাতিরে টাকা দেন, একারণ তাঁহাকেই চাহিয়াছিলেন। উক্ত অধমর্ণদ্বয় আর কখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। শুনিতেছি তাহাদের উভয়েরই মৃত্যু হইয়াছে এবং উভয়েরই বিলক্ষণ ভূমিসম্পত্তি আছে।

এক সময়ে পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার বিপদে পড়িয়া, বিষণ্ন বদনে দাদার নিকট আসিয়া বলেন, মহাশয় অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছি, পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই, যদি অনুগ্রহ করিয়া ৫০০৲ টাকা ধার দেন তাহা হইলে এ যাত্রা পরিত্রাণ পাই নচেৎ আমায় আত্মহত্যা করিতে হয়। শুনিয়া অগ্রজ অতিশয় দুঃখিত হইলেন। নিজের টাকা না থাকা প্রযুক্ত অপরের নিকট ঋণ করিয়া ৫০০৲ টাকা দিলেন তাহার পর এই দীর্ঘকালের মধ্যে জগন্মোহন তাঁহার সহিত আর কখন সাক্ষাৎ করিলেন না।...

অগ্রজ মহাশয় কেবল দরিদ্রগণকে সাহায্য করিতেন এমত নহে, বন্ধু-বান্ধবেরা বিপদে পড়িলে তিনি অকাতরে অর্থসাহায্য করিতেন। ঐ সকল টাকা পরে ফেরত পাইব কখন এমত আশা করিতেন না ও চাহিতেন না। তিনি এই মনে করিতেন যে, আমি বন্ধুদিগের বিপদে সাহায্য করিতেছি, পরে তাঁহাদের সময় ভাল হইলে, ইচ্ছা হয়, তাঁহারা স্বয়ং প্রত্যর্পণ করিবেন। দুঃখের বিষয় এই যে, দুই এক জন ভিন্ন কেহই তাহা ফেরৎ দেন নাই। কিন্তু দাদাও তাহাদিগকে কখনও টাকার কথা বলেন নাই।"[১২]

একবার একটা আশ্চর্য কাণ্ড হল।

কৈলাসচন্দ্র বসু বিদ্যাসাগরের চেনা-জানা ভদ্রলোক। কৈলাসচন্দ্র একজন বন্ধুকে নিয়ে একদিন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে এসে উপস্থিত। বন্ধুটি নাটোরের দারোগা।

কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বললেন—আমার এই বন্ধুটি বড়ো বিপদে পড়েছেন। নির্দোষ হয়েও ইনি এক মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন, ভদ্রলোকের মিছামিছি ছ-মাসের জেলের হুকুম হয়েছে। অগত্যা ইনি হাইকোর্টে মোশান করেছেন, সাতশো টাকা ফি-তে মনোমোহন ঘোষকে ব্যারিষ্টার লাগিয়েছেন। বাড়ি থেকে কাল টাকা আসার কথা ছিল, কিন্তু আসেনি। আজ প্রথম শুনানির দিন। আপনি দয়া করে ঘোষ মশায়কে একটু চিঠি লিখে দিন, আজকের কাজটুকু যেন উনি টাকা বাকি রেখে করেন, টাকা এলেই ওঁকে দিয়ে দেওয়া হবে। টাকা এক সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয়ই আসবে।

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন বিদ্যাসাগর। তারপর বললেন—একজনের এক পা জেলে আরেক পা বাইরে, তার টাকা বাকি রেখে আমি ঘোষকে কাজ করতে বলব কেমন করে? ঘোষই বা কী মনে করবেন? আমি পারব না, এ-কাজ আমাকে দিয়ে হবে না।

বিদ্যাসাগরের কথা শুনে দারোগাবাবু কেঁদে ফেললেন। বললেন—শুনেছি, কোথাও যার কূল-কিনারা হয় না, সে আপনার এখানে এসে আশ্রয় পায়। আমার তাও রইল না।

একজন বিপন্নের আর্তস্বরটুকু ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছল। বিদ্যাসাগর বিচলিত হলেন। যে-কাজ তাঁকে দিয়ে হবার নয়, সেই কাজেই হাত দিলেন। মনোমোহন ঘোষকে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলেন। 'মাই ডিয়ার ঘোষ' পর্যন্ত লিখে ফেললেন। তারপর কলম আর চলে না। সব চুপচাপ। মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে। 'মাই ডিয়ার ঘোষ' পর্যন্ত লেখা হয়েছে, আর একটি অক্ষরও লেখা হয়নি তারপর। শেষপর্যন্ত বিদ্যাসাগর বললেন—না, এ-কাজ আমাকে দিয়ে হবে না।

দারোগাবাবু তখন কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—তবে কি আমি জেলেই যাব?

সামান্য একটি প্রশ্নে বিদ্যাসাগরের দু-চোখ জলে ভরে উঠল।

কিন্তু বিদ্যাসাগরের হাতে তখন টাকা নেই। না, ব্যাঙ্কেও নেই। তবুও বাক্স থেকে ব্যাঙ্কের চেকবই বের করলেন বিদ্যাসাগর। সাতশো টাকার একখানা চেক দিলেন দারোগাবাবুর হাতে। বললেন—দ্যাখো, ব্যাঙ্কেও আমার টাকা নেই। এই চেকখানা ঘোষকে দিয়ে বলো, উনি যেন কাল সাড়ে এগারোটার আগে এই চেক ব্যাঙ্কে না পাঠান।

হাইকোর্টের বিচারে দারোগাবাবু খালাস পেয়ে গেলেন। চারদিনের দিন সাতশো টাকা নিয়ে তিনি এলেন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে। সঙ্গে কৈলাসচন্দ্র আছেন।

বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করে দারোগাবাবু সাতশো টাকা রাখলেন তাঁর সামনে। হাসিমুখে বললেন—হাইকোর্টের বিচারে আমি খালাস পেয়েছি। আর আজ সকালবেলা বাড়ি থেকে টাকাও এসে গেছে। তাই আমার খালাসের সংবাদ আর আপনার সাতশো টাকা দিতে এলাম।

বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই খুশি হবেন, দু-একটা মিষ্টি কথা বলবেন—এই আশায় দারোগাবাবু আর কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু কোথায়!

বিদ্যাসাগর দারোগাবাবুকে বললেন—তুমি ভদ্রসন্তান হয়ে আমাকে বঞ্চনা করলে?

তারপর কৈলাসচন্দ্রকে বললেন—আমার চেনা-জানা হয়েও তুমি আমার সঙ্গে চাতুরী করলে?

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দু-জনে। হয়তো ভাবতে লাগলেন, কখন বিদ্যাসাগরকে বঞ্চনা করা হল, কোন মুহূর্তে চাতুরী করা হল তাঁর সঙ্গে।

খানিকক্ষণ বাদে বিদ্যাসাগর দারোগাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি না বলেছিলে, তুমি পুলিসে চাকরি করো?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

বিদ্যাসাগর বললেন—না, একথা কিছুতেই সত্য হতে পারে না। তুমি মিথ্যে বলেছ।

—আজ্ঞে, না। খোঁজ করলেই জানতে পারবেন, আমি নাটোরের পুলিস সাব-ইনস্পেক্টর।

এতক্ষণে কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথার ভঙ্গি থেকে অনুমান করলেন, নিশ্চয়ই কোথাও কিছু রহস্য আছে, নিশ্চয়ই বিদ্যাসাগর রাগ করেননি। কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বললেন—আপনি কি বলতে চান বলুন তো। আমরা আপনাকে মিথ্যে কথা বলেছি মনে করছেন কেন?

বিদ্যাসাগর হাসলেন। বললেন—মিথ্যে কথা ছাড়া আর কি মনে করব? কত লোক আমার থেকে 'দেব' বলে টাকা নিয়ে গিয়েছে, টাকা ফেরত দেওয়া তো দূরের কথা, আর দেখা পর্যন্ত দেয়নি। গরীবদের কথা না হয় ছেড়ে দিচ্ছি, টাকাঅলা লোকেরা পর্যন্ত সবসময় ধার শোধ করেনি। যে-দেশে নিলে আর দিতে চায় না, সে-দেশে পুলিসের দারোগা হয়ে একজন সাত দিনের কড়ারে টাকা নিয়ে চারদিনের দিন ফেরত দিতে এসেছে, একথা কেমন করে বিশ্বাস করি?

কৈলাসচন্দ্র আর দারোগাবাবু মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের বসতে বললেন বিদ্যাসাগর। তারপর দারোগাবাবুকে বললেন—হাইকোর্টের জজেরা অনেক সময় মামলা না বুঝে আসামীকে ছেড়ে দেয়; তোমার ব্যাপারেও দেখছি তাই হয়েছে। তোমার তো জেলে যাওয়াই উচিত ছিল। সাতদিনের কড়ারে টাকা নিয়ে চারদিনের দিন যে ফেরত দেয়, দারোগাগিরি করে সে জেলে যাবে না তো জেলে যাবে কে?[১৩]

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:

"দীর্ঘকাল ধরিয়া লোকের প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, মিথ্যাচরণ প্রভৃতি দেখিয়া মানুষের আচরণের প্রতি তাঁহার (বিদ্যাসাগর) এক প্রকার বিজাতীয় ঘৃণার সঞ্চার হইয়াছিল। একদিকে প্রেমিকহৃদয় বিদ্যাসাগর মহাশয় মানবের প্রতি মহাপ্রেমে অনুপ্রাণিত, অপরদিকে মানুষের আচরণে ভগ্নহৃদয় ও বিশ্বাস-বিহীন!...

বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবনের শেষ দশায় অতি আর্ত্তভাবে নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "এদেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিবিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাত পুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নূতন মানুষের চাষ করিতে পারিলে, তবে এ দেশের ভাল হয়।..."

জীবনের শেষপর্বে বিদ্যাসাগর বলেছেন—আগে সকল লোককে সৎ বলে মনে করতাম। কিন্তু সরলভাবে লোককে বিশ্বাস করে এ-জীবনে পদে পদে প্রবঞ্চিত হয়েছি। শেষে দেখি যে 'ঠক বাছতে গাঁ ওজর,' কেউ আর বাদ যায় না। আমি আগে ছিলাম মতিলাল শীল, এখন হয়েছি দ্বারকানাথ ঠাকুর।

এখানে একটু টীকা দরকার। দ্বারকানাথ ঠাকুর অচেনা-অজানা লোককে গোড়াতেই সৎ বলে ধরে নিতেন না; কিন্তু মতিলাল শীল অন্যরকম, অচেনা-অজানা লোককেও সৎ বলে ধরে নিতেন।[১৪]

বিদ্যাসাগরের মতো অসামান্য মানবপ্রেমিকও বহু দুঃখে জীবনের শেষ পর্বে কিয়ৎ পরিমাণে মানববিদ্বেষী হয়ে উঠেছেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন: শেষাশেষি বিদ্যাসাগর কতকটা misanthrope নরজাতিদ্বেষী হইয়াছিলেন। বিস্তর লোকের ব্যবহার তাঁহার প্রতি এরূপ কদর্য্য হইয়াছিল যে

অনেক সহ্য করিয়া শেষটা তিনি অসংযতবাক্‌ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এরূপ অসার যে, অর্থলোভে তাহারা না পারে এমন কায নাই। আবার ইংরাজি শিক্ষিতাভিমানীকেও তিনি যেন ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। কোনও কোনও বিধবাবিবাহদ্বেষী তার্কিক তর্কস্থলে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির সংখ্যা অনেক বেশী; যদি বিধবাদিগের বিবাহ দেওয়া হয় তাহা হইলে অনেক অপরিণীতা কুমারীর বিবাহ হওয়া ভার হইবে; সেটা কি মঙ্গলকর? এই আপত্তির কথা উত্থাপন করিয়া তিনি একদিন বলিলেন,—'ছেলেপুলেকে আর যা করি আর না করি, ইংরাজি ত কখনও শেখাবো না, অসার ও ডেঁপো হবার এমন পথ আর নাই।'[১৫]

বিদ্যাসাগরের এই মানববিদ্বেষ, মনে হয়, তাঁর অসামান্য মানবপ্রেমেরই অনিবার্য ফল। মনে রাখা দরকার, মানববিদ্বেষ বিদ্যাসাগরকে মানবপ্রেমের উদার ব্রত থেকে তিলার্ধ বিচ্যুত করতে পারেনি।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একদিন একটি শ্লোক আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন বিদ্যাসাগর :

কুরঙ্গমাতঙ্গপতঙ্গভৃঙ্গমীনা হতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমাদী স কথনং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ।

তারপর বলেছেন—এককেটা ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়ে জীবগণ বিনষ্ট হয়। আর যে মানুষের এই পঞ্চেন্দ্রিয় মুক্তভাবে কাজ করে, তার বিনাশ কত সহজ, আর কত সাবধান হলে মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে, মানুষ কি তা ভাবে? মানুষ দিনরাত এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধীন হয়ে নিজেকে ইতর জন্তুর চেয়েও অধম করে। ইতর জন্তু কারা? মানুষ যাদের ইতর জন্তু বলে তারা না মানুষ নিজে? সকল অপকর্মই মানুষ করতে পারে। তবে সে শেয়াল-কুকুর বাঘ-সিংহ গোরু-মেষ প্রভৃতি জীবদের কেন ইতর জন্তু বলবে?[১৬]

উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলেছেন : "...বিদ্যাসাগর দুঃসহ আঘাত পেয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই বেদনা বহন করেছিলেন। তিনি নৈরাশ্যগ্রস্থ pessimist ছিলেন বলে অখ্যাতি লাভ করেছেন; তার কারণ হচ্ছে যে, যেখানে তাঁর বেদনা ছিল দেশের কাছ থেকে সেখানে তিনি শান্তি পাননি। তিনি যদিও তাতে কর্তব্যভ্রষ্ট হননি, তবুও তাঁর জীবন যে বিষাদে আচ্ছন্ন হয়েছিল তা অনেকের কাছে অবিদিত নেই। তিনি তাঁর বড়ো তপস্যার দিকে স্বদেশীয়ের কাছে অভ্যর্থনা পাননি, কিন্তু সকল মহাপুরুষেরাই এই না-পাওয়ার গৌরবের দ্বারাই ভূষিত হন। বিধাতা তাঁদের যে দুঃসাধ্য সাধন করতে সংসারে পাঠান তাঁরা সেই দেবদত্ত দৌত্যের দ্বারাই অন্তরের মধ্যে সম্মান গ্রহণ করেই আসেন। বাহিরের অগৌরব তাঁদের অন্তরের সেই সম্মানের টীকাকেই উজ্জ্বল করে তোলে—অসম্মানই তাঁদের পুরস্কার।"[১৭]

রাজনারায়ণ বসুকে একবার একটা ছড়া শুনিয়েছেন বিদ্যাসাগর :

পৃথিবীতে যত বেটা, সব বেটা গরু।
যে যারে ঠকাতে পারে, সেই তার গুরু।[১৮]

এই ছড়া মিলিয়ে দেখতে গেলে বাঙলাদেশে বিদ্যাসাগরের গুরুর আর ইতি-অন্ত নেই। অনেকেই বিদ্যাসাগরকে ঠকিয়েছেন। যাঁদের কাছে বিদ্যাসাগর ঠকেছেন, তাঁদের অনেকেরই ভদ্রলোক বলে নামডাক আছে।

এক ভদ্রলোকের অসুখ করেছে। চিকিৎসক তাঁকে হাওয়া-বদলের পরামর্শ

দিলেন। পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে চলে এলেন।

চিকিৎসকের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের চেনা-জানা আছে। সেই সুবাদে তিনি বিদ্যাসাগরকে বললেন—আপনার কার্মাটাড়ের বাড়িটি যদি দিনকয়েকের জন্য ছেড়ে দেন তো বড়ো ভালো হয়। আমার এই রোগী সেখানে থেকে দিনকয়েক হাওয়া-বদল করে আসতে পারেন।

কিন্তু রোগীটিকে বিদ্যাসাগর বিন্দুমাত্র চেনেন না। কণামাত্র আলাপ নেই ওঁর সঙ্গে। তাই চিকিৎসক রোগীটির পরিচয় দিলেন বিদ্যাসাগরকে। তারপর বললেন—ইনি অত্যন্ত ভদ্রলোক।

বিদ্যাসাগর সহাস্যে বললেন—ওঁর সঙ্গে যখন আমার আলাপ নেই, তখন আপনার কথা স্বীকার করে নিতে আমি বাধ্য। এ-পর্যন্ত যাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ভদ্রলোক তো বড়ো একটা দেখতে পাইনি![১৯]

চেহারা দেখে কি ভদ্রলোক চেনা যায়? যদি চেহারায় না যায় তো কিসে ভদ্রলোক বোঝা যাবে?

এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগর একবার কথা বলেছেন নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে।

নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের ছাত্র। তিনি নিমতলায় কাঠের গোলা খুলেছেন। খবর শুনে বিদ্যাসাগর একদিন সেই কাঠের গোলা দেখতে এলেন। সমস্ত পথ হেঁটে এলেন।

নগেন্দ্রনাথ তো বিদ্যাসাগরকে আসন দেবার জন্য ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠলেন। বিদ্যাসাগর আসন পাততে বারণ করলেন। কাঠের গোলায় এসেছেন, কাঠের উপরেই বসে পড়লেন।

নগেন্দ্রনাথের হাতে তখন একখানা ইংরেজি মাসিকপত্র। বিদ্যাসাগর বিরক্ত হলেন। বললেন—ব্যবসা করতে এসেছিস, হাতে ইংরেজি মাসিকপত্র কেন? যদি একান্তই বই রাখতে হয়, ব্যবসাদারের মতো রামায়ণ-মহাভারত রাখ না!

বিদ্যাসাগর এসেছেন। বিদ্যাসাগর এসেছেন। অতএব রাস্তায় ভিড় হয়ে গেল।

বিদ্যাসাগর নগেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলেন—এত ভিড় কেন?

নগেন্দ্রনাথ বললেন—আপনাকে দেখবার জন্য এত ভিড় হয়েছে।

বিদ্যাসাগর বললেন—তুই তবে ঘণ্টা বাজা, ঘণ্টা বাজা।

তারপর ব্যবসার কথায় এলেন বিদ্যাসাগর। জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ রে, কি রকম ব্যবসা করছিস।

—আজ্ঞে, ধারেও বেচি, নগদেও বেচি।

—ধারে কি ভাবে বেচিস?

—আজ্ঞে, ভদ্রলোক দেখে ধার দি।

—ভদ্রলোক কি করে বুঝিস?

—চেহারা অবস্থা দেখে ভদ্রলোক বুঝি।

—দূর মূর্খ! তোর কিছু হবে না। ব্যবহার করে-করে যখন দেখবি মানুষটি খাঁটি, তখন ধার দিবি। তাছাড়া কিছুতেই নয়।—ভদ্রলোক চেনার উপায় বলে দিলেন বিদ্যাসাগর—ভদ্রলোক ঠিক করবি ব্যবহারে, চেহারায় নয়।[২০]

বিদ্যাসাগর নিজের মনের মতো একখানা বাড়ি করেছিলেন কার্মাটাড়ে।

শেষ জীবনে শরীর-মন যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ত, শহরের হট্টগোল যখন অসহ্য হয়ে উঠত, বিদ্যাসাগর মাঝে-মাঝে বিশ্রামের জন্য কার্মাটাড়ে চলে যেতেন। কার্মাটাড় সাঁওতাল পরগণায়।

সাত-আট ঘর বাঙালী কার্মাটাড়ে, কিন্তু কারো ভাগ্যে মাছ জোটে না। সকলে একদিন বিদ্যাসাগরকে বললেন—আমরা মাছ খেতে পাই না।

খোঁজ-খবর নিয়ে বিদ্যাসাগর জানতে পারলেন, মাছ নিয়ে বাবুরা দাম দেয় না বলে জেলেরা এদিকে মাছ বেচে না।

তখন থেকে নিজেই মাছ কিনতেন বিদ্যাসাগর। ভাগ করে বাড়ি-বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। এ-ব্যবস্থা এমন চালু হয়ে গিয়েছিল যে কার্মাটাড়ে কোনো বাড়ির ছেলেরা সকাল-সকাল ভাত খাবার বায়না ধরলে তাদের বলা হত—ঈশ্বরে জেলে এখনো মাছ দিয়ে যায়নি, ভাত দেব কি?[২১]

বিস্তর সাঁওতাল কার্মাটাড়ের বাসিন্দা। সাঁওতালদের ভালোবেসে ফেললেন বিদ্যাসাগর। বলতেন—সাঁওতালদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার আনন্দ হয়। ওরা গালি দিলেও আমার তৃপ্তি। ওরা অসভ্য বটে, কিন্তু সরল ও সত্যবাদী।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন : "কর্ম্মাটাড়ে বাস করিয়া তিনি (বিদ্যাসাগর) সাঁওতাল জাতির বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, এবং সর্ব্বদাই তাহাদের সরলতার প্রশংসা করিতেন। একটা গল্প তাঁহার মুখে প্রায়ই শুনা যাইত। একবার একজন চতুর বাঙ্গালী সাঁওতাল পরগণায় কিছু জমী খরিদ করিয়া কাছাকাছি পাঁচজনের জমী আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তদুপলক্ষে সীমাসহরদ্দ লইয়া এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। বাঙ্গালীটি অনেক প্রলোভন দেখাইয়া একজন বৃদ্ধ সাঁওতালকে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য দাঁড় করাইল; তাহাকে শিখাইয়া রাখিল যে, সে বলিবে যে অমুক শিমুল গাছ হইতে সীমানার আরম্ভ। সাঁওতাল রাজী হইল। মোকদ্দমার সময়ে যখন হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সাঁওতাল প্রথমে মিথ্যা কথা বলিল—অমুক শিমুল গাছটা বটে; পরক্ষণেই আসল কথাটি আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না; আপনা হইতেই বলিয়া উঠিল, 'কিন্তু ঐ গাছটি বটে,' বলিয়া আর একটি গাছ দেখাইয়া দিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই গল্পটি করিতেন আর হাসিতেন; বলিতেন, দেখ, ইহারা এখনও কেমন সাদাসিধে আছে; সত্যটা কোনও রকমেই গোপন রাখিতে পারে না।"[২২]

সাঁওতালদের দু-হাত ভরে দিতেন বিদ্যাসাগর। ওষুধ-বিষুধ, কাপড়-চোপড়, চাল-ডাল। থালা-গেলাস, ঘটিবাটি। যে যা চাইত, দিতেন।

একবার কার্মাটাড়ে পৌঁছতেই তো ছোট-ছোট সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা বিদ্যাসাগরকে ঘিরে ধরল—দাদা, আমাদের জন্য কি এনেছিস?

আগেই অবশ্যি ওরা বিদ্যাসাগরকে ফরমাস দিয়ে রেখেছে। ওদের ফরমাস মাফিক জিনিসপত্র এসেছে তো? আরশি কই? চিরুনি কই? ঘুনসি কই?

বিদ্যাসাগর হেসে বললেন—সব এনেছি। সব দিচ্ছি।

একে-একে সকলকে দিলেন। চিরুনি, ঘুনসি পরিয়ে দিলেন। তারপর বাগান থেকে গোলাপ ফুল নিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর। সব মেয়ের মাথায়, কানে গোলাপ ফুল পরিয়ে দিলেন। বিদ্যাসাগরেরও আনন্দ, ওদেরও আনন্দ।[২৩]

মিষ্টি-মিঠাই খাইয়েছেন সাঁওতালদের যত্ন করে। একবার খেজুর নিয়ে গিয়েছিলেন। খেজুর খেয়ে ওদের ভালো লেগেছিল, আরো খেজুর খেতে

চেয়েছিল ওরা। বিদ্যাসাগর তাই আরেকবার দশ-বারো বস্তা খেজুর নিয়ে গেলেন।

ইচ্ছা হলে বিদ্যাসাগর সাঁওতালদের নাচ দেখতেন। ওদের নাচ দেখে খুব আনন্দ পেতেন।

সাঁওতালদের ছেলেরা যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে, সেজন্য বিদ্যাসাগর কার্মাটাড়ে নিজের খরচে একটা স্কুল খুলে দিয়েছেন। এই স্কুলটির জন্য বিদ্যাসাগরের মাসে কুড়ি টাকা খরচ হত।

সাঁওতালেরা বিদ্যাসাগরকে একবিন্দু ভয় করত না, ভক্তি করত, ভালোবাসত। নির্ভয়ে বিদ্যাসাগরের হাত থেকে খাবার জিনিস কাড়াকাড়ি করে নিত।

বিদ্যাসাগর কার্মাটাড়ে এলেই সাঁওতালদের আনন্দ। প্রত্যেকবার বিদ্যা-সাগরের সঙ্গে প্রথম দেখা করতে আসার সময় সাঁওতালেরা বিদ্যাসাগরের জন্য উপহার নিয়ে আসত। তরিতরকারি, শাকসবজিই বেশি আসত।

একবার একজন সাঁওতাল একটা মুরগীর ছানা নিয়ে এল। মুরগীর ছানা বিদ্যাসাগর কেমন করে নেবেন? নিজের পৈতে দেখিয়ে বিদ্যাসাগর বললেন—আমি তো ওই মুরগীর ছানা নিতে পারব না।

হায়, বিদ্যাসাগরের জন্য যা নিয়ে এসেছে, বিদ্যাসাগর তা নিতে পারবেন না। সাঁওতালটি কাঁদতে লাগল। বিদ্যাসাগর তখন অগত্যা সেই মুরগীর ছানা হাতে নিলেন।[২৪]

কারো দুঃখ-কষ্ট দেখলে বিদ্যাসাগর কিছুতেই স্থির হয়ে থাকতে পারেন না।

কার্মাটাড়ে একদিন সকালবেলা একজন মেথর এসে কাঁদতে-কাঁদতে বলল—আমার ঘরে মেথরানীর কলেরা হয়েছে। বাবা, তুমি কিছু না করলে তো আর উপায় নেই।

সেই মুহূর্তে তিনি রওনা হলেন। ওষুধের বাক্স আর একটা মোড়া নিয়ে একজন চাকরও চলল তাঁর সঙ্গে। সারাদিন বিদ্যাসাগর রইলেন রোগিনীর কাছে, সাধ্যমতো ওষুধ দিলেন। রোগিনীর অবস্থা অনেকখানি ভালো হবার পর প্রায় সন্ধ্যার সময়ে বাড়িতে ফিরে এসে স্নানাহার করলেন।

একদিন একজন সাঁওতাল বিদ্যাসাগরের কাছে এসেছে। সঙ্গে একটি মেয়ে। তাকে দেখিয়ে সাঁওতালটি বিদ্যাসাগরকে বলল—একে একখানা কাপড় দিতে হবে।

একটু রঙ্গ করার ইচ্ছা হল বিদ্যাসাগরের। বললেন—কাপড় নেই। আর ওকে দেব কেন?

সাঁওতালটি বলল—তা হবে না। কাপড় দিতেই হবে।

বিদ্যাসাগর বললেন—কাপড় নেই।

সেকথা বিশ্বাস হল না। সাঁওতালটি বলল—দে তোর চাবি। চাবি খুলে সিন্দুক দেখব।

হাসিমুখে বিদ্যাসাগর চাবি দিলেন। সিন্দুক খুলে ফেলল সাঁওতালটি। বিস্তর কাপড় সিন্দুকে। একখানা ভালো কাপড় বের করে এনে সাঁওতালটি মেয়েটিকে দিয়ে দিল। আর এতেই বিদ্যাসাগরের অগাধ সুখ।

আরেকদিন একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন বিদ্যাসাগর। এমন সময় দুটি সাঁওতাল মেয়ে এসে উপস্থিত।

সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে সংক্ষেপে কথাবার্তা শেষ করলেন বিদ্যাসাগর। তাঁকে বিদায় দিলেন।

তখন একটি সাঁওতাল মেয়ে আরেকটিকে ধরে নিয়ে এল বিদ্যাসাগরের কাছে। বলল—ইটা আমার বিহান হয়, তুই একে একটা কাপড় দে।

বিদ্যাসাগর ঠাট্টা করে বললেন—কাপড় কোথায় পাব?

—ইস্, তোর আবার কাপড় ন্যাই?

বিদ্যাসাগর বললেন—হ্যাঁরে, কাপড় কোথায় পাব?

—চল তো, সিন্দুকটা খুলবি।

—চল, দেখবি।

সিন্দুক খুলে দিলেন বিদ্যাসাগর। কাপড়ে ভর্তি।

মেয়েটি বলল—ইয়েঃ, তুইও মিছা কথাটা শিখলি হেঃ?

বিদ্যাসাগর বললেন—আর তোদের দেশে এসেই তো শিখলাম।

মেয়েটি দুঃখ করে বলল—আমরা মিছা কথাটা কই না, আমরা জানতাম তুই মিছা কথাটা বলিস না।

দু-জনে দু-খানা নতুন সুন্দর শাড়ি নিয়ে চলে গেল।[২৫]

বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় লিখিত হয়েছে : "বৈদ্যনাথের নিকটে কর্ম্মাটাঁড় নামে একটী স্থান আছে। বিদ্যাসাগর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে এই স্থানে গিয়া বাস করেন। ইনি এখানকার সাঁওতালদিগকে বড়ই যত্ন করিয়া থাকেন। তাহারাও ইহাঁকে দেবতার তুল্য জ্ঞান করে।"[২৬]

পুজোর সময় কার্মাটাঁড়ের সাঁওতালদের তিন-চারশো টাকার কাপড় কিনে দিতেন বিদ্যাসাগর।* কলকাতার দোকানে নিজে গিয়ে কিনতেন।

একদিন এক দোকানে কাপড় কিনতে এসে তামাক খাচ্ছেন, এমন সময় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেই দোকানের সামনে দিয়ে গাড়ি করে যাচ্ছেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হল। কিছু কথাবার্তার পর মহারাজা যতীন্দ্রমোহন বিদ্যাসাগরকে বললেন—আপনাকে আমরা এত সম্মান করি, আর আপনার এই রকম খোলার ঘরে বসে তামাক খাওয়া যেন কি রকম কি রকম ঠেকে।

বিদ্যাসাগর বললেন—দ্যাখো, ওদের নিয়েই আমাদের ঘরকন্না, ওদের কাছে তেল-নুন কিনতে আসতে হয়, কাপড় কিনতে আসতে হয়, রাজা-মহারাজাদের নিয়ে তো আর আমাদের ঘরকন্না নয়। তা যদি বলো তো না হয় তোমার ওখানে আর যাব না। তোমাদের ছাড়তে পারি কিন্তু ওদের ছাড়তে পারি না।[২৭]

"একদিন বিদ্যাসাগর কর্ম্মাটাঁড়ে বাগান প্রস্তুত করিবার জন্য কয়েকজন সাঁওতালকে ডাকাইয়া আনেন। তাহারা প্রত্যেকে ৶০ হিসাবে রোজ পাইত, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাহাদিগের পরিশ্রম ও কার্য্যক্ষমতা জানিয়া ।০ আনা করিয়া

---

* প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "(বিদ্যাসাগর) পূজার সময় কর্ম্মটারের সাঁওতালদের জন্য প্রতি বৎসর সহস্র টাকার অধিক বস্ত্র ক্রয় করিয়া বিতরণ করিতেন। শীতকালে জঙ্গল প্রদেশে অত্যন্ত শীত হয়, সাঁওতালদের গাত্রে শীত বস্ত্র নাই দেখিয়া প্রতি বৎসর যথেষ্ট মোটা চাদর ও কম্বল ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন। শীতকালে যথেষ্ট কমলালেবু ও কলসীখেজুর প্রভৃতি নানাপ্রকার উপাদেয় দ্রব্য কলিকাতা হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন, এবং সাঁওতালদিগকে স্বহস্তে বিতরণ করিতেন। বৃদ্ধ এবং প্রধান প্রধান সাঁওতালদিগকে নিকটে বসাইয়া ঐ সকল দ্রব্য খাওয়াইতেন।" (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত, কলকাতা, ১৮৯১, পৃ. ২১৭।)

রোজ দিবেন বলেন। তাহারা তাঁহাকে একজন "ঝুটা বাঙ্গালী"* বলিয়াই জানিত—সুতরাং এই প্রস্তাবে হাসিয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল বিদ্যাসাগর বুঝি তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিতেছেন। তন্মধ্যে একজন রমণী ব্যতীত কেহই তাঁহার কথা বুঝিত না। তিনি তাহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, যে তিনি সত্য-সত্যই দ্বিগুণ রোজ দিবেন। তখন সাঁওতালেরা কাজে লাগিল। মধ্যাহ্নকালে প্রবল বাত্যা বহিল—পরক্ষণেই মুষলধারে বৃষ্টি। বিদ্যাসাগর তাহাদিগকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আসিতে কহিলেন। বৃষ্টি দেখিয়া তাহারা দ্বিগুণ রোজের আশায় দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্য করিতে লাগিল।

বিদ্যাসাগর বারবার তাহাদিগকে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। তাহারা বলিল, "পুরা কাজ না করিলে পুরা রোজ কি তুই দিবি? রোজ না পাইলে আমরা আজ কি খাইব?" বিদ্যাসাগর বুঝাইয়া বলিলেন যে তিনি তাহাদের রোজ কাটিবেন না; তখন তাহারা বৃষ্টি হইতে গৃহমধ্যে ফিরিল। সে দিবস বৃষ্টির জন্য আর কাজ হইল না। সাঁওতালেরা ভাবিল আজ বুঝি রিক্তহস্তে ফিরিতে হইবে। কিন্তু বিদ্যাসাগর পরক্ষণেই তাহাদিগকে ।০ করিয়া রোজ দিলেন—সাঁওতালেরা স্তম্ভিত!

আর একদিন তিনি জনকয়েক সাঁওতালকে আহারের নিমন্ত্রণ করেন। প্রথমে তাহারা খাইতে স্বীকৃত হয় নাই। পঞ্চায়েত বসিল—পাহাড়ের উপর সর্দ্দারের নিকট সংবাদ পোঁছিল। বিদ্যাসাগরের উদার চরিত্র ও বাৎসল্যগুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহার গৃহে আহার করিবার অনুমতি হইল। তিনি নানাবিধ উত্তম উত্তম খাদ্যের আয়োজন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তাহারা কোনকালে এরূপ আহার্য্য চক্ষে দেখে নাই, বিশেষতঃ ৮।১০ দিন অন্তর একদিন মাত্র একবেলা চারিটি অন্ন খাইতে পায়। আজ তাহাদিগেরই পাতে বিদ্যাসাগর উৎকৃষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদি দিতে লাগিলেন। আহার করিতে করিতে তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল স্বর্গ হইতে বুঝি দেবদূত আসিয়া তাহাদিগকে আহার করাইতেছেন! আহারাদি সমাপ্ত হইলে তাহারা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিল, "কে তুই মহাপুরুষ আমাদিগকে বল্? তুই আমাদের দুঃখ বুঝিয়াছিস, তোকে আমরা ছাড়িব না।" তিনি সকলকেই সুমধুর কথায় সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। তাহারা বিদ্যাসাগরকে আপনার জন জানিয়া তাঁহাকে আর একদিন আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ সাঁওতাল-কুটীরে উপস্থিত। জনৈকা বৃদ্ধা সাঁওতাল-রমণী বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় যত্ন করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সাঁওতাল-সমিতি কুটীর সম্মুখে উপস্থিত। তাহারা সকলে বিদ্যাসাগরকে ঘেরিয়া বসিল। তিনি মিষ্টবচনে তাহাদিগকে তৃপ্ত করিলেন। পরিশেষে ফিরিবার সময় বৃদ্ধা তাঁহার উত্তরীয়বসনাগ্রে কয়েকটী কাঁচকলা, কতকগুলি কুতরুল ফল ও অন্যান্য কয়েকটী বনফল বাঁধিয়া দিতে গেল। তিনি দেখিলেন সাঁওতাল-সংসারের একদিনের আহার তাঁহার চাদরের কোণে বৃদ্ধা বাঁধিতেছে। তিনি সুমধুর কথায় বৃদ্ধাকে বলিলেন, "মা, এত কেন আমায় দিবি? তোদের ছেলেরা একদিন ইহা খাইয়া বাঁচিবে!" বৃদ্ধা একবার বিদ্যাসাগরের মুখের দিকে তাকাইল—পরক্ষণেই দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রু বিগলিত হইল।

* সাঁওতালেরা বাঙ্গালীদিগের আচার ব্যবহারে বিশেষতঃ অত্যাচারে সময়ে সময়ে পীড়িত হইয়া সাধারণ বাঙ্গালীকে "ঝুটা বাঙ্গালী" বলিয়াই জানে।

বৃদ্ধা বুঝিল আমাদিগের দুঃখ বুঝিবার লোক মিলিল—বিদ্যাসাগর বুঝিলেন সাঁওতালেরা সরল অন্তরে তাঁহাকে কত ভালবাসে!"[২৮]

জীবনের একটা অংশ কার্মাটাড়ে কাটিয়েছেন বিদ্যাসাগর। সেখানকার সাঁওতালেরা বিদ্যাসাগরকে তাদের পরমাত্মীয় বলে জেনেছে। বিদ্যাসাগর তাদের নিতান্ত আপনজন হয়ে থেকেছেন।

১৮৭৫ সালের মাঝামাঝি দিনকয়েকের জন্য কার্মাটাড়ে গিয়েছিলেন শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন। তিনি লিখেছেন: "দাদা (বিদ্যাসাগর) প্রাতঃকাল হইতে বেলা দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত সাঁওতাল রোগীদিগকে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিয়া থাকেন এবং পথ্যের জন্য সাগু, বাতাসা, মিছরী প্রভৃতি নিজ হইতে প্রদান করেন। ভোজনের পর বাগানের গাছ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন আবশ্যক মতে এক স্থানের চারা গাছ তুলাইয়া অন্য স্থানে বসাইতেন। পরে পুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করিতেন, অপরাহ্নে পীড়িত সাঁওতালদের পর্ণকুটীরে যাইয়া তত্ত্বাবধান করিতেন। তাহাদের কুটীরে যাইলে তাহারা সমাদর পূর্ব্বক বলিত তুই আসেছিস, তাহাদের কথা অগ্রজকে (বিদ্যাসাগর) বড় ভাল লাগিত, আমায় তৎকালে বলেন বড়লোকের বাটীতে যাওয়া অপেক্ষা এ সকল লোকের কুটীরে যাইতে আমায় ভাল লাগে, ইহাদের স্বভাব ভাল ইহারা কখন মিথ্যাকথা বলে না ইত্যাদি কারণে এখানে থাকিতে ভাল বাসি।"

কার্মাটাড়ে বিদ্যাসাগরের একটি দিনের খবর শুনিয়েছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

সকালবেলা। রোদ উঠতে-না-উঠতেই একজন সাঁওতাল গোটা পাঁচ-ছয় ভুট্টা নিয়ে এসে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে উপস্থিত হল। বলল—ও বিদ্যেসাগর, আমার পাঁচগণ্ডা পয়সা নইলে আজ ছেলেটার চিকিৎসা হবে না। তুই আমার এই ভুট্টা কটা নিয়ে আমায় পাঁচগণ্ডা পয়সা দে।

বিদ্যাসাগর পাঁচগণ্ডা পয়সা দিয়ে সেই ভুট্টা কিনলেন। নিজের হাতে তাকে তুলে রাখলেন।

ভুট্টা নিয়ে আবার আরেকজন সাঁওতাল এল। বলল—আমার আটগণ্ডা পয়সার দরকার।

আটগণ্ডা পয়সা দিয়ে আবার বিদ্যাসাগর ভুট্টা কিনলেন।

একের পর আরেকজন সাঁওতাল আসছে। ভুট্টা নিয়ে আসছে। বিদ্যাসাগর সব ভুট্টা কিনে তাকে রেখে দিচ্ছেন। কোনো দরাদরি নেই। যে যা দাম বলছে, বিদ্যাসাগর বিনাবাক্যব্যয়ে সেই দাম দিচ্ছেন। সকাল আটটার মধ্যে চারদিকের তাক ভর্তি হয়ে গেল, অথচ ভুট্টা কেনার কামাই নেই।

হরপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন—এত ভুট্টা নিয়ে আপনি কী করবেন?

বিদ্যাসাগর বললেন—দেখবি রে দেখবি।

ভুট্টা কেনা চলছে সমানে। ইতিমধ্যে দুটি সাঁওতাল মেয়ে এসে উঠোনে দাঁড়াল। বলল—ও বিদ্যেসাগর, আমাদের কিছু খাবার দে।

আগের দিন বিকেলে হরপ্রসাদ কার্মাটাড়ে এসেছেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে বললেন—ওরা খাবার চাচ্ছে, আপনার এত মতিচুর ছানাবড়া আছে, দু-একটা দিন না!

বিদ্যাসাগর বললেন—দূর হ, ওরা কি ওসবের স্বাদ জানে, না রস জানে? ওদের খাবার হলেই হল, ভালমন্দ খাবার ওরা বোঝে না। ওসবের জন্য আলাদা লোক আছে, এখানে সাঁওতালদের সঙ্গে থেকে তারা সাঁওতালদের

মতো হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের জিভ আছে, জিনিস চেনে। আর এদের কাছে মুড়ি-চিঁড়েও যা, সন্দেশ-রসগোল্লাও তাই।

হরপ্রসাদ বললেন—তাহলে আমার সঙ্গে পরশুর ভাজা কতগুলো লুচি আছে, সেগুলো এদের দিয়ে দি।

বিদ্যাসাগর বললেন—আছে নাকি? কই, দেখি।

কলাপাতায় বাঁধা প্রায় দু-দিস্তে লুচি আছে হরপ্রসাদের কাছে। দু-দিন কলাপাতায় বাঁধা আছে, লুচিতে কলাপাতার গন্ধ হয়ে গেছে। হরপ্রসাদ সাঁওতাল মেয়ে দুটিকে লুচি দিতে যাচ্ছেন, বিদ্যাসাগর বললেন—আমায় দে, ওদের কি অমন করে দিতে আছে?

কলাপাতা খুলে বিদ্যাসাগর লুচিগুলো খানিকক্ষণ বাতাসে রাখলেন। বললেন—এই দ্যাখ, কিছু গন্ধ নেই।

মাঝখান থেকে চারখানা লুচি তুলে নিয়ে বেশ সাবধানে রাখলেন।

হরপ্রসাদ বললেন—আপনি ও কি করছেন?

বিদ্যাসাগর বললেন—খাবো রে। তোর মায়ের হাতে ভাজা?

—না। বড়বৌয়ের।

—তবে আরো ভালো। নন্দকুমার* ন্যায়চঞ্চুর বিধবা পত্নীর? নন্দ আমার বড়ো প্রিয়পাত্র ছিল।

উপর থেকে দু-খানা লুচি তুলে নিয়ে সাঁওতালীদের দিলেন বিদ্যাসাগর। টপ করে লুচি খেয়ে ফেলল ওরা। বিদ্যাসাগর হরপ্রসাদকে বললেন—দেখলি? ওরা কি স্বাদ জানে, না রস জানে?

---

* ১২৬৫ সনের ২-চৈত্র 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছে : "ইঁহার (নন্দকুমার) উপাধি ন্যায়চুঞ্চু, কিন্তু বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ ও বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি মহামান্যবর্গ ন্যায়চুঞ্চু উপাধির পরিবর্ত্তে তর্করত্ন উপাধি দিয়াছেন।"

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত অগ্রজ মহাশয়ের (বিদ্যাসাগর) অত্যন্ত প্রণয় ছিল। রমাপ্রসাদ বাবু বর্দ্ধমানের রাজবাটী হইতে নৈহাটীনিবাসী নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু নামক স্বল্পবয়স্ক অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় এক পণ্ডিতকে আনয়ন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অর্পণ করেন। ঐ নন্দকুমারের পিতৃকুল ও মাতৃকুল বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যাবত্তার কারণ বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ, এই কারণে অগ্রজ মহাশয় (বিদ্যাসাগর) নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চুকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া কোন উচ্চ পদ শূন্য না থাকায় অগত্যা একটি ৩০৲ টাকা বেতনের পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করিলেন। ইনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন না, একারণ শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্‌টার ইয়ং সাহেবের নানা আপত্তি খণ্ডন করিয়া আপাততঃ কিছু কালের জন্য ঐ পদে রাখিলেন। কিন্তু সংস্কৃত বিদ্যালয়ে পূজ্যপাদ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের সহিত বিচার হওয়ায় নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু উৎকৃষ্ট সাব্যস্ত হয়েন। পরে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহ ও রাজা ঈশ্বরনারায়ণ সিংহের কান্দীগ্রামে তাঁহাদের স্থাপিত বিদ্যালয়ে ৮০৲ টাকা বেতনে ন্যায়চুঞ্চুকে নিযুক্ত করিয়া পাঠান। কয়েক বৎসর পরে তিনি জ্বরকাশ রোগে আক্রান্ত হইলে অগ্রজ মহাশয় (বিদ্যাসাগর) তাঁহাকে কলিকাতায় আনাইয়া তৎকালের বিখ্যাত ডাক্তার গুডিভ সাহেব প্রভৃতি চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করান। ঐ রোগেই তাঁহার মৃত্যু হইলে পর তাঁহার জননী দেবীর ও পত্নীর এবং নাবালক সহোদরদিগকে কর্ম্মক্ষম হওয়া পর্য্যন্ত ভরণপোষণ ও তাহাদের বিদ্যানুশীলনাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন ও আবশ্যক মত সময়ে সময়ে নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন। এমন কি, তাঁহার ভ্রাতৃবর্গকে সহোদর নির্ব্বিশেষে তত্ত্বাবধান করিয়া আসিয়াছেন।" (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত, কলকাতা, ১৮৯১, পৃ ১০৯-১০।)

ভুট্টা কেনার বিরাম নেই। কী একটা কাজে হরপ্রসাদ একটু অন্য দিকে গিয়েছেন, ফিরে এসে দেখেন, বিদ্যাসাগর নেই। কোথায় গেলেন চোখের পলকে?

খানিকক্ষণ পরে হরপ্রসাদ দেখলেন, একটা আলপথে বিদ্যাসাগর হনহন করে হেঁটে আসছেন, দরদর করে ঘাম পড়ছে, বিদ্যাসাগরের হাতে একটা পাথরের বাটি।

কোথায় গিয়েছিলেন এভাবে?

বিদ্যাসাগর হরপ্রসাদকে বললেন—ওরে, খানিকক্ষণ আগে একটা সাঁওতালী এসেছিল। সে বলল, 'বিদ্যেসাগর, আমার ছেলেটার নাক দিয়ে হু-হু করে রক্ত পড়ছে, তুই এসে যদি তাকে বাঁচাস।' তাই আমি একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ এই বাটিতে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আশ্চর্য দেখলাম এক ডোজ ওষুধে ছেলেটার রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল। এরা তো মেলা ওষুধ খায় না, অল্প ওষুধেই এদের উপকার হয়। কলকাতার লোকের ওষুধ খেয়ে-খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে, মেলা ওষুধ না দিলে তাদের উপকার হয় না।

হরপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কতদূর গিয়েছিলেন?

বিদ্যাসাগর বললেন—ওই যে গাঁ-টা দেখা যাচ্ছে। মাইল দেড়েক হবে।

একটা সাঁওতাল ছেলের জন্য সকালবেলা পাথরের বাটিতে ওষুধ নিয়ে বিদ্যাসাগর পায়ে হেঁটে এককথায় লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন!

এদিকে সামনের উঠোন সাঁওতালে ভর্তি হয়ে গেছে। ছোটো-ছোটো দলে ভাগ হয়ে বসে গেছে তারা। কোনো দলে পাঁচজন, কোনো দলে আটজন, কোনো দলে দশজন। প্রত্যেক দলের মধ্যিখানে কতগুলো শুকনো পাত, শুকনো কাঠ। বিদ্যাসাগরকে দেখে সাঁওতালের দল বলে উঠল—ও বিদ্যেসাগর, আমাদের খাবার দে।

তখন বিদ্যাসাগর ভুট্টা পরিবেশন করতে বসলেন।

শুকনো কাঠ-পাতায় আগুন জ্বালিয়ে সাঁওতালেরা মহানন্দে ভুট্টা সেঁকে খেল। তাকের রাশীকৃত ভুট্টা প্রায় ফুরিয়ে এল। সাঁওতালেরা উঠে বলল—খুব খাইয়েছিস বিদ্যেসাগর।

সাঁওতালেরা চলে যেতে লাগল। বিদ্যাসাগর রকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন।[২৯]

বিদ্যাসাগর তখন কলকাতায়। শরীর ভেঙে পড়েছে তাঁর। একদিন দুপুর-বেলা বাড়িতে একলা বসে আছেন, এমন সময় হাইকোর্টের উকিল শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য দেখতে এলেন তাঁকে। প্রণাম করলেন। জিজ্ঞেস করলেন—আজ আপনি কেমন আছেন?

—ভালো নয়। ক্রমেই অসুখ বেড়ে যাচ্ছে। তার উপর এখানে অনেক কাজ, সুস্থ হবার উপায় নেই।

—আপনি কার্মাটাড়ে গেলে ভালো থাকেন। আর সেখানে আপনার বিশ্রামও হয়। কিছুদিন সেখানে গিয়ে থাকুন না।

—আমার পক্ষে আজকাল সবই সমান। সেখানেও বড়ো ভালো থাকি না।

—খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন বিদ্যাসাগর। তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—বাপু, সেখানে গেলে ভালো থাকি বটে। আমার যদি অতুল ঐশ্বর্য থাকত, তাহলে সেখানে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারতাম, শরীর-মন

ভালো থাকত। কিন্তু, আমার সে-অদৃষ্ট কই? আমার সে-ক্ষমতা কই? দ্যাখো, কার্মাটাড়ে একসের চালের ভাত, আধসের অড়হর ডাল, আধসের আলু আর একসের মাংস যে অনায়াসে খেতে পারে, তাকে আজকাল পোয়াটাক ভুট্টার ছাতু খেয়ে থাকতে হয়, তার বেশি আর জোটে না। আমি সেখানে গিয়ে দিব্যি খাওয়া-দাওয়া করব, আর আমার চারদিকে সাঁওতালেরা না খেয়ে মারা যাবে দেখব—এ কি সইতে পারি?

বিদ্যাসাগর আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন।[৩০]

কুড়ি

বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণচন্দ্রের দৌহিত্র ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

"In 1875 at the age of 54, Pandit Iswar Chandra Vidyasagar drew up his last will and testament. . . He lived 16 years after this date, and had another will drawn up with somewhat different bequests. One feature of it was the constitution of a board of trustees for the Metropolitan Institution. But he died before this will was signed. . . .

There are with me two other wills drawn up and signed by Iswar Chandra prior to 1875 which he cancelled by his last will and testament. . . ." ১

বিদ্যাসাগরের উইল একটি ঐতিহাসিক বস্তু। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পক্ষে উইলখানা একটি অপরিহার্য দলিল। এই উইলের তাৎপর্য অনুভব করা সহজ, ব্যাখ্যা করা দুরূহ না হলেও অবান্তর।

উইলখানা আদ্যন্ত উদ্ধার করি :

"শ্রীশ্রীহরি—
শরণম্।

১। আমি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে আমার সম্পত্তির অন্তিম বিনিয়োগ করিতেছি। এই বিনিয়োগ দ্বারা আমার কৃত পূর্ব্বান সমস্ত বিনিয়োগ নিরস্ত হইল।

২। চৌগাছা নিবাসী শ্রীযুত কালীচরণ ঘোষ পাথরা নিবাসী শ্রীযুত ক্ষীরোদনাথ সিংহ আমার ভাগিনেয় পসপুর নিবাসী শ্রীযুত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় এই তিন জনকে আমার এই অন্তিম বিনিয়োগ পত্রের কার্য্যদর্শী নিযুক্ত করিলাম তাঁহারা এই বিনিয়োগ পত্রের অনুযায়ী যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।*

৩। আমি অবিদ্যমান হইলে আমার সমস্ত সম্পত্তি নিযুক্ত কার্য্যদর্শী-দিগের হস্তে যাইবেক।

৪। এক্ষণে আমার যে সকল সম্পত্তি আছে কার্য্যদর্শীদিগের অবগতি নিমিত্ত তৎসমুদয়ের বিবৃতি এই বিনিয়োগ পত্রের সহিত গ্রথিত হইল।

৫। কার্য্যদর্শীরা আমার ঋণ পরিশোধ ও আমার প্রাপ্য আদায় করিবেন।

৬। আমার সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে আমার পোষ্যবর্গ ও কতকগুলি নিরুপায় জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় প্রভৃতির ভরণপোষণ ও কতিপয় অনুষ্ঠানের

---

* বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেহাত্যয়ের পূর্ব্বেই লোকান্তরিত হওয়ায় ও শ্রীযুত কালীচরণ ঘোষ কার্য্যভার লইতে অস্বীকার করায় কেবল শ্রীযুত বাবু ক্ষীরোদনাথ সিংহ মহাশয়ই কার্য্যদর্শী পদে অভিষিক্ত হয়েন।" (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস, পৃ. ৮৫।)

ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে এই সমস্ত ব্যয় এককালে রহিত করিয়া আপন আপন প্রাপ্য আদায়ে প্রবৃত্ত হইবেন আমার উত্তমর্ণেরা সেরূপ প্রকৃতির লোক নহেন কার্য্যদর্শীরা তাঁহাদের সম্মতি লইয়া এরূপ ব্যবস্থা করিবেন যে এই বিনিয়োগ পত্রের লিখিত বৃত্তি প্রভৃতি প্রচলিত থাকিয়া তাহাদের প্রাপ্য ক্রমে আদায় হইয়া যায়।

৭। এক্ষণে যে সকল ব্যক্তি আমার নিকট মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন আমি অবিদ্যমান হইলে তাঁহাদের সকলের সেরূপ বৃত্তি পাওয়া সম্ভব নহে। তন্মধ্যে যাঁহারা আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যেরূপ মাসিক বৃত্তি পাইবেন তাহা নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে—

প্রথম শ্রেণী

পিতৃদেব শ্রীযুত ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—	৫০৲ পঞ্চাশ টাকা
মধ্যম সহোদর শ্রীযুত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন—	৪০৲ চল্লিশ টাকা
তৃতীয় সহোদর শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—	৪০৲ চল্লিশ টাকা
কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—	৩০৲ ত্রিশ টাকা
জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী—	১০৲ দশ টাকা
মধ্যমা ভগিনী শ্রীমতী দিগম্বরী দেবী—	১০৲ দশ টাকা
কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মন্দাকিনী দেবী—	১০৲ দশ টাকা
বনিতা শ্রীমতী দীনময়ী দেবী—	৩০৲ ত্রিশ টাকা
জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবী—	১৫৲ পনর টাকা
মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী—	১৫৲ পনর টাকা
তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী—	১৫৲ পনর টাকা
কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী—	১৫৲ পনর টাকা
পুত্রবধূ শ্রীমতী ভবসুন্দরী দেবী—	১৫৲ পনর টাকা
পৌত্রী শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী—	১৫৲ পনর টাকা
জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—	১৫৲ পনর টাকা
কনিষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ সমাজপতি—	১৫৲ পনর টাকা
দৌহিত্রী শ্রীমতী রাজরাণী দেবী—	১৫৲ পনর টাকা
কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ শ্রীমতী এলোকেশী দেবী—	১০৲ দশ টাকা
শ্বাশুড়ী শ্রীমতী তারাসুন্দরী দেবী—	১০৲ দশ টাকা
জ্যেষ্ঠা কন্যার শাশুড়ী শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবী—	১০৲ দশ টাকা
জ্যেষ্ঠা কন্যার ননদ শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দেবী—	১০৲ দশ টাকা
মাতৃদেবীর মাতুলকন্যা শ্রীমতী উমাসুন্দরী দেবী—	৩৲ তিন টাকা
মাতৃদেবীর মাতুলদৌহিত্র গোপালচন্দ্র চট্টোর বনিতা—	৩৲ তিন টাকা
পিতৃস্বসৃপুত্র ত্রিলোচন মুখোপাধ্যায়ের বনিতা—	৩৲ তিন টাকা
পিতৃদেবের পিতৃস্বসৃ কন্যা শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী—	৩৲ তিন টাকা
বৈবাহিকী শ্রীমতী সারদা দেবী—	৫৲ পাঁচ টাকা
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মাতা—	৮৲ আট টাকা
শ্রীযুত মদনমোহন বসুর বনিতা শ্রীমতী নৃত্যকালী দাসী—	১০৲ দশ টাকা
শ্রীযুত মধুসূদন ঘোষের বনিতা শ্রীমতী থাকমণি দাসী—	১০৲ দশ টাকা
বারাশত নিবাসী শ্রীযুত কালীকৃষ্ণ মিত্র—	৩০৲ ত্রিশ টাকা

কালীকৃষ্ণ মরিয়া গেলে তাহার বনিতা শ্রীমতী উমেশ-মোহিনী দাসী—	১০৲ দশ টাকা
শ্রীরাম প্রামাণিকের বনিতা শ্রীমতী ভগবতী দাসী—	২৲ দুই টাকা

দ্বিতীয় শ্রেণী

মাতৃস্বসৃ পুত্র শ্রীযুত সর্ব্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—	১০৲ দশ টাকা
ভাগিনেয়ী শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী—	৫৲ পাঁচ টাকা
জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ননদ শ্রীমতী তারামণি দেবী—	৫৲ পাঁচ টাকা
পিতৃস্বসৃকন্যা শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী—	২৲ দুই টাকা
মাতৃদেবীর মাতৃস্বসৃপুত্র শ্রীযুত শ্যামাচরণ ঘোষাল—	৫৲ পাঁচ টাকা
মাতৃদেবীর মাতুলপুত্র তারাচরণ মুখোর পরিবার—	৮৲ আট টাকা
মাতৃদেবীর মাতৃস্বসৃপুত্র শ্রীযুত কালিদাস মুখো—	৫৲ পাঁচ টাকা
মাতৃদেবীর পিতৃস্বসৃপুত্র রামেশ্বর মুখোর পরিবার—	৫৲ পাঁচ টাকা
মাতৃদেবীর মাতুলকন্যা শ্রীমতী বরদা দেবী—	২৲ দুই টাকা
বারাশতনিবাসী নবীনকৃষ্ণ মিত্রের বনিতা শ্রীমতী শ্যামা-সুন্দরী দাসী—	১০৲ দশ টাকা
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা শ্রীমতী কুন্দমালা দেবী—	১০৲ দশ টাকা
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ভগিনী শ্রীমতী বামাসুন্দরী দেবী—	৩৲ তিন টাকা
বর্দ্ধমানের প্যারীচাঁদ মিত্রের বনিতা শ্রীমতী কামিনী দাসী—	১০৲ দশ টাকা

৮। যদি কার্য্যদর্শীরা দ্বিতীয় শ্রেণীনিবিষ্ট কোন ব্যক্তিকে মাসিক বৃত্তি দেওয়া অনাবশ্যক বোধ করেন অর্থাৎ আমার দত্ত বৃত্তি না পাইলেও তাঁহার চলিতে পারে এরূপ দেখেন তাহা হইলে তাঁহার বৃত্তি রহিত করিতে পারিবেন।

৯। আমার দেহান্ত সময়ে আমার মধ্যমা তৃতীয়া ও কনিষ্ঠা কন্যার যে সকল পুত্র ও কন্যা বিদ্যমান থাকিবেক কোনও কারণে তাহাদের ভরণপোষণ বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহের অসুবিধা ঘটিলে তাহারা প্রত্যেকে দ্বাবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মাসিক ১৫৲ পনর টাকা বৃত্তি পাইবেক।

১০। আমার দেহান্ত সময়ে আমার যে সকল পৌত্র ও দৌহিত্র অথবা পৌত্রী ও দৌহিত্রী বিদ্যমান থাকিবেক তাহাদের মধ্যে কেহ অন্ধত্ব পঙ্গুত্ব প্রভৃতি দোষাক্রান্ত অথবা অচিকিৎস্য রোগগ্রস্ত হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যাবজ্জীবন মাসিক ১০৲ দশ টাকা বৃত্তি পাইবেক।

১১। যদি আমার মধ্যমা অথবা কনিষ্ঠা ভগিনীর কোনও পুত্র উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বে তাঁহার বৈধব্য ঘটে তাহা হইলে যাবৎ তাঁহার কোনও পুত্র উপার্জ্জনক্ষম না হয় তাবৎ তিনি আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে সপ্তম ধারা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ব্যতিরিক্ত মাসিক আর ২০৲ কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইবেন।

১২। যদি শ্রীমতী নৃত্যকালী দাসীর কোনও পুত্র উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বে তাঁহার বৈধব্য ঘটে তাহা হইলে যাবৎ তাঁহার কোনও পুত্র উপার্জ্জনক্ষম না হয় তাবৎ তিনি আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে সপ্তম ধারা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ব্যতিরিক্ত মাসিক আর ১০৲ দশ টাকা বৃত্তি পাইবেন।

১৩। কার্য্যদর্শীরা আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে নীলমাধব ভট্টাচার্য্যের বনিতা শ্রীমতী সারদা দেবীকে তাঁহার নিজের ও পুত্রত্রয়ের ভরণপোষণার্থে মাস মাস ৩০৲ ত্রিশ টাকা আর তাঁহার পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যাবজ্জীবন মাস মাস ১০৲ দশ টাকা দিবেন। তিনি বিবাহ করিলে অথবা উৎপথবর্ত্তিনী হইলে তাঁহাকে উক্ত উভয় বিধেয় মধ্যে কোনও প্রকার বৃত্তি দিবার আবশ্যকতা নাই।

১৪। আমি অবিদ্যমান হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যে অনুষ্ঠানে যেরূপ মাসিক ব্যয় হইবেক তাহা নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে আমার স্থাপিত বিদ্যালয়—১০০৲ একশত টাকা
ঐ ঐ গ্রামে আমার স্থাপিত চিকিৎসালয়—৫০৲ পঞ্চাশ টাকা
ঐ ঐ গ্রামের অনাথ ও নিরুপায় লোক—৩০৲ ত্রিশ টাকা
বিধবা বিবাহ ১০০৲ একশত টাকা

১৫। যদি শ্রীযুত জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ পালিত শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র ভড় এই তিনজন আমার দেহান্ত সময় পর্য্যন্ত আমার পরিচারক নিযুক্ত থাকে তাহা হইলে কার্য্যদর্শীরা তাহাদের প্রত্যেককে এককালীন ৩০০৲ তিনশত টাকা দিবেন।

১৬। কার্য্যদর্শীরা বিষয় রক্ষা লৌকিক রক্ষা কন্যা দান প্রভৃতির আবশ্যক ব্যয় স্বীয় বিবেচনা অনুসারে করিবেন।

১৭। এই বিনিয়োগপত্রে যাঁহার পক্ষে অথবা যে বিষয়ে যেরূপ নির্ব্বন্ধ করিলাম যদি তাহাতে তাঁহার পক্ষে সুবিধা অথবা সে বিষয়ের সুশৃঙ্খলা না হয় তাহা হইলে কার্য্যদর্শীরা সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া যাঁহার পক্ষে অথবা যে বিষয়ে যেরূপ নির্ব্বন্ধ করিবেন তাহা আমার স্বকৃতের ন্যায় গণনীয় ও মাননীয় হইবেক।

১৮। এক্ষণে আমার সম্পত্তির যেরূপ উপস্বত্ব আছে যদি উত্তরকালে তাহার খর্ব্বতা হয় তাহা হইলে যাহাকে বা যে বিষয়ে যাহা দিবার নির্ব্বন্ধ করিলাম কার্য্যদর্শীরা স্বীয় বিবেচনা অনুসারে তাহার ন্যূনতা করিতে পারিবেন।

১৯। আবশ্যক বোধ হইলে কার্য্যদর্শীরা আমার সম্পত্তির কোন অংশ বিক্রয় করিতে পারিবেন।

২০। আমার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক সকল শম্ভুচন্দ্রের (সংস্কৃত যন্ত্রের) পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে আমার একান্ত অভিলাষ শ্রীযুত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় যাবৎ জীবিত ও উক্ত পুস্তকালয়ের অধিকারী থাকিবেন তাবৎকাল পর্য্যন্ত আমার পুস্তক সকল ঐ স্থানেই বিক্রীত হয় তবে এক্ষণে যেরূপ সুপ্রণালীতে পুস্তকালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে ও তন্নিবন্ধন ক্ষতি বা অসুবিধা বোধ হইলে কার্য্যদর্শীরা স্থানান্তরে বা প্রকারান্তরে পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

২১। কার্য্যদর্শীরা একমত হইয়া কার্য্য করিবেন মতভেদস্থলে অধিকাংশের মতে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক।

২২। নিযুক্ত কার্য্যদর্শীদিগের মধ্যে কেহ অবিদ্যমান অথবা এই বিনিয়োগ পত্রের অনুযায়ী কার্য্য করিতে অসম্মত হইলে অবশিষ্ট দুই জনে তাঁহার

স্থলে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন। এইরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি আমার নিজের নিয়োজিত ব্যক্তির ন্যায় কার্য্যক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

২৩। যদি নিযুক্ত কার্য্যদর্শীরা এই বিনিয়োগ পত্রের অনুযায়ী কার্য্যভার গ্রহণে অসম্মত বা অসমর্থ হন তাহা হইলে যাঁহারা এই বিনিয়োগ পত্র অনুসারে বৃত্তি পাইবার অধিকারী তাঁহারা বিচারালয়ে আবেদন করিয়া উপযুক্ত কার্য্যদর্শী নিযুক্ত করাইয়া লইবেন। তিনি এই বিনিয়োগ পত্রের অনুযায়ী সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

২৪। যাবৎ আমার ঋণ পরিশোধ না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত এই বিনিয়োগ পত্রের নিয়ম অনুসারে নিযুক্ত কার্য্যদর্শীদিগের হস্তে সমস্ত ভার থাকিবেক। ঋণ পরিশোধ হইলে ঐ সময়ে যাঁহারা শাস্ত্রানুসারে আমার উত্তরাধিকারী থাকিবেন তাঁহারা আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবেন এবং সপ্তম নবম দশম একাদশ দ্বাদশ ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ ধারার নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক উপস্বত্ব ভোগ করিবেন। ঐ উত্তরাধিকারীরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কার্য্যদর্শীরা তাঁহাদিগকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া অবসৃত হইবেন।

২৫। আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপর নাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী এজন্য ও অন্য অন্য গুরুতর কারণ বশতঃ আমি তাঁহার সংস্রব ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি এই হেতু বশতঃ বৃত্তি নির্ব্বন্ধস্থলে তাঁহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং এই হেতু বশতঃ তিনি চতুর্ব্বিংশ ধারা নির্দ্দিষ্ট ঋণ পরিশোধ কালে বিদ্যমান থাকিলেও আমার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত অথবা দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ ধারা অনুসারে এই বিনিয়োগ পত্রের কার্য্যদর্শী নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। তিনি চতুর্ব্বিংশ ধারা নির্দ্দিষ্ট ঋণ পরিশোধ কালে বিদ্যমান না থাকিলে যাঁহাদের অধিকার ঘটিত তিনি তৎকালে বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা চতুর্ব্বিংশ ধারার লিখিত মত আমার সম্পত্তির অধিকারী হইবেন। ইতি তাং ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ সাল ইং ৩১ মে ১৮৭৫ সাল।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মোকাম কলিকাতা।

ইসাদী।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্যামাচরণ দে
শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় শ্রীনীলমাধব সেন শ্রীবিহারীলাল ভাদুড়ী
শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন শ্রীযোগেশচন্দ্র দে শ্রীকালীচরণ ঘোষ

সর্ব্ব সাকিম কলিকাতা।

চতুর্থ ধারার উল্লিখিত সম্পত্তির বিবৃতি—
(ক) সংস্কৃতযন্ত্রের তৃতীয় অংশ—
(খ) আমার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক—

বাঙগালা

(১) বর্ণপরিচয় দুই ভাগ
(২) কথামালা
(৩) বোধোদয়

বাঙগালা

(৪) চরিতাবলী
(৫) আখ্যানমঞ্জরী দুই ভাগ
(৬) বাঙগালার ইতিহাস ২য় ভাগ

বাঙগালা

(৭) জীবনচরিত
(৮) বেতালপঞ্চবিংশতি
(৯) শকুন্তলা
(১০) সীতার বনবাস
(১১) ভ্রান্তিবিলাস

বাঙগালা

(১২) মহাভারত
(১৩) সংস্কৃতভাষা প্রস্তাব
(১৪) বিধবাবিবাহ বিচার
(১৫) বহুবিবাহ বিচার

সংস্কৃত

(১) উপক্রমণিকা
(২) ব্যাকরণ কৌমুদী
(৩) ঋজুপাঠ তিন ভাগ
(৪) মেঘদূত
(৫) শকুন্তলা
(৬) উত্তরচরিত

ইংগরেজী

(১) Poetical Selection
(২) Selection from Goldsmith

(গ) যে সকল পুস্তকের সত্ত্বাধিকার ক্রয় করা হইয়াছে।
(১) মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত শিশুশিক্ষা তিন ভাগ।
(২) রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত কুলীন কুলসর্ব্বস্ব।
(ঘ) কাদম্বরী সটীক বাল্মীকি রামায়ণ প্রভৃতি মুদ্রিত সংস্কৃত পুস্তক।
(ঙ) নিজ ব্যবহারার্থ সংগৃহীত সংস্কৃত বাঙগালা হিন্দী পার্শী ইংরেজী প্রভৃতি পুস্তকের লাইব্রারী।
(চ) কর্ম্মটাঁড়ের বাঙগালা ও বাগান।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।"[২]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর সময় তাঁহার উইলের উল্লিখিত ঋণ ছিল না। তবে কার্য্য কর্ম্ম উপলক্ষে কোনও কোনও ব্যক্তির তাঁহার নিকট টাকা প্রাপ্য ছিল বটে, তাহা এস্থলে উল্লেখের আবশ্যক নাই। তাঁহার বাটীতে নিজ তহবীলে ও ব্যাঙ্কে প্রায় বিংশতি সহস্র টাকা জমা ছিল। যে সময়ে উইল হইয়াছিল, তৎকালে আয় কম ছিল, পরে যেমন আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল, বিদ্যাসাগরের দানও যথেষ্ট হইতে লাগিল। উইলের লিখিত তালিকা অপেক্ষা কি দেশস্থ কি বিদেশস্থ কি কলিকাতাস্থ অনেক দরিদ্র আত্মীয়ের নিরুপায় পরিবারগণকে মাসহরা দিতেন, এস্থলে সে সকলের নামোল্লেখ করা অনাবশ্যক। এই উইলের লিখিত অনেকেই বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় লোকান্তরিত হইয়াছেন। সুতরাং সে সকলকে আর মাসহরা দিতে হয় নাই।"[৩]

বিদ্যাসাগরের উইল নিয়ে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়েছে। মামলায় জয়ী হয়েছেন বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণচন্দ্র।

'পণ্ডিত °ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উইলের মকদ্দমা' শিরোনামে ১৮৯২ সালের ৩১-আগস্ট 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছে :

"পণ্ডিত °ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পৌত্র শ্রীমান প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁহার পিতা বাবু নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উইলের একজিকিউটার

বাবু ক্ষীরোদনাথ সিংহের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে যে অভিযোগ উপস্থিত করেন, তাহার ইসু ধার্য্যের জন্য মকদ্দমা উঠিয়াছিল।

বাদীপক্ষে কৌন্সলী পিউ উপস্থিত ছিলেন, একজিকিউটরের পক্ষে মিঃ সুইনো এবং মিস্‌য়ার্স ছিল, এবং চৌধুরী প্রধান প্রতিবাদী নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

বাদী তাঁহার পিতামহের উইলের মর্ম্মানুসারে বলেন যে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তিনিই উত্তরাধিকারী, তাঁহার পিতা নহেন, যেহেতু তিনি তাঁহার উইলে তাঁহাকে সমস্ত বিষয় বিভব হইতে বঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন।

উইলে যে একটী ধারা আছে তাহার মর্ম্ম এই যে, একজিকিউটরদিগের হস্তে তিনি তাঁহার সমস্ত বিষয় বৈভব রাখিয়া যাইতেছেন, তাঁহারা তাঁহার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিবেন, এবং সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইলে সেই সময় যাঁহারা তাঁহার উত্তরাধিকারী থাকিবেন, তাঁহাদিগকে সমস্ত বিষয় বৈভব বুঝাইয়া দিবেন, কিন্তু সেই সময় যদি তাঁহার উত্তরাধিকারীরা নাবালক থাকে, তাহা হইলে যতদিন তাঁহারা সাবালক না হয় ততদিন পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় বৈভব তাঁহাদিগেরই হস্তে থাকিবে। তাহার পর উইলে এরূপ লিখিত আছে যে, তাঁহার পুত্র নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যদৃচ্ছাচারী হইয়াছেন, তিনি তাঁহার সহিত কোন ঘনিষ্ঠতা রাখেন না, তত্রাপি তিনি যদি সে সময় জীবিত থাকেন, তাহা হইলে প্রথমে ঋণ সকল পরিশোধ হইবে, তৎপরে উত্তরাধিকারীগণ পাইবে। যদি পুত্রের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ পাইবে।

১৮৭৫ সালে এই উইল হয়, এবং উইলকর্ত্তা গত বৎসর পরলোক গমন করিয়াছেন। উইলকর্ত্তার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার পুত্রের সহিত পুনর্ব্বার মিল হইয়াছিল, এবং উইল পরিবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা না করিতে করিতেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

প্রতিবাদী নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আপত্তি করেন যে, উইলে তাঁহাকে যে সমস্ত বিষয় বৈভব হইতে বঞ্চিত করণের কথা লিখিত হইয়াছে, উহা আইনানুসারে অন্যায়। হাইকোর্ট পুত্র নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সানুকূলেই মকদ্দমাটী নিষ্পত্তি করিয়াছেন শুনিয়া আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিলাম।”

বিদ্যাসাগর-চরিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের জন্য বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্রও অপরিহার্য উপকরণ। চিঠিপত্রের মধ্যে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের এমন একটি পরিচয় পাওয়া যায় যা অন্যত্র দুর্লভ। বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্র একের পর আরেক উদ্ধার করি।

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদনম্—

আপনার শ্রীচরণারবিন্দের আশীর্ব্বাদ প্রভাবে আমি কায়িক ভাল আছি। ৩৮৲ আটত্রিশ টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি আপনকার শ্রাবণ মাসের খরচ ৩০৲

ত্রিশ টাকা ও মদনের মাতার ৮, আট টাকা। এই পত্রের পঁহুছ সংবাদ ও আপনকার কায়িক কুশল সংবাদদ্বারা নিরুদ্বেগ করিতে আজ্ঞা হয় ইতি
৮ শ্রাবণ

ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৭]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

পূজ্যপাদ শ্রীমত্ পিতৃদেব শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদনম্—

কাশীবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য অদ্য আমার নিকট ছয়টাকা জমা করিয়া দিলেন আমি চারিপাঁচ দিন পরে যখন মাঘমাসের টাকা পাঠাইব ঐ সঙ্গে ঐ ছয় ৬, টাকাও প্রেরিত হইবেক বেণীমাধববাবুর অভিলাষ ও অনুরোধ এই আপনি ইতিমধ্যে তাঁহার পিতৃদেবকে এই ছয়টাকা দেন অনেকদিন টাকা না যাওয়াতে তাঁহার পিতৃদেবের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে এই ছয়টাকা দিবেন আগামী শুক্র অথবা শণিবার সমুদয় টাকা পাঠাইব ইতি ৩০ মাঘ

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৫]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—

আপনকার ১ আশ্বিনের পত্র অদ্য ২১ আশ্বিন পাইলাম কারণ এই যে আমি ভাদ্রমাসের শেষে স্থানান্তরে গিয়াছিলাম অদ্য প্রাতে এখানে পঁহুছিয়াছি আমি যাইবার দিন হুণ্ডী সমেত পত্র পাঠাইয়াছিলাম বোধ করি তাহা পঁহুছিয়াছে কার্য্যবশতঃ অদ্যই স্থানান্তরে যাইতে হইল °পিতামহদেবের একোদ্দিষ্ট দিন ৩০ আশ্বিন হইবেক পূজার পূর্ব্বে আপনকার পত্র হস্তগত হইলে একোদ্দিষ্টের খরচ পাঠাইতে পারিতাম এক্ষণে ছাপাখানা প্রভৃতি সমুদয় বন্ধ আছে সুতরাং টাকা পাঠাইবার সুবিধা নাই আপাতত হাওলাত করিয়া কার্য্যশেষ করিবেন আমি কলিকাতায় আসিয়া ১০০, একশত টাকা ও আশ্বিন মাসের খরচের টাকা একহুণ্ডীতে পাঠাইয়া দিব। এসময়ে পাঠাইতে পারিলাম না এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। গত তিনবত্সরকাল যেসকল রোগ ভোগ করিতেছিলাম এক্ষণে প্রায় নাই বলিলেই হয় কিন্তু এককালে নিঃশেষ হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও সচ্ছন্দ হইয়াছি তাহার সন্দেহ নাই। ব্যস্ততাপ্রযুক্ত অদ্য আর কিছু লিখিতে পারিলাম না আসিয়া অন্যান্য বিষয়ে সংবাদ লিখিব ইতি
২১ আশ্বিন

ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৬]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—

বারাণসীনিবাসী শ্রীযুত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বে ৬ ছয়টাকা দিতে লিখিয়াছিলাম এক্ষণে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে আর ৫ পাঁচ-টাকা দিবেন এই ১১ এগার টাকা সত্বর প্রেরিত হইবেক ইতি ১২ চৈত্র

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৭]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—

বারাণসীনিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ৫ পাঁচটাকা অনুগ্রহপূর্ব্বক দিবেন এই পাঁচটাকা আগামী টাকা পাঠাইবার সময় পাঠাইব কিমধিকমিতি ২৬ চৈত্র

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৮]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—

৮৩ তিরাশী টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি নিম্নলিখিত বিনিয়োগ করিবেন

নিজ খরচ পৌষ—৪৫
সারদা দেবী ঐ—৭
মদনের মাতা ঐ—৮
কালিদাস ভট্টাচার্য্য—৪
নিস্তারিণী পিসী—১২ গোপালের প্রেরিত

আপনকার শ্রীচরণারবিন্দের আশীর্ব্বাদপ্রভাবে এখানকার একপ্রকার সমস্ত মঙ্গল। আমি সেখান হইতে আসিয়া অবধি অনেক ভাল আছি। বাসা পরিবর্ত্তের বিষয়ে পূর্ব্বপত্রে যে নিবেদন করিয়াছি যদি তাহা আপনকার নিতান্ত অনভিমত হয় তবে কেবল আমার প্রার্থনা অনুরোধে তাহাতে সম্মত হইবার আবশ্যকতা নাই। আপনি ও শম্ভুচন্দ্র এক্ষণে কায়িক কিরূপ আছেন সবিশেষ লিখিয়া পরিতৃপ্ত করিতে আজ্ঞা হয় ইতি ২৫ পৌষ ১২৮০

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৯]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—

গত রবিবার বাটী হইতে আসিয়াছি সেখানে সকলে কায়িক ভাল আছেন আমি এক্ষণে আপনকার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদপ্রভাবে অনেক সুস্থ হইয়াছি জানিবেন। সোমপ্রকাশের বরাতী ১৩৲ তের টাকা অদ্য দিলাম তাঁহারা রীতিমত রসীদ পাঠাইয়া দিবেন। ২৫৲ পঁচিশ টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি পঁহুছসংবাদ লিখিয়া উদ্বেগ দূর করিবেন। কঠোরব্রতে প্রবৃত্ত হইয়া শারীরিক কিরূপ আছেন জানিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইয়া আছে সবিশেষ লিখিয়া নিরুৎকণ্ঠ করিতে আজ্ঞা হয় কিমধিকমিতি ১৫ ফাল্গুন

ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১০]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনমিদম্

একশত তিপ্পান্ন টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি তন্মধ্যে আপনকার দুইমাসের খরচ ১২০৲ মদনের মাতার দুইমাসের ২০৲ ও শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দরুন ১৩৲। আপনকার শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদপ্রভাবে এখানকার সমস্ত মঙ্গল জানিবেন। আপনি গোপাল ও বেণী সকলে কেমন আছেন সবিশেষ সংবাদ দ্বারা চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হয় কিমধিকমিতি ১৭ মাঘ বুধবার

ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ--

বনমালীপুরের হারুকাকার মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যু হইয়াছে আর অষ্টাহ শুক্রবার অশৌচান্ত জ্ঞাতকারণ নিবেদন করিলাম

শ্রীঈ

ভ্রান্তিক্রমে গঙ্গামণি দেবীর টাকা হুণ্ডীর মধ্যে দেওয়া হয় নাই তাঁহাকে আপনি দুইমাসের ১৪৲ টাকা অনুগ্রহপূর্ব্বক দিবেন এই মাসের শেষেই অথবা তৎপূর্ব্বেই সুযোগক্রমে ঐ টাকা পাঠাইব

শ্রীঈ—[১১]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনমিদম্—

কয়েকদিবস হইল আমি রেজিষ্টরী ডাকযোগে এক পত্র লিখিয়াছি তাহা এতদিনে নিঃসন্দেহ আপনকার হস্তগত হইয়াছে। আমি ১ শ্রাবণে আপনকার এক পত্র পাইয়াছিলাম তৎপরেই রেজিষ্টরী পত্র পাঠাইয়াছি বেণীকে একখান

পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা সে আমাকে দেখাইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন এখানে আর কাহাকে পত্র লিখিয়াছেন কিনা তাহা আমি জানি না এবং কি কারণে তাঁহারা উত্তর লিখেন নাই তাহাও বলিতে পারি না। আপনি ৬ আষাঢ়ে যে পত্র লিখিয়াছিলেন অসুস্থতা ও ব্যস্ততাবশতঃ তাহার উত্তর লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। তত্‌পরে ১ শ্রাবণের পূর্ব্বে আপনকার আর কোন পত্র আমি পাই নাই। ২ আষাঢ়ে কুমুদিনীর বিবাহ হয় তজ্জন্য কিছুদিন অতিশয় ব্যস্ত ছিলাম ও অসুস্থ হইয়াছিলাম। নারায়ণ প্রভৃতি সকলে এক্ষণে কলিকাতায় আছেন এবং সকলে ভাল আছেন। পরশ্বঃ দিন দীনবন্ধু ও শম্ভুচন্দ্রের পত্র পাইয়াছি তাঁহারা সপরিবারে ভাল আছেন। ঈশান কলিকাতায় আছেন তিনিও ভাল আছেন। বেণী কলিকাতায় আছেন তিনিও ভাল আছেন এবং অদ্য ৫।৬ দিন হইল পশপুরের লোক আসিয়াছিল তথাত্র সকলে ভাল আছেন। এতদ্ভিন্ন দিগম্বরী ও মন্দাকিনী ও স্বপুত্রকন্যাপ্রভৃতিসমেত ভাল আছেন। এইরূপে আপনকার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে আপনকার পরিবার সকলেই ভাল আছেন তজ্জন্য কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইবেন না। ৪ঠা শ্রাবণ দীনবন্ধুর তৃতীয় কন্যার বিবাহ হইয়াছে জানিবেন ইতি ১২ শ্রাবণ ১২৭৯ সাল

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১২]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্‌—

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্‌—

শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ৮৲ আট টাকা দিবেন তাঁহার পুত্র এখানে আমার নিকট ঐ টাকা জমা দিলেন আগামী টাকা পাঠাইবার সময় পূর্ব্বের ৫৲ ও এবারের ৮৲ এই ১৩৲ তের টাকা পাঠাইব ইতি ২৭ পৌষ

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১৩]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্‌—

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্‌—

অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ১০৲ দশ টাকা দিবেন ইতি ২০ বৈশাখ ১২৮১ সাল

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১৪]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—
অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ৪, চারি টাকা দিবেন ইতি ৫ অগ্রহায়ণ

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১৫]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—
অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত কলিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ৫, পাঁচ টাকা দিবেন ইতি ১৫ চৈত্র ১২৮০ সাল

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১৬]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—
আপনকার শ্রীচরণারবিন্দের আশীর্ব্বাদপ্রভাবে এক্ষণে আমি অনেক সুস্থ হইয়াছি অদ্য ১৮।১৯ দিন হইল আর অসুখ বোধ হইতেছে না। শম্ভুচন্দ্রের পত্রে অবগত হইলাম আপনি অনেক সুস্থ হইয়াছেন গঙ্গাতীরে গিয়া আহ্নিকাদি কার্য্য করিয়া আসিতেছেন এই সংবাদে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম এবং উদ্বেগ দূর হইল।

একশত সাতষট্টি টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি নিম্নলিখিত মত বিনিয়োগ করিতে আজ্ঞা হয়।

পিতামহীদেবীর একোদ্দিষ্টের খরচ—১০০,
আপনকার অগ্রহায়ণের খরচ—৪৫,
সারদা দেবী—৭,
মদনের মাতা—৮,
গঙ্গামণি দেবী—৭,

১৬৭,

ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ৪ চারিটাকা দিবার বরাত লিখিয়াছিলাম বিস্মৃতিক্রমে হুণ্ডীতে ঐ টাকা দেওয়া হয় নাই আগামী মাসে পাঠাইব। এখানকার আর সমস্ত মঙ্গল জানিবেন আপনি কায়িক কিরূপ থাকেন মধ্যে মধ্যে তাহার সংবাদ পাইলে চরিতার্থ হইব ইতি ২০ অগ্রহায়ণ ১২৮০ সাল

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১৭]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—

আপনকার শ্রীচরণারবিন্দের আশীর্ব্বাদপ্রভাবে এখানকার সমস্ত মঙ্গল জানিবেন আপনকার ও মদনের মাতার মাঘমাসের খরচ হিসাবে ৭০ সত্তর টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি পঁহুছসংবাদ লিখিয়া নিরুদ্বেগ করিতে আজ্ঞা হয়—আপনারা কায়িক কিরূপ আছেন তাহার সবিশেষ লিখিতে আজ্ঞা হয় কিমধিকমিতি ২২ ফাল্গুন

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১৮]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—

আপনকার আজ্ঞাপত্র পাইয়াছি। আপনি ও বেণীমাধব উভয়ে কায়িক ভাল আছেন এই সংবাদে অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। ঈশানচন্দ্র আমায় লিখিয়াছিলেন ৩০ ত্রিশ টাকার নোট পাঠাইলেই কলিকাতায় আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবেন তদনুসারে ১২ ফাল্গুন ৩০ টাকার নোট রেজিষ্টরী করিয়া তাঁহার লিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়াছি এ পর্য্যন্ত তিনি আইসেন নাই এবং পত্রেরও উত্তর পাই নাই। যদি তিনি আইসেন তাঁহার সহিত যেরূপ কথাবার্ত্তা হয় সবিশেষ শ্রীচরণে নিবেদন করিব।

আমি এক্ষণে অনেক ভাল আছি এখানকার আর সমস্ত মঙ্গল জানিবেন ইতি ২ চৈত্র ১২৮১ সাল

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১৯]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্‌—

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্‌

চুরাশী টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি তন্মধ্যে আপনকার ও মদনের মাতার ফাল্গুন মাসের খরচ ৭০, বাকী চোদ্দ টাকা শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হিসাবে পূর্ব্বে যে ছয়টাকা দিয়াছিলেন তাহা লইবেন এবং কয়েক-দিন হইল যে আটটাকা দিবার জন্য পত্র লিখিয়াছি অবশিষ্ট আট টাকা সেই হিসাবে প্রেরিত হইল। আপনকার শ্রীচরণারবিন্দের আশীর্ব্বাদপ্রভাবে এখানকার কায়িক সমস্ত মঙ্গল ইতি ১১ চৈত্র

ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[২০]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্‌—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্‌—

গিরিশবাবুর ভ্রাতার মৃত্যু হইলে পর টাকা পাঠাইবার বন্দোবস্তের বিষয়ে আপনকার অভিপ্রায় জানিবার অভিপ্রায়ে এক পত্র লিখিয়াছিলাম আপনকার পত্র পাঠ করিয়া বোধ হইল সে পত্র আপনি পান নাই। যাহা হউক এক্ষণে স্থির করিলাম মাস মাস কলিকাতা হইতে ডাকে নোট পাঠাইব মাস মাস ৩৮ টাকা পাঠাইবার সুবিধা হইবেক না কারণ ৮ টাকার নোট নাই এজন্য স্থির করিয়াছি ৪ মাস ৪০ টাকার নোট পাঠাইয়া পঞ্চম মাসে ৩০ টাকা পাঠাইব তাহা হইলেই মাসে ৩৮ টাকা পাওয়া হইবেক তর্কালঙ্কারের মাতাকে প্রথম ৪ মাস ৮ টাকা হিসাবে দিয়া ২ টাকা আপনকার নিকট রাখিবেন পঞ্চম মাসে এই সঞ্চিত ৮ টাকা দিবেন অথবা তাঁহাকে মাস মাস দশ ১০, টাকা দিবেন এবং কহিবেন পঞ্চম মাসে তিনি টাকা পাইবেন না এইরূপে যাহাতে সুবিধা হয় করিয়া দিবেন। আমি ফরাসডাঙ্গায় আছি কল্য কলিকাতায় গিয়া আষাঢ় মাসের টাকা পাঠাইয়া দিব। শ্রাবণমাস অবধি মাস আরম্ভ হইলেই টাকা পাঠাইয়া দিব বিলম্ব হইবেক না জানিবেন। আমি এক্ষণে শারীরিক কিছু সুস্থ হইয়াছি কিন্তু তাহাতে বিশ্বাস নাই। ২।৩ মাস ভাল থাকিয়া পুনরায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ি। এক্ষণে আমি যেরূপ অবস্থায় কাল যাপন করিতেছি তাহাতে আর আমার একবারে সুস্থ হইবার আর প্রত্যাশা নাই গত বৎসরের বৈশাখ অবধি যেরূপ মনোবেদনায় কালহরণ করিতেছি তাহা বলিয়া ব্যক্ত করিবার নহে। যাহা হউক আপনাকে এবিষয়ে কিছু জানাইব না স্থির করিয়া রাখিয়া ছিলাম কিন্তু কিছু দিন হইল এরূপ কারণ ঘটিয়াছে যে আপনাকে না জানাইয়া ক্ষান্ত থাকা উচিত হয় না এজন্য এক স্বতন্ত্র পত্রে আপনার গোচর করিব ইতি তাং ১১ আষাঢ়

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

পুনশ্চ—

জ্যৈষ্ঠমাসের টাকা লইয়া যে বরাত দিয়াছিলেন ঐ বরাত অনুসারে টাকা দেওয়া হইয়াছে জানিবেন ইতি[২১]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—

কলিকাতা হইতে একপত্র হুণ্ডীসমেত পাঠাইয়াছি ঐ পত্রের উত্তর কর্ম্মাটাড়ে লিখিবেন এই প্রার্থনা করিয়াছিলাম অদ্য তিন দিন হইল এখানে আসিয়াছি মনে করিয়াছিলাম এখানে আসিয়াই আপনকার পত্র পাইব কিন্তু এপর্য্যন্ত পত্র না আসাতে অতিশয় উদ্বেগ হইতেছে অথবা এপর্য্যন্ত আমার পত্র আপনকার হস্তগত হয় নাই। যাহা হউক আপনি এক্ষণে কায়িক কিরূপ আছেন অনুগ্রহ করিয়া তাহার সবিশেষ সংবাদ লিখিতে আজ্ঞা হয়। ইতি ১০ আশ্বিন

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

আমার ঠিকানা
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
রেলওয়ে ষ্টেশন
কর্ম্মাটাড়
কর্ডলাইন[২২]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—

১০৯ একশত নয় টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি নিম্নলিখিত বিনিয়োগ করিতে আজ্ঞা হয়

	জ্যৈষ্ঠমাসের
আপনকার—	৫০৲
মদনের মাতা—	৮৲
গঙ্গামণি দেবী—	৮৲
সারদা দেবী—	৭৲
নিস্তারিণী দেবী—	৩৲
	৭৬৲

কাশী থাকার সময় অন্ত্যেষ্টি তহবীলে আমার যে দেনা হইয়াছিল তাহা

এই—	৬।৵৫
বস্ত্রখরিদ	৪৵৫
মিষ্টান্ন	৭।৵৫
ঘটীসাগর	১৲
মিছরী	৭৲
অতিরিক্ত বাসা খরচের দরুন	৫৲
কালিদাস ভট্টাচার্য্য	
	৩০৸৵১৫

অবশিষ্ট ২/৫ দুই টাকা পাঁচ পাই মিছরী ও সন্দেশ হিসাবে জমা থাকিবেক যদি ইতোমধ্যে আর মিছরী খরিদ হইয়া থাকে তাহা ইহা হইতে দিতে বলিবেন অবশিষ্ট যাহা থাকিবেক ময়রার হিসাবে জমা করিয়া দিতে বলিবেন।

শেষে শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে যে ১০৲ দশটাকা দিতে লিখিয়াছিলাম ঐ দশটাকা ভ্রান্তিক্রমে হুণ্ডীর সঙ্গে দেওয়া হয় নাই আগামী মাসে পাঠাইব। আপনকার শ্রীচরণারবিন্দের আশীর্ব্বাদপ্রভাবে এখানকার সমস্ত মঙ্গল। আপনাদিগের কুশলসংবাদদ্বারা চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হয় ইতি ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ সাল

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[২৩]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—

আমি মধ্যে অতিশয় অসুস্থ হইয়াছিলাম এবং অধিকাংশ সময় কলিকাতায় উপস্থিত ছিলাম না এজন্য এতদিন আপনাকে পত্র লিখিতে অথবা টাকা পাঠাইতে পারি নাই এক্ষণে আপনকার আশীর্ব্বাদ প্রভাবে অপেক্ষাকৃত অনেক সুস্থ হইয়াছি। একশত সাতাত্তর টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি

পিতামহদেবের একোদ্দিষ্টের খরচ—	১০০৲
আপনকার আশ্বিন মাসের খরচ—	৬০৲
মদনের মাতার আশ্বিন মাসের খরচ—	১০৲
গঙ্গামণি দেবীর আশ্বিন মাসের খরচ—	৭৲

আপনি এক্ষণে কায়িক কিরূপ আছেন তাহার সবিশেষ সংবাদদ্বারা চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হয় এখানকার সমস্ত মঙ্গল ইতি ২১ কার্ত্তিক

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[২৪]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

আপনকার পত্র পাইয়া সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলাম। আপনি এক্ষণে কায়িক ভাল আছেন এই সংবাদে পরম আহ্লাদিত হইলাম। পিতামহীদেবীর শ্রাদ্ধে মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ করিয়াছেন এবং ৪০ জন মহারাষ্ট্রীয় ও ৪৫ জন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ জলপান করিয়াছেন ইহাতে আমার যারপরনাই আহ্লাদিত জন্মিল। এরূপ ব্রাহ্মণ ভোজন ও এরূপ ক্ষেত্রে তৈজসাদি দানই যথার্থ কর্ম্ম।

আমার উদরাময়ের সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্তি হইয়াছে কিন্তু অদ্যাপি সচ্ছন্দরূপে আহার করিতে পারিতেছি না। পাছে পুনরায় রোগের আবির্ভাব হয় এই ভয়ে সাবধানে আহারাদি করিতে হইতেছে। সচ্ছন্দরূপ আহার চলিতেছে না এজন্য অদ্যাপি অতিশয় দুর্ব্বল আছি। বোধ করি আর কিছু দিনেই সম্পূর্ণরূপে সচ্ছন্দ হইব। এখানকার আর সমস্ত মঙ্গল জানিবেন ইতি ৬ পৌষ

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

অত্রপত্রে শম্ভুচন্দ্রভায়া আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে তোমার মাসিক বরাদ্দের মধ্য হইতে ১৫ পনর টাকা পাঠাইতে লিখিয়াছ কিন্তু তাহা না করিয়া আমি এই ১৫৲ পনর টাকা স্বতন্ত্র পাঠাইব অর্থাৎ তোমার বাটীতে যেরূপ টাকা পাঠাই সেইরূপ পাঠাইব এই পনর টাকা আমি স্বতন্ত্র দিব। পৌষ মাসের টাকার সঙ্গে এই ১৫৲ টাকা প্রেরিত হইবেক তুমি আপাততঃ হাওলাত করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করিবে। তোমার পত্র পাইবার পূর্ব্বেই চন্দ্রশেখরের কাশী যাওয়া রহিত করিয়া তাহাকে বাটী পাঠাইয়াছি ইতি—[২৫]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনমিদম্—

আপনকার আজ্ঞাপত্র পাইয়া সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলাম। আমি উৎকট উদরাময় পীড়ায় প্রায় দেড় মাস কাল বড় কষ্ট পাইয়াছি অবশেষে অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ি। কলিকাতায় কোনমতে পীড়াশান্তি না হওয়াতে কর্ম্মটাঁড়ে আসিয়াছি। এখানকার জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর ৬ দিন মাত্র এখানে আসিয়াছি ইহার মধ্যেই বিলক্ষণ উপকার বোধ হইয়াছে বোধ করি ২০।২৫ দিন এখানে থাকিলেই সুস্থ হইব। আপনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইবেন এই কারণে পূর্ব্বে পীড়ার সংবাদ আপনাকে লিখি নাই এক্ষণে উদ্বেগের কোন কারণ নাই এজন্য লিখিলাম। আমি এত অসুস্থ না হইলে যজ্ঞেশ্বরকে না পাঠাইয়া স্বয়ং আপনকার নিকটে যাইতাম কেবল দুর্ব্বলতা-

বশতঃ যাইতে পারি নাই। গেলে আমাদ্বারা আপনকার কোন উপকার হইত না অথচ আমার পীড়াদ্বারা আপনাকে বিব্রত করিতাম। আপনি এ অবস্থায় স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিতেছেন এই সংবাদ পাইয়া আমি ম্রিয়মাণ হইয়া আছি; কেবল নিতান্ত নিরুপায় বলিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছি। আমি অসুস্থ অবস্থাতেও যাইতে উদ্যত হইয়াছিলাম কেবল সকলে প্রতিবন্ধক হইয়া যাইতে দিল না। শম্ভু ত্রয়োদশীর দিন বাটী হইতে নির্গত হইবেন লিখিয়াছেন ত্রয়োদশীর আর বিলম্ব নাই—যদি কোনগতিকে তাঁর আসিবার বিলম্ব হয় আমি যাইব। কল্য কলিকাতার পত্র পাইয়াছি সেখানে সকলে ভাল আছে। প্রায় একমাস হইল আমার মধ্যমা কন্যা কুমুদিনীর এক কন্যা হইয়াছে ইতি ১৩ আশ্বিন

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[২৬]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনমিদম্—

৭৬ টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি আপনকার মদনের মাতার ও সারদাদেবীর শ্রাবণ মাসের খরচ হিসাবে লইবেন আমি কয়েক দিবসের পর অদ্য অন্ন আহার করিয়াছি অতিশয় দুর্ব্বল আছি এজন্য আপনকার শেষপত্রের লিখিত অন্যান্য বিষয়ে কিছু লিখিতে কিঞ্চিৎ সবল হইয়া লিখিব। শম্ভুকে কহিবেন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র এখানে আসিয়াছেন এবং কাশীপুরের বাসাতে আছেন এখানে কিছু দিন থাকিলে সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারিবেন ইতি ২৬ শ্রাবণ

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[২৭]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—

অদ্য শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাত হইল তিনি কহিলেন আপনকার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল আপনি কায়িক ভাল আছেন এবং ...একোদ্দিষ্ট ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে তাঁহার মুখে যেরূপ উদ্যোগের কথা শুনিলাম তাহাতে আমি যে টাকা পাঠাইয়াছিলাম তদ্দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে অতএব আমার প্রার্থনা এই যে অধিক ব্যয় হইয়াছে জানিতে

পারিলে পাঠাইয়া দি কারণ ঐ ব্যয় আপনকার নিয়মিত টাকা হইতে নিৰ্ব্বাহ করিতে হইলে কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। আমি সেইরূপই আছি অদ্যাপি সম্যক্ সুস্থ হইতে পারি নাই আপনি এক্ষণে কায়িক কিরূপ আছেন লিখিতে আজ্ঞা হয়। আমি ৭।৮ দিন হইল বাটী হইতে আসিয়াছি বোধ করি আর ৭।৮ দিন পরে পুনরায় বাটী যাইব ২২ অগ্রহায়ণ বিস্মৃত হইব না তথাপি অনুগ্রহপূৰ্ব্বক ঐ মাসের ১০।১২ তারিখে ঐ দিবস উল্লেখে সংবাদ লিখিলে ভাল হয় ইতি ৩ কাৰ্ত্তিক ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শৰ্ম্মণঃ[২৮]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূৰ্ব্বকং নিবেদনম্—

আপনকার শ্রীচরণারবিন্দের আশীৰ্ব্বাদে আমি এক্ষণে কিছু ভাল আছি জানিবেন। শম্ভু প্রভৃতি সকলে নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছেন সোমবার বেলা ২॥ প্রহরেয় তাঁহারা কলিকাতায় পঁহুছেন আমি সেদিন কলিকাতায় ছিলাম তাঁহাদের মঙ্গলবার বাটী যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমি সোমবার সন্ধ্যাকালেই বৰ্দ্ধমানে আসিয়াছি। শম্ভুচন্দ্র ১২৮৲ একশত আঠাইশ টাকার দেনার ফৰ্দ্দ দিয়াছিলেন ঐ টাকা ও আপনকার ও তর্কালঙ্কারের মাতার ভাদ্র মাসের টাকা সমুদয়ে ১৬৬৲ একশত ছষট্টি টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি পঁহুছ সংবাদ লিখিয়া নিরুদ্বেগ করিতে আজ্ঞা হয়। আপনি কায়িক স্বচ্ছন্দ আছেন শুনিয়া পরম সুখী হইলাম। পঁহুছ সংবাদ বৰ্দ্ধমান ঠিকানায় লিখিবেন ইতি ভাদ্র

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শৰ্ম্মণঃ[২৯]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূৰ্ব্বকং নিবেদনম্—

আপনকার আজ্ঞাপত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম আমি তিন চারি দিন পরে কলিকাতায় যাইব এবং গিরিশবাবুর ভ্রাতাকে ১০০৲ একশত টাকা দিব। সেখানে ৪।৫ দিন থাকিয়া পুনরায় বৰ্দ্ধমানে আসিব। আপনি যখন পত্র লিখিবেন বৰ্দ্ধমান ঠিকানা দিবেন কারণ এক্ষণে প্রায় বৰ্দ্ধমানেই থাকি মধ্যে মধ্যে ২।৪ দিনের জন্য কেবল কলিকাতায় যাই। আমি এখন অনেক ভাল আছি জানিবেন ইতি তাং ২৩ পৌষ

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শৰ্ম্মণঃ[৩০]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—

৭১ একাত্তর টাকার হুণ্ডি পাঠাইতেছি নিম্নলিখিত বিনিয়োগ করিতে আজ্ঞা হয়।

নিজ খরচ আশ্বিন	...	...	৫০৲
মদনের মাতা ঐ	...	...	৮৲
নিস্তারিণী দেবী ঐ	...	...	৩৲
গঙ্গামণি দেবী ঐ	...	...	৮৲
			৬৯৲

অবশিষ্ট ২৲ টাকা ও পূর্ব্বের তারাশঙ্কর তর্করত্নের পিসি বলিয়া যে ৩৲ টাকা প্রেরিত হইয়াছিল এই পাঁচ টাকা আপনকার নিকট জমা রাখিবেন। আমি তথায় গিয়া এই টাকার বিলি করিব। প্রায় একমাস আট দিন হইল আমার বাঁ পায়ে ও কোমরের নীচে এই দুই স্থানে দুটী ব্রণ হইয়াছিল, অদ্য ২১ দিন হইল অস্ত্র করা হইয়াছে, কোমরের নীচের ব্রণটি আর ৪।৫ দিনে ও বাঁ পায়ের ব্রণটি আর ১০।১২ দিনে সম্পূর্ণ শুষ্ক হইবে, উদ্বেগের কোন বিষয় নাই জানিবেন। শম্ভুচন্দ্রের পত্রে অবগত হইলাম আপনি এক্ষণে অপেক্ষাকৃত কিছু ভাল আছেন, দুই জানুতে যে বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়াছে। হস্তের ঘা সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়াছে কিনা অনুগ্রহ করিয়া তাহার সবিশেষ লিখিতে আজ্ঞা হয়। এখানকার আর সমস্ত মঙ্গল জানিবেন ইতি ৫ই আশ্বিন

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে যে দশটাকা দিতে লিখিয়াছিলাম ঐ দশটাকা শম্ভুচন্দ্রের হস্তে দিয়াছি। ইতি—[৩১]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনমিদম্

প্রায় দুইমাসের অধিক হইল আমি শিরোরোগে ও উদরপীড়ায় অতিশয় কষ্টভোগ করিতেছি বিশেষতঃ রাত্রিতে নিদ্রা হয় না এই সমস্ত কারণে আমার বুদ্ধির স্থিরতা নাই মনের অত্যন্ত চাঞ্চল্য জন্মিয়াছে কি করিয়াছি তাহার স্মরণ হয় না এবং কি করিতে হইবেক তাহা স্থির করিতে পারি না। আপনাকে যে দুই মাস পত্র লিখি নাই আপনকার আজ্ঞাপত্র পাইবার পূর্ব্বে তাহা বোধ ছিল না। যাহা হউক এতদিন পত্র না লেখাতে আমার যে অপরাধ

হইয়াছে তাহা মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হয়। ১৫৭ টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি আপনকার চৈত্র বৈশাখ দুই মাসের ১৪০ মদনের মাতার ২০৲ গঙ্গামণি দেবীর বৈশাখের ৭৲ আর যদুনাথ চট্টোর হাওলাতের দরুন ১০৲। আমার এক্ষণে আয়ের খর্ব্বতা হইয়াছে এজন্য ব্যয়ের সঙ্কোচ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে তজ্জন্য সকল বিষয়েরই সংক্ষেপ করিতে হইবেক এক্ষণে আপনকার নিকট নিবেদন এই জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি আপনাকে মাস মাস ৪০ চল্লিশ টাকা দিলে আপনকার চলিতে পারে কিনা অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিতে আজ্ঞা হয় আপনি যেরূপ লিখিবেন তদনুসারে কার্য্য করিব। এখানকার একপ্রকার সমস্ত মঙ্গল জানিবেন ইতি ১৮ জ্যৈষ্ঠ

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৩২]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—

একশত ছিয়াত্তর টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি তন্মধ্যে ছিয়াত্তর টাকা মাসিক বরাদ্দের হিসাবে অবশিষ্ট একশত শ্রাদ্ধের ব্যয়ের হিসাবে প্রেরিত হইল। আমি এক্ষণে কিছু ভাল আছি জানিবেন। হুণ্ডীর পঁহুছসংবাদ ও আপনাদের কুশলসংবাদ লিখিয়া নিরুদ্বেগ করিতে আজ্ঞা হয়। এখানকার আর আর সমস্ত মঙ্গল জানিবেন ইতি ২৮ আশ্বিন[৩৩]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—

৭৬ টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি নিম্নলিখিত বিনিয়োগ করিতে আজ্ঞা হয়

নিজ খরচ চৈত্র	...	...	৫০৲
মদনের মাতা	...	...	৮৲
গঙ্গামণি দেবী	...	...	৮৲
সারদা দেবী	...	...	৭৲
নিস্তারিণী দেবী	...	...	৩৲
			৭৬

আপনকার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদপ্রভাবে এক্ষণে কিছু ভাল আছি জানিবেন ইতি ৫ চৈত্র ১২৮১ সাল

ভৃত্য
ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৩৪]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্‌—

শ্রীচরণারবিন্দেষ্‌

প্রণতিপ্‌র্ব্বকং নিবেদনম্‌—

৮৭ সাতাশী টাকার হ্‌ণ্ডী পাঠাইতেছি নিম্নলিখিত বিনিয়োগ করিবেন

আপনকার জ্যৈষ্ঠ	...	...	৬০৲
মদনের মাতা ঐ	...	...	১০৲
গঙ্গামণি দেবী ঐ	...	...	৭৲
কালিদাস ভট্টাচার্য্য ঐ	...	...	১০
			৮৭৲

আমি এক্ষণে কয়দিন অবধি কিছ্‌ ভাল আছি জানিবেন এখানকার আর আর সমস্ত মঙ্গল জানিবেন আপনি কায়িক কেমন আছেন লিখিয়া নির্‌দ্বেগ করিবেন ইতি ১২ আষাঢ়

ভৃত্য
ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৩৫]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্‌—

শ্রীচরণারবিন্দেষ্‌

প্রণতিপ্‌র্ব্বকং নিবেদনমিদম্‌—

অন্‌গ্রহপ্‌র্ব্বক শ্রীয্‌ক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ৫৲ পাঁচ টাকা দিবেন ইতি ২৫ মাঘ ১২৮০ সাল

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৩৬]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্‌—

শ্রীচরণারবিন্দেষ্‌

প্রণতিপ্‌র্ব্বকং নিবেদনম্‌—

শ্রীয্‌ক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অন্‌গ্রহপ্‌র্ব্বক ৬৲ ছয়টাকা দিবেন আগামী টাকা পাঠাইবার সময় ঐ টাকা পাঠাইব ইতি ২৬ মাঘ

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৩৭]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্‌—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্‌—

৮৯৷· উননব্বই টাকা চারি আনার হুণ্ডী পাঠাইতেছি নিম্নলিখিতমত বিনিয়োগ করিতে আজ্ঞা হয়।

নিজ	৫০৲
মদনের মাতা	৮৲
গঙ্গামণি দেবী	৮৲
সারদা দেবী	৭৲
নিস্তারিণী দেবী	৩৲
কালিদাস ভট্টাচার্য্য	৯৲
আমার হাওলাত	৪৷·
	৮৯৷·

আপনি এক্ষণে কায়িক সচ্ছন্দ আছেন ইহা শম্ভুচন্দ্রের মুখে অবগত হইয়া নিরুদ্বেগ হইলাম আপনকার শ্রীচরণারবিন্দের আশীর্ব্বাদপ্রভাবে আমি অনেক ভাল আছি জানিবেন ইতি ১৪ ফাল্গুন ১২৮১ সাল

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৩৮]

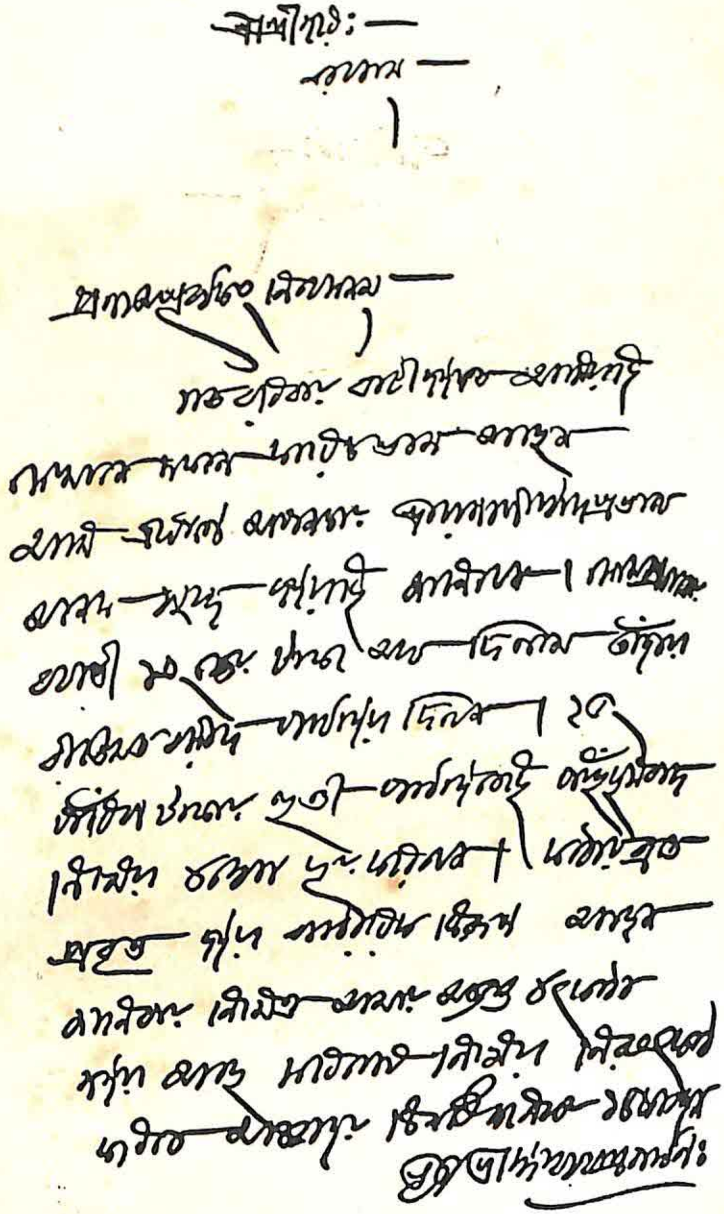
ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্‌—

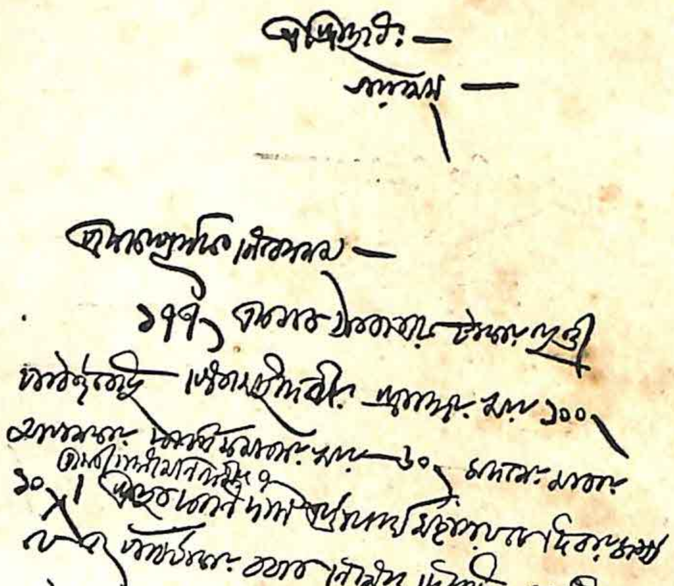
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্‌

১৭৭৲ একশত সাতাত্তর টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি পিতামহীদেবীর শ্রাদ্ধের খরচ ১০০৲ আপনকার কার্ত্তিকমাসের খরচ ৬০৲ মদনের মাতার ১০৲ শ্রীমতী গঙ্গামণি দেবীর ৭৲। শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দিবার জন্য যে ৫৲ পাঁচটাকার বরাত লিখিয়া দিয়াছি অনবধানবশতঃ ঐ ৫৲ টাকা হুণ্ডীর মধ্যে দিতে বিস্মৃত হইয়াছি অগ্রহায়ণের টাকার সঙ্গে পাঠাইতে ভুলিব না। আমি ইতিপূর্ব্বে দুইবার পত্র লিখিয়াছি বোধ করি তাহা পান নাই। যাহা হউক এক্ষণে আমি অনেক ভাল আছি জানিবেন এখানকার আর সমস্ত মঙ্গল জানিবেন ইতি ৬ পৌষ

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৩৯]



ঠাকুরদাসকে লেখা বিদ্যাসাগরের একখানা চিঠির প্রতিলিপি



ঠাকুরদাসকে লেখা বিদ্যাসাগরের একখানা চিঠির প্রতিলিপি

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—

শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ৬, ছয় টাকা দিবেন আগামী টাকা পাঠাইবার সময় ঐ টাকা প্রেরিত হইবেক ইতি ২২ শ্রাবণ ১২৮০

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৪০]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্

শম্ভুচন্দ্রের ২০ কার্ত্তিকের পত্রে আপনকার সুস্থতার সংবাদ পাইয়া কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম বলিতে পারি না। আমি আপনকার কষ্টের কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। আপনকার শ্রীচরণারবিন্দের আশীর্ব্বাদপ্রভাবে আমি ক্রমে সুস্থ হইতেছি যদি আর কোন ব্যতিক্রম না ঘটে আর ১০।১৫ দিনে সুস্থ ও সবল হইব এবং আপনকার শ্রীচরণদর্শন করিতে পারিব। এখানকার আর আর সমস্ত মঙ্গল জানিবেন ইতি ২৩ কার্ত্তিক

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

আপনকার কার্ত্তিকের খরচ	৪৫,
মদনের মাতা	৮,
সারদা দেবী	৭,
কালিদাস ভট্টাচার্য্যের দঃ	১০,
গঙ্গামণি দেবী	৭,
	৭৭,

হুণ্ডীর টাকা আনাইয়া উপরিলিখিতমত বিনিয়োগ করিতে আজ্ঞা হয়

অত্রপত্রে শম্ভুচন্দ্র আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে পিতৃদেব যখন যেরূপ থাকেন প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার তাহার সংবাদ লিখিবে। অদ্য তোমার বাটীতে আশ্বিন মাসের টাকা পাঠাইলাম এবং যাহাতে মাস মাস তোমার পুত্রেরা টাকা পায় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম।...পত্রে সকল সমাচার অবগত হইবে ইতি[৪১]

ঠাকুরদাসকে লেখা:

শ্রীশ্রীহরিঃ
সহায়—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্

শম্ভুচন্দ্র ও নারায়ণ নির্বিঘ্নে পঁহুছিয়াছেন ও আপনি কায়িক ভাল আছেন ইহাতে কি পর্য্যন্ত সুখী ও আহ্লাদিত হইলাম বলিতে পারি না পরম্পরায় আপনকার অসুস্থতা ও দৌর্ব্বল্যের সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বেগ ও দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল যাহা হউক এমতাবস্থায় আর আপনকার একাকী থাকা উচিত হয় না আমার ইচ্ছা নারায়ণ আপনকার শ্রীচরণসমীপে থাকে এবং কাশীর কালেজে অধ্যয়ন করে আপনকার অনুমতি পাইলে আমি ২।৪ দিনের জন্য সেখানে গিয়া বন্দোবস্ত করিয়া আসি। আমি এক্ষণে কিছু ভাল আছি জানিবেন। চকদিঘীতে আর ২।৩ দিন থাকিয়া কলিকাতা যাইব এবং সেখান হইতে পুনরায় সংবাদ লিখিব ইতি ১২ ভাদ্র

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৩২]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনমিদম্

আপনকার আজ্ঞাপত্র পাইয়া সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলাম আমি... উত্তরোত্তর দুর্ব্বল হইতেছি মন অত্যন্ত অসুস্থ তাহাতেই এরূপ দুর্ব্বল হইতেছি। আপনারা কায়িক ভাল আছেন ইহাতে পরম সুখী হইলাম! ৭৬ টাকার হুন্ডী পাঠাইতেছি ভাদ্রমাসের হিসাবে দিবেন ও লইবেন। এখানকার আর আর সমস্ত মঙ্গল জানিবেন।...ইতি ২৩ ভাদ্র

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৪০]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
সহায়—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনমিদম্—

একশত উনিশ টাকার হুন্ডী পাঠাইতেছি নিম্নলিখিত বিনিয়োগ করিতে আজ্ঞা হয়—

নিজখরচ মাঘ	৪৫
মদনের মাতা	৮
সারদা দেবী	৭
গঙ্গামণি দেবী	৭
নিস্তারিণী দেবী	২
মদনের মাতা	৫০
	১১৯

আপনকার আজ্ঞাপত্র পাইয়া শম্ভুচন্দ্রকে অবিলম্বে কলিকাতায় আসিতে লিখিয়াছি আসিলেই পাঠাইয়া দিব এবং আমিও ঐসঙ্গে অথবা দুই একদিন পরে শ্রীচরণসমীপে উপস্থিত হইতেছি। শ্রীমতী ছোট বধূমাতার যাইবার বিষয়ে বক্তব্য এই যে শীতকালে দুগ্ধপোষ্য বালিকা লইয়া দূরদেশ যাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। যাহা হউক শ্রীচরণসমীপস্থ হইয়া পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিব। আমি এক্ষণে অনেক ভাল আছি এখানকার আর সমস্ত মঙ্গল জানিবেন ইতি ২১ মাঘ

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

মদনের মাতার ১৫০ টাকার হিসাব পাঠাইতেছি তাঁহাকে দেওয়াইবেন এবং কহিবেন আমার নিকট তাঁহার যে ১৫০ টাকা জমা ছিল তাহা তিন দফায় তিনি সমুদয় লইবেন ইতি[৪৪]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্‌—

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্‌—

আপনকার শ্রীচরণারবিন্দের আশীর্ব্বাদপ্রভাবে এখানকার সমস্ত মঙ্গল জানিবেন। দুইশত সাঁইত্রিশ টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি নিম্নলিখিত মত বিনিয়োগ করিবেন

আপনকার নিজ খরচ—ভাদ্র ও আশ্বিন	...	...	৯০৲
পিতামহদেবের একোদ্দিষ্ট খরচ	...	...	১০০৲
মদনের মাতা—ভাদ্র আশ্বিন	... ...	...	১৬৲
সারদার মাতা—আশ্বিন	... ...	...	৭৲
গঙ্গামণি দেবী—ভাদ্র আশ্বিন	... ...	...	১৪৲
কালিদাস ভট্টাচার্য্যের দ	... ...	...	১০৲
			২৩৭৲

শম্ভুচন্দ্রের পত্রে অবগত হইলাম তিনি পূজার পর ত্রয়োদশীর দিন যাত্রা করিবেন তিনি আপনাকেও এই সংবাদ লিখিয়াছেন তাঁহার পত্রে অবগত হইলাম অতএব যজ্ঞেশ্বরকে বলিবেন শম্ভুর যাওয়া পর্য্যন্ত তিনি তথায় থাকেন। আমার উদরাময় হইয়াছিল তজ্জন্য অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছি। আমি কল্য অথবা পরশ্বঃ কর্ম্মটাড় নামক স্থানে যাইতেছি তথায় কিছুদিন থাকিব। সেখানকার জলবায়ু বড় ভাল তথায় কিছুদিন থাকিলে স্বচ্ছন্দ ও সবল হইতে পারিব। এই পত্রের পঁহুছসংবাদ ঐ ঠিকানায় লিখিবেন। আমার নাম লিখিয়া ঠিকানার স্থলে

"কর্ম্মটাড় ষ্টেশন"

এই মত লিখিলেই আমি পত্র পাইব।

আপনি এক্ষণে কায়িক কেমন আছেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার সবিশেষ লিখিতে আজ্ঞা হয়। ইতি ৩ আশ্বিন ১২৮০ সাল

ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৪৫]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—

অদ্য ১৩ দিন হইল আমি কর্ম্মটাঁড়ে আসিয়াছি। এখানে আসিয়া অবধি ভাল আছি। ২১ পৌষ পুনরায় কলিকাতায় যাইব এবং তথায় ১০।১২ দিন থাকিয়া এখানে আসিয়া শ্রীচরণদর্শনে যাইব। আপনি এবং ঈশান ও ছোট বৌ সকলে কেমন আছেন সবিশেষ লিখিয়া চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হয় ইতি ৮ পৌষ ১২৮২

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৪৬]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—

অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ৬ ছয় টাকা দিবেন ইতি ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ সাল

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৪৭]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—

আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ৬ ছয়-টাকা দিবেন ইতি ২ চৈত্র

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৪৮]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—

অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ১০্ দশটাকা দিবেন

ইতি ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ সাল

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৪৯]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—

অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ১০ দশ টাকা দিবেন

ইতি ২০ ভাদ্র

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৫০]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্—

অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ১০্ দশটাকা দিবেন

ইতি ৬ আশ্বিন ১২৮০

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৫১]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্

১৩২ একশত বত্রিশ টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি তন্মধ্যে আপনকার আষাঢ় শ্রাবণ দুইমাসের ৯০্ মদনের মাতা ১৬্ গঙ্গামণি দেবী ১৪্ কালিদাস ভট্টাচার্য্যের দঃ—১২। আপনি যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন তদনুসারে আপনকার ১৫্ পনর টাকা কম প্রেরিত হইল আর মদনের মাতাকে বলিবেন তাঁহাকেও দুই টাকা কম দিলাম।

শম্ভুচন্দ্রের মুখে শুনিলাম যজ্ঞেশ্বর পাক করিলে আপনি খাইবেন না সুতরাং আপনাকে নিজে পাক করিতে হইবেক ইহাতে অতিশয় উদ্বিগ্ন

হইলাম। এ অবস্থায় স্বয়ং পাক করিয়া আহার করা সহজ নহে। যাহার কেহ কোথাও না থাকে তাহারই এইরূপ ঘটে আপনকার সকল থাকিয়াও না থাকার তুল্য হইয়াছে।

এখানকার একপ্রকার সমস্ত মঙ্গল জানিবেন ইতি ১২ ভাদ্র

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৩২]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্

বেণীমাধব নির্বিঘ্নে এখানে পঁহুছিয়াছেন। ৯৭৲ সাতানব্বই টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি নিম্নলিখিত মত বিলি করিবেন।

নিজ খরচ মাঘ	৬০
মদনের মাতা	১০৲
গঙ্গামণি দেবী	২১৲
কালিদাস ভট্টাচার্য্য	৬৲
	৯৭৲

শ্রীমতী গঙ্গামণি দেবীকে আপনি দুইমাসের টাকা দিয়াছেন ঐ টাকা আপনি লইবেন অবশিষ্ট ৭৲ টাকা তাঁহাকে দিবেন। বেণীর মুখে শুনিলাম আপনকার এক পা ফুলিয়াছে এক্ষণে বোধ করি তাহা আরাম হইয়াছে তদ্ভিন্ন আপনি শারীরিক কিরূপ আছেন তাহার সবিশেষ লিখিতে আজ্ঞা হয়। এখানকার সকলে কিরূপ আছেন তাহা আপনি অনায়াসে অনুমান করিতে পারিতেছেন সে বিষয়ে কিছু লিখিবার প্রয়োজন নাই ইতি ১৩ ফাল্গুন

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

পুনশ্চ নিবেদনং

আপনি অনুগ্রহ করিয়া গঙ্গামণি দেবীকে এই কথা বলিবেন যে নীলমাধব বাবুর হিসাবে তাঁহার চৈত্র মাস পর্য্যন্ত শোধ হইয়া গেল ইতি[৩৩]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্

আপনকার শ্রীচরণারবিন্দের আশীর্ব্বাদপ্রভাবে এক্ষণে অপেক্ষাকৃত অনেক সুস্থ হইয়াছি বোধ হয় আর কিছু দিনে সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারিব।

পিতামহদেবের একোদ্দিষ্ট উপলক্ষে যেরূপ ব্রাহ্মণ ভোজনাদি নির্ব্বাহ হইয়াছে তাহাতে পরম আহ্লাদিত হইলাম। লিখিয়াছেন কতকগুলি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হইয়াছে আমার এইরূপ সংস্কার ছিল হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণেরা শ্রাদ্ধে ভোজন ও দান গ্রহণ করেন না এক্ষণে সেই সংস্কার অমূলক বোধ হইতেছে। আপনকার আশীর্ব্বাদে এখানকার আর আর সমস্ত মঙ্গল জানিবেন ইতি ৫ কার্ত্তিক

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৫৪]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্

প্রাতঃকালে গাড়ীতে চড়িয়া রাত্রি দুই প্রহর দুইটার সময় বর্দ্ধমানে পঁহুছাই পরদিন অর্থাৎ পরশ্বঃ আহারান্তে ৪টার সময় গাড়ীতে চড়িয়া রাত্রি ৯টার সময় কলিকাতায় পঁহুছিয়াছি কল্য অতিশয় দুর্ব্বল ছিলাম অদ্য আর কোন অসুখ নাই। এখানে সকলে ভাল আছেন। আপনারা নূতন বাটীতে উঠিয়া গিয়াছেন ও আপনারা কায়িক কিরূপ আছেন লিখিতে আজ্ঞা হয় ইতি ১৫ ফাল্গুন রবিবার

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

দীনবন্ধুকে কহিবেন গোপালের মাতুলের বাসার ঠিকানা লিখিয়া পাঠান আসিবার সময় আনিতে বিস্মৃত হইয়াছি ইতি

শ্রীঈ[৫৫]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্

শম্ভুচন্দ্র পরশ্বঃ সন্ধ্যাকালে কাশীযাত্রা করিয়াছেন। তাহার প্রমুখাৎ এখানকার সকল সংবাদ অবগত হইয়াছেন। ৮৪ টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি শ্রাবণ মাস হিঃ আপনকার ৬০ ষাটি মদনের মাতার ১০৲ সারদা দেবীর ৭৲ বাকী ৭৲ সাত টাকা শ্রীমতী গঙ্গামণি দেবী নামে একজন কাশীতে বাস করিয়া আছেন তাঁহাকে দিতে হইবেক ইনি শ্রীযুক্ত নীলমাধব মুখোর ভগিনী শম্ভুকে সকল কহিয়া দিয়াছি তিনি এই টাকার বিলি করিবেন ইতি ২৯ শ্রাবণ ১২৭৯ সাল

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৫৬]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্

একশত আশী টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি তন্মধ্যে—

পিতামহীদেবীর একোদ্দিষ্টের খরচ	...	১০০৲
আপনকার বাসা খরচ	... ...	৬০৲
মদনের মাতা	... ...	১০৲
সারদা দেবীর হিসাব শোধ	... ...	১০৲
		১৮০৲

৪।৫ দিনের মধ্যে এখান হইতে কাহাকেও পাঠাইতেছি তিনি পঁহুছিলে শম্ভুচন্দ্র বাটী আসিবেন। এখানকার একপ্রকার সমস্ত মঙ্গল জানিবেন। আপনি এক্ষণে কিরূপ আছেন লিখিয়া নিরুদ্বেগ করিবেন ইতি ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৭৮ সাল

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৩৭]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্

আমি মধ্যে অতিশয় অসুস্থ হইয়াছিলাম এজন্য এতদিন কোন সংবাদ লিখিতে পারি নাই এক্ষণে আপনকার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে অনেক সুস্থ হইয়াছি। সত্তর টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি পৌষ মাসের খরচের হিসাবে লইবেন ও মদনের মাতাকে দিবেন মাঘ মাসের টাকা সত্বর পাঠাইতেছি। শম্ভুচন্দ্র কল্য রাত্রিতে কাশীযাত্রা করিয়াছেন। এখানকার আর সমস্ত মঙ্গল জানিবেন ইতি ২০ মাঘ

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৩৮]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্

৭০ সত্তর টাকার হুণ্ডী পাঠাই আপনকার ও মদনের মাতার চৈত্র মাসের খরচ হিসাবে লইবেন। এখানকার সমস্ত মঙ্গল জানিবেন আপনকারদিগের কুশলসংবাদদ্বারা নিরুদ্বেগ করিতে আজ্ঞা হয় কিমধিকমিতি ২৫ চৈত্র

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৩৯]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্

একশত ছত্রিশ টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি নিম্নলিখিত বিনিয়োগ করিবেন। আপনি এক্ষণে কায়িক কিরূপ আছেন এবং শম্ভুচন্দ্র পীড়িত হইয়াছিলেন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন কিনা লিখিতে আজ্ঞা হয়। আমি কায়িক অনেক ভাল আছি জানিবেন। অত্যন্ত ব্যস্ততাবশতঃ অদ্য আর কোনও কথা লিখিতে পারিলাম না ইতি ৫ মাঘ

শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছিলেন এবার শ্রাদ্ধে ২০ কুড়ি টাকা অধিক খরচ হইয়াছে তাহা প্রেরিত হইল।

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

নিজ খরচ মাঘ	...	...	৫০্
মদনের মাতা	...	...	৮্
নিস্তারিণী দেবী	...	...	৩্
সারদা দেবী	...	...	৭্
গঙ্গামণি দেবী	...	...	৮্
আমার হাওলাত	...	...	৪০্
শ্রাদ্ধের অতিরিক্ত খরচ	...	...	২০্
			১৩৬্৬০

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্

আপনকার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদপ্রভাবে এক্ষণে কায়িক ভাল আছি। শ্রীযুত গোপালচন্দ্র শিটবাহ প্রয়াগ হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছেন শুনিলাম শম্ভুচন্দ্রও সেই সঙ্গে গিয়াছেন পাথেয় ছিল না এজন্য গোপালবাবুর নিকট ৩০্ ত্রিশ-টাকা হাওলাত করিয়াছেন আগত লোক কহিলেন কাশীতে আসিলে গোপাল-বাবুর ঐ টাকার প্রয়োজন হইবেক এজন্য ৪০্ চল্লিশ টাকার নোট পাঠাই শম্ভু কাশীতে আসিলে তাহাকে দিবেন তথা হইতে আগত ব্যক্তি শম্ভুর নিকট হইতে ১০্ দশটাকা হাওলাত লইয়াছিলেন তিনি আমার নিকট ঐ দশটাকা দিয়া পাঠাইতে কহিয়াছেন এজন্য আমার প্রেরিত ৩০্ ও ঐ ১০্ সমুদয়ে ৪০্ টাকা পাঠাইলাম। শম্ভু কাশীতে পঁহুছিলে শীঘ্র আসিতে আদেশ করিবেন আমি তাহার অপেক্ষায় রহিলাম সে আসিলে বাটী যাইব ইতি ৩০ মাঘ

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১১]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনমিদম্—

আপনারা সকলে কায়িক কুশলে আছেন এই সংবাদে আহ্লাদিত হইলাম। আমি ক্রমে সুস্থ ও সবল হইতেছি। অদ্যাপি অতি সাবধানে আহারাদির নিয়ম অনুসারে চলিতেছি। আমার তৃতীয় জামাতার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া ১০।১২ দিন হইল কলিকাতায় আসিয়াছি। তিনি অনেক সুস্থ হইয়াছেন তাঁহাকে লইয়া ৪।৫ দিন পরে পুনরায় কর্ম্মাটাঁড়ে যাইব। এখানকার আর সমস্ত মঙ্গল জানিবেন ইতি ১ আশ্বিন ১২৮২

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৬১]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্

আপনকার ৩০ ভাদ্রের লিখিত আজ্ঞাপত্র পাইয়াছি। আপনি কায়িক ভাল আছেন এই সংবাদে পরম সুখী হইলাম। মাতাঠাকুরাণী প্রভৃতি বাটী পঁহুছিয়াছেন অদ্য তথাকার পত্রে অবগত হইলাম। নারায়ণ কলিকাতায় আছে পূজার পর অবধি বর্দ্ধমানে আমার নিকটেই থাকিবেক এরূপ কথা আছে। আমি পূর্ব্ববত্ কিছু ভাল আছি জানিবেন ইতি ২ আশ্বিন

ভৃত্য
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৬০]

ঠাকুরদাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

শ্রীচরণারবিন্দেষু
প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্

আপনকার আজ্ঞাপত্র পাইয়া সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলাম। আমি যে দিন কর্ম্মাটাঁড়ে আসিব স্থির করিয়া আপনাকে পত্র লিখিয়াছিলাম কিন্তু কার্য্যগতিকে আসিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। ৬ আশ্বিন আসিবার সময় শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বরাত চিঠী লিখিয়াছিলাম। অদ্য কার্য্যানুরোধে পুনরায় কলিকাতা যাইতে হইল। পিতামহ দেবের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইবার সংবাদ অনুগ্রহপূর্ব্বক কলিকাতায় লিখিবেন। আমি অদ্যাপি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারি নাই সুস্থ হইলেই আপনকার শ্রীচরণ দর্শন করিব। আপনি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছেন এই সংবাদে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছি। শম্ভুচন্দ্র যাইতেছেন ইহাঁর প্রমুখাত্ সকল সংবাদ জ্ঞাত হইবেন। ইনি আপনকার নিকটে থাকিলে আমি অনেক অংশে নিশ্চিন্ত থাকি ইনি সেখান হইতে আসিলেই

আমার অত্যন্ত ভয় ও উদ্বেগ জন্মে। বিশেষতঃ ইহাঁর অনুপস্থিতিতে আপনাকে এ অবস্থায় পাক করিতে হইতেছে। ইনি যাইতেছেন আর দুর্ভাবনা রহিল না। ইনি সাধ্যানুরূপ পিতৃসেবা করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করিতেছেন। আমার অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য ঘটিতেছে না। নানা কারণে এরূপ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি যে কোনও বিষয়ে ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম করিতে পারি না। নতুবা আমিই আদ্যোপান্ত আপনকার নিকটে থাকিয়া চরণসেবা করিতাম ইতি।

ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১৪]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ

শুভাশিষঃ সন্তু

তোমার পত্র পাইয়া সবিশেষ অবগত হইলাম যাহারা দুইজনে ৮ টাকা দিয়া এক সার্টিফিকেট লইয়াছে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিবে যেন তাহারা কোনক্রমে একযোগে কর্ম্ম করি বলিয়া দরখাস্ত না দেয়। তাহাদিগকে কহিবে যদি তাহাদিগকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করে তাহাতে ভয় পাইবার আবশ্যকতা নাই ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট তলপ করিলেন তাহারা দুই নামেই আট টাকার সার্টিফিকেট দেখাইয়া বলে, আমরা টেক্স দিয়াছি ও সার্টিফিকেট পাইয়াছি আর আমাদের উপর টেক্সের দাওয়া হইতে পারে না যদি হাকীম তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া জরীমানা করেন জরীমানার টাকা দাখিল করিয়া দিতে বলিবে আমি ঐ টাকার দায়ী রহিলাম আর তাহাদিগকে কহিবে যেন পূর্ব্বপ্রাপ্ত দুই নামের সার্টিফিকেট ও ৮৲ টাকার নূতন সমন কোনমতে হাতছাড়া না করে। আমি গবর্ণমেণ্টে জানাইয়াছি তদারকের হুকুম হইয়াছে, আমি ও তদারকের নিমিত্ত নিযুক্ত ব্যক্তি সত্বর পঁহুছিতেছি একথা সকলের নিকট প্রচার করিবার প্রয়োজন নাই। তাহাদিগকে কহিবে আমি নিশ্চিন্ত নাই যাহাতে তাহাদের নিষ্কৃতি হয় অবিলম্বে তাহার পথ হইবে তাহারা যেন ভয় না পায়। কোন দিন আমরা যাইব কল্য তাহা অবধারিত হইবেক ইতি ১৯ ডিসেম্বর।

শুভার্থিনঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১৫]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা :

প্রিয়তম

তুমি এক্ষণে আমার একমাত্র ভরসার স্থান এই বিবেচনা করিয়া চলিবে ও সকল কর্ম্ম করিবে আমি যতশীঘ্র পারি বাটী যাইতেছি স্ত্রীলোকের বা ইতরজনের বাক্যে ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইবে না কোন কারণে বা কাহারো কথায় আমি কখন তোমার উপর বিরক্ত হইব ইহা মনেও স্থান দিবে না যাহাতে তোমার মান ও প্রতিপত্তি থাকে সে বিষয়ে আমি ক্ষণকালের নিমিত্ত অনবহিত হইব না ইহা নিশ্চিত জানিবে ইতি রবিবার।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১৬]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ

শুভাশিষঃ সন্তু

৭০০, সাতশত টাকার নোট পাঠাইতেছি আষাঢ় মাসের হিসাবে বিলি করিবে।

মাতাঠাকুরাণী	... ৩০,	স্কুল	... ... ২২০,
দীনবন্ধু	... ... ৭০,	ডাক্তারখানা	... ... ২২,
শম্ভুচন্দ্র	... ... ৭০,	স্ব মসহরা	... ... ৭০
ছোট বৌ	... ... ৮,	গ্রা মসহরা	... ... ৫৫,
মনোমোহিনী	... ... ১৫,		
দিগম্বরী	... ... ৫,		৩৬৭,
মন্দাকিনী	... ... ৫,	মাতামহী দেবীর	
সর্ব্বেশ্বর	... ... ১৫,	একোদ্দিষ্ট	... ১০০,
	২১৮,		৪৬৭,
			২১৮,
			৬৮৫,

স্বসম্পর্কীয় মসহরা দুই টাকা অধিক যাইতেছে ঐ দুই টাকা পাতুলের উমা মাসীকে দিবে তিনি আষাঢ় অবধি মাস মাস দুই টাকা পাইবেন খরচ বাদে অবশিষ্ট ১৫, পনর টাকা মজুদ রাখিবে আগামী মাসে ঐ পনর টাকা বাদে পাঠাইব। ভৈরবকে বলিবে সত্বর মসহরা বিলি করিয়া অবিলম্বে বিধবা-বিবাহের মসহরার বহি লইয়া কলিকাতায় আইসে পস্পুরে টাকা দিয়া তথা হইতে আসিতে বলিবে। মাতাঠাকুরাণী প্রভৃতি ঝড় বৃষ্টির দিন প্রস্থান করিয়াছেন অবিলম্বে তাঁহাদের পঁহুছ সংবাদ দ্বারা নিরুদ্বেগ করিবে ইতি ১৮ শ্রাবণ।

শুভার্থিনঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

মাতামহীদেবীর একোদ্দিষ্টের টাকা মাতৃদেবীর হস্তে দিবে।

শ্রীঈশ্বর[৬৭]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ

প্রিয়তম

আমি শারীরিক অসুস্থ ও টাকাও অত্যন্ত টানাটানি এজন্য টাকা পাঠাইতে বিলম্ব হইয়াছে যাহা হউক এক্ষণেও সমুদায় টাকা পাঠাইতে পারিলাম

না কেবল বিদায়ের দরুণ একশত দশ ১১০ টাকা পাঠাইতেছি পঁহুছ সংবাদ লিখিবে। বিবাহের হিসাবে টাকা বৈশাখের ৪।৫ নাগাইদ পাঠাইব তোমার কষ্ট হইতেছে সন্দেহ নাই কিন্তু নিতান্ত অসুবিধা বশতঃ তোমাকে কষ্ট দিতে হইতেছে। দীনবন্ধু আমাকেও লিখিয়াছেন ডিস্পেন্সরী ও নাইট স্কুল হিসাবে ৪০, টাকা দিবেন। অতএব তাঁহাকে লিখিয়া মার্চ্চ মাস অবধি তাঁহার নিকট হইতে টাকা আনাইয়া লইবে পূর্ব্ব কয় মাসের শ্রীরামের বেতন আমি দিব। পিতৃদেব সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন কি না সবিশেষ লিখিবে। যদি তিনি ত্বরায় সুস্থ হইতে না পারেন পাল্কী করিয়া কলিকাতায় পাঠাইবে কোন মতে অন্যথা করিবে না। কয় দিবস হইল গোপাল বাটী গিয়াছে তাহার পঁহুছ সংবাদ লিখিবে। জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ্চ এপ্রেল এই চারি মাসের বালিকাবিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরা অর্দ্ধ বেতন পাইবেন মে মাস হইতে সম্পূর্ণ বেতন দিব। উদয়রাজপুরে ১মে হইতে পুনরায় বালিকাবিদ্যালয় বসাইবে। বালিকাবিদ্যালয়ের পূর্ব্বোক্ত হিসাবে টাকা বৈশাখের ১০ নাগাইদ পাঠাইব ইতি তাং ২৯ চৈত্র।

শুভার্থিনঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৬৮]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ—
শরণম্—

শুভাশিষঃ সন্তু—

ভৈরব দ্বারবানের হস্তে ৭৮০ সাতশত আশী টাকা পাঠাইতেছি নিম্নলিখিত মতে বিলি করিবে।

বাটী—
অগ্রহায়ণ—

মাতাঠাকুরাণী—	৩০,
শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যো—	৬০,
ছোট বৌ—	৮,
সর্ব্বেশ্বর বন্দ্যো—	১৫,
২ দ্বারবান্—	১৫,
	১২৮,

স্কুল—

কার্ত্তিক—	১৩৮,
অগ্রহায়ণ—	১৭৮,
	৩১৬,

৪৪৪,

ডাক্তারখানা—

কার্ত্তিক—	২২,
অগ্রহায়ণ—	২২,
	৪৪,

স্বসম্পর্কীয় মসহরা—

কার্ত্তিক—	৯২,
অগ্রহায়ণ—	৯২,
	১৮৪,
	৬৭২,

গ্রামস্থ মসহরা—

কার্ত্তিক—	৫৫,	
অগ্রহায়ণ—	৫০,	১১০,
		৭৮২,

কার্ত্তিক মাসের বাটীর খরচের হিসাবে ১৩০৲ টাকা পাঠাইয়াছিলাম তন্মধ্যে ২৲ দুই টাকা মজুদ আছে ঐ দুই টাকা দিলেই সমুদয়ে ৭৮২৲ টাকা হইবেক। স্কুলের টাকার মধ্যে শিবচন্দ্র এখানে ৪০৲ টাকা লইয়াছেন এজন্য কার্ত্তিক মাসের হিসাবে ১৩৮ টাকা মাত্র পাঠাইলাম।

বাটীর হিসাবে তোমার যে দেনা আছে আগামী মাসে তন্মধ্যে কতক টাকা পাঠাইব। মাতাঠাকুরাণীকে কহিবে ঈশানের হিসাবে তিনি কিছু চাহিয়াছিলেন তাহাও আগামী মাসে দিব, ইতি ১৬ পৌষ।

শুভার্থিনঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।[৩১]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ—

শুভাশিষঃ সন্তু—

৪৮০৲ চারিশত আশী টাকার নোট পাঠাই নিম্নলিখিত বিনিয়োগ করিবে।

পৌষ মাস

বাটীর খরচ—	২২৮৲
মসহরা স্বসম্পর্কীয়—	৬৮৲
বাটীর খরচ—	
মাতৃদেবী—	৩০৲
দীনবন্ধু—	৭০৲
শম্ভুচন্দ্র—	৭০৲
ছোট বৌ—	৮৲
মনোমোহিনী—	১৫৲
মন্দাকিনী—	১০৲
সর্ব্বেশ্বর—	১৫৲
	২১৮৲

গ্রামস্থ মসহরা—	৫৫৲
স্কুল—	১২০৲
ডাক্তারখানা—	২২৲
স্বসম্পর্কীয় মসহরা—	
গোপালচন্দ্র চট্টো—	৩৲
শ্যামাচরণ ঘোষাল—	৫৲
নীলাম্বর ন্যায়ালঙ্কার—	৫৲
বিন্ধ্যবাসিনী দেবী—	১৲
হরদাস তর্কালঙ্কার—	৪৲
রাধামণি দেবী—	১৲
হারাধন বন্দ্যো—	৩৲
তারাচরণ মুখো—	১০৲
রামেশ্বর মুখো—	৫৲
কালিদাস মুখো—	৪৲
প্রসন্নময়ী দেবী—	২৲
বরদা দেবী—	২৲
মোক্ষদা দেবী—	২৲
তারাসুন্দরী দেবী—	১০৲
গোবিন্দচন্দ্র অধিকারী—	৫৲
ভৈরবী দেবী—	২৲
ভগবতী দেবী—	২৲
নৃত্যকালী দেবী—	২৲
	৬৮৲

মনোমোহিনী ও মন্দাকিনীর নাম স্বসম্পর্কীয় মসহরার মধ্য হইতে উঠাইয়া বাটীর খরচের ফর্দ্দ মধ্যে নিবেশিত হইল তুমিও সেখানে সেইরূপ করিয়া লইবে। শিবচন্দ্র এখানে তাঁহার টাকা লইয়াছেন তাহা বাদে স্কুলের ১২০৲ টাকা পাঠাইলাম।

পত্রের পঁহুছ সংবাদ লিখিবে। দীনবন্ধু টাকা লইতে সম্মত হইয়াছেন এজন্য টাকা পাঠাইলাম। যদি তিনি বাটীতে না লিখিয়া থাকেন মেজো বৌ লইতে সম্মত হইবেন না এজন্য লিখিতেছি যদি না লিখিয়া থাকেন তথাপি তাঁহাকে লইতে বলিবে আমি দীনবন্ধুর হস্তের লিপি পাইয়াছি। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
২১ মাঘ।
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

সমুদয়ে ৪৮৩৲ টাকা তিন টাকা পাঠাইবার সুবিধা নাই এজন্য ৪৮০৲ পাঠাইলাম অন্য সকলকে সম্পূর্ণ দিবে তুমি ৩৲ টাকা কম লইবে। দুই মাস পরে একখান ১০৲ টাকার নোট পাঠাইব তাহা হইলে তোমার বাকী মাসিক ৩৲ টাকা পাইবে। যদি দ্বারবানেরা সেখানে না থাকে ঠিকা লোক করিয়া মসহরার টাকা পাঠাইয়া দিবে তাহাতে যাহা খরচ লাগে আপাততঃ তুমি দিবে পরে আমি দিব।

শ্রীঈ°

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ—

শুভাশিষঃ সন্তু—

চূড়ামণির হস্তে ৬৭৩ ছয় শত তিয়াত্তর টাকা পাঠাইতেছি নিম্নলিখিত মত বিনিয়োগ করিবে।

মাতাঠাকুরাণী—	৩০৲
দীনবন্ধু বন্দ্যো—	৭০৲
শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যো—	৭০৲
ছোট বৌ—	৮৲
মনোমোহিনী—	১৫৲
মন্দাকিনী—	১০৲
সর্ব্বেশ্বর বন্দ্যো—	১৫৲
স্বসম্পর্কীয় মসহরা—	৬৮৲
গ্রামস্থ মসহরা—	৫৫৲
স্কুল—	২১০৲
ডাক্তারখানা—	২২৲
শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যো বাটীর দেনা হিঃ—	১০০৲
	৬৭৩৲

তোমার বাটীর দরুণ দেনা একবারে দেওয়া সুবিধা হইবেক না ক্রমে ক্রমে দিব। যে বিবাহের কথা লিখিয়াছ তাহাতে আমার সম্পূর্ণ মত, ২।৩টি উত্তম পাত্র উপস্থিত আছে। আমার নিকট উপস্থিত হইলে দেখিয়া শুনিয়া অনায়াসে বিবাহ দিতে পারিব। অতএব কন্যার মাতাকে সংবাদ দিয়া যত সত্বর সুবিধা হয় তাহাদিগকে পাঠাইবে তাহাদের আসা স্থির হইলে আমাকে সংবাদ লিখিবে আমি তোমার নিকট লোক পাঠাইব এবং কোন স্থানে কিরূপে তাহাদিগকে পাঠাইবে তাহাও লিখিব। ছত্রগঞ্জ স্কুলের চাঁদা কত বাকী আছে জানিলে পাঠাইতে পারিব। একবার সমুদায় পরিশোধ করিয়া তৎপরে মাস মাস পাঠাইয়া দিব অতএব স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করিয়া সংবাদ লিখিবে। চন্দ্রকোণার কালী মুখো টাকা পাইয়াছেন জানিবে ইতি ৩১ চৈত্র।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

যদি ব্রাহ্মণ জাতি ভদ্রগৃহের বিধবা কন্যা বিবাহের নিমিত্ত উপস্থিত হয় তাহাদের সবিশেষ পরিচয় সমেত আমাকে সংবাদ লিখিবে উপস্থিত কন্যাটির বিবাহ সত্বর সম্পন্ন হইতে পারিবে আর কয়টি পাত্র উপস্থিত আছেন তাঁহারা নিজ ব্যয়ে বিবাহ করিবেন কন্যার সুযোগ করিয়া দিলেই হয় ইতি।[৭১]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শুভাশিষঃ সন্তু—

তিনশত টাকা পাঠাই ফৰ্দ্দ অনুসারে বিনিয়োগ করিবে। স্কুলের টাকা আষাঢ় শ্রাবণ দুই মাসের এককালে ৮।১০ দিন পরে প্রেরিত হইবে। কয় দিন হইল বিশেষ কারণ বশতঃ কলিকাতায় আসিয়াছিলাম অদ্য বৰ্দ্ধমান চলিলাম। বৰ্দ্ধমানে যে বাসা হইয়াছে সেখানে মাতাঠাকুরাণীর থাকার সুবিধা হইবেক না তাঁহাকে বাটী পাঠাইতে হইবেক অতএব একখান পাল্‌কী ও আট বেহারা ও প্রতাপ সিংহকে বৰ্দ্ধমান পাঠাইবে আর ভৈরব আমার নিকট থাকিলে ভাল হয় অতএব তাহাকে আপন কাপড় চোপড় লইয়া ঐ সঙ্গে আসিতে বলিবে বেহারা আসিতে কোনমতে বিলম্ব না হয় ইতি ৪ সেপ্টেম্বর।

শুভার্থিনঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শৰ্ম্মণঃ।[৭২]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শুভাশিষঃ সন্তু—

তোমার পত্র পাইয়া সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলাম আমি আর ৬।৭ দিন পরে বৰ্দ্ধমান হইতে উঠিয়া কলিকাতায় যাইব তথা হইতে পত্র লিখিলে কৃষ্ণনগরের বিধবা কন্যা ও তাহার মাতাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবে। তোমার পত্রের লিখিত অন্যান্য বিষয়ের উত্তর কলিকাতায় গিয়া লিখিব ইতি ৭ জ্যৈষ্ঠ।

শুভার্থিনঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শৰ্ম্মণঃ।[৭৩]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শুভাশিষঃ সন্তু—

অতঃপর যে সকল বিধবা কন্যার বিবাহ হইবেক তাহাতে আমি কিছুই খরচ করিব না স্থির করিয়াছি অতএব কৃষ্ণনগরের কন্যার মাতাকে স্পষ্ট বাক্য বলিবে আমি কেবল পাত্র স্থির করিয়া দিব পাত্র খরচ করিয়া বিবাহ করিবেন এবং আপন সঙ্গতি অনুরূপ অলঙ্কার দিবেন যদি ইহাতে সম্মত থাকেন তবেই তাঁহাকে ও তাঁহার কন্যাকে কলিকাতায় পাঠাইবে নতুবা প্রয়োজন নাই।

এ কথা লিখিবার অভিপ্রায় এই যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে কলিকাতায় যে কন্যার বিবাহ হয় সে অনেক স্বর্ণ অলঙ্কার পায় যদি তাঁহারও সে সংস্কার থাকে তবে সেই সংস্কার অনুযায়ী অলঙ্কার তাঁহার কন্যা না পাইলে তিনি নিঃসন্দেহ দুঃখিত হইবেন। এজন্য অগ্রে সকল কথা পরিষ্কার হইয়া থাকা উচিত।

* * *

আমি কলিকাতায় গিয়া তোমাকে সংবাদ লিখিব। এই পত্রের প্রথম ভাগে যে সকল কথা লিখিলাম কৃষ্ণনগরের কন্যার মাতা তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মত থাকেন তবে যে স্থানে তাঁহাদিগকে পাঠাইতে বলিব তথায় পাঠাইয়া দিবে ইতি ২১ জ্যৈষ্ঠ।

শুভার্থিনঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৭৪]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শুভাশিষঃ সন্তু—
...কৃষ্ণনগরের কন্যাকে পাঠাইবে যে লোক সঙ্গে আসিবে তাহাকে বলিয়া দিবে তাহাদিগকে রাজকৃষ্ণবাবুর বাটীতে পঁহুছাইয়া দেয় ইতি ১০ আষাঢ়

শুভার্থিনঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৭৫]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ—

প্রিয়তম—
তোমার পত্রে বিবাহবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। ব্যয় অধিক হইয়াছে বটে কিন্তু যেরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছ তাহাতে ইহাকে কোনমতেই অধিক ব্যয় বলা যায় না কেবল তোমার ক্ষমতা ও পরিশ্রমেই এরূপ সুশৃঙ্খলরূপে সমুদায় সমাধা হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। টাকার চেষ্টা দেখিতেছি সংগ্রহ হইতে অধিক বিলম্ব হইবেক না। এত টাকা ডাকে পাঠান পরামর্শ সিদ্ধ নহে অতএব তুমি একজন পাইক লইয়া আসিবে এবং টাকা লইয়া যাইবে। আমি অদ্যাপি সম্যক্ সুস্থ হইতে পারি নাই। ইতি তাং

* * *

শুভার্থিনঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।[৭৬]

করিবার চেষ্টায় আছে। আমার অবিদ্যমানে যে কিরূপ করিবে তাহা বলা যায় না যাহা হউক পিতামহী ঠাকুরাণীর প্রতিষ্ঠিত অশ্বথ বৃক্ষটি রক্ষণ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। এ মোকদ্দমার কত ব্যয় হইবেক তাহা তুমি লিখ নাই। আপাততঃ হাওলাৎ করিয়া অশ্বথ বৃক্ষের মোকদ্দমা সমাধা করিবে। পরে আমি ঐ টাকা তোমাকে দিব। পীতাম্বর যাইতেছেন ইহার প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইবে। তোমার পত্র আসিবার পূর্ব্বে ঈশান ঘাটাল গিয়াছিল। উহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবে

ইতি ৮ অগ্রহায়ণ ১২৯৬ সাল

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৭৯]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

প্রাণাধিক

শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন স্নেহাস্পদেষু

নারায়ণের বাটী মেরামতের টাকা আমি দিব না। তুমি নারায়ণের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া স্কুল *** তুমি সত্বর বীরসিংহায় *** ডাক্তারখানা বসাইবে। ডাক্তার শ্রীরাম ভায়াকে মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিলাম। ইতিপূর্ব্বেই শ্রীরামের সহিত আমার ডাক্তারখানা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা শেষ হইয়াছে নিশ্চিত জানিবে। তুমি তথাকার খাতায় ডাক্তার ২৫৲ কম্পাউন্ডার ৫৲ বাজে খরচ ২৲ ঔষধ ১৮৲ ডাক্তারখানা হিসাবে মোট ৫০৲ টাকা লিখিয়া * * * ইহার অন্যথা না হয় ইতি * * * ১২৯৮।[৮০]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

শুভাশিষঃ সন্তু

৫৬০ পাঁচশত ষাটি টাকার নোট পাঠাই পৃষ্ঠের লিখিত বিলি করিবে এবং পহুঁছ সংবাদ লিখিবে ইতিপূর্ব্বে তুমি লিখিয়াছিলে পিতামহী ঠাকুরাণীর অশ্বথ বৃক্ষের মোকদ্দমার দরুণ তোমার যথেষ্ট ধার হইয়াছে তজ্জন্য মাস মাস সুদ গণিতেছ ঐ দেনার পরিশোধ কারণ তুমি আমার নিকট টাকা ধার চাহিয়াছিলে এবং টাকা মাসহারা হইতে মাস মাস দশ টাকা করিয়া পরিশোধ করিবে। তুমি এরূপ লেখায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। কারণ আমি তোমাকে হাওলাত করিয়া ঐ বৃক্ষের মোকদ্দমার তদ্বির ও ব্যয় করিতে বলিয়াছিলাম। এখন গত কার্ত্তিক মাসের শেষে তোমাকে ঐ টাকা ও বেণীমাধবের মোকদ্দমার ব্যয়ের টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলাম কেবল কন্যা হেমলতার সহিত তোমার বাদানুবাদ উপস্থিত হওয়ায় টাকা স্থগিত রাখিয়া তোমাকে বলিয়াছিলাম। অশ্বথ বৃক্ষের মোকদ্দমার দরুণ সুদসহ

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শুভাশিষঃ সন্তু—

তুমি ও পূজ্যপাদ পিতৃদেব উভয়ে স্বচ্ছন্দ শরীরে আছ এই সংবাদে নিরুদ্বেগ ও আহ্লাদিত হইলাম। তুমি পিতৃদেবের নিকট থাকিলে আমার আর তাঁহার জন্য কোনও চিন্তা ও উদ্বেগ থাকে না। তাঁহার চরণারবিন্দে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করিবে এবং জানাইবে তদীয় শ্রীচরণারবিন্দের আশীর্ব্বাদ প্রভাবে আমি এখানে আসিয়া অনেক ভাল আছি এবং যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে কিছুদিন এ স্থানে থাকিলে বিলক্ষণ সুস্থ ও সবল হইতে পারিব। গঙ্গামণি দিদির টাকা পাঠাইতে বিস্মৃত হইয়াছে। অদ্য কলিকাতায় পত্র লিখিয়া দিলাম পৌষ মাসের টাকার সঙ্গে তাঁহার দুই মাসের টাকা পাঠাইবেক। ততদিন টাকা না পাঠাইলে তাঁহার অতিশয় কষ্ট হইবেক অতএব তুমি তহবীল হইতে তাঁহাকে ৮ৎ আট টাকা দিবে পৌষ মাসে টাকা আসিলে তহবীল ভর্ত্তি করিবে। শ্রীযুক্ত পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আমার প্রণাম জানাইবে। ১৪ পৌষ যাহাতে কাশীতে উপস্থিত হইতে পারি তাহার চেষ্টা করিব। এখনও অনেক দিন বিলম্ব আছে। তুমি ১০।১২ দিন অন্তর পিতৃদেবের সংবাদ লিখিবে ইতি ১৭ অগ্রহায়ণ।

শুভার্থিনঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

আমার ঠিকানা কেবল "কানপুর" এই মাত্র লিখিবে ঠাণ্ডী সড়ক বা অন্য কিছু লিখিলে পত্র পাইতে বিলম্ব হয় ইতি—[৭৭]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ—
শরণম্—

শুভাশিষঃ সন্তু—

তুমি অবিলম্বে কলিকাতায় আসিবে। তুমি আসিলে স্কুলের উপরিতন শ্রেণীর ব্যবস্থা করিব। বেঞ্চ গড়িতে দিয়াছি আর ৭।৮ দিনে প্রস্তুত হইবেক। যদি বিষ্ণুপুরিয়া ভাল তামাক ওখানে উপস্থিত থাকে এক টাকার কিনিয়া আনিবে ইতি ১১ শ্রাবণ ১২৯৭ সাল।

শুভার্থিনঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।[৭৮]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

শুভাশিষঃ সন্তু

তোমার পত্র পাইয়া সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলাম। দুর্বৃত্তগণের আস্পর্দ্ধা কম নহে। আমার জীবদ্দশাতেই পিতামহী ঠাকুরাণীর কীর্ত্তি লোপ

৫০০ পাঁচশত টাকা ও বেণীমাধবের মোকদ্দমার দরুণ ২০০ দুইশত টাকা মোট ৭০০ সাতশত টাকা যখন আমার দেনা তখন আমাকেই পরিশোধ করিতে হইবেক। আমার কথায় তুমি বিশ্বাস করিয়া অন্যের নিকট টাকা ধার করিয়া দিয়াছ মাত্র আমি ৭/৮ দিন পরে বীরসিংহ যাইয়া ঐ সমস্ত টাকা পরিশোধ করিব। আমি দেশে যাইবার পূর্ব্বে তুমি ইঁট সংগ্রহ করিবে বাটী যাইয়া বিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইবে এখানে তোমার সমক্ষে হেম মিস্ত্রিকে কপাট জানালা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে বলা হইয়াছে। আমি ক্রমে দুর্ব্বল হইতেছি আর অধিক দিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয় না তুমি শীঘ্র ডাক্তারখানা বসাইবার চেষ্টা কর ইতি ৩রা বৈশাখ ১২৯৮ সাল

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

শম্ভুচন্দ্র—	৬০৲
এলোকেশী—	৩০৲
নারায়ণী—	১২৲
ধর্ম্মদাস—	১০৲
পীতাম্বর—	১০৲
স্ব সম্পর্কীয়—	৭৩৲
বিধবাবিবাহ—	৭৩৲
গ্রামস্থ—	৫১৲
স্কুল—	২৩৬৲
ছিরুর স্ত্রী—	২৲
ভৈরব—	২৲
প্রতাপ—	২৲
শ্রীপতির মাতা—	২৲
	৫৬৩৲[৮১]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে (?) লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ—
শরণম্—

শুভাশিষঃ সন্তু—

পিতৃদেব সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন ও মাতৃদেবী সুস্থমনে ও সচ্ছন্দশরীরে আছেন এই সংবাদে পরম আহ্লাদিত হইলাম। অতঃপর পিতৃদেবকে কোন প্রকার উৎকট পরিশ্রম করিতে দিবে না যেমন অবস্থা তদনুরূপ করাও উচিত। তোমাদের চৈত্রমাসের ৬০৲ ও মদনের মাতার ফাল্গুন চৈত্র ২০৲ ও সারদা দেবীর ৬৲ সমুদয়ে ৮৬ টাকার হুণ্ডী পাঠাই পঁহুছ সংবাদ লিখিবে। তুমি ও মাতৃদেবী বৈশাখের কোন নাগাএদ আসিতে চাও লিখিবে তদনুসারে বন্দোবস্ত করিব। এখানকার সমস্ত মঙ্গল জানিবে। তোমার বাটীর হিসাবে মাঘের টাকার সঙ্গে অতিরিক্ত ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা প্রেরিত হইয়াছে ফাল্গুনের

টাকার সঙ্গে বাকী পঞ্চাশ টাকা পাঠাইব। লোকনাথ বাবুর নিকট যে পঞ্চাশ টাকা লইয়াছিলাম তাহা দেওয়া হইয়াছে জানিবে। খুদীর বরের অন্বেষণে আছি নিশ্চিন্ত নাই ইতি ১১ চৈত্র

শুভার্থিনঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৮২]

পুত্র নারায়ণকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ—
শরণম্—

শুভাশিষঃ সন্তু—

তোমার পত্র পাইয়াছি লিখিয়াছ পথে যাইতে অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল কিন্তু যাইবার যেরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহাতে তাদৃশ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না যাহা হউক কিরূপ কষ্ট তাহার বিশেষ কিছু লিখ নাই সুতরাং বুঝিতে পারিলাম না। অদ্য আমি কলিকাতায় চলিলাম। তুমি কেমন থাক তাহার বিশেষ সংবাদ সেখানে লিখিবে। আমি কলিকাতায় চলিলাম এই সংবাদ পিতৃদেবকে জানাইবে। তিনি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছেন চলিতে পারেন না চলিতে গেলে পায়ে পায়ে জড়াইয়া যায় ইহা অবগত হইয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলাম কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেই আমি তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনে যাইব মানস করিয়াছি। তুমি প্রতিসপ্তাহে তোমার ও পিতৃদেবের সবিশেষ সমস্ত সংবাদ লিখিবে ইতি ২১ আশ্বিন

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

পিতৃদেবের শ্রীচরণারবিন্দে প্রণাম নিবেদন করিয়া কহিবে তাঁহার পত্র পাইয়াছি ইতি[৮৩]

পুত্র নারায়ণকে (?) লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ—
শরণম্—

শুভাশিষঃ সন্তু—

কর্ত্তামহাশয় এক্ষণে কেমন আছেন সবিশেষ লিখিবে শম্ভু অদ্যাপি না আসাতে বোধ হইতেছে তিনি অদ্যাপি সুস্থ হইতে পারেন নাই অতঃপর তুমি প্রতি সপ্তাহে তথাকার সংবাদ লিখিবে কোনমতে অন্যথা করিবে না। একশত টাকার হুণ্ডী পাঠাইতেছি দেনাশোধ ও বাসাখরচ করিবে ও বাসাখরচ চালাইবে। চৈত্রমাস অবধি বাসাখরচ হিঃ কত পাঠাইব আন্দাজী লিখিবে। আমি অদ্য কৃষ্ণনগর যাইতেছি সোমবার ফিরিয়া আসিব। বাটীর ও এখানকার সমস্ত মঙ্গল জানিবে ইতি ২০ ফাল্গুন

শুভার্থিন
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৮৪]

পুত্রবধূ ভবসুন্দরীকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরি
শরণম্

বৎসে ভবসুন্দরী

শারীরিক অসুস্থতা প্রভৃতি কারণ বশতঃ অনেক দিন তোমাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। সেজন্য বোধ করি তুমি অতিশয় দুঃখিত আছ ও অসন্তুষ্ট হইয়াছ। আমি এত দিন তোমায় পত্র না লিখিয়া অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছি তাহার সন্দেহ নাই।

আমি কলিকাতায় অতিশয় অসুস্থ হইয়া দশ দিবস হইল কর্ম্মাটাড় আসিয়াছি। কলিকাতায় বিলক্ষণ অসুখ ভোগ করিয়াছি এখানে আসিয়াও ভালরূপ আরাম হইতে পারি নাই। এখানে আর ৮।১০ দিন থাকিয়া পুনরায় কলিকাতা যাইব। কলিকাতায় গিয়া যেন তোমার পত্র পাই। কুন্দ বোধ করি এতদিনে আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে। তাহাকে কাছে বসাইয়া খাওয়াইতে বড় ইচ্ছা হয়। তাহার সম্ভাষণ বাক্যগুলি সর্ব্বদাই মনে পড়ে। ইতি—১লা চৈত্র ১২৮৫ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৮৫]

পুত্রবধূ ভবসুন্দরীকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

বৎসে ভবসুন্দরী

এই পত্রের মধ্যে একশত পঞ্চাশ টাকার নোট পাঠাইতেছি। পঁহুছ সংবাদ ও তোমার মঙ্গল সংবাদ লিখিয়া নিরুদ্বেগ করিবে। এখানে সকলে ভাল আছেন। আমি অদ্যাপি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারি নাই। মৃণালিনী দিদিকে আমার স্নেহ সম্ভাষণ জানাইয়া বলিবে তাহার পত্র পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। দুই তিন দিনের মধ্যে তাহাকে পত্র লিখিব। হেমলতা কহিলেন, মাস মাস ৮০৲ আশী টাকা পাঠাইলে তোমাদের সব বিষয়ে সুবিধা হয়, এজন্য ঐ হিসাবে ৮০৲ আশী টাকা আর সাবেক খাজানার বাবতে ৭৫৲ পঁচাত্তর টাকা দিলাম। সমুদয়ে ১৫৫ এক শত পঞ্চান্ন টাকা হয়। হেমলতা এখানে পাঁচ টাকা লইয়াছেন, বাকী এক শত পঞ্চাশ টাকা প্রেরিত হইল। ইতি ৩রা চৈত্র ১২৯১ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৮৬]

পুত্রবধূ ভবসুন্দরীকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

বৎসে ভবসুন্দরি

তোমার পত্র পাইয়াছি এবং তোমরা সকলে ভাল আছ এই সংবাদে আহ্লাদিত হইয়াছি। আমি অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপ সুস্থ হইতে পারি নাই।

অতিশয় দুর্ব্বল আছি। বাটীর সকলে ভাল আছেন। মৃণা, কুন্দ, প্যারী, মতি ইহাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ সম্ভাষণ জানাইবে। তাহাদিগকে মনে করিলেই চক্ষে জল আইসে। শুনিলাম মৃণার এখান হইতে যাইতে ইচ্ছা ছিল না। যাইবার আগে জানিতে পারিলে, যাইতে দিতাম না। মধ্যে মধ্যে তোমাদের সংবাদ লিখিয়া নিরুদ্বেগ করিবে। ইতি সন ২৬শে চৈত্র ১২৯১ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৮৭]

পুত্রবধূ ভবসুন্দরীকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

বৎসে ভবসুন্দরি

এই পত্রের মধ্যে আশী টাকার নোট পাঠাইতেছি, পঁহুছ সংবাদ ও তোমরা সকলে কেমন আছ তাহার সংবাদ লিখিয়া নিরুদ্বেগ করিবে। আমি সেইরূপই আছি। অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপ সুস্থ হইতে পারি নাই। বাটীর আর সকলে ভাল আছেন। মৃণা, কুন্দ, প্যারী ও মতীকে আমার স্নেহসম্ভাষণ বলিবে। তাহাদের জন্য সর্ব্বদাই মন কেমন করে। মধ্যে মধ্যে চক্ষে জল পড়ে। আমি ৩।৪ দিনের মধ্যে একবার কর্ম্মাটাঁড় যাইব। সেখানে ৪।৫ দিনের অধিক থাকিব না। ইতি ৩০শে বৈশাখ ১২৯২ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

পত্রের পঁহুছ সংবাদ কলিকাতার ঠিকানায় লিখিবে।[৮৮]

পুত্রবধূ ভবসুন্দরীকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ—
শরণম্

বৎসে ভবসুন্দরি

এই পত্রের মধ্যে আশীটাকার নোট পাঠাইতেছি পঁহুছসংবাদ ও তোমরা সকলে কেমন আছ তাহার সংবাদ লিখিয়া নিরুদ্বেগ করিবে। কুমুদিনী অদ্যাপি সুস্থ হইতে পারেন নাই। বাটীর আর সকলে ভাল আছেন ইতি ৫ আশ্বিন ১২৯২ সাল

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৮৯]

পুত্রবধূ ভবসুন্দরীকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

বৎসে ভবসুন্দরি

এই পত্রের মধ্যে তোমাদের চৈত্র মাসের ৬০, ষাটি টাকা পাঠাইতেছি, পঁহুছ সংবাদ লিখিয়া নিরুদ্বেগ করিবে। মৃণা, কুন্দ, প্যারী ও নুদিকে আশীর্ব্বাদ

ও স্নেহ সম্ভাষণ জানাইবে এবং বলিবে তাহাদের জন্য আমার বড় মন কেমন করে। আবার কত দিনে তাহাদিগকে দেখিতে পাইব। তাহারা কেমন আছে লিখিবে। এখানে সকলে ভাল আছেন। ইতি—১লা চৈত্র ১২৯২ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১০]

পৌত্রী মৃণালিনীকে লেখা :

সস্নেহ সম্ভাষণমাবেদন মিদম্

তোমার পত্র পাইয়াছি এবং তোমার জননী দেবীর পেটের অসুখ ভাল হইয়াছে এবং তোমরা সকলে ভাল আছ আর তুমি বস্তুবিচার পড়িতেছ, কুন্দমালা কথামালা পড়িতেছে, এই সকল সংবাদ অবগত হইয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়াছি। তোমরা মন দিয়া লেখা পড়া শিখিবে। ভাল লিখিতে পারিলে আমি তোমাদিগকে অতিশয় ভাল বাসিব। তুমি মধ্যে মধ্যে আমাকে পত্র লিখিবে। আর কুন্দ যদি লিখিতে পারে, তাহাকেও পত্র লিখিতে বলিবে। তোমাদের পত্র পাইলে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইব।

প্রায় একমাস হইল আমার পেটের অসুখ হইয়াছে। এখনও ভাল হইতে পারি নাই। অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছি। আজ তিন দিন হইল কিছু ভাল আছি। বোধ হইতেছে আর ৪।৫ দিনে ভাল হইতে পারিব। তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না। তোমার ঠাকুর মা, পিসিমারা, এবং সুরেশ, যতীশ, হরিমোহন, রামকমল প্রভৃতি এবং রাণীরা সকলে ভাল আছেন। তোমার জননী, কুন্দ, প্যারী, মতি ইহাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ সম্ভাষণ বলিবে। দুর্ব্বল আছি বলিয়া তোমার জননীকে পত্র লিখিতে পারিলাম না। তোমাকে না লিখিলে হয় ত তুমি রাগ করিবে এজন্য তোমাকে লিখিলাম। আজ আর লিখিতে পারিব না। ইতি—১লা আষাঢ় ১২৯১ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১১]

পৌত্রী মৃণালিনীকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

সস্নেহ সম্ভাষণমাবেদনমিদম্

তোমার পত্র পাইয়াছি এবং তোমরা সকলে ভাল আছ এই সংবাদে নিরুদ্বেগ ও আহ্লাদিত হইয়াছি। একখানা বাঙ্গালা ম্যাপের জন্য লিখিয়াছ দুই তিন দিনের মধ্যে পাঠাইয়া দিব। মনোযোগপূর্ব্বক পড়িলে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট ও আহ্লাদিত হইব। তোমার মাতা, কুন্দ, প্যারী ও মতীকে আমার আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ সম্ভাষণ বলিবে। এখানে সকলে ভাল আছেন। আমি সেইরূপই আছি। ইতি ৩১শে চৈত্র ১২৯২ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১২]

পৌত্র প্যারীমোহনকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

প্রাণাধিক ভাই প্যারীমোহন

তুমি পত্র লিখিতে পারিয়াছ ইহাতে আমি কত আহ্লাদিত হইয়াছি বলিতে পারি না। তুমি মন দিয়া লেখা পড়া করিবে তাহা হইলে আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইব। তুমি প্রতি মাসে, দুইবার আমাকে পত্র লিখিবে।

তোমরা সকলে ভাল আছ এই সংবাদে আহ্লাদিত হইলাম। আমি এখন অনেক ভাল আছি। বাটীর আর সকলে ভাল আছেন। মতিমালা কুন্দমালা, মৃণালিনী ও তোমার জননীকে আমার স্নেহ সম্ভাষণ জানাইবে। ইতি ২৭শে পৌষ ১২৯২ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১৩]

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে* লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

সাদরসম্ভাষণমাবেদনমিদম্

তোমার প্রেরিত উপাদেয় উপহার পাইয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইলাম। আমার উপর তোমার যে প্রগাঢ় স্নেহ আছে এই উপহার তাহার সবিশেষ প্রমাণ বলিয়া পরম সমাদরে পরিগৃহীত হইল।

তুমি সর্ব্বদা অসুস্থ থাক—এই সংবাদে সাতিশয় দুঃখিত হইলাম। আমি চৈত্র বৈশাখ দুই মাস শয্যাগত থাকিয়া এক্ষণে অপেক্ষাকৃত অনেক সুস্থ হইয়াছি। বাটীর আর সকলে ভাল আছেন।

হর্ষচরিত মুদ্রিত হইয়াছে। কল্য একখানি তোমার নিকট পাঠাইয়া দিব। ইতি ২ আষাঢ় ১২৯০ সাল

শুভাকাঙ্ক্ষিণ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণ[১৪]

---

* রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বিদ্যাসাগর, ১২৯২ সালের ৮-অগ্রহায়ণ, লিখেছেন : "উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় বংশোদ্ভূত শ্রীযুত বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বিলক্ষণ বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত ও বিদ্যানুশীলন বিষয়ে সবিশেষ অনুরক্ত। বহুদিনের পরিচয় দ্বারা, ইনি সুশীল, সুবোধ, সচ্চরিত্র বলিয়া আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এ দেশের বড় মানুষের সন্তানেরা সচরাচর যে সমস্ত দোষে দূষিত হইয়া থাকেন, আমার যতদূর বোধ আছে, তদনুসারে ইনি সেসমস্ত দোষে কোনও অংশে দূষিত নহেন। আমার বিবেচনায় রাসবিহারী বাবু সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয় ব্যক্তি।"[১৫]

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে লেখা :

শ্রীহরিঃ
শরণম্

ভ্রাতঃ—

স্নেহপ্রদর্শনপূর্ব্বক যে মত্স্য পাঠাইয়াছ তাহা পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। আমি বোধ হয় কিছু ভাল আছি। পীড়ার আর বৃদ্ধি হয় নাই। ইতি ৭ কার্ত্তিক ১২৯১ সাল

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১৬]

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে লেখা :

শ্রীহরিঃ
শরণম্

সাদরসম্ভাষণমাবেদনমিদম্

তুমি এ পর্য্যন্ত সুস্থ হইতে পার নাই ইহাতে অতিশয় দুঃখিত হইলাম। আমি দুই চারি দিন ভাল থাকি আবার দুই চারি দিন অসুস্থ হই এই ভাবে চলিতেছে। মধ্যমা কন্যাটি অতিশয় অসুস্থ আছেন। তদ্ভিন্ন আর সকলে ভাল আছেন।

প্রেরিত তামাক পাইলাম। না খাইয়া ভাল কি মন্দ কিছুই বলিতে পারিতেছি না ইতি ১৬ অগ্রহায়ণ, ১২৯২ সাল

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১৭]

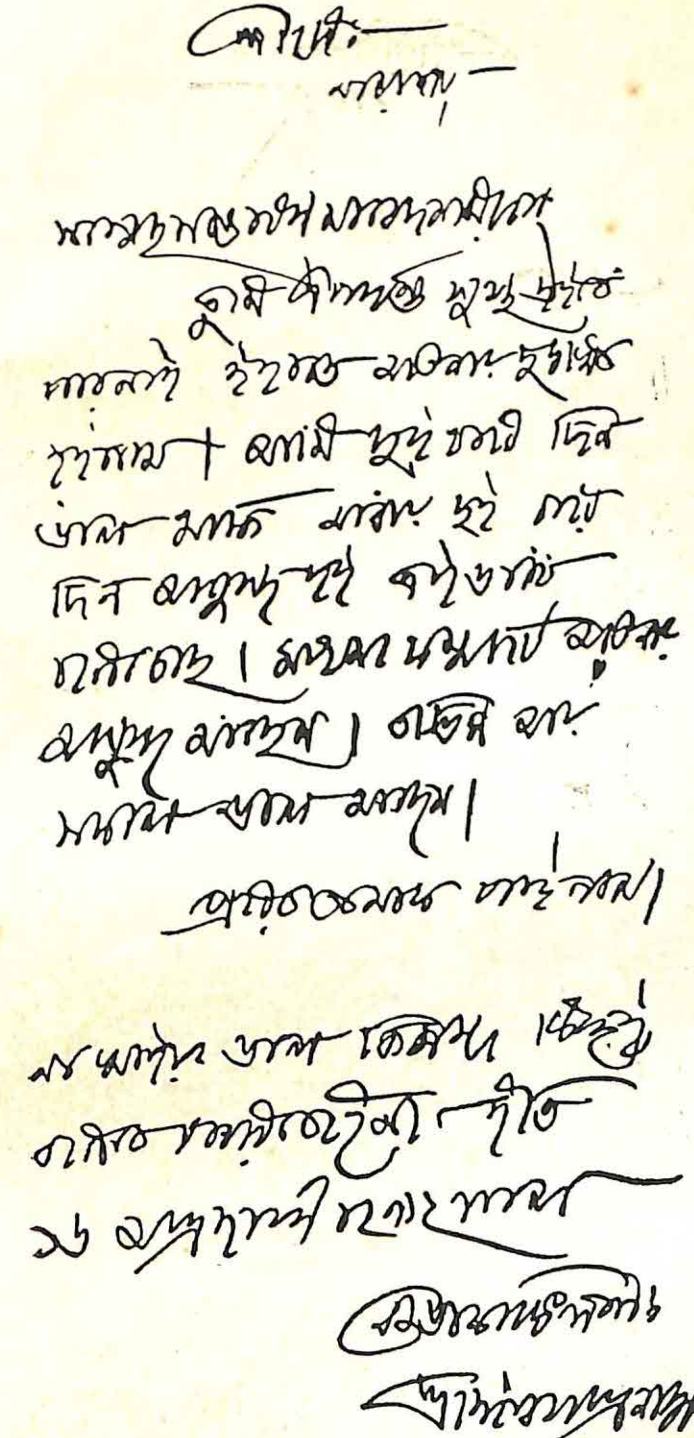
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে লেখা :

শ্রীহরিঃ
শরণম্

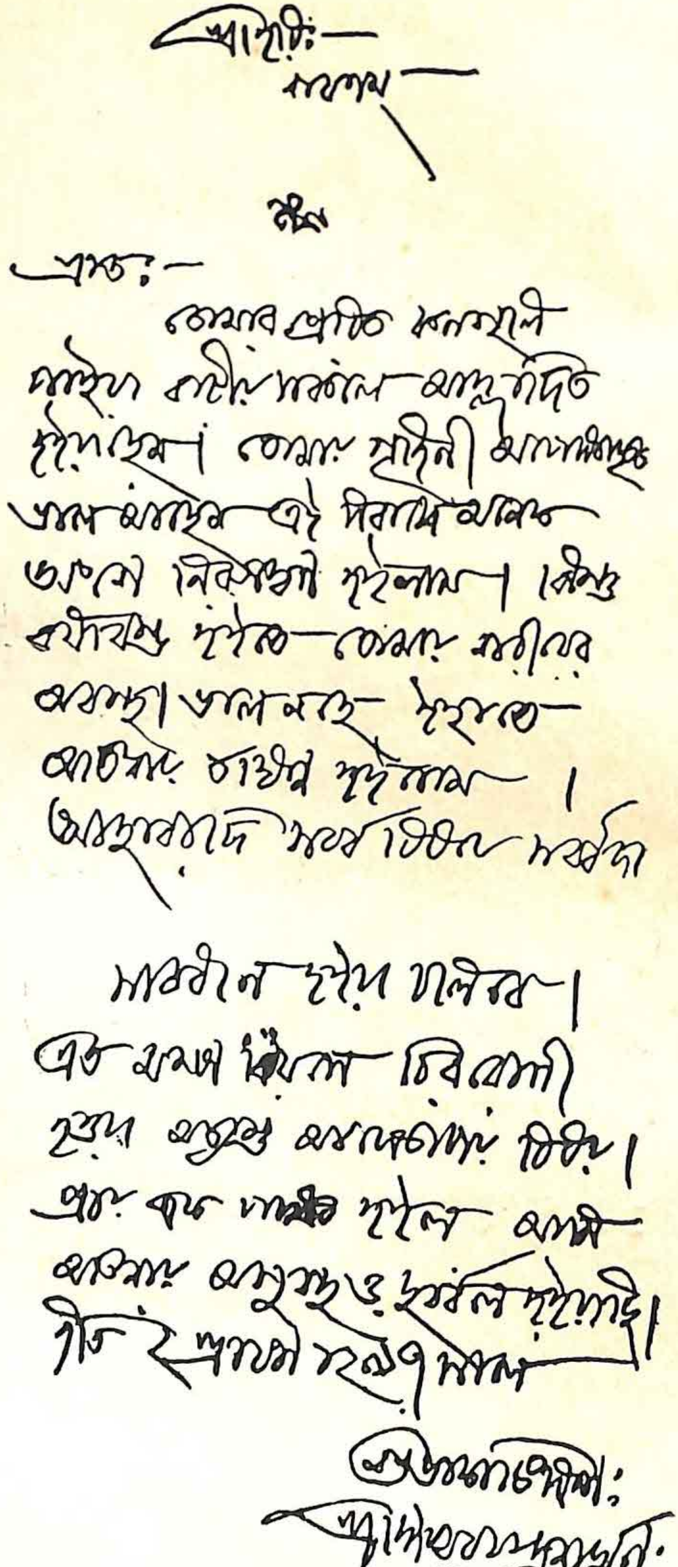
ভ্রাতঃ

তোমার প্রেরিত ফলগুলি পাইয়া বাটীর সকলে আহ্লাদিত হইয়াছেন। তোমার গৃহিণী অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন এই সংবাদে অনেক অংশে নিরুদ্বেগ হইলাম। কিন্তু বর্ষারম্ভ হইতে তোমার শরীরের অবস্থা ভাল নহে ইহাতে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলাম। আহারাদি সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া চলিবে। এত অল্প বয়সে চিররোগী হওয়া অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। প্রায় এক পক্ষ হইল আমি অতিশয় অসুস্থ ও দুর্ব্বল হইয়াছি। ইতি ২ শ্রাবণ ১২৯৭ সাল

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১৮]



রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে লেখা বিদ্যাসাগরের একখানা চিঠির প্রতিলিপি



রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে লেখা বিদ্যাসাগরের একখানা চিঠির প্রতিলিপি

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে লেখা :

শ্রীহরিঃ
শরণম্

ভ্রাতঃ

তোমার দুইখানি পত্র পাইয়াছি কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ এতদিন উত্তর লিখিতে পারি নাই। বিধুভূষণকে সঙ্গে লইয়া কল্য দুই প্রহরের পর দুইটার মধ্যে আসিবে। সাক্ষাতে সকল কথোপকথন হইবেক। যদি তুমি কল্য আসিতে না পার বিধুভূষণকে আসিতে বলিবে। পরে সুবিধামত তুমি অন্য একদিন আসিবে। ইতি ৯ শ্রাবণ শুক্রবার

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[৯৯]

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

......মিদম্

পত্রবাহক বাহাদুর সেখ আমার নিতান্ত অনুগত—এ তোমাদের জমীদারীর প্রজা—ইহাকে যেজন্য তোমার নিকট পাঠাইতেছি ইহার বাচনিক সবিশেষ অবগত হইবে এবং যাহাতে ইহার প্রার্থনা সফল হয় তদ্বিষয়ে তুমি যত্নবান্ ও মনোযোগী হইলে আমি পরম আহ্লাদিত ও অতিশয় উপকৃত হইব এবিষয়ে আমার সহস্র অনুরোধ জানিবে।

এ ব্যক্তি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলে আমি অতিশয় দুঃখিত ও লজ্জিত হইব জানিবে কিমধিকমিতি ২০ বৈশাখ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১০০]

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে লেখা :

মধ্যে যে ক্ষুদ্র পত্রখানি দিতেছি ইহা লইয়া তিনি প্রসন্নবাবুর সঙ্গে সাক্ষাত্ করিবেন। এস্থলে একটি কথা অগ্রে বলা আবশ্যক। কলিকাতায় বালকেরা অতি দুরন্ত তাহাদিগকে আয়ত্ত রাখিয়া সুশৃঙ্খলরূপে পাঠনা কার্য্য নির্ব্বাহ করা সহজ ব্যাপার নহে। অনেকেই এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। এজন্য যখন তিনি নিযুক্ত হয়েন তাঁহার সহিত এই কথা স্থির থাকে class manage করিতে না পারিলে তাঁহাকে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবেক। তোমার পণ্ডিতের সঙ্গেও এই ব্যবস্থা। কাজ চালাইতে পারিলে পাকা নিযুক্ত হইবেন এবং উত্তমরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিলে বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

বাবুর অবলম্বিত প্রণালী পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাচীন প্রণালী অনুসারে কন্যার বিবাহ দেন, তাহা হইলে ব্রাহ্ম-বিবাহ প্রচলিত হওয়ার পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিবেক। তৃতীয়তঃ, ব্রাহ্মপ্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিলে ঐ বিবাহ সর্ব্বাংশে সিদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হইবেক কি না তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না। এই সমস্ত কারণে আমি এ বিষয়ে সহসা আপনাকে কোন পরামর্শ দিতে উৎসুক বা সমর্থ নহি। এই মাত্র পরামর্শ দিতে পারি যে, আপনি সহসা কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন না।

উপস্থিত বিষয়ে আমার প্রকৃত বক্তব্য এই যে, এরূপ বিষয়ে অন্যের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা বিধেয় নহে। ঈদৃশ স্থলে নিজের অন্তঃকরণে অনুধাবন করিয়া যেরূপ বোধ হয়, তদনুসারে কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। কারণ, যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, সে ব্যক্তি নিজের যেরূপ মত ও অভিপ্রায়, তদনুসারেই পরামর্শ দিবেন, আপনকার হিতাহিত বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে তত দৃষ্টি রাখিবেন না।

এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া উপস্থিত বিষয়ের স্বয়ং কর্ত্তব্য নিরূপণ করিলেই আমার মতে সর্ব্বাংশে ভাল হয়।

আমি কায়িক ভাল আছি। ইতি তাং ৬ আশ্বিন।

ভবদীয়
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।[১০০]

দুর্গামোহন দাসকে লেখা :*

অশেষ গুণাশ্রয়
শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয়
পরমকল্যাণভাজনেষু

সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্—

অন্নদাচরণকে যে দিন শেষ পত্র লিখি, ঐ দিনেই আপনাকে স্বতন্ত্র পত্র লিখিতে বাসনা ছিল, কিন্তু তাহা না পারিয়া স্থির করিয়াছিলাম, পরদিন লিখিব, কিন্তু পরদিন অধিকবার ভেদ হওয়াতে কয়েক দিন এরূপ দুর্ব্বল ছিলাম এবং তৎপরে আর কয়েকদিন কোন বিশেষ কারণ বশতঃ এরূপ ব্যস্ত ছিলাম যে আপনাকে এত দিন পত্র লিখিয়া উঠিতে পারি নাই, ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না।

আপনি অভিপ্রেত বিষয়ের সিদ্ধির নিমিত্ত আন্তরিক যত্ন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং অবশেষে সঙ্কলিত বিষয়ে যেরূপ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে তাহার সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি বলিয়া ব্যক্ত করিবার নহে। এ বিষয়ে আপনি যে কিরূপ ক্ষোভ ও মনস্তাপ পাইয়াছেন তাহা আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, এই ক্ষোভ ও মনস্তাপ সহসা আপনকার অন্তঃকরণ হইতে দূর হইবার নহে। কিন্তু সাংসারিক বিষয়ের এইরূপই

---

* দুর্গামোহন দাস আপন বালিকা বিমাতার বিবাহ দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করেও প্রথমবার বিফল হয়েছিলেন। সেসময়ে তিনি আক্ষেপ করে বিদ্যাসাগরকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠিখানা সেই চিঠির উত্তর।

আমি কল্য সায়ংকালে এখানে পঁহুছিয়াছি। আসিয়া অবধি কোন অসুস্থ বোধ হয় নাই জানিবে। ইতি—২৮ শ্রাবণ বুধবার

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১০১]

রাজনারায়ণ বসুকে লেখা :

সাদরসম্ভাষণমাবেদনমিদম্

আপনার নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছান সংবাদ পাইয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, কিন্তু যাইয়া কিছু অসুস্থ হইয়াছেন পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। মেদিনীপুর স্থান ভাল, ত্বরায় সুস্থ হইবেন ও ভাল থাকিবেন কোন সন্দেহ নাই; তবে সে স্থান নূতন, এখানে যেমন সর্ব্বদা আত্মীয়বর্গের মধ্যে থাকিতেন ও সর্ব্বদা তাঁহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন, সেখানে আপাততঃ তাহা দুর্লভ, সুতরাং এ নিমিত্ত কিছুদিন মনের অসুখ থাকিবেক, ক্রমে তথায়ও আত্মীয় সঙ্ঘটন হইবেক। সংসারের এই রীতি। লিখিয়াছেন second master (দ্বিতীয় শিক্ষক) অধ্যক্ষবর্গের প্রিয়পাত্র, সুতরাং তাঁহার সহিত অস্বরস হইলে অসুখের বিষয় ঘটিতে পারে, অতএব আমার মতে তাঁহার সহিত মিল করিয়া লওয়া ভাল। আর তিনি অভদ্র হন, ঘরের ভাত অধিক করিয়া খাইবেন, আপনি ধর্ম্মতঃ আপন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন, তাহা হইলে ধর্ম্মদ্বারে খালাস।

লোক্যাল কমিটির (Local Committee) মধ্যে যে সাহেবকে ভদ্র দেখিবেন মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট গেলেও হানি নাই। বোধ করি, সাক সাহেব তথায় ম্যাজিষ্ট্রেট। আমি শুনিয়াছি তিনি ভদ্র বটেন ও বুদ্ধিজীবীও বটেন; বিদ্যা-শিক্ষায় তাঁহার অনুরাগ আছে।

সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবেন এবং অনুগ্রহ পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে মঙ্গল সংবাদ লিখিয়া নিরুদ্বিগ্ন ও সুস্থ করিতে আজ্ঞা হইবেক।

ভবদেকশর্ম্মশর্ম্মণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।[১০২]

রাজনারায়ণ বসুকে লেখা :

সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্—

কয়েক দিবস হইল, মহাশয়ের পত্র পাইয়াছি; কিন্তু নানা কারণে সাতিশয় ব্যস্ততা-প্রযুক্ত এত দিন উত্তর লিখিতে পারি নাই; ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না।

আপনার কন্যার বিবাহ-বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিয়াছি, কিন্তু আপনাকে কি পরামর্শ দিব, কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। ফল কথা এই যে, এরূপ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া কোন ক্রমেই সহজ ব্যাপার নহে। প্রথমতঃ আপনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। ব্রাহ্মধর্ম্মে আপনার যেরূপ শ্রদ্ধা আছে তাহাতে দেবেন্দ্র বাবু যে প্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, যদি তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুযায়িনী বলিয়া আপনার বোধ থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রণালী অনুসারেই আপনার কন্যার বিবাহ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দ্বিতীয়তঃ, যদি আপনি দেবেন্দ্র

নিয়ম। সদভিপ্রায়সকল, সকল সময়ে সম্পন্ন হইয়া উঠে না। "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" শুভ কার্য্যের নানা বিঘ্ন। আমি যে অবধি এই বিষয় জানিতে পারিয়াছিলাম সর্ব্বদা এই আশঙ্কা করিতাম, আপনকার অগ্রজের কর্ণগোচর হইলে সকল চেষ্টা বিফল হইয়া যাইবেক। অবশেষে তাহাই ঘটিয়া উঠিল। যাহা হউক এই চেষ্টা বিফল হইয়াছে বলিয়া একেবারে নিরুৎসাহ হইবেন না। কত বিষয়ে কত চেষ্টা কত উদ্যোগ করা যায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সে সকল সফল হইয়া উঠিবে না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, যাহাদের অভিপ্রায় সৎ ও প্রশংসনীয় এরূপ লোক অতি বিরল এবং শুভ ও শ্রেয়স্কর বিষয়ে বাধা ও ব্যাঘাত জন্মাইবার লোক সহস্র সহস্র। এমন অবস্থায় চেষ্টা করিয়া যতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় তাহাতেই সৌভাগ্য জ্ঞান করিতে হয়। এ বিষয় সম্পন্ন হইলে আমি আপনাকে যেরূপ শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করিতাম, এইরূপে ব্যাঘাত ঘটাতেও সেইরূপ করিব। কারণ কর্ম্ম সম্পন্ন হউক, আর নাই হউক, আপনকার সাহস, মানসিক মহত্ত্ব প্রভৃতি প্রধান গুণের স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে এবং ইহাও স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, সকল বিষয়ে আপনকার সম্পূর্ণ হস্ত থাকিলে অবশ্যই অভিপ্রেত কর্ম্ম সম্পন্ন হইত। আপনি যেরূপ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন আমার বোধ হয় আর কেহই সাহস করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। ফলতঃ আপনি একজন প্রকৃত পুরুষ বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। প্রার্থনা করি আপনি দীর্ঘজীবি হউন, আপনি দীর্ঘজীবি হইলে অনেক লোক অনেক প্রকারে আপনকার নিকট অশেষবিধ উপকার লাভ করিতে পারিবেক।

আমি অনেকবার অনেক প্রামাণিক লোকের মুখে আপনকার গুণানুবাদ শুনিয়াছি এবং আপনি সদাশয় সরলহৃদয় অকুতোভয় উদারচরিত ও সর্ব্বদা পরের হিতাকাঙ্ক্ষী ও হিতকারী ব্যক্তি বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছি।

আমি অদ্যাপি শারীরিক সম্যক স্বচ্ছন্দ হইতে পারি নাই। মধ্যে মধ্যে আপনকার মঙ্গল সংবাদ পাইলে পরম পরিতোষ লাভ করিব, ইতি।

ভবদীয়স্য

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১০৪]

দুর্গামোহন দাসকে লেখা :

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয়,
সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্—

আপনার প্রেরিত ব্রহ্মময়ীর জীবনালেখ্য সাতখানি পঁহুছিয়াছে। একখানি দীনবন্ধুকে দিয়াছি, একখানি নিজে লইয়াছি। অবশিষ্ট পাঁচখানি যথাসম্ভব যোগ্যপাত্রে বিতরণ করিব। পুস্তকখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি; এবং মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, ব্রহ্মময়ীর তুল্য সদাশয়, উদারচরিত স্ত্রীলোক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক, এই পুণ্যশীলা মহিলা দুর্গামোহনের সহধর্ম্মিণী না হইলে, স্বীয় প্রকৃতিসিদ্ধ প্রকৃষ্ট প্রবৃত্তি-পরম্পরার প্রকৃতরূপ পরিচয় দিবার সুযোগ লাভ করিতে পারিতেন না। ঈদৃশ পত্নীর অকালমৃত্যু, ভবাদৃশ পতির পক্ষে, কতদূর আন্তরিক ক্লেশকর হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই অনুধাবন করিতে পারা যায়। সে দিবস যেরূপ

অসুস্থ দেখিয়া গিয়াছেন, সেইরূপই আছি। এজন্য এ পত্রখানি এত সংক্ষিপ্ত হইল। ইতি ২২শে পৌষ, ১২৮৮ সাল।

ভবদীয়স্য,
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।[১০৫]

দুর্গামোহন দাসকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণম্—

প্রিয় ভ্রাতঃ—তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে, এই সংবাদে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম। আমার আন্তরিক বাসনা ও প্রার্থনা এই যে, কয়েক দিন জীবিত থাক, নবপ্রণয়িনীর সহিত সুখে কালযাপন কর। তোমার নবপ্রণয়িনীকে আমার আশীর্ব্বাদ ও স্নেহসম্ভাষণ জানাইবে; ইতি—২রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮।[১০৬]

মহারাণী স্বর্ণময়ীকে লেখা :

শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী, সি-আই, মহোদয়া সমীপেষু,
বিনয়বহুমানশুভাশীর্ব্বাদপূর্ব্বকং নিবেদনম্।

বহুদিন হইল, কার্য্যবিশেষ উপলক্ষে টাকার আত্যন্তিক প্রয়োজন উপস্থিত হওয়াতে, অধুনা লোকান্তরবাসী নিরতিশয় উদারচরিত রাজীবলোচন রায় দেওয়ানজী মহাশয় সাতিশয় দয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীমতীর অনুমতি অনুসারে রাজধানীর ধনাগার হইতে আমাকে ৭৫০০৲ টাকা দিয়াছিলেন, কহিয়াছিলেন, এ টাকার সুদ দিতে হইবেক না, যখন সুবিধা হইবেক, পরিশোধ করিবেন।

এই টাকা পাইয়া আমি কি পর্য্যন্ত উপকৃত হইয়াছিলাম, তাহা বলিবার নয়, যত কাল জীবিত থাকিব, এই মহোপকার আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকিবেক। লোকের উপকার করিবার জন্যই শ্রীমতীর জন্মগ্রহণ। দেশে অনেক ঐশ্বর্য্যশালী লোক আছেন, কিন্তু কেহই শ্রীমতির ন্যায় সর্ব্বসাধারণের যথার্থ ধন্যবাদের আস্পদ ও উপকৃতবর্গের আন্তরিক আশীর্ব্বাদের ভাজন হইতে পারেন নাই।

দীর্ঘকাল, এই ঋণের পরিশোধের সুবিধা না হওয়াতে, আমি অতিশয় কুণ্ঠিত ছিলাম; এক্ষণে আমার সুবিধা হইয়াছে, এজন্য এই পত্রের মধ্যে সাত হাজার পাঁচশত টাকার নোট পাঠাইতেছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আমায় ঋণে মুক্ত করিতে আজ্ঞা হয়, কিমধিকেনেতি।...

নিয়তগুণানুকীর্ত্তনশুভানুচিন্তনকর্ম্মণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।[১০৭]

মহারাণী স্বর্ণময়ীকে লেখা :

শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী, সি, আই, মহোদয়া সমীপেষু,
বিনয়বহুমানশুভাশীর্ব্বাদপূর্ব্বকং নিবেদনম্।

শ্রীমতীর অনুগ্রহপূর্ণ পত্রে রাজধানীর মঙ্গল সংবাদ অবগত হইয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। আমি পরিবারবর্গের সহিত কায়িক ভাল আছি।

শ্রীমতীর পত্রে লিখিত হইয়াছে "মৎপ্রতি শ্রদ্ধা বিচলিত না হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়।" এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, দয়া ও পরোপকার প্রবৃত্তি সর্ব্ববাদিসম্মত প্রশংসনীয় গুণ। এই দুই গুণ সংসারে অতি বিরল। কিন্তু শ্রীমতীর কার্য্য পরম্পরা নিরন্তর এই দুই প্রশংসনীয় গুণের সবিস্তর পরিচয় প্রদান করিতেছে। এমন স্থলে শ্রীমতীর প্রতি যাহার শ্রদ্ধা না জন্মিবেক, অথবা শ্রদ্ধা বিচলিত হইবেক, তিনি নিতান্ত পামর, কিমধিকেনেতি ৮ই ফাল্গুন ১২৮৯ সাল।

নিয়তগুণকীর্ত্তনশুভানুচিন্তনকর্ম্মণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।[১০৮]

মহারাণী স্বর্ণময়ীর সরকারকে লেখা :

শুভাশিষঃসন্তু—

সাদর সম্ভাষণমাদনম্—

আপনি অবগত আছেন বিধবা বিবাহ কার্য্যোপলক্ষে আমি বিলক্ষণ ঋণগ্রস্ত হইয়াছি ঐ ঋণের ক্রমে পরিশোধ করিতেছি। দুই ব্যক্তির নিকট কিছু অধিক ঋণ আছে তাঁহারা ক্রমে লইতে সম্মত নহেন এককালে টাকা পাইবার জন্য ব্যস্ত করিতেছে এককালে তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করি তাহার সুযোগ নাই। কিন্তু তাহা না করিলেও কোন ক্রমে চলিতেছে না। উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে শ্রীমতী রাণী মহোদয়ার নিকট প্রার্থনা করিতেছি তিনি দয়া করিয়া আমাকে ৭৫০০ সাত হাজার পাঁচ শত টাকা ধার দেন একখানি হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিব এবং তিন বৎসরে পরিশোধ করিব। এই ঋণ নিয়মিত সময়ে পরিশোধ করিতে পারিব সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই সন্দেহ থাকিলে কখন আমি এরূপে ধার চাহিতাম না। আপনকার সহায় ব্যতিরেকে আমার এই প্রার্থনা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনি অসন্দিগ্ধচিত্তে সহায়তা করিবেন। এই সহায়তা করিয়া আপনাকে কখনও অপ্রস্তুত হইতে হইবেক না আমি এত অসম্ভ্রান্ত ও অপদার্থ লোক নহি যে পরিশোধ করিবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি ঋণ করিতেছি অথচ পরিশোধ বিষয়ে অযত্ন করিব কিংবা নিশ্চিন্ত থাকিব আপনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও আশঙ্কা করিবেন না। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ যতদিন জীবিত ও সহজ অবস্থায় ছিলেন, তাঁহার নিকট মধ্যে মধ্যে এইরূপ ধার পাইতাম এবং ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিতাম। এক্ষণে এখানকার কোন ধনীর সহিত আমার এরূপ আত্মীয়তা নাই যে টাকা ধার চাহিতে পারি। আপনি না থাকিলে শ্রীমতী রাণী মহোদয়ার নিকটেও ধার চাহিতে পারিতাম না। এক্ষণে যাহাতে আমার প্রার্থনা সফল হয় দয়া করিয়া তাহা করিতে হইবেক। না করিলে আমি অপমানিত ও অপদস্থ হইব এই বিবেচনায় যাহা উচিত হয় তাহা করিবেন। অত্যন্ত অসুবিধায় না পড়িলে আমি কদাচ শ্রীমতীকে ও আপনাকে এরূপে বিরক্ত করিতে উদ্যত হইতাম না জানিবেন। অগ্রহায়ণ মাসে আমার টাকার প্রয়োজন। এই টাকা ধার করিয়া দিলে আর পূর্ব্ববৎ বার্ষিক সাহায্য করিতে হইবেক না। শ্রীমতী আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। ঐ সকল উপকার আমার অন্তঃকরণে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে। আমি যে তাঁহার যথার্থ গুণগ্রাহী ও আশীর্ব্বাদক অনতিবিলম্বে তাহার পরিচয় দিব।

আমি এক্ষণে কিছু ভাল আছি। আপনার নিজের ও রাজধানীর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সংবাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে আজ্ঞা হয়। কিমধিকমিতি ২০ কার্ত্তিক ১২৭৬ সাল।[১০৯]

প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ—
শরণম্—

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী

ভ্রাতঃ!—প্রায় দুই সপ্তাহ কাল আমি অত্যন্ত অসুস্থ ও একটী দৌহিত্র উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় যৎপরোনাস্তি ব্যতিব্যস্ত ছিলাম। এজন্য পরিচারকদিগকে বলিয়াছিলাম, কাহাকেও আসিতে দিও না। বলিবে আমি অতিশয় অসুস্থ আছি, দেখা হইবেক না। অনেকে এই কথায় ক্ষান্ত না হইয়া চিরকুটে আপন নাম ও পরিচয় লিখিয়া পরিচারকদিগকে দিতেন, তাহারা ঐ সকল চিরকুট আমার নিকট আনিত; আর যদি কেহ কাহারও পত্র আনিতেন তাহাও আনিয়া দিত। এইরূপ চিরকুট ও পত্র প্রত্যহ অন্ততঃ পঁচিশ খান তাহারা আনিয়া দিয়াছে। এক গোস্বামীর পুত্রকে তুমি যে পত্র দাও, তাহা আনিয়া দিয়াছে; তোমার প্রেরিত যে পত্রের উত্তর লিখিতেছি তাহাও আনিয়া দিয়াছে, এমন স্থলে তোমার উল্লিখিত Gentleman's son (ভদ্রলোকের ছেলেটী) যে পত্রখানি আনিয়াছিলেন, কেবল সেইখানি আনিয়া আমায় দিতে অসম্মত হইল কেন বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার পত্র পাইয়া পরিচারকদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল, 'কোনও ব্যক্তি পত্র আনিয়াছিলেন তাহা লইয়া আপনাকে দিতে অসম্মত হইয়াছি, যদি কেহ এরূপ কথা বলিয়া থাকেন, তিনি অন্যায় কহিয়াছেন, আমরা পত্র লইয়া যাইব না, এরূপ কথা কাহাকেও বলি নাই; যিনি যখন পত্র আনিয়াছেন তখনই ঐ পত্র আপনার নিকট আনিয়া দিয়াছি।' যাহা হউক সমুদয় অনুধাবন করিয়া পরিচারকদিগকে অপরাধী করিতে সাহস হইতেছে না এবং আপনাকেও অপরাধী ভাবিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। তুমি এখানকার বৃত্তান্ত কিছুই জান না, সুতরাং তোমার Gentleman's son (ভদ্রলোকের ছেলেটী) যাহা কহিয়াছেন, তাহাতে নির্ভর করিয়া উচিত ও আবশ্যক বোধে আমায় যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়াছ। ফল কথা এই, আমার আত্মীয়েরা আমার পক্ষে বড় নিদ্দর্য়, সামান্য অপরাধ ধরিয়া অথবা অপরাধ কল্পনা করিয়া আমায় নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। এই সংস্কার অনেক দিন পূর্ব্বে আমার হৃদয়ে প্ররূঢ় হইয়া ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছে, এজন্য তোমার পত্র পাঠ করিয়া সবিশেষ ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত হইলাম না। ইতি ১৫ই মাঘ ১২৮৭ সাল।

ত্বদেকশর্ম্ম শর্ম্মণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ—[১১০]

চণ্ডীচরণ ন্যায়রত্নকে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃশরণম্।

সাদরসম্ভাষণমাবেদন মিদম্—

আপনকার পত্র পাঠ করিয়া সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলাম। অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলাম, আপনি নাড়িয়াতে যে দশ খানি পুস্তক পাঠাইতে বলিয়াছিলেন, প্রেরকদিগের অসাবধান দোষে তাহা পাঠান হয় নাই। অদ্যকার ডাকে রেজিষ্টারী করিয়া দশখানি পুস্তক প্রেরিত হইল তত্রত্য মহাশয়দিগকে পাঠ করিতে দিবেন। পূজার পরেই আমার ঢাকা যাইবার অভিলাষ ছিল, অসুস্থতা প্রভৃতি কতিপয় প্রতিবন্ধক বশতঃ যাইতে পারি নাই, অগ্রহায়ণ মাসের শেষার্দ্ধে যাইব, এই স্থির করিয়াছি। পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন, আগমন কালে আনিবেন, ইহা অবগত হইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। শ্রীযুত তারাপ্রসাদ রায় মজুমদার স্বাক্ষর করণ কার্য্যে সবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, তিনি যেইরূপ প্রকৃতির মনুষ্য, তাহা আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি। তাঁহার সদৃশ লোক সচরাচর পাওয়া যায় না। শ্রীযুত রায় কালীনারায়ণ রায় বাহাদুরের নিকটও আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে। আমি এক্ষণে কিছু ভাল আছি জানিবেন। ইতি ২৫শে কার্ত্তিক।

ভবদীয়স্য

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১১১]

চন্দ্রমুখী বসুকে লেখা :

শ্রীহরিঃ
শরণম্।

সস্নেহসম্ভাষণমাবেদনমিদম্

তোমার পিতৃব্যের প্রণীত যে দুইখানি পুস্তক পাঠাইয়াছ, তাহা পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। কিন্তু অনেক দিন অবধি আমার শরীরের যেরূপ মন্দ অবস্থা চলিতেছে, তাহাতে এক্ষণে ঐ পুস্তক পাঠ করি, আমার সেরূপ ক্ষমতা নাই। কিঞ্চিৎ সুস্থ না হইলে, পুস্তক পাঠ করিতে ও তদ্বিষয়ে কিছু বলিতে পারিতেছি না। এক্ষণে বাটীর মেরামত হইতেছে। এজন্য আমার পরিবারবর্গ অন্য এক বাটীতে আছেন। আমি অতি কষ্টে আপন বাটীতেই অবস্থিতি করিতেছি। আর দশ বার দিনে মেরামত শেষ হইবে। শেষ হইলে তোমাকে সংবাদ লিখিব। তখন তুমি ও রাধা উভয়ে আসিবে। অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, দেখিলে যারপরনাই আহ্লাদিত হইব, ইহা বলা বাহুল্য। আমার পরিবারবর্গ ভাল আছেন। ইতি ২৪ শ্রাবণ, ১২৯২ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

পুনশ্চ—৫।৬ দিন অতিশয় অসুস্থ ছিলাম। এজন্য এই পত্র লিখিতে এত বিলম্ব হইল, মনে কিছু করিও না। শ্রীঈঃ—[১১২]

মেজর ছক্কনলাল সিংহ রায়কে লেখা :

শ্রীহরি
শরণং

খুড়া মহাশয়—

তিনবার কলিকাতা গিয়া শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। অদ্য ছয় দিন হইল তিনি ফরাশডাঙ্গায় আসিয়াছিলেন। তোমার অভিপ্রায় তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি সে বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন।

আমার অবস্থা ক্রমে মন্দ হইতেছে। একদিনের জন্যও সুস্থ নহি। এখানকার আর সকলে ভাল আছেন। তোমাদের মঙ্গল সংবাদ দ্বারা নিরুদ্বেগ করিবে, ইতি—১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১১০]

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা :

আমি ক্রমাগত কয়েকদিনই চেষ্টা দেখিলাম, কিন্তু তোমার কাগজ খোলসা করিয়া দিবার উপায় করিতে পারিলাম না। সুতরাং সত্বর তোমার কাগজ তোমাকে দিতে পারি এমন পথ দেখিতেছি না। তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ আমি নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত তোমার কাগজ লই নাই। বিধবাবিবাহের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থে লইয়াছিলাম, কেবল তোমার নিকট নহে, অন্যান্য লোকের নিকট হইতেও লইয়াছি। এ সকল কাগজ এই ভরসায় লইয়াছিলাম যে, বিধবাবিবাহ-পক্ষীয় ব্যক্তিরা যে সাহায্য দান অঙ্গীকার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা অনায়াসে পরিশোধ করিতে পারিব। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই অঙ্গীকৃত সাহায্য দানে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। উত্তরোত্তর এ বিষয়ের ব্যয়বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু আয় ক্রমে খর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে সুতরাং আমি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি; সেই সকল ব্যক্তি অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলে, আমাকে এরূপ সঙ্কটে পড়িতে হইত না; কেহ মাসিক কেহ এককালীন, কেহ বা উভয় এইরূপ নিয়মে অনেকে দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ হেতু দেখাইয়া, কেহ বা তাহা না করিয়াও, দিতেছে না। অন্যান্য ব্যক্তিদের ন্যায় তুমিও মাসিক ও এককালীন সাহায্য দান স্বাক্ষর কর। এককালীনের অর্দ্ধ মাত্র দিয়াছ, অবশিষ্টার্দ্ধ এ পর্য্যন্ত দাও নাই এবং কিছু দিন হইল মাসিক দান রহিত করিয়াছ। এইরূপে আয়ের অনেক খর্ব্বতা হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিয়াছে সুতরাং এই বিষয় উপলক্ষে যে ঋণ হইয়াছে তাহার সহসা পরিশোধ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমি এই ঋণ পরিশোধের সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখিতেছি। অন্য উপায়ে তাহা না করিতে পারি, অবশেষে আপন সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও পরিশোধ করিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে তোমার প্রয়োজনের সময়ে তোমাকে তোমার কাগজ দিতে পারিলাম না, এজন্য অতিশয় দুঃখিত হইতেছি। আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে জানিলে আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে

হস্তক্ষেপ করিতাম না। তৎকালে সকলে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতেই আমি সাহস করিয়া এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, নতুবা বিবাহ ও আইন প্রচার পর্য্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতাম। দেশহিতৈষী সৎকর্ম্মোৎসাহী মহাশয়দিগের বাক্যে আশ্বাস করিয়া ধনে প্রাণে মারা পড়িলাম। অর্থ দিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক, কেহ ভুলিয়া এ বিষয়ের সংবাদ লয়েন না।...

ভবদীয়স্য

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১১৪]

যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে লেখা :

বিনয়নমস্কারবহুমানপুরঃসর আবেদনমিদম্—

আপনাদের বিষয়বিভাগ সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তির ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু নানা কারণে এত বিরক্ত হইয়াছি যে, আমার ঐ বিষয়ে পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। এজন্য নিরতিশয় দুঃখিত অন্তঃকরণে আপনাদের গোচর করিতেছি, আমি এ বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম। আপনাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হওয়া ও আন্তরিক সুখলাভ করা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। কিমধিকমিতি সন ১২৯২ সাল। ১৫ই আষাঢ়।[১১৫]

রামেশ্বর মালিয়াকে লেখা :

শ্রীযুক্ত বাবু রামেশ্বর মালিয়া,

বিনয়-নমস্কার-পুরস্কৃতং নিবেদনমিদম্—

এক্ষণে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে এ বিষয়ের আন্দোলন হইয়াছিল, পরিশেষে তাঁহারই প্রাধান্য নির্ব্বিবাদে অংগীকৃত হইয়াছে। অতএব আপনকারদের সংসার হইতে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িককে যে বার্ষিক বৃত্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয়ই ঐ বৃত্তির যথার্থ অধিকারী। আমি পীড়িত হইয়া শয্যাগত আছি, এজন্য উত্তর লিখিতে বিলম্ব হইল। ইতি ২৯এ আশ্বিন ১২৯০ সাল।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ—[১১৬]

রামশঙ্কর সেন ও ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখা :

সাদরসম্ভাষণমাবেদনমিদম্

শ্রীযুত বাবু...মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত বাবু...চাঁদ মিত্র, ও আমি, আমরা তিনজনে, আপনাদের সমক্ষে, যে কথা যেরূপ বলিয়াছিলাম, এই পত্রে সে কথা সেইরূপ লিখিত হইয়াছে কি না, ইহা আপনারা লিপি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিলে, আমি সাতিশয় উপকৃত ও সবিশেষ অনুগৃহীত হইব ইতি। ১২ই ভাদ্র ১২৯২ সাল।

ভবদীয়স্য

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১১৭]

ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে লেখা :

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্

সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্—

চণ্ডীর (ডিপজিটরীর পূর্ব্বতন ম্যানেজার বাবু চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়) মুখে শুনিলাম, গত শুক্রবার জননীদেবী মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার দেহান্ত সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর হইয়াছে। তিনি যাতনামুক্ত হইলেন এবং আপনাকে জীবিত দেখিয়া দেহত্যাগ করিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা। তবে আপনার দশদিক শূন্য হইল। অতঃপর সংসার যাত্রা কেবল বিড়ম্বনা স্থান হইয়া উঠিল। যে কয় দিন জীবিত থাকিবেন, আর অমৃতময় স্নেহ সম্ভাষণ শুনিতে পাইবেন না। যাহা হউক আপনি তাঁহার শেষ দশায় শুশ্রূষা করিতে পারিয়াছেন এবং অন্তিম সময়ে সন্নিহিত থাকিয়া তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বা তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তর দিবার অবকাশ পাইয়াছেন, ইহা আপনার পক্ষে অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে, কিন্তু আপনাকে যেরূপ জানি তাহাতে আপনি বিলক্ষণ মাতৃদেব ছিলেন, সুতরাং সহসা মাতৃশোক সংবরণ করা আপনার পক্ষে নিতান্ত সহজ ব্যাপার হইবেক না।

এই সংবাদ শুনিয়াই আমার আপনার নিকট যাইবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু ১৫।১৬ দিন হইতে শিরোরোগ ও নিদ্রার ব্যাঘাত বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। একেই অতিশয় দুর্ব্বল, তাহাতে এই কয় দিনে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি। এ অবস্থায় স্থানান্তরে যাওয়া আমার পক্ষে কোন মতে সম্ভাবিত নহে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনও মতে যাইতে সাহস করিতে পারিলাম না। অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। ইতি ১৬ই মাঘ ১২৮৪ সাল।

ত্বদেকাত্মনঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ[১১৮]

যদুনাথ রায়কে লেখা :

রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর, কৃষ্ণনগর।

সাদরসম্ভাষণমাবেদনমিদম্—আপনকার অত্যুৎকট অশুভ ঘটনার বিষয় অবগত হইয়া, আমি মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়াছি। এই ভয়ানক অশুভ ঘটনার দ্বারা আপনার অন্তঃকরণের কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিতেছি। আমি মনে করিতাম আপনি সাংসারিক বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে সুখী। দৈববিড়ম্বনায় আর আপনাকে সেরূপ ভাবিবার পথ রহিল না। সংসার অতি বিচিত্র স্থান। সংসারে আসিয়া, কেহ কখনও সর্ব্বাংশে সুখী হইতে পারিবেন, তাহাও সম্ভাবিত নহে।

আমি আপনার জন্য তত উদ্বিগ্ন নহি। আপনি নানা বিষয়ে ব্যাসক্ত থাকিয়া অনেক সময় অন্যমনস্ক হইতে পারিবেন। কিন্তু যিনি গর্ভধারণ দিবস অবধি অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার বিষয় ভাবিয়া

আমার আন্তরিক অসুখের একশেষ উপস্থিত হইতেছে। তিনি এজন্মের মত দুস্তর দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। ফল কথা এই, পিতা ও মাতা হওয়া অপেক্ষা অধিকতর মহাপাতকের ভোগ আর নাই। পিতামাতাকে প্রকৃত প্রস্তাবে সুখী করেন, এরূপ পুত্র অতি বিরল, কিন্তু অসদাচরণ ও অকালমরণ প্রভৃতি দ্বারা পিতা মাতাকে যাবজ্জীবন দগ্ধ করেন এরূপ পুত্রের সংখ্যাই অধিক।

প্রিয় বিয়োগ নিবন্ধন হৃদয়বিদারণ শোকের সহসা সংবরণ করা কাহারও সাধ্য নহে। এমন স্থলে আপনারা শোক সংবরণ পূর্ব্বক চিত্তের স্থৈর্য সম্পাদন করুন এরূপ অনুরোধ করা বা উপদেশ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নহে। আপনাদের শোক সন্তপ্ত হৃদয় দৈব অনুগ্রহে অচিরে শান্তিসলিলে সিক্ত হউক, এই আমার প্রার্থনা। ইতি ১২ই আশ্বিন ১২৯১ সাল।

ভবদীয়স্য

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।[১১৯]

অভিরাম মণ্ডলকে লেখা :

শ্রীহরিঃ শরণম্—

শুভাশিষঃ সন্তু।—এই পত্রের মধ্যে ত্রিশ টাকার নোট পাঠাইতেছি, সকলকে দিবে। আমি যাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু অসুখ ও কাজের ঝঞ্চাট এই দুই কারণে যাইতে পারিতেছি না।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।[১২০]

'সোমপ্রকাশ' সম্পাদককে লেখা :

সম্পাদক মহাশয়! গত ৬ই ভাদ্রের সোমপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে "যাহারা রাজবিধি দ্বারা বহুবিবাহ প্রতিষেধ প্রয়াস পাইতেছেন...রাজবিধির বলে এই অন্যায়কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে রাজা কি প্রত্যবায়ভাগী হইবেন না"* আপনকার এই লিপিদর্শনে অনায়াসে বোধ হইতে পারে, এদেশে স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে পুনরায় দারপরিগ্রহের প্রথা নাই, রাজবিধি দ্বারা বহুবিবাহ নিবারণপ্রার্থীরা ঐ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, এবং বহুবিবাহ বিষয়ে তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে আপনি তাঁহাদের নিকটে এই প্রশ্ন করিতেন না।

---

* ১২৭৮ বঙ্গাব্দের ৬-ভাদ্র (১৮৭১ সালের ২১-আগস্ট) 'সোমপ্রকাশ' লিখেছে : "যাঁহারা রাজবিধি দ্বারা বহুবিবাহ প্রতিষেধ প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহাদিগের নিকটে আমাদিগের একটী প্রশ্ন, স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে পুরুষ দারান্তর পরিগ্রহ করিতে পারিবেন, এই প্রস্তাব করা হইয়াছে, এ প্রস্তাব অনর্থের কারণ হইবে কি না? স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বের ন্যায় পুরুষেরও বন্ধ্যত্ব সম্ভাবনা আছে। পুরুষ বন্ধ্য অথবা স্ত্রী বন্ধ্যা, সূক্ষ্ম পরীক্ষা ব্যতিরেকে তন্নির্ণয় সম্ভাবিত নহে। যদি বাস্তবিক পুরুষ বন্ধ্য হয়, স্ত্রী বন্ধ্যা না হয়, আর স্ত্রী বন্ধ্যা ইহা স্থির করিয়া পুরুষ অন্য নারীর পাণি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে স্ত্রীর প্রতি কি যার পর নাই অন্যায় ব্যবহার করা হইবে না? রাজবিধির বলে এই অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে রাজা কি প্রত্যবায়ভাগী হইবেন না?..."

স্ত্রী বন্ধ্যা বা ব্যভিচারাদি দোষাক্রান্ত হইলে শাস্ত্রকারেরা পুরুষের পক্ষে পুনরায় দারপরিগ্রহের বিধি দিয়াছেন এবং সেই বিধি অবলম্বন করিয়া অনেকে দারপরিগ্রহ করিয়া থাকে। তদ্ব্যতিরিক্ত, যদৃচ্ছাক্রমে যত ইচ্ছা বিবাহ করিবার প্রথা বিলক্ষণ প্রবল হইয়াছে। এবং এই প্রথার প্রবলতা প্রযুক্ত সংসারে ঘোরতর অনিষ্ট সংঘটন হইতেছে। রাজবিধি দ্বারা বহুবিবাহ নিবারণ প্রার্থীদের উদ্দেশ্য এই, এই লজ্জাকর, ঘৃণাকর, অনর্থকর, অধর্ম্মকর, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহু-বিবাহকাণ্ড রহিত হইয়া যায়। এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা রাজবিধি দ্বারা তৎসাধনার্থ উদ্যোগ করিয়াছেন। যেরূপ রাজবিধি তাঁহাদের প্রার্থনীয়, "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার" পুস্তকের শেষে তাহার পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পাণ্ডুলেখ্যের স্থূলমর্ম্ম এই, পূর্ব্ব পরিণীতা স্ত্রী বন্ধ্যা, জাতিভ্রষ্টা চিররোগিণী ব্যভিচারিণী অথবা শাস্ত্রানুসারে অবিবাহ্যা অথচ অনবধানবশতঃ বিবাহিতা এরূপ দোষাক্রান্ত না হইলে, তাহার জীবদ্দশায় কেহ পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবেন না; এইরূপ বহুবিবাহ নিবারণী ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইলে যদৃচ্ছ প্রবৃত্ত বহু-বিবাহকাণ্ড এককালে রহিত হইতেছে, এবং শাস্ত্রানুসারে যে যে স্থলে পুনরায় বিবাহ করা নিতান্ত আবশ্যক, তাহার ব্যাঘাত ঘটিতেছে না। শাস্ত্রকারেরা বন্ধ্যা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করিবার বিধিদান করিয়াছেন এবং তাঁহারাই তাহার কাল নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ প্রথম ঋতুদর্শনের সময় হইতে আটবৎসরের মধ্যে সন্তান না জন্মিলে, স্ত্রীকে বন্ধ্যা স্থির করিয়া বিবাহ করিবেক, স্ত্রী ও পুরুষ এ উভয়ের মধ্যে কাহার দোষে সন্তান হইতেছে না, তাহার নির্ণয় বা অনুসন্ধানের আবশ্যকতা রাখেন নাই। এইরূপে স্ত্রী বন্ধ্যা বা অন্যবিধ দোষাক্রান্ত হইলে, শাস্ত্রানুসারে এতদ্দেশীয় লোকের, পূর্ব্ব-পরিণীতা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করিবার যে চিরন্তন অধিকার আছে, রাজবিধি দ্বারা বহুবিবাহ নিবারণপ্রার্থীরা তদ্বিষয়ে প্রতিপক্ষতা করিতে উদ্যত নহেন, এইমাত্র। ইহাতে "স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে, পুরুষ, দারান্তর পরিগ্রহ করিতে পারিবেন এই প্রস্তাব করা হইয়াছে", এরূপ নির্দ্দেশ কোন-মতে সঙ্গত হইতে পারে না। আর যদি তাঁহাদের প্রার্থনা অনুসারে, প্রকাশিত পাণ্ডুলেখ্যের অনুরূপ কোনও ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়, এবং স্ত্রী প্রথম ঋতু-দর্শনের সময় হইতে আট বৎসরের মধ্যে পুত্রবতী না হইলে কোন ব্যক্তি নিজে হীনবীর্য্য হইয়াও স্ত্রীকে বন্ধ্যা স্থির করিয়া তাহার জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করে, তাহাতে রাজা প্রত্যবায়ভাগী হইবেন কেন? রাজা সে বিষয়ে নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত করিতেছেন না। লোকে এ বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি অনুসারে চলিতে চাহিতেছেন, রাজা তাহাতে আপত্তি করিতেছেন না, এইমাত্র। যাহা হউক আপনি রাজা বা রাজবিধি দ্বারা বহুবিবাহ নিবারণ প্রার্থী-দিগকে এবিষয়ে যে অপরাধী করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহা কোনও মতে ন্যায়োপেত বোধ হইতেছে না।

যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ড অশেষ দোষের আস্পদ, তাহা আপনি সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং এই নৃশংস প্রথার নিবারণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তাহারও অঙ্গীকার করেন; কেবল তদর্থে রাজবিধি প্রার্থনা করিতে সম্মত নহেন, কারণ, তাহা হইলে রাজাকে সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হয়। কিন্তু রাজা বহুবিবাহের উপর গুরুতর কর নির্দ্ধারণ করিয়া কৌশলক্রমে তাহা রহিত করুন, অনায়াসে এই প্রস্তাব করিতেছেন

এবং এই প্রস্তাবটি সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ ও ফলোপধায়ক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এবিষয়ে জিজ্ঞাস্য এই, বহুবিবাহ বিষয়ে গুরুতর কর নির্দ্ধারণ করিলে রাজার কি সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে না? কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে কেবল সামাজিক বিষয়ে নহে, ধর্ম্ম বিষয়েও হস্তক্ষেপ করা হইবেক; কারণ স্ত্রী বন্ধ্যা বা অন্যবিধ দোষাক্রান্ত হইলে শাস্ত্রকারেরা পুনরায় বিবাহ করিবার বিধি দিয়াছেন। বহুবিবাহের উপরে গুরুতর কর নির্দ্ধারিত হইলে নিঃস্ব ব্যক্তির ঐ বিধি প্রতিপালনের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। বলিতে কি আপনকার এই প্রস্তাবটি সমুচিত বিবেচনা পূর্ব্বক করা হয় নাই। গুরুতর কর নির্দ্ধারণ দ্বারা বহুবিবাহ প্রথা রহিত করা অপেক্ষা রাজবিধি দ্বারা বহুবিবাহ নিবারণ প্রার্থীদের অভিমত ব্যবস্থা বিধিবন্ধ করিয়া এই কুৎসিত প্রথা রহিত করা সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃকল্প, অন্তত অপেক্ষাকৃত অনিন্দনীয় ও সমধিক ফলোপধায়ক, স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বোধ করি, আপনকারও তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। যদি আপনকার প্রস্তাব অনুসারে এতদ্দেশীয় লোকের বহুবিবাহের উপর কর নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহকাণ্ডের সর্ব্বতোভাবে নিবারণ হইবেক না; লাভের মধ্যে ইঙ্গরেজ জাতি পৃথিবীস্থ অন্যান্য সভ্যজাতির নিকট যার পর নাই হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইবেন।

কাশীপুর
৮ই ভাদ্র
১২৭৮

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।[১২১]

একুশ

বাঙলায় সাহিত্যভাষার সিংহদ্বার উদ্ঘাটন করেছেন বিদ্যাসাগর। বাঙলায় সাহিত্যের ভাষা দ্বিধাবিহীন মূর্তিতে প্রথম পরিস্ফুট হয়েছে বিদ্যাসাগরের রচনায়। রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করে বলেছেন : "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলায় সাহিত্যভাষার সিংহদ্বার উদ্ঘাটন করেছিলেন। তার পূর্ব থেকেই এই তীর্থাভিমুখে পথখননের জন্যে বাঙালির মনে আহ্বান এসেছিল এবং তৎকালীন অনেকেই নানা দিক থেকে সে আহ্বান স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁদের অসম্পূর্ণ চেষ্টা বিদ্যাসাগরের সাধনায় পূর্ণতার রূপ ধরেছে। ভাষার একটা প্রকাশ মননের দিকে এবং জ্ঞানের তথ্যসংগ্রহের দিকে, অর্থাৎ বিজ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞানে ইতিহাসে; আর-একটা প্রকাশ ভাবের বাহন-রূপে রসসৃষ্টিতে; এই শেষোক্ত ভাষাকেই বিশেষ করে বলা যায় সাহিত্যের ভাষা। বাংলায় এই ভাষাই দ্বিধাবিহীন মূর্তিতে প্রথম পরিস্ফুট হয়েছে বিদ্যাসাগরের লেখনীতে, তার সত্তায় শৈশব-যৌবনের দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়েছিল।"[১]

কিন্তু বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের আগেও বাঙলা গদ্যসাহিত্যের একটি চিত্তাকর্ষক ইতিহাস আছে।

ওড়িয়া, অসমীয়া ও বাঙালাভাষা সমগোত্রের।[২] সংস্কৃত → প্রাকৃত → অপভ্রংশ থেকে দশম শতাব্দীর কোনো এক সময়ে প্রাচীন বাঙালাভাষার জন্ম।

জন্ম থেকে সুদীর্ঘকালের বাঙলা গদ্যের পরিচয় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে কিছু শিলালেখে, তাম্রশাসনে, দলিল-দস্তাবেজে, চিঠিপত্রে, কয়েকটি গ্রন্থের অংশে এবং কয়েকটি সম্পূর্ণ সহজিয়া পুঁথিতে।

পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন যে ১৫৫৫ সালে আহোম-রাজকে লেখা মহারাজ নরনারায়ণের পত্রটি বাঙালাভাষার প্রাচীনতম প্রামাণিক পত্র। উক্ত পত্রের একাংশ উদ্ধার করি : "লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে বার্দ্ধতাকপাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি। তোমারো এগোট কর্ত্তব্য উচিত হয় না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম।..."

সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙলা গদ্যের নমুনা হিসেবে একখানা চুক্তিপত্র প্রায় সম্পূর্ণ উদ্ধার করি : "লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদাস ও নরসিংহ দাস আগে আমরা দুই লুকে করার করিলাম জে কিছু বারে (=কারে?) সুনারগায় ও গর খ (?) রিকরি সকারাত ২ দ্ব (দু) ই রূপাইয়া করিআ আরত দলালি লইব আর কুন দায়া নাই খুরাক সমেত এই নিঅমে করা [র] পত্র দিলাম স ১১০৩তে ১৪ আগ্রান।"[৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত "মহারাজ বিক্রমাদিত্য চরিত্র' নামক গদ্যগল্প থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি : "শ্রীযুত ভোজরাজা তাহার কন্যা নাম স্রীমতি মৌনাবতি সোড়ষ বরিস্যা বড় সুন্দরি মুখ চন্দ্রতুল্য কেষ মেঘের রঙগ চক্ষু আকর্ণ্ণ পয্যন্ত যুঙগ্য ভ্রূর ধনুকের নেয়ায় ওষ্ঠ রক্তিমে বর্ণ্ণ হস্ত পদ্মের

মৃনাল স্তন দাড়িম্ব ফল রূপলাবন্য বিদ্যুৎছটা তার তুলনা আর নাঞী এমন ষুন্দরি সে কন্যার বিবাহ হয় নাঞী। কন্যা পন করিয়াছে রাত্রের মধ্যে জে কথা কহাইতে পারিবেক তাহাকে আমি বিভা করিব। একথা ভোজরাজা সুনে বড় বড় রাজার পুত্রকে নিমন্ত্রন করিয়া আনিলেক এক ২ রাজার পুত্রকে এক ২ দীন রাত্রের মধ্যে এক ২ জোন কে সয়ন ঘরে লইয়া সয়ন করায় সে ঘরে আর কেহো থাকে না কেবল কন্যা : আর রাজপুত্র এক খাটে কন্যা সোয়ে : এক খাটে রাজপুত্র সোয়ে।"[৪]

বাঙলা গদ্যের ধারায় পোর্তুগিজ প্রভাব খুব প্রবল নয়। তাহলেও বাঙলা গদ্যে পোর্তুগিজ প্রভাবের একটি ইতিহাস আছে। এই ইতিহাস একটি বিশেষ প্রাদেশিক কথিত ভাষা সম্পর্কিত; এই ইতিহাসের আরম্ভ ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে এবং সমাপ্তি ১৭৪৩ সালে। এই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ রচনাই অদ্যাবধি অজ্ঞাত, কেবলমাত্র তিনটি গ্রন্থ আমাদের কাল পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে : দোম আন্তোনিয়োর 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ', মনোএল দা আস্‌সুম্পসাঁউয়ের 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' ও বাঙলা ব্যাকরণ।

ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়ো 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' রচনা করেছেন। প্রচলিত কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করলে বলা যায় যে 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত। বাঙালীদের মধ্যে দোম আন্তোনিয়োই প্রথম মাতৃভাষায় গদ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন।

দোম আন্তোনিয়ো নিঃসন্দেহে বাঙালী। ভূষণার রাজপুত্রকে বাল্যকালে, ১৬৬৩ সালে, মগেরা বন্দী করে আরাকানে নিয়ে যায়। সেখানে ফাদার মনোএল দো রোজারিও তাঁকে উদ্ধার করেন এবং রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। কথিত আছে যে পরবর্তীকালে এঁর প্রভাবে ও প্রচারে ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রায় তিরিশ হাজার লোক রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল।

'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' থেকে রচনার সামান্য একটু নমুনা : "এ কার্য্যো মুনিষ্যের সাধ্যো নহে, যে কথা কহো, যে কুপ্রকৃতির কুক্ষেতে প্রবেশ করিয়া সেই সকোল রূপ বিরোমানা দেখাইতে মুনিষ্যো নষ্টো করিতে; কামুক যে নারোকী, সে কামাতুর স্ত্রী সকোলকে রমণ করিয়া প্রীবিত জর্মাইলো, যেমত নিদ্রাএ ছেলে, এহাতে আপনে বুঝিবা যে পরমো ব্রর্মো পদার্থো এমত মতি নহে; তাহান ভজোনাতে, যে জনের ভক্তি থাকে, মুক্তি থাকে তাহার কামোদ্ভাবে শীলই নাহি, ক্রেপাএ জিতেন্দ্রিও হএ, তবে সে মুক্তি পদ পাএ, সন্যাসী সকোলে; আর যে জোনে গ্রেহস্তো করে সেই এক স্ত্রী বিবাহ করিবেক, তাহান আগ্যাএ প্রতিপালোন করিবে, তাহারে মুক্তি করিবেন।"[৫]

'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদে'র ভাষা সম্পর্কে ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছেন : "দোম আন্তোনিয়োর ভাষা অত্যন্ত সরল। সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত হইলেও তাঁহার গদ্য যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিখিত বাঙ্গালা গদ্য অপেক্ষা অধিক অবোধ্য নহে ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই।...স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তন করিলেই দোম আন্তোনিয়োর গদ্য আধুনিক গদ্য বলিয়া চালান যাইতে পারে।"[৬]

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' বাঙলাভাষার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। ১৭৪৩ সালে পোর্তুগালের লিসবন শহরে সম্পূর্ণ রোমান হরফে মুদ্রিত; গ্রন্থের বাঁ দিকের

পৃষ্ঠায় বাঙলা এবং ডানদিকের পৃষ্ঠায় পোর্তুগিজ ভাষায় লেখা। আখ্যাপত্রে গ্রন্থকাররূপে পাদরী মনোএল দা আস্‌সুম্পসাঁউয়ের নাম আছে। ইনি পোর্তুগালের এভোরা শহরের অধিবাসী এবং পূর্বভারতের মণ্ডলীভুক্ত অগস্তিনীয় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ছিলেন। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' ১৭৩৫ সালে ভাওয়াল পরগণার নাগরীতে লিখিত, ভাওয়ালে প্রচলিত মৌখিক ভাষার ভিত্তিতে লিখিত।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদে'র বহুক্ষেত্রে মূল পোর্তুগিজে ও অনূদিত বাঙলায় অমিল আছে। এবিষয়ে একটি প্রচলিত মত এই যে অনুবাদের কালে বৃদ্ধ ফাদার মনোএল মাঝে-মাঝে ঝিমিয়ে পড়তেন, দেশীয় অনুবাদক তখন তাঁর অজ্ঞাতে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদে'র মধ্যে খ্রীষ্টধর্মবিরোধী নানা গালগল্প নিজেই জুড়ে দিয়েছে।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' থেকে রচনার সামান্য একটু নমুনা : "পুরুষে কহিবে : 'ফলানা, আমি তোমারে বিভাও করিব'। স্ত্রীয়ে কহিবে, 'ফলানা, আমি তোমার লগে বিভাও হইব'। তবে দুই জনের নিশান বদল করিয়া হইবেক : এ নিশান কিবা আংগুটি, কিবা মালা হইতে পারে। তাহার পর বিভাও যে সময়ে হয়, সেই সময়ে হইবেক।"[৭]

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদে'র ভাষা সম্পর্কে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : "এই ভাষার যথেষ্ট ফিরিঙ্গিয়ানা দোষ আছে; কিন্তু গুণও যথেষ্ট আছে।...বহু স্থানে পাদ্রি সাহেব বেশ ঝরঝরে বাঙ্গালা লিখিয়াছেন। তাঁহার রচনা-শৈলী একেবারে কথাবার্ত্তার অনুকারী; আস্তে আস্তে থামিয়া থামিয়া পড়িয়া গেলে, বিপরীত বাক্যরীতিও ততটা কানে ঠেকে না,—যে সব বাক্যাংশ সাধারণতঃ আমরা বাক্যের আদিতে বসাইয়া থাকি, সে সব বাক্যাংশ পরে আসিলেও মনে হয় যেন বাক্য মনের ভাবের গতি অনুসরণ করিয়া সহজভাবে প্রকাশিত হইতেছে, ধরিয়া ধরিয়া গুছাইয়া লইয়া তর্কবিদ্যানুমোদিত পন্থা অনুসারে সাধুভাষার ভঙ্গীকে অবলম্বন করিয়া কৃত্রিমতা প্রাপ্ত হয় নাই। ছোট ছোট বাক্যে ঘরোয়া কথা পাদ্রি সাহেব যেখানে বলিয়াছেন, সেখানকার রচনা বাস্তবিকই প্রসাদগুণযুক্ত...।"[৮]

তাছাড়া পাদরী মনোএল-দা-আস্‌সুম্পসাঁউ বাঙলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেছেন।* ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন : "বাঙ্গালার প্রথম ব্যাকরণকার ও কোষকার বলিয়া উচ্চস্থান তাঁহার প্রাপ্য।"[৯]

১৭৭৮ সালে হুগলি শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুদ্রাযন্ত্র; ছেনি-কাটা বাঙলা হরফে মুদ্রণ আরম্ভ হয়েছে। এই ১৭৭৮ সালেই হুগলিতে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়েছে নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডের 'A Grammar of the Bengali Language,' এবং ইংরেজিতে লেখা এই ব্যাকরণে দৃষ্টান্তস্বরূপ বাঙলা হরফে মুদ্রিত হয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কয়েকটি অংশ। বাঙলা হরফে সর্বপ্রথম মুদ্রিত

---

* ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : "এই বই খ্রীষ্টীয় ১৭৩৪ সালে রচিত হইয়া খ্রীষ্টীয় ১৭৪৩ সালে পোর্ত্তুগাল-দেশের রাজধানী লিস্‌বন্‌-নগরীতে রোমান অক্ষরে ছাপা হইয়াছিল।" (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন : পাদ্রি মানোএল্‌-দা-আস্‌সুম্পসাম্‌-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ, 'প্রবেশক', পৃ. ।০)

বাঙলা গদ্যের নমুনা হিসেবে 'A Grammar of the Bengali Language' থেকে একখানা পত্র উদ্ধার করি :

"৭ শ্রীরাম—

গরিবনেওয়াজ শেলামত—

আমার জমিদারি পরগনে কাকজোল তাহার দুই গ্রাম দরিয়াশীকিশ্‌তি হইয়াছে শেই দুই গ্রাম পয়শ্‌তী হইয়াছে চাকলে একবরপুরের শ্রীহরেকৃষ্ণ চৌধুরী আজ রায় জবরদস্তী দখল করিয়া ভোগ করিতেছে আমি মালগুজারির শরবরাহতে মারা পড়িতেছি উমেদওয়ার যে সরকার হইতে আমিন ও এক চোপদার সরজমিনেতে পহুচিয়া তোরফেনকে তলব দিয়া লইয়া আদালত করিয়া হকদারের হক দেলায়া দেন ইতি শন ১১৮৫ শাল তারিখ ১১ শ্রাবণ।

ফিদবি

জগতধির রায়"

উত্তরকালে সজনীকান্ত দাস মন্তব্য করেছেন : "আরবী ও পারসী শব্দকোষের দ্বারা বাংলা দেশের মৌখিক ও বৈষয়িক ভাষা প্রবলভাবে আক্রান্ত হইয়াছিল। এখন পর্যন্ত সে যুগের ভাষার নমুনা হিসাবে যত চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি দাখিল করা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতেই এই আক্রমণের আঘাত সুস্পষ্ট। বাংলা দেশে যদি ইংরেজের আগমন না ঘটিত তাহা হইলে আজিও আমাদিগকে বাংলা ভাষা লিখিতে বসিয়া 'গরিবনেওয়াজ শেলামত' বলিয়া সুরু করিয়া 'ফিদবি' বলিয়া শেষ করিতে হইত। তাহা মঙ্গলের হইত কি অমঙ্গলের হইত, আজ সে বিচার করিয়া লাভ নাই।"[১০]

ডঃ সুশীলকুমার দে মন্তব্য করেছেন : "To Carry belongs the credit of having raised the language from its debased condition of an unsettled dialect to the character of a regular and permanent form of speech, capable, as in the past, of becoming the refined and comprehensive vehicle of a great literature in the future." [১১]

উইলিয়ম কেরী কলকাতায় এসেছেন ১৭৯৩ সালের ১১-নভেম্বর। উইলিয়ম কেরীর মৃত্যু হয়েছে ১৮৩৪ সালের ৯-জুন। কেরীর জীবনের এই সুদীর্ঘ একচল্লিশ বছর বাঙলা গদ্যের ইতিহাসের সঙ্গে লিপ্ত হয়ে আছে।

কেরীর লেখা বাঙলা গদ্যের প্রথম নমুনা পাওয়া যায় ১৭৯৫ সালের ১৩-আগস্ট কেরীর লেখা একখানা চিঠিতে। চিঠিখানা থেকে কেরীর লেখা বাঙলা গদ্যের নমুনাটুকু উদ্ধার করি : "বাহিরে আইস এবং আলাদা হও এবং অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করিও না এবং আমি কবুল করিব তোমারদিগকে এবং তোমরা হইবে আমার পুত্রগণ এবং কন্যাগণ এই মত বলেন সর্বশক্ত ভগবান।"

১৮০০ সালের ১০-জানুআরি কেরী শ্রীরামপুরে এসেছেন। সেদিনই শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হল। পরদিন থেকে একটি ভাড়াবাড়িতে মিশনের কাজ আরম্ভ হল।

শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানায় প্রথম মুদ্রিত গদ্যপুস্তকের নাম 'মংগল সমাচার মাতিউর রচিত'; ১৮০০ সালের আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তকের সূত্রে বাঙলা গদ্যের ইতিহাসে একসংগে স্মরণীয় হয়ে আছে তিনটি নাম : রামরাম বসু, টমাস ও কেরী।

১৮০০ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়েছে 'এ লেটার টু দি লস্করস' নামে একটি পুস্তিকার বাঙলা অনুবাদ। কেরী অনুবাদ করেছেন।

১৮০১ সালের ৭-ফেব্রুআরি কেরীর বাঙলা নিউ টেস্টামেণ্টের মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয়েছে। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে কেরী সম্পূর্ণ বাইবেলের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেছেন; কেরীর বাইবেলের শেষ সংশোধিত ভাষার নমুনা : "অতএব এই মত প্রার্থনা কর হে আমারদের স্বর্গস্থ পিতা তোমার নাম পবিত্ররূপে মান্য হউক। তোমার রাজ্যের আগমন হউক। যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীতে তোমার ইষ্টক্রিয়া করা যাউক। অদ্য আমারদের নিত্য ভক্ষ্য আমারদিগকে দেও। এবং যেমন আমরা আপনারদের ঋণধারির দিগকে মাফ করি সেই মত আমারদের ঋণ মাফ কর। এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় চালাইও না কিন্তু আমাদিগকে আপদ হইতে পরিত্রাণ কর কেন না সদা সর্বক্ষণে রাজ্য ও শক্তি ও গৌরব তোমার। আমিন।"

কেরী খ্রীষ্টধর্মবিষয়ে একাধিক পুস্তক-পুস্তিকা লিখেছেন। সেসবের কথা বাদ দিলে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কেরীর প্রথম বই একখানা বাঙলা ব্যাকরণ। ১৮০১ সালে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে মুদ্রিত। এই বাঙলা ব্যাকরণের ভূমিকায় কেরী, ১৮০১ সালের ২২-এপ্রিল, লিখেছেন :

"The study of Bengalee has been much neglected from an idea that its use is very confined. I believe, however, that it is the universal medium of conversation and business throughout the whole of Bengal, except among the servants of Europeans; and even they use it constantly in their own families.

This language is peculiarly copious and harmonious; and, were it properly cultivated, would be deserving a place among those which are accounted the most elegant and expressive...."

১৮০১ সালের ৪-মে কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক হয়ে এলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংগে বাঙলা গদ্যের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক কেরী এবং তাঁর কয়েক-জন সহকর্মীর যত্নে ও উৎসাহে বাঙলা গদ্যে একাধিক পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছে; সেই পাঠ্যপুস্তকমালাতেই বাঙলা গদ্যের ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের আরম্ভ ও সমাপ্তি।

রামকমল সেন লিখেছেন : "Whatever has been done towards the revival of the Bengalee language, its improvement, and in fact the establishing it as a language must be attributed to that excellent man Dr. Carry and his colleagues, by whose liberality and great exertions many works have been carried through

the Press and the general tone of the language of this province so greatly raised." ১২

কেরীর 'কথোপকথন' প্রকাশিত হয়েছে ১৮০১ সালের আগস্টে। 'কথোপকথনে'র ভূমিকায়, ১৮০১ সালের ৪-আগস্ট, কেরী লিখেছেন:

"I have employed some sensible natives to compose dialogues upon subjects of a domestic nature, and to give them precisely in the natural style of the persons supposed to be speakers. . . ."*

'কথোপকথন' সেকালের কলকাতা-শ্রীরামপুর অঞ্চলের কথ্যভাষায় রচিত। বাঁ-পৃষ্ঠায় মূল বাঙলা রচনা, ডানপৃষ্ঠায় ইংরেজি অনুবাদ। 'কথোপকথন' থেকে 'কন্দল' নামে একটি রচনা উদ্ধার করি:

"আর শুনছিসডে নির্ম্মলের মা। এই যে বেণে মাগী অহঙ্কারে আর চকে মুখে পথ দেখে না। হ্যাদ্যাখ। কালি যে আমার ছেলে পথে ডাড়িয়াছিল তা ঐ বুড়া মাগী তিন চারি ছেলের মা করিলে কি ভরন্ত কলসিডা অমনি ছেলের মাথার উপর তলানি দিয়া গেল। সেই হইতে যাইটের বাছা জ্বরে ঝাঁউরে পড়েছে। এমন গরবাশুকি বল্লে আবার গালাগালি ঝকড়া করে। এ ভাতারখাগি সর্ব্বনাশির পুতটা মরুক তিন দিনে উহার তিনডা বেটার মাথা খাউক ঘাটে বসে মঙ্গল গাউক।

হাঁলো ঝি জামাই খাগি কি বলছিস। তোরা শুনছিস গো এ আঁটকুড়ি রাঁড়ির কথা। তুই আমার কি অহঙ্কার দেখিলি তিন কুলখাগি আমি কি দেখে তোর ছেলের মাথার উপর দিয়া কলসি নিয়া গিয়াছিলাম যে তুই ভাতার পুত কেটে গালাগালি দিচ্ছিস। তোর ভালডার মাথা খাই হালো ভালডা খাগি তোর বুকে কি বাঁশ দিয়াছিলাম হাড়ে।

থাক লো ছারকপালি গিদেরি থাক। তোর গিদেরে ছাই পল প্রায়। যদি আমার ছেলের কিছু ভাল মন্দ হয় তবে কি তোর ইটা ভিটা কিছু থাকিবে যা মনে আছে তা করিব। তখন তোমার কোন বাপে রাখে তাই দেখিব। হে ঠাকুর তুমি যদি থাক তবে উহার তিন বেটা যেন সাপের কামড়ে আজি রাত্রে মরে। ও যে কালি প্রাতঃকালে বাছা ২ করে কাঁদে তবেই ও অঙ্কারির অঙ্কারে ছাই পড়ে। হা বউরাঁড়ি তোর সর্ব্বনাশ হউক। তোর বংশে বাতি দিতে যেন কেউ থাকে না।

ওলো। তোর শাপে আমার বাঁ পার ধুলা ঝাড়া যাবে। তোর ঝি পুত কেটে দি আমার ঝি পুতের পায়। যালো যা বারোদুয়ারি ভাড়ানি হাট বাজার কুড়ানি খানকি যা। তোর গালাগালিতে আমার কি হবে লো কুন্দলি।

আই ২। এমন কর্ম্ম কি ও দেখে করেছে তা নহে। ওয় পোয়াতি বটে।

---

* সজনীকান্ত দাস মন্তব্য করেছেন: "সে যুগের পণ্ডিতদের রচনার সহিত তাঁহাদের লিখিত ও অনূদিত পুস্তক মারফত আমাদের যে পরিচয় আছে, তাহাতে আমরা মনে করিতে পারি, এই সকল কথোপকথন রচনার কৃতিত্ব মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারেরই প্রাপ্য। অন্য কেহই তখন তাঁহার মত যৌগিক ভাষা এবং প্রচলিত "ইডিয়ম" সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না।... তথাপি, কেরীর নামে যখন পুস্তকটি প্রকাশিত হইয়াছে, আজ সকল প্রশংসাই তাঁহার প্রাপ্য।" (সজনীকান্ত দাস: বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, ১৩৬৯, পৃ. ১৩৬।)

যা বুন! তুইও যা। ও যাউক। আর ঝকড়া কন্দলে কাজ নাই। পাড়াপড়সি রাতি পোয়াইলেই দেখা হবে এত বাড়াবাড়ি কেন।”

কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারতের সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংস্করণ কেরী ১৮০২ সালে প্রকাশ করেছেন। পরবর্তীকালে প্রকাশিত কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারতের অধিকাংশ সংস্করণ শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের উক্ত রামায়ণ-মহাভারতের আদর্শে প্রস্তুত।

১৮১২ সালের মার্চে প্রকাশিত হয়েছে কেরীর ‘ইতিহাসমালা’। দেড়শো গল্প আছে ‘ইতিহাসমালা’য়, প্রত্যেকটি গল্পই বিভিন্ন ভাণ্ডার থেকে আহৃত। ‘ইতিহাসমালা’ থেকে একটি রচনা উদ্ধার করি : “এক রাজার অতি সুন্দরী কন্যা কিন্তু সে হরিণীবদনা জন্মিয়াছিল রাজা তাহাতে সদা ভাবিত কি ক্রমে বিবাহ হইবেক স্বীকার কেহ করে না এই মতে প্রায় বার তের বৎসর বয়ঃক্রম হইল। এক দিবস রাজা ভাবিত হইয়া সভামধ্যে বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন রাত্রি প্রভাতে প্রথমে যাহার মুখ দর্শন করিব তাহার সহিত কন্যাই কন্যার বিবাহ দিব। পর দিন প্রথম একজন মন্ত্রিপুত্রকে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। মন্ত্রিপুত্র একদিন রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসিলেন তোমার হরিণীবদনের বিবরণ কি কন্যা কহিল তবে কহি শুন যদি তুমি ইহার প্রতিকার করিতে পার তবে আমার মনুষ্যের মুখ হইতে পারিবেক শুন আমি জাতিস্মরা পুর্ব্ব জন্মে হরিণী ছিলাম চিত্রকূট পর্ব্বতের মধ্যে একটা অতিবড় কূপ আছে তন্মধ্যে যে যে মানস করিয়া প্রাণ ত্যাগ করে তাহার জন্মান্তরে তাহাই সিদ্ধ হয় অতএব আমি রাজকন্যা হইব এই মানস করিয়া তাহাতে পড়িয়াছিলাম কিন্তু আমার মস্তকে একটা লতা লাগিয়া মাথা উপরে ছিল সর্ব্বাঙ্গ জল মধ্যে এ কারণ আমার এ দশা তুমি যদি সেই মাথা তথায় যাইয়া সেই জল মধ্যে ফেলিয়া দিতে পার তবে আমার মস্তক মনুষ্যাকার হয় মন্ত্রিপুত্র তাহা শুনিয়া সেই চিত্রকূট পর্ব্বতে গিয়া সেই মত করিলে রাজকন্যার মনুষ্যের মস্তক হইল। রাজা দেখিয়া এবং বিবরণ শুনিয়া অতিতুষ্ট হইয়া মন্ত্রিপুত্রকে অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া রাজা করিলেন ইতি।—”

‘ইতিহাসমালা’র শেষ গল্পটির শেষে কয়েকটি চমৎকার পংক্তি আছে : “মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা চিলে নিলে দুগণ্ডা বাঁকী রহিল ষোল তাহা ধুতে আটটা জলে পলাইল তবে থাকিল আট দুইটায় কিনিলাম দুই আটি কাঠ তবে থাকিল ছয় প্রতিবাসিকে চারিটা দিতে হয় তবে থাকিল দুই তার একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই তবে থাকিল এক ঐ পাত পানে চাহিয়া দেখ এখন হইস যদি মানুষের পো তবে কাঁটাখান খাইয়া মাছখান থো আমি যেঁই মেয়ে তেঁই হিসাব দিলাম কয়ে...।”

১৮১৮ সালে প্রকাশিত হল কেরীর বাঙলা অভিধানের প্রথম খণ্ড। ১৮২৫ সালের মধ্যে দুভাগে প্রকাশিত হল কেরীর বাঙলা অভিধানের দ্বিতীয় খণ্ড।

কেরী বাঙলাদেশে এসেছিলেন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য; সেজন্য নয়, চিরকালের বাঙালীর কাছে তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে রইলেন তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য।

আর্থিক কারণে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষ একবার সাব্যস্ত করলেন যে কলেজে বাঙলা পঠনপাঠন বন্ধ করে দেবেন। এবিষয়ে মতামত চাওয়া হল কেরীর কাছে। জবাবে কেরী যে চিঠি লিখেছেন, তার একজায়গায় আছে :

"The Bengalee language is superior in point of intrinsic merit to every language spoken in India and in point of real utility yields to none. . . ."

অতঃপর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুনশীদের প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে।

১৮০১ সালে প্রকাশিত রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত বাঙালী-রচিত প্রথম মৌলিক গদ্যগ্রন্থ। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' থেকে একাংশ উদ্ধার করি: "রাজা প্রতাপাদিত্য মহারাজা হইলেন। তাহার রাণী মহারাণী। বঙ্গভূমি অধিকার সমস্তই তাহারি করতলে। এই মত বৈভবে কতক কাল গত হয়। রাজা প্রতাপাদিত্য মনে বিচার করেন আমি একছত্রী রাজা হইব এ দেশের মধ্যে কিন্তু খুড়া মহাশয় থাকিতে হইতে পারে না। ইহার মরণের পরে ইহার সন্তানদিগকে দূর করিয়া দিব। তবেই আমার একাধিপত্য হইল। এখন কিছু কাল ধৈর্য্য অবলম্বন কর্ত্তব্য। এই মতে ঐশ্বর্য্য পর ২ বৃদ্ধি হইতেছে। নিকটবর্ত্তি আর ২ পট্টিদার যে ২ ছিল সমস্তকেই উৎখ্যাত করিয়া দিয়া আপনিই সর্ব্বাধ্যক্ষ হইল। কোন ক্রমে আর হ্রাস নাই পর পর বৃদ্ধি।—"

১৮০২ সালে প্রকাশিত হয়েছে 'লিপি মালা' নামে রামরাম বসুর আরেকখানা বই। 'লিপি মালা' রচনার উদ্দেশ্য কী? সে-বিষয়ে রামরাম বসু লিখেছেন: "এ হেন্দুস্থান মধ্যস্থল বঙ্গ দেশ কার্য্য ক্রমে এ সময় অন্যোন্য দেশীয় ও উপদ্বীপীয় ও পর্ব্বতস্থ ত্রিবিধ লোক উত্তম মধ্যম অধম অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে এবং অনেক অনেকের অবস্থিতি ও এই স্থানে এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এ দেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজ ক্রিয়া ক্ষম হইতে পারেন না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখা পড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্য ক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে এ ভূমীয় যাবদীয় লেখা পড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপি মালা নাম পুস্তক রচনা করা গেল।"

'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে' রামরাম বসু নির্ভয়ে ফারসী, আরবী, বাঙলা ও সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন। একটি অস্বাভাবিক বাক্যরীতি আশ্রয় করেছেন। ফলে কোনো সুসমঞ্জস গদ্যভাষা রচিত হয়নি। কিন্তু 'লিপি মালা' সম্পর্কে সেরকম কোনো অভিযোগ উত্থাপন করা চলে না।

গোলোকনাথ শর্মা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন। ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয়েছে গোলোকনাথের 'হিতোপদেশ'। সংস্কৃত থেকে অনুবাদ। কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হলেও গোলোকনাথ পুস্তক-প্রকাশকালে কলেজ-কর্তৃপক্ষের কাছে অর্থসাহায্য লাভ করেছেন। 'হিতোপদেশ' থেকে একটুখানি উদ্ধার করি: "যদি কীট পুষ্পের সহিত থাকে তবে মহতের শিরে আরোহণ করে। আর সাধু ব্যক্তি যদ্যপি পাথর স্থাপন করে তবে যে পাথর দেবত্ব পায় যেমন পর্ব্বতের উপরের দ্রব্য নিকটে দীপ্ত হয় তেমন সতের নিকটে হীন বর্ণের দীপ্ত হয়।"

১৮০২ সালে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' থেকে একাংশ উদ্ধার করি: "হে মহারাজ শুন রাজলক্ষ্মী কখন কাহাতেও স্থির হইয়া থাকেন না। রক্ত মাংস মল মূত্র নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরীরও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয় অতএব এ সকলে আত্যন্তিক

প্রীতি করা জ্ঞানী জনের উপযুক্ত নয় প্রীতি যেমন সুখদায়ক বিচ্ছেদে ততোধিক দুঃখদায়ক হন অতএব নিত্য বস্তুতে মনোভিনিবেশ জ্ঞানীর কর্ত্তব্য।"

১৮০৮ সালে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'হিতোপদেশ' থেকে একাংশ : "দক্ষিণ সমুদ্রতীরে টিট্টিভেরা স্ত্রী পুরুষে বাস করে তাহাতে প্রসব কাল নিকট হইলে টিট্টিভী পতিকে বলিল হে নাথ প্রসবোপযুক্ত নির্জ্জন স্থান অনুসন্ধান কর। টিট্টিভ কহিল হে প্রিয়ে এই স্থান সে বলিল এ স্থান সমুদ্র-বেলাকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় টিট্টিভ বলিল সমুদ্র কি আমাকে নিগ্রহ করিবেন টিট্টিভী হাসিয়া বলিল হে স্বামি তোমাতে আর সমুদ্রেতে বিস্তর অন্তর..."

আনুমানিক ১৮১৩ সালে রচিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' থেকে একাংশ : "হে ঈশ্বরদর্শি মুনি বহু কাল ব্যতীত হইল আমি তপস্যা করিতেছি তপঃসিদ্ধি হয় না কত কালে আমার তপঃসিদ্ধি হইবে ইহা আপনি ঈশ্বরসমীপে জানিয়া আমাকে আজ্ঞা করিবেন। তাপসের এই বাক্য শুনিয়া নারদ মুনি ঈশ্বর সন্নিধানে গিয়া তাহার কথা নিবেদন করিলেন। ঈশ্বর আজ্ঞা করিলেন ঐ তাপসের তপোবনোপকণ্ঠে যে অতিবৃহৎ তিন্তিড়ী বৃক্ষ আছে সে বৃক্ষের যত পত্র তত শত বৎসরে তার তপস্যাসিদ্ধি হইবে।"

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' থেকে আরেকটি অংশ : "শাক ভাত পেট ভরিয়া যে দিন খাই সে দিন তো জন্মতিথি। কাপড় বিনা কেয়ো পাচা ঠুকরিয়া খায় তেল বিহনে মাতায় খড়ি উড়ে। শীতের দিনে কাঁথা খানী ছালিয়া গুলিকের গায় দি আপনারা দুই প্রাণী বিচালি বিছাইয়া পোয়ালের বিঁড়ার মাতা দিয়া মেলের মাদুর গায় দিয়া শুই। বাসন গহনা কখন চক্ষেও দেখিতে পাই না যদি কখন পাথরায় খাইতে পাই ও রাঙ্গা তালের পাতা কাণে পরিতে ও পুঁতির মালা গলায় পরিতে ও রাঙ্গ সীসা পিতলের বালা তাড় মল খাড়ু গায় পরিতে পাই তবেতো রাজরাণী হই। এ দুঃখেও দুরন্ত রাজা হাজা শুকা হইলেও আপন রাজস্বের কড়া গণ্ডা ক্রান্তি বট ধূল ছাড়ে না এক আধ দিন আগে পাছে সহে না।...হে ঈশ্বর দুঃখির উপরেই দুঃখ ওরে পোড়া বিধাতা আমারদের কপালে এত দুঃখ লেখিস্ তোর কি ভাতের পাতে আমরাই ছাই দিয়াছি।"

মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার এই নমুনা অংশত উদ্ধার করে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন : "এ ভাষা অস্মদীয় ভাষা হউক আর না হউক, ইহা যে খাঁটি বাংলা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ ভাষা সজীব সতেজ সরল স্বচ্ছন্দ ও সরস। ইহার গতি মুক্ত, ইহার শরীরে লেশমাত্রও জড়তা নাই।..."[১০]

১৮১৭ সালে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্তচন্দ্রিকা' থেকে একাংশ : "দুর্গম বন পর্ব্বতে কণ্টকোদ্ধার করিয়া প্রথম পথপ্রবর্ত্তক প্রাচীনতর বিদ্যাজ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতেরদের কর্তৃক প্রকাশিত পথের পরিষ্কার করিয়া সেই পথের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমত্বকারীও যদি হউন প্রাচীন পণ্ডিতেরা তথাপি তাদৃশ প্রাচীনতর পণ্ডিতেরদের হইতে বড় হন না যে প্রথম পথপ্রবর্ত্তক সেই বড় ও তৎপ্রবর্ত্তিত ও তদুত্তরপণ্ডিতপরিষ্কৃত যে পথ সেই পথ। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ইতি।"

জে. সি. মার্শম্যান লিখেছেন : "(মৃত্যুঞ্জয়) was a colossus of literature. He bore a strong resemblance to our great lexicographer (Dr. Johnson), not only by his stupendous acquirements and the soundness of his critical judgment, but also in his rough

features and unwieldy figure. His knowledge of the Sanscrit Classics was unrivalled, and his Bengalee composition has never been surpassed for ease, simplicity, and vigour." [১৪]

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "বাংলা-গদ্যের যখন নিতান্ত শৈশবাবস্থা, তখনই তিনি (মৃত্যুঞ্জয়) বিভিন্ন গদ্যরীতি লইয়া পরীক্ষা চালাইয়াছেন এবং তাঁহার বিভিন্ন পুস্তক বিভিন্ন রীতিতে রচনা করিবার দুঃসাহস দেখাইয়াছেন। ঐ শিশু ভাষার ভবিষ্যৎ বিচিত্র সম্ভাবনার কথা সর্ব্বপ্রথম তাঁহারই মানস নেত্রে ধরা পড়িয়াছিল এবং কোনও প্রাচীন আদর্শের অভাবে তিনি নানা আদর্শ লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় জ্ঞানী মৃত্যুঞ্জয় সংস্কৃত রীতিকে যত দূর সম্ভব প্রাধান্য দিয়াছেন, কিন্তু খাঁটি বাংলা রীতিকেও তিনি উপেক্ষা করেন নাই। সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টিকর্তা যখন উপকরণ লইয়া পরীক্ষা করেন, তখন সমগ্র ভবিষ্যৎকে তিনি দেখিতে পান না বলিয়া কোনও একটি বিশেষ প্রকরণকেই একান্ত করিয়া দেখিতে পারেন না। মৃত্যুঞ্জয়ও কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট রীতিকেই একমাত্র রীতি বলিয়া প্রচার করিতে পারেন নাই; শিল্পিসুলভ প্রেমে সবগুলিকেই ভবিষ্যৎ বিচারকের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন।"[১৫]

জন গিলক্রাইস্টের তত্ত্বাবধানে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, মৌলবী ও মুনশীরা ইংরেজি থেকে ঈশপের গল্প ও অন্যান্য প্রাচীন কাহিনী ছয়টি দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এই অনুবাদগ্রন্থের নাম 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট', ১৮০৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে। 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্টে'র বাঙলা, ফারসী ও হিন্দুস্থানী অংশ অনুবাদ করেছেন তারিণীচরণ মিত্র। 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট' থেকে একটি বাঙলা রচনার অংশবিশেষ উদ্ধার করি : "হে আমার বন্ধুগণ এবং স্বদেশস্থ লোক, আমার কথা মনোযোগ করহ· এক বার এমন সঙ্ঘটন হইল যে শরীরের খণ্ড সকল পেটের চরিত্র হইতে রুষ্ট হইয়া এই স্থির করিলেক, যে পূর্ব্বাপর মতে ইহাকে আর খাদ্য জোগাইব না· প্রথম জিহ্বা দুষ্ট ভাষাতে তাহাদিগের দুঃখ বিস্তারিত কহিলেক; এবং হাতে পায়ের কৃতিত্ব ও পরিশ্রম অত্যন্ত বাখানিয়া কহিলেক, এ কি প্রমাদ আর অসঙ্গত হইল যে এমন স্থূল ও অলস উদর, যে নিতান্ত অকেজুয়া, আপনার কর্ম্ম আপনি করিতে অশক্ত, এবং অতিশয় লোভী তাহার নিমিত্তে আমাদিগের শ্রমের ফল নষ্ট হইবেক. এই কথা সকল অঙ্গেরা একত্র হইয়া প্রশংসাপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেক তৎক্ষণাৎ হস্ত কহিলেক আমি আর শ্রম করিব না; পা বলিলেক নাড়ীভুঁড়ীর ভার, যাহাতে অদ্যাবধি আমি আক্রান্ত ছিলাম আর বহিব না; বরং সেই দাঁত অমান্য হইল যে তাহার কারণ এক গ্রাসও চাবাইব না."*[১৬]

১৮১৮ সালে প্রকাশিত 'নীতিকথা'র সঙ্গেও তারিণীচরণের নাম জড়িত আছে। 'নীতিকথা'য় ইংরেজি ও আরবী থেকে একত্রিশটি কাহিনীর বাঙলা অনুবাদ আছে; রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের সহযোগে তারিণীচরণ বাঙলায় অনুবাদ করেছেন।

১৮০৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'। এই বই থেকে ঈষদংশ উদ্ধার করি : "রাজা রামনারায়ণ কহিলেন আপনি মধ্যে ২ কলিকাতার কোঠির বড় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ

* রোমান হরফে মুদ্রিত।

করেন কিন্তু তাঁহার বাক্য কি প্রকারে আপনি বুঝেন আর আপনকার কথা তিনি বা কি প্রকারে জ্ঞাত হন। এই কথার উত্তর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় করিলেন কলিকাতায় অনেক ২ বিশিষ্ট লোকের বসতি আছে তাঁহারা সকলে ইংগরেজী ভাষা অভ্যাস করিয়াছেন এবং সেই সকল বিশিষ্ট মনুষ্য সাহেবের চাকর আছেন তাঁহারাই বুঝাইয়া দেন।"

১৮০৫ সালে প্রকাশিত 'তোতা ইতিহাসে'র জন্য চণ্ডীচরণ মুন্‌শীর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। চণ্ডীচরণের 'তোতা ইতিহাস' ফারসী 'তুতিনামা'র বাঙলা অনুবাদ। চণ্ডীচরণের 'তোতা ইতিহাস' থেকে একাংশ উদ্ধার করি : "যখন সূর্য্য অস্ত হইল এবং চন্দ্রোদয় হইল তখন খোজেস্তা প্রেমানলে দগ্ধা হইয়া ক্রন্দন করিতে ২ তোতার অগ্রে যাইয়া কহিলেক ওহে শ্যামবর্ণ তোতা তুমি প্রত্যহ জ্ঞান বাক্য কহিয়া আমার গমন বারণ করিতেছ কিন্তু তোমার নীতি-বাক্যেতে আমার কোন উপকার হইবে না কেননা যে ব্যক্তি প্রেমাসক্ত হয় তাহার নীতবচনে কি হইতে পারে অতএব আমি প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পারিয়া যে রূপ দগ্ধচিত্তা হইতেছি তাহা কি কহিব?"

হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষপরীক্ষা' (সংস্কৃত থেকে অনুবাদ) প্রকাশিত হয়েছে ১৮১৫ সালের মাঝামাঝি। 'পুরুষপরীক্ষা'র ভূমিকায় হরপ্রসাদ লিখেছেন : "কেবল পুরুষাকার অনেক লোক মিলিতে পারে কিন্তু বক্ষ্যমান লক্ষণেতে যুক্ত যে পুরুষ সে অতি দুর্লভ তাহাও কহিতেছি ধীর এবং সুধী ও বিদ্বান্ আর পুরুষার্থযুক্ত এই চারি প্রকার পুরুষ তদ্ভিন্ন যে লোক সকল তাহারা পুরুষাকার পশু কেবল পুচ্ছরহিত।"

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুনশীদের রচিত পাঠ্যপুস্তকমালার সাহিত্যিকমূল্য হয়তো অসামান্য নয়, কিন্তু ঐতিহাসিকমূল্য নিশ্চয় আসামান্য। আলোচ্য পণ্ডিত-মুনশীদের মধ্যে সাহিত্যমূল্যের দিক থেকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার নিঃসন্দেহে সর্বাধিক স্মরণীয়।

এবং, মনে রাখা দরকার, কেরী কেবল নিজে বই লিখেই আপন কর্তব্য সমাপন করেননি, কেরীর উৎসাহ ও তত্ত্বাবধানেই আলোচ্য পণ্ডিত-মুনশীরা রচনাকার্যে লিপ্ত হয়েছেন, কেরী এবং তাঁর সহকর্মীদের যত্ন ও উৎসাহের ফলেই ভবিষ্যতের সমৃদ্ধিশালী বাঙলা সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।

এইচ. এইচ. উইলসন বলেছেন : "Either by his (কেরী) own exertions, or those of others, which he instigated and superintended, he left not only the students of the language well provided with elementary books, but supplied standard compositions to the natives of Bengal, and laid the foundation of a cultivated tongue and flourishing literature throughout the country." [১৭]

১৮১৪ সালে রামমোহন রায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য কলকাতায় আসেন। রামমোহনের প্রথম বাঙলা গ্রন্থ 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশিত হয়েছে ১৮১৫ সালে; অতঃপর শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রভাব ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এসেছে, বাঙলা গদ্য ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "বাংলা-গদ্যে গুরুগম্ভীর বিষয়

লইয়া প্রবন্ধরচনার অন্যতম প্রবর্ত্তক রামমোহন। তাঁহার শাস্ত্রবিচার ও তৎসংক্রান্ত বিবাদমূলক রচনার সাহায্যে বাংলা-গদ্যের গুরুত্ব যে প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি এক দিকে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহকে ভাষায় প্রকাশ করিয়া যেমন ভাষার ভাব ও শব্দসম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তেমনই অন্য দিকে তর্ক ও বিচারমূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া ইহাকে ঋজু, সতেজ ও পুষ্ট করিয়াছিলেন।"[১৮]

প্রমথ চৌধুরীর বিবেচনায় রামমোহনের বিচারপদ্ধতি ও তর্কের রীতি সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃতশাস্ত্রের ভাষ্যকারদের অনুরূপ। প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন : "রামমোহন রায়ের গদ্যে বাগাড়ম্বর নেই, সমাসের নামগন্ধও নেই এবং সে ভাষা সংস্কৃতবহুলও নয়।"[১৯]

১৮১৫ সালে প্রকাশিত, রামমোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থ' থেকে একাংশ উদ্ধার করি : "প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কতক গুলিন শব্দ আছে এভাষা সংস্কৃতের জে রূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিংবা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থ বোধের সময় অনুভব হয় অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ ২ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এনিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। জাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর জাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর সুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়।"

১৮১৬ সালে প্রকাশিত রামমোহনের 'ঈশোপনিষৎ' থেকে ঈষদংশ উদ্ধার করি : "ইঙ্গরেজ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে অধ্যয়ন করান কোন শাস্ত্রে আর কোন পূর্ব্বপরম্পরায় ছিল। আর কাগজ যে সাক্ষাৎ যবনের অন্ন তাহাকে স্পর্শ করা আর তাহাতে গ্রন্থাদি লেখা কোন্ শাস্ত্রবিহিত আর পরম্পরাসিদ্ধ হয় ইঙ্গরেজের উচ্ছিষ্ট করা আর্দ্র ওয়ফর দিয়া বন্ধ করা পত্র যত্নপূর্ব্বক হস্তে গ্রহণ করা কোন্ পূর্ব্বপরম্পরাতে পাওয়া যায় আর আপনার বাটীতে দেবতার পূজাতে যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা আর দেবতাসমীপে আহারাদি করান কোন্ পরম্পরাসিদ্ধ হয় এইরূপ নানাপ্রকার কর্ম্ম যাহা অত্যন্ত শিষ্টপরম্পরাবিরুদ্ধ হয় প্রত্যহ করা যাইতেছে। আর শুভসূচক কর্ম্মের মধ্যে জগদ্ধাত্রী রটন্তী ইত্যাদি পূজা আর মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ এ কোন্ পরম্পরায় হইয়া আসিতেছিল তাহাতে যদি কহ যে এ উত্তম কর্ম্ম শাস্ত্রবিহিত আছে যদ্যপিও পরম্পরাসিদ্ধ নহে তত্রাপি কর্ত্তব্য বটে। ইহার উত্তর। শাস্ত্রবিহিত উত্তম কর্ম্ম পরম্পরাসিদ্ধ না হইলেও যদি কর্ত্তব্য হয় তবে সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ আত্মোপাসনা যাহা অনাদি পরম্পরাক্রমে সিদ্ধ আছে কেবল অতি অল্প কাল কোনো ২ দেশে ইহার প্রচারের ন্যূনতা জন্মিয়াছে ইহা কর্ত্তব্য কেন না হয়।"

১৮১৯ সালের নভেম্বরে প্রকাশিত রামমোহনের 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ' থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি : "অনেক কুলীন

ব্রাহ্মণ যাঁহারা দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্ত করেন, তাহাদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারিবার সাক্ষাৎ করেন, তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামিদ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতা-পূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্যবর্ণের মধ্যে যাহারা আপন ২ স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাহারদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি ২ দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন; যেহেতু স্বামির গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্য বৃত্তি করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থান মার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জ্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে; এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামী শ্বশুর ও শাশুড়ি ও স্বামীর ভ্রাতৃবর্গ আমাত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেষণাদি আপন ২ নিয়মিত কালে করে,...ঐ রন্ধনে ও পরিবেষণে যদি কোন অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহারদের স্বামী শাশুড়ি দেবর প্রভৃতি কি ২ তিরস্কার না করেন; এ সকলকেও স্ত্রী-লোকেরা ধর্ম্ম ভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষ-পূর্ব্বক আহার করিয়া কাল যাপন করে; আর অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ যাঁহারদের ধনবত্তা নাই, তাহারদের স্ত্রীলোক সকল গোসেবাদি কর্ম্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম্ম তাহাও করেন, মধ্যে ২ কোনো কর্ম্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্বামীর ধনবত্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যাভিচার দোষে মগ্ন হয়, এবং মাসমধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই।"

১৮২১ সালে প্রকাশিত রামমোহনের 'ব্রাহ্মণ সেবধি' থেকে একাংশ উদ্ধার করি: "ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিশনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্ম্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্ম্মের ঔৎকর্ষ্য ও অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রীষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে।...বাংলা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্ব্বল ও দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না।..."

১৮২২ সালে প্রকাশিত রামমোহনের 'চারি প্রশ্নের উত্তর' থেকে একাংশ উদ্ধার করি: "যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতা প্রযুক্ত লজ্জা ও ধর্ম্ম ভয় পরিত্যাগ

করিয়া যাঁহারা বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান যবন্যাদি গমন করেন তাঁহারা বিরুদ্ধকারী অতএব শাসনার্হ অবশ্য হয়েন সেইরূপ যাঁহাদের পিতা বিদ্যমান আছেন এ নিমিত্ত ধন ও প্রভুতা নাই কেবল যৌবন ও অবিবেকতা প্রযুক্ত ধর্ম্মকে তুচ্ছ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদ সুরাপান ও যবন্যাদি গমন করেন তাঁহারাও শাসন-যোগ্য হয়েন অথবা কেশে অন্ত্যজরচিত কলপের ছোপ প্রায় প্রত্যহ দেন ও সর্ব্বদা যাহা সুরাতুল্য হয় তাহার পান এবং স্বভৃত্য যবন স্ত্রী ও চণ্ডালিনীবেশ্যা ভোগ করেন সে ২ ব্যক্তিও বিরুদ্ধকারী ও শাসনার্হ হয়েন। যেহেতু পিতা অবিদ্যমানে ধন ও প্রভুত্ব এ দুই অধিক সহকারী হইলে তাঁহাদের কি পর্য্যন্ত অসৎ প্রবৃত্তির সম্ভাবনা না হইবেক?"

১৮২৩ সালে প্রকাশিত রামমোহনের 'পথ্যপ্রদান' থেকে ঈষদংশ উদ্ধার করি: "স্মৃতি ও তন্ত্র উভয় শাস্ত্রানুসারে স্বস্ত্রী বঞ্চক পুরুষ সর্বথা পাপী হয়েন, কিন্তু ভর্ত্তা বর্ত্তমানে স্ত্রীর বৈধব্য, কি মহেশ্বর শাস্ত্রে কি স্মৃতিশাস্ত্রে লিখেন না, তবে ভর্ত্তা বিদ্যমানেও বৈধব্যের স্বীকার এবং তাহার সহিত অন্যের বিবাহের বিধি ধর্ম্মসংহারকের মতানুসারে তাঁহার ক্রোড়স্থই আছে, অর্থাৎ পাঁচশিকা গোঁসাইকে দিলেই স্বামী থাকিতেও পূর্ব বিবাহের খণ্ডন হইয়া স্ত্রী বৈধব্য হয়, আর পাঁচশিকা পুনরায় প্রদানের দ্বারা তাহার সহিত অন্যের বিবাহ পরে হইতে পারে...।"

১৮৩৩ সালে প্রকাশিত রামমোহনের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' থেকে ঈষদংশ উদ্ধার করি: "মনুষ্যের অভিপ্রায় নানাবিধ হইয়াছে, এবং কণ্ঠ তালু ওষ্ঠ ইত্যাদির অভিঘাতে নানা প্রকার শব্দ জন্মিতে পারে; এ নিমিত্তে এক ২ অভিপ্রেত বস্তুর বোধ জন্মাইবার নিমিত্তে এক ২ বিশেষ শব্দকে দেশ ভেদে নিরূপিত করিয়াছেন। যেমন ভিন্ন ২ বৃক্ষ সকলের বোধের নিমিত্তে আম্র, জাম, কাঁঠাল, ইত্যাদি ভিন্ন ২ ধ্বনিতে গৌড় দেশে নিরূপণ করেন, সেইরূপ ভিন্ন ২ ব্যক্তি সকলের উদ্বোধের নিমিত্তে রামচন্দ্র, রামহরি, রামকমল, ইত্যাদি নাম স্থির করিতেছেন; সেই ২ ধ্বনিকে শব্দ ও পদ কহেন, এবং সেই ২ ধ্বনিত হইতে যাহা বোধগম্য হয় তাহাকে অর্থ ও পদার্থ কহিয়া থাকেন।"

রামমোহন বাঙলা গদ্যে অন্যূন তিরিশখানা পুস্তক-পুস্তিকার রচয়িতা।

১৮৫৪ সালের ১৩-মার্চ 'সংবাদ প্রভাকর' মন্তব্য করেছে: "দেওয়ানজী (রামমোহন রায়) জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন, তাহাতে কোন বিচার ও বিবাদ ঘটিত বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাব সকল অতি সহজে স্পষ্ট-রূপে প্রকাশ পাইত, এজন্য পাঠকেরা অনায়াসেই হৃদয়ংগম করিতেন, কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না।..."

অত্যন্ত সার্থক মন্তব্য।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন: "বাংলা-সাহিত্যের প্রসারের সহিত বাংলা সাময়িক-পত্রিকার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে; ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সাময়িক-পত্র প্রকাশের সংগে সংগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে।"[২০]

ডঃ শিশিরকুমার দাশ যথার্থ লিখেছেন: "The majority of the newspapers were written in part at any rate in Bengali, some wholly so. The writing of Bengali continued and when the language debate was brought to an end in 1835, Bengali was

the established language of the popular newspapers in Bengal and a language written by many of its journalists. It is correct, therefore, to say that the first phase of Bengali prose writing belonged to the class room, it is equally correct to say that the second phase belonged to the newspapers." [২১]

'দিগ্দর্শন' প্রথম প্রকাশিত বাঙলা সাময়িকপত্র। মাসিকপত্র। সম্পাদক—জন ক্লার্ক মার্শম্যান। প্রথম প্রকাশ—এপ্রিল, ১৮১৮ সাল। শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত। প্রথম ভাগ 'দিগ্দর্শন' থেকে একটি রচনার অংশ উদ্ধার করি : "পৃথিবী চারি ভাগে বিভক্ত আছে ইওরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা। ইওরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা এই তিন ভাগ এক মহাদ্বীপে আছে ইহারা কোন সমুদ্রদ্বারা বিভক্ত নয় কিন্তু আমেরিকা পৃথক্ এক দ্বীপে প্রথম দ্বীপ হইতে সে দুই হাজার ক্রোশ অন্তর। অনুমান হয় তিন শত ছাব্বিশ বৎসর হইল আট শত আটানব্বই শালে আমেরিকা প্রথম জানা গেল তাহার পূর্ব্বে আমেরিকা কোন লোককর্তৃক জানা ছিল না..."

'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে ১৮১৮ সালের ২৩-মে : "কথক মাস হইল শ্রীরামপুরের ছাপাখানা হইতে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাস ২ ছাপাইবার কল্পও ছিল তাহার অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিকটে সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয় কিন্তু সে পুস্তকে সকলের সম্মতি হইল না এই প্রযুক্ত যদি সে পুস্তক মাস ২ ছাপা যাইত তবে কাহারো উপকার হইত না অতএব তাহার পরীবর্ত্তে এই সমাচারের পত্র ছাপাইতে আরম্ভ করা গিয়াছে। ইহার নাম সমাচার দর্পণ।"

'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদক—জে. সি. মার্শম্যান। সাপ্তাহিক পত্রিকা। প্রত্যেক শনিবার শ্রীরামপুর থেকে বেরত। প্রথম তিন সপ্তাহ বিলি করা হয়েছিল বিনামূল্যে। সম্পাদক একজন সাহেব, কিন্তু আসল কাজ করতেন দিশী পণ্ডিতেরা। তাঁরা যদি উপস্থিত না থাকতেন তো পত্রিকায় নতুন সংবাদও নেই। পণ্ডিতেরা বাড়ি গেলেন তো পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবেদন দেখা গেল : "আমারদের পণ্ডিতগণ আগামী সোমবার পর্যন্ত সব ২ বাটী হইতে প্রত্যাগত হইবেন না অতএব এই কালের মধ্যে দর্পণে নূতন ২ সম্বাদ প্রকাশ না হওয়াতে পাঠক মহাশয়েরা ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।"

১৮৩২ সালের ১১-জানুআরি থেকে 'সমাচার দর্পণ' অর্ধ-সাপ্তাহিক হয়ে গেল। ১৮৩৪ সালের ৮-নভেম্বর থেকে আবার পালাবদল হল, 'সমাচার দর্পণ' আবার সাপ্তাহিক হয়ে গেল। এবং ১৮৪১ সালের শেষের দিকে মার্শম্যান সাহেব 'সমাচার দর্পণ' ছেড়ে দিলেন, 'সমাচার দর্পণ' বন্ধ হয়ে গেল।

বাঙালীদের চেষ্টায় আবার 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হল ১৮৪২ সালে। এবার সম্পাদক একজন বাঙালী—ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি পত্রিকাখানা। ১৮৪৩ সালে আবার বন্ধ হল 'সমাচার দর্পণ'। কিন্তু ১৮৫১ সালের মে-মাসে শ্রীরামপুর মিশন থেকে আবার প্রকাশিত হল 'সমাচার দর্পণ'। দেড়বছর বাদে বন্ধ হল। সেই শেষ।

শ্রীরামপুর থেকে 'সমাচার দর্পণ' আর কলকাতা থেকে 'বাঙ্গাল গেজেটি'। 'সমাচার দর্পণে'র মূলে ছিলেন সাহেব, আর 'বাঙ্গাল গেজেটি'র মূলে বাঙালী। 'বাঙ্গাল গেজেটি' বাঙালীদের হাতে গড়া প্রথম বাঙলা পত্রিকা। মূলে ছিলেন দুজন—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য আর হরচন্দ্র রায়।

'সমাচার দর্পণ' আর 'বাঙ্গাল গেজেটি'— দুয়ের মধ্যে বয়সের তফাৎ মাত্র কয়েকটি দিন। দুটি পত্রিকার জন্ম একই বছরে—১৮১৮ সালে।

১৮১৯ সালের ডিসেম্বরে ব্যাপটিস্ট অক্সিলিয়ারি মিশনারি সোসাইটি থেকে 'গস্‌পেল মাগাজীন' নামে একখানা দ্বিভাষিক মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি পৃষ্ঠার বাঁ দিকে থাকত ইংরেজি, ডানদিকে বাঙলা। প্রথম সংখ্যা 'গস্‌পেল মাগাজীন' থেকে একটি রচনাংশ উদ্ধার করি : "পণ্ডিতেরা পৃথিবীর চারি খণ্ডের ক্রমেতে ইউরপ, আর আসিয়া, এবং আফ্রিকা, এবং আমেরিকা, এই চারি নাম দিয়াছেন; এই প্রত্যেক খণ্ডেতেই বহু বিধ মনুষ্যের বসতি আছে. ইহার খণ্ডে ২ ব্যবহার ভিন্ন ২ বটে; অধিকন্তু, প্রত্যেক খণ্ডে দেশ দেশান্তরের লোক ভিন্ন ২ ব্যবহারে চলে, পরন্তু, তাহার মধ্যে এই একটা অতিশয় আশ্চর্য্য, যে সপ্তাহ তাবৎ খণ্ডেতেই প্রচদ্রূপ চলিত আছে, সকলেই সপ্তাহ গণনা করিয়া থাকে· দেখ, দিন, ও রাত্রি, এবং মাস, আর বৎসর, যে সকলে মানে, এ অতি অসম্ভব নয়, কেননা সূর্য্যের উদয়াস্ত লইয়া দিন রাত্রির স্থিত্ হয়;..."

'গস্‌পেল মাগাজীনে'র আগে আর কোনো সাময়িকপত্রে সম্ভবত বাঙলা-গদ্যে ইংরেজি বিরামচিহ্নাদি ব্যবহৃত হয়নি।

১৮২১ সাল। 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত একখানি পত্র দেখে রামমোহন রায় বিবেচনা করলেন মিশনারিদের পক্ষ থেকে হিন্দুধর্মকে অযথা আক্রমণ করা হয়েছে। শিবপ্রসাদ শর্মার নামে উত্তর লিখে তিনি 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদকের কাছে পাঠালেন। 'সমাচার দর্পণে'র সম্পাদক সে-উত্তরটি পুরোপুরি ছাপতে রাজি হলেন না। রামমোহন রায় তখন বের করলেন 'ব্রাহ্মণ সেবধি', 'শিবপ্রসাদ শর্মা'র নামে রামমোহন একাধিক রচনা ছাপিয়েছেন ওই পত্রিকায়।

সাপ্তাহিক 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশ করেছেন কলুটোলার তারাচাঁদ দত্ত আর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ : ১৮২১ সালের ৪-ডিসেম্বর। প্রতি মঙ্গলবারে বেরত 'সম্বাদ কৌমুদী'। অন্যতম নিয়মিত লেখক ছিলেন রামমোহন রায়। সহমরণের বিরুদ্ধে রামমোহন প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করলেন, তাই তেরোটি সংখ্যা বেরনোর পরেই ভবানীচরণ 'সম্বাদ কৌমুদী'র সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখলেন না। ভবানীচরণ 'সম্বাদ কৌমুদী' থেকে বিদায় নিলেন, তাঁর জায়গায় এলেন তারাচাঁদ দত্তের পুত্র হরিহর দত্ত। নামে হরিহর কিন্তু আসলে পত্রিকা চালাতে লাগলেন রামমোহন। পত্রিকার টাকা-পয়সার অবস্থা কিছু আশাপ্রদ নয়। তাই হরিহরও সত্ত্বাধিকারীর পদ থেকে আড়াইমাস বাদেই অবসর নিলেন। তার বদলে পরিচালক হলেন গোবিন্দচন্দ্র কোঙার। তবুও চলল না, চারমাস পরেই বন্ধ হয়ে গেল 'সম্বাদ কৌমুদী'। পরের বছর এপ্রিল-মাসে পুনর্জীবিত হল 'সম্বাদ কৌমুদী'। সেবার সম্পাদক—আহিরীটোলার আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মুদ্রাকর ও প্রকাশক আগের সেই গোবিন্দচন্দ্র কোঙার। বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও পত্রিকাটি তখন প্রায় দশবছর জীবন্ত ছিল।

'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকার রচনার একটুখানি নমুনা : "শুনা গেল যে সংপ্রতি জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি হরিপুর গ্রামনিবাসি রামমোহন বসু নামক এক কায়স্থের পুত্রের বিবাহ আতাড়িখড়শী গ্রামের মিত্রেরদের কন্যার সহিত হইয়াছিল তাহাতে যে সকল বিশিষ্ট সন্তান বরযাত্র গিয়াছিলেন তাহার-দিগের সহিত পরিহাসের কারণ কন্যা যাত্রিকেরা কএক হাঁড়ির মধ্যে হেলে ঢোঁড়া ও ঢেম্না এই তিন প্রকার সর্প পরিপূর্ণ করিয়া এক গৃহমধ্যে রাখিয়া সেই গৃহে বরযাত্রিরদিগকে বাসা দিয়া দ্বার রুদ্ধপূর্ব্বক কৌশলক্রমে ঐ সকল

হাঁড়ি ভগ্ন করিল তাহাতে এককালে সর্প বাহির হইয়া হিলিবিলি করিয়া ইতস্ততঃ পলায়নের পথ না পাইয়া ফোঁস ফাঁস করত বরযাত্রিকেরদের গাত্রে উঠিতে লাগিল তাহাতে বরযাত্রিকেরা ঐ সকল বীভৎসাকার সর্পভয়ে ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বাপরে মলেমরে ওরে সাপে খেলেরে তোমরা এগোওরে বলিয়া মহাব্যস্ত সমস্ত হওয়াতে গ্রামের চৌকিদার প্রভৃতি ডাকাইত পড়িয়াছে বলিয়া ধাবমানে আসিয়া পরিহাস শুনিয়া হাসিয়া দ্বার খুলিয়া দেওয়াতে সকলে বাহির হইয়া একপ্রকার রক্ষা পাইল এবং সর্পসকলও ক্রমে২ প্রস্থান করিল যাহা হউক এতদ্বিষয় আমারদিগের প্রকাশের তাৎপর্য্য এই যে এতৎ প্রদেশীয় অনেক২ বৈবাহিক বরযাত্রিকেরদের মধ্যে বিবিধ রহস্য ও অবস্থা শ্রুত দৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু এমত অদ্ভুত রহস্য কেহ কুত্রাপি দেখেন নাই এবং শুনেনও নাই।”

১৮২২ সালে কলকাতা স্কুলবুক সোসাইটি থেকে বেরল ‘পশ্বাবলী’ নামে একখানি মাসিক বাঙলা বই। একেকটি সংখ্যায় একেকটি জন্তুর কথা ও কাহিনী, সঙ্গে সেই জন্তুটিরই কাঠ-খোদাই ছবি। যথা—সিংহ, ভালুক, হাতি, গণ্ডার ইত্যাদি। সঙ্কলক ছিলেন পাদরী লসন, কাঠখোদাইগুলিও তাঁর। রচনার বঙ্গানুবাদ করে দিতেন পীয়ার্স সাহেব। পাদরী লসনের মৃত্যুতেই ‘পশ্বাবলী’র প্রথম পর্যায় শেষ হল। দ্বিতীয় পর্যায়ে ‘পশ্বাবলী’ বেরিয়েছিল রামচন্দ্র মিত্রের পরিচালনায়। সাকুল্যে ষোলোটি সংখ্যা বের করেছিলেন তিনি। প্রথম পর্যায়ের ‘পশ্বাবলী’ থেকে রচনার একটি দৃষ্টান্ত আহরণ করি। রচনাটি শৃগাল সংক্রান্ত :

“জেলা নদিয়ার মাটিয়ারি পরগণার সাহাবাদপুর গ্রামে শ্রীপলিন বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি মুছলমান ছিল; সে প্রতি দিন রোজা করিত; তাহাতে ঐ গ্রামের উত্তর দিকে গিয়া পাক করিয়া সন্ধ্যাকালে আহার করিত· শৃগালেরদিগকে ও অন্ন দিত. ঐ অন্নাশাতে অনেক শৃগাল সেইস্থানে একত্র হইয়াছিল, কিন্তু যখন বিশ্বাস পাকারম্ভ করিত, তখন সকল শৃগাল নির্ভয়ে অশব্দে বসিয়া থাকিত; পাক সমাপ্ত হইলে সকলকে ডাকিয়া নিরূপিত খাপরায় তাহারদিগকে অন্ন দিত· তাহাতে শৃগালেরা আপন২ ভাগ খাইয়া অন্য কোন ভাগের উপর আক্রমণ করিত না. আর শৃগালেরা ঐ বিশ্বাসের নিকটে অতি নির্ভয়ে আপন ২ বাচ্চার সহিত গতায়াত করিত, এবং তাহারদিগকে ভাগ২ করিয়া দিলে যাবৎ বিশ্বাসের আজ্ঞা না পায় তাবৎ ঐ অন্নের নিকটে বসিয়া থাকে; আজ্ঞা পাইলে স্ব ২ ভাগ মাত্র খায়·

এক দিবস ঐ বিশ্বাসের ২ বৎসর বয়স্কা এক পৌত্রীর মৃত্যু হইলে, বিশ্বাস শোকার্ত্ত হইয়া অনেক রোদন করিয়া সে দিবস আহার না করিয়া কোন লোক দ্বারা অন্ন প্রস্তুত করাইয়া শৃগালেরদিগকে নিয়মানুসারে দিল; তাহাতে প্রভুর দুঃখে কোন শৃগাল সে দিন অন্ন খাইল না·

এবং সেই কন্যার গোর সেই স্থানে দিলে শৃগালেরা অতিশয় মাংসাসী হইয়াও অন্য ২ বালকের গোরের মত তাহার কোন ব্যাঘাত করিল না, বরং ঐ গোরের রক্ষা করিল· ইহাতে হে মনুষ্যেরা, শৃগালের প্রভুভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জানিয়া তোমারদিগের ও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত·”

ওদিকে সহমরণের বিরুদ্ধে রামমোহন একের পর আরেক প্রবন্ধ রচনা করে চলেছেন ‘সম্বাদ কৌমুদী’তে। সেজন্যই ভবানীচরণ ‘সম্বাদ কৌমুদী’র সংস্রব ত্যাগ করেছেন। সেকথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু সেটুকুই তো যথেষ্ট

নয়। গোঁড়া হিন্দুরা—যাঁরা সহমরণের পক্ষে—একখানা সাপ্তাহিকপত্র বের করলেন : 'সমাচার চন্দ্রিকা'। সম্পাদক—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশিত হয়েছে ১৮২২ সালের ৫-মার্চ। 'সম্বাদ কৌমুদী' আর 'সমাচার চন্দ্রিকা'—একখানা আরেকখানার বিষম বিপক্ষ। দু-দলে বিবাদ। ১৮২৯ সালের এপ্রিল মাসে 'সমাচার চন্দ্রিকা' আর সাপ্তাহিক রইল না, সপ্তাহে দু-বার করে বেরতে লাগল। সেসময়ে খুব নামডাক হয়েছিল 'সমাচার চন্দ্রিকা'র, অন্যান্য পত্রিকার তুলনায় গ্রাহকসংখ্যাও ছিল চমৎকার। ১৮৪৮ সালের ২০-ফেব্রুআরি ভবানীচরণ মারা গেলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙলাদেশের সাংবাদিক ও সুলেখক হিসাবে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষভাবে স্বীকৃত ও সম্মানিত। ভবানীচরণ বাঙলা-গদ্যে বঙ্গরচনার প্রথম শিল্পী।

১৮২৩ সালে প্রকাশিত ভব্যানীচরণের 'কলিকাতা কমলালয়' থেকে একাংশ তুলে দিচ্ছি : "বি, প্র, মহাশয় এই কলিকাতায় ভাগ্যবান্ লোকের বাটীতে আমারদিগের দেশস্থ কতকগুলিন লোক কোন ২ কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তাঁহার-দিগের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি যে বাবুসকল নানা জাতীয় ভাষার উত্তম ২ গ্রন্থ অর্থাৎ পার্সি ইংরাজী আরবি কেতাব ক্রয় করিয়া কেহ এক কেহ বা দুই গেলাসওয়ালা আলমারির মধ্যে সুন্দর শ্রেণী পূর্ব্বক এমত সাজাইয়া রাখেন যে দোকানদারের বাপেও এমত সোনার হল করিয়া কেতাব সাজাইয়া রাখিতে পারে না আর তাহাতে এমন যত্ন করেন এক শত বৎসরেও কেহ বোধ করিতে পারেন না যে এই কেতাবে কাহারও হস্তস্পর্শ হইয়াছে অন্য পরের হস্ত দেওয়া দূরে থাকুক জেলদ্গর ভিন্ন বাবুও স্বয়ং কখন হস্ত দেন নাই এবং কোন কালেও দিবেন এমত কথাও শুনা যায় না...।"

১৮২৫ সালে প্রকাশিত ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাস' থেকে একাংশ উদ্ধার করি : "অনন্তর চট্টগ্রামনিবাসী অপূর্ব্ব মিষ্টভাষী এক উপযুক্ত মুনসী তিনি বোট আপিসের মাঝি ছিলেন, এক সার্টিফিকিট দেখাইলেন কর্ত্তার যেরূপ বিদ্যা তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি তাহাতেই সুবিদিত আছেন, কর্ত্তা মহাশয় ঐ ইংরাজী লিখিত সার্টিফিকিট পাঠ করিয়া বলিলেন যে অনেক দিবসাবধি এ ব্যক্তি মুনসীগিরি কর্ম্ম করিয়াছে তাহাতে লেখা আছে, যে এ ব্যক্তি মাঝি বড় ভাল মনুষ্য এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছে এ প্রযুক্ত আমার কর্ম্ম হইতে ছাড়াইল, কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কত কাল এ সাহেবের নিকট চাকর ছিলে, মুনসী কহেন উহাতে লেখা আছে আপনি দেখিবার চান তো দেখুন; কর্ত্তা কহিলেন হাঁ২ আছে বটে, কোন্ সাহেবের কর্ম্ম করিতে, আজ্ঞা কর্ত্তা, বালবর কোম্পানি, কোম্পানির মুনসী শুনিয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন পরে মাঝি পূর্ব্বলিখিত বেতনে সেই সকল কর্ম্ম স্বীকার করিলেন। পরদিবস বাবুদিগের পাঠ আরম্ভ হইল। অতিসূক্ষ্মবুদ্ধিপ্রযুক্ত দুই বৎসর মধ্যেই প্রায় করিমা সমাপ্ত করিলেন, গোলেস্তাঁ বোস্তাঁ আরম্ভ করিয়া ইংরাজী পড়িবার নিমিত্ত বাবুরা স্বয়ং চেষ্টক হইলেন বয়ঃক্রম প্রায় তের চৌদ্দ বৎসর হইয়াছে, ইংরাজী কাহার নিকটে পড়িবেন ইহার চেষ্টায় কখন আরাতুন পিৎরুস, ডিকরুস, ফালস ইত্যাদি সাহেবের ইস্কুলে গমনাগমন করেন, কিন্তু বাবুদিগের কেহ ভালমতে বুঝাইতে পারেন না...।"

ভবানীচরণের মৃত্যুর পর 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক হলেন তাঁর পুত্র রাজকৃষ্ণ। কিন্তু তখন 'সংবাদ প্রভাকর' 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রভৃতি পত্রিকার

আবির্ভাবের ফলে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র আর সেদিন নেই। রাজকৃষ্ণ ঋণভারে দেউলে হয়ে গেলেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র স্বত্ব কিনে নিলেন ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

সাময়িকপত্র সম্পর্কে নতুন আইন জারি হল ১৮২৩ সালে। সেই আইনের ফলে স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর আর প্রকাশককে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হত। ১৮৩৫ সালে স্যর চার্লস মেটকাফের কৃপায় ও-আইন রহিত হয়ে গেল।

১৮৩১ সালের ২৬-জানুআরি সাপ্তাহিক 'সংবাদ প্রভাকরে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদক—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। গোড়ার দিকে পাথুরেঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের টাকায় চোরবাগানের একটি প্রেসে ছাপানো হত 'সংবাদ প্রভাকর'। মাসকয়েক পরে ওই 'সংবাদ প্রভাকর' ছাপানোর জন্য ঠাকুরবাড়িতে একটি প্রেস বসানো হল।

যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুর পর দেড়বৎসরাবধি অপ্রকাশিত ছিল 'সংবাদ প্রভাকর'। এই পত্রিকাটির আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হলেও বাধাবিঘ্নহীন নয়। সাপ্তাহিক ছেড়ে পত্রিকাটি বারত্রয়িক হয়েছে, বারত্রয়িক থেকে দৈনিক। 'সংবাদ প্রভাকর' বাঙলাভাষায় প্রকাশিত সর্বপ্রথম দৈনিকপত্র। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ লিখেছেন : 'সংবাদ প্রভাকর' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্ত্তি।

সেকালের আরেকখানি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা—'জ্ঞানান্বেষণ'। এর মূলে ছিল ইংরেজি-জানা উদারমতাবলম্বী যুবকদের উদ্যম। গবর্নমেণ্টের লাইসেন্স নিয়ে প্রথম এই সাপ্তাহিকখানা প্রকাশ করেন দক্ষিণানন্দন (পরে 'দক্ষিণারঞ্জন') মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণানন্দনের পরে 'জ্ঞানান্বেষণে'র পরিচালনার ভার নিলেন রসিককৃষ্ণ ও মাধবচন্দ্র মল্লিক। প্রথমদিকে 'জ্ঞানান্বেষণ' বেরত বাঙলাভাষায়, তারপর ইংরেজি-বাঙলা দু-ভাষাতেই প্রচারিত হতে লাগল 'জ্ঞানান্বেষণ'। কিছু-কাল এই পত্রিকার বাঙলা বিভাগের সম্পাদক ছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। উদারমতাবলম্বী—এই অপরাধে তিনি সেকালের গোঁড়া হিন্দুদের কাছে বহু-নিন্দিত। 'জ্ঞানান্বেষণ'কে কেন্দ্র করে দক্ষিণানন্দন ও গৌরীশঙ্করকে জড়িয়ে গোঁড়াদলের একজন—'সম্বাদ তিমিরনাশক' পত্রের সম্পাদক একবার লিখলেন : "সন ১২৩৮ সালের ৫ আষাঢ়ে জ্ঞানান্বেষণ কাগজ প্রকাশ হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুত দক্ষিণানন্দন ঠাকুর ইনি বাবু সূর্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গালা লেখা পড়া কিছুই জানেন না এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে রুচিও নাই অথচ বাঙ্গালা সমাচার কাগজের এডিটর না হইলেই নয় মাতামহদত্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে তাহা তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া ঐ কাগজের জন্য কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় করেন এক জন নাটুরে ভাট মদ্যপায়িকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন সে নাস্তিক হিন্দুদ্বেষী কাগজ আরম্ভাবধি কেবল ধার্ম্মিকবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকাকর মহাশয়কে কটু কহে আর হিন্দুশাস্ত্র ভাল নহে তাহারি দোষ আপন বুদ্ধিতে যাহা আইসে তাহাই লেখে এজন্য ভদ্রলোকমাত্র কেহ ঐ কাগজ পাঠ করেন না তথাচ কাগজ ছাপা করিয়া জন কএক লোকের বাটীতে পাঠাইয়া দেন।"

'সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে ১৮৩৫ সালের জুনমাসে। প্রথমদিকে 'সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়' ছিল মাসিক পত্রিকা, প্রতি পূর্ণিমায় বেরত। প্রথমে তিনবছরের অধিককাল পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন হরচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়। হরচন্দ্রের পরে সম্পাদক হলেন আমড়াতলার উদয়চন্দ্র আঢ্য। তারপরের

সম্পাদক উদয়চন্দ্রের বড়ো ভাই অদ্বৈতচন্দ্র আঢ্য। অদ্বৈতচন্দ্রের পর গোবিন্দচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্রের পর মহেন্দ্রনাথ।

১৮৩৬ সালের ৯-এপ্রিল থেকে মাসিক ছেড়ে সাপ্তাহিকপত্র হল 'সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়'। তারপর ১৮৪৪ সালের নভেম্বর থেকে একেবারে দৈনিকপত্র। এই দৈনিকপত্র হিসেবেই দীর্ঘ তিয়াত্তর বছর চলেছে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'।

১৮৩৫ সালের ৮-জুন 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' 'বিজ্ঞাপন' লিখেছে : "এতন্মহানগরীয় বা অন্যান্য ভিন্নদেশীয় অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত যশঃপূর্ণিত সর্ব্বগুণালঙ্কৃত গাম্ভীর্য্য স্থৈর্য্যবীর্য্যবন্ত অত্তৈশ্বর্য্যান্বিত বা মধ্যমস্থ সাধুসদাশয় সমূহ মহাশয় এনিকৃষ্টের ধীরতার প্রাখর্য্য প্রকাশে অনিবৃক্রমণ পূর্ব্বক সর্ব্বদোষ মার্জ্জনা করিবেন তথা অলঙ্কারাদি দোষে দৃষ্টি-পাত পরিত্যাগ করতঃ সারভাগ গ্রহণ করিবেন যথা হংসের নীরে ক্ষীর ভক্ষণ..."

তারপর বলা যাক 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার কথা। ১৮৩৯ সালের মার্চ মাসে 'সম্বাদ ভাস্করে'র জন্ম। সম্পাদক—শ্রীনাথ রায়। কিন্তু মূলে পরিচালক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। ১৮৪৬ সালের ৭-এপ্রিলের 'সম্বাদ ভাস্কর' থেকে একটি 'বিজ্ঞাপন' উদ্ধার করি : "সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করা যাইতেছে যে মেং ডগক্লেশ সাহেব আশ্চর্য্য এক যন্ত্রদ্বারা ছায়া আকর্ষণ করিয়া ঠিক প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতেছেন, আপনার প্রতিমূর্ত্তি করাইতে যাঁহাদিগের ইচ্ছা হয় তাঁহারা ইটালীর আরমাণি বাজারের দক্ষিণ প্রথম সংখ্যক বাটী যাহাতে বড় একটা নিম্ব বৃক্ষ আছে ঐ বাটীতে উক্ত সাহেবের নিকট গিয়া ছবি করাইবেন, ক্ষুদ্র ২ ছবির মূল্য ১২। বড় ২ ছবির মূল্য ৫০ টাকা, অর্দ্ধ মিনিটের মধ্যে ছবি হয়, তৎপরে আর ২ কর্ম্মেতে চারি পাঁচ মিনিট লাগে এই অল্পক্ষণের পরে প্রকৃতছবি লইয়া প্রত্যাগমন করিতে পারেন এবং স্ত্রীলোকদিগের ছবি করাইতে হইলে সাহেবকে আপনারদিগের বাটীতে আনাইতে হয়, তাহাতে ৮ টাকা অধিক লাগে, স্ত্রীলোকদিগকে সাহেবের সাক্ষাতে আসিতে হইবেক না, সাহেব অন্তরে থাকিয়া ছবি করিয়া দিবেন, অতএব সাধারণ লোকেরা ছবি করণোপলক্ষে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখুন।"

'সম্বাদ ভাস্কর' দীর্ঘায়ু পত্রিকা।

১৮৩৯ সালের ২৯-নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছে 'সম্বাদ রসরাজ'। সাপ্তাহিকপত্র। অল্পদিন বাদেই সাপ্তাহিক ছেড়ে অর্ধসাপ্তাহিক হল 'সম্বাদ রসরাজ'। এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। নাম কালীকান্তের, কিন্তু আসলে পরিচালনা করতেন গৌরীশঙ্কর। 'সম্বাদ ভাস্কর' আর 'সম্বাদ রসরাজ'—এই দুই পত্রের সম্পাদকীয় দায়িত্ব অভিন্ন। গালিগালাজ ও অশ্লীল রচনার জন্য অনেকেই 'সম্বাদ রসরাজে'র প্রতি বিরক্ত। ১৮৫৭ সালের ৩-ফেব্রুআরি 'সংবাদ প্রভাকর' মন্তব্য করেছে : "যখন কেহ এমত কহিতেন, যে, ভাস্কর সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য স্বয়ং লেখনী ধারণ পূর্ব্বক রসরাজ পত্রের সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন, তখন মনে মনে তাঁহার প্রতি কত ঘৃণা হইত। তাঁহার এই গুরুতর দোষ জন্য আমরা প্রভাকরের সহিত ভাস্কর পত্রের বিনিময় পরিত্যাগ করিয়াছি, কারণ তাহাতেও প্রায় সর্ব্বদাই অভিমান-ঘটিত অন্যান্য বিষয় প্রকাশ হয়। রসরাজ দেখা দূরে থাকুক, যাঁহারদিগের বিছানায় ঐ নিন্দিত পত্র দেখিতে পাইতাম, তাঁহারদিগের বিছানায় বসিতেও লজ্জা বোধ করিতাম।..."

প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির সহায়তায় রামগোপাল ঘোষ 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'

নামে ইংরেজি-বাঙলা দ্বিভাষিক মাসিকপত্র প্রকাশ করেছেন ১৮৪২ সালের এপ্রিলে। ১৮৪২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' পাক্ষিক হয়ে গেল। ১৮৪৩ সালের মার্চ থেকে হয়ে গেল সাপ্তাহিক।

১৮৪৩ সালের নভেম্বরে 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' বন্ধ হয়ে গেল। ১৮৪৩ সালের ২০-নভেম্বর 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' লিখেছে : "১৮৪২ সালের এপ্রেল মাসাবধি বেঙ্গাল স্পেক্‌টেটর পত্র মাসিক পত্রিকা রূপে প্রকাশ হয়, প্রোপাইটরদিগের এতদ্দ্বারা লাভ করণের ইচ্ছা না থাকাতে ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসাবধি পক্ষান্তে প্রকাশ হইতে লাগিল এবং যদিও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই এবং আয় দ্বারা ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না তথাচ প্রোপ্রাইটরেরা এই পত্রিকা বিশেষরূপে দেশোপকারিণী করণাশয়ে ১৮৪৩ সালের মার্চ্চ মাসাবধি সাপ্তাহিক করিলেন তাঁহারা প্রায় ৮ মাস পর্য্যন্ত ইহা হইতে ব্যয় নির্ব্বাহ হয় কি না পরীক্ষা করিতেছিলেন কিন্তু শেষে দেখিলেন যে ইহাতে সহস্র মুদ্রার অধিক ক্ষতি হইয়াছে। সাপ্তাহিক হওয়াতে যদিও গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়াছিল তথাচ তদ্দ্বারা সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না আর যে অভিপ্রায় এ পত্র সৃষ্টি হয় তর্থাৎ এতদ্দেশীয় সাধারণ লোক পাঠ করিবে এবং সকলে নানা বিষয়ের উপর লিখিবে তাহা হইল না অতএব প্রোপাইটরেরা এতৎ পত্রের সাহায্যকারি গ্রাহকদিগের নিকট এবং সহকারি সম্পাদকবর্গ সন্নিধানে বিনয় পূর্ব্বক খেদান্বিত হইয়া বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে অদ্যাবধি এতৎ পত্র প্রকাশ স্থগিত করা গেল যে সকল কারণে রহিত হইতেছে কোন উপায় দ্বারা যদি তাহা পরিবর্ত্ত হয় তবে আহ্লাদ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রকাশ করিবেন।"

অক্ষয়কুমার দত্ত ও প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ 'বিদ্যাদর্শন' নামে একখানা মাসিকপত্র প্রকাশ করেছেন ১৮৪২ সালের জুন-জুলাই মাসে। প্রথম সংখ্যা 'বিদ্যাদর্শন' নিবেদন করেছে : "এতৎ পত্রে এমত সকল বিষয়ের আলোচনা হইবেক, যদ্দ্বারা বঙ্গভাষার লিপি বিদ্যার বর্ত্তমান রীতি উত্তম হইয়া সহজে ভাব প্রকাশের উপায় হইতে পারে। যত্নপূর্ব্বক নীতি, ও ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহুবিদ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত নানা প্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা যাইবেক, এবং দেশীয় কুরীতির প্রতি বহুবিধ যুক্তি, ও প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা হইবেক। তদ্ভিন্ন রূপকাদিলিখনে এক ২ প্রকার নূতন নিয়ম প্রস্তুত করা যাইবেক।..."

'বিদ্যাদর্শনে'র মাত্র ছয়টি সংখ্যা বেরিয়েছিল।

'তত্ত্ববোধিনী সভা' থেকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' নামে একখানা মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়েছে ১৮৪৩ সালের ১৬-আগস্ট। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশের তাৎপর্য কী? সেবিষয়ে প্রথম সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' নিবেদন করেছে :

"তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য পরস্পর দূর দূর স্থায়ী প্রযুক্ত সভার সমুদয় উপস্থিত কার্য্য সর্ব্বদা জ্ঞাত হইতে পারেন না, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনা এবং উন্নতি কিপ্রকার হইবেক? অতএব তাহারদিগের এসকল বিষয়ের অবগতির জন্য এই পত্রিকাতে সভার প্রচলিত কার্য্য বিষয়ক বিবরণ প্রচার হইবেক।

অনেক সভ্য দূরদেশ বশতঃ বা শরীরগত অসুস্থতা হেতু বা কোন কার্য্যক্রমে অথবা অন্য কোন দৈব বিপাকে ব্রহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে অশক্ত হয়েন বিশেষতঃ তাঁহারদিগের নিমিত্তে উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান সময়ে সময়ে এই পত্রিকাতে প্রকটিত হইবেক।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে সাধারণের অপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকে তাহার মর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন, অতএব সেই সকল গ্রন্থ এবং অন্য যে কোন গ্রন্থ যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে তাহা এই পত্রিকাতে উদ্ধৃত হইবেক।

পরব্রহ্মের উপাসনার প্রকার এবং তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্ব্বোপাসনা হইতে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহা জানাইবার নিমিত্তে আমারদিগের শাস্ত্রের সার মর্ম্ম সংগৃহীত হইবেক। বিচিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশিত হইবেক।

কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।

বৈষয়িক সম্বাদ পত্রে পরমার্থ ঘটিত রচনা প্রকাশের প্রথা না থাকাতে অনেক জ্ঞানি ব্যক্তি আপনারদিগের অভিলষিত রচনা প্রকাশ করিতে অশক্ত ছিলেন, অতএব এই পত্রিকা প্রকাশ হইয়া তাঁহারদিগের সে খিন্নতা এইক্ষণে নিবৃত্ত হইল, এবং সর্ব্ব সাধারণ সমীপে মনোগত জ্ঞান আলোকের প্রকাশ হইবার বিলক্ষণ উপায় হইল।

এই অমূল্য পত্রিকা তাহার চিরজীবন এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রতি মাসের প্রথম দিবসে উদিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের এবং তাহারদিগের বন্ধুগণের মনোরঞ্জন করিবেন। যদি তাহারদিগের স্নেহের দ্বারা এই পত্রিকার পরমায়ু বৃদ্ধি হয় তবে তৎকালে ইহার সমাচার দেওয়া যাইবেক।"

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রথম বারো বছরের সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত।

অক্ষয়কুমার দত্ত বিদ্যাসাগর-যুগের লেখক। কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার আগে অক্ষয়কুমারের দু-খানা পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে : 'ভূগোল' আর 'শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা।'

১৮৪১ সালে প্রকাশিত 'ভূগোলে'র ভূমিকায় অক্ষয়কুমার দত্ত লিখেছেন : "এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়া উপায়াভাবে কিয়ৎকাল অপ্রকটিত ছিল, পরে তত্ত্ববোধিনী সভা বিশেষরূপে সুপ্রসন্না হইয়া স্বীয় চিত্রব্যয় দ্বারা ইহাকে প্রকাশিত করত যে প্রকার কৃপা বিতরণ করিলেন, তাহাতে সাহস পূর্ব্বক কহিতে পারি, যে উক্ত সভার এরূপ অনুগ্রহ না হইলে এই পুস্তক সাধারণ সমীপে কদাচ এরূপে উদিত হইত না, অতএব চিত্তমধ্যে এই অতুল উপকারকে যাবজ্জীবন জাগরূক রাখিয়া তাহার কৃপা মূল্যে বিক্রীত থাকিলাম।"

১৮৪৫ সালে প্রকাশিত অক্ষয়কুমারের 'শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা, থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি : "ভারতবর্ষের মহৎ বিদ্যালয় যে হিন্দু কালেজ, তাহা স্থাপনের মূলাধার কারণ কোন্ ব্যক্তি?—সকলেই অবশ্য ব্যক্ত করিবেন যে শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেব। বঙ্গভাষাকে উন্নত করিবার জন্য প্রথম যত্নবান্ কোন্ মনুষ্য?—ডেবিড হেয়ার সাহেব। উপদেশ দ্বারা চিকিৎসা বিদ্যা বিস্তার জন্য মহোৎসাহী কোন্ পুরুষ?—ডেবিড হেয়ার সাহেব। অশেষ মঙ্গলের কারণ যে মুদ্রাযন্ত্র তাহার স্বাধীনতা স্থাপনে উদ্‌যোগী কোন্ মহাত্মা—ডেবিড হেয়ার সাহেব। এই রূপে এদেশের জ্ঞান বৃদ্ধির কারণ সন্ধান জন্য যে প্রশ্ন করা যায়, সেই প্রশ্নের

উত্তরেই ভারতরাজ্যের বিদ্যা রূপ বৃক্ষমূলে হেয়ার সাহেবকে বীজ রূপে দৃষ্টি করা যায়। তিনি আমারদিগকে হীরক দেন নাই, স্বর্ণ দেন নাই, রজতও দান করেন নাই, কিন্তু তাহার অপেক্ষা সহস্র গুণ—কোটি গুণ মূল্যবান্ বিদ্যারত্ন প্রদান করিয়াছেন।"

তারপর ১৮৪৭ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত হল বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি': "কালেজ আফ্ ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুত মেজর জি. টি. মার্শাল মহোদয়ের আদেশে প্রসিদ্ধ হিন্দী পুস্তক অনুসারে লিখিত কলিকাতা শ্রীযুত পি. এস. ডি. রোজারিও কোম্পানির মুদ্রাযন্ত্রে প্রকাশিত সংবৎ ১৯০৩।"

বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' মূলত ছাত্রপাঠ্য।

গোড়ার দিকে বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র আদর হোক বা না হোক, পরে এই বই বিপুলভাবে আদৃত হয়েছিল। সেকালে অনেকে বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র অনেক অংশ মুখস্থ করে রাখতেন।[২২]

বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশের প্রায় একযুগ পরে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের একটি সংলাপ থেকে এই ধারণা প্রশ্রয় পায় যে এককালে গ্রামের মেয়েদের কাছেও বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' সমাদর পেয়েছে। 'নীলদর্পণে'র সৈরিন্ধ্রী সরলতাকে বলেছে—ছোট বউ বসিস, আমি আস্চি, বিদ্যাসাগরের বেতাল শুন্বো।[২৩]

বাইশ

বাঙলা, হিন্দী ও সংস্কৃতে বিদ্যাসাগর সাকুল্যে বারোখানা বই সম্পাদনা করেছেন। বাঙলা—অন্নদামঙ্গল। হিন্দী—বৈতাল-পচ্চীসী। সংস্কৃত—রঘুবংশম; কিরাতার্জ্জুনীয়ম্; সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ; শিশুপালবধ; কুমারসম্ভব; কাদম্বরী; মেঘদূতম্; উত্তরচরিতম্; অভিজ্ঞানশকুন্তলম্; হর্ষচরিতম্।

১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগর সম্পাদিত ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ("কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর মূলপুস্তক দৃষ্টে পরিশোধিত") দু-খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রিয় কবি। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন: বিদ্যাসাগর ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনা অতিশয় পছন্দ করিতেন।...আমি তাঁহাকে কোনও কোনও সময়ে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলের' কবিতা গদগদভাবে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। আমার বেশ মনে হইতেছে একদিন তিনি 'হেথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া' ইত্যাদি কবিতাটি বিশেষ আনন্দের সহিত পড়িতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—'দেখ দেখি, কেমন পরিষ্কার ঝর্ ঝরে ভাষা।'[১]

বিহারীলাল সরকার লিখেছেন: "ভারতচন্দ্রের পর দাশরথি রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রসিকচন্দ্র রায় খাঁটি বাঙ্গালী কবি বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রীতি-ভাজন ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার কোন কোন বিষয়ে, বিশেষতঃ বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে মতের মিল না থাকিলেও, তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রকৃত বাঙ্গালা কবি বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন*; পরন্তু তাঁহার রচনা প্রকৃত বাঙ্গালা কবিতার আদর্শ ভাবিয়া তাঁহার কবিতাকে আদর করিতেন।...ঈশ্বরচন্দ্রের ন্যায় কবি রসিকচন্দ্রের কবিতায়ও তিনি পরম প্রীতি প্রদর্শন করিতেন। রসিকচন্দ্র প্রকৃত বাঙ্গালী-কবি-শ্রেণীর শেষ কবি। রসিকচন্দ্রের দেহান্তরে খাঁটি বাঙ্গালী কবি-শ্রেণীর অবসান হইবে বলিয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশ্বাস ছিল। রসিক-চন্দ্রের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথেষ্ট বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল।...রসিকচন্দ্রের কবিতা তিনি এত ভালবাসিতেন যে, আপনার দৌহিত্রীদিগকেও তদ্রচিত অনেক কবিতা মুখস্থ করাইতেন। রসিকচন্দ্র আধুনিক সাহিত্য-সেবকদিগের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট যেরূপ উৎসাহ পাইতেন, তেমন আর কাহার নিকট পাইতেন না। শ্রীরামপুর বড়া গ্রামে রসিকচন্দ্রের নিবাস ছিল। কলিকাতায় আসিলে তিনি সর্ব্বাগ্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। বিদ্যা-সাগর মহাশয়ও তাঁহার যথেষ্ট আদর করিতেন। রসিকচন্দ্রের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইলে, তিনি শতমুখে বিদ্যাসাগরের সহৃদয়তা ও বদান্যতার কীর্ত্তন করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পর রসিকচন্দ্র একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। অন্যান্য অনেক বার বৃদ্ধ রসিকচন্দ্রের মুখে অনেক রস-ভাষা শুনিয়াছিলাম। তাঁহার বার্দ্ধক্য-জরা বদনমণ্ডলেও যৌবনসুলভ হাস্য-কৌতুকের লহরী দেখিয়াছি; এবার কিন্তু আর তাঁহার সে ভাব দেখি নাই, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে বৃদ্ধের দেহ-যষ্টি ভগ্ন হইয়াছিল। পরম সুহৃদ্ বিদ্যা-

---

* কিন্তু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন: "বিদ্যাসাগর ঈশ্বর গুপ্তকেও দেখিতে পারিতেন না।" (বিপিনবিহারী গুপ্ত: পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায়, কলকাতা, ১৩২০, পৃ. ৭৯)।

সাগরের গুণগরিমা ও বান্ধববাৎসল্য স্মরণ করিয়া তিনি কেবলমাত্র অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। রসিকচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "যখন বিদ্যাসাগর নাই, তখন আমিও আর নাই। আমি জীবন্মৃত হইয়া রহিলাম।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর বৎসর দুই পর রসিকচন্দ্র মানবলীলা সংবরণ করেন। সহৃদয় সুহৃদের সুদারুণ শোক অনেকটা রসিকচন্দ্রের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল।"[২]

স্বসম্পাদিত হিন্দী 'বৈতাল-পচ্চীসী'র ভূমিকায় বিদ্যাসাগর, ১৮৫২ সালের ১৫-জানুআরি, লিখেছেন :

". . . In bringing out the edition now presented to the public, the Original Text of 1805 and the Agra Edition of 1843, have been carefully collated. The former has been generally adhered to ; but the latter, though sometimes inferior in accuracy, has been occasionally followed in instances where it appeared judiciously modernised in its style of expression and orthography. The correct Sanskrit forms of the proper names, as far as they can be traced, have been inserted in the places where they occur, at the foot of the page. Some do not admit of Sanskrit equivalents ; and it is evident that the Translators were not particular in this point, and adopted popular epithets at their own pleasure."

১৮৫৩ সালের জুন মাসে প্রকাশিত স্বসম্পাদিত 'রঘুবংশে'র 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "কিছু দিবস হইল সংস্কৃতবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মল্লিনাথপ্রণীত সঞ্জীবনীনামক সর্ব্বপ্রধান টীকা সমেত রঘু-বংশ মুদ্রিত করিয়াছেন। এই মহাকাব্য যেরূপে মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যের প্রযত্নে ও পরিশ্রমে তাহাই হইয়াছে; তথাপি পুনর্ম্মুদ্রিত করিতে উদ্যত হইবার তাৎপর্য্য এই যে সটীক মুদ্রিত গ্রন্থ যে মূল্যে বিক্রীত হইতেছে সেই মূল্যে ক্রয় করিয়া অধ্যয়ন করিতে পারে সংস্কৃতবিদ্যালয়ের ছাত্র-দিগের অনেকেরই এরূপ অবস্থা নহে। এই নিমিত্ত মূল মাত্র মুদ্রিত হইল। আর যদিও এই সংস্কৃতভাষার সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্যের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তথাপি কোন কোন অংশ ও কোন কোন শ্লোক এরূপ আছে যে ছাত্রদিগের অধ্যয়নযোগ্য নহে। এই নিমিত্ত সেই সমস্ত বর্জ্জনীয় অংশ ও বর্জ্জনীয় শ্লোক পরিত্যক্ত হইয়াছে। রঘুবংশ যে প্রণালীতে মুদ্রিত হইল কুমারসম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত প্রভৃতিও সেই প্রণালীতে মুদ্রিত হইবেক।"

বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় 'কিরাতার্জ্জুনীয়ম্' প্রকাশিত হয়েছে ১৮৫৩ সালে। বিদ্যাসাগর স্বসম্পাদিত 'কিরাতার্জ্জুনীয়মে'র কোনো ভূমিকা লেখেননি।

স্বসম্পাদিত 'সর্বদর্শনসংগ্রহে'র ভূমিকায় বিদ্যাসাগর, ১৮৫৮ সালের ২০ জানুআরি, লিখেছেন :

"The Sarvadarsanasamgraha is a work by Mádhavácharya, the well-known scholiast of the Vedas. It contains short notices of all the systems of Indian philosophy, and as such is very valuable. It is natural to suppose that every Indian

Sanskrit scholar would have possessed a copy of a treatise of so much importance. But it is somewhat singular that manuscripts of the work are very rare, and that the great majority of the learned of this country are probably not even aware of its existence. If not printed now, the Sarvadarsanasamgraha would, in all probability, share the common fate of many other valuable relics of Sanskrit learning. To preserve the work from destruction I proposed to the Asiatic Society of Bengal to edit the work for them if they would undertake to print it. My offer was kindly accepted, and the work, under their auspices, is printed and published. . . ."

১৮৫৭ সালে বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় 'শিশুপালবধ' প্রকাশিত হয়েছে।

১৮৬১ সালে বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় 'কুমারসম্ভব' প্রকাশিত হয়েছে।

১৮৬২ সালে বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় 'কাদম্বরী' প্রকাশিত হয়েছে।

১৮৬৯ সালে প্রকাশিত স্বসম্পাদিত 'মেঘদূতে'র* 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "কতিপয় বৎসর অতীত হইল, কলিকাতা, বারাণসী ও মুম্বয়ী নগরে মেঘদূত মল্লিনাথকৃতসঞ্জীবনীটীকাসহিত মুদ্রিত হইয়াছিল। ঐ তিনখানি ও কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কালেজের পুস্তকালয়স্থিত হস্তলিখিত একখানি, চারি পুস্তকের মেলন করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত হইল। সঞ্জীবনীর স্থানে স্থানে পাঠের এরূপ বৈকল্য ঘটিয়াছে যে যদিও সংশোধনবিষয়ে যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই, তথাপি ঐ সকল স্থল প্রকৃত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। কতিপয় স্থল নিতান্ত অশুদ্ধ ও অসংলগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে।..."

বিদ্যাসাগরের 'মেঘদূত' সংস্করণ সম্পর্কে একটি বলবার মতো খবর আছে।

বিদ্যাসাগর বিশ্লেষণ করে দেখালেন, 'মেঘদূতে'র কয়েকটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত। অর্থাৎ, সেই শ্লোকগুলো কালিদাস লেখেননি, পরবর্তীকালে আর-কেউ লিখে 'মেঘদূতে'র মধ্যে জুড়ে দিয়েছে, কালিদাসের নামে চালিয়ে দিয়েছে।

বিদ্যাসাগরের 'মেঘদূত' সংস্করণ বেরোনোর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরের কথা। কাশ্মীরে একখানা পুঁথি পাওয়া গেল। 'মেঘদূতে'র প্রাচীনতম টীকাকার বল্লভদেবের টীকাখানা আছে সেই পুঁথিতে। দেখা গেল, বিদ্যাসাগরের বিবেচনায় 'মেঘদূতে'র যে-কটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত, বল্লভদেবের টীকায় সেসব শ্লোকের নামগন্ধ পর্যন্ত নেই। অর্থাৎ, বিদ্যাসাগরের বিচার নির্ভুল।°

স্বসম্পাদিত 'উত্তরচরিতে'র 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর, ১৮৭০ সালের ১০-নভেম্বর, লিখেছেন : "কিছুদিন পূর্ব্বে, আমি, উত্তরচরিতের সংস্করণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু, কোনও বিশিষ্ট হেতু বশতঃ, তৎকালে তাহা হইতে বিরত হই। অনন্তর, এই নাটক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপুস্তক স্থিরীকৃত হইলে, অনেকে, ইহার নূতন সংস্করণ প্রচারিত করিবার নিমিত্ত, অনুরোধ

---

* বিহারীলাল সরকার লিখেছেন : একদিন মেঘদূতের স্বরচিত টীকা দেখিয়া, তিনি (বিদ্যাসাগর) স্বীয় দৌহিত্রের নিকট একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—"ওরে আমি বেশ সংস্কৃত লিখেছি তো।" (বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৪৩।)

করেন। তদন্‌সারে, এই সংস্করণ প্রচারিত হইল। চল্লিশ বৎসর প্‌র্ব্বে, রাজকীয় শিক্ষাসমাজের আদেশে ও অর্থব্যয়ে, উত্তরচরিত সর্ব্বপ্রথম ম্‌দ্রিত হয়। কলিকাতাস্থ সংস্কৃতবিদ্যালয়ের সাহিত্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যাপক প্‌জ্যপাদ জয়গোপাল তর্কালংকার মহাশয়ের নিকট তদীয় অগ্রজ রঘ্‌ত্তম শিরোমণি মহাশয়ের হস্তলিখিত যে প্‌স্তক ছিল, প্রথমম্‌দ্রিত প্‌স্তক ঐ প্‌স্তকের প্রতিকৃতি। আট বৎসর অতীত হইল, উল্লিখিত বিদ্যালয়ের তদানীন্তন অধ্যক্ষ সংস্কৃতবিদ্যান্‌রাগী শ্রীয্‌ত ই. বি. কাউএল মহোদয়ের উদ্যোগে ও অর্থ ব্যয়ে, ঐ বিদ্যালয়ের অলঙ্কারশাস্ত্রের ভূতপ্‌র্ব্ব অধ্যাপক প্‌জ্যেপাদ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়, প্রথমম্‌দ্রিত প্‌স্তক ও হস্তলিখিত অপর প্‌স্তকদ্বয় অবলম্বন করিয়া, সংক্ষিপ্ত টীকা সহিত, এই নাটক দ্বিতীয়বার ম্‌দ্রিত করেন। তত্রত্য বিজ্ঞাপনে নির্দ্দিষ্ট আছে, ঐ হস্তলিখিত প্‌স্তকদ্বয়ের একখানি বারাণসী হইতে সংগৃহীত, দ্বিতীয় খানি বিজয়নগর হইতে অধিগত। উল্লিখিত ম্‌দ্রিত প্‌স্তকদ্বয় ও অপর দ্‌ই খানি হস্তলিখিত প্‌স্তক অবলম্বন প্‌র্ব্বক, এই সংস্করণ সম্পাদিত হইল।..."

C. H. Tawney 'উত্তররামচরিতে'র ইংরেজি অন্‌বাদ করেছেন। উক্ত অন্‌বাদগ্রন্থের ভূমিকায় টনি সাহেব, ১৮৭১ সালের ডিসেম্বরে, লিখেছেন :

"... The text followed in the translation is that published at Calcutta in 1862. An attempt has been made to furnish in notes a translation of the principal various readings of Pandit I. C. Vidyáságara's edition, which became known to the Translator when his work was almost completed."

১৮৭৪ সালে এই অন্‌বাদগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল; দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় টনি সাহেব লিখেছেন :

"In the present edition the text of Pandit Isvara Chandra Vidyáságara has been carefully followed, and the translation is generally based upon his explanations."

১৮৭১ সালের জ্‌ন মাসে প্রকাশিত স্বসম্পাদিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলমে'র 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "এ দেশে উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের প্রচলিত প্‌স্তকের প্রচার নাই। উক্তবিধ প্‌স্তকের প্রেরণের নিমিত্ত, আমি বারাণসীনিবাসী এক আত্মীয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম। এই প্রার্থনা ফলবতী হয় নাই। এ বিষয়ে অন্যান্য চেষ্টা করিয়াও, কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। ফলতঃ প্‌স্তকপ্রাপ্তি বিষয়ে প্রথমতঃ বিলক্ষণ অস্‌বিধা ঘটিয়াছিল। পরে, আমি, কার্য্যবশতঃ, গত ফাল্গ্‌নমাসে, বারাণসীধামে গিয়াছিলাম। ঐ সময়ে উক্ত নগরীর অধিবাসী শ্রীয্‌ত বাব্‌ হরিশ্চন্দ্রের সহিত আমার আলাপ হয়। এই মহোদয়, দয়া করিয়া, স্বীয় প্‌স্তকালয় হইতে, আমায় তিনখানি ম্‌ল, একখানি টীকা, ও তিনখানি প্রাকৃতবিকৃতি দিয়াছিলেন। অনন্তর, কলিকাতাস্থ সংস্কৃতবিদ্যালয়ের তাৎকালিক অধ্যক্ষ, শ্রীয্‌ত বাব্‌ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর উদ্যোগে, বারাণসীসংস্কৃতবিদ্যালয় হইতেও, দ্‌ইখানি ম্‌ল আমার হস্তগত হয়। এই পাঁচখানি ম্‌ল, একখানি টীকা, ও তিনখানি প্রাকৃতবিকৃতি অবলম্বন প্‌র্ব্বক, অভিজ্ঞানশকুন্তলের সংস্করণকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।..."

১৮৮৩ সালে প্রকাশিত স্বসম্পাদিত 'হর্ষচরিতে'র 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

"হর্ষচরিত কাদম্বরীরচয়িতা মহাকবি বাণভট্টের প্রণীত। উভয় গ্রন্থই এক কবির লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত, এক প্রণালীতে রচিত, এবং উভয়ই অসম্পূর্ণ অবস্থায় অবস্থিত। এ তিন বিষয়ে উভয় গ্রন্থের কোনও বৈলক্ষণ্য নাই; কিন্তু, উৎকর্ষ বিষয়ে, পরস্পর তুলনা করিলে, অনেক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবেক। কাদম্বরীর চমৎকারিতা ও মনোহারিতা হর্ষচরিতে ভূরি পরিমাণে উপলব্ধ হয় না। তদ্ভিন্ন, অনায়াসে অর্থ বোধ জন্মে না, কাদম্বরীতে এরূপ স্থলের সংখ্যা অতি অল্প; হর্ষচরিতে তাদৃশ স্থলের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক। ফলকথা এই, হর্ষচরিত কাদম্বরী অপেক্ষা অনেক অংশে নিকৃষ্ট কাব্য। কাদম্বরী অপেক্ষা নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু উহা যে এক প্রশংসনীয় গ্রন্থ, সে বিষয়ে সংশয় নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসে যেরূপ দৃষ্ট হইতেছে, তদনুসারে হর্ষচরিত বাণভট্টের প্রথম কাব্য।

বাণভট্ট হর্ষচরিত নামে গদ্য গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, ইহা আমি পূর্ব্বে অবগত ছিলাম না। দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইল, আমার পরম বন্ধু, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, অধুনা লোকান্তরবাসী হারাধন বিদ্যারত্ন মহাশয়, জম্বু রাজধানীতে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া, তিনি আমাকে, এক খানি পুস্তক দেখাইয়া, কহিলেন, শ্রীযুত শেষ শাস্ত্রী নামে একটি পণ্ডিত, পুরস্কারলাভের প্রত্যাশায়, আমার নিকট এই পুস্তক খানি দিয়াছেন। ইহার নাম হর্ষচরিত; ইহা বাণভট্টপ্রণীত। বাণভট্টপ্রণীত, এই কথা শুনিয়া, আমি, যার পর নাই, আহ্লাদিত হইলাম, এবং পুরস্কারদানের অঙ্গীকার করিয়া, কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে, পুস্তক খানি লইলাম। এইরূপে অদৃষ্টচর, অশ্রুতপূর্ব্ব, অপূর্ব্ব এক গদ্য কাব্য হস্তগত হওয়াতে, আমি, কাল-বিলম্ব না করিয়া, নিরতিশয় আহ্লাদিত চিত্তে, সবিশেষ আগ্রহ সহকারে, উহা মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলাম।

কিন্তু, অল্প দিনেই বুঝিতে পারিলাম, এক মাত্র পুস্তক অবলম্বন করিয়া, হর্ষচরিত মুদ্রিত করিলে, সম্যক্ শুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। ফলকথা এই, এত স্থল অশুদ্ধ ও অসংলগ্ন প্রতীয়মান হইতে লাগিল, যে পুস্তকান্তরের সাহায্য না পাইলে, হর্ষচরিত মুদ্রিত করা পরামর্শসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইল না। সুতরাং, হর্ষচরিতের মুদ্রাঙ্কনকার্য্য স্থগিত রাখিতে হইল। আমার সবিশেষ স্নেহভাজন শ্রীযুত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, জম্বু রাজধানীতে, এক প্রধান রাজ-পুরুষের পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রসঙ্গক্রমে হর্ষচরিতের কথা উত্থাপিত হইলে, সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, তিনি কাশ্মীর দেশ হইতে দুই খান পুস্তক পাঠাইয়া দেন। এইরূপে তিন পুস্তক হস্তগত হইলে, আমি, সাহস করিয়া, হর্ষচরিতের মুদ্রাঙ্কনকার্য্যে পুনরায় প্রবৃত্ত হই।

এক্ষণে, হর্ষচরিত মুদ্রিত হইল। এ বিষয়ে আমি যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি; কিন্তু তাদৃশ যত্নের ও পরিশ্রমের অনুরূপ ফললাভ হয় নাই। আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, পুস্তকের অনেক স্থল অশুদ্ধ ও অসংলগ্ন রহিয়া গেল। অর্দ্ধ ভাগ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইলে, আমি, বিরক্ত হইয়া, পুনরায়, হর্ষচরিতের মুদ্রাঙ্কনকার্য্য হইতে বিরত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম; কিন্তু, অনেকের সবিশেষ অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া, সে সঙ্কল্পের অনুসরণ করিতে পারিলাম না। অনুরোধকারী মহাশয়েরা আমায়, নানা কারণ দর্শাইয়া, হর্ষ-চরিতের মুদ্রাঙ্কনকার্য্য হইতে, কোনও মতে, বিরত হইতে দিলেন না।"

লক্ষণীয়, স্বসম্পাদিত একাধিক সংস্কৃত গ্রন্থের ভূমিকা বিদ্যাসাগর

বাঙলাভাষায় লিখেছেন।

কে একজন ভদ্রলোক সংস্কৃত রচনা লিখে বিদ্যাসাগরকে দেখাতে এসেছেন। বিদ্যাসাগর দেখে দিলেন, সংশোধন করে দিলেন। চমৎকৃত হয়ে ভদ্রলোক বললেন—আপনি এমন সুন্দর সংস্কৃত লেখেন, তবে আপনি যেসব সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করেছেন, তার মুখবন্ধে বা বিজ্ঞাপনে বাঙলা লেখেন কেন?

বিদ্যাসাগর সহাস্যে বললেন—সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকলেও বিশুদ্ধ সংস্কৃত রচনা দুরূহ বলে আমার বিশ্বাস।[৪]

উত্তরকালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন : "তিনি (বিদ্যাসাগর) বলিতেন যে, একালে প্রকৃত সংস্কৃত লেখা অসম্ভব, যাহা লেখা যায় সবই গোঁজামিল। কিন্তু আমার মনে হয় যে, ইদানীং যত লোক সংস্কৃত রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিদ্যাসাগরের রচনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; তিনি 'উত্তরচরিত', 'শকুন্তলা' ও 'ঋজুপাঠ' তৃতীয় ভাগের টীকায় স্থলে স্থলে যৎকিঞ্চিৎ সংস্কৃত লিখিয়াছেন। তাহা অতি সুন্দর, এমন কি প্রাচীন সংস্কৃতের ন্যায় বোধ হয়।"[৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, একটি বেনামী রচনায় বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "এক্ষণে যিনি যত বড় পণ্ডিত হউন, কেহই প্রকৃতরূপ সংস্কৃত লিখিতে পারেন না। সংস্কৃত লিখিতে গেলে, নানা প্রকারে ভুল হয়। অতএব, আমার বিবেচনায়, সংস্কৃতরচনায় কাহারও প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। যিনি লিখিবেন, তাঁহারই ভুল হইবেক, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। আমাকেও, নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক, সময়ে সময়ে, সংস্কৃত লিখিতে হয়। তৎকালে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখি, মনে করি ভুল নাই; কিন্তু, কিছু দিন পরে, পদে পদে ভুল দেখিতে পাই।"[৬]

১৮৫১ সালের নভেম্বরে বেরল বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা'। বাঙলায় লেখা সংস্কৃত ব্যাকরণের বই। 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' সম্পর্কে বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "এই গ্রন্থে অল্পবয়স্ক বালকদিগের প্রথম শিক্ষোপযোগি স্থূল স্থূল বিষয় সকল সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি জন্মিবেক না যথার্থ বটে কিন্তু উপদেশসাপেক্ষ হইয়া সহজ সহজ সংস্কৃত গ্রন্থ সকল সহজে অধ্যয়ন করিবার ক্ষমতা জন্মিবেক, সন্দেহ নাই। এবং ইহাই এই পুস্তক প্রস্তুত করিবার মুখ্য তাৎপর্য্য।"

বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণের উপক্রমণিকায় চমৎকৃত হয়ে একজন পণ্ডিতমশাই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। দেখা করে বললেন—মশায়, আপনি ব্যাকরণের রেলরোড করেছেন বলে আপনাকে দেখতে এসেছি। রেলরোডে যেমন ছ-মাসের পথ ছ-দিনে যাওয়া যায় আপনার উপক্রমণিকা পড়ে সেইরকম ছ-মাসের ব্যাকরণ ছ-দিনে শেখা যায়।[৭]

'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' রচনার মূলে একটি ঘটনা আছে।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স তখন পনেরো-ষোলো বছর। হিন্দু কলেজের পাঠ চুকিয়ে সেই বয়সেই তিনি পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছেন। সকাল-সন্ধ্যা বিদ্যাসাগরের বাসায় আসেন। বিদ্যাসাগর তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরি করেন।

বিদ্যাসাগরের বাসায় রাজকৃষ্ণ একদিন দেখলেন বিদ্যাসাগরের মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু সুর করে 'মেঘদূত' পড়ছেন। শুনে রাজকৃষ্ণ মুগ্ধ হলেন। সংস্কৃত শেখার সাধ হল তাঁর। বিদ্যাসাগরকে জানালেন সেকথা।

বিদ্যাসাগর রাজকৃষ্ণকে সংস্কৃত শেখাতে রাজি হলেন। বিদ্যাসাগর রাজকৃষ্ণকে বললেন—দেখ, আমি যখন মুগ্ধবোধ মুখস্থ করি, তখন ওর একবর্ণও বুঝতে পারিনি, পরে বুঝেছি। তোমাকে মুগ্ধবোধ মুখস্থ করিয়ে সংস্কৃত শেখাতে হলে এ-বয়সে সংস্কৃত শেখা দায় হবে। অতএব তোমাকে একটা সহজ উপায়ে সংস্কৃত শেখাতে হবে।

সেদিন রাজকৃষ্ণকে বিদায় দিলেন বিদ্যাসাগর। পরদিন বিদ্যাসাগরের বাসায় এসে রাজকৃষ্ণ দেখলেন তাঁকে সহজ উপায়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ শেখানোর জন্য বিদ্যাসাগর কয়েকখানা ফুলস্ক্যাপ কাগজে বাঙলা অক্ষরে বর্ণমালা থেকে ধাতু প্রত্যয়াদি পর্যন্ত 'মুগ্ধবোধে'র সারাংশ লিখে রেখেছেন। উত্তরকালে বিহারীলাল সরকার লিখেছেন : "রাজকৃষ্ণ বাবু আমাদিগকে বলিয়াছেন,—"ইহাই উপক্রমণিকা ব্যাকরণের সূত্রপাত। উপক্রমণিকা ব্যাকরণের পূর্ব্বাভাস এইখানেই তাঁহার মস্তকে প্রবেশ করে। আমি সেই ফুল্‌স্কেপ কাগজে লিখিত ব্যাকরণের সারাংশ এবং তাৎকালিক ব্যাপ্‌টিষ্ট প্রেসে মুদ্রিত একখানা সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করি। মাস দুই তিন পড়িয়া আমি ব্যাকরণের আভাস কতকটা আয়ত্ত করিয়া লই। তিন চারি মাসের পর আমি মুগ্ধবোধ পড়িতে আরম্ভ করি।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিক্ষা দিবার প্রণালীর গুণে এবং স্বকীয় অসাধারণ অধ্যবসায়ে ও পরিশ্রমবলে রাজকৃষ্ণ বাবু ছয় মাসের মধ্যে মুগ্ধবোধ পড়া সাঙ্গ করেন। পরে তিনি কাব্যাদিপাঠে প্রবৃত্ত হন।"[৮]

বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা'র ইংরেজি অনুবাদ করেছেন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে। "Introduction to Sanskrit Grammar in Bengali. Translated into English with additions by Rajkrishna Banerji."

উক্ত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

"In none of the languages of the world, whether living or dead, does Grammar play so important a part as in Sanskrit. The complex and elaborate system of its Grammar, enunciated in abstruse rules, renders the language extremely difficult of acquisition. *The Introduction to Sanskrit Grammar in Bengali* by Pandita Iswarachandra Vidyasagara, which has so much facilitated the study of Sanskrit, may be said to mark an era in the cultivation of that language in Bengal. But the facilities, afforded by this work, are not available to foreigners or to natives of other Provinces of India, by reason of its Bengali dress. Translations of it have, accordingly, been made into the vernaculars of some of the other provinces. . . .

The translator, from his experience as a teacher of Sanskrit in the Presidency College, felt the necessity of enlarging certain parts of the work for the better comprehension of the learners, and he has, with the permission of the Author, made the necessary additions and alterations. They are, however, not radical, nor inconsistent with the general character of the work."

'ঋজুপাঠ' নামে একখানা সংস্কৃত বই তিনভাগ বের করেছেন বিদ্যাসাগর। প্রথম ভাগ বেরিয়েছে ১৮৫১ সালের নভেম্বরে।

'ঋজুপাঠ, প্রথম ভাগে'র বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "ঋজুপাঠের প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। ইহাতে পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটী উপাখ্যান ও মহাভারতের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গিয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীন বলিয়া ইহার রচনা অত্যন্ত সহজ। সংস্কৃত ভাষাতে এরূপ সহজ গ্রন্থ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এই নিমিত্ত, যাহারা প্রথম সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করে পঞ্চতন্ত্র তাহাদিগের অতি উপযুক্ত পুস্তক। কিন্তু মধ্যে মধ্যে অনেক দীর্ঘ সমাস আছে; অনেক অসার ও অসম্বন্ধ কথা আছে; এবং কয়েকটী অতি অশ্লীল উপাখ্যান আছে। অধুনাতম গ্রন্থের ন্যায়, রচনার মাধুর্য্য নাই; কথাযোজনার চাতুর্য্য নাই। অধিকন্তু, লিপিকর প্রমাদ বশতঃ স্থানের স্থানের পাঠ এমত অপভ্রংশিত হইয়াছে যে অর্থবোধ ও তাৎপর্য্য গ্রহ হওয়া দুর্ঘট। এরূপ গ্রন্থ আদ্যন্ত পাঠ করা অনাবশ্যক ও অবিধেয় বোধ হওয়াতে, কয়েকটী উপাখ্যান মাত্র পরিগৃহীত হইল। অল্পবয়স্ক বালকদিগের অধ্যয়নোপযোগি করিবার নিমিত্ত ঐ কয়েকটী উপাখ্যানেরও কোন কোন অংশ পরিবর্জ্জিত ও কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত হইল। মহাভারতেরও যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহারও কোন কোন ভাগ পরিত্যাগ ও কোন কোন স্থানে পরিবর্ত্ত করা গিয়াছে।"

১৮৫২ সালের মার্চে প্রকাশিত 'ঋজুপাঠ, দ্বিতীয় ভাগে'র 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "ঋজুপাঠের দ্বিতীয় ভাগ রামায়ণ হইতে সংগৃহীত হইল। রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, রামায়ণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এই প্রাচীন গ্রন্থ মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কোনও কোনও আলঙ্কারিকেরা রামায়ণকে মহাকাব্যমধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা তাদৃশ কাব্যের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎসমুদায় কালিদাসাদিপ্রণীত রঘুবংশাদি অপেক্ষাকৃত নব্য কাব্যগ্রন্থসমূহে যেরূপ লক্ষিত হয়, প্রাচীন কাব্য রামায়ণে সেরূপ লক্ষিত হয় না। বাল্মীকিকাব্যে পৌনরুক্ত, প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অতি বিস্তৃত বর্ণনা প্রভৃতি কতিপয় গুরুতর দোষ আছে। যাহা হউক, অনায়াসে এই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, সংস্কৃত ভাষায় এরূপ প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট পদ্য গ্রন্থ আর নাই। রামায়ণের মধ্যে অযোধ্যাকাণ্ডের রচনা যেরূপ চমৎকারিণী ও চিত্তহারিণী অন্যান্য কাণ্ডের রচনা সেরূপ নহে। এই নিমিত্ত ঋজুপাঠের দ্বিতীয় ভাগে অযোধ্যাকাণ্ডের কতিপয় উৎকৃষ্ট অংশ সঙ্কলিত হইল। সঙ্কলিত অংশ সকলের কোনও কোনও ভাগ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।"

১৮৫১ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত 'ঋজুপাঠ, তৃতীয় ভাগে'র 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "ঋজুপাঠের তৃতীয় ভাগ হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, ভট্টিকাব্য, ঋতুসংহার ও বেণীসংহার এই কয়েক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইল। এই সকল গ্রন্থের যে যে স্থান উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাদের কোন কোন ভাগ এক বারেই পরিত্যক্ত ও কোন কোন ভাগ কিয়দংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।..."

১৮৫২ সালের ৮-সেপ্টেম্বর 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছে : "আমরা অবগত হইলাম সংস্কৃত কালেজের সর্ব্বাধ্যক্ষ পণ্ডিতবর গুণাকর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "এসিএটিক সোসাইটীর" প্রকাশিত মাসিক পুস্তকে বেণী-

সংহার, প্রসন্ন রাঘভ, নাগানন্দ প্রভৃতি ছয়খানা প্রসিদ্ধ নাটক যথা নিয়মে ক্রমশঃ প্রকাশ করিবেন। এই সমাচারে আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম, কেননা নানা বিদ্যার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় তদনুরূপ প্রশংসনীয় কার্য্য সমুদায়ে সর্ব্বতোভাবেই উপযুক্ত।"

কিন্তু সে-কাজ সম্ভবত শেষপর্যন্ত হয়ে ওঠেনি।

বেথুন সোসাইটিতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে বিদ্যাসাগর বাঙলা-ভাষায় লেখা নিজের একটি রচনা পড়ে শোনালেন।

১৮৫৩ সালের ১৯-ফেব্রুআরি 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছে :

"গত ১০ ফিব্রুআরি তারিখে মেডিকেল কালেজের হালে বীটন সোসাইটির নিয়মিত সভা হইয়াছিল, বাবু রামগোপাল ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।...

ঐ সভায় শ্রীযুত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংস্কৃত ভাষা ও বিদ্যা বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহা শ্রবণ করত সকলেই সংপূর্ণ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, আগামি সভাতেও তিনি অপর এক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন এমত প্রস্তাব হইয়াছে।"

১৮৫৩ সালের ১২-মার্চ 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছে : "বীটন সভার মাসিক বৈঠকে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত বিদ্যার গৌরব প্রতিভা সন্দীপন মূলক বঙ্গভাষায় যে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বাংশে উত্তম হইয়াছে, তাহাতে তিনি অসামান্য লিপিনৈপুণ্য ও সংস্কৃত বিদ্যায় বিপুল ব্যুৎপন্ন প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই, যে সকল মহাশয়েরা সভাগারে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন।..."*

১৮৫৩ সালের মার্চে বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' নামে একটি বই বেরল। বাঙলাদেশে—না, শুধু বাঙলাদেশে নয়—ভারতবর্ষে সাহিত্যের ইতিহাস রচনার এই প্রথম প্রচেষ্টা।[১]

'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবে'র 'উপসংহারে' বিদ্যা-সাগর লিখেছেন :

"...অনেকে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন একান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত, সংস্কৃত ভাষার ফলোপধায়কতা বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া প্রস্তাব সমাপন করিব।

সংস্কৃতভাষার অনুশীলনে নানা ফল। ইয়ুরোপে শব্দবিদ্যার যে ইয়ত্তী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন তাহার মূল। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন দ্বারা অন্য অন্য ভাষার মূলনির্ণয়, স্বরূপপরিজ্ঞান ও মর্ম্মোদ্ভেদে সমর্থ হইয়াছেন; এবং এই পৃথিবী যে নানা মানবজাতির আবাসস্থান, তাহাদের কে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত, কে কোন দেশের আদিম নিবাসী লোক, কে কোন প্রদেশ হইতে আসিয়া কোন প্রদেশে বাস

---

* উত্তরকালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন : "(বিদ্যাসাগর) Bethune Society তে পঠিত হইবার জন্য 'সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' নামে একটি প্রবন্ধ বাঙ্গালায় রচনা করিয়াছিলেন; নিজে কতকটা তোৎলা বলিয়া স্বয়ং পড়েন নাই, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী পড়িয়াছিলেন।" (বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, 'আর্য্যাবর্ত্ত', মাঘ, ১৩২০, পৃ. ৯০৯-১০।)

স্পষ্ট জানা যাচ্ছে, কৃষ্ণকমলের এই উক্তি ভুল।

করিয়াছে; ইত্যাদি নির্দ্ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু, ইয়ুরোপীয় শব্দবিদ্যা যাবৎ সংস্কৃত ভাষার সহায়তা প্রাপ্ত হয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত এই সকল বিষয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; এই নিমিত্তই ডাক্তর মোক্ষমূলর সংস্কৃত ভাষাকে সকল ভাষার ভাষা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনের এক অতি প্রধান ফল এই যে, ইদানীন্তন কালে ভারতবর্ষে হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি যে সকল ভাষা কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত আছে, সে সমুদয় অতি হীন অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা একপ্রকার বিধিনির্ব্বন্ধস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে, ভূরি পরিমাণে সংস্কৃত কথা লইয়া ঐ সকল ভাষায় সন্নিবেশিত না করিলে তাহাদের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা যাইবেক না। কিন্তু, সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ ব্যতিরেকে, তৎসম্পাদন কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, ভারতবর্ষীয় সর্ব্বসাধারণ লোক বিদ্যানুশীলনের ফলভোগী না হইলে, তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্র হইতে চিরপ্ররূঢ় কুসংস্কারের সমূলে উন্মূলন হইবেক না; এবং হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি তত্তৎ প্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে দ্বারস্বরূপ না করিলে, সর্ব্বসাধারণের বিদ্যানুশীলন সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং, ইয়ুরোপীয় কোন ভাষা হইতে পুরাবৃত্ত পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি ঐ সকল প্রচলিত ভাষায় সঙ্কলিত হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু, সংস্কৃত না জানিলে, কেবল ইংরেজী শিখিয়া আমরা যে ঐ মহোপকারক গুরুতর বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিব, ইহা কোনও মতে সম্ভাবিত নহে।

তৃতীয়তঃ, পূর্ব্বকালীন লোকদিগের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম, উপাসনা ও বুদ্ধির গতি প্রভৃতি বিষয় সকল মনুষ্যমাত্রের অবশ্যজ্ঞেয়, ইহা বোধ হয়, সকলেই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। অন্য অন্য দেশসংক্রান্ত এই সমস্ত বিষয় তত্তদ্দেশীয় পুরাবৃত্ত গ্রন্থ দ্বারা অবগত হওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায়, রাজতরঙ্গিণী ব্যতিরিক্ত, প্রকৃত পুরাবৃত্ত গ্রন্থ একখানিও নাই। রাজতরঙ্গিণীতেও এই বহুবিস্তৃত ভারতবর্ষের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ কাশ্মীরের পুরাবৃত্ত মাত্র সঙ্কলিত আছে। সেই সঙ্কলিত পুরাবৃত্ত সর্ব্বসাধারণলোকসংক্রান্ত নহে। কে কোন সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, কে কত দিন রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিয়াছিলেন, কে কোন সময়ে সিংহাসনভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, কে কাহাকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিয়া স্বীয় ক্ষমতাতে রাজ্যাস্পদ অধিকার করিয়াছিলেন; এইরূপ, কেবল রাজাদিগের বৃত্তান্তমাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং, প্রকৃত পুরাবৃত্তের নিতান্ত অসদ্ভাবস্থলে বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলন ব্যতিরেকে, পূর্ব্বকালীন ভারতবর্ষীয়দিগের আচার ব্যবহার প্রভৃতি পরিজ্ঞানের আর কোনও পথ নাই।

চতুর্থতঃ, যাবতীয় সাহিত্যশাস্ত্রের অনুশীলনে যে আমোদ, যে উপকার ও যে উপদেশ লাভ হইয়া থাকে, সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র সেই আমোদ, সেই উপকার ও সেই উপদেশ প্রদানে অসমর্থ নহে।

এই সমস্ত সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনসাপেক্ষ।

এক্ষণে, এতদ্দেশে যাঁহারা লেখা পড়ার চর্চ্চা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে এইরূপ মহোপকারিণী সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে একান্ত উপেক্ষা করেন, ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে।”

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের ক্লাশে অলঙ্কারের প্রশ্নোত্তরে একটি ছাত্র 'কাশীস্থিতগবাম্' লিখেছে। ছাত্রটিকে তিরস্কার করলেন প্রেমচাঁদ। তারপর বিদ্যাসাগরকে বললেন—ঈশ্বর, এইসকল ছেলের মাথা খাচ্ছ, বাঙলায় সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা লেখাতে এরা কিছুই শিখছে না।

বিদ্যাসাগর প্রেমচাঁদকে বললেন—ভট্টাচার্য মশায়! আমি ব্যাকরণকৌমুদী লিখেছি, আর কোনো চিন্তা নেই।[১০]

'ব্যাকরণ কৌমুদী' নামে বাঙলাভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের বই লিখেছেন বিদ্যাসাগর। চারভাগে বেরিয়েছে 'ব্যাকরণ কৌমুদী'। প্রথমভাগ ও দ্বিতীয়-ভাগ বেরিয়েছে ১৮৫৩ সালে। তৃতীয়ভাগ বেরিয়েছে ১৮৫৪ সালে। চতুর্থ-ভাগ বেরিয়েছে ১৮৬২ সালে। চতুর্থ ভাগের 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "ব্যাকরণ কৌমুদীর শেষভাগ প্রচারিত হইল। এই ভাগে নূতন প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। অনেকে ব্যাকরণ কৌমুদীতে সংস্কৃত সূত্র দিবার নিমিত্ত সবিশেষ অনুরোধ করেন। ঐ অনুরোধের তাৎপর্য্য এই যে বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত সূত্র অপেক্ষা অল্পাক্ষরগ্রথিত সংস্কৃত সূত্র অনায়াসে অভ্যাস করা ও স্মরণ রাখা যাইতে পারে। তাঁহাদের অনুরোধ যুক্তিযুক্ত বোধ হওয়াতে এই ভাগে সংস্কৃত সূত্র সন্নিবেশিত হইল এবং ঐ হেতু বশতঃ পূর্ব্ব তিন ভাগেও ক্রমে ক্রমে এই প্রণালী অবলম্বিত হইবেক। সকল সূত্র নূতন সঙ্কলিত নহে অনেক স্থলে পাণিনিপ্রণীত সূত্র অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।"

রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছেন : "বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের যে উপক্রমণিকাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা দেশমধ্যে সাধারণতঃ সংস্কৃত শিক্ষাবিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। পূর্ব্বে অনেকদিন হইতেই ইংরেজিভাষায় কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই সংস্কৃত শিখিতে অভিলাষ হইত, কিন্তু উহার দ্বারে যে ভীষণমূর্ত্তি ব্যাকরণ দণ্ডায়মান ছিল, তাহাকে দেখিয়া কেহই নিকটেই ঘেঁসিতে পারিতেন না। বিদ্যাসাগর সেই পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে কি পল্লী, কি নগর সর্ব্বত্রই বিদ্যানুশীলন-রত কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই যে, কিছু না কিছু সংস্কৃতের চর্চ্চা করিতেছেন, উপক্রমণিকাদ্বারা ব্যাকরণের দুর্গমপথ পরিষ্কৃত হওয়াই তাহার মূলকারণ।...ফলতঃ বিদ্যাসাগরের যদি আর কোন কার্য্যও না থাকিত, তথাপি উপক্রমণিকাদি রচনাদ্বারা সংস্কৃতভাষার পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়ারূপ এই একমাত্র কার্য্যের জন্যও দেশীয় লোকদিগের নিকট তিনি চির-কাল কৃতজ্ঞতার ভাজন হইতেন সন্দেহ নাই।"*[১১]

আগেই বলা হয়েছে, সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময় বিদ্যাসাগর সংস্কৃতে অনেক রচনা লিখেছিলেন। একদিন একজন আত্মীয় বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে অনেকগুলো রচনা পড়তে নিয়ে গেলেন। কথা দিয়ে গেলেন, পড়ে তাড়াতাড়ি ফেরত দেবেন। কিন্তু কথা রাখলেন না তিনি। বারংবার লেখা-গুলো ফেরত চেয়েছেন বিদ্যাসাগর, কিন্তু ফেরত পাননি। পুরোনো কাগজ-পত্রের মধ্যে বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে বিদ্যাসাগর ছেলেবেলায় লেখা কয়েকটি সংস্কৃত রচনা পেলেন; সেগুলোর সঙ্গে আপন মন্তব্য জুড়ে 'সংস্কৃত রচনা' নামে একখানা বই বের করলেন ১৮৮৯ সালের নভেম্বরে।

---

* প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৮৬৬ সালের ৪-জুনের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' থেকে জানা যাচ্ছে যে, বিদ্যাসাগর লণ্ডনের সংস্কৃত টেক্সটস্ সোসাইটির সদস্য হতে ইচ্ছুক হয়েছেন।

বিদ্যাসাগরের 'শ্লোকমঞ্জরী' বেরল ১৮৯০ সালের মে-মাসে। 'শ্লোক-মঞ্জরী'তে বিদ্যাসাগর সাকুল্যে দুশো-তেরোটি উদ্ভট শ্লোক সংকলন করেছেন।

অনেক আগেই বলা হয়েছে, গঙ্গাধর তর্কবাগীশের কাছে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়েছেন ১৮২৯ সালের জুন থেকে ১৮৩৩ সালের জানুআরি পর্যন্ত।

উত্তরকালে বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

"পূজ্যপাদ (গঙ্গাধর) তর্কবাগীশ মহাশয়, শেষ ছয় মাস, দৈনন্দিন অধ্যাপনাকার্য্য সমাপ্ত হইলে পর, প্রত্যহ, এক একটি উদ্ভট শ্লোক লেখাইয়া, তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিতেন। ঐ শ্লোকটি কণ্ঠস্থ করিয়া, আমাদিগকে, পর দিন, তাঁহার সমক্ষে, উহার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতে হইত। যদি আবৃত্তি বা ব্যাখ্যায় কোনও ব্যতিক্রম লক্ষিত হইত, তিনি তাহার সংশোধন করিয়া দিতেন। এই রূপে, ছয় মাস, আমরা প্রত্যহ এক একটি উদ্ভট শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম।

উদ্ভটশ্লোকশিক্ষা বিষয়ে আমার সবিশেষ অভিনিবেশ দেখিয়া, পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আমি সাহিত্যশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইবার পর, তিনি আমায় বলিয়া দিয়াছিলেন, প্রত্যহ না পার, মধ্যে মধ্যে আমার নিকটে আসিয়া, উদ্ভট শ্লোক লিখিয়া লইয়া যাইবে। তদীয় এই সদয় আদেশ অনুসারে, সাহিত্যশ্রেণীতে অধ্যয়নকালে, মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকটে গিয়া, উদ্ভট শ্লোক লিখিয়া আনিতাম। এইরূপে, দয়াময় তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রসাদে, দুই শতের অধিক শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতিরিক্ত, পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেবের ও অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে, ক্রমে ক্রমে, প্রায় তিন শত শ্লোকের সংগ্রহ করিয়াছিলাম।"[১২]

উদ্ভট শ্লোক কাকে বলে? বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "যে সকল শ্লোক কোনও গ্রন্থের অন্তর্ভূত নহে, উহারাই উদ্ভট শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।"

'শ্লোকমঞ্জরী'র পরিশিষ্টভাগে বিদ্যাসাগর কয়েকটি আদিরসাশ্লিষ্ট শ্লোক সন্নিবেশিত করেছেন। কোনো-কোনো শ্লোকে বিদ্যাসাগর পাদটীকা যোগ করেছেন। একটি শ্লোকের (তব তন্বি কুচাবেতৌ নিয়তং চক্রবর্ত্তিনৌ। আসমুদ্রকরগ্রাহী ভবান্ যত্র করপ্রদঃ॥) বিদ্যাসাগর কৃত পাদটীকা উদ্ধৃত করি :

"এই শ্লোক সংক্রান্ত কিংবদন্তী সংক্ষেপে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

কালিদাসের আরাধনায় প্রসন্ন হইয়া, সরস্বতী দেবী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলে, প্রভূত ভক্তিযোগ সহকারে বারংবার প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, কালিদাস সরস্বতী দেবীর বর্ণনা করিলেন। এই বর্ণনা আরাধ্য দেবতার বর্ণনার অনুযায়িনী হয় নাই; সামান্য নায়িকার বর্ণনা যে প্রণালীতে প্রণীত হইয়া থাকে, তদনুযায়ী হইয়াছিল। এজন্য সরস্বতী দেবী সাতিশয় অসন্তোষপ্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন, তুমি, সামান্য নায়িকার ন্যায় বর্ণনা করিয়া, আমার অবমাননা করিলে। এই অপরাধে, সামান্য নায়িকার হস্তে তোমার প্রাণান্ত ঘটিবেক।

রাজা বিক্রমাদিত্যের রক্ষিতা এক বারবনিতা ছিল। রাজপ্রাসাদে এই বার-বনিতার সুখ, সম্পত্তি, ও আধিপত্যের সীমা ছিল না। কালিদাস তাহার নিরতিশয় প্রণয়ভাজন ছিলেন; প্রত্যহ, গোপনে তাহার ভবনে গিয়া, আমোদ করিতেন। এক দিন, তিনি তাহার সহিত আমোদ করিতেছেন, এমন সময়ে রাজা বারবনিতার আবাসে উপস্থিত হইলেন। তদীয় আগমনবার্ত্তা শ্রবণে, কালিদাস

ও বারবনিতা উভয়ে ভয়ে অভিভূত ও যৎপরোনাস্তি ব্যতিব্যস্ত হইলেন। উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে কালিদাস পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে লুকাইয়া রহিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে রাজা বারবনিতার নিকটে উপস্থিত হইলে, উভয়ে, একাসনে আসীন হইয়া, ইষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। রাজা, বারবনিতার স্তনে হস্তার্পণ করিয়া, বলিলেন,

"তব তন্বি কুচাবেতৌ নিয়তং চক্রবর্ত্তিনৌ"।

রাজকৃত স্তনবর্ণনা শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, কালিদাস, এককালে বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হইয়া, ঐ বর্ণনার সমর্থনার্থে বলিলেন,

"আসমুদ্রকরগ্রাহী ভবান্ যত্র করপ্রদঃ"।

রাজা, কালিদাসের স্বরশ্রবণ মাত্র, চকিত ও অতিমাত্র লজ্জিত হইলেন, এবং এ স্থানে কালিদাসের গতিবিধি আছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া, ভয়ানক ঈর্ষ্যার আবির্ভাব বশতঃ, বারবনিতার উপর যৎপরোনাস্তি রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া, আজ অবধি আমি তোমার সংস্রবত্যাগ করিলাম, তাহাকে এই কথা বলিয়া, চলিয়া গেলেন। কালিদাসের নির্বুদ্ধিতা ও অবিমৃশ্যকারিতার জন্যে, আমি এ জন্মের মত রাজপ্রসাদে বঞ্চিত হইলাম, এই ভাবিয়া, ক্রোধে অন্ধ ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া, বারবনিতা তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে কালিদাসের মস্তকচ্ছেদন করিল। এই রূপে, সরস্বতীর অভিসম্পাতবাক্য সর্ব্বতোভাবে কার্য্যে পর্য্যবসিত হইল।"

সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময় ১৮৩৯ সালে ভূগোল-খগোল সম্পর্কে কতগুলো শ্লোক লিখে বিদ্যাসাগর পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর সেই শ্লোকগুলো বই হয়ে বেরল 'ভূগোলখগোলবর্ণনম্' নামে—১৮৯২ সালের এপ্রিলে। চারশো-আটটি শ্লোক আছে 'ভূগোলখগোল-বর্ণনমে'।

বিদ্যাসাগরের রচিত, সঙ্কলিত ও সম্পাদিত বইয়ের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ রচনাই অনুবাদ, অনুসৃতি অথবা ছাত্রপাঠ্য।

রাজনারায়ণ বসু বলেছেন : "অনেকে মনে করেন, বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনী-শক্তি নাই, তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অনুবাদ মাত্র, কিন্তু যিনি তাঁহার রচিত সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব এবং বিধবাবিবাহ-বিচার গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তিনি বিদ্যাসাগরের অসাধারণ স্বকপোল-রচনা-শক্তি নাই, এমন কখনই বলিতে পারিবেন না।...বিদ্যাসাগর বঙ্গভাষার অনেক পরিমাণে নির্ম্মাণ ও পরিমার্জ্জন-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। বঙ্গভাষা তাঁহার নিকটে অশেষ কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ আছে।"[১৩]

একটা গল্প আছে।

কৃষ্ণনগরের রাজবাড়িতে শাস্ত্রের কী একটা বিষয় নিয়ে বিচার হচ্ছে। বিচারের সিদ্ধান্ত একজন স্কুলের পণ্ডিত বাঙলায় লিখলেন। সেই লেখা শুনে একজন অধ্যাপক অবজ্ঞা করে বললেন—এ কি হয়েছে!—এ যে বিদ্যা-সাগরী বাঙলা হয়েছে! এ যে অনায়াসে বোঝা যায়!![১৪]

অধ্যাপক মশাই মিথ্যে বলেননি। বিদ্যাসাগরের বাঙলা সত্যিই সহজ, সেকালের যে কোনো লেখকের ভাষার চেয়ে সহজ। সহজ এবং মধুর।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্যসমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য, তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে।...

বাংলাভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া, বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহার-যোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন; গদ্যের পদ-গুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন।"[১৫]

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

"বাঙ্গালা গদ্যে প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ—বিদ্যাসাগর। বিভিন্ন বাঙ্গালা শব্দের পরস্পর সমাবেশে অভিধানগত অর্থ ব্যতিরেকেও যে আর একটী অবর্ণনীয় রসের সৃষ্টি হইতে পারে, এই অপূর্ব সত্য তিনিই সর্বপ্রথম মনে মনে অনুভব করিয়া, লেখনীমুখে তাহার সম্ভাবনাও তাঁহার স্বদেশবাসীকে দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং তাহার ফলেই শতাব্দীপাদের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র এবং অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে।

ভাষা-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও গতানুগতিক ও প্রাচীনপন্থী ছিলেন না, বরং ভাষা সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রগতিশীল বলা যাইতে পারে। সময় ও শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুবিধা পাইলেই ভাষার পরিবর্তন ও মার্জনা সাধন করিতেন। তাঁহার জীবিত-কালেই তাঁহার রচিত পুস্তক-গুলির প্রায় প্রত্যেকটীর অনেকগুলি করিয়া সংস্করণ হয়। প্রত্যেক সংস্করণে তিনি কিছু-না-কিছু সংস্কার করিয়াছেন। তাঁহার এই সংস্কারকামী মনের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার বিরাম-চিহ্ন প্রয়োগের ক্রম-বাহুল্য দেখিয়া।...

গদ্য রচনার ছন্দ বিষয়ে তিনিই ছিলেন প্রথম দ্রষ্টা ও স্রষ্টা; গদ্যপাঠের ধ্বনিসামঞ্জস্যে যে পাঠক ও শ্রোতা আনন্দ পাইতে পারে, এই সূক্ষ্ম অনুভূতি তাঁহার ছিল।...বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে যখন কেহ চিন্তা করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত অর্জন করে নাই, সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে এ বিষয়ে তাঁহার সার্থক চিন্তা—বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি লইয়া এখন যাঁহারা গবেষণা করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বিদ্যাসাগর স্বয়ং যে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ—এই অন্তর্নিহিত ছন্দোগুণের জোরেই সে যুগের অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে তাঁহার রচনাগুলিই মাত্র স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।..."[১৬]

ভাষা-সংস্কার ও বিরাম-চিহ্ন প্রয়োগ বিষয়ে বিদ্যাসাগর কী ভাবে কাজ

করেছেন, 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র কয়েকটি সংস্করণ থেকে একই অংশ উদ্ধার করে তার একটি উদাহরণ :

"কিন্তু আমি তোমাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে বাঁচাইতেছি। যাহা কহি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। এবং তদনুসারে কার্য্য করিলে দীর্ঘ জীবী হইয়া নিরুদ্বেগে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য করিতে পারিবে। তখন ভূপতি বিস্মিত ও ব্যগ্রচিত্ত হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। যক্ষও ক্ষণ মধ্যে সমরশ্রান্তি পরিহার পূর্ব্বক বিক্রমাদিত্যকে সম্বোধন করিয়া অভিপ্রেত উপাখ্যানের উপক্রম করিল।"—প্রথম সংস্করণ থেকে।

"কিন্তু আমি তোমাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে বাঁচাইতেছি। যাহা কহি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। শুনিয়া তদনুসারে কার্য্য করিলে দীর্ঘজীবী হইয়া নিরুদ্বেগে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য করিতে পারিবে। তখন ভূপতি বিস্মিত ও ব্যগ্রচিত্ত হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। যক্ষও ক্ষণমধ্যে সমরশ্রান্তি পরিহার করিয়া বিক্রমাদিত্যকে সম্বোধিয়া অভিপ্রেত উপাখ্যানের উপক্রম করিল।"—সপ্তম সংস্করণ থেকে।

"কিন্তু আমি তোমায় আসন্ন মৃত্যু হইতে বাঁচাইতেছি, এজন্য এরূপ বলিতেছি। যাহা কহি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, তদনুযায়ী কার্য্য করিলে, দীর্ঘজীবী হইবে, এবং নিরুদ্বেগে, অখণ্ড ভূমণ্ডলে, একাধিপত্য করিতে পারিবে। তখন ভূপতি, অতিশয় বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া, যক্ষের বক্ষঃস্থল হইতে উত্থিত হইলেন। যক্ষও, ক্ষণ মধ্যে সমরশ্রান্তিপরিহার পূর্ব্বক, বিক্রমাদিত্যকে সম্বোধিয়া, তদীয় জীবন সংক্রান্ত গূঢ় বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিতে আরম্ভ করিল।"—দশম সংস্করণ থেকে।

এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন : "বাঙ্গালা গদ্যের এই ধ্বনি-প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি (বিদ্যাসাগর) ধীরে-ধীরে কি ভাবে সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন, এইরূপ নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দেখানো যাইতে পারে। এই ভাষা চরম বিকাশ লাভ করিয়াছে, শেষ বয়সে রচিত তাঁহার কতকগুলি বেনামী পুস্তিকায়।..."[১৭]

১৮৪৮ সালে বেরল বিদ্যাসাগরের 'বাঙ্গালার ইতিহাস (দ্বিতীয় ভাগ)'। এই বই সম্পর্কে বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

"বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ, শ্রীযুক্ত মার্শমন সাহেবের রচিত ইঙ্গরেজী গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বন পূর্ব্বক, সঙ্কলিত, ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। কোনও কোনও অংশ, অনাবশ্যক বোধে, পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং কোনও কোনও বিষয়, আবশ্যক বোধে, গ্রন্থান্তর হইতে সঙ্কলন পূর্ব্বক, সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই পুস্তকে, অতি দুরাচার নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সিংহাসনারোহণ অবধি, চিরস্মরণীয় লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক মহোদয়ের অধিকারসমাপ্তি পর্য্যন্ত, বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।..."

বিদ্যাসাগরের 'বাঙ্গালার ইতিহাসে'র ইংরেজি অনুবাদ ("*a close translation of* ISHWAR CHANDRA SHARMA'S *Bengalee*

version of that portion of MARSHMAN'S HISTORY OF BENGAL, which comprizes the rise and progress of the British Dominion, with notes and observations") করেছেন মেজর জি. টি. মার্শাল। ১৮৫০ সালে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজি অনুবাদের নাম: A Guide to Bengal.

১৮৪৯ সালের সেপ্টেম্বরে 'জীবনচরিত' নামে বিদ্যাসাগরের আরেকখানা বই বেরল। বইখানা ইংরেজি থেকে বাঙলায় অনুবাদ করেছেন বিদ্যাসাগর। এই বই সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: "বাঙ্গালায় ইঙ্গরেজীর অবিকল অনুবাদ করা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম্ম; ভাষাদ্বয়ের রীতি ও রচনাপ্রণালী পরস্পর নিতান্ত বিপরীত; এই নিমিত্ত, অনুবাদক অত্যন্ত সাবধান ও যত্নবান হইলেও অনুবাদিত গ্রন্থে রীতিবৈলক্ষণ্য, অর্থপ্রতীতির ব্যতিক্রম ও মূলার্থের বৈকল্য ঘটিয়া থাকে। আমি ঐ সমস্ত দোষ অতিক্রম করিবার আশয়ে অনেক স্থলে অবিকল অনুবাদ করি নাই...।"

বিদ্যাসাগরের 'জীবনচরিতে' কোপার্নিকস, গালিলিয়, নিউটন, হর্শেল, গ্রোশ্যস্, লিনিয়স্, ডুবাল, জেঙ্কিন্স ও জোন্সের চরিতকথা সংকলিত। লক্ষণীয়, সকলেই বিদেশী।

'জীবনচরিতে'র জন্য বিদ্যাসাগর ৭৪টি ইংরেজি শব্দের বাঙলা পরিভাষা রচনা করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ:

Degree—অংশ, অক্ষাংশ;
Perverted—অযথাভূত;
Discovery—আবিষ্ক্রিয়া;
Botany—উদ্ভিদবিদ্যা;
Colonial—ঔপনিবেশিক;
Monument—কীর্তিস্তম্ভ;
Heraldry—কুলাদর্শ;
Prejudice—কুসংস্কার;
Centre—কেন্দ্র;
Research—গবেষণা;
Planetary Nebulae—গ্রহনীহারিকা;
Biographer—চরিতাখ্যায়ক;
Museum—চিত্রশালিকা;
Milky way—ছায়াপথ;
National Law—জাতীয় বিধান;
Astronomy—জ্যোতির্বিদ্যা;
Numismatics—টঙ্কবিজ্ঞান;
Telescope—দূরবীক্ষণ;
Optics—দৃষ্টিবিজ্ঞান;
Mineralogy—ধাতুবিদ্যা;
Astrology—নক্ষত্রবিদ্যা;
Equator—নাড়ীমণ্ডল, বিষুবরেখা;
Natural Law—নৈসর্গিক বিধান;

Natural Philosophy—পদার্থবিদ্যা;
Perspective—পরিপ্রেক্ষিত;
Ticket—প্রবেশিকা;
Reflecting Telescope—প্রাতিফলিক দূরবীক্ষণ;
Metaphysics—মনোবিজ্ঞান;
Axis—মেরুদণ্ড;
Theatre—রঙ্গভূমি;
Revolution—রাজবিপ্লব;
Report—বিজ্ঞাপনী;
University—বিশ্ববিদ্যালয়;
Century—শতাব্দী।

এই শব্দমালা বিষয়ে বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "ইউরোপীয় পদার্থবিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা সংক্রান্ত অনেক কথার বাঙ্গলা ভাষায় অসঙ্গতি আছে; ঐ অসঙ্গতি পূরণার্থে কোন কোন স্থানে দুরূহ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ ও স্থান বিশেষে তত্তৎ কথার অর্থ ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া তৎপ্রতিরূপ নূতন শব্দ সঙ্কলন করিতে হইয়াছে...। কিন্তু সঙ্কলিত শব্দ সকল বিশুদ্ধ ও অবিসম্বাদিত হইয়াছে কি না সে বিষয়ে আমি অপরিতৃপ্ত রহিলাম।"

'জীবনচরিতে'র দ্বিতীয়বারের 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "...সঙ্কল্প করিয়াছিলাম আর কখন ইঙ্গরেজী পুস্তকের অনুবাদ করিব না এবং এই পুস্তকও পুনর্মুদ্রিত করিব না। এবং এই নিমিত্ত বাঙ্গলায় এক নূতন জীবনচরিত পুস্তক সঙ্কলন করিবার বাসনা ও উদ্যোগ করিয়াছিলাম। কিন্তু গত দুই বৎসর কাল বিষয়ান্তরে একান্ত ব্যাপৃত হইয়া এমত অবকাশ-শূন্য হইয়াছি যে সে বাসনা সম্পন্ন করিতে পারি নাই এবং ত্বরায় সম্পন্ন করিতে পারিব এমন সম্ভাবনাও নাই।"

বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' বেরয় ১৮৫১ সালের এপ্রিলে। 'বোধোদয়ে'র 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "বোধোদয় নানা ইংরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল, পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে। যে কয়টি বিষয় লিখিত হইল, বোধ করি, তৎপাঠে অমূলক কল্পিত গল্পের পাঠ অপেক্ষা, অধিকতর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা। অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালকবালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে, এই আশায় অতি সরল ভাষায় লিখিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছি; কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না।..."

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একদিন বিদ্যাসাগরকে বললেন—অনেকে আমাকে বলেন, বিদ্যাসাগর ছেলেদের জন্য এমন সুন্দর একখানা বই লিখলেন, ছেলেদের জানবার মতো সব কথাই এতে আছে, কেবল ঈশ্বর বিষয়ে কোনো কথা নেই, কেন নেই?

বিদ্যাসাগর একটু হেসে বললেন—যাঁরা তোমার কাছে ওকথা বলেন তাঁদের বলো, এবার যে 'বোধোদয়' ছাপা হবে তাতে ঈশ্বরের কথা থাকবে।[১৮]

পরে বিদ্যাসাগর 'বোধোদয়ে' ঈশ্বরের কথা লিখেছেন, 'ঈশ্বর' নাম দিয়ে লিখেছেন। বিদ্যাসাগরের সেই 'ঈশ্বর' নামের রচনাটি 'বোধোদয়' থেকে তুলে দিচ্ছি :

"ঈশ্বর কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি

করিয়াছেন। এ নিমিত্ত, ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলে। ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি, তিনি তাহা দেখিতে পান; আমরা যাহা মনে ভাবি, তিনি তাহা জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু; তিনি সমস্ত জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা।"*

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গব্যঙ্গে সিদ্ধহস্ত। বঙ্কিমচন্দ্র একবার বলেছেন—"ইন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্য-আকাশের Halley's Comet, যখন ফুটিয়া উঠে, তখন উহার প্রভায় দশদিক্ আলোকিত হইয়া উঠে। পরন্তু সবাই উহাকে দেখিলে ভয় পায়। কে জানে, কাহার কোন অন্ধকার কোণটি উহার পুচ্ছের আলোকে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, আর দেশশুদ্ধ লোকে তাহা দেখিয়া হাসিবে ও হাত-তালি দিবে।"

এই ইন্দ্রনাথের সঙ্গে একদিন বিদ্যাসাগরের দেখা। বয়সে ইন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের চেয়ে প্রায় তিরিশ বছরের ছোটো। বিদ্যাসাগর হেসে বললেন—ইন্দির, তুই তো আমাকে নিয়ে কোনোরকম পরিহাস করিসনি। আমি কারণ ঠাওরে উঠতে পারিনে।

ইন্দ্রনাথ সহাস্যে বললেন—যখন অনুমতি পেলাম, তখন করব।

কিছুদিন পরেই বঙ্গবাসীতে "নষ্টে মৃতে"র ব্যাখ্যা বেরল, বোধোদয়ের ব্যঙ্গ বেরল।

ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের মারফৎ ইন্দ্রনাথকে আশীর্বাদ করে পাঠালেন বিদ্যাসাগর। আর ইন্দ্রনাথ বললেন—এতদিন পরে আমার একটা রঙ্গ করা সার্থক হল।[১১]

'নীতিবোধ' নামে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানা প্রবন্ধের বই বেরল ১৮৫১ সালের জুলাই মাসে। 'নীতিবোধে'র 'বিজ্ঞাপনে' রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "...শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এবং তিনি সংশোধন করিয়াছেন বলিয়াই আমি সাহস করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তিনিই প্রথমে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। পশুগণের প্রতি ব্যবহার, পরিবারের প্রতি ব্যবহার, প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিনয়, এই কয়েকটি প্রস্তাব তিনি রচনা করিয়াছিলেন; এবং প্রত্যেক প্রস্তাবের উদাহরণ স্বরূপ যে সকল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টের কথাও তাঁহার রচনা।"

'নীতিবোধ' থেকে বিদ্যাসাগরের 'বিনয়' নামে একটি রচনা তুলে দিচ্ছি :

"যদি কেহ আপনি আপনার প্রশংসা করে, কিংবা আপনার কথা অধিক করিয়া বলে, অথবা কোন রূপে ইহা ব্যক্ত করে যে, সে আপনি আপনাকে বড় জ্ঞান করে, তাহা হইলে, সে নিঃসন্দেহ উপহাসাস্পদ হয়। আমাদিগের

---

* ১৮৪১ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি বক্তৃতায় ব্যক্ত করেন—ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্য-স্বরূপ। উত্তরকালে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী এ-বিষয়ে লিখেছেন : "'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ' এই মহাবাক্য কয়েক বৎসর পরে (১৮৫১ সালে) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক তাঁহার 'বোধোদয়' পুস্তকে গৃহীত হয়; তদবধি ইহা লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী বালকবালিকার অন্তরে ঈশ্বর সম্বন্ধে বিমল ধারণার উদয় করিয়া আসিতেছে।" (সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৬৯।)

আপনাকে সামান্য জ্ঞান করা উচিত, এবং লোকেও যেন বুঝিতে পারে যে আমরা আপনাকে সামান্য জ্ঞান করি। আর অন্যে যখন আমাদের প্রশংসা করে, তৎকালে বিনীত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহা অতি যথার্থ কথা যে বিনয় সদ্‌গুণের শোভা সম্পাদন করে, কিন্তু যথার্থ সদ্‌গুণও আত্মশ্লাঘাসহকৃত হইলে সকলের ঘৃণিত হয়। আর আমাদিগের যে সকল বিদ্যা, গুণ, অথবা পদ নাই, যদি আমরা উহা আছে বলিয়া লোকের নিকট ভান করি, তাহা হইলে, আমাদিগকে আরও উপহাসাস্পদ হইতে হয়। যেহেতু আমাদের ঐ সকল ভান অমূলক বলিয়া লোকে অনায়াসে বুঝিতে পারে। লোক নির্গুণ ব্যক্তিকে যত অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে, নির্গুণ হইয়া গুণ আছে বলিয়া ভানকারী ব্যক্তিকে তাহা অপেক্ষা অধিক অবজ্ঞা ও অধিক ঘৃণা করে।

অনেকের এরূপ রোগ আছে যে, আপনার সিদ্ধান্তকে অখন্ডনীয় ও অন্যের সিদ্ধান্তকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এই মহৎ রোগের প্রতীকারে সযত্ন হওয়া অতি কর্ত্তব্য। আমরা অপসিদ্ধান্ত বোধ করিলেও তাহাদের সিদ্ধান্ত বস্তুতঃ অভ্রান্ত হইতে পারে; আর আমাদিগের সিদ্ধান্ত আমরা অভ্রান্ত বোধ করিলেও বাস্তবিক ভ্রমাত্মক হইবার আটক কি। সকলেরই বিশেষ বিশেষ মত আছে, এবং সকলেই আপন আপন মত অভ্রান্ত বোধ করিতে পারে। অতএব সকলেরই মত ভ্রান্তি-মূলক কেবল আমারই প্রামাণিক ইহা কোন ক্রমেই হইতে পারে না। আমার ভুল হইতে পারে এইরূপ ভাবিয়া কর্ম্ম করা সকলের পক্ষেই বিশেষ আবশ্যক।”

‘টেলিমেকস’ নামে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানা অনুবাদগ্রন্থ আছে। সেই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ‘বিজ্ঞাপনে’ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: “...শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই অনুবাদের আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।”

১৮৫৪ সালের ১৫-সেপ্টেম্বর ‘সংবাদ প্রভাকর’ লিখেছে: “পণ্ডিতবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কয়েকখানি পুস্তক প্রকটন করিয়াছেন, কেবল তাহাই বালকদিগের শিক্ষোপযোগি হইয়াছে, কিন্তু তাহার সংখ্যা এত অল্প যে তৎপাঠে কোন রূপেই শিক্ষার আতিশয্য হইতে পারে না।”

১৮৫৪ সালের ডিসেম্বরে বেরল বিদ্যাসাগরের ‘শকুন্তলা’। ‘শকুন্তলা’ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর লিখেছেন: “ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান কবি কালিদাসের প্রণীত অভিজ্ঞানশকুন্তল সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক। এই পুস্তকে সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকের উপাখ্যানভাগ সংকলিত হইল।...”

‘শকুন্তলা’ থেকে একটি অংশ তুলে দিচ্ছি:

“অতি পূর্ব্ব কালে, ভারতবর্ষে দুষ্মন্ত নামে সম্রাট্ ছিলেন। তিনি, একদা, বহুতর সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে, মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। এক দিন, মৃগের অনুসন্ধানে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, এক হরিণশিশুকে লক্ষ্য করিয়া, রাজা শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। হরিণশিশু, তদীয় অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, প্রাণভয়ে, দ্রুত বেগে, পলাইতে আরম্ভ করিল। রাজা রথা-রোহণে ছিলেন, সারথিকে আজ্ঞা দিলেন, মৃগের পশ্চাৎ রথচালন কর। সারথি কশাঘাত করিবামাত্র, অশ্বগণ বায়ুবেগে ধাবমান হইল।

কিয়ৎ ক্ষণে রথ মৃগের সন্নিহিত হইলে, রাজা শরনিক্ষেপের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে, দূর হইতে, দুই তপস্বী উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না, বধ করিবেন না। সারথি, শুনিয়া, অবলোকন করিয়া কহিল, মহারাজ! দুই তপস্বী এই মৃগের প্রাণবধ করিতে

নিষেধ করিতেছেন। রাজা, তপস্বীর উল্লেখশ্রবণমাত্র, অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া, সারথিকে কহিলেন, ত্বরায় রশ্মি সংযত করিয়া রথের বেগসংবরণ কর। সারথি, যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া, রশ্মি সংযত করিল।

এই অবকাশে, তপস্বীরা, রথের সন্নিহিত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না। আপনকার বাণ অতি তীক্ষ্ণ ও বজ্রসম, ক্ষীণজীবী অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্য নহে। শরাসনে যে শর সংহিত করিয়াছেন, আশু তাহার প্রতিসংহার করুন। আপনকার শস্ত্র আর্ত্তের পরিত্রাণের নিমিত্ত, নিরপরাধের প্রহারের নিমিত্ত নহে।”

মূল 'শকুন্তলা'য় একাধিক অলৌকিক বর্ণনা আছে। বিদ্যাসাগর অলৌকিক বর্ণনা যথাসম্ভব বর্জন করেছেন। নিতান্ত অপরিহার্য না হলে বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'য় অলৌকিক বর্ণনা স্থান পায়নি।

মহাকবি কালিদাসের প্রতি বিদ্যাসাগরের বিপুল শ্রদ্ধা। বিদ্যাসাগরের বিবেচনায় কালিদাসের কবিত্বশক্তি অসাধারণ, অলৌকিক; রচনাশক্তি অদ্বিতীয়; এবং সহৃদয়তা অনন্যসামান্য। বিদ্যাসাগর লিখেছেন : “কালিদাস কীদৃশকবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। যাঁহারা কাব্যের যথার্থরূপ রসাস্বাদে অধিকারী, সেই সহৃদয় মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন, কালিদাস কিরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, কোনও দেশের কোনও কবি, আমাদের কালিদাসের ন্যায়, সকল বিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না।”[২০]

উত্তরকালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন : “একদিন কালিদাস ও শেক্সপীয়র সম্বন্ধে তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) সহিত আলাপ করিতেছিলাম। বিদ্যাসাগর কালিদাসের এমন একান্ত ভক্ত ছিলেন যে, কালিদাস যে কাহারও অপেক্ষা হীন একথা একেবারেই স্বীকার করিতে চাহিতেন না।”

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শেক্সপীয়রের প্রশস্তি করে লিখেছেন : “ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি”—অর্থাৎ, কালিদাস কেবলমাত্র ভারতের কবি, কিন্তু শেক্সপীয়র সমস্ত জগতের কবি।

কবি হেমচন্দ্রের এই শেক্সপীয়র-প্রশস্তির কথা কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বিদ্যাসাগরকে। শুনে বিদ্যাসাগর রাগ করে বললেন—হেম-বাবুর একথা বলবার অধিকার নেই। সে তো সংস্কৃত জানে না।*[২১]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শেক্সপীয়র সম্পর্কে বিদ্যাসাগর লিখেছেন : “সেক্সপীর, পঁয়ত্রিশখানি নাটক রচনা করিয়া, বিশ্ববিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত নাটকসমূহে কবিত্বশক্তির ও রচনাকৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত, তিনি চারিখানি খণ্ড কাব্য ও কতকগুলি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিয়াছেন। অনেকে বলেন, তিনি যে কেবল ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি ছিলেন, এরূপ নহে; এ পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলে যত কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহেন। এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বা পক্ষপাতবিবর্জ্জিত কি না মাদৃশ ব্যক্তির তদ্বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রগল্‌ভতাপ্রদর্শন মাত্র।”[২২]

---

* স্বয়ং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : “বাল্যাবধি আমি ইংরেজী ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি, এবং সংস্কৃত ভাষা অবগত নহি...।” (হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : বৃত্রসংহার কাব্য, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩।)

বিদ্যাসাগর শেক্সপীয়রের অনুরাগী ছিলেন, এ সত্যে সন্দেহ নেই। বিদ্যাসাগরের মুখে শেক্সপীয়রের আবৃত্তি শুনে অনেকে মুগ্ধ হয়েছেন।[২৩]

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "সুপ্রসিদ্ধ ৺প্যারীচরণ সরকার মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। যাঁহারা অকৃত্রিম প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া চিরদিন তাঁহার কার্য্যকলাপের সহিত অক্ষুণ্ণ যোগ রাখিয়া চলিয়াছেন, সরকার মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে এক জন। প্যারীবাবুর সদর বাটীর বৈঠকখানা ঘরে সর্ব্বদাই বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির সমাগমে মজলিস হইত। একদিনকার ঐরূপ মজলিসে বঙ্গদেশীয় বালক বালিকাগণের শিক্ষা লাভের সদুপায় সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা উঠে। সেদিনকার বৈঠকের কথাবার্ত্তায় স্থির হয় যে, প্যারীচরণ সরকার মহাশয় ইংরাজী বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া বালকদিগের প্রথম পাঠ্য কতকগুলি ইংরাজী পুস্তক রচনা করিবেন; আর বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া বালকদিগের উপযোগী কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করিবেন। এইরূপ স্থির হওয়ার পর উভয় বন্ধু ঐ উভয় ভাষায় শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থে বাহির হইয়া পথে পাল্কিতে বসিয়া বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ রচনা করেন।"[২৪]

'বর্ণপরিচয়—প্রথম ভাগ' সম্পর্কে একই রকম বিবরণ দাখিল করেছেন বিহারীলাল সরকার ও সুবলচন্দ্র মিত্র।

কিন্তু নবকৃষ্ণ ঘোষ লিখেছেন: "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিতগুলিতে লিখিত হইয়াছে যে একদিন প্যারীবাবুর চোরবাগানস্থ বাটীর বৈঠকখানায় বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে কথা উঠিলে, স্থির হয় যে প্যারীচরণ ইংরাজি ভাষায় এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া স্কুল পাঠ্য প্রাথমিক পুস্তকগুলি লিখিবেন, এবং সেই কথোপকথনের ফলস্বরূপ প্যারীবাবুর ফার্ষ্ট বুক এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ আদি পুস্তকাবলীর সৃষ্টি হয়। উক্ত কথোপকথনের কথা শ্রবণ করিলে সাধারণের ধারণা জন্মিতে পারে যে প্যারীবাবুর ফার্ষ্ট বুক ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ একই সময়ে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। বাস্তবিক ঘটনা কিন্তু সেরূপ নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ খৃীঃ ১৮৫৫ অব্দে প্রকাশিত হয়; তাহার প্রায় পাঁচবর্ষ পূর্ব্বে প্যারীবাবু বারাসতে অবস্থান কালে তদীয় ফার্ষ্ট বুক রচনা, প্রকাশ ও স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত করেন। সম্ভবতঃ খৃীঃ ১৮৫৪ অব্দে যখন প্যারীবাবু হেয়ারস্কুলের কর্ত্তৃত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া নবীন উদ্যমে তদীয় ফার্ষ্ট বুকাদি পুস্তকের সংস্করণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন সেই সময়ে উক্ত কথোপকথন হয়। এবং উক্ত কথোপকথন সত্য হইলে বোধ হয় যে প্যারীবাবুর দৃষ্টান্তে বা তাঁহার পরামর্শেই তদীয় সোদরোপম সুহৃদ্বর বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা বর্ণপরিচয়াদি চিরস্মরণীয় স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনাকার্য্যে ব্রতী হয়েন।"[২৫]

১৮৫৫ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত 'বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগে'র 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর লিখেছেন: "বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। বহুকাল অবধি, বর্ণমালা ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় দীর্ঘ ঋকার ও দীর্ঘ ঌকারের প্রয়োগ নাই; এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর, সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অনুস্বর ও বিসর্গ স্বরবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না; এজন্য,

ঐ দুই বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। আর, চন্দ্রবিন্দুকে ব্যঞ্জনবর্ণ-স্থলে এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করা গিয়াছে। ড, ঢ, য এই তিন ব্যঞ্জনবর্ণ, পদের মধ্যে অথবা পদের অন্তে থাকিলে, ড়, ঢ়, য় হয়; ইহারা অভিন্ন বর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন আকার ও উচ্চারণ উভয়ের পরস্পর ভেদ আছে, তখন উহাদিগকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করাই উচিত; এই নিমিত্ত, উহারাও স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক ও ষ মিলিয়া ক্ষ হয়, সুতরাং উহা সংযুক্ত বর্ণ; এজন্য, অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গণনাস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।"

'বর্ণপরিচয়—প্রথম ভাগে'র '১৯ পাঠে' বিদ্যাসাগর গোপালের কথা লিখেছেন :

"গোপাল বড় সুবোধ। তার বাপ মা যখন যা বলেন, সে তাই করে। যা পায় তাই খায়, যা পায় তাই পরে, ভাল খাব, ভাল পরিব বলিয়া উৎপাত করে না।

গোপাল আপনার ছোট ভাই ভগিনীগুলিকে বড় ভাল বাসে। সে কখনও তাদের সহিত ঝগড়া করে না, তাদের গায় হাত তুলে না। এ কারণে, তার পিতা মাতা তাকে অতিশয় ভাল বাসেন।

গোপাল যখন পড়িতে যায়, পথে খেলা করে না; সকলের আগে পাঠশালায় যায়; পাঠশালায় গিয়া, আপনার জায়গায় বসে; আপনার জায়গায় বসিয়া, বই খুলিয়া পড়িতে থাকে; যখন গুরু মহাশয় নূতন পড়া দেন, মন দিয়া শুনে।

খেলিবার ছুটী হইলে, যখন সকল বালক খেলিতে থাকে, গোপালও খেলা করে। আর আর বালকেরা, খেলিবার সময়, ঝগড়া করে, মারামারি করে। গোপাল তেমন নয়। সে এক দিনও, কাহারও সহিত, ঝগড়া বা মারামারি করে না।

পাঠশালার ছুটী হইলে, বাড়ী গিয়া, গোপাল পড়িবার বইখানি আগে ভাল জায়গায় রাখিয়া দেয়; পরে, কাপড় ছাড়িয়া, হাত পা মুখ ধোয়। গোপালের মা যা কিছু খাবার দেন, গোপাল তাই খায়; খাইয়া, আপনার ছোট ভাই ভগিনী-গুলি লইয়া, খানিক খেলা করে।

গোপাল কখনও লেখা পড়ায় অবহেলা করে না। সে পাঠশালায় যাহা পড়িয়া আইসে, বাড়ীতে তাহা ভাল করিয়া পড়ে; পুরাণ পড়াগুলি দুবেলা আগাগোড়া দেখে। পড়া বলিবার সময়, সে সকলের চেয়ে ভাল বলিতে পারে।

গোপালকে যে দেখে, সেই ভালবাসে। সকল বালকেরই গোপালের মত হওয়া উচিত।"

'বর্ণপরিচয়—প্রথম ভাগে'র '২০ পাঠে' বিদ্যাসাগর রাখালের কথা লিখেছেন :

"গোপাল যেমন সুবোধ, রাখাল তেমন নয়। সে বাপ মার কথা শুনে না; যা খুসী তাই করে: সারা দিন উৎপাত করে; ছোট ভাই ভগিনীগুলির সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে। এ কারণে, তার পিতা মাতা তাকে দেখিতে পারেন না।

রাখাল, পড়িতে যাইবার সময়, পথে খেলা করে; মিছামিছি দেরি করিয়া, সকলের শেষে পাঠশালায় যায়। আর আর বালকেরা পাঠশালায় গিয়া পড়িতে বসে। রাখলও দেখাদেখি বই খুলিয়া বসে; বই খুলিয়া হাতে করিয়া থাকে, এক বারও পড়ে না।

লেখা পড়ায় রাখালের বড় অমনোযোগ। সে এক দিনও মন দিয়া পড়ে না; এবং এক দিনও ভাল পড়া বলিতে পারে না। গুরু মহাশয় যখন নূতন পড়া দেন, সে তাহাতে মন দেয় না, কেবল এদিকে ওদিকে চাহিয়া থাকে।

খেলিবার ছুটী হইলে, রাখাল বড় খুসী। খেলিতে পাইলে, সে আর কিছুই চায় না। খেলিবার সময়, সে সকলের সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে; এ কারণে গুরুমহাশয় তাহাকে সতত গালাগালি দেন।

ছুটী হইলে, বাড়ীতে গিয়া, রাখাল পড়িবার বই কোথায় ফেলে, কিছুই ঠিকানা থাকে না। কোনও দিন পাঠশালায় ফেলিয়া আইসে; কোনও দিন পথে হারাইয়া আইসে। রাখালের পিতা, এক মাসের ভিতর, চারিবার বই কিনিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এবার বই হারাইলে, আর কিনিয়া দিবেন না।

রাখালকে কেহ ভাল বাসে না। কোন বালকেরই রাখালের মত হওয়া উচিত নয়। যে রাখালের মত হইবে, সে লেখা পড়া শিখিতে পারিবে না।"

এই গোপাল-রাখালের কথা তুলে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর-চরিত্র ব্যাখ্যা করেছেন :

"বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে গোপাল নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপ-মায়ে যাহা বলে সে তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন তখন গোপালের অপেক্ষা কোনো কোনো অংশে রাখালের সঙ্গেই তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক্, পিতা যাহা বলিতেন তিনি তাহার ঠিক উল্টা করিয়া বসিতেন।...

নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালিজাতির শীর্ণচরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাস করিয়া ভালো চাকরি-বাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। বহুকাল পূর্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু একটা বিষয়ে রাখালের সহিত তাহার জীবনচরিত-লেখকের সাদৃশ্য ছিল না। 'রাখাল পড়িতে যাইবার সময় পথে খেলা করে, মিছামিছি দেরি করিয়া, সকলের শেষে পাঠশালায় যায়।' কিন্তু পড়াশুনায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। যে প্রবল জিদের সহিত তিনি পিতার আদেশ ও নিষেধের বিপরীত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন সেই দুর্দম জিদের সহিত তিনি পড়িতে যাইতেন। সেও তাঁহার প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে নিজের জিদ রক্ষা।..."[২৬]

শব্দের পর শব্দ গেঁথে বিদ্যাসাগর কত সুন্দর ছবি 'বর্ণপরিচয়—প্রথম ভাগে' এঁকে রেখেছেন : "বড় গাছ। ভাল জল। লাল ফুল। ছোট পাতা।... জল পড়ে। মেঘ ডাকে।...কাল পাথর। সাদা কাপড়।...কপাট খোল।...কাক ডাকিতেছে। পাখী উড়িতেছে। পাতা নড়িতেছে। গরু চরিতেছে। জল পড়িতেছে। ফল ঝুলিতেছে।"

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ 'বর্ণপরিচয়—প্রথম ভাগ' পড়েছেন। বড়ো হয়েও তিনি সে-বইয়ের কথা ভুলতে পারেননি।

উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে পাতা

নড়ে।' তখন 'কর খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে।' আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।"*[২৭]

'বর্ণপরিচয়—প্রথম ভাগে'র কথায় একটা গল্প এসে যাচ্ছে। দুই বিদ্যা-সাগরের নামে গল্প। গল্পের মতো, কিন্তু ঠিক গল্প নয়। সত্য ঘটনা বলে বর্ণনা করা যেতে পারে।

চন্দ্রমোহন নামে একটি বামুনের ছেলে নদীয়া জেলার দেবগ্রামের জমিদার-বাড়িতে চাকরি পেয়েছে। রান্নাঘরে কাজ করবে। দিব্যি চালাক-চতুর ছেলেটি। কাজকর্ম করে। জমিদারবাড়ির সকলেই চন্দ্রমোহনকে খুব পছন্দ করেন।

জমিদারবাড়ির মুহুরীদের ধরাধরি করে কাজের ফাঁকে চন্দ্রমোহন খান-

---

* বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় প্রকাশিত 'বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগে'র কোনো সংস্করণ আমি অদ্যাবধি সংগ্রহ করতে পারিনি। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগে'র সংস্করণে 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' পাইনি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন :

"রবীন্দ্রনাথের প্রথম পাঠ্যপুস্তক হবার এবং চিরস্মরণীয় 'কবিতা'টির (জল পড়ে, পাতা নড়ে) উৎসস্থল হবার গৌরবের অধিকারী কোন্ বই তা অনুসন্ধানের বিষয় বই কি। জীবনস্মৃতির বর্তমান সংস্করণে সেই গৌরব দেওয়া হয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগকে। এই পুস্তকখানির প্রকাশকাল ১৮৫৫ সাল। সুতরাং এখানির পক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পাঠ্যপুস্তক হবার খুবই সম্ভাবনা ছিল সন্দেহ নেই। এই পুস্তকের বর্ণযোজনা অংশের প্রায় গোড়াতেই 'কর, খল' শব্দ দুটিও আছে। কিন্তু এটিতে কোথাও "জল পড়ে, পাতা নড়ে" এই 'আদি কবিতা'টি নেই। অবশ্য অষ্টম পাঠে "কাক ডাকিতেছে। গরু চরিতেছে" ইত্যাদি গদ্যবাক্যের সঙ্গে "জল পড়িতেছে। পাতা নড়িতেছে" এই দুটি বাক্যও আছে। কিন্তু এদুটিকে 'আদি কবির প্রথম কবিতা' আখ্যা দেওয়া চলে কিনা সন্দেহ।...

তৎকালীন আরেকখানি বহু প্রচলিত প্রাথমিক পুস্তক হচ্ছে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ। প্রকাশকাল ১৮৪৯।...এই পুস্তকের একেবারে গোড়াতেই 'কর খর, কল খল' ইত্যাদি বর্ণযোজনার ছন্দোবদ্ধ দৃষ্টান্ত রয়েছে। আর কিছু পরেই আছে 'জল পড়ে, ছাতি ধরে'। কিন্তু "পাতা নড়ে" নেই। এখানে ছন্দোগত মিল আছে। কিন্তু তথ্যগত মিল নেই। পক্ষান্তরে বর্ণপরিচয়ে তথ্য ঠিক আছে, কিন্তু ছন্দ বা মিল নেই। রবীন্দ্রনাথ হয়তো দুখানি বই-ই পড়েছিলেন এবং একটি থেকে ছন্দ ও মিল, আর অপরটি থেকে তথ্যসংগ্রহ করে নিজের অজ্ঞাতসারেই ওই আদি কবিতাটি কল্পনা করে নিয়েছিলেন।...অবশ্য কোন তৃতীয় পুস্তকের সাহায্যে বা অন্য উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করা যায় কিনা, তাও ভেবে দেখা দরকার।" (শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন : রবীন্দ্রনাথের বাল্য রচনা, ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ও ডঃ শিশিরকুমার দাশ সম্পাদিত 'শশিভূষণ স্মারক গ্রন্থ', দিল্লী, ১৯৬৮, পৃ. ১০২-০৩।)

বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় প্রকাশিত 'বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগে'র এক কিংবা একাধিক সংস্করণে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' থাকতে পারে। না থাকলেও, 'বর্ণপরিচয়, প্রথম ভাগে'র 'জল পড়ে।...পাতা নড়িতেছে।...জল পড়িতেছে' থেকে উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের 'জল পড়ে পাতা নড়ে' মনে পড়ে যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথের 'সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে' পারে।

কয়েক বাঙলা বই পড়ে ফেলল। বই-টই পড়ে চন্দ্রমোহনের ইচ্ছা হল, লেখক হতে হবে, একখানা বই লিখে ফেলতে হবে।

কিছু কাগজ যোগাড় করে চন্দ্রমোহন একখানা খাতা বেঁধে নিল। পয়লা পাতায় বড়ো-বড়ো অক্ষরে অ-আ লিখল। পর-পর কয়েক পাতা জুড়ে নানারকম কারিকুরি করল। তারপর পাতার পর পাতায় দিনের পর দিন লিখে যেতে লাগল পাড়ার যাবতীয় সংবাদ। একদিন গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হল। হ্যাঁ, মলাটে চন্দ্রমোহনের স্বহস্তে অঙ্কিত ছবিও আছে একখানা। আর বইখানার নাম কী? খাতার যথাস্থানে চন্দ্রমোহন লিখেছে: "বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ—চন্দ্রমোহন বিদ্যাসাগর প্রণীত।"

হঠাৎ কী করে খাতাখানা বাড়ির কর্তাদের চোখে পড়ে গেল। হেসে আকুল সকলে। সকলেই একসঙ্গে বসে "চন্দ্রমোহন বিদ্যাসাগর প্রণীত বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ" আদ্যন্ত পড়ে ফেললেন। সকলেই একবাক্যে বললেন—তুই যে রাতারাতি বিদ্যাসাগর হয়ে গেলি রে চন্দর!

এই বাড়িতে সেদিন থেকে চন্দ্রমোহনের নামই হয়ে গেল 'বিদ্যাসাগর'। দিনের পর দিন গেল, এই বাড়ির সকলেই ভুলে গেলেন যে এই 'বিদ্যাসাগরে'র নিজের একটা নাম আছে। সকলের মুখেই বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর।

জমিদারবাবু সপরিবারে কলকাতায় এসেছেন একবার। আমাদের এই বিদ্যা-সাগর তখন জমিদারবাবুর বাড়ির রান্নাঘরের ঠাকুর, অতএব তাকেও আসতে হল কলকাতায়। সেবার একটা কাণ্ড হল।

আসল বিদ্যাসাগরের সঙ্গে জমিদারবাবুর চেনা-জানা আছে। সেদিন বিদ্যাসাগর জমিদারবাবুর বাড়িতে এসেছেন। জমিদারবাবু বাড়ির সকলকে আড়ালে বললেন—আজ কেউ চন্দ্রমোহনকে 'বিদ্যাসাগর' বলে ডেকো না। আজ আসল বিদ্যাসাগর এসেছেন। খবরদার।

কিন্তু বহুকালের অভ্যাস এক মুহূর্তে যাবার নয়। আসল বিদ্যাসাগর মাঝে-মাঝে ফিসফিসানি শুনছেন: বিদ্যাসাগর, ডালে নুন হয়নি কেন? বিদ্যাসাগর। চুপ, চুপ। ও বিদ্যাসাগর, হাত চালিয়ে নাও, হাঁ করে দেখছ কি। চুপ, চুপ। ও বিদ্যাসাগর—। চুপ, চুপ।

আসল বিদ্যাসাগর কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। শেষপর্যন্ত তিনি জমিদারবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন—ব্যাপার কি মশাই?

জমিদারবাবু তখন সহাস্যে আদ্যন্ত বললেন বিদ্যাসাগরকে। শুনে বিদ্যা-সাগর হাসতে লাগলেন। ডেকে আনলেন চন্দ্রমোহনকে। সামনাসামনি বসালেন। বললেন—তা বেশ হয়েছে। তুমিও বিদ্যাসাগর, আমিও বিদ্যাসাগর। আজ থেকে তুমি আমার মিতা।[২৮]

এই ঘটনার ঈষৎ অন্যরূপ বিবরণ দাখিল করেছেন মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়: বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রেমগ্রন্থের লেখক হেমেন্দ্র নাথ সিংহ মহাশয়দের বাটীতে যাইতেন; তাঁহাদের বাটীতে ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক এক পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। ইহাকে তাঁহারা বিদ্যাসাগর বলিয়া ডাকিতেন। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদের বাটীতে আইসেন। বাটীর কর্ত্তা ছেলেদের সাবধান করিয়া দিলেন যে ঠাকুরকে বিদ্যাসাগর বলিয়া ডাকিয়া কোন ফরমায়েস না করা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিলে ছেলেরা অভ্যাস মত বলিয়া উঠিল "বিদ্যাসাগর ঝোল দিয়ে যাও।" বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা শুনিয়া কিছু বুঝিতে পারিলেন না; তিনি উঠিয়া যাইয়া রান্নাঘরের সম্মুখে গিয়া বসিলেন। কর্ত্তা

বিদ্যাসাগর ঝোল দিয়ে যাও কথার অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। তিনি যখন জানিলেন যে পাচক ব্রাহ্মণের নামও ঈশ্বর, তখন তিনি তাহাকে বলিলেন "ভাই তুমি আমার মিতে; কল্য তুমি রাঁধিও না, আমি রেঁধে খাওয়াব। কাল তোমার ছুটি"। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি পরদিন স্বয়ং রন্ধন করিয়া ছেলেদের পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখনই সিংহমহাশয়দের বাসভূমি, বোলপুর রায়পুরে যাইতেন, তখনই জিজ্ঞাসা করিতেন, "আমার মিতা কোথায়?"[২৯]

বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ অনেকক্ষণ ধরে উল্টেপাল্টে দেখে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন বলেছেন—শিশুমনের সঙ্গে নিবিড় একাত্মতা অনুভব করে তাকে ধাপে ধাপে ভাষা শেখাবার চমৎকার ব্যবস্থা। বিদ্যেসাগর মশায়ের মতো পাকা শিক্ষকেরই উপযুক্ত কাজ। ভাষা শিক্ষানবীশদের জ্ঞানের স্তরভেদ, বর্ণ ও বাক্যবিন্যাস—যথাযথ এর মধ্যে করা হয়েছে।[৩০]

১৮৫৫ সালের জুনে প্রকাশিত 'বর্ণপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগে'র 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

"বালকদিগের সংযুক্তবর্ণপরিচয় এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সংযুক্তবর্ণের উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ আছে, শিক্ষক মহাশয়েরা বালকদিগকে উহাদের বর্ণবিভাগ মাত্র শিখাইবেন, অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না। বর্ণ-বিভাগের সঙ্গে অর্থ শিখাইতে গেলে, গুরু শিষ্য উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক, এবং শিক্ষাবিষয়েও আনুষঙ্গিক অনেক দোষ ঘটিবেক।

ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণবিভাগ শিক্ষা করিতে গেলে, অতিশয় নীরস বোধ হইবেক ও বিরক্তি জন্মিবেক, এজন্য মধ্যে মধ্যে এক একটি পাঠ দেওয়া গিয়াছে। অল্পবয়স্ক বালকদিগের সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয়, এরূপ বিষয় লইয়া ঐ সকল পাঠ অতি সরল ভাষায় সংকলিত হইয়াছে। শিক্ষক মহাশয়েরা উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য্য স্ব স্ব ছাত্রদিগের হৃদয়ংগম করিয়া দিবেন।"

বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়—দ্বিতীয় ভাগ' থেকে 'চুরি করা কদাচ উচিত নয়' নামে একটি রচনা তুলে দিচ্ছি :

"না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। যে চুরি করে, তাহাকে চোর বলে। চোরকে কেহ বিশ্বাস করে না। চুরি করিয়া ধরা পড়িলে, চোরের দুর্গতির সীমা থাকে না। বালকগণের উচিত, কখনও চুরি না করে। পিতা মাতা প্রভৃতির কর্ত্তব্য, পুত্র প্রভৃতিকে কাহারও কোনও দ্রব্য চুরি করিতে দেখিলে, তাহাদের শাসন করেন এবং চুরি করিলে কি দোষ হয়, তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন।

একদা, একটি বালক, বিদ্যালয় হইতে, অন্য এক বালকের এক খানি পুস্তক চুরি করিয়া আনিয়াছিল। অতি শৈশব কালে, ঐ বালকের পিতা মাতার মৃত্যু হয়। তাহার মাসী লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি, তাহার হস্তে ঐ পুস্তক খানি দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, ভুবন! তুমি এই পুস্তক কোথায় পাইলে। সে কহিল, বিদ্যালয়ের এক বালকের পুস্তক। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভুবন ঐ পুস্তক খানি চুরি করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু তিনি পুস্তক ফিরিয়া দিতে বলিলেন না, এবং ভুবনের শাসন, বা ভুবনকে চুরি করিতে নিষেধ, করিলেন না।

ইহাতে ভুবনের সাহস বাড়িয়া গেল। যত দিন বিদ্যালয়ে ছিল, সুযোগ পাইলেই, চুরি করিত। এইরূপে, ক্রমে ক্রমে সে বিলক্ষণ চোর হইয়া উঠিল।

সকলেই জানিতে পারিল, ভুবন বড় চোর হইয়াছে। কাহারও কোনও দ্রব্য হারাইলে, সকলে তাহাকেই সন্দেহ করিত। যদি ভুবন অন্য লোকের বাটীতে যাইত, পাছে সে কিছু চুরি করে, এই ভয়ে তাহারা অত্যন্ত সতর্ক হইত, এবং যথোচিত তিরস্কার ও প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া, তাহাকে তাড়াইয়া দিত।

কিছু কাল পরে, ভুবন চোর বলিয়া ধরা পড়িল। সে বহু কাল চোর হইয়াছে এবং অনেকের অনেক দ্রব্য চুরি করিয়াছে, তাহা প্রমাণ হইল। বিচার-কর্ত্তা ভুবনের ফাঁসির আজ্ঞা দিলেন। তখন ভুবনের চৈতন্য হইল। যে স্থানে অপরাধীদের ফাঁসী হয়, তথায় লইয়া গেলে পর, ভুবন রাজপুরুষদিগকে কহিল, তোমরা দয়া করিয়া, এ জন্মের মত, এক বার আমার মাসীর সঙ্গে দেখা করাও।

ভুবনের মাসী ঐ স্থানে আনীত হইলেন এবং ভুবনকে দেখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে, তাহার নিকটে গেলেন। ভুবন কহিল, মাসি! এখন আর কাঁদিলে কি হইবে। নিকটে এস, কানে কানে তোমায় একটি কথা বলিব। মাসী নিকটে গেলে পর, ভুবন তাঁহার কানের নিকটে মুখ লইয়া গেল এবং জোরে কামড়াইয়া, দাঁত দিয়া তাঁহার একটী কান কাটিয়া লইল। পরে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, মাসি! তুমিই আমার এই ফাঁসির কারণ। যখন আমি প্রথম চুরি করিয়াছিলাম, তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। সে সময়ে যদি তুমি শাসন ও নিবারণ করিতে, তাহা হইলে আমার এ দশা ঘটিত না। তাহা কর নাই, এজন্য তোমার এই পুরস্কার হইল।"*

১৮৫৬ সালের ফেব্রুআরিতে বিদ্যাসাগরের 'কথামালা' বেরল। বিদ্যাসাগর বিদেশী কয়েকটি নীতিগর্ভ গল্পের অনুবাদ করেছেন; 'কথামালা' সেই অনুবাদের সঙ্কলন।

'কথামালা' থেকে 'বৃদ্ধা নারী ও চিকিৎসক' নামে একটি গল্প তুলে দিচ্ছি :

"এক বৃদ্ধা নারীর চক্ষু নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া গিয়াছিল; এজন্য, তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেন না। নিকটে এক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। বৃদ্ধা তাঁহার নিকটে গিয়া কহিলেন, কবিরাজ মহাশয়! আমার চক্ষুর দোষ জন্মিয়াছে, আমি কিছুই দেখিতে পাই না; আপনি আমার চক্ষু ভাল করিয়া দেন; আমি আপনাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিব; কিন্তু, ভাল করিতে না পারিলে, আপনি কিছুই পাইবেন না।

চিকিৎসক, বৃদ্ধার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, পর দিন, প্রাতঃকালে, তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধার গৃহ নানাবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ দেখিয়া, চিকিৎসকের অতিশয় লোভ জন্মিল। তিনি স্থির করিলেন, প্রতিদিন, ইহাকে দেখিতে আসিব, এবং এক একটি দ্রব্য লইয়া যাইব। এজন্য, যাহাতে শীঘ্র তাহার পীড়ার শান্তি হইতে পারে, সেরূপ ঔষধ না দিয়া, কিছুদিন গোলমাল করিয়া কাটাইলেন। পরে, একে একে সমস্ত দ্রব্য লইয়া গিয়া, তিনি রীতিমত ঔষধ দিতে আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধার চক্ষু, অল্প দিনেই, পূর্ব্ববৎ, নির্দ্দোষ হইল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার গৃহে যে নানাবিধ দ্রব্য ছিল, তাহার একটিও

* এই রচনাটি সম্পর্কে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "এটিকে আমরা যথার্থ ছোট গল্পও বলতে পারি।...ভুবনের গল্প বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা নয়। এটি টমাস জেমস্ অনূদিত AESOP'S FABLES-এর অন্তর্গত 'The Thief and His Mother'-গল্পের প্রায় স্বচ্ছন্দ অনুবাদ।" (দেবকুমার বসু সম্পাদিত : বিদ্যাসাগর রচনাবলী; দ্বিতীয় খণ্ড : কলকাতা, ১৯৬৬, ভূমিকা পৃ. ৩৫।)

নাই; অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলেন, চিকিৎসক, একে একে, সমুদয় লইয়া গিয়াছেন।

এক দিন, চিকিৎসক বৃদ্ধাকে কহিলেন, আমার চিকিৎসায় তোমার পীড়ার শান্তি হইয়াছে। পীড়ার শান্তি হইলে, আমায় পুরস্কার দিবে, বলিয়াছিলে; এক্ষণে, প্রতিশ্রুত পুরস্কার দিয়া, সন্তুষ্ট করিয়া, আমায় বিদায় কর। বৃদ্ধা, চিকিৎসকের আচরণে, অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; এজন্য, কোনও উত্তর দিলেন না। চিকিৎসক, বারংবার চাহিয়াও, পুরস্কার না পাইয়া, বৃদ্ধার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ করিলেন। বৃদ্ধা বিচারকদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; এবং, চিকিৎসককে স্পষ্ট বাক্যে চোর না বলিয়া, কৌশল করিয়া বলিলেন, কবিরাজ মহাশয় যাহা কহিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে। আমি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, যদি আমার চক্ষু পূর্ব্ববৎ হয়, কোনও দোষ না থাকে, তবে উঁহাকে পুরস্কার দিব। উনি কহিতেছেন, আমার চক্ষু নির্দ্দোষ হইয়াছে; কিন্তু, আমি যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে আমার চক্ষু এখনও নির্দ্দোষ হয় নাই। কারণ, যখন আমার চক্ষুর দোষ জন্মে নাই, আমার গৃহে যে নানাবিধ দ্রব্য ছিল, সে সমস্ত দেখিতে পাইতাম। পরে, চক্ষুর দোষ জন্মিলে, সে সকল দেখিতে পাই নাই; এখনও, সে সব দেখিতে পাইতেছি না। ইহাতে, উঁহার চিকিৎসায়, আমার চক্ষু নির্দ্দোষ হইয়াছে, আমার সেরূপ বোধ হইতেছে না। এক্ষণে, আপনাদের বিচারে, যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন।

বিচারকেরা, বৃদ্ধার উত্তরবাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া, হাস্যমুখে, তাঁহাকে বিদায় দিলেন, এবং, যথোচিত তিরস্কার করিয়া, চিকিৎসককে, বিচারালয় হইতে, চলিয়া যাইতে বলিলেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন দুঃখ করে প্রিয়নাথ সিংহকে বললেন—দেশের মহা দুর্গতি হয়েছে, কিছু কর্ রে। ছোটছেলেদের পড়বার উপযুক্ত একখানাও কেতাব নেই।

প্রিয়নাথ বললেন—বিদ্যাসাগর মশায়ের তো অনেকগুলি বই আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ উঁচুগলায় হেসে উঠলেন। বললেন—'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ,' 'গোপাল অতি সুবোধ বালক'—ওতে কোন কাজ হবে না। ওতে মন্দ বই ভালো হবে না।[৩১]

স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের মুখ থেকে নির্গত হলেও বিদ্যাসাগরের রচনা সম্পর্কে এই উক্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষাযোগ্য। স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া বিদ্যাসাগরের রচনা সম্পর্কে এরকম অশ্রদ্ধেয় উক্তি আর কেউ উচ্চারণ করেননি।

কিন্তু, মনে রাখা দরকার, বিদ্যাসাগরের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের বিপুল শ্রদ্ধা। সিস্টার নিবেদিতা লিখেছেন :

"After Ramakrishna, I follow Vidyasagar!" he (Swami Vivekananda) exclaimed, only two days before his death, and out came the oft-repeated story of the wooden sandals coming pitter patter with the chudder and Dhoti, into the Viceregal Council Chamber, and the surprised "But if you didn't want me, why did you ask me to come?" of the old Pundit, when they remonstrated. [৩২]

তেইশ

১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে বিদ্যাসাগরের 'চরিতাবলী' বেরল। 'চরিতাবলী' সম্পর্কে বিদ্যাসাগর লিখেছেন: "সংক্ষেপে, সরল ভাষায়, কতকগুলি মহানুভাবের বৃত্তান্ত সংকলিত হইল। যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলে, বালকদিগের লেখা পড়ায় অনুরাগ জন্মিতে ও উৎসাহবৃদ্ধি হইতে পারে, এই পুস্তকে তদ্রূপ বৃত্তান্ত মাত্র সংকলিত হইয়াছে।"

বিদ্যাসাগরের 'চরিতাবলী'তে ডুবাল, উইলিয়ম রস্কো, হীন, জিরম ষ্টোন, হণ্টর, সিমসন, উইলিয়ম হটন, ওগিলবি, লীডন, জেঙ্কিন্স, উইলিয়ম গিফোর্ড, উইঙ্কিলমন, উইলিয়ম পষ্টেলস, এড্রিয়ন, প্রিডো, ডাক্তর এডাম, লমনসফ, মেডক্স, লণ্ডোমণ্টেস ও রেমসের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত সংকলিত। সকলেই বিদেশী।

বিদ্যাসাগরকে স্বদেশীয় মানুষদের জীবনী লেখার অনুরোধ করেছেন আনন্দকৃষ্ণ বসু। আনন্দকৃষ্ণের অনুরোধে বিদ্যাসাগর রাজি হয়েছেন। সে-বিষয়ে বিদ্যাসাগর একবার বিশেষ উদ্যোগও করেছেন। নতুন জীবনচরিত লেখার জন্য বিদ্যাসাগরকে অনেক বই যোগাড় করে দিয়েছেন ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু।[১]

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "বিদ্যাসাগর মহাশয় গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। গুণের আদর করিতে কখনও কৃপণতা প্রকাশ করিতেন না। বহুকাল হইতে তিনি °মতিলাল শীলের গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। °দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিবিধ গুণের উল্লেখ করিয়া কত সময়ে আমাদের নিকট তাঁহার পৌরুষ ও প্রতিষ্ঠাবিষয়ক আখ্যায়িকার বর্ণন করিতেন। তিনি এই দুই মহাত্মার দুইখানি জীবনচরিত লিখিবার মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, তাঁহার সে ইচ্ছাও পূর্ণ হয় নাই।"[২]

কালীময় ঘটক 'চরিতাষ্টক' লিখেছেন। 'চরিতাষ্টকে' একাধিক বাঙালীর চরিতকথা আছে। যতদূর জানা যাচ্ছে, স্বদেশী মানুষের চরিতকথা বাঙলাদেশে কালীময় ঘটকই প্রথম রচনা করেছেন।

'চরিতাষ্টকে'র ভাষা ও উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে বিদ্যাসাগর বলেছেন—কালীময়, তুমি আমার অনেক শ্রম বাঁচিয়েছ। দেশীয় মানুষদের জীবনী সংগ্রহের ক্লেশ, মনে করেই আমি বিদেশী পুরুষ নিয়ে চরিতাবলী লিখেছি। তোমার অধ্যবসায় ও পরিশ্রম মনে করে যেমন সুখ পাচ্ছি তেমনি অবাকও হয়েছি।[৩]

'A vocabulary of all the words occurring in the text of the charitabali of Isvarachandra Vidyasagara' ১৮৮৩ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইয়ের লেখকের নাম: James Fuller Blumhardt.

এই বইয়ের ভূমিকায় Blumhardt লিখেছেন: "I have been particularly careful throughout, as far as possible, to give such significations *only* as are exact English equivalents for the Bengali words *as they occur in the charitabali*, excluding all others which may be noticed in the dictionaries, and which would only tend to confuse or perplex the student. . . ."

মহাভারতের অংশবিশেষ বিদ্যাসাগর সংস্কৃত থেকে বাঙলায় অনুবাদ করেছেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় সেই অনুবাদ বেরিয়েছে। সম্পাদক ১৭৭১ শকের শ্রাবণে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন : "...শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাভারতের বাঙ্গলা অনুবাদ দ্বারা পত্রিকাকে অলঙ্কৃতা করিতেছেন...।" বই বেরল ১৮৬০ সালের জানুআরিতে।

বিদ্যাসাগরের 'মহাভারত (উপক্রমণিকাভাগ)' থেকে একটুখানি তুলে দিচ্ছি :

"ভরতবংশীয়দিগের মহৎ জন্মবিবরণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইহার নাম মহাভারত; যিনি মহাভারত শব্দের এই ব্যুৎপত্তি অবগত হয়েন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। এই ভারতে ভরতবংশীয়দিগের বিচিত্র চরিত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা পাঠ করিলে মনুষ্যেরা মহাপাপ হইতে মুক্ত হয়।... এই পরম পবিত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস শ্রবণে যাদৃশ সুখ ও সন্তোষ লাভ হয়, মনুষ্য স্বর্গলাভেও তাদৃশ সুখ ও সন্তোষের অধিকারী হইতে পারে না। যে সকল পুণ্যশীল লোক এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করেন, এবং শ্রবণ করান, তাঁহাদিগের রাজসূয় ও অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। যেমন সমুদ্র ও সুমেরু রত্ননিধি বলিয়া বিখ্যাত, এই ভারতও সেইরূপ রত্ননিধি।"

মহাভারতের কেবলমাত্র একটি অংশের অনুবাদ করেছেন বিদ্যাসাগর, সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করেননি। যে-মুহূর্তে শুনলেন, কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারত অনুবাদ করতে আরম্ভ করেছেন, বিদ্যাসাগর মহাভারতের অনুবাদে ক্ষান্ত হলেন। এবং কালীপ্রসন্নকে সাহায্য করলেন।

১৮৬৬ সালের ১৩-আগস্ট 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখেছে : ". . . About ten years ago Pundit Eswar Chunder Vidyasaghur began to translate the Mahavaratha into Bengallee, and the first few instalments were published in the *Tuttobodhinee Puttrica,* of which he was then one of the directors. But owing to diverse engagements he could not proceed with the translation with the desired despatch, and he readily consented to withdraw when Baboo Kaliprossunno Sing expressed a desire to undertake this gigantic work. . . ."

এ-বিষয়ে কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখেছেন : "আমার অদ্বিতীয়সহায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং মহাভারতের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং অনুবাদিত প্রস্তাবের কিয়দংশ কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের অধীনস্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রচারিত ও কিয়দ্ভাগ পুস্তকাকারেও মুদ্রিত করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি মহাভারতের অনুবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি শুনিয়া, তিনি কৃপাপরবশ হইয়া সরলহৃদয়ে মহাভারতানুবাদে ক্ষান্ত হন। বাস্তবিক বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদে ক্ষান্ত না হইলে আমার অনুবাদ হইয়া উঠিত না। তিনি কেবল অনুবাদেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, অবকাশানুসারে আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন ও সময়ে সময়ে কার্য্যোপলক্ষে যখন আমি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিতাম, তখন স্বয়ং আসিয়া আমার মুদ্রাযন্ত্রের ও ভারতানুবাদের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন। ফলতঃ বিবিধ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পাঠ্যাবস্থাবধি

আমি যে কত প্রকারে উপকৃত হইয়াছি, তাহা বাক্য বা লেখনী দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না।"[৪]

বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'* বেরিয়েছে ১৮৬০ সালের এপ্রিলে। 'সীতার বনবাস' সম্পর্কে বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ভবভূতিপ্রণীত উত্তরচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত; অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ সকল পুস্তকবিশেষ হইতে পরিগৃহীত নহে, রামায়ণের উত্তর কাণ্ড অবলম্বন পূর্ব্বক সংকলিত হইয়াছে।..."

'সীতার বনবাস' থেকে একটুখানি তুলে দিচ্ছি :

"এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে।"

১৮৬২ সালের ১২-মে 'শুভকরী' পত্রিকা লিখেছে :

"বিদ্যাসাগর মহাশয় 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া ভাষার কত শ্রীবৃদ্ধি সাধনই করিয়াছেন! তাঁহার রচনা-শক্তির পরিচয় আর অধিক কি দিব; এক কথা বলিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে বিদ্যাসাগর প্রণীত গ্রন্থ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে অনেকে বাঙ্গালা পুস্তক অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্তই হইতেন না।...

বিদ্যাসাগর মহাশয় পীড়িত ও নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও মধ্যে মধ্যে সুমধুর ও হিতকর গ্রন্থ রচনা করিতেছেন।..."

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম-প্রথম বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলেছেন— He is only a Primer-maker (তিনি খানকতক ছেলেদের বই লিখেছেন বই ত নয়)।[৫]

বঙ্কিমচন্দ্র এককালে বলেছেন—বিদ্যাসাগর বড়ো বড়ো সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করে বাঙলা ভাষার ধাতটা গোড়ায় খারাপ করে গেছেন।[৬]

বঙ্কিমচন্দ্র এককালে বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'কে বলেছেন—কান্নার জোলাপ।[৭]

রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছেন : "বিদ্যাসাগর-রচিত সীতার বনবাসকে অনেকে "কান্নার জোলাপ" কহে। ঐ পুস্তকের প্রথমাংশ ভবভূতিপ্রণীত উত্তরচরিতের প্রায় অবিকল অনুবাদ, কিন্তু অপর সমুদয়ভাগ কেবল নূতনরূপ রচনাই নহে, উহাতে যে কি মধুর, কি চমৎকারজনক ও কি অলৌকিক কাণ্ড সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনীয় নহে। বোধ হয় উহাতে এমত একটি পৃষ্ঠাও নাই, যাহা পাঠ করিতে পাষাণেরও হৃদয় দ্রব না হয়। করুণরসের উদ্দীপনে বিদ্যাসাগরের যে, কি অদ্ভুত শক্তি আছে, তাহা এক সীতার বনবাসেই পর্য্যাপ্তরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহাহউক, আমরা ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া তৎকালে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, বিদ্যাসাগরের লেখনীই মধুময়ী; উহা হইতে যাহা কিছু নির্গত হয়, তাহাই মধুবর্ষী হইয়া পড়ে। বলিতে কি, সীতার বনবাস

* বিহারীলাল সরকার লিখেছেন : "বিদ্যাসাগর মহাশয় চারি দিনে "সীতার বনবাস" লিখিয়া সমাপ্ত করেন। দিবাভাগে নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, তিনি লিখিবার অবসর পাইতেন না। রাত্রি ২॥০ (আড়াইটার) সময় হইতে পর দিন বেলা ১০ (দশটা) পর্য্যন্ত লিখিতেন।" (বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩৩০।)

পাঠাবসানে বিদ্যাসাগরকে ঐরূপ কার্য্যে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত তাঁর স্ব-নামাঙ্কিত একটি স্বর্ণময়ী লেখনী সোমপ্রকাশ-সম্পাদকদ্বারা অপ্রকাশ্যভাবে উপহার দিবার জন্য আমাদের বড়ই অভিলাষ হইয়াছিল; লেখনী নির্ম্মাণ করাইবার জন্য অনেক চেষ্টাও করিয়াছিলাম; কিন্তু নানাকারণে তৎকালে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই—ভাবিয়াছিলাম, অপর কোন সুযোগে উহা প্রদান করিব। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এপর্য্যন্ত তেমন সুযোগ আর ঘটিয়া উঠিল না!"[৮]

'সীতার বনবাস' সম্পর্কে R. W. Frazer লিখেছেন : "...showed how Bengali had become a classic prose language, with all the flexibility, dignity, and grace requisite for the purpose of interpreting to the mass of the people the old life-history of the nation, and the new phase of thought introduced from the West."[৯]

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর তাঁর 'সীতার বনবাসে'র ইংরেজি অনুবাদ ১৯০৪ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজি অনুবাদের নাম : Exile of Sita। অনুবাদ করেছেন H. Jane Harding।[১০]

'The Exile of Sita'-র ভূমিকায় H. Jane Harding লিখেছেন :

"My attention was first drawn to the subject of translating into English some account of the heroines of Hindu writers by the Revd. James Long; some time afterwards I met with this tale—"Sita's Exile" in the elegant Bengali of Iswarachundra Vidyasagara and thought that if I translated anything about Sita it should be this. I commenced and have finished my undertaking. . . Whilst endeavouring to give a faithful translation of the original I have rather softened in some places the terms of excessive weeping, it is not fair to make what is pathos in one language, bathos in another. The translation of the sixth chapter is slightly free-er than that of the others. . .

It is perhaps as well to say that the learned Pundit Vidyasagara, having heard through mine, of my translation, requested permission to see it, and as far as I remembered found no fault with it."

১৮৮৮ কি ১৮৮৯ সালের একদিনের কথা। বৃন্দাবন মল্লিকের লেনে বিদ্যাসাগরের বাড়ির উত্তর দিকে দোতলায় তিনটি ঘর; পশ্চিমের ঘরে বিদ্যাসাগর একা বসে আছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখা করতে এলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে।

সাহিত্যের কথা উঠল—বঙ্কিমচন্দ্র বেশি সংস্কৃত লেখেন? না, বিদ্যাসাগর বেশি সংস্কৃত লেখেন?

সেদিনের আলাপ-আলোচনার কথা উত্তরকালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সবিস্তারে লিখেছেন :

"বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—বারাসতে কালীকৃষ্ণ মিত্রের বাড়ি একদিন এই কথা উঠিয়াছিল। তাহার পর বলিলেন—ছাপাখানায় 'এম্' কা'কে বলে তুই

জানিস্? আমি বলিলাম—না। তিনি আমাকে 'এম্' বুঝাইয়া দিলেন। তারপর বলিলেন—কালীকৃষ্ণ মিত্র বঙ্কিমের একখানা ও আমার একখানা বই আনিলেন। আমার বইয়ে যতগুলো 'এম্' ছিল বঙ্কিমের বইয়েরও ততগুলো 'এম্' লইলেন। তাহার পর কথা গণিতে লাগিলেন। আমার সেইটুকুতে ৫৫টা সংস্কৃত কথা ছিল, আর বঙ্কিমের ৬৫টা। আমি কালীকৃষ্ণবাবুকে দেখাইয়া দিলাম—এই ত, কার সংস্কৃত বেশী দেখ; তার ওপর আমি সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করিয়াছি, আর উনি অসংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। দেখিলাম বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু বিচলিত হইয়াছেন। কথাটা চাপা দিবার জন্য আমি বলিলাম—চলিত ভাষায় বই লেখা কি আপনার মত নয়? তিনি বলিলেন—ভাষাটা ত মার্জ্জিত হওয়া চাই।...*"[১১]

আরেককালে বিদ্যাসাগরের ভাষা সম্পর্কে অন্য কথাও বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বলেছেন—বিদ্যাসাগর মশায়ের রচিত ও গঠিত বাঙলা ভাষাই আমাদের মূলধন। তাঁরই উপার্জিত সম্পত্তি নিয়ে নাড়াচাড়া করছি।[১২] বঙ্কিমচন্দ্রই লিখেছেন : "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।"[১৩]

১৮৮২ সালে 'সীতার বনবাস' নামে গিরিশচন্দ্র ঘোষের একখানা নাটক বেরিয়েছে। সেখানা গিরিশচন্দ্র উৎসর্গ করেছেন বিদ্যাসাগরকে। সেই 'সীতার বনবাসে'র উৎসর্গপত্র থেকে তুলে দিচ্ছি :

"পূজনীয় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্রীচরণেষু—

গুরুদেব দীননাথ!

মাতৃভাষা জানি না বলা, ভাল নয়—মন্দ, মহাশয়ের "বেতাল" পাঠে বুঝিলাম। আচার্য্য! আমার পরীক্ষা গ্রহণ করুন। আমি চিরদিন মহাশয়কে মনে মনে বন্দনা করি।

সেবক—শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।"

বাগবাজার, কলিকাতা। মাঘ, ১২৮৮।

গিরিশচন্দ্রের 'সীতার বনবাসে'র অভিনয় হল ন্যাশনাল থিয়েটারে। গিরিশচন্দ্র 'সীতার বনবাসে'র অভিনয় দেখতে অনুরোধ করেছেন বিদ্যাসাগরকে। কিন্তু বিদ্যাসাগর সেই অনুরোধ রাখতে পারেননি।

বিদ্যাসাগরের অভিনয় দেখা নিয়ে একটা গল্প আছে।

'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় হচ্ছে। স্বনামধন্য অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী উডসাহেব সেজেছেন। সেদিন বিদ্যাসাগর 'নীলদর্পণ' দেখতে এসেছেন। অত্যাচারী উডসাহেবের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয় এমন নিপুণ হল যে বিদ্যাসাগর স্থানকালপাত্র ভুলে গেলেন। পায়ের চটি তিনি ছুঁড়ে মারলেন উডসাহেবরূপী অর্ধেন্দুশেখরের গায়ে। অর্ধেন্দুশেখর মহানন্দে বিদ্যাসাগরের পায়ের চটি মাথায় তুলে নিলেন।

---

* কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন : "বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বঙ্কিমের লিখা পছন্দ করিতেন না, তাহা আপামর সাধারণ সকলেই জানেন।" (বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, 'আর্য্যাবর্ত্ত', মাঘ, ১৩২০, পৃ. ৯০৪।)

কিন্তু এটি নিছক গল্প। সত্য নয়, কিংবদন্তী। ঘটনা নয়, রটনা। এই রটনার মূলে বিন্দুমাত্র সত্য নেই।[১৪]

১৮৬৩ সালের নভেম্বরে বিদ্যাসাগরের 'আখ্যানমঞ্জরী' নামে একখানা বই বেরল। কয়েক বছর পর সেই 'আখ্যানমঞ্জরী' দু-ভাগ হয়ে গেল। প্রথমবারের 'আখ্যানমঞ্জরী'র ছটি আখ্যানের সঙ্গে কয়েকটি নতুন আখ্যান জুড়ে বিদ্যাসাগর 'আখ্যানমঞ্জরী, প্রথম ভাগ' বের করলেন; আর প্রথমবারের 'আখ্যানমঞ্জরী'র বাকি আখ্যানগুলোর সঙ্গে সাতটি নতুন আখ্যান জুড়ে বের করলেন 'আখ্যানমঞ্জরী, দ্বিতীয় ভাগ'।

কিন্তু ১৮৮৮ সালের জুনমাসে 'আখ্যানমঞ্জরী, দ্বিতীয় ভাগ' নামে আবার আরেকখানা বই বের করলেন বিদ্যাসাগর। আগের 'আখ্যানমঞ্জরী, দ্বিতীয় ভাগে'র সঙ্গে এই নতুন 'আখ্যানমঞ্জরী, দ্বিতীয় ভাগে'র নামে ছাড়া আর কোথাও মিল নেই। তাহলে আগের 'আখ্যানমঞ্জরী, দ্বিতীয় ভাগে'র কী দশা হবে? বিদ্যাসাগর 'বিজ্ঞাপনে' জানালেন : "এই পুস্তকের যে ভাগ, ইতঃপূর্ব্বে দ্বিতীয় ভাগ বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহা অতঃপর তৃতীয় ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইবেক।"

বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "আখ্যানমঞ্জরী পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে, কতিপয় ইংগরেজী পুস্তক অবলম্বনপূর্ব্বক সংকলিত হইল।"

১৮৬৪ সালে বিদ্যাসাগর 'শব্দমঞ্জরী' নামে একখানা বাঙলা অভিধান বের করেছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বিদ্যাসাগর-গ্রন্থসংগ্রহে একখণ্ড 'শব্দমঞ্জরী' আছে। সেখানায় আখ্যাপত্র নেই; 'নিবৃত্তি' পর্যন্ত শব্দ আছে। খুব সম্ভব অভিধানখানা বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ করেননি।

'শব্দমঞ্জরী' থেকে কয়েকটি উদাহরণ :

"অকণ্টক, (অ-কণ্টক) বিং কণ্টকহীন,
যেখানে কণ্টক নাই, যথা অকণ্টক
পথ। নির্ব্বিঘ্ন, নিরাপদ, নিরুপদ্রব,
যথা অকণ্টক রাজ্যভোগ, গ্রাম
অকণ্টক হইয়াছে।" ('শব্দমঞ্জরী', পৃষ্ঠা ১)

"আত্মবিস্মৃত, (আত্মন্-বিস্মৃত) বিং
যে আপনাকে বিস্মৃত হইয়াছে,
যে আপনার গুণ দোষ ক্ষমতা
বা অবস্থা বুঝিতে পারে না।" ('শব্দমঞ্জরী', পৃষ্ঠা ৬৯)

"ঈশ্বর, (ঈশ্ প্রভুত্ব করা) বিং ঈশ,
প্রভু, স্বামী, অধিপতি। সং
জগৎকর্ত্তা, জগদীশ্বর, পরমেশ্বর।" ('শব্দমঞ্জরী', পৃষ্ঠা ৮৯)

"কোজাগর, (কঃ কে—জাগৃ জাগরণ করা)
আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা। লক্ষ্মী বলেন আজি

নিদ্রাবেশ হইলে প্রহার করিয়া সজাগর করিয়া দেন; বসিয়া থাকিলে প্রহার করিয়া উঠাইয়া দেন; কোনও কাজে পাঠাইতে হইলে প্রহার করিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া দেন; কার্যসমাধা করিয়া বাটীতে আসিলে প্রহার করিয়া আমার সংবর্দ্ধনা করেন; কথায় কথায় কান ধরিয়া টানেন, তাহাতেই আমার কান এত লম্বা হইয়াছে। বলিতে কি মহাশয়! কেহ কখনও এমন গুণের মনিব ও এমন সুখের চাকরি পাইবেক না; আমি ইঁহার আশ্রয়ে পরম সুখে কাল কাটাইতেছি।"

১৮৭২ সালে 'দ্বাদশ কবিতা' নামে দীনবন্ধু মিত্রের একখানা কবিতার বই বেরল। সে-বই দীনবন্ধু বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করে লিখেছেন : "আপনি বর্ত্তমান বঙ্গভাষার জনক, বঙ্গভাষা আপনার তনয়া।"

১৮৭৬ সালের নভেম্বরে দীনবন্ধুর আরেকখানা কবিতার বই বেরল—সুরধনী কাব্য : দ্বিতীয় ভাগ। সেখান থেকে দীনবন্ধুর লেখা বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কয়েকটি লাইন তুলে দিচ্ছি :

"বিদ্যার সাগর বিদ্যাসাগর প্রবর,
দীনজন-লালন-পালন-তৎপর,
মাতৃভক্তি ভরা চিত্ত, কাছে গিয়ে মার
অদ্যাপি শিশুর মত করে আবদার;
বিধবা-বিবাহ বিধি যুক্তির বিচার,
খণ্ডাতে পারেনি কেহ শাস্ত্রমত তার;
অমিয়া-লহরী-যুত রচনা-নিচয়,
ললিত-মালতীমালা-কোমলতাময়,
সাহিত্য-সহজ-পথ উপক্রমণিকা,
পড়িয়া পণ্ডিত কত বালক বালিকা;
সংস্কৃত কালেজ যাঁর যতন কৌশলে,
লভিয়াছে এত যশঃ মানবমণ্ডলে;
দেশ-অনুরাগ-স্রোতঃ বহিছে হৃদয়ে,
'বেঁচে থাক বিদ্যাসিন্ধু চিরজীবী হয়ে।'..."

দীনবন্ধু মিত্রকে খুব ভালোবাসতেন বিদ্যাসাগর। ১৮৭৩ সালের ১-নভেম্বর দীনবন্ধু ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। দীনবন্ধুর মৃত্যুর পরেও বিদ্যাসাগর দীনবন্ধুর সংসারের খোঁজ-খবর নিয়েছেন সবসময়, দীনবন্ধুর স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছেন দুঃসময়ে, সাহায্য করেছেন।

মধুসূদন শর্মা 'বামনাখ্যানম্' লিখেছেন। একশো-সতেরোটি শ্লোক লিখেছেন সংস্কৃতে।

কেউ-কেউ মধুসূদনকে বাঙলা অনুবাদ সমেত সংস্কৃত শ্লোকগুলো ছাপিয়ে দিতে বললেন। বাঙলা অনুবাদের জন্য মধুসূদন এলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগর শ্লোকগুলোর বাঙলা অনুবাদ করে দিলেন; এবং নিজেই টাকা-পয়সা খরচ করে মধুসূদনের 'বামনাখ্যানম্' ছাপিয়ে দিলেন। ১৮৭৩ সালের কথা।

রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছেন : "কেহ কেহ কহেন বিদ্যাসাগরের বাঙ্গালা-রচনানৈপুণ্য বিষয়ে অদ্বিতীয়তা জন্মিয়াছে সত্য, কিন্তু বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনীশক্তি বা মৌলিকতা (originality) নাই—অর্থাৎ বিদ্যাসাগর অনুবাদ

ভিন্ন মূলগ্রন্থ রচনা করিতে পারেন না। বিদ্যাসাগর রচিত যে সকল পুস্তকের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই কোন না কোন পুস্তকের অনুবাদ, মূলগ্রন্থ তাহাদের মধ্যে অল্পই আছে, এ কথা অযথার্থ নহে। কিন্তু এস্থলে ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, বিদ্যাসাগরের রচনাপ্রণালীর প্রাদুর্ভাবের সময়ই বাঙ্গালাভাষার পক্ষে অন্ধকারাবস্থা হইতে আলোকে প্রবিষ্ট হইবার প্রায় প্রথম উদ্যমকাল; ঐরূপ কালে সকল ভাষাতেই মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদগ্রন্থই অধিক হইয়া থাকে, ইহা এক সাধারণ নিয়ম। বিদ্যাসাগর সে নিয়মের অনধীন হইতে পারেন নাই—সুতরাং তাঁহাকে মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদগ্রন্থই অধিক করিতে হইয়াছে। কিন্তু যিনি উপক্রমণিকা, কৌমুদী, বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত ১ম ও ২য় পুস্তক, সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যবিষয়কপ্রস্তাব, সীতার বনবাস ও বহুবিবাহবিচার রচনা করিয়াছেন, তাঁহাকে মূলরচনা করিবার শক্তিবিহীন বলা নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্য্য হয়।”[১৮]

১৮১৩ শকাব্দের ভাদ্রমাসে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লিখেছে : “বিদ্যাসাগর বঙ্গভাষার পিতা। রাজা রামমোহন রায় অবশ্য বাঙ্গলায় গদ্য রচনার প্রথম সূত্রপাত করিয়া যান কিন্তু বিদ্যাসাগরের হস্তে ইহা নবজীবনে উত্থিত হয়। এখন যে ভাষার এতদূর উন্নতি হইয়াছে বিদ্যাসাগরই তাহার মূল। তিনি যে সমস্ত পুস্তক প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন বঙ্গের শিশু হইতে বৃদ্ধটী পর্য্যন্ত তদ্দ্বারা উপকার পাইতেছে।”

প্রত্যেক ভাষারই একটি নিজস্ব মর্যাদা আছে। এই সত্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে বাঙলাভাষার মূর্তি নির্মাণের সময় বিদ্যাসাগর বাঙলাভাষার মর্যাদা রক্ষার প্রতি উদাসীন থাকেননি। বাঙলা ১৩৪৬ সনের ১২-অগ্রহায়ণ রবীন্দ্রনাথ যথার্থ লিখেছেন : “সংস্কৃত শাস্ত্রে বিদ্যাসাগরের ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। এইজন্য বাংলাভাষার নির্মাণকার্যে সংস্কৃতভাষার ভাণ্ডার থেকে তিনি যথোচিত উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু উপকরণের ব্যবহারে তাঁর শিল্পীজনোচিত বেদনাবোধ ছিল। তাই তাঁর আহরিত সংস্কৃত শব্দের সব-গুলিই বাংলাভাষা সহজে গ্রহণ করেছে, আজ পর্যন্ত তার কোনোটিই অপ্রচলিত হয়ে যায় নি। বস্তুত পাণ্ডিত্য উদ্ধত হয়ে উঠে তাঁর সৃষ্টিকার্যের ব্যাঘাত করতে পারে নি। এতেই তাঁর ক্ষমতার বিশেষ গৌরব। তিনি বাংলাভাষার মূর্তি নির্মাণের সময় মর্যাদারক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন।”[১৯]

১৮৮৮ সালের এপ্রিলে 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস' নামে বিদ্যাসাগরের একখানা বই বেরল।

'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াসে'র কথা বলতে হলে আরম্ভ করতে হয় অনেক, অনেক কাল আগে থেকে। মদনমোহন আর বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। সংস্কৃত কলেজে অনেক দিন একই সঙ্গে পড়েছেন দু-জনে।

সংস্কৃত কলেজের পড়া শেষ করে মদনমোহন তর্কালঙ্কার দু-মাস কাজ করেছেন হিন্দুকলেজ-পাঠশালায়। তারপর কাজ নিয়েছেন বারাসত গবর্নমেণ্ট স্কুলে; একবছর সেখানে কাজ করলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮৪৩ সালের এপ্রিল থেকে ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতী করেছেন; ১৮৪৬ সালের জানুআরি থেকে কৃষ্ণনগর কলেজে পণ্ডিতী করেছেন।

সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার।

১৮৪৬ সালের ১৩-এপ্রিল তিনি মারা গেলেন। সাহিত্যের অধ্যাপক কে হবেন এবার? নব্বুই টাকা মাইনে পাবেন তিনি।

বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজে অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি, পঞ্চাশ টাকা মাইনে পাচ্ছেন। সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত ঠিক করলেন, বিদ্যাসাগরকে ঐ নব্বুই টাকার চাকরিতে বহাল করবেন। মাইনে পঞ্চাশ টাকা থেকে একটানে নব্বুই টাকা হয়ে যাবে—খুব সামান্য কথা নয়।

কিন্তু বিদ্যাসাগর "বিশিষ্ট হেতু বশতঃ"[২০] সে-চাকরি নিলেন না। মদনমোহন তর্কালঙ্কার যাতে ঐ চাকরি পান, বিদ্যাসাগর সেইরকম অনুরোধ করলেন কর্তৃপক্ষকে। বিদ্যাসাগরের অনুরোধে কাজ হল। ১৮৪৬ সালের ২৭-জুন মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হলেন।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: "কৃষ্ণনগরের কার্য্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিতে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বিলম্ব হওয়ায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েক দিন সাহিত্যশ্রেণীতে কিরাতার্জ্জুনীয় অর্থাৎ ভারবি পড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ছাত্রগণ তাঁহার অধ্যাপনার পাণ্ডিত্য দর্শনে পরমাহ্লাদিত হইয়াছিল। তদনন্তর মদনমোহন তর্কালঙ্কার কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক কয়েক দিবস বিদ্যাসাগরের বাসায় অবস্থিতি করিয়া, তাঁহার নিকট ভারবির যে যে অংশ ছাত্রগণকে পড়াইতে হইবে সেই সেই স্থলের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতেন। ক্রমশঃ তর্কালঙ্কার অধ্যাপনা কার্য্য করিয়া সাহিত্যশাস্ত্রে অসাধারণ লোক হইয়া উঠিলেন।"[২১]

একটা ঘটনা আছে।

সংস্কৃত কলেজের উত্তরদিকের দোতলার একখানা ঘরে মদনমোহন ছাত্রদের পড়াতেন। সংস্কৃত কলেজের উত্তরদিকের একখানা বাড়ির একজন ভদ্রলোক একদিন বিদ্যাসাগরের কাছে নালিশ করলেন—মশায়, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের জন্য আমাদের স্ত্রীলোকেরা ছাদে উঠতে পারেন না। ছাত্রেরা সবসময় আমাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে।

বিদ্যাসাগর অতএব মদনমোহনকে বললেন—মদন, ছেলেদের বারণ করে দিও, যেন ওদিকে না তাকায়।

মদনমোহন উত্তর দিলেন—দ্যাখো বিদ্যাসাগর, বসন্তকাল পড়েছে। 'মেঘদূত' পড়ানো হচ্ছে। আর পড়াচ্ছেন কে? না, স্বয়ং মদন। এ-অবস্থায় কেউ চঞ্চল না হয়ে থাকতে পারে?

উত্তর শুনে বিদ্যাসাগর খুশি হলেন। কিন্তু কাজের দিক ঠিক আছে। মিস্ত্রি ডাকিয়ে ওদিকের খড়খড়িগুলো স্ক্রু লাগিয়ে এমনভাবে বন্ধ করে দিলেন যে আর কোনো অভিযোগের কারণ রইল না।[২২]

১৮৪৭ সালে সংস্কৃত প্রেস খোলা হল। উত্তরকালে বিদ্যাসাগর লিখেছেন: "যৎকালে আমি ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কালেজে নিযুক্ত ছিলাম; তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে, সংস্কৃতযন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়। ঐ ছাপাখানায়, তিনি ও আমি, উভয়ে সমাংশভাগী ছিলাম।"

সংস্কৃত কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ১৮৫০ সালের নভেম্বরে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত হলেন। ১৮৫৫ সালের ডিসেম্বরে মুর্শিদাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হলেন। এক বছর পর কান্দীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হলেন।

"ক্রমে ক্রমে, এরূপ কতকগুলি কারণ উপস্থিত হইল যে,"—স্বয়ং

বিদ্যাসাগরের ভাষায় বলা হচ্ছে—"তর্কালঙ্কারের সহিত কোনও বিষয়ে সংস্রব রাখা উচিত নহে।"

উত্তরকালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন : "মদনমোহনের সহিত বিদ্যাসাগরের মনোমালিন্যের কারণ কি, সেটি আমি বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলাম যে, প্রকাশ করা উচিত নহে;...এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, প্রকাশিত হইলে বিদ্যাসাগরের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইবে।"[২৩]

অথচ এককালে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল দুজনের মধ্যে।

বিদ্যাসাগরের চেয়ে মদনমোহন বয়সে বছর তিনেক বড়ো। তাই বিদ্যাসাগর মদনমোহনের স্ত্রীকে 'বৌদিদি' বলে ডাকতেন। মদনমোহনের স্ত্রী বিদ্যাসাগরকে ডাকতনে—'ঠাকুরপো'।

মদনমোহন তখন কলকাতায়। সেদিন কলেজ থেকে মদনমোহনের বাসায় গিয়েছেন বিদ্যাসাগর। মদনমোহনের স্ত্রীকে বললেন—বৌদিদি, বড়ো ক্ষিদে পেয়েছে। কী খাব?

বৌদিদি তখন দুপুরের খাওয়া খেতে বসেছেন। বললেন—কেন ঠাকুরপো, এই ভাত আছে, খাও না।

তক্ষুনি বিদ্যাসাগর অম্লানবদনে বৌদিদির পাশে বসে বৌদিদির থালা থেকে হাম্ হাম্ করে ভাত খেতে লাগলেন।

এমন সময় মদনমোহন এলেন। বললেন—আরে, কী কর, বিদ্যাসাগর। সকল মহাপ্রসাদ খেও না। আমি খাব কী?

মদনমোহনের স্ত্রী ভাতের থালাখানা হাতে নিয়ে উঠে বললেন—এই লও, মহাপ্রসাদ খাও।

মদনমোহন সেই থালা চাটতে লাগলেন।[২৪]

অনেকদিন আগের কথা। এ-দৃশ্য এখন পুরোনো। সেই প্রগাঢ় বন্ধুত্বের দিন এখন আর নেই।

না, বিদ্যাসাগর কিছুতেই মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবেন না।

বিদ্যাসাগর আর মদনমোহন তর্কালঙ্কার—দুজনের সঙ্গেই পটলডাঙার শ্যামাচরণ দে-র বন্ধুত্ব।

এই সময়ে শ্যামাচরণকে লেখা মদনমোহনের একখানা চিঠি থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি :

"ভ্রাতঃ! ক্রমশঃ পদোন্নতি ও এই ডেপুটি মাজিস্ট্রেটী পদপ্রাপ্তি যে কিছু বল, সকলি বিদ্যাসাগরের সহায়তা বলে হইয়াছে, অতএব তিনি যদি আমার প্রতি এত বিরূপ ও বিরক্ত হইলেন তবে আর আমার এই চাকরি করায় কাজ নাই, আমার এখনি ইহাতে ইস্তাফা দিয়া, তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া উচিত হয়। শ্যাম হে! কি বলিব ও কি লিখিব, আমি এই সবডিভিজনে আসিয়া অবধি যেন মহাসাপরাধীর ন্যায় নিতান্ত ম্লান ও স্ফূর্ত্তিহীনচিত্তে কর্ম্মকাজ করিতেছি, অথবা আমার অসুখের ও মনোগ্লানির পরিচয় আর কি মাথামুণ্ডু জানাইব, আমার বাল্যসহচর, একহৃদয়, অমায়িক, সহোদরাধিক, পরম বান্ধব বিদ্যাসাগর আজি ৬ ছয় মাস কাল হইতে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করে নাই, আমি কেবল জীবন্মৃতের ন্যায় হইয়া আছি। শ্যাম! তুমি আমার সকল জান, এই জন্যে তোমার নিকট এত দুঃখের পরিচয় পাড়িলাম"।

এই শ্যামাচরণের মারফৎ বিদ্যাসাগর সংস্কৃত প্রেস সম্পর্কে মদনমোহন

তর্কালঙ্কারকে একটা প্রস্তাব করে পাঠালেন। ভাগাভাগির প্রস্তাব। ছাপাখানা ভাগ হয়ে যাক দুজনের মধ্যে। অথবা, যা ন্যায্য প্রাপ্য হয় বিদ্যাসাগরকে তা দিয়ে মদনমোহন ছাপাখানা নিয়ে নিক। কিম্বা, যা ন্যায্য প্রাপ্য হয় মদনমোহন তা নিয়ে বিদ্যাসাগরকে ছাপাখানা ছেড়ে দিক।—অর্থাৎ মদনমোহনের সঙ্গে অংশীদার হয়ে বিদ্যাসাগর আর ছাপাখানায় থাকবেন না।

নিজের প্রাপ্য বুঝে নিয়ে মদনমোহন ছাপাখানা ছেড়ে দিতে চাইলেন বিদ্যাসাগরকে।

খাতাপত্র দেখে-শুনে হিসেব-নিকেশ দেনা-পাওনার মীমাংসা করে দিলেন শ্যামাচরণ দে, তারানাথ তর্কবাচস্পতি আর রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ব্যাপারে এঁরাই সালিসী হয়েছেন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার 'শিশুশিক্ষা' নামে একখানা বই তিন ভাগে লিখেছেন। 'শিশুশিক্ষা' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ বেরিয়েছে ১৮৪৯ সালে, তৃতীয় ভাগ বেরিয়েছে ১৮৫০ সালে। প্রথম ভাগ 'শিশুশিক্ষা'র একটি কবিতার সঙ্গে প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর নিঃসন্দেহে শৈশবকাল থেকে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। মদনমোহনের সেই কবিতাটির প্রথম পংক্তি: "পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল"।

মদনমোহনের ইচ্ছামতো সেই তিনভাগ 'শিশুশিক্ষা' ছাপাখানার সম্পত্তি হয়ে গেছে। সালিসীতে ছাপাখানার ষোলোআনা স্বত্ব পেলেন বিদ্যাসাগর। অতএব, না বললেও চলে নিশ্চয়ই, ওই তিনভাগ 'শিশুশিক্ষা'র স্বত্বও বিদ্যাসাগরের।

মদনমোহন একখানা চিঠি লিখে শ্যামাচরণকে জানালেন: "আমি এক্ষণে যাইতে পারিব না; আদালত বন্ধ হইলে, কলিকাতায় গিয়া, আপন প্রাপ্য বুঝিয়া লইব।"

কিন্তু মদনমোহনের আর কলকাতায় এসে আপন প্রাপ্য বুঝে নেওয়া হল না।

কান্দীতে কলেরা হল মদনমোহনের। বাঁচার তিলমাত্র আশা রইল না। অন্তিমকালেও মদনমোহন বিদ্যাসাগরের কথা ভুলতে পারেননি, মর্মে-মর্মে বুঝেছেন বিদ্যাসাগরের উপর চিরকাল নির্ভর করা চলে।

স্বামীর শেষশয্যার ধারে মদনমোহনের স্ত্রী নিঃশব্দে কাঁদছেন। মদনমোহন স্ত্রীকে বললেন—তুমি কেঁদো না। আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু তুমি কিছুতেই নিরাশ্রয় হবে না। আমার প্রাণের বন্ধু ঈশ্বর নিশ্চয়ই তোমাকে আশ্রয় দেবে। ঈশ্বর বেঁচে থাকতে তুমি আর আমার মেয়েরা কোনো কষ্ট পাবে না। আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।[২৫]

১৮৫৮ সালের ৯-মার্চ মদনমোহনের মৃত্যু হল।*

* লক্ষণীয়, যে-বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল, বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মা-বোন-মেয়েকে বিদ্যাসাগর উপেক্ষা করেননি। এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বিদ্যাসাগরের মত্যুর পরেও যাতে ওঁরা আর্থিক সাহায্য পান আপন উইলে সেই ব্যবস্থাও করে গিয়েছেন বিদ্যাসাগর। আপন উইলে বিদ্যাসাগর স্বীয় বিষয়ের উপস্বত্ব থেকে "মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মাতা"কে আট টাকা, "মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা শ্রীমতী কুন্দমালা দেবী"কে দশ টাকা এবং "মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ভগিনী শ্রীমতী বামাসুন্দরী দেবী"কে তিন টাকা মাসিক বৃত্তিদানের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন।

বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "তাঁহার (মদনমোহনের) পত্নী, কলিকাতায় আসিয়া, ছাপাখানা সংক্রান্ত স্বীয় পতির প্রাপ্য বুঝিয়া লয়েন।"

মদনমোহন যখন কলকাতায়, মুর্শিদাবাদে, কান্দীতে কাজ করতেন, তাঁর পরিবার তাঁর কাছে থাকতেন; আর তাঁর মা থাকতেন বাড়িতে, বিল্বগ্রামে। তর্কালংকারের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবার, কোথায় আর যাবেন, বিল্বগ্রামের বাড়িতে গিয়ে রইলেন।

কুন্দমালাকে নিয়ে মদনমোহনের স্ত্রী একবার কলকাতায় এলেন। কুন্দমালা মদনমোহনের মেজোমেয়ে। কুন্দমালা বিধবা।

সেবার মায়ের সামনেই কুন্দমালা একদিন বিদ্যাসাগরকে বলল—দ্যাখো, কাকা! বাবা অনেক টাকা রেখে গিয়েছিলেন; মা বুঝে-শুনে চললে আমাদের সচ্ছন্দে চলে যেত। কিন্তু মা সবই উড়িয়ে দিচ্ছেন। আর কিছুদিন পরে আমাদের ভাত-কাপড়ের কষ্ট পেতে হবে, ওঁর অদৃষ্টে যা আছে হোক। কিন্তু আমার বয়স অল্প, আমি অনাথা, আমার অদৃষ্টে কত কষ্ট আছে বলতে পারি না।

বলতে-বলতে কুন্দমালা কেঁদে ফেলল।

কুন্দমালার কান্না দেখে বিদ্যাসাগরের মন দুঃখে ভরে গেল। তিনি বললেন—বাছা! কেঁদো না। আমি যতদিন বেঁচে আছি, তুমি ভাত-কাপড়ের কষ্ট পাবে না। আমি তোমাকে মাসে-মাসে দশটাকা দেব। তাহলেই তোমার অনায়াসে চলে যাবে।

মাসে-মাসে কুন্দমালাকে দশটাকা দিয়ে যেতে লাগলেন বিদ্যাসাগর।

এখানে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের নামে দু-চার কথা না বললে নয়।

১৮৬৩ সালের কথা। যোগেন্দ্রনাথ তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। সেই সময় তাঁর বিয়ে হয়ে গেল। বৌয়ের নাম কৈলাসকামিনী। কয়েক বছর বাদে কৈলাসকামিনীর মৃত্যু হল।

কৈলাসকামিনীর মৃত্যুর দশ-বারো দিনের মধ্যেই যোগেন্দ্রনাথের আত্মীয়-স্বজন তাঁকে আবার বিয়ে করার জন্য অস্থির করে তুললেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। যোগেন্দ্রনাথ সবকথা শিবনাথকে জানালেন, শিবনাথের পরামর্শ চাইলেন।

শিবনাথ বললেন—যাও, যাও, আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না। দশ-বারো দিন হল তোমার স্ত্রী মরেছে, এর মধ্যেই বিয়ের কথা। আর বিয়েই যদি করো, একটি আট-ন বছরের মেয়ে বিয়ে করবে তো, তাতে আমার মত নেই। তোমার যা ইচ্ছে হয় করো।

ক্ষুণ্ণমনে যোগেন্দ্রনাথ চলে গেলেন। দুদিন পরে আবার এসে শিবনাথকে ধরলেন। শিবনাথ তাঁকে বিধবা-বিবাহ করার জন্য নাচিয়ে তুললেন। রাজি হয়ে গেলেন তিনি। ঠিক হয়ে গেল, মহালক্ষ্মী নামে একটি বিধবাকে বিয়ে করবেন যোগেন্দ্রনাথ।

সেই সংবাদ নিয়ে শিবনাথ গেলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগর খুশি হলেন; বলে দিলেন যে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে এ-বিয়ে দেবেন। ১৮৬৮ সালের গোড়ার দিকে যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গে মহালক্ষ্মীর বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের সমস্ত খরচ দিয়েছেন বিদ্যাসাগর।[২৩]

১৮৬৯ সালে মহালক্ষ্মীর মৃত্যু হল।

তারপর, খুব সম্ভব ১৮৭১ সালে, যোগেন্দ্রনাথ আবার বিয়ে করলেন।

"সপ্তদশ বৎসর অতীত হইল, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জামাতা শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম. এ., তর্কালঙ্কারপ্রণীত শিশুশিক্ষা উপলক্ষে, আমার উপর, পরস্বহারী বলিয়া, যে দোষারোপ করেন, তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভের অভিলাষে, তদ্বিষয়ে স্বীয় বক্তব্য, লিপিবদ্ধ করিয়া, পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিবার অভিপ্রায় ছিল। নানা কারণে, তৎকালে সে অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারি নাই; এবং, এত দিনের পর, আর তাহা সম্পন্ন করিবার অনুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিতে পাই, যোগেন্দ্রনাথ বাবুর আরোপিত দোষের উল্লেখ করিয়া, অদ্যাপি অনেক মহাত্মা আমায় নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। এজন্য, কতিপয় আত্মীয়ের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া, স্বীয় বক্তব্য মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে হইল।

যে মহোদয়েরা, যোগেন্দ্রনাথ বাবুর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, আমি পরস্বহারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বিনীত বচনে আমার প্রার্থনা এই, অনুগ্রহ পূর্ব্বক, কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিয়া, এই পুস্তকে একবার দৃষ্টিসঞ্চারণ করেন; তাহা হইলে, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক, যোগেন্দ্রনাথ বাবু, উচিতানুচিতবিবেচনায় বিসর্জ্জন দিয়া, আমার উপর যে উৎকট দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা, কোনও মতে, সঙ্গত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।"

'শিশুশিক্ষা'র স্বত্ব সম্পর্কে আদ্যন্ত ঘটনা বিদ্যাসাগর 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াসে' সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

আগেই বলা হয়েছে, যোগেন্দ্রনাথ আপন শ্বশুরমশায়ের একখানা জীবনচরিত লিখেছেন। সেই বইতে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে যা লিখেছেন তার অধিকাংশই অমূলক। 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াসে'র শেষভাগে বিদ্যাসাগর সে-বিষয়ে আপন বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন।

সম্ভবত ১৮৮৫ সালের শেষাংশে 'অপূর্ব্ব ইতিহাস' নামে বিদ্যাসাগরের একটি পুস্তিকা বেরিয়েছে। "উপকারের বদলে প্রত্যুপকার পাওয়া বিদ্যাসাগরের গা-সহা ছিল। কিন্তু তাঁহার শেষ বয়সে কোন কোন বিশ্বাস ও স্নেহের পাত্রের কাছে এমন আঘাত তিনি পাইয়াছিলেন যাহাতে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া তাঁহাকে সালিশ মানিতে হইয়াছিল। বলিতে পারি পুস্তিকাটি সেই সালিশির রিপোর্ট।"[২৭]

এই পুস্তিকাটি সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন :

"পুস্তিকাটি ডিমাই আকারের, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫১। নামপত্রে 'অপূর্ব্ব ইতিহাস' ছাড়া কিছু নেই। মুদ্রাযন্ত্রের উল্লেখ নেই, প্রকাশকালেরও উল্লেখ নেই। তবে মূল রচনার শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সই (অর্থাৎ নাম ছাপা) আছে, আর তারিখ আছে ১লা অগ্রহায়ণ ১২৯২ সাল। সুতরাং প্রকাশকাল ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ-পৌষের মধ্যেই হবে। মূল অংশটুকু, যাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সই আছে, তা ১ থেকে ৪৩ পৃষ্ঠা। বাকি পৃষ্ঠাগুলি পরিশিষ্ট। প্রথম পরিশিষ্ট (পৃ ৪৪) ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সই করা। দ্বিতীয় পরিশিষ্ট (পৃ ৪৫-৪৮) ইংরেজীতে লেখা ও রামশঙ্কর সেনের সই করা (তারিখ ২১ আগস্ট ১৮৮৫)। তৃতীয় পরিশিষ্টে (পৃ ৪৯) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিঠি (তারিখ ১২ ভাদ্র ১২৯২) এবং রামশঙ্কর সেন ও ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জবাব (তারিখ ৫ আশ্বিন ১২৯২)। চতুর্থ পরিশিষ্টে (পৃ ৫০-৫১) ছয়টি সংস্কৃত শ্লোক ও সেগুলির অনুবাদ। শ্লোকগুলি সবই

বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে। দুটি শ্লোক পদ্যে অনুদিত, চারটি গদ্যে। পদ্যে অনুবাদের নমুনা মূলসহ—

পরিতোষয়িতা না কশ্চন স্বগতো যস্য গুণোঽস্তি দেহিনঃ।
পরদোষকথাভিরল্পকঃ স্বজনং তোষয়িতুং স ইচ্ছতি॥

নাহি হেন কোন গুণ নিজের যাহার
জনময়ে পরিতোষ যাহে সবাকার॥
সেই নীচ করি পরদোষের কীর্ত্তন।
স্বজনে তুষিতে সদা করে আকিঞ্চন॥

'অপূর্ব্ব ইতিহাস' পুস্তিকাটি আদালতের নথির মতো, বিচার—কমিশনের পূর্ণ রিপোর্টের মতো। মনে হয় বইটি আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রচারের জন্য ছাপা হয়েছিল, বিক্রয়ের জন্য নয়।..."[২৮]

'পদ্যসংগ্রহ' নামে একখানা বই দুভাগে বের করেছেন বিদ্যাসাগর। প্রথম-ভাগ বেরিয়েছে ১৮৮৮ সালের জুলাই মাসে। দ্বিতীয়ভাগ ১৮৯০ সালে। প্রথমভাগ কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' থেকে সঙ্কলিত। দ্বিতীয় ভাগ ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' থেকে সঙ্কলিত।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন : "এই সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি (বিদ্যাসাগর) তাঁহার রাজতন্ত্রের নিকট আর কাহারও আসন হইতে পারে, একথা কল্পনা করিতেও পারিতেন না। তাঁহার এই literary jealousy সম্বন্ধে আমার বিন্দু-মাত্রও সন্দেহ নাই।" বিদ্যাসাগরের literary jealousy সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হয়ে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য অতঃপর একটি সংবাদ পরিবেশন করেছেন : "শ্যামাচরণ বাবু খাঁটি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় একখানা ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। এখন মনে হয় যে, বইখানি বাস্তবিকই খুব ভাল হইয়াছিল; কিন্তু যেমন পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল, অমনই বিদ্যাসাগর সে বইখানাকে pooh pooh করিলেন, আমরাও সকলে বিদ্যাসাগরের সহিত যোগ দিলাম। শ্যামাচরণ বাবু মাথা তুলিতে পারিলেন না।"[২৯]

কৃষ্ণকমলের বর্ণনার ভঙ্গি থেকে এই ধারণাই প্রশ্রয় পায় যে শ্যামাচরণের বইখানা উত্তম জেনেও বিদ্যাসাগর ঈর্ষ্যাবশত অবজ্ঞা করেছেন। কিন্তু শ্যামা-চরণের বইখানা সত্যই যদি বিদ্যাসাগরের অসার মনে হয়ে থাকে এবং বিদ্যাসাগর যদি সেই নিজস্ব মত ব্যক্ত করে থাকেন তাহলে অবশ্যই এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগর কণামাত্র অপরাধী নন।

এ-বিষয়ে সত্য বিবরণ স্বয়ং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যই পরবর্তীকালে দাখিল করেছেন : "তিনি (বিদ্যাসাগর) বাস্তবিকই বহিখানি অসার ভাবিয়াছিলেন, এবং সেই মতই প্রকাশ করিয়াছিলেন...।"[৩০]

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় একদিন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বিদ্যাসাগর নীলাম্বরকে বললেন—বড়ো ইচ্ছা ছিল আর কিছু করব, কিন্তু আমার শরীরের অবস্থা যেমন হয়ে পড়েছে, আমার দ্বারা যে আর কিছু হবে এমন বোধ হয় না। তুই তো কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে এলি, লেখাপড়া শিখেছিস, আমি সমস্ত ঠিক করে রেখেছি, তুই আমার সে-কাজের ভার নে দেখি।

কী এমন কাজ? চণ্ডীচরণ তখন সেখানে উপস্থিত, নীলাম্বর বিদায় নেবার পর, ভয়ে-ভয়ে কথাটা জানতে চাইলেন।

বিদ্যাসাগর একটু হেসে বললেন—একখানা বই লেখার সমস্ত আয়োজন করে রেখেছি, কিন্তু শরীরের এমন অবস্থা হয়ে পড়েছে যে কোনো মতেই আর সে-কাজে হাত দিতে পারছি না।

চণ্ডীচরণ আস্তে-আস্তে বললেন—আপনার কি লেখার সাধ এখনো মেটেনি? এমন কি বই লেখার ইচ্ছা আছে যার জন্য এত আগে থেকে আয়োজন করছেন?

বিদ্যাসাগর আবার একটু হেসে বললেন—ভারতবর্ষের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার সমস্ত সংগ্রহ করে রেখেছি। কেবল শরীর ভালো নয় বলে আজ-কাল করে বিলম্ব হয়ে পড়ছে।[৩১]

ইচ্ছা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর ভারতবর্ষের একখানা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখে যেতে পারেননি। উত্তরকালে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ মন্তব্য করেছেন: "বিস্তারিত আকারে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করবেন বলে বিদ্যাসাগর অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। দুঃখের বিষয় নানা কারণে, শারীরিক অসুস্থতার জন্যই, এ কার্যে তিনি হস্তক্ষেপ করতে পারেন নি। যদি তিনি এই বিপুল পরিশ্রমসাধ্য কর্মে সফল হতেন তা হলে বাঙালীর লেখা একখানি মৌলিক ইতিহাস-গ্রন্থ বাঙলীর গৌরব বৃদ্ধি করত, বাংলায় ইতিহাস-সাহিত্যেরও শ্রীবৃদ্ধি হত।"[৩২]

বিহারীলাল সরকার লিখেছেন: "ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস লিখিবেন বলিয়াই, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাচীনতম ও অধুনাতম ইতিহাস-গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে পারেন নাই। মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না বলিয়া, এক দিন আলমারিবদ্ধ এই সমুদয় ইতিহাস পুস্তক দেখিতে দেখিতে অবিরল-ধারায় অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন।"[৩৩]

বঙ্গভাষার প্রতি বিদ্যাসাগরের অসামান্য অনুরাগ ও শ্রদ্ধা। কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর লিখেছেন: "আমার কলিকাতা-পাঠ্য জীবনে (১৮৮৫ খৃঃ) একদিন স্বনামধন্য এবং চিরস্মরণীয় দয়ার সাগর ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিতে যাই; তখন আমার বাবুয়ানা বেশের মধ্যে সোনার চেইন ও ঘড়ি ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় উচিত বক্তা, তিনি একটু বিরাগভাবে আমার সোনার চেইনের মধ্যে দোদুল্যমান মোহরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"ও মোহরটা কিসের মোহর?" আমি কম্পিত কলেবরে তাঁহার নিকট এই মুদ্রাখণ্ড দেখাইলে তিনি পাঠ করিলেন—"শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পদে শ্রীশ্রীযুত মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্যদেব—শ্রীশ্রীমতী গুণবতী দেব্যা।" বৃদ্ধ তখন লাফাইয়া উঠিলেন। এবং উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমরা দেখ আমার বঙ্গভাষা রাজভাষা! বাঙ্গলা অক্ষরে এই সুবর্ণমুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছে।"......"[৩৪]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বঙ্গসাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমেষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা,
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা,
বঙ্গভারতীর ভালে পরাল প্রথম জয়টিকা।
রুদ্ধভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা,
হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে উপবনে
নব উদ্বোধনগাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।
যে বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি,
সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্যগঙ্গাস্নানে তাহা শুচি।
ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি;
ভারতীর পূজাতরে চয়ন করেছি আমি গীতি
সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে
মরুর পাষাণ ভেদি' প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে॥

২৪ ভাদ্র
১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Calcutta
the 5th August 1874

I have known Pundit Visweswara Vidyaratna for many years past. He is a good Sanskrit scholar and is a clever teacher. He bears an unexceptionable character.

Ishwarchandra Sarmah

বিদ্যাসাগর প্রদত্ত একখানা প্রশংসাপত্রের প্রতিলিপি

চব্বিশ

খাঁটি বাঙলা শব্দ সঙ্কলনের কাজে হাত দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর তাঁর সেই শব্দ-সংগ্রহ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (১৩০৮ সাল, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ. ৭৪-১৩০) বেরিয়েছে।*

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগরের কয়েকটি রচনা বেরিয়েছে—অধুনালুপ্ত 'সখা', 'ধ্রুব' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায়। সেসব রচনার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিদ্যাসাগরের স্বরচিত জীবন-চরিত আর 'প্রভাবতীসম্ভাষণ'।

স্বরচিত জীবন-চরিতে বিদ্যাসাগর আপন শৈশবকালের কথা সংক্ষেপে লিখেছেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর সেই রচনা "বিদ্যাসাগর রচিত 'আত্ম-জীবনচরিতের' কয়েক পৃষ্ঠা" নামে 'সাহিত্য' পত্রিকায় (কার্তিক, ১২৯৮ সাল) বেরল।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "এই সংখ্যায় ('সাহিত্য', কার্তিক, ১২৯৮) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মজীবনচরিতের কয়েক পৃষ্ঠা বাহির হইয়াছে। ইহাতে অলঙ্কারবাহুল্য বা আড়ম্বরের লেশমাত্র নাই। পূজনীয় লেখক মহাশয় সমগ্র গ্রন্থটি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া মনে একান্ত আক্ষেপ জন্মে। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে বাঙ্গালীদের পক্ষে শিক্ষার স্থল হইত। প্রথমতঃ একটি অকৃত্রিম মহত্ত্বের আদর্শ বঙ্গসাহিত্যে চিরজীবন লাভ করিয়া বিরাজ করিত, দ্বিতীয়তঃ আপনার কথা কেমন করিয়া লিখিতে হয় বাঙ্গালী তাহা শিখিতে পারিত। সাধারণতঃ বাঙ্গালী লেখকেরা নিজের জবানী কোন কথা লিখিতে গেলে অতিশয় সহৃদয়তা প্রকাশ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন—হায় হায় মরি মরি শব্দে পদে পদে হৃদয়াবেগ ও অশ্রুজল উদ্বেলিত করিয়া তোলেন। "আত্মজীবনচরিত" যতটুকু বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি সংযত সহৃদয়তা এবং নিরলঙ্কার সত্য প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীজাতির প্রতি লেখক মহাশয় যে ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কেমন সরল সমূলক ও অকৃত্রিম। আজকাল যাঁহারা স্ত্রীজাতির প্রতি আধ্যাত্মিক দেবত্ব আরোপ করিয়া বাক্‌চাতুরী প্রকাশ করিয়া থাকেন তাঁহাদের সহিত কি প্রভেদ!"[১]

বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনচরিতের কয়েক পৃষ্ঠা 'বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত)' নামে বই হয়ে বেরল ১৮৯১ সালের সেপ্টেম্বরে। সেই বই থেকে ঈষদংশ উদ্ধার করি: "—শাকে, কার্ত্তিক মাসে, পিতামহদেব, রামজয় তর্ক-ভূষণ, অতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন, কোন অংশে কাহার নিকট অবনত হইয়া চলিতে অথবা কোনও প্রকারে অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না।

---

* বিদ্যাসাগরের শব্দ-সংগ্রহের পাণ্ডুলিপি বর্তমানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে। উক্ত পাণ্ডুলিপির সূচনায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ১৩০৯ সালের ২৫-ফাল্গুন, লিখেছেন: "সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্কলিত ও স্বহস্তলিখিত এই শব্দ সংগ্রহ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে উপহার দিলাম। গতবর্ষের পরিষৎ পত্রিকায় এই শব্দ সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য পরিষদের প্রতি অনুরোধ যে এই পুস্তক সযত্নে রক্ষার ব্যবস্থা হইবে, এবং কোন হেতুতে কোন ব্যক্তি কর্তৃক সাহিত্য পরিষদের পুস্তকালয় হইতে স্থানান্তরিত হইবে না।..."

তিনি সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তন, তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকার প্রত্যাশায় অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। তিনি নিতান্ত নিস্পৃহ ছিলেন, এজন্য অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য, তাঁহার পক্ষে, কস্মিন্ কালেও আবশ্যক হয় নাই।

...তর্কভূষণ মহাশয়, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক বীরসিংহবাসে সম্মত হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্যালক, রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ, গ্রামের প্রধান বলিয়া পরিগণিত এবং সাতিশয় গর্ব্বিত ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি মনে করিয়া ছিলেন, ভগিনীপতি রামজয় তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার ভগিনীপতি কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা বুঝিতে পারিলে, তিনি সেরূপ মনে করিতে পারিতেন না। রামজয় রামসুন্দরের অনুগত হইয়া না চলিলে, রাম-সুন্দর নানা প্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিবেন, অনেকে তাঁহাকে এই ভয় দেখাইয়া-ছিলেন। কিন্তু রামজয়, কোনও কারণে, ভয় পাইবার লোক ছিলেন না, তিনি স্পষ্ট বাক্যে বলিতেন, বরং বাসত্যাগ করিব, তথাপি শালার অনুগত হইয়া চলিতে পারিব না। শ্যালকের আক্রোশে তাঁহাকে সময়ে সময়ে, প্রকৃত প্রস্তাবে, এক ঘরিয়া হইয়া থাকিতে ও নানাপ্রকার অত্যাচার উপদ্রব সহ্য করিতে হইত, তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইতেন না।"

'প্রভাবতীসম্ভাষণ' রচনার মূলে একটু করুণ-মধুর ইতিহাস আছে।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রাজ-কৃষ্ণের একমাত্র মেয়ের নাম প্রভাবতী। মেয়েটিকে খুব ভালোবাসতেন বিদ্যাসাগর।

আধো-আধো গলায় কী চমৎকার কথা বলত প্রভাবতী। বিদ্যাসাগরকে ডাকত 'ভচ্চে' বলে। 'নে না' বলতে পারত না প্রভাবতী, বলত, 'নীনা'; 'শুলো' বলতে পারত না, বলত, 'শোলো': 'দুখানি' বলতে পারত না, বলত, 'দুখুনি'। এইরকম।

কতদিন প্রভাবতীর সঙ্গে ঝগড়া করেছেন বিদ্যাসাগর। সেই মধুর ঝগড়া আহ্লাদ করে দেখবার মতো।

প্রভাবতীর বড়ো ভয়। সাহস করে কখনো গাড়ি চড়তে পারেনি। প্রভাবতীকে কোলে করে বিদ্যাসাগর সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাচ্ছেন, প্রভাবতী বিদ্যাসাগরের থুতনি ধরে সাবধান করে দিচ্ছে—নাফাস্‌নি, পড়ে যাব।

বিদ্যাসাগর ঠাট্টা করে বললেন—না, আমি লাফাব।

অমনি মায়ের দিকে মুখ ফেরাল প্রভাবতী। বলল—দেখ্‌দিখি মা, আমার কথা শোনে না।

দাদারা মাঝে-মাঝে প্রভাবতীকে ঠাট্টা করে বলত—ভচ্চে আর তোমায় ভালোবাসবেন না।

সে-ঠাট্টা বুঝতে পারত না প্রভাবতী। তার ভয় হত। ভচ্চে যদি আর না ভালোবাসে! আশ্চর্য সুন্দর ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে প্রভাবতী বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞেস করত—ভাল বস্‌বি, ভাল বস্‌বি।

বিদ্যাসাগর বলতেন—ভালোবাসব।

একদিন বিদ্যাসাগর সেকথা বললেন না। সেদিন বাইরের বারান্দায় বসে

আছেন বিদ্যাসাগর। বাড়ির ভেতরের নিচের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে প্রভাবতী বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথাবার্তা কইছে। বিদ্যাসাগর সেদিন প্রভাবতীকে বারংবার বলতে লাগলেন—আর ভালোবাসব না।

প্রভাবতী বারংবার বলল—না, ভাল বস্‌বি।

কিন্তু কিছুতেই বিদ্যাসাগর সেদিন 'ভালোবাসব' বললেন না, বারংবার বললেন—আর ভালোবাসব না, আর ভালোবাসব না।

প্রভাবতী বুঝি খানিক দুঃখ পেল। ভচ্চে কিছুতেই আর ভালোবাসবে না? সুন্দর মধুর গলায় প্রভাবতী তখন বিদ্যাসাগরকে বলল—তুই ভাল বস্‌বিনি, আমি ভাল বসবো।

'খাব, খাব' বলে কতদিন বিদ্যাসাগর ব্যস্ত করেছেন প্রভাবতীকে। বিদ্যাসাগর চুমু খাবেন। 'এই খা', বলে ডান গাল বাড়িয়ে দিয়েছে প্রভাবতী। 'খাব না', বলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন বিদ্যাসাগর। ডান গালে খাবেন না? 'তবে এই খা', বলে বাঁ গাল বাড়িয়ে দিয়েছে প্রভাবতী। 'খাব না', বলে আবার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন বিদ্যাসাগর। বাঁ গালেও খাবেন না? যেন আর কোনো উপায় নেই, আর কিছু বলার নেই, এমনিভাবে প্রভাবতী তখন নিজের ঠোঁট বিদ্যাসাগরের ঠোঁটের কাছে নিয়ে এসেছে।

অসুখ করেছে প্রভাবতীর। দারুণ পিপাসা। কিন্তু, চিকিৎসকের বারণ আছে, বেশি জল দেবার উপায় নেই। ওষুধ খাবার পর একটুখানি জল দেওয়া হত প্রভাবতীকে। আরো জল চাই, আরো জল চাই। পিপাসার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠেছে প্রভাবতী। পিপাসায় আকুল হয়ে করুণ চোখে বিদ্যাসাগরের কাছে জল চেয়েছে। বিদ্যাসাগর জল দিতে পারেননি, নানা কথায় প্রভাবতীকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। হায়, তখন যদি বিদ্যাসাগর ঘুণাক্ষরেও জানতেন যে প্রভাবতীর আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, তাহলে পিপাসার যন্ত্রণায় ওকে কিছুতেই অস্থির হতে দিতেন না, ওকে নিশ্চয়ই প্রাণ ভরে জল খেতে দিতেন।

তিন বছর বয়সে প্রভাবতী মারা গেল।

প্রভাবতী নেই, প্রভাবতী নেই। বিদ্যাসাগর স্থির হয়ে বসতে পারেন না, খেতে পারেন না, শুতে পারেন না। বিদ্যাসাগরের এককণা সুখ নেই। বিদ্যাসাগরের প্রত্যেকটি মুহূর্ত পরম দুঃখে ভরে আছে।

বিদ্যাসাগর খেতে বসেন। অনেকদিন চোখের জলে খাবার নষ্ট হয়ে যায়। একা-একা যখন বসে থাকেন, প্রভাবতীর কথা ভাবতে-ভাবতে চোখের জলে দশদিক ভেসে যায়। রাত্রে বিছানায় শুয়েও নিস্তার নেই। অধিকাংশ সময়েই একমনে প্রভাবতীর কথা ভাবেন। ভাবতে-ভাবতে এককে সময় মনে হয়, সত্যিই বুঝি প্রভাবতী কথা কয়ে উঠল, বুঝি প্রভাবতীর গলার স্বর শোনা গেল। বিদ্যাসাগর চমকে ওঠেন।

প্রভাবতীর মৃত্যুর দিন কয়েক পরের কথা। দিনের বেলা ঘুম এসেছে বিদ্যাসাগরের চোখে। স্বপ্নে দেখলেন—প্রভাবতীকে। স্বপ্নের মধ্যে পরম স্নেহে বিদ্যাসাগর কোলে নিলেন প্রভাবতীকে, স্বপ্নের মধ্যে প্রভাবতীর মুখে চুমু খেতে যাচ্ছেন—এমন সময় কে একজন এসে বিদ্যাসাগরের ঘুম ভাঙিয়ে দিল। ঘুম ভেঙে গেল, স্বপ্ন ভেঙে গেল। তবু তো স্বপ্নের মধ্যে প্রভাবতী এসেছিল। আহা, এমন স্বপ্ন ভেঙে গেল। বিদ্যাসাগরের এ-দুঃখ কাউকে বলে বোঝানোর নয়।

ইহসংসারে প্রভাবতী কোথাও নেই, কিন্তু বিদ্যাসাগরের মনের মধ্যে কেবল

প্রভাবতী, প্রভাবতী, প্রভাবতী। প্রভাবতী মরে গেছে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মনের মধ্যে প্রভাবতী সারাক্ষণ বেঁচে আছে, বেঁচে আছে।

১৮৬৪ সালের এপ্রিলে প্রভাবতীর উদ্দেশে একটি রচনা লিখলেন বিদ্যাসাগর—'প্রভাবতীসম্ভাষণ'। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর রচনাটি প্রথম ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে 'সাহিত্যে'—১২৯৯ সালের বৈশাখে। পরের মাসের 'সাধনা'য় 'প্রভাবতীসম্ভাষণ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলে হৃদয় করুণারসে আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারে না।"

'প্রভাবতীসম্ভাষণ' থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি:

"বৎসে! তোমার কিছুমাত্র দয়া ও মমতা নাই। যখন, তুমি, এত সত্বর চলিয়া যাইবে বলিয়া, স্থির করিয়া রাখিয়াছিলে, তখন তোমার সংসারে না আসাই সর্ব্বাংশে উচিত ছিল। তুমি, স্বল্প সময়ের জন্য আসিয়া, সকলকে কেবল মর্ম্মান্তিক বেদনা দিয়া গিয়াছ। আমি যে, তোমার অদর্শনে, কত যাতনাভোগ করিতেছি, তাহা তুমি একবারও ভাবিতেছ না।...

বৎসে! কিছু দিন হইল, আমি, নানা কারণে সাতিশয় শোচনীয় অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছি। সংসার নিতান্ত বিরস ও বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। কেবল এক পদার্থ ভিন্ন, আর কোনও বিষয়েই, কোন অংশে, কিঞ্চিন্মাত্র সুখবোধ বা প্রীতিলাভ হইত না। তুমি আমার সেই এক পদার্থ ছিলে। ইদানীং একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া, এই বিষময় সংসার অমৃতময় বোধ করিতেছিলাম। যখন, চিত্ত বিষম অসুখে ও উৎকট বিরাগে পরিপূর্ণ হইয়া, সংসার নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণাভবন বলিয়া প্রতীয়মান হইত, সে সময়ে, তোমায় কোলে লইলে, ও তোমার মুখচুম্বন করিলে, আমার সর্ব্ব শরীর, তৎক্ষণাৎ, যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত হইত। বৎসে! তোমার কি অদ্ভুত মোহনী শক্তি ছিল, বলিতে পারি না। তুমি অন্ধতমসাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপ্ত প্রদীপের, এবং চিরশুষ্ক মরুভূমিতে প্রভূত প্রস্রবণের, কার্য্য করিতেছিলে। অধিক আর কি বলিব, ইদানীং তুমিই আমার জীবনযাত্রার একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিলে। সুতরাং, তোমার অসদ্ভাবে, আমার কীদৃশ শোচনা অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা তুমি ইচ্ছা করিলে, অনায়াসে, স্বীয় অনুভবপথে উপনীত করিতে পার।

কিন্তু, এক বিষয় ভাবিয়া, আমি, কিয়ৎ অংশে, বীতশোক ও আশ্বাসিত হইয়াছি। বৎসে! তুমি এমন শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে যে, ব্যক্তিমাত্রেই, তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্ত্তি ও প্রভূতমাধুরীপূর্ণ ভাবভঙ্গী দৃষ্টিগোচর করিয়া, নিরতিশয় পুলকিত ও চমৎকৃত হইতেন। তুমি সকলের নয়নতারা ছিলে। সকলেই তোমায় আপন প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিতেন। এই নগরের অনেক পরিবারের সহিত আমার প্রণয় ও পরিচয় আছে; কিন্তু, কোনও পরিবারেই, তোমার ন্যায়, অবিসংবাদে সর্ব্বসাধারণের নিরতিশয় স্নেহভূমি ও আদরভাজন অপত্য, এ পর্য্যন্ত, আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই।...

তুমি স্বল্প কালে নরলোক হইতে অপসৃত হইয়া, আমার বোধে, অতি সুবোধের কার্য্য করিয়াছ। অধিক কাল থাকিলে, আর কি অধিক সুখভোগ করিতে; হয়ত, অদৃষ্টবৈগুণ্যবশতঃ, অশেষবিধ যাতনাভোগের একশেষ ঘটিত। সংসার যেরূপ বিরুদ্ধ স্থান, তাহাতে, তুমি, দীর্ঘজীবিনী হইলে, কখনই, সুখে ও সচ্ছন্দে, জীবনযাত্রার সমাধান করিতে পারিতে না।

কিন্তু, এক বিষয়ে, আমার হৃদয়ে নিরতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়া রহিয়াছে।

অন্তিম পীড়াকালে, তুমি, উৎকট পিপাসায় সাতিশয় আকুল হইয়া, জলপানের নিমিত্ত, নিতান্ত লালায়িত হইয়াছিলে। কিন্তু, অধিক জল দেওয়া চিকিৎসকের মতানুযায়ী নয় বলিয়া, তোমার ইচ্ছানুরূপ জল দিতে পারি নাই। ঔষধ-সেবনান্তে, কিঞ্চিৎ দিবার পর, আকুল বচনে, 'আর খাব' 'আর খাব' বলিয়া, জলের নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি লালসাপ্রদর্শন করিতে। কিন্তু, আমি, ইচ্ছানুরূপ জলপ্রদানের পরিবর্ত্তে, তোমায় কেবল প্রবঞ্চনাবাক্য সান্ত্বনাপ্রদানের চেষ্টা করিতাম। যদি তৎকালে জানিতে পারিতাম, তুমি অবধারিত পলায়ন করিবে, তাহা হইলে, কখনই তোমায় পিপাসার যন্ত্রণায় অস্থির ও কাতর হইতে দিতাম না; ইচ্ছানুরূপ জলপান করাইয়া, নিঃসন্দেহ, তোমার উৎকটপিপাসা-নিবন্ধন অসহ্য যাতনার সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিতাম। সে যাহা হউক, বৎসে! তুমি উৎকট পিপাসায় সাতিশয় আকুল হইয়া, জলপ্রার্থনাকালে, আমার দিকে, বারংবার, যে কাতর দৃষ্টিপাত করিয়াছিলে, তাহা আমার হৃদয়ে, বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায়, চিরদিনের নিমিত্ত নিহিত হইয়া রহিয়াছে। যদি তোমার সকল কাণ্ড বিস্মৃত হই, ঐ মর্ম্মভেদী কাতর দৃষ্টিপাত, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, আমার স্মৃতিপথ হইতে অপসারিত হইবেক না। যদি তাহা বিস্মৃত হইতে পারি, তাহা হইলে, আমার মত পামর ও পাষণ্ড ভূমণ্ডলে আর নাই।

বৎসে! আমি যে তোমায় আন্তরিক ভাল বাসিতাম, তাহা তুমি বিলক্ষণ জান। আর তুমি যে আমায় আন্তরিক ভাল বাসিতে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি, তোমায় অধিকক্ষণ না দেখিলে, যার পর নাই অসুখী ও উৎকণ্ঠিত হইতাম। তুমিও, আমায় অধিকক্ষণ না দেখিতে পাইলে, যার পর নাই অসুখী ও উৎকণ্ঠিত হইতে, এবং, আমি কোথায় গিয়াছি, কখন আসিব, আসিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন, অনুক্ষণ, এই অনুসন্ধান করিতে। এক্ষণে, এতদিন তোমায় দেখিতে না পাইয়া, আমি অতি বিষম অসুখে কালহরণ করিতেছি। কিন্তু, তুমি এত দিন আমায় না দেখিয়া, কি ভাবে কালযাপন করিতেছ, তাহা জানিতে পারিতেছি না। বৎসে! যদিও তুমি, নিতান্ত নির্ম্মম হইয়া, এ জন্মের মত, অন্তর্হিত হইয়াছ, এবং আমার নিমিত্ত আকুলচিত্ত হইতেছ কি না, জানিতে পারিতেছি না, আর, হয়ত, এত দিনে, আমায় সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছ; কিন্তু, আমি তোমায়, কস্মিন্ কালেও, বিস্মৃত হইতে পারিব না। তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্ত্তি, চিরদিনের নিমিত্ত, আমার চিত্তপটে চিত্রিত থাকিবেক। কালক্রমে পাছে তোমায় বিস্মৃত হই, এই আশঙ্কায়, তোমার যার পর নাই চিত্ত-হারিণী ও চমৎকারিণী লীলা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। সতত পাঠ করিয়া, তোমায় সর্ব্বক্ষণ স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিব; তাহা হইলে, আর আমার তোমায় বিস্মৃত হইবার অণুমাত্র আশঙ্কা রহিল না।...”

'প্রভাবতীসম্ভাষণ' বিদ্যাসাগর নিজের জন্য লিখেছেন, নিজের পড়ার জন্য লিখেছেন। কী আশ্চর্য লেখা। বিদ্যাসাগরের বিশাল হৃদয়ের দুঃখে 'প্রভাবতী-সম্ভাষণে'র প্রত্যেকটি অক্ষর অপার মাধুর্যে সিক্ত হয়ে আছে।*

* এই রচনাটি সম্পর্কে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন :

“পূজ্যপাদ, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাতামহ মহাশয়, শিশুদের প্রতি অতিশয় স্নেহময় ছিলেন। বর্ত্তমান ক্ষুদ্র রচনায় তাঁহার সেই স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত, মাতামহদেবের বিশেষ সৌহৃদ্য ও আত্মীয়তা ছিল। তাঁহার একমাত্র কন্যা প্রভাবতী এই রচনার বিষয়। ১৭৮২ শাকের

আরেকরকম স্বাদের বিদ্যাসাগরের আরেকটি রচনা—নাম 'ছাগলের বুদ্ধি'—১৮৯৪ সালের জানুআরি মাসের 'সখা' থেকে তুলে দিচ্ছি :

"এক ওয়েল্স্দেশীয় ভদ্রসন্তান ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিয়া, সুরাপানে অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছিলেন। প্রতি দিন সময় বিশেষে শুঁড়ীর দোকানে গিয়া, বিলক্ষণ সুরাপান করিয়া আসিতেন।

এই ব্যক্তি একটি ছাগল পুষিয়াছিলেন। ছাগলটি, ক্রমে ক্রমে, তাঁহার অতিশয় অনুগত হইয়াছিল। তিনি যখন যেখানে যাইতেন, ছাগলটি তাঁহার সঙ্গে যাইত। সুরাপানের জন্যে, যখন তিনি শুঁড়ীর দোকানে যাইতেন, সে সময়েও ছাগলটি তাঁহার সঙ্গে যাইত। যখন তিনি সুরা লইতেন এবং সুরা লইয়া পান করিতেন, সে সময়ে সে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিত। ফলতঃ, ছাগলটি এক দিনের জন্যেও তাঁহার কাছ ছাড়া হইত না।

এক দিন তিনি কিঞ্চিৎ সুরা লইয়া ছাগলটির সম্মুখে ধরিলে, ছাগলটি আগ্রহ সহকারে পান করিল। সে অন্যান্য দিন যেরূপ স্বচ্ছন্দে আহার বিহার প্রভৃতি করিত, সুরাপান নিবন্ধন নেশায় অভিভূত হইয়া, সে দিন সেরূপ করিতে পারিল না।

পরদিন যখন তিনি সুরাপান করিতে যান, ছাগলটি তাঁহার সঙ্গে গেল। কিন্তু অন্যান্য দিনের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে দোকানের ভিতরে না গিয়া, কিঞ্চিৎ অন্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি বারংবার ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই দোকানের ভিতরে গেল না। অনন্তর তিনি নিজে পান করিয়া ছাগলকে পান করাইবার জন্য, কিঞ্চিৎ সুরা লইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইবা মাত্র, সে কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তিনি অনেক চেষ্টা পাইলেন, কিছুতেই ছাগলকে সুরাপান করাইতে পারিলেন না।

এই ব্যাপার দর্শনে তাঁহার জ্ঞানের উদয় হইল। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, ছাগল একবার মাত্র সুরাপান করিয়া, সুরাপানে কত অসুখ ও কত অনিষ্ট হয়, তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, এবং তজ্জন্য এত পীড়াপীড়িতেও কোনও মতে আর সুরাপানে সম্মত হইতেছে না। আমি সুরাপানের দোষ বুঝিতে পারিয়াছি, অথচ সুরাপানে ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। অতএব বুদ্ধি ও বিবেচনা বিষয়ে আমি পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট। পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়া জীবনধারণ অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। কিয়ৎক্ষণ মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া, প্রাণান্ত ঘটে, তাহাও স্বীকার, তথাপি আর কদাচ সুরাপান করিব

২৩শে মাঘ প্রভাবতীর জন্ম হয়; ১৭৮৫ শাকের ৪ঠা ফাল্গুন, তিন বৎসর বয়সে প্রভাবতীর মৃত্যু হয়। মাতামহদেব, প্রভাবতীকে অপত্যনির্ব্বিশেষে ভাল বাসিতেন। এই সময়ে, নানা-বিধ কারণে, তিনি সংসারে সম্পূর্ণ বীতরাগ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন, এই ক্ষুদ্র রচনায় তাহার আভাষ পাওয়া যায়। মনের এই অবস্থায়, স্নেহভাজনের বিয়োগে, তাঁহার স্নেহময় করুণ হৃদয় বড় ব্যথিত হইয়াছিল। প্রভাবতীর স্মৃতি চিরজাগরূক রাখিবার জন্য, তিনি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। মৃত্যুর তিন চারি মাস পূর্ব্বেও আমি তাঁহাকে একান্তে "প্রভাবতী-সম্ভাষণ" পড়িতে দেখিয়াছি। প্রভাবতীর স্মৃতি তিনি চিরদিন হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন।...

এই প্রবন্ধ, ১৭৮৬ শকাব্দার ১লা বৈশাখ লিখিত হয়।..." ('সাহিত্য', বৈশাখ, ১২৯৯, পৃ. ১০।)

না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, সেই দিন অবধি তিনি সুরাপান পরিত্যাগ করিলেন।"

সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের স্মরণীয়তা এখনো বাঙলাভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত হয়ে আছে। এই সংশয়হীন সত্য মনে রাখা দরকার যে বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির ছন্দে নতুন গদ্যরীতির মূল ছন্দ ধ্বনিত।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী লিখেছেন : "ছন্দের প্রাণ যতিতে অর্থাৎ যতিস্থাপনের বৈচিত্র্যে—এই নিয়ম গদ্য ও পদ্য দুই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যতিস্থাপনের সার্থকতাতেই মেঘনাদবধ কাব্যের অমিত্রাক্ষর আশ্চর্য সৃষ্টি, আর উহার সার্থকতার অভাবেই বৃত্রসংহার কাব্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দ মিলহীন পয়ার মাত্র। বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী গদ্যলেখকগণ সজ্ঞানে যতিস্থাপনের নিয়ম অনুসরণ করেন নাই—আঁচে আন্দাজে বা অন্ধভাবে চলিয়াছেন, কখনো কখনো তীর লক্ষ্যভেদ করিয়াছে, অধিকাংশ সময়েই করে নাই। বিদ্যাসাগরই প্রথম সজ্ঞানে শিল্পবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া নিয়মটিকে অনুসরণ করিয়াছেন...। প্রভাবতীসম্ভাষণের ভাষা হৃদয়াবেগে মন্থর, অশ্রুজলে ভারাক্রান্ত, পদে পদে কমা সেমিকোলনে ঈষৎ থামিয়া থামিয়া চলিয়াছে। ব্রজবিলাস ও তজ্জাতীয় বিতণ্ডা ও বিদ্রূপাত্মক রচনাগুলিতে ভাষা কেমন টাট্টুঘোড়ার মতো ছুটিয়াছে, চার পায়ের আঘাতে গ্রাম্য শব্দের লোষ্ট্র-খণ্ড ছুটিয়া গিয়া প্রতিপক্ষকে আহত করিয়াছে। আর সীতার বনবাসের ভাষায় ঐরাবতের গজেন্দ্রগমন! পৌরাণিক পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে ঐ ভাষাই অত্যাবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্রে পৌঁছিবার আগে ভাষার এমন বিচিত্র গতিচ্ছন্দ আর পাওয়া যাইবে না। সর্বোপরি বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির ছন্দে নব্য গদ্যরীতির মূল ছন্দ ধ্বনিত। সেই ছন্দই নানা কলমে বিচিত্রতর হইয়া আজ পর্যন্ত ধ্বনিত হইতেছে।"[২]

একথা অবিস্মরণীয় যে বাঙলাভাষায় সাহিত্যরচনা-কার্যের ভূমিকা নির্মাণ করে দিয়েছে বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত গদ্যভাষারীতি। সাহিত্যক্ষেত্রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কাছে আপন ঋণ স্বীকার করেছেন। ১৩৪৬ সালের ১২-অগ্রহায়ণ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : "যে গদ্যভাষারীতির তিনি (বিদ্যাসাগর) প্রবর্তন করেছেন তার ছাঁদটি বাংলাভাষায় সাহিত্যরচনা-কার্যের ভূমিকা নির্মাণ করে দিয়েছে। অথচ যদিও তাঁর সমসাময়িক ঈশ্বর গুপ্তের মতো রচয়িতার গদ্যভঙ্গীর অনুকরণে তখনকার অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক আপন রচনার ভিত গাঁথছিলেন, তবু সে আজ ইতিহাসের অনাদৃত নেপথ্যে অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে। তাই আজ বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার দিন এল যে, সৃষ্টিকর্তারূপে বিদ্যাসাগরের যে স্মরণীয়তা আজও বাংলাভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত, তাকে নানা নব নব পরিণতির অন্তরাল অতিক্রম করে সম্মানের অর্ঘ্য নিবেদন করা বাঙালির নিত্যকৃত্যের মধ্যে যেন গণ্য হয়।... বঙ্গসাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার করে থাকেন তবে আমি যেন স্বীকার করি, একদা তার দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।"[৩]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা' নামে একটি সভা খুলেছেন। পরে 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা' নাম বদল করে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' হল। কিছুকাল 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সম্পাদক ছিলেন বিদ্যাসাগর।

১৭৮০ শকের শ্রাবণে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় একটি 'বিজ্ঞাপন' আছে :

"তত্ত্ববোধিনী সভায় সম্পাদক পরিবর্ত্ত হইয়াছে, এনিমিত্ত সকলকে জানান

যাইতেছে, যে অতঃপর যাঁহাদের সভায় কোন পত্র লিখিবার প্রয়োজন হইবেক, তাঁহারা নিম্ন লিখিত প্রকারে শিরোনাম দিয়া লিখিবেন।

"শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক।
কলিকাতা"।
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা
সম্পাদক।"

১৭৮১ শকের জ্যৈষ্ঠে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' লুপ্ত হয়ে যায়। বিদ্যাসাগর 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র শেষ সম্পাদক।

'তত্ত্ববোধিনী সভা' থেকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' নামে একখানা মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়েছে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রথম প্রকাশিত হল ১৮৪৩ সালের ১৬-আগস্ট।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রথম সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত—উত্তরকালের একজন স্বনামধন্য লেখক। সাহিত্যক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারকে বিশেষ সাহায্য করেছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর বিদ্যাসাগর।

রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন : "অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন।"[৪]

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা পেপার-কমিটি করেছেন। পত্রিকায় কোন লেখা ছাপা হবে, তা ঠিক করে দিত পেপার-কমিটি। ওই পেপার-কমিটির একজন সভ্য ছিলেন আনন্দকৃষ্ণ বসু।

আনন্দকৃষ্ণের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের আলাপ হয়ে গেল।

আনন্দকৃষ্ণের কাছে আসত অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধগুলো। বিদ্যাসাগরও আসতেন আনন্দকৃষ্ণের কাছে। আনন্দকৃষ্ণের কথায় বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধগুলো দেখে দিতেন।

কিছুদিন পরের কথা। আনন্দকৃষ্ণ একদিন বিদ্যাসাগরকে বললেন—অক্ষয়বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

বিদ্যাসাগর বললেন—আচ্ছা বেশ, তাঁকে আসতে বলবেন।

তারপর অক্ষয়কুমার একদিন এসে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন—আমার প্রবন্ধগুলো দেখে দিয়ে আপনি আমার উপকার করেন। অনুগ্রহ করে এরকম করলে বড়ো ভালো হয়। আমি চিরবাধিত হব, বিশেষ উপকৃত হব।[৫]

১৮৫১ সালে অক্ষয়কুমারের 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (প্রথম ভাগ)' বেরিয়েছে। ওই বইয়ের 'বিজ্ঞাপনে' অক্ষয়কুমার লিখেছেন : "সকৃতজ্ঞ চিত্তে অঙ্গীকার করিতেছি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরা বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই গ্রন্থ সংশোধন বিষয়ে বিশিষ্টরূপ আনুকূল্য করিয়াছেন।"

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পেপার-কমিটির একজন সভ্য ছিলেন বিদ্যাসাগর।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র জন্য যেসব রচনা আসত, দরকার হলে রচনা অদল-বদল করা হত; পেপার-কমিটির অধিকাংশ সভ্যের পছন্দ না হলে কোনো রচনাই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ছাপা হত না। আর কারো কথা দূরে থাক,

স্বয়ং বিদ্যাসাগরের রচনাও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ছাপা হওয়ার আগে পেপার-কমিটির অধিকাংশ সভ্যের সম্মতি দরকার।

পেপার-কমিটি কী ভাবে রচনা নির্বাচন করত? দুটি উদাহরণ তুলে দিচ্ছি :

"কবির পন্থিদিগের বৃত্তান্ত বিষয়ক পাণ্ডুলেখ্য প্রেরণ করিতেছি। যথা বিহিত অনুমতি করিবেন। নিবেদনমিতি।

তত্ত্ববোধিনী সভা
১৪ আশ্বিন ১৭৭০

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত
গ্রন্থ-সম্পাদক।

প্রেরিত প্রস্তাব পাঠে পরম পরিতোষ পাইলাম। ইহা অতি সহজ ও সরল ভাষায় সুচারুরূপে রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে। অতএব পত্রিকায় প্রকাশ বিষয়ে আমি সন্তুষ্ট চিত্তে সম্মতি প্রদান করিলাম ইতি।

ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উক্ত পাণ্ডুলেখ্যর স্থানে স্থানে যে সকল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম হইয়াছে।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

প্রেরিত পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ যোগ্য।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র।
শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গভাষায় মহাভারত অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়া তাহার এক অংশ প্রেরণ করিয়াছেন দৃষ্টি করিবেন। আপনারা দেখিবেন তাহা অতি সুচারু শুদ্ধ ভাষায় পরিপাটীরূপে লিখিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া পাঠকেরা পরম পরিতোষপ্রাপ্ত হইবেন এবং পত্রিকার বিষয়ে তাঁহাদিগের অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে পারিবেক। এতদ্ভিন্ন আমারদিগের পূর্ব্বেকার আচার ব্যবহারাদির যেরূপ নিদর্শন মহাভারতে পাওয়া যায় এমত আর কুত্রাপি নাই, অতএব এই বাঙ্গালা অনুবাদ দ্বারা ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সন্ধায়ি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগেরও উপকার হইবেক। নিবেদনমিতি।

তত্ত্ববোধিনী সভা
২৬ পৌষ ১৭৭০

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।
গ্রন্থ-সম্পাদক।

গ্রন্থ-সম্পাদক মহাভারতের অনুবাদ বিষয়ে উত্তম বিবেচনা করিয়াছেন ইহা অবশ্য প্রকাশ কর্ত্তব্য।

শ্রীআনন্দকৃষ্ণ বসু।

অতি সুলোলিত (সুললিত?) ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে এবং ভরসা করি এইরূপ প্রকাশ ক্রমশঃ হয় তাহা হইলে অনেক উপকার সম্ভাবনা।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

এতদ্রূপ মহাভারতের অনুবাদ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে অতি লোকপ্রিয় করিবেক।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।”[৬]

একবার রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে একটি বক্তৃতা পড়েন। সেই বক্তৃতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অত্যন্ত ভালো লেগেছিল; কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা সেটি পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য মনে করেননি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ১৭৭৫ শকের ২৬ ফাল্গুন, একখানা চিঠিতে রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছেন: “এ বক্তৃতা আমার বন্ধুদিগের মধ্যে যাঁহারা শুনিলেন তাঁহারাই পরিতৃপ্ত হইলেন; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা ইহাকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য বোধ করিলেন না। কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহারদিগকে এ পদ হইতে বহিস্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা নাই।”[৭]

বিদ্যাসাগর সম্ভবত উক্ত ‘কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষে’র অন্যতম।

কিন্তু এ-বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ নেই, বিদ্যাসাগর ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’কে বিপুলভাবে সাহায্য করেছেন।

১৮১৩ শকাব্দের ভাদ্রমাসে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’ লিখেছে: “...এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমে পরিচালিত হইয়া বঙ্গে একটী যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। ইহা জ্ঞানালোক ও ধর্ম্মালোকে লোকের যার পর নাই উপকার করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে মহাভারত অনুবাদ করিতেন। এবং এই পত্রিকায় যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত তাহার সংশোধনের ভার তাঁহারও হস্তে ছিল। ফলত তত্ত্ববোধিনী দ্বারা এক সময় যে বঙ্গ ভাষার অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল তাহাতে বিদ্যাসাগরের অনেকটা সহায়তা ছিল।...”

হিন্দু কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের ছাত্রেরা সাব্যস্ত করলেন, ‘সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা’ নামে নতুন একখানা মাসিক পত্রিকা বের করা হবে। কর্মকর্তারা বিদ্যাসাগরকে বললেন—আমাদের এই নতুন কাগজে প্রথম কী লেখা উচিত, তা আপনি লিখে দিন। প্রথম কাগজে আপনার লেখা বেরলে, কাগজের গৌরব হবে, সকলে সমাদর করে কাগজ দেখবে।[৮]

‘সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা’র প্রথম সংখ্যা বেরল ১৮৫০ সালের আগস্ট মাসে।* প্রথম সংখ্যাতেই বিদ্যাসাগর ‘বাল্যবিবাহের দোষ’ নামে একটি রচনা লিখেছেন। রচনাটি প্রায় সম্পূর্ণ উদ্ধার করি:

“অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা দান করিলে পিতা মাতার গৌরীদানজন্য পুণ্যোদয় হয়, নবমবর্ষীয়াকে দান করিলে পৃথ্বী দানের ফল লাভ হয়; দশমবর্ষীয়াকে পাত্রসাৎ করিলে পরত্র পবিত্রলোকপ্রাপ্তি হয়, ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রপ্রতিপাদিত

---

* উত্তরকালে রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন: “ইনি (মদনমোহন তর্কালঙ্কার) ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ‘সর্ব্বশুভকরী’ নামে পত্রিকা বাহির করেন।” (রাজনারায়ণ বসু: আত্মচরিত, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩৮-৩৯)

বিদ্যাসাগর বা মদনমোহন তর্কালঙ্কার ‘সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা’ সম্পাদনা করেননি। ‘সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা’র সম্পাদকের নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। ‘সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা’ ঠনঠনিয়ার সর্ব্বশুভকরী সভার মুখপত্র।

কল্পিত ফলমৃগতৃষ্ণায় মুগ্ধ হইয়া পরিণাম বিবেচনা পরিশূন্য চিত্তে অস্মদ্দেশীয় মনুষ্য মাত্রেই বাল্যকালে পাণিপীড়নের প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন।

ইহাতে এ পর্য্যন্ত যে কত দারুণ অনর্থ সংঘটন হইতেছে, তাহা কাহার না অনুভবগোচর আছে? শাস্ত্রকারকেরা এই বাল্য বিবাহ সংস্থাপনা নিমিত্ত এবং তারুণ্যাবস্থায় বিবাহ নিষেধার্থ স্ব স্ব বুদ্ধিকৌশলে এমত কঠিনতর অধর্ম্মভাগিতার বিভীষিকা দর্শাইয়াছেন, যদ্যপি কোন কন্যা কন্যাদশাতেই পিতৃগৃহে স্ত্রীধর্ম্মিণী হয়, তবে সেই কন্যা পিতৃ মাতৃ উভয় কুলের কলঙ্ক-স্বরূপা হইয়া সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্তকে নিরয়গামী করে, এবং তাহার পিতা মাতা যাবজ্জীবন অশৌচগ্রস্ত হইয়া সমস্ত লোকসমাজে অশ্রদ্ধেয় ও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়।

ইহাতে যদিও কোন সুবোধ ব্যক্তির অন্তঃকরণে উক্ত বিধির প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি জন্মে, তথাপি তিনি চিরাচরিত লৌকিক ব্যবহারের পরতন্ত্র হইয়া স্বাভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সমর্থ হন না। তাঁহার আন্তরিক চিন্তা অন্তরে উদয় হইয়া ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণমাত্রেই অন্তরে বিলীন হইয়া যায়।

এইরূপে লোকাচার ও শাস্ত্রব্যবহারপাশে বদ্ধ হইয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা চিরকাল বাল্য বিবাহনিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ও দুরপনেয় দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছি। বাল্যকালে বিবাহ হওয়াতে বিবাহের সুমধুর ফল যে পরস্পর প্রণয়, তাহা দম্পতিরা কখন আস্বাদ করিতে পায় না, সুতরাং পরস্পরের সপ্রণয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করণ বিষয়েও পদে পদে বিড়ম্বনা ঘটে, আর পরস্পরের অত্যন্ত অপ্রীতিকর সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহাও তদনুরূপ অপ্রশস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আর নব-বিবাহিত বালক বালিকারা পরস্পরের চিত্তরঞ্জনার্থে রসালাপ, বিদগ্ধতা, বাক্‌চাতুরী, কামকলা-কৌশল প্রভৃতির অভ্যাসকরণে ও প্রকাশকরণে সর্ব্বদা সযত্ন থাকে, এবং তত্তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপায়পরিপাটী পরিচিন্তনেও তৎপর থাকে, সুতরাং তাহাদিগের বিদ্যালোচনার বিষম ব্যাঘাত জন্মিবাতে সংসারের সারভূত বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়া কেবল মনুষ্যের আকারমাত্রধারী, বস্তুতঃ প্রকৃত রূপে মনুষ্যগণনায় পরিগণিত হয় না।

সকল সুখের মূল যে শারীরিক স্বাস্থ্য, তাহাও বাল্যপরিণয়প্রযুক্ত ক্ষয় পায়, ফলতঃ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অস্মদ্দেশীয় লোকেরা যে শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যে নিতান্ত দরিদ্র হইয়াছে, কারণ অন্বেষণ করিলে পরিশেষে বাল্যবিবাহই ইহার মুখ্য কারণ নির্দ্ধারিত হইবেক সন্দেহ নাই।

হায়! জগদীশ্বর আমারদিগকে এ দুরবস্থা হইতে কত দিনে উদ্ধার করিবেন। এবং সেই শুভ দিনই বা কত কালের পর উপস্থিত হইবে। যাহা হউক, অধুনা এতদ্বিষয় লইয়া যে আন্দোলন হইতেছে, ইহাও মঙ্গল। বোধ হয়, কখন না কখন এতদ্দেশীয় লোকেরা সেই ভাবি শুভ দিনের শুভাগমনে সুখের অবস্থা ভোগ করিতে সমর্থ হইবেক।

এইরূপে অস্মদ্দেশীয় অন্যান্য অসদ্ব্যবহার বিষয়ে যদ্যপি সর্ব্বদাই লিখন পঠন ও পর্য্যালোচনা হয়, অবশ্যই তন্নিরাকরণের কোন সদুপায় স্থির হইবেক সন্দেহ নাই। অনবরত মৃত্তিকা খনন করিলে কত দিন বারি বিনির্গত না হইয়া রহিতে পারে? কাষ্ঠে কাষ্ঠে অনবরত সংঘর্ষণ করিলে কত ক্ষণ হুতাশন বিনিঃসৃত না হইয়া থাকিতে পারে? এবং অনবরত সত্যের অনুসন্ধান করিলে কত দিনই বা তাহা প্রকাশিত না হইয়া মিথ্যাজালে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?

আমরা অন্তঃকরণমধ্যে এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া বাল্যবিবাহের বিষয়ে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সৃষ্টিকর্ত্তার এই বিশ্বরচনামধ্যে সর্ব্বজীবেই স্ত্রী পুরুষ সৃষ্টি ও তদুভয়ের সংসৃষ্টি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহাতে স্পষ্টরূপে বিশ্বরূপের এই অভিপ্রায় প্রকাশ পায় যে, স্ত্রীপুংজাতি কোনরূপ অপ্রতিবন্ধ সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ থাকিয়া ইতরেতর রক্ষণাবেক্ষণপূর্ব্বক স্বজাতীয় জীবোৎপত্তি-নিমিত্ত নিত্য যত্নশীল হয়। বিশেষতঃ মনুষ্যজাতীয়েরা এক স্ত্রী, এক পুরুষ, উভয়ে মিলিত হইয়া, পরস্পরের উপরোধানুরোধ রক্ষা করত সপ্রণয়ে উত্তম নিয়মানুসারে সংসারের নিয়ম রক্ষা করে।

জগৎসৃষ্টির কত কাল পরে মনুষ্য জাতির এই বিবাহসম্বন্ধের নিয়ম চলিত হইয়াছে, যদ্যপি তদ্বিশেষ নির্দ্দেশ করা অতি দুরূহ, তথাপি এই মাত্র উল্লেখ করা যাইতে পারে, যখন মনুষ্যমণ্ডলীতে বৈষয়িক জ্ঞানের কিঞ্চিৎ নির্ম্মলতা ও রাজনীতির কিঞ্চিৎ প্রবলতা হইতে আরম্ভ হইল এবং যখন আত্মপরবিবেক, স্নেহ, দয়া, বাৎসল্য, মমতাভিমান ব্যতিরেকে সংসারযাত্রার সুনির্ব্বাহ হয় না, বিবাহসম্বন্ধই ঐ সকলের প্রধান কারণ, ইত্যাকার বোধ সকলের অন্তঃকরণে উদয় হইতে লাগিল, তখনি দাম্পত্য সম্বন্ধ অর্থাৎ বিবাহের নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

অনন্তর সর্ব্বদেশে এই বিবাহের প্রথা পূর্ব্বপূর্ব্বাপেক্ষা উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অস্মদ্দেশে উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং এমত নিকৃষ্ট হইয়াছে যে, যথার্থ বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, বর্ত্তমান বিবাহনিয়মই অস্মদ্দেশের সর্ব্বনাশের মূল কারণ।

এতদ্দেশে পিতা মাতারা পুত্রী সম্প্রদানের নিমিত্ত স্বয়ং বা অন্য দ্বারা পাত্র অন্বেষণ করিয়া, কেবল অসার কৌলীন্যমর্য্যাদার অনুরোধে পাত্র মূর্খ ও অপ্রাপ্তবিবাহকাল এবং অযোগ্য হইলেও তাহাকে কন্যা দান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য বোধ করেন, উত্তরকালে কন্যার ভাবি সুখ দুঃখের প্রতি একবারও নেত্রপাত করেন না। এই সংসারে দাম্পত্যনিবন্ধন সুখই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সুখ। এতাদৃশ অকৃত্রিম সুখে বিড়ম্বনা ঘটিলে দম্পতির চিরকাল বিষাদে কালহরণ করিতে হয়। হায়, কি দুঃখের বিষয়! যে পতির প্রণয়ের উপর প্রণয়িনীর সমুদায় সুখ নির্ভর করে, এবং যাহার সচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন সুখী ও অসচ্চরিত্রে যাবজ্জীবন দুঃখী হইতে হইবেক, পরিণয়কালে তাদৃশ পরিণেতার আচার ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে যদ্যপি কন্যার কোন সম্মতির প্রয়োজন না হইল, তবে সেই দম্পতির সুখের আর কি সম্ভাবনা রহিল।

মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল। সেই ঐক্য বয়স, অবস্থা, রূপ, গুণ, চরিত্র, বাহ্য ভাব ও আন্তরিক ভাব ইত্যাদি নানা কারণের উপর নির্ভর করে। অস্মদ্দেশীয় বালদম্পতিরা পরস্পরের আশয় জানিতে পারিল না, অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না, অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধান পাইল না, আলাপ পরিচয় দ্বারা ইতরেতরের চরিত্রপরিচয়ের কথা দূরে থাকুক, এক বার অন্যোন্য নয়নসঙ্ঘটনও হইল না, কেবল এক জন উদাসীন বাচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজনক বৃথা বচনে প্রত্যয় করিয়া পিতা মাতার যেরূপ অভিরুচি হয়, কন্যা পুত্রের সেই বিধিই বিধিনিয়োগবৎ সুখ দুঃখের অনুল্লঙ্ঘনীয় সীমা হইয়া রহিল। এই জন্যই অস্মদ্দেশে দাম্পত্যনিবন্ধন অকপট প্রণয় প্রায় দৃষ্ট হয় না, কেবল

প্রণয়ী ভর্ত্তাস্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহপরিচারিকাস্বরূপ হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

অপ্রমত্ত শারীরতত্ত্বাভিজ্ঞ বিজ্ঞ ভিষগ্বর্গেরা কহিয়াছেন, অনতীত-শৈশব জায়া-পতিসম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহার গর্ব্ভবাসেই প্রায় বিপত্তি ঘটে, যদি প্রাণবিশিষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাকে আর ধাত্রীর অঙ্কশয্যাশায়ী হইতে না হইয়া অনতিবিলম্বেই ভূতধাত্রীর গর্ব্ভশায়ী হইতে হয়। কথঞ্চিৎ যদি জনক জননীর ভাগ্যবলে সেই বালক লোকসংখ্যার অঙ্ক বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু স্বভাবতঃ শরীরের দৌর্ব্বল্য ও সর্ব্বদা পীড়ার প্রাবল্যপ্রযুক্ত সংসারযাত্রার অকিঞ্চিৎকর পাত্র হইয়া অল্পকালমধ্যেই পরত্র প্রস্থিত হয়। সুতরাং যে সন্তানোৎপত্তিফলনিমিত্ত দাম্পত্য সম্বন্ধের নির্ব্বন্ধ হইয়াছে, বাল্যপরিণয় দ্বারা সেই ফলের এই প্রকার বিড়ম্বনা সংঘটন হইয়া থাকে।

অস্মদ্দেশীয়েরা ভূমণ্ডলমধ্যস্থিত প্রায় সর্ব্বজাতি অপেক্ষা ভীরু, ক্ষীণ, দুর্ব্বলস্বভাব এবং অল্প বয়সেই স্থবিরদশাপন্ন হইয়া অবসন্ন হয়, যদ্যপি এতদ্বিষয়ে অন্যান্য সামান্য কারণ অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, বাল্যবিবাহই এ সমুদায়ের মুখ্য কারণ হইয়াছে। পিতা মাতা সবল ও দৃঢ়শরীর না হইলে সন্তানেরা কখন সবল হইতে পারে না, যেহেতু ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, দুর্ব্বল কারণ হইতে সবল কার্য্যের উৎপত্তি কদাপি সম্ভবে না, যেমন অনুর্ব্বরা ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজ বপন এবং উর্ব্বরা ক্ষেত্রে হীনবীর্য্য বীজ রোপণ করিলে ফলোদয় হয় না, সেইরূপ অকালবপনেও ইষ্টসিদ্ধির অসংগতি হয়।

ভারতবর্ষে নিতান্তই যে বীর্য্যবন্ত বীরপুরুষের অসদ্ভাব ছিল, এমত নহে, যেহেতু পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয়সন্তানেরা এবং কোন কোন বিপ্রসন্তানেরা যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্য্যে প্রবল পরাক্রম ও অসীম সাহস প্রকাশ করিয়া এই ভূমণ্ডলে অবিনশ্বর কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের তত্তচ্চরিত্র পৌরাণিক ইতিবৃত্তে প্রথিত আছে, সেই সকল বীরপুরুষ প্রসব করাতে এই ভারতভূমিও বীরপ্রসবিনী বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এবং এক্ষণেও পশ্চিমপ্রদেশে ভূরি ভূরি পরাক্রান্ত পুরুষেরা অনেকানেক বিষয়ে সাহস ও শৌর্য্যগুণের কার্য্য দর্শাইয়া পূর্ব্বপুরুষীয় পরাক্রমের দৃষ্টান্ত বহন করিতেছে। এতদ্দেশীয় হিন্দুগণ সেই জাতি ও সেই বংশে উৎপন্ন হইয়া যে এতাদৃশ দুর্ব্বলদশাগ্রস্ত হইয়াছে, বাল্যপরিণয় কি ইহার মুখ্য কারণ নয়? কেন না, পূর্ব্বকালে প্রায় সর্ব্বজাতি-মধ্যেই অধিক বয়সে দারক্রিয়া নিষ্পন্ন হইত। যদ্যপি তৎকালে অষ্টবিধ বিবাহক্রিয়ার শাস্ত্র পাওয়া যায়, তথাপি অধিকবয়োনিষ্পন্ন গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ, এই বিবাহচতুষ্টয় অধিক প্রচলিত ছিল, ইহা ভিন্ন স্বয়ম্বর প্রথারও প্রচলন ছিল, এবং এই সমুদায়প্রকার বিবাহক্রিয়া বরকন্যার অধিক বয়স ব্যতীত সম্ভবে না। আরো আমরা অনুসন্ধান দ্বারা পশ্চিমদেশীয় লোকমুখে জ্ঞাত আছি, তদ্দেশে অদ্যাপি প্রায় সর্ব্বজাতিমধ্যে বরকন্যার অধিক বয়সে বিবাহকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, সুতরাং তদ্দেশে জনকজননীসদৃশ অপত্যোৎপত্তির কোন অসংগতি না থাকাতে তাহারা প্রায় সকলেই পরাক্রমী ও সাহসী হইয়া আসিতেছে। ইহার প্রমাণ, পশ্চিমদেশীয়েরা যখন অন্যবিধ জীবিকার উপায় না পায়, তখনি রাজকীয় সৈন্যশ্রেণীতে ও অন্যান্য ধনাঢ্য লোকের দৌবারিকতাদি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অক্লেশে আজীবন নির্ব্বাহ করে। এতদ্দেশীয়েরা অন্নাভাবে জঘন্য বৃত্তিও স্বীকার করে, তথাপি কোন সাহসের

ও পরাক্রমের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। এই জন্যই রাজকীয় সৈন্যমধ্যে কখন বঙ্গদেশোৎপন্ন ব্যক্তিকে দেখা যায় নাই। উৎকলদেশীয়েরা আমারদিগের অপেক্ষাও ভীরু এবং দুর্ব্বলস্বভাব, এ নিমিত্ত আমরাও তাহাদিগকে ভীত ও কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করিয়া থাকি। জানা গিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যেও এতদ্দেশের ন্যায় বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। অতএব পাশ্চাত্ত্য লোকের সহিত আমারদিগের ও উৎকলদিগের সাহস ও পরাক্রম বিষয়ে এতাদৃশ গুরুতর ইতর বিশেষ দেখিয়া কাহার না স্পষ্টই বোধ হইবে যে, বাল্যপরিণয়ই এতাদৃশ বৈলক্ষণ্যের কারণ হইয়াছে, নতুবা কি হেতুক যে উভয় দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, তদ্দেশীয়েরাই দুর্ব্বল ও সাহসবিহীন হয়, এবং যে প্রদেশে অধিক বয়সে বিবাহ হইতেছে, তদ্দেশীয়েরাই বা কেন সাহসী ও পরাক্রান্ত হইতেছে।

এতদ্দেশে যদ্যপি স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রথা প্রচলিত থাকিত, তবে অস্মদ্দেশীয় বালক বালিকারা মাতৃসন্নিধান হইতেও সদুপদেশ পাইয়া অল্প বয়সেই কৃতবিদ্য হইতে পারিত। সন্তানেরা শৈশব কালে যেরূপ স্ব স্ব প্রসূতির অনুগত থাকে, পিতা বা অন্য গুরুজনের নিকটে তাদৃশ অনুগত হয় না। শিশুগণের নিকটে সস্নেহ মধুর বচন যাদৃশ অনুকূলরূপে অনুভূয়মান হয়, উপদেশকের হিতবচন তাদৃশ প্রীতিজনক নহে। এই নিমিত্তে বালকেরা স্ত্রী-সমাজে অবস্থিত করিয়া যাদৃশ সুখী হয়, পুরুষসমাজে থাকিয়া তাদৃশ সুখী ও সন্তুষ্ট হয় না। অতএব স্তনপান পরিত্যাগ করিয়াই যদি বালকেরা মাতৃ-মুখ-চন্দ্রমণ্ডল হইতে সরস উপদেশসুধা স্বাদ করিতে পায়, তবে বাল্যকালেই বিদ্যার প্রতি দৃঢ়তর অনুরাগী হইয়া অনায়াসে কৃতবিদ্য হইতে পারে। কারণ, সন্তানের হৃদয়ে জননীর উপদেশ যেমন দৃঢ়রূপে সংসক্ত হয় ও তদ্দ্বারা যত শীঘ্র উপকার দর্শে, অন্য শিক্ষকের দ্বারা তাহার শতাংশেরও সম্ভাবনা নাই, জননীর উপদেশকতাশক্তি থাকাতেই ইউরোপীয়েরা অল্প বয়সেই বিচক্ষণ ও সভ্যলক্ষণসম্পন্ন হয়। অতএব যাবৎ অস্মদ্দেশ হইতে বাল্যবিবাহের নিয়ম দূরীকৃত না হইবে, তাবৎ উক্তরূপ উপকার কদাচ ঘটিবে না। আমরা অবগত আছি, কোন কোন ভদ্র সন্তানেরা স্ব স্ব কন্যাসন্তানদিগকেও পুত্রবৎ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই কন্যাদিগের বর্ণপরিচয় হইতে না হইতেই উদ্বাহের দিন উপস্থিত হয়। সুতরাং তাহার পাঠের প্রস্তাব সেই দিনেই অস্তগত হইয়া যায়। পরে পরগৃহবাসিনী হইয়া তাহাকে পরের অধীনে শ্বশ্রূ শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের ইচ্ছানুসারে গৃহসম্মার্জ্জন, শয্যাসজ্জন, রন্ধন, পরিবেষণ ও অন্যান্য পরিচর্য্যার পরিপাটী শিক্ষা করিতে হয়। পিতৃগৃহে যে কয়েকটি বর্ণের সহিত পরিচয় হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই স্থালী, কটাহ, দর্ব্বী প্রভৃতির সহিত নিয়ত সদালাপ হওয়াতে একবারেই লোপ পাইয়া যায়। ফলতঃ সেই কন্যাদিগের পিতা মাতা যদ্যপি এতদ্দেশীয় বিবাহনিয়মের বাধ্য হইয়া শিক্ষার উপক্রমেই কন্যাদিগে পাত্রসাৎ না করেন, তবে আর কিছুকাল শিক্ষা করিলেই তাঁহাদিগের সেই দুহিতৃগণ ভাবী সন্তানগণের উপদেশক্ষম হইয়া পিতা মাতার অশেষ অভিলাষ সফল করিতে পারেন। অতএব অধুনাতন সভ্য সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা স্ত্রীজাতির শিক্ষা দান বিষয়ে যেরূপ উদ্যোগ করিবেন, তদ্রূপ বাল্যবিবাহপ্রথার উচ্ছেদ করণেও যত্নশালী হউন, নচেৎ কদাচ অভীষ্টসিদ্ধি করিতে পারিবেন না।

বাল্যকালে বিবাহ করিয়া আমরা সর্ব্বতোভাবে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হই। কারণ, প্রথমতঃ বিবাহঘটিত আমোদপ্রমোদে ও কেলিকৌতুকে বিদ্যা শিক্ষার

মুখ্য কাল যে বাল্য কাল, তাহা বৃথা ব্যয় হইয়া যায়। অনন্তর উপার্জ্জনক্ষমতার জন্ম না হইতেই সন্তানের জন্মদাতা হই। সুতরাং তখন নিত্যপ্রয়োজনীয় অর্থের নিমিত্তে অত্যন্ত ব্যাকুল হইতে হয়। কারণ, গৃহস্থ ব্যক্তির হস্তে ক্ষণেক অর্থ না থাকিলে চতুর্দ্দশ ভুবন শূন্যময় প্রতীত হইতে থাকে। তৎকালে যদি অসৎ কর্ম্ম করিয়াও অর্থলাভ সম্পন্ন হয়, তাহাতেও নিতান্ত পরাঙ্মুখতা না হইয়া, বরং বার বার প্রবৃত্তি জন্মিতে থাকে। অনেক স্থলে এমতও দৃষ্ট হইয়াছে যে, বাস্তবিক সংস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিরাও কতকগুলি অপোগণ্ড পরিবারে পরিবৃত হইয়া অগত্যা দুষ্ক্রিয়াকরণে সম্মত হইয়াছেন। আর ঐরূপ দুরবস্থাকালে পরম প্রীতির পাত্র পুত্রকলত্রাদি পরিবারবর্গ উপসর্গবৎ বোধ হয়। তখন কাজে কাজেই পিতৃসত্ত্বে তাঁহার অধীন, কখন বা সহোদরদিগের অনুগ্রহোপজীবী, কখন বা আত্মীয়বর্গের ভারস্বরূপ হইয়া স্বকীয় স্বাধীনতাসুখে বঞ্চিত ও জনপদে পদে পদে অপমানিত হইয়া অতি কষ্টে মনোদুঃখে জীবন ক্ষয় করিতে হয়। অতএব যে বাল্যবিবাহ দ্বারা আমাদিগের এতাদৃশী দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে, সমূলে তাহার উচ্ছেদ করা কি সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর নহে?

যদ্যপি কোন ব্যক্তি এমত আপত্তি উপস্থিত করেন যে, অস্মদ্দেশে বাল্যপরিণয়প্রথা না থাকিলে বালক বালিকাদিগের দুষ্কর্ম্মাসক্ত হইবার সম্ভাবনা। এ কথায় আমরা একান্ত ঔদাস্য করিতে পারি না; কিন্তু ইহা অবশ্যই বলিতে পারি, যদি বাল্যকালাবধি বিদ্যার অনুশীলনে সর্ব্বদা মন নিবিষ্ট থাকে, তাহা হইলে কদাপি দুষ্ক্রিয়াপ্রবৃত্তির উপস্থিতিই হয় না। কারণ, বিদ্যা দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মে ও সদসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিচার জন্মে এবং বিবেকশক্তির প্রাখর্য্য বৃদ্ধি হয়। তাহা হইলে অসদিচ্ছার উদয় হইবার অবসর কোথায়? অতএব অপক্ষপাতী হইয়া বিবেচনা করিলে এতাদৃশ পূর্ব্বপক্ষই উপস্থিত হইতে পারে না।

কত বয়সে মনুষ্যদিগের মৃত্যু ঘটনার অধিক সম্ভাবনা, যদি আমরা এই বিষয়ের আলোচনা করি, তবে অবশ্যই প্রতীতি হইবে, মনুষ্যের জন্মকাল অবধি বিংশতি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত মৃত্যুর অধিক সম্ভাবনা। অতএব বিংশতি বর্ষ অতীত হইলে যদ্যপি উদ্বাহকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়, তবে বিধবার সংখ্যাও অধিক হইতে পারে না। এবং পিতামাতাদিগের তন্নিমিত্ত আশঙ্কার লাঘবও হইতে পারে। যেহেতু অস্মদ্দেশে বিধবা-বেদনের বিধি দৃঢ়তররূপ প্রতিষিদ্ধ হওয়াতে শাস্ত্রানুসারে বিধবাগণের যেরূপ কঠোর ব্রতানুষ্ঠান ও তজ্জন্য যে প্রকার দুঃসহ দুঃখ সহন করিতে হয়, তাহা কাহার না অনুভবগোচর আছে?... অতএব যদি কোন বালিকা অনাথা হইয়া এইরূপ দারুণ দুরবস্থায় পতিতা হয়, যাহা বাল্যবিবাহে নিয়তই ঘটিতে পারে, তবে বিবেচনা কর, তাহার সমান দুঃখিনী ও যাতনাভাগিনী আর কে আছে? যে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাচরণ পরিণত শরীর দ্বারাও নির্ব্বাহকরণ দুষ্কর হয়, সেই দুশ্চর ব্রতে কোমলাঙ্গী বালিকাকে বাল্যাবধি ব্রতী হইতে হইলে তাহার সেই দুঃখদগ্ধ জীবন যে কত দুঃখেতে যাপিত হয়, বর্ণনা দ্বারা তাহার কি জানাইব। আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছি, এইরূপ শত শত হতভাগা কুমারী উপবাসশর্ব্বরীতে ক্ষুৎপিপাসায় ক্ষামোদরী শুষ্কতালু ম্লানমুখ হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া যায়, তথাপি কোন কারুণিক ব্যক্তি তাহার তাদৃশ শোচনীয়াবস্থাতে করুণা দর্শাইয়া নিষ্ঠুর শাস্ত্রবিধি ও লোকাচার উল্লঙ্ঘনে সাহস করিতে চাহেন না। আর ঐ অভাগিনী-গণেরও এমত সংস্কারের দৃঢ়তা জন্মে যে, যদি প্রাণবায়ুর প্রয়াণ হইয়া যায়,

তাহাও স্বীকার, তথাপি জলবিন্দু মাত্র গলাধঃকরণ করিতে চায় না। অতএব যে সময়ে লালন পালন শরীর সংস্কারাদি দ্বারা পিতা মাতার সন্তানদিগকে পরিরক্ষণ করা উচিত, তৎকালে পরিণয় দ্বারা পরগৃহে বিসর্জ্জন দিয়া এতাদৃশ অসীম দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করা নিতান্ত অন্যায্য কর্ম্ম। আর ভদ্রকুলে বিধবা স্ত্রী থাকিলে যে কত প্রকার পাপের আশঙ্কা আছে, বিবেচনা করিলে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। বিধবা নারী অজ্ঞানবশতঃ কখন কখন সতীত্ব ধর্ম্মকেও বিস্মৃত হইয়া বিপথগামিনী হইতে পারে, এবং লোকাপবাদভয়ে ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি অতি বিগর্হিত পাপ কার্য্য সম্পাদনেও প্রবৃত্ত হইতে পারে। অতএব অল্প বয়সে যে বৈধব্য দশা উপস্থিত হয়, বাল্যবিবাহই তাহার মুখ্য কারণ। সুতরাং বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া অতিশয় নির্দ্দয় ও নৃশংসের কর্ম্ম। অতএব আমরা বিনয়বচনে স্বদেশীয় ভদ্র মহাশয়দিগের সন্নিধানে নিবেদন করিতেছি, যাহাতে এই বাল্যপরিণয়রূপ দুর্নয় অস্মদ্দেশ হইতে অপনীত হয়, সকলে একমত হইয়া সতত এমত যত্নবান্ হউন।

বাল্যবিবাহ বিষয়ে আমরা অদ্যকার পত্রিকায় যাহা লিখিলাম, ইহা কেবল উপক্রম মাত্র। এতদ্বিষয়ক হেতু, যুক্তি ও দৃষ্টান্ত আমাদিগের মনে মনে অনেক পরিশিষ্ট রহিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে তাহা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিব না।”

বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহের বিরোধী।

বড়ো মেয়ে হেমলতাকে নিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী একদিন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে যাচ্ছেন। হেমলতার বয়স তখন ষোলো বছর, অথচ বিয়ে হয়নি। পথে হেমলতা বলল—আচ্ছা, বাবা, এত বয়সেও তুমি আমার বিয়ে দাওনি, এ জন্যে পণ্ডিতমশায় তোমায় কিছু বলবেন না তো!

শিবনাথ বললেন—বিদ্যাসাগর সবরকম কুসংস্কারের বিরোধী, অতএব তোমার দুর্ভাবনার কোনো কারণ নেই, মা।

বিদ্যাসাগরের বাড়িতে পৌঁছনো গেল। নানা কথাবার্তার পর শিবনাথ, পথে হেমলতা যা বলেছিল, সেকথা খোলাখুলি বললেন বিদ্যাসাগরকে। কথা শুনে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন বিদ্যাসাগর। তারপর হেমলতাকে বললেন—কি গো, তুমি কি ভাবো, বেশি বয়সে মেয়ের বিয়ে দেবার ব্যাপারে তোমার বাবাই খুব বাহাদুর। তুমি বুঝি জানো না, বিয়ের সময় আমার মেয়েদের বয়স তোমার থেকেও বেশি হয়েছিল। তাছাড়া তোমার ভাবনা কি। তোমার বাবা যদি তোমার বিয়ে না-ই ঠিক করেন, উপযুক্ত পাত্র হিসেবে আমি তো হাতের কাছেই হাজির আছি। তুমি যেদিন বলবে, সেদিনই তোমাকে গিন্নি করে আমার বাড়িতে নিয়ে আসব।[১]

১৮৫৮ সালের ১৫-নভেম্বর ‘সোমপ্রকাশ’ নামে একখানা সাপ্তাহিকপত্র সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ‘সোমপ্রকাশ’ প্রকাশের পরিকল্পনা করেছেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর।

১৮৬৫ সালের ৯-জানুআরি ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ লিখেছে :

“The *Shome Prokash* was first projected by Pundit Eswar Chunder Vidyasaghur, and we believe the first number was written by him. . . .”

১২৯৩ সালের ১৫-ভাদ্র ‘সোমপ্রকাশ’ লিখেছে : “সারদাপ্রসাদ নামক জনৈক বধির ছাত্রের ভরণপোষণ করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ই প্রথমে এই

পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। প্রস্তাব হয় যে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং এই পত্রিকাখানি লিখিবেন এবং সারদাপ্রসাদ তাহার সম্পাদক হইবেন, সারদাপ্রসাদ তৎপরে বর্দ্ধমানের মহারাজার অধীনে একটী কর্ম্ম পাইয়া বর্দ্ধমানে গমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে সোমপ্রকাশ প্রকাশের কল্পনাটিও পরিত্যক্ত হয়।... বিদ্যাসাগর মহাশয় আবার "সোমপ্রকাশ" সৃজনের কল্পনা করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ আর কয়েকজন পণ্ডিতকে আহ্বান করিয়া "সোমপ্রকাশ" প্রকাশের প্রস্তাব করেন। সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের হস্তে ইহার সম্পাদকীয় ভার অর্পণ করা হয়।"

উত্তরকালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন : "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আর এক কীর্ত্তি সোমপ্রকাশ। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিতেন—যে-সকল বাংলা কাগজ ছিল, তাহাতে নানা রকম খবর দিত; ভাল খবর থাকিত, মন্দ খবরও থাকিত। লোকের কুৎসা করিলে কাগজের পসার বাড়িত, অনেক সময় কুৎসা করিয়া তাহারা পয়সাও রোজগার করিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিলেন যদি কোনো কাগজে ইংরেজীর মত রাজনীতি চর্চ্চা করা যায়, তাহা হইলে বাংলা খবরের কাগজের চেহারা ফেরে। তাই তাঁহারা কয়েকজন মিলিয়া সোমপ্রকাশ বাহির করিলেন; সোমবারে কাগজ বাহির হইত বলিয়া নাম হইল সোমপ্রকাশ।"

এবার 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র কথায় আসা যাক।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' ইংরেজি পত্রিকা, সম্পাদক ছিলেন হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৮৬১ সালের ১৪-জুন হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু হল। হরিশ্চন্দ্রের সংসার গেল নিঃস্ব হয়ে। নিঃস্ব পরিবারের মুখ চেয়ে বিদ্যাসাগর এগিয়ে এলেন। বিদ্যাসাগরের কথায় কালীপ্রসন্ন সিংহ পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কিনে নিলেন 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র স্বত্ব এবং ছাপাখানার সমস্ত সরঞ্জাম। কালীপ্রসন্নের ইচ্ছায় তাঁর বন্ধু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হলেন 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র ম্যানেজিং এডিটর। কিন্তু বেশিদিন থাকতে পারলেন না তিনি। নাম করা যাবে না, এমন একজনের চক্রান্তে বিরক্ত হয়ে শম্ভুচন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ছেড়ে চলে গেলেন।

কালীপ্রসন্ন এখন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নিয়ে কী করেন? তিনি 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সমস্ত ভার বিদ্যাসাগরের হাতে তুলে দিলেন।

অল্প কিছুদিন বিদ্যাসাগর কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদকীয় কাজ চালিয়ে নিলেন। তারপর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর আর বিদ্যাসাগর 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদন-ভার নিতে অনুরোধ করলেন মাইকেল মধুসূদনকে।

কিছুদিনের জন্য 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক রইলেন মাইকেল মধুসূদন।

তারপর কৃষ্ণদাস পালের কথা।

কৃষ্ণদাস পাল তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে চাকরি করেন। কৃষ্ণদাসের উপর দয়া হল বিদ্যাসাগরের। কৃষ্ণদাসকে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' চালাতে বললেন তিনি।

কিন্তু কৃষ্ণদাসের বয়স অল্প তখন। তাই বিদ্যাসাগর কৃষ্ণদাসের উপর পুরোপুরি নির্ভর করলেন না। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র জন্য বিদ্যাসাগর নিজের ইচ্ছামতো লেখা কৃষ্ণদাসকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে লাগলেন। এই ব্যবস্থাই চলল কিছুকাল। অর্থাৎ, কিছুদিনের জন্য কৃষ্ণদাস বিদ্যাসাগরের অধীনে থেকে 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদকের কাজ করেছেন। বিদ্যাসাগরের অনুগ্রহেই কৃষ্ণদাস পাল

'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক হয়েছেন।[১০] পরবর্তীকালে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছেন কৃষ্ণদাস পাল।*

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন : "বিদ্যাসাগর মহাশয় খুব পরিশ্রম করিতে পারিতেন, তাঁহার অনেকগুলি বই ছিল। তিনি সব বইয়ের প্রুফ নিজে দেখিতেন এবং সর্ব্বদাই উহার বাংলা পরিবর্ত্তন করিতেন। দেখিতাম প্রত্যেক পরিবর্ত্তনেই মানে খুলিয়াছে। তিনি প্রেসের কাজ বেশ জানিতেন—বুঝিতেন। বহুদিন ধরিয়া তিনি সংস্কৃত প্রেসের মালিক ছিলেন। তখন সংস্কৃত প্রেসই বাংলার ভাল প্রেস ছিল। তিনি সংসারের কাজ খুব বুঝিতেন; প্রেস হইল, বই ছাপা হইল, বিক্রয় করিবে কে? তাহার জন্য সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি (১৮৪৭) নাম দিয়া এক বইয়ের দোকান খুলিলেন।"[১১]

শেষ প্রুফ নিজে দেখে দিতেন বিদ্যাসাগর। শেষ প্রুফ দেখার পর কেউ যদি ভুল বের করে দিতে পারত, সে টাকা পেত। একেকটি সেরকম ভুল ধরার জন্য একেক টাকা করে পেত। সেরকম ভুল সুরেশ সমাজপতি ছাড়া আর-কেউ কখনো ধরতে পারেননি।[১২]

ছাপাখানার উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর বিস্তর পরিশ্রম করেছেন। টাইপকেসে কোথায় কোন বাঙলা অক্ষরটি থাকলে সুবিধা হয়, ছাপার কাজ সহজ হয়, তারও একটা নিয়ম বের করেছেন বিদ্যাসাগর। 'বিদ্যাসাগর সার্ট' বলে তাকে।[১৩]

সংস্কৃত প্রেস নিয়ে অনেক ঘটনা আছে বিদ্যাসাগরের জীবনে। আগে সামান্য কিছু বলা হয়েছে। এখানেও অন্তত দু-একটি ঘটনা না বললে চলে না।

সংস্কৃত প্রেস স্থাপিত হওয়ার কিছুদিন পরে প্রেসের জন্য একটি সরকার দরকার হয়ে পড়ল।

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ভগ্নীপতির নাম মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগর জানেন, মাধবচন্দ্র অতি কষ্টে সংসার চালান। অতএব সেই মাধবচন্দ্রকেই প্রেসের সরকার বহাল করার কথা বললেন বিদ্যাসাগর।

কিন্তু মদনমোহন প্রথমে তাতে রাজি হননি। বিদ্যাসাগরের পীড়াপীড়িতে শেষপর্যন্ত তাঁকে রাজি হতে হল। মাধবচন্দ্র প্রেসের সরকার বহাল হলেন। মাইনে দশটাকা।

---

* শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "যদিও বাবু কৃষ্ণদাস পাল তৎকালীনের কোন বিখ্যাত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া জুনিয়র বা সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নহেন, তথাপি বাটীতে স্বয়ং সর্ব্বদা অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার ভালরূপ ইংরাজী লিখিবার অসাধারণ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। কৃষ্ণদাস পাল অতিশয় বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন, বিশেষতঃ অগ্রজের (বিদ্যাসাগর) সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল; তজ্জন্য অগ্রজ মহাশয় (বিদ্যাসাগর) বাবু কৃষ্ণদাস পালকে হিন্দু পেট্রিয়টের স্বত্ব এককালে সমর্পণ করেন। তদ্দর্শনে অনেক কৃতবিদ্য লোক স্পষ্ট বাক্যে বলিতেন যে, বিদ্যাসাগর কৃষ্ণদাসকে বিনামূল্যে হিন্দু পেট্রিয়ট একবারে দিয়া ভাল কাজ করেন নাই, যেহেতু কৃষ্ণদাস পাল কোনও ভাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া বৃত্তি পায় নাই। হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ ও কৃষ্ণনগরের কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ যশস্বী লেখকদিগের মধ্যে কাহাকেও না দিয়া অন্যায় কার্য্য করিলেন। তৎকালে অনেকেই অগ্রজকে (বিদ্যাসাগর) নির্ব্বোধ জ্ঞান করিয়াছিলেন। কিন্তু বাবু কৃষ্ণদাস পাল হিন্দুপেট্রিয়টের এডিটার হইয়া ক্রমশঃ বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। হিন্দুপেট্রিয়ট উপলক্ষেই বাবু কৃষ্ণদাস পাল বিখ্যাত হইয়াছিলেন, ও ক্রমশঃ তিনি ভারত ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন। পরন্তু কৃষ্ণদাস বাবুর ওরূপ নাম ও প্রতিপত্তি লাভ হইবার আশা ছিল না, অগ্রজই (বিদ্যাসাগর) কৃষ্ণদাস বাবুর এই উন্নতির মূল।" (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত, কলকাতা, ১৮৯১, পৃ. ১৪০-৪১।)

কিছুকাল পরে মাধবচন্দ্র মারা গেলেন।

মদনমোহনের বোন কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগরের কাছে কেঁদে পড়লেন—দাদা! কাল কী খাব, তার সংস্থান নেই। দয়া করে আমার কোনো উপায় করো। নয়তো ছেলেমেয়ে নিয়ে আমায় উপোস করে মরতে হবে।

সত্যি কথা। মদনমোহনের বোন একবিন্দু বাড়িয়ে বলেননি।

বিদ্যাসাগর মদনমোহনকে বললেন—যতদিন তোমার ভাগ্নেটি মানুষ না হয়, ততদিন ছাপাখানার তহবিল থেকে তোমার বোনকে মাস-মাস দশটাকা দিতে হবে।

নিতান্ত অনিচ্ছায় মদনমোহন রাজি হলেন।

ছাপাখানার তহবিল থেকে মাসে-মাসে দশটাকা পেতে লাগলেন মদনমোহনের বোন। কায়ক্লেশে সংসার চালাতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে আরেক অভাবনীয় কাণ্ড হল। মুর্শিদাবাদ থেকে মদনমোহন লিখে পাঠালেন : আমার ভগিনীকে, ছাপাখানার তহবিল হইতে, মাস মাস যে দশ টাকা দেওয়া হয়, তাহা আমি, আগামী মাস হইতে, রহিত করিলাম।

খবর পেয়ে মদনমোহনের বোন কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগরের কাছে কাঁদতে লাগলেন।

বিদ্যাসাগর বললেন—ছাপাখানার তহবিল থেকে আর আমি তোমায় টাকা দিতে পারব না। আমি এইমাত্র করতে পারি, আমার অংশের পাঁচটাকা তুমি মাস-মাস আমার কাছ থেকে পাবে; এর বেশি দেওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে।

তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি চলে গেলেন মদনমোহন তর্কালংকারের বোন।

উত্তরকালে বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "তিনি (মদনমোহন তর্কালংকারের ভগিনী) যত দিন জীবিত ছিলেন, আমার নিকট হইতে, মাস মাস, পাঁচ টাকা পাইয়া, কোনও রূপে দিনপাত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই, তদীয় পুত্রটির প্রাণত্যাগ ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয়া বিধবা কন্যা, যত দিন জীবিত ছিলেন, আমার নিকট হইতে মাস মাস দুই টাকা লইয়া, দিনপাত করিয়াছিলেন।"[১৪]

আরেকরকম। আরেকটি ঘটনা।

কী একটা কাজে সংস্কৃত প্রেসে এসেছেন কৃষ্ণকিশোর। প্রেসের ম্যানেজারের নাম পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের ভাই। বিদ্যাসাগরকে 'দাদা' বলে ডাকেন পীতাম্বর।

কৃষ্ণকিশোর পীতাম্বরকে জিজ্ঞেস করলেন—আমার কাজটার কী হল?

পীতাম্বর বললেন—দাদার হুকুম না হলে কিছুই হবে না।

এখানে কে কার দাদা, কে কার ভাই—কিছুই জানেন না কৃষ্ণকিশোর। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কে? তোমার দাদাই বা কে?

পীতাম্বর রাগ করে বললেন—আমার দাদাকে জানো না? ভারতবর্ষের, এমন কি পৃথিবীর লোক দাদাকে জানে, আর তুমি জানো না?

প্রেসের আপিসঘরে বসে কাজ করছিলেন বিদ্যাসাগর, পীতাম্বরের কথা তাঁর কানে গেল। তিনি বললেন—এমন গাধা না হলে কি আমার প্রেসের ম্যানেজার হয়! 'তুমি কে, তোমার দাদা কে', জিজ্ঞেস করছে, বল, 'আমি বিদ্যাসাগরের ভাই'। তা না, 'আমার দাদাকে চেনো না! আমার দাদাকে না জানে এমন লোক ভারতবর্ষে নেই!'[১৫]

যজ্ঞেশ্বর ঘোষ সংস্কৃত প্রেসে কাজ করে। যজ্ঞেশ্বরের মা মারা গেলেন। গলায় কাছা দিয়ে প্রেসে এসেছে যজ্ঞেশ্বর। কাজ করছে।

বিদ্যাসাগর ডাকলেন যজ্ঞেশ্বরকে। বললেন—তুই আমার প্রেসে ঢুকলি কেন? বেরো প্রেস থেকে।

কেন, বিদ্যাসাগর রাগ করলেন কেন। কিছুই বুঝে উঠতে পারল না যজ্ঞেশ্বর।

বিদ্যাসাগর বললেন--যা, আমার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়া।

হুকুম তামিল করল যজ্ঞেশ্বর। বিদ্যাসাগর এসে জিজ্ঞেস করলেন—তোর মা মরেছে কতদিন? মায়ের শ্রাদ্ধ কী করে করবি?

—যা একটু জমি আছে, তা বেচে বা বন্ধক রেখে শ্রাদ্ধ করব।

—কত লাগবে?

—আজ্ঞে, পাঁচ-সাতশো টাকার কমে নিষ্কৃতি পাব না।

প্রেসের ম্যানেজারকে ডাকলেন বিদ্যাসাগর। বললেন—যজ্ঞেশ্বরকে সাতশো টাকা দাও।

সংস্কৃত প্রেসে চল্লিশ টাকা মাইনে পায় যজ্ঞেশ্বর। তার কাছে একসঙ্গে সাতশো টাকা যেমন-তেমন কথা নয়।

যা হোক, বিদ্যাসাগর যজ্ঞেশ্বরকে বললেন—যোগে, আজ থেকে তোর একমাস ছুটি। মা মরেছে, সর্বনাশ হয়েছে, ও আবার এসেছে আমার কাজ করতে!

যজ্ঞেশ্বর চলে গেল। ফিরে এল একেবারে শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়ে।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ রে যোগে, টাকায় তোর কুলিয়েছে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে এখন হাতে কিছু নেই। ধার করে খেতে হবে।

বিদ্যাসাগর প্রেসের ম্যানেজারকে বলে দিলেন—ওর দরকারমতো ওকে কিছু-কিছু টাকা দিও।

তারপর মাইনের তারিখ এসে গেল। যজ্ঞেশ্বরের মাইনে তো চল্লিশ টাকা; প্রেসের ম্যানেজার দেখি মাইনে থেকে ধার বাবদ দশ টাকা কেটে রেখে যজ্ঞেশ্বরকে তিরিশ টাকা দিতে যাচ্ছেন।

তিরিশ টাকায় সারা মাস কেমন করে চলবে। যজ্ঞেশ্বর ম্যানেজারকে বলল-- এত কাটলে বাড়িতে খাবে কী?

একটু দূরে আছেন বিদ্যাসাগর, সেখান থেকে তিনি সব কথা শুনলেন। সেখান থেকেই তিনি ম্যানেজারকে বললেন—ওহে, তুমি কি জানো না, ওর মাইনে বাড়ানো হয়েছে। ওর মাইনে যে এমাস থেকে ষাট টাকা হয়েছে। ষাট টাকা থেকে দশ টাকা কেটে রেখে ওকে মাসে-মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দিও।[১৬]

সংস্কৃত প্রেস স্থাপনের মূলে দুজন আছেন জানি—মদনমোহন তর্কালঙ্কার আর বিদ্যাসাগর। এই ব্যাপারে মদনমোহন কিম্বা বিদ্যাসাগর—কেউই গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের নাম উচ্চারণ করেননি। এমন কি, স্বয়ং গিরিশচন্দ্রও সংস্কৃত প্রেসের জন্মের সঙ্গে নিজের কোনোরকম সম্পর্কের কথা কোথাও বলেননি।

কিন্তু গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের ছেলে হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন এক জায়গায় লিখেছেন: "... "সংস্কৃত-যন্ত্র" নামক একটি ছাপাখানা বিদ্যাসাগর-মহাশয়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও আমার পিতৃদেব গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই তিনজনে একত্র হইয়া সৃষ্টি করেন...। কিছুদিন পরে মদনমোহন তর্কালঙ্কার বহরমপুরে

চলিয়া গেলেন এবং আমার পিতৃদেব "গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র" নামক পৃথক্ একটি ছাপাখানা করিলেন। সুতরাং "সংস্কৃত যন্ত্র" নামক ছাপাখানাটি কেবল বিদ্যাসাগরের রহিল।"[১৭]

আরেক জায়গায় হরিশচন্দ্র কবিরত্ন লিখেছেন :

"কিছুদিন পরে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় মুরসিদাবাদের জজপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কাজেই মুদ্রাযন্ত্র চালাইবার ভার উভয়ের উপর ন্যস্ত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালে সংস্কৃত কালেজের প্রিন্‌সিপাল ছিলেন; সুতরাং তাঁহার হস্তে অনেক কার্য্যভার ছিল; তিনি কেবল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া দিতেন; পিতৃদেব ঐগুলি মুদ্রিত করা, প্রুফ্ শোধন করা প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।...

কালক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত গ্রন্থই অধিকসংখ্যক হইয়া উঠিতে লাগিল; মদনমোহন তর্কালঙ্কারের গ্রন্থ তদপেক্ষা অনেক কম হইল; পিতৃদেবের প্রকাশিত গ্রন্থ ত অতীব অল্প ছিল। পিতৃদেব যৎপরোনাস্তি শারীরিক করিয়া মুদ্রাযন্ত্র চালাইতেন বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকেও সমান অংশ দিতেন। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা পিতৃদেবের ন্যায়সঙ্গত বোধ হইল না। তিনি একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন, "আপনার রচিত গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ আমাদের গ্রহণ করা উচিত হয় না; মদনেরও এইরূপ মত হইবে; আপনি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানুন"। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে ঐ কথায় কর্ণপাত করেন নাই। পরে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়কে পত্র লিখিয়া যখন তাঁহারও ঐরূপ মত জানিলেন, তখন অগত্যা পিতৃদেবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় ও পিতৃদেব উভয়ে সংস্কৃত যন্ত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই দিলেন, এবং তৎকালে তাঁহাদের যাহা কিছু লভ্যাংশ প্রাপ্য হইয়াছিল তাহা গ্রহণ করিলেন।..."[১৮]

'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াসে' বিদ্যাসাগর সংস্কৃত প্রেস সম্পর্কে যে-বিবরণ দিয়েছেন তার সঙ্গে হরিশচন্দ্র কবিরত্নের এই বিবরণের পুরোপুরি মিল নেই।*

এখানে গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সম্পর্কে দু-চার কথা বলা যেতে পারে।

১৮২২ সালের ২৬-সেপ্টেম্বর গিরিশচন্দ্রের জন্ম। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র গিরিশচন্দ্র। সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়ে গিরিশচন্দ্র বাড়ি গিয়েছেন; সেবারেই গিরিশচন্দ্রের বাবা মারা গেলেন। পিতৃহীন সহায়সম্বলশূন্য গিরিশচন্দ্র কলকাতায় চলে এলেন বিদ্যাসাগরের কাছে।

বিদ্যাসাগর তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঙলা বিভাগের সেরেস্তাদার। তিনি বললেন—গিরিশ, ভাবিস না; যতদিন তোর কোনো চাকরি না হয়, আমার বাসায় থাক।

বেশিদিন বসে থাকতে হয়নি গিরিশচন্দ্রকে। ১৮৪৫ সালের ১৪-জানুআরি তিনি সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ হলেন। কিছুকাল পরে, ১৮৫১ সালের জুনমাসে, বিদ্যাসাগরের চেষ্টায়—বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল—গিরিশচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হলেন।

১৮৫৫ সালে গিরিশচন্দ্র, লালচাঁদ বিশ্বাসের সঙ্গে একত্র হয়ে, 'কলিকাতা

---

* প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিহারীলাল সরকার লিখেছেন : "১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই অগষ্ট বিদ্যাসাগর মহাশয়, পরম বন্ধু রাজকৃষ্ণ বাবুকে সংস্কৃত প্রেসের এক তৃতীয়াংশ চারি সহস্র টাকায় এবং কালীচরণ ঘোষকে এক তৃতীয়াংশ চারি সহস্র টাকায় বিক্রয় করেন।" (বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪১৯।)

সুচারু যন্ত্র' নামে গড়পারে একটি ছাপাখানা খুলেছেন। তারপর ১৮৫৬ সালে গিরিশচন্দ্র 'বিদ্যারত্ন-যন্ত্র' নামে একটি ছাপাখানা খুলেছেন। কিছুদিন পরে বটতলায় আরেকটি 'বিদ্যারত্ন-যন্ত্র' হল, গিরিশচন্দ্র তখন নিজের ছাপাখানার নতুন নাম করলেন—'গিরিশ-বিদ্যারত্ন-যন্ত্র'।

গিরিশচন্দ্রের বড়ো মেয়ের বিয়ে নিয়ে একটা ঘটনা আছে।

অনেকদিন থেকেই কথা হয়ে আছে, মঙ্গিলপুরে ছকু ভট্টাচার্যের ছেলের সঙ্গে গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বড়ো মেয়ের বিয়ে হবে।

গিরিশচন্দ্র সেবার মঙ্গিলপুরে গেলেন। ছকু ভট্টাচার্যের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। যথাসময়ে মেয়ের বিয়ের কথা তুললেন। বিয়েটা এবার হয়ে যাক।

মঙ্গিলপুরের প্রবীণ ব্রাহ্মণেরা একত্র হয়ে বললেন—তুমি বিধবাবিবাহের দলে গিয়েছ, অতএব তুমি পতিত। যদি তুমি আমাদের জমিদার দত্তমশায়দের বাড়িতে গিয়ে গোবর খেয়ে প্রতিজ্ঞা করো যে আর কখনো বিধবাবিবাহ দলে যাবে না, তাহলে আমরা তোমার মেয়ে নিতে পারি। নইলে তোমার মেয়ের সঙ্গে আমাদের ছেলের বিয়ে দেব না।

জমিদারবাড়িতে গেলেন গিরিশচন্দ্র। সকলের সামনে তিনি বললেন—আপনারা আমাকে গোবর খেয়ে প্রতিজ্ঞা করতে বলছেন যে আর কখনো বিধবা-বিবাহ দলে থাকব না। কিন্তু আপনারাই বিবেচনা করে বলুন, সে-কাজ আমি কীভাবে করতে পারি। আমি সংস্কৃত কলেজে চাকরি করি, বিদ্যাসাগর মশায়ের অধীনে আছি। আজ যদি আমি তাঁর দল ছাড়ি, তিনি আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিতে পারেন। এ তো গেল আমার প্রথম আপত্তি। এবার আমার দ্বিতীয় আপত্তি শুনুন। বিধবাবিবাহ দলে আছি বলে আপনাদের মতে আমি পাতকী, তাই আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু আমার মতে যে-কাজ ধর্মসম্মত, শাস্ত্রসংগত, যে-কাজে প্রাচীন ঋষিদের সম্পূর্ণ সম্মতি আছে, সে-কাজে যোগ দিয়ে আমি কখনোই পাতকী হইনি, এই আমার বিশ্বাস। তবে আমি প্রায়শ্চিত্ত করব কেন? আপনারা যাই বলুন, প্রায়শ্চিত্ত আমি কিছুতেই করব না। এতে যদি আমার মেয়ে আপনারা না নেন, আমি নিরুপায়।

কিন্তু গিরিশচন্দ্র প্রায়শ্চিত্ত না করলে কিছুতেই এখানে গিরিশচন্দ্রের মেয়ের বিয়ে হবে না।

গিরিশচন্দ্র তখন জমিদারবাবুকে বললেন—দেখুন, নারায়ণ সাক্ষী করে আমি এখানে আমার মেয়ের বিয়ে দেবার কথা বলেছিলাম। সেই কথামতো, এখানে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি আছি। কিন্তু এঁরা আমার মেয়েকে নিতে চাচ্ছেন না। এতে আমার কোনো অপরাধ নেই। এঁরা না নিলে মেয়েকে আমার অন্য কোথাও বিয়ে দিতে হবে। সেজন্য আমি পাতকী হব না।

কলকাতায় ফিরে এসে গিরিশচন্দ্র সমস্ত ঘটনা বললেন বিদ্যাসাগরকে।

বিদ্যাসাগর বললেন—গিরিশ, একটা মৌলিকের ছেলে সন্ধান কর। আমি দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দেব।

কিছুদিন পরে কেদারনাথ চক্রবর্তী নামে একটি ছেলের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের বড়ো মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। উত্তরকালে হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন সেই বিবাহরাত্রির কথা লিখেছেন :

"বিবাহরাত্রিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও কালেজের সমস্ত অধ্যাপক এবং অন্যান্য অনেক আত্মীয় ভদ্রলোক উপস্থিত থাকিয়া উক্ত কার্য্যে সাহায্য দান করিয়াছিলেন। আমার অল্প অল্প মনে পড়ে, বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং কোমর

বাঁধিয়া লুচি পরিবেশন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সান্নিধ্য হেতু সমস্ত কার্য্যের নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়াছিল।"[১৯]

তারপর মেজোমেয়ের বিয়ে।

গিরিশচন্দ্রের মেজোমেয়ের বিয়ে দেবার সময় এসে গেল। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন।

চাঙরিপোতার বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্যের ছেলের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের মেজো-মেয়ের বিয়ের কথা হয়ে আছে। সময় হয়েছে এখন, গিরিশচন্দ্র গেলেন চাঙরিপোতায়।

পাত্রপক্ষ থেকে আপত্তি উঠল। ওঁরা গিরিশচন্দ্রকে বললেন—বারুইপুরের জমিদারদের কাছে গিয়ে তুমি যদি প্রতিজ্ঞা করো যে আর কখনো বিধবা-বিবাহ দলে যাবে না, তাহলে আমরা তোমার মেয়েকে নিতে পারি।

—আচ্ছা, বিবেচনা করে দেখি। বিবেচনা করে বলব।

গিরিশচন্দ্র কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগরকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। এখন কী কর্তব্য?

ক্ষণকাল ভাবলেন বিদ্যাসাগর। তারপর বললেন—গিরিশ, তুই গিয়ে বল, 'আমি আর বিধবাবিবাহ দলে থাকব না'।

—সেকথা কেমন করে বলব?

বিদ্যাসাগর বললেন—আমি যখন আর বিধবাবিবাহ দিয়ে উঠতে পারছি না, তখন তো আর বিধবাবিবাহ দল থাকছে না। তবে তুই আর কীভাবে ওই দলে যোগ দিবি?[২০]

বইপুঁথির উপর বিদ্যাসাগরের অপার ভালোবাসা। লাইব্রেরিভর্তি বই ছিল তাঁর। সংস্কৃত, ইংরেজি, বাঙলা, হিন্দী। হাতে-লেখা অনেক সংস্কৃত পুঁথি। পড়বার পর বইগুলো বাঁধিয়ে নিতেন। সুন্দর করে বাঁধাতেন। এ-বাবদে বিস্তর খরচ হত তাঁর।

কে একজন একবার বিদ্যাসাগরকে বললেন—এত টাকা খরচ করে এই বইগুলো বাঁধানো কি ভালো?

বিদ্যাসাগর বললেন—কেন, দোষ কী?

—দোষ কী? ওই টাকায় অনেকের উপকার হতে পারত।

এ-বিষয়ে তখনকার মতো বিদ্যাসাগর চুপ করে গেলেন। বই বাঁধানোর খরচের কথা ছেড়ে সরাসরি চলে গেলেন অন্য কথায়। তারপর খানিক বাদে তামাক খেতে-খেতে হঠাৎ বিদ্যাসাগরের নজর পড়ল ভদ্রলোকের গায়ের শালের দিকে। দিব্যি জিনিসটি। বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—আপনার এই শালখানা কত টাকায় কিনেছেন?

চমৎকার শাল। নানা গুণ এখানার। ভদ্রলোক একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। দাম বললেন শেষকালে—এ-যোড়াটি পাঁচশো টাকায় কিনেছি।

তখন বিদ্যাসাগর বললেন—পাঁচসিকের কম্বলেই তো কাজ চলে, তবু এত টাকার শাল গায়ে দিয়েছেন কেন? ও-টাকায়ও অনেকের উপকার হতে পারত। আমি তো মোটা চাদর গায়ে দিয়েই কাজ চালাই।

ভদ্রলোক বুঝলেন বিদ্যাসাগরকে বই বাঁধানোর খরচের কথাটা বলা অন্যায় হয়ে গেছে। খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন তিনি। তারপর ক্ষমা চাইলেন।[২১]

বিদ্যাসাগরের লাইব্রেরিতে বিস্তর বই ছিল। নিজের লাইব্রেরি থেকে তিনি

বন্ধু-বান্ধবদের বই পড়তে দিতেন। কিন্তু একবার একজন বন্ধু বই নিয়ে একটা কাণ্ড করলেন। দামী একখানা দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত বই!

বইখানা নিয়ে গেছেন, ফেরত দিচ্ছেন না। দিনকয়েক বাদে বিদ্যাসাগর তাগাদা দিলেন, বইখানা ফেরত চাইলেন। ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়লেন—সে কি কথা! ও-বই তো আমি ফেরত দিয়েছি।

অথচ আসলে ফেরত পাওয়া যায়নি। সম্পূর্ণ বাজে কথা। বিদ্যাসাগর বিরক্ত হলেন। মনে-মনে ভাবলেন, কস্মিনকালেও আর-কাউকে বই দেবেন না।

কিন্তু, হায়, যে-বইখানা হাতছাড়া হয়ে গেল, ইহজীবনে কি আর তা পাওয়া যাবে। ও-বই যে জার্মানি ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না।

অদৃষ্ট ভালো বলতে হবে, বইখানা পাওয়া গেল।

ঠিক ওই বইখানা নিয়েই বিদ্যাসাগরের চেনা-জানা একজন বইওয়ালা বিদ্যাসাগরের কাছে এসে উপস্থিত। চেনা বইখানা দেখে বিদ্যাসাগর চমকে উঠলেন। বইওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেন—এ-বই তুমি কোথায় পেলে?

যে-বন্ধু বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে বইখানা পড়তে নিয়ে গিয়েছিল, তারই বাড়ি থেকে বইওয়ালা পুরনো বইয়ের দরে বইখানা কিনে এনেছে। খবর শুনে বিদ্যাসাগর বইখানা আবার কিনে নিলেন। তারপর থেকে বই তো দূরের কথা, এক টুকরো কাগজও লাইব্রেরি থেকে কাউকে নিয়ে যেতে দিতেন না।[২২]

পঁচিশ

ঈশ্বরের কথা কাউকে বলেননি বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর বলেছেন—আমি নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছু বুঝি না, আবার পরকে কি লেকচার দেব?[১]

স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বাস, বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই ঈশ্বরের বিষয়ে বুঝেছেন; ঈশ্বরের বিষয়ে না বুঝলে তিনি আর পাঁচটা বিষয়ে কেমন করে বুঝলেন?

আর পাঁচটা কী?

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে বলেছেন—ঈশ্বরের বিষয়ে যে বোঝেনি, সে দয়া, পরোপকার বুঝলে কেমন করে? স্কুল বুঝলে কেমন করে? কেমন করে বুঝলে, স্কুল খুলে ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে হবে? যে একটা ঠিক বোঝে, সে সব বোঝে।[২]

ক্ষোভে-দুঃখে ঈশ্বরের নামে কটুবাক্য বলতে শোনা গেছে বিদ্যাসাগরকে।

দুষ্ট লোকে একজন বিধবার সর্বস্ব চুরি করে নিয়েছে। অত্যাচার করেছে। বন্ধুদের কাছে সেই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বললেন—এই জগতের মালিককে যদি পাই, তাহলে একবার দেখি! এ-জগতের মালিক থাকলে কি এত অত্যাচার সহ্য করে?[৩]

বিদ্যাসাগর অভিমান করে বলেছেন : "ঈশ্বরকে ডাকবার আর কি দরকার! জেঙ্গিস খাঁ যখন লুটপাট আরম্ভ করলে তখন অনেক লোককে বন্দী করলে; ক্রমে প্রায় একলক্ষ বন্দী জমে গেল। তখন সেনাপতিরা এসে বললে, মহাশয়, এদের খাওয়াবে কে? সঙ্গে এদের রাখলে আমাদের বিপদ। কি করা যায়? ছেড়ে দিলেও বিপদ। তখন জেঙ্গিস খাঁ বললেন, তাহলে কি করা যায়; ওদের সব বধ কর। তাই কচাকচ করে কাটবার হুকুম হয়ে গেল। এই হত্যা-কাণ্ড তো ঈশ্বর দেখলেন? কই একটু নিবারণ তো করলেন না। তা তিনি থাকেন থাকুন, আমার দরকার বোধ হচ্ছে না। আমার তো কোনো উপকার হল না।"[৪]

কখনো-কখনো বিদ্যাসাগর বলেছেন—ঈশ্বর যদি থাকেন তো তিনি তো আর কামড়াবেন না।[৫]

'স্যার জন লরেন্স' নামে একখানা স্টিমার ডুবে গেল; তার ফলে জলে পড়ে মারা গেল সাত-আটশো মানুষ।

খবর শুনে খুব দুঃখ পেলেন বিদ্যাসাগর। বললেন—দুনিয়ার মালিক কি আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর? আমি যা পারি না, কেমন করে পরম করুণাময় হয়ে তিনি তা পারলেন, কেমন করে তিনি একসঙ্গে ডুবিয়ে মারতে পারলেন সাত-আটশো মানুষ? এই কি দুনিয়ার মালিকের কাজ? এসব দেখলে এই দুনিয়ার কেউ মালিক আছেন বলে সহসা মনে হয় না।[৬]

এই দুনিয়ার একজন মালিক আছেন, বিদ্যাসাগরের সেই রকম বিশ্বাস। বিদ্যাসাগর বলেছেন—এই দুনিয়ার একজন মালিক আছেন তা বেশ বুঝি। নিজে যেমন বুঝি, তেমনি চলি। কেউ পীড়াপীড়ি করলে বলব, 'এর বেশি বুঝতে পারিনি।' কিন্তু এ-পথে না গিয়ে ও-পথে গেলেই স্বর্গে যেতে পারব,

তাঁর প্রিয় হব, এসব বুঝিও না, কাউকে বোঝানোরও চেষ্টা করি না। লোককে বুঝিয়ে শেষকালে কি ফ্যাসাদে পড়ে যাব? পরের জন্য বেত খেয়ে মরব?[৭]

বেত খাবার গল্পটি বিদ্যাসাগর ভারি সুন্দর বলেছেন :

"মনে কর মরবার পর আমরা সকলে ঈশ্বরের কাছে গেলুম। মনে কর কেশব সেনকে, যমদূতেরা ঈশ্বরের কাছে নিয়ে গেল। কেশব সেন অবশ্য সংসারে পাপটাপ করেছে। যখন প্রমাণ হলো তখন ঈশ্বর হয়ত বলবেন, ওঁকে পঁচিশ বেত মারো। তারপর মনে কর আমাকে নিয়ে গেল। আমি হয়ত কেশব সেনের সমাজে যাই। অনেক অন্যায় করেছি; তার জন্য বেতের হুকুম হোল। তখন আমি হয়ত বল্লাম কেশব সেন আমাকে ঐরূপ বুঝিয়েছিলেন, তাই এইরূপ কাজ করেছি। তখন ঈশ্বর আবার দূতদের হয়ত বলবেন, কেশব সেনকে আবার নিয়ে আয়। এলে পর হয়ত তাকে বলবেন তুই একে উপদেশ দিছিলি? তুই নিজে ঈশ্বরের বিষয় কিছুই জানিস না, আবার পরকে উপদেশ দিছিলি? ওরে কে আছিস—একে আর পঁচিশ বেত দে।...

নিজেই সামলাতে পারি না, আবার পরের জন্য বেত খাওয়া!..."[৮]

বিদ্যাসাগর বলেছেন—ধর্ম বড়ো জটিল জিনিস। আমি এ-বিষয়ে বড়ো কিছু বুঝতে পারি না।

আত্মা কী?

বিদ্যাসাগর বলেছেন—ধর্মশাস্ত্রাদিতে আত্মা সম্পর্কে অনেক রকম সংজ্ঞা আছে কিন্তু আমি সেসব বিষয়ের মর্মোদ্ঘাটন করতে পারি না।[৯]

উত্তরকালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন : "বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন...।"[১০]

বিদ্যাসাগর কি বাস্তবিক নাস্তিক ছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন—ঐ এক রকমের নাস্তিক ছিলেন, যাকে বলে অজ্ঞেয়বাদী।[১১]

সুকিয়া স্ট্রিটে ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষের বাড়িতে বসে পাইকপাড়ার রাজ-বাড়িতে একখানা চিঠি লিখছেন বিদ্যাসাগর। লেখা হয়ে যাবার পর চন্দ্রমোহন একবার চিঠিখানা দেখতে চাইলেন।

বিদ্যাসাগর হাসতে-হাসতে বললেন—তুমি যা ভাবছ, তা নয়। এই দ্যাখো, 'শ্রীশ্রীহরিঃ সহায়ঃ' লিখেছি।[১২]

সত্যিই লিখেছেন। শুধু সেই একখানা চিঠিতেই নয়, আরো অনেক চিঠিতেই বিদ্যাসাগর লিখেছেন : 'শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং', কিংবা 'শ্রীশ্রীহরিঃ সহায়', অথবা 'শ্রীশ্রীহরিঃ শরণং'।

ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে কি চিঠিতে ঈশ্বরের নাম এমন করে লিখতে পারতেন বিদ্যাসাগর?

আগেই বলা হয়েছে, প্রধানত বিদ্যাসাগরেরই প্রাণপণ চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফন্ড'; এবং এই ফন্ডের সঙ্গে বিদ্যাসাগর প্রায় সাড়ে তিন বছর ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

তারপর, প্রশ্ন থেকে যায়, বিদ্যাসাগর কেন চলে এলেন?

এই ফন্ডের কাজকর্মে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ফন্ডের পরিচালনার ভার যাঁদের উপর, তাঁদের কাজকর্ম বিদ্যাসাগরের পছন্দ হল না। তাই এই ফন্ডের সঙ্গে বিদ্যাসাগর আর কোনো সম্পর্ক রাখলেন না।

১৮৭৬ সালের ২১-ফেব্রুআরি ফন্ডের ডিরেক্টরদের কাছে বিদ্যাসাগর

একখানা চিঠিতে লিখেছেন : "এই ফণ্ডের সহিত আর সংযুক্ত থাকিলে ভবিষ্যতে আমাকে দুর্নামের ভাগী হইতে হইবে এবং ঈশ্বরের কাছেও জবাবদিহি করিতে হইবে। এই ভয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই ফণ্ডের সহিত আমার সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিতেছি।"

ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহির ভয়! ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে কি ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহির কথা এমন করে লিখতে পারতেন বিদ্যাসাগর?

মানুষের পরম ধর্মের কথা বলেছেন বিদ্যাসাগর। মানুষের জীবনের সর্বপ্রধান কর্মের কথা বলেছেন বিদ্যাসাগর। ওই চিঠিতেই বলেছেন। ওই চিঠিতেই তিনি লিখেছেন : "যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া, তাহার পরম ধর্ম্ম ও তাহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম;...।"

পরোপকার বিদ্যাসাগরের পরম ধর্ম। কেবল নিজে পরোপকার করেই বিদ্যাসাগর ক্ষান্ত হননি, অন্যকেও পরোপকারী করে তুলতে যথাসাধ্য সচেষ্ট হয়েছেন। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "বাঙ্গালা ১২৭৬ সালের পূর্ব্বে রাধানগর গ্রামবাসী জমিদার বাবু উমাচরণ চৌধুরী প্রভৃতির বৈঁচি নিবাসী জমিদার বিহারিলাল মুখোপাধ্যায়ের সহিত ঋণগ্রহণ ও বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বিহারী বাবুর পরিচয়, প্রণয় ও বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। এক সময়ে বিহারী বাবু কলিকাতায় আসিয়া কথাপ্রসঙ্গে অগ্রজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়! আমি অপুত্রক, স্ত্রীর মনে যদি কষ্ট হয়, এ কারণে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। অতএব আমি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিব অভিপ্রায় করিয়াছি, নতুবা আমার বিষয় সম্পত্তি অকারণ নষ্ট হইয়া যাইবে, এবং আমাদের নাম লোপ হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, যদি আমার মত গ্রহণ কর, তবে আমার মতে দত্তকপুত্র না লইয়া আপনার যাবতীয় সম্পত্তি দেশের হিতকর কার্য্যে সমর্পণ করুন। তাহাই কর্ত্তব্য ও তাহাই পরম ধর্ম্ম, এবং তাহাই বহুকালস্থায়ী; কোন সভ্য রাজার সময়ে ইহার লোপ হইবে না। দাতব্য বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় এবং অসহায় রোগীদিগের আহার ও থাকিবার স্থান দান করা এবং নিজ গ্রামের ও তাহার পার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহের অন্ধ, পঙ্গু, ও অনাথ প্রভৃতি নিরুপায় লোকদিগের দুঃখমোচনে যাবতীয় সম্পত্তি নিয়োজিত করা প্রধান ধর্ম্ম। স্বর্গীয় বিহারীলাল বাবু আহ্লাদের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় উইলের আদর্শ প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি একখানি নূতন উইল প্রস্তুত করাইয়া বহুদর্শী উকীল বাবুদিগকে দেখান, পরে ঐ আদর্শ উইল খানি বিহারী বাবুকে দেন। তিনি উহা পাঠ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। সন ১২৭৭ সালের ২৫শে শ্রাবণ ঐ উইল প্রস্তুত করিয়া যথারীতি রেজেষ্টরি করাইলেন। ইহার কিছুদিন পরে বিহারীলাল বাবুর মৃত্যু হইলে ঐ উইলের সর্ত্তানুসারে তাঁহার বনিতা শ্রীমতী কমলেকামিনী দেবী দাতব্য স্কুল, ডিস্পেনসরি ও হাঁসপাতাল জন্য সন ১২৮৪ সালের ৫ই শ্রাবণ, ইং ১৮৭৭ সালে ২৯শে জুলাই, একলক্ষ ষাটি হাজার টাকা ঐ বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত হুগলি জেলার কালেক্টারিতে আমানত করিলেন, এবং ঐ বর্ষ হইতে দাতব্য এনট্রান্স স্কুল, ডিস্পেনসারি ও হাঁসপাতালের কার্য্য আরম্ভ হয়। ঐ কার্য্য অবাধে চলিয়া আসিতেছে। অপিচ দাতার উইল অনুসারে ভোগাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত অভাবে যাবতীয় সম্পত্তি

গবর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে তত্ত্বাবধানের ভার লইয়া দাতার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য সকল নিষ্পন্ন করিবেন। এবং ঐ বিষয় প্রিভি কৌনসেল পর্য্যন্ত যাইয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। উইলের কোন অংশ রহিত কি পরিবর্ত্তিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় পরোপকারার্থে নিজ ধন ব্যয় করিতে যেরূপ কাতর ছিলেন না, অন্য ব্যক্তিকেও সেইরূপ কার্য্যে ব্রতী করিতেও তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। স্বতঃ পরতঃ পরোপকার যেরূপ পরম ধর্ম্ম, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।"

কয়েকজন ভদ্রলোক এলেন একদিন বিদ্যাসাগরের কাছে। বললেন—বিদ্যাসাগর মশায়! ধর্ম নিয়ে বাঙলাদেশে বড়ো হুলস্থুল পড়েছে। যার যা ইচ্ছা, বলে যাচ্ছে। এ-বিষয়ের কিছুই ঠিকানা নেই। আপনি ছাড়া এ-বিষয়ের মীমাংসা হবার সম্ভাবনা নেই।

বিদ্যাসাগর বললেন—ধর্ম যে কী, মানুষের বর্তমান অবস্থায় তা জানার উপায় নেই; এবং, জানারও কোনো দরকার নেই।

ধর্মের তত্ত্ব কী? এ নিয়ে তর্কাতর্কির বোধ করি কোনোকালেই মীমাংসা হবে না। এ তর্ক চিরকাল চলবে।

বিদ্যাসাগর বলেছেন :

"পৃথিবীর প্রারম্ভ হইতে এরূপ তর্ক চলিতেছে ও যাবৎ পৃথিবী থাকিবে তাবৎ এই তর্ক থাকিবেক, বোধ হয় যে কস্মিন্ কালেও ইহার মীমাংসা হইবে না। তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন মহাভারতে বেদব্যাস লিখিয়াছেন, বকরূপী ধর্ম্মরাজ এই মর্ম্মে ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলে যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন—

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ নাসৌ মুনির্যস্য
মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো
যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥"[১০]

কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বসে বিদ্যাসাগর আলাপ করছেন একদিন, এমন সময় দেখলেন একটি অন্ধ-খঞ্জ ফকির গান গাইতে-গাইতে যাচ্ছে : কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন...

গানটির আরম্ভ শুনেই ফকিরকে ডাকালেন বিদ্যাসাগর। ফকিরের নাম অখিলান্দিন। তাকে বসিয়ে গানটি আদ্যন্ত বারংবার শুনলেন, প্রাণ ভরে শুনলেন :

কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন নিল্লয় করবে রে কে,
তুমি কোনখানে খাও কোথায় থাক রে মন অটল হয়ে,
কোথায় ভুলে রয়েছ—।
তুমি আপনি নৌকা আপনি নদী, আপনি দাঁড়ি আপনি মাঝি,
আপনি হও যে চরণদারজী, আপনি হও যে নায়ের কাছি,
আপনি হও যে হাইল বৈঠা।
তুমি আপনি মাতা আপনি পিতা
আপনার নামটী রাখবো কোথা, সে নাম হৃদয়ে গাঁথা,

আমার গোঁসাঞিচাঁদ বাউলে বলে সে নাম ভুলবো নারে প্রাণ গেলে।
তুমি আপনি অসার আপনি হও সার,
আপনি হও রে নদীর দুধার, আপনি নদীর কিনার,
আমি অগাধ জলে ডুব দিতে যাই, সে নাম ভুলব নারে প্রাণ গেলে।
আপনি তরো আপনি সারা, আপনি জরা আপনি মরা,
আপনি হওসে নদীর পাড়া আবার আপনি হওসে শ্মশান কর্ত্তা গো,
আপনি হওসে জলের মীন, ও নিরঞ্জন তোর কোথায় গো সাকিম,
আমি ভেবে চিন্তে হলেম ক্ষীণ।

গান শুনতে-শুনতে চোখের জলে আকুল হলেন বিদ্যাসাগর। গান শেষ হবার পরেও অনেকক্ষণ বিভোর হয়ে রইলেন। ফকিরকে কিছু পয়সা দিয়ে বিদায় করলেন বিদ্যাসাগর। মাঝে-মাঝে তাকে আসতে বলে দিলেন।

অখিলদ্দিন ফকির বলেছে : "বিদ্দেসাগর বাবু আমাকে বড়ই ভালো-বাসতেন, আর এই গান শুনে খুব খুশি হতেন। তাঁর কাছে অনেক পয়সা পেয়েছি।"[১৪]

ওই গানের মধ্যে তো কেবল ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা। ওই গান শুনে যিনি খুব খুশি হতেন, যিনি চোখের জলে ভেসে যেতেন, কেমন করে বলা যায় যে তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন? কেমন করে বলা যায় যে বিদ্যাসাগরের ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই?

আগেই বলা হয়েছে, এককালে বিদ্যাসাগর 'বোধোদয়ে' 'ঈশ্বর' নামক একটি রচনায় ঈশ্বরের কথা লিখেছেন।

'ঈশ্বর' নামক রচনার বাইরেও বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়ে' ঈশ্বরের কথা আছে :

"ঈশ্বর, কি অভিপ্রায়ে, কোন জন্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহা অবগত নহি; এজন্য, কতকগুলিকে পূজ্য ও পবিত্র জ্ঞান করি, আর কতক-গুলিকে ঘৃণা করি। কিন্তু ইহা অন্যায় ও ভ্রান্তিমূলক। বিশ্বকর্ত্তা ঈশ্বরের সন্নিধানে, সকল জন্তুই সমান। অতএব, আমাদেরও ঐরূপ জ্ঞান করা উচিত। পশুদের মধ্যে পদমর্য্যাদা নাই। লোকে সিংহকে মৃগেন্দ্র অর্থাৎ পশুর রাজা বলে। কিন্তু, উহা কদাচ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। সকল পশু অপেক্ষা সিংহের সাহস ও বিক্রম অধিক; এই নিমিত্ত, মনুষ্যেরা উহাকে ঐ উপাধি দিয়াছে; নচেৎ, সিংহ, অন্য অন্য পশু অপেক্ষা, কোনও মতে উৎকৃষ্ট নহে।"[১৫]

ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে কোনোকালেই কি তিনি ঈশ্বরের কথা লিখতে পারতেন?

আর, কেবলমাত্র ঈশ্বরের কথা নয়, ঈশ্বরের ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসের কথাও বিদ্যাসাগরের একটি রচনায় আছে।

'ঐশিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস' নামে বিদ্যাসাগরের একটি রচনা উদ্ধৃত করি :

"একটি দুঃখী বালক, অল্প বয়সে, পিতৃহীন ও মাতৃহীন হইয়াছিল। সে পিতামাতার এক মাত্র পুত্র। তদীয় ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করেন, তাহার এরূপ কোনও আত্মীয় ছিলেন না। আহার প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যক বিষয়ে, তাহার ক্লেশের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু তাহার বুদ্ধি ও বিবেচনা বিলক্ষণ ছিল। সে স্থির করিয়াছিল, আমি প্রাণান্তেও পরের গলগ্রহ হইব না; পরের গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা, অনাহারে প্রাণত্যাগ করা ভাল। যথাশক্তি পরিশ্রম

করিয়া, যাহা পাইব, তাহাতেই কোনও রূপে আপন ভরণ পোষণ সম্পন্ন করিব।

এক দিন এই দীন বালক শুনিতে পাইল, অমুক ব্যক্তির একটি অল্প বয়স্ক পরিচারকের আবশ্যক হইয়াছে; তিনি লোকের অন্বেষণ করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, সে ঐ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনকার কি একটি অল্প বয়স্ক পরিচারকের প্রয়োজন হইয়াছে; যদি সেরূপ প্রয়োজন হইয়া থাকে, অনুগ্রহ করিয়া আমায় নিযুক্ত করুন।" সে ব্যক্তি কহিলেন, "এক্ষণে আমার ওরূপ পরিচারকের প্রয়োজন নাই।" বালক শুনিয়া, হতাশ্বাস হইয়া, মৌনভাবে দণ্ডায়মান রহিল।

সে ব্যক্তি বালকের মুখ দেখিয়া দুঃখিত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি কোথাও কর্ম্ম জুটিতেছে না।" তখন বালক কহিল, "না মহাশয়, আমি অনেক স্থানে চেষ্টা দেখিতেছি, কিন্তু কোথাও কিছু হইতেছে না; একটি স্ত্রীলোক আমায় বলিয়াছিলেন, আপনকার লোকের প্রয়োজন হইয়াছে সেই জন্যে আপনকার নিকট আসিয়াছিলাম, এখন বুঝিতে পারিলাম, তিনি, সবিশেষ না জানিয়াই, ওরূপ বলিয়াছিলেন।"

বালকের ভাব দর্শনে, তাঁহার অন্তঃকরণে বিলক্ষণ দয়ার সঞ্চার হইল। তখন তিনি, আশ্বাস প্রদানের নিমিত্ত কহিলেন, "তুমি হতোৎসাহ হইও না।" এই কথা শুনিয়া, বালক প্রফুল্ল চিত্তে কহিল, "না মহাশয়, যদিও আমি অশন বসন প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়ে অতিশয় ক্লেশ পাইতেছি, তথাপি, একদিনের জন্যেও, আমি হতোৎসাহ হই নাই। আমার সম্পূর্ণ আশা আছে, আমি, অচিরে কোনও স্থলে নিযুক্ত হইয়া, আপন ক্লেশ দূর করিতে পারিব। দেখুন, এই পৃথিবী অতি প্রকাণ্ড স্থান। ঈশ্বর এই পৃথিবীর কোনও স্থলে, অবশ্যই, আমার জন্য কোনও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন; এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, আমি কেবল সেই ব্যবস্থার অন্বেষণ করিতেছি।"

এক ডাক্তার, কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া বালকের এই কথোপকথন শুনিতেছিলেন। তিনি বালকের মুখে এই কথা শুনিয়া, সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "অহে বালক, তুমি ঠিক বলিয়াছ; আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমায় নিযুক্ত করিব; আমার তোমার মত পরিচারকের প্রয়োজন আছে।" এই বলিয়া তিনি সেই বালককে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন এবং তাহাকে যে সকল কর্ম্ম করিতে হইবেক, সে সমুদয় বলিয়া দিলেন। বালক, এইরূপে নিযুক্ত হইয়া, যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে, কর্ম্ম করিতে লাগিল। এক দিন, এক বেলার জন্যেও, আলস্য বা ঔদাস্য করিল না। তদ্দর্শনে ডাক্তার, যারপরনাই প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

ঈশ্বরের ব্যবস্থায় বিদ্যাসাগরের বিশ্বাস না থাকলে কেমন করে বিদ্যাসাগরের রচনার একটি সহায়সম্বলশূন্য বালক বলতে পারল : "ঈশ্বর এই পৃথিবীর কোনও স্থলে, অবশ্যই, আমার জন্য কোনও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন; এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, আমি কেবল সেই ব্যবস্থার অন্বেষণ করিতেছি।"

বিদ্যাসাগরের ঈশ্বরবিশ্বাসের প্রমাণ হিসেবে বিদ্যাসাগরের 'ভূগোলখগোলবর্ণনমে'র প্রথম শ্লোকটি উদ্ধার করি :

"যৎক্রীড়াভাণ্ডবদ্ভাতি ব্রহ্মাণ্ডমিদমদ্ভুতম্।
অসীমমহিমানং তং প্রণমামি মহেশ্বরম্॥"

ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে বিদ্যাসাগর কি এই শ্লোক লিখতে পারতেন?

আর যাই হোক, বিদ্যাসাগর অবতার হতে চাননি।

বিদ্যাসাগরের একখানা ছবি যোগাড় করেছেন কৈলাসচন্দ্র বসু। ছবির নিচে একটি সংস্কৃত শ্লোক লেখা হল :

শ্রীমানীশ্বরচন্দ্রোঽয়ং বিদ্যাসাগর-সংজ্ঞকঃ।
ভূদেবকুলসম্ভূতো মূর্ত্তিমদ্দেবতং ভুবি॥

ছবি বাঁধানো হল। তারপর কৈলাসচন্দ্র একদিন সেখানা বিদ্যাসাগরকে দেখাতে নিয়ে গেলেন।

শ্লোক দেখে বিদ্যাসাগর নিজস্ব ভঙ্গিতে কৈলাসচন্দ্রকে বললেন—"শ্রীমানীশ্বরচন্দ্রোঽয়ং"—এর চেয়ে সত্যকথা আর নেই। "শ্রীমান" না হলে কি এমন উড়ে বেহারার রূপ হয়? "মূর্ত্তিমদ্দেবতং ভুবি"—একথার আর প্রতিবাদ নেই। সাক্ষাৎ দেবতা না হলে এমন কর্মভোগ আর কার ভাগ্যে ঘটে থাকে?

এই ভাবে কৈলাসচন্দ্রের শ্লোকের টীকা করে বিদ্যাসাগর শেষে বললেন—তোমরা যে আমাকে ভালোবাসো, এই আমার জীবনের লাভ। আমি অবতার হতে চাই না।[১৬]

সংস্কৃত ঋগ্বেদসংহিতার বাঙলা অনুবাদ করেছেন রমেশচন্দ্র দত্ত। অনুবাদ আরম্ভ করে সবসময় বিদ্যাসাগরের কাছে আসতেন রমেশচন্দ্র, বিদ্যাসাগরের লাইব্রেরিতে বসে সংস্কৃত পুঁথি ঘাঁটতেন, কোথাও সন্দেহ হলে বিদ্যাসাগরের উপদেশ নিতেন।

একদল পণ্ডিত রুষ্ট হলেন। রব তুললেন—সর্বনাশ হয়ে গেল, ধর্ম লোপ হয়ে গেল। ঋগ্বেদের বাঙলা অনুবাদ হবে, সর্বনাশের আর বাকি কি। অনুবাদ আর অনুবাদককে গালমন্দ করতে লাগলেন তাঁরা।

কিন্তু বিদ্যাসাগর বরাবর এ-কাজে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি রমেশচন্দ্রকে বলেছেন—ভাই, উত্তম কাজে হাত দিয়েছ, কাজটি সম্পন্ন করো। যদি আমার শরীর একটু ভালো থাকে, যদি আমি কোনোরূপে পারি, তোমাকে সাহায্য করব।[১৭]

কিন্তু পরকাল নিয়ে বিদ্যাসাগর বুঝি কিছুই বলেননি। না, একটু কিছু বলেছেন।

রাজা রামমোহন রায়ের বড়ো ছেলের দৌহিত্রের নাম ললিত চাটুয্যে। পরকালের তত্ত্ব নিয়ে ললিতের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করেছেন বিদ্যাসাগর। ললিত নাকি ওসব তত্ত্ব জানেন।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করতেন—হ্যাঁ রে, ললিত, আমারও পরকাল আছে নাকি?

ললিত চাটুয্যে বলতেন—আছে বৈকি! আপনার এত দান, এত দয়া, আপনার পরকাল থাকবে না তো থাকবে কার?

বিদ্যাসাগর হাসতেন।[১৮]

পরকাল আছে, মৃত্যুর পর মানুষ আবার পৃথিবীতে জন্ম নিতে পারে—এমন সম্ভাবনার কথা বিদ্যাসাগর বুঝি একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেননি। প্রভাবতীর মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর 'প্রভাবতীসম্ভাষণে' প্রভাবতীর উদ্দেশে লিখেছেন : "বৎসে! তোমায় আর অধিক বিরক্ত করিব না; একমাত্র বাসনা ব্যক্ত করিয়া বিরত হই—যদি তুমি পুনরায় নরলোকে আবির্ভূত হও, দোহাই ধর্ম্মের এইটি করিও, যাঁহারা তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হইবেন, যেন তাঁহাদিগকে,

আমাদের মত, অবিরত, দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া, যাবজ্জীবন যাতনাভোগ করিতে না হয়।" এ কি কেবলমাত্র রচনাকৌশল? কেবলমাত্র স্নেহশীল যন্ত্রণা-কাতর মনের পরম দুর্বল মুহূর্তের উচ্চারণ? নাকি বিদ্যাসাগর পরকালে বিশ্বাস করতেন, মৃত্যুর পরেও 'পুনরায় নরলোকে আবির্ভূত' হবার সম্ভাবনাকে পুরোপুরি নস্যাৎ করতে পারেননি, অথবা, নস্যাৎ করতে চাননি?

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখেছেন : "দুঃখ-দাবানলের কেন্দ্রস্থলে উপবেশন করিয়া জগতের মঙ্গলময়ত্ব-সম্বন্ধে বক্তৃতা করা তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল। বোধ করি, সেইজন্যই ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিতে তিনি চাহিতেন না। তাঁহার প্রবৃত্তি তাঁহাকে যে কর্ত্তব্যপথে চালাইত, তিনি সেই পথে চলিতেন। মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন; গণ্ডগোলে প্রবৃত্ত হইবার তাঁহার অবসর ছিল না।"[১৯]

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি সেসময়ে বাঙলাদেশে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের আন্দোলন আরম্ভ করেছেন।

শশধর তর্কচূড়ামণি একদিন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করলেন।

বিদ্যাসাগর শশধর তর্কচূড়ামণিকে বললেন—শুনেছি আপনি হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য এসেছেন। আপনি শাস্ত্রাদি কোথায় পড়েছেন?

শশধর তর্কচূড়ামণি বললেন—কাশীধামে।

—কী পড়েছিলেন?

—দর্শনশাস্ত্র।

—দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে হিন্দুধর্মের সাদা, রাঙা, নীল, কালো, এমন সকল রঙ কোথায় পেলেন? আমিও দর্শন পড়েছি, কিন্তু দুর্বোধ্য বিষয়, কিছুই ভালো বোঝা যায় না। পণ্ডিতমশায় পড়ানোর সময় যখন জিজ্ঞেস করতেন, 'ঈশ্বর বোঝো তো?', আমি বলতাম, 'আপনিও যেমন বোঝেন, আমিও তেমনি বুঝি, পড়িয়ে যাচ্ছেন পড়িয়ে যান।' আমার কথা শুনে পণ্ডিতমশায় খুব হাসতেন।

কথায়-কথায় বিদ্যাসাগর শশধর তর্কচূড়ামণিকে বললেন—আপনাকে হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য যাঁরা এনেছেন তাঁরা যে কেমন দরের হিন্দু তা তো আমি বেশই জানি, তবে আপনি এসেছেন, বক্তৃতা করুন। লোকে বলবে, বেশ বলেন ভালো। এইরকম একটা প্রশংসা পাবেন, আর কিছু না। আমার স্কুলের ছেলেরা যে মুরগীর মাংস খায়, আপনার বক্তৃতায় তারা যে মাংস ছাড়বে আমি তা একেবারেই বিশ্বাস করি না।

বিদ্যাসাগর একটু রসিকতাচ্ছলে শশধর তর্কচূড়ামণিকে বললেন—দেখুন, হিন্দুধর্ম অজর অমর ও অক্ষয়।[২০]

ক্ষুদিরাম বসু লিখেছেন :

"তাঁর (বিদ্যাসাগরের) ধর্ম্মজীবন-সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, তাঁর ধর্ম্ম-জীবন কর্ম্মগত ছিল। কাজই তাঁর কাছে ধর্ম্ম। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন, বোধোদয়ে আমরা তার নিদর্শন পাই। কিন্তু তিনি প্রথম বই লেখেন —"বাসুদেব-চরিত।" প্রতিমাপূজা তিনি লৌকিকভাবেই দেখতেন। কেন না বাড়ীতে ত কোন পূজা হ'তে দেখি নি। মোটের উপর মনে হয় তিনি Agnostic (সংশয়-বাদী) ছিলেন। তিনি বল্‌তেনও—"যেটা পার্‌বি সেইটে কর।" লোক-সেবাই তাঁর ধর্ম্ম ছিল। তাঁর নীতি ছিল লোককে না ঠকানো।

তিনি বল্‌তেন—"দুনিয়ার মালিক যদি অনন্ত-দয়ালু হ'ত ত এত কষ্ট সংসারে থাক্‌ত? লোকে এত কষ্ট পাচ্ছে, যন্ত্রণা পাচ্ছে,—দয়াময় হরি আছেন, আর ভাবনা কি?" আবার তাঁকে এও বল্‌তে শুনেছি—"যীশুখৃষ্টের ধর্ম্ম ভিন্ন জায়গায় গিয়ে পড়েছে, ওটা আমাদের ধাতে ঠিক মিশ খেতো। ইউরোপে গিয়ে পড়ে, এক রকম অপাত্রে পড়েছে।"

এক সম্প্রদায়ের উপাসনা দেখে এসে তিনি বলেছিলেন—"তারা বল্‌ছে শুন্‌লুম আমরা—মুশারও পায়ের ধুলো নিচ্ছি, ঈশারও পায়ের ধুলো নিচ্ছি, শ্রীচৈতন্যেরও পায়ের ধুলো নিচ্ছি;—আরে বাপু, ঈশা মুশা শ্রীচৈতন্য মরে' ত ভূত হয়ে গিয়েছে—পায়ের ধুলো কি রে বাবা?" আর এক সময় তিনি বলে ছিলেন—"বয়স ঢের হয়েছে, ঈশ্বরবিশ্বাসী লোক একটী দেখি নি। সকলেই নীচের দিকে তাকায়, উপরের দিকে কেউ তাকায় না।" কেশববাবু বলেন যে, তাঁতে ভক্তির দিক্‌টা কম ছিল।

অনেক দিন এমন কেটেছে যে বিকেল থেকে ঠায় ঘরে বসে গল্পগুজব হ'তে হ'তে রাত হ'য়ে গেছে, সেই খানেই খাবার টাবার এল, সকলের সঙ্গে তিনিও খেলেন, সন্ধ্যা-আহ্নিক কর্‌তে ত দেখিনি।"[২১]

বিদ্যাসাগর কারো কাছে মন্ত্রদীক্ষা নেননি। ঠাকুমার পীড়াপীড়িতেও নেননি। বিহারীলাল সরকার লিখেছেন : "...বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আচারানুষ্ঠানাদি-সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলি। তিনি তো পিতামহীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন নাই; পরন্তু সন্ধ্যাহ্নিক পূজাদিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। তবে অপর কাহারও সন্ধ্যাহ্নিক ক্রিয়া দেখিয়া, তিনি নাসিকা সঙ্কুচিত করিতেন না। আপন পরিবারের মধ্যে কাহারও প্রতি তৎসম্বন্ধে তাঁহার নিষেধও ছিল না। ব্রত-স্বস্ত্যয়নাদি ক্রিয়ায় কেহ কখন তাঁহার নিকট বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। সন্ধ্যাহ্নিক আচারানুষ্ঠানে বিরত থাকিলেও, হিন্দুর আচার-সম্মত খাদ্যাখাদ্য-সম্বন্ধে তিনি অনেকটা বিচার করিতেন। মুরগী, মদ প্রভৃতি অখাদ্য-ভোজী তাঁহার সৌহার্দ্দ-সৌভাগ্য লাভ করিলেও, তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া, কখন নিজের বাড়ীতে খাওয়াইতে পারিতেন না। রাজকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, কোন একজন শক্তিশালী ব্যক্তি শ্যামাচরণ বাবু ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন। তিনি অখাদ্য খাইতেন বলিয়া, শ্যামাচরণ বাবু ও বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁহার বাড়ীতে কখন নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতেন না।"[২২]

শ্রাদ্ধাদি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানকে প্রশ্রয় দেননি। মৃত্যুর কাছাকাছি এসে মানুষ সাধারণত দুর্বল হয়ে পড়ে, অনেক অবিশ্বাসীও সেসময়ে শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর সেসময়েও অবিচলিত থেকেছেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর অল্প কিছুকাল আগে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন তাঁকে পঞ্চস্বস্ত্যয়ন ও হোম করার জন্য অনুরোধ করেছেন। ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : "বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতীক পূজা, ও স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি অযৌক্তিক, এই হিসাবে কোনও দিন প্রশ্রয় দেন নাই। মানুষ সাধারণতঃ মৃত্যুর সন্নিকটে এলে, বিশেষতঃ রোগে তিল তিল করে যন্ত্রণা পেয়ে অন্তিম সময়ের দিকে এগিয়ে চললে কিছু দুর্ব্বল চিত্ত হয়। কিন্তু এই দৃঢ় কঠিন যুক্তিবাদী পুরুষ দুর্ব্বলতাকে শেষ সময়েও প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁর কন্যা জোর ক'রে কলিকাতার বাটীর একতলার একটি ঘরে হোম করেন। ঘরটী দুতলায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঘর হ'তে নামবার পথের পাশে। কিন্তু সে ঘরে বিদ্যাসাগর প্রবেশ

করেন নাই। কন্যার বিশেষ অনুরোধে, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঈষৎ হেসে বলেন, "মা, এইখানে ও ধোঁয়া আসছে; মনে দুঃখ করিস না"। উদ্বেগ ও চিন্তা তাঁর মনে ছিল, কিন্তু নিজের জন্য নয়, মৃত্যু শয্যায় শেষ দিনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিষণ্ণ মুখ দেখে তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র 'কি কষ্ট হচ্ছে'—প্রশ্ন করায় বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, "দুঃখ হচ্ছে যে মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের জন্য চাকুরী জীবন অন্তে গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও ব্যবস্থা করে যেতে পারলাম না"।..."[২৩]

রাস্তার ধারে বারান্দায় বসে মুড়ি খেতে-খেতে গল্প বলছেন বিদ্যাসাগর। গল্প শুনছেন শিবনাথ শাস্ত্রী এবং আরো কয়েকজন। এমন সব গল্প বলছেন বিদ্যাসাগর, সকলে হেসে অস্থির।

শিবনাথ শাস্ত্রী সেসময়ে ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট মানুষ। শিবনাথকে খুব ভালোবাসতেন বিদ্যাসাগর।

রাস্তার ধারে বারান্দায় বসে মুড়ি খেতে-খেতে গল্প-গুজব হচ্ছে, এমন সময় সেখানে একজন বাঙালী পাদরী সাহেব এসে উপস্থিত। পাদরী সাহেব শিবনাথকে চেনেন, বিদ্যাসাগরকে চেনেন না।

শিবনাথকে ওই অবস্থায় দেখে পাদরী সাহেব অবাক হয়ে গেলেন। শিবনাথকে তিনি বললেন—মুক্তি পাবার জন্য আপনি কি সত্যিই কিছু করছেন? আমার তো মনে হয় ব্রাহ্মধর্ম করে আপনার মুক্তি হবে না।

ধর্ম-টর্ম নিয়ে এসব গুরুগম্ভীর কথাবার্তা শুনে বিদ্যাসাগর ভাবলেন, পাদরী সাহেবের সঙ্গে খানিক আমোদ করা যাক। বিদ্যাসাগর একগাল হেসে পাদরী সাহেবকে বললেন—আরে মশাই, এসব অল্পবয়সী ছেলেদের সঙ্গে ধর্মের কথা বলে কোনো লাভ নেই। মুক্তির কথা ভাববার ওদের সময়ই নেই। তার চেয়ে বরং আসুন, আপনি আর আমি ধর্মের কথা নিয়ে একটু আলাপ-টালাপ করি। আমাদের তো ওপারে যাবার সময় এসে গেছে।

ঠাট্টা বুঝলেন না দিশী পাদরী সাহেব। খুব গম্ভীরভাবে তিনি বিদ্যাসাগরের পাশে বসলেন। গুরুগম্ভীর মুখে ধর্ম নিয়ে নানারকম কথাবার্তা কইতে লাগলেন।

বিদ্যাসাগরও নানারকম কথা বলে যাচ্ছেন—সব অবশ্যি ঠাট্টা করে বলে যাচ্ছেন। সেসব ঠাট্টার মানে বুঝলেন না পাদরী সাহেব। কেবল এটুকু বুঝলেন, এই মানুষটির সঙ্গে ধর্মকথা কইবার কোনো মানে হয় না। রাগ করে তিনি বিদ্যাসাগরকে বললেন—বুড়ো বয়সেও আপনি এমন নাস্তিক? মৃত্যুর পরে নরকেও আপনার স্থান হবে না।

রাগ করে পাদরী সাহেব বিদায় নিলেন। আর প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন বিদ্যাসাগর।

তারপর বিদ্যাসাগর শিবনাথকে বললেন—পাদরী সাহেবটিকে আমার পরিচয় দিও না কিন্তু। তাহলে উনি আরো দুঃখ পাবেন। পাদরী সাহেবেরা সব সময়েই মুক্তির গম্ভীর তত্ত্ব নিয়ে ব্যস্ত, ধর্মকথা কইবার ওদের কোনো জায়গা-বেজায়গা নেই। এই কথাটি বুঝিয়ে দেবার জন্যই আমি ওঁর সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম।[২৪]

সকল পাদরী সাহেবকে বিদ্যাসাগর অপছন্দ করতেন, একথা মনে করলে ভুল হবে। বিহারীলাল সরকার লিখেছেন : "পাদরী ডল সাহেবের সহিত

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সৌহার্দ্য ও সদ্ভাব হইয়াছিল।...বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় দীন-পালন তাঁহার জীবনের সাধনব্রত ছিল। দীন-হীন-দরিদ্র বালক-দিগকে বিনা বেতনে পড়াইবার জন্য তিনি একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে সাতিশয় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। তিনি সদানন্দ, সরল, সাহসী ও সত্যপ্রিয় ছিলেন। এই সব গুণ চিরকাল বিদ্যাসাগরের চিত্তাকর্ষক। ডল সাহেবের মুখে প্রায় বিদ্যাসাগরের গুণব্যাখ্যা শুনিতাম।"[২৫]

কোনো ধর্মমতকে বিদ্যাসাগর নিন্দাও করেননি, প্রশংসাও করেননি। নিছক ধর্মমতের জন্য কারো উপর তিনি সন্তুষ্টও হননি, বিরূপও হননি। মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখেছেন তিনি।

ধর্ম ত্যাগ করেছেন বলে বিদ্যাসাগর বন্ধুকে ত্যাগ করেননি। বিপন্ন বন্ধুকে সাহায্য করা বিদ্যাসাগরের ধর্ম।

রামতনু লাহিড়ী উপবীত ত্যাগ করেছেন। তখন বর্ধমান তাঁর কর্মস্থল। সেখানে হিন্দুসমাজের লোক দল বেঁধে তাঁর ধোপা-নাপিত বন্ধ করে দিল। ঝি-চাকর উধাও হয়ে গেল। অগত্যা রামতনুকে নিজের হাতে জল আনতে হত, কাঠ কাটতে হত, হাট-বাজার প্রভৃতি করতে হত।

অতঃপর রামতনু বর্ধমান থেকে বদলি হলেন। বদলি হয়ে বালি-উত্তর-পাড়ায় ইংরেজি স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে এলেন। ১৮৫২ সালের কথা।

উত্তরপাড়াতে এসে রামতনু সামাজিক নির্যাতন থেকে কিঞ্চিৎ নিস্তার পেলেন। সেসময়ে কলকাতার বন্ধুরা তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। সহায়ক বন্ধুদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন : "বিদ্যাসাগর মহাশয় আজ পাচক ব্রাহ্মণ পাঠাইলেন; কাল পলাইয়া গেল। তিনি আবার পাচক যোগাড় করিয়া পাঠাইলেন। ভৃত্যের পর ভৃত্য পলাইতে লাগিল; বিদ্যাসাগর মহাশয় আবার পাঠাইতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন গার্হস্থ্য সামগ্রী সকল কলিকাতাতে ক্রয় করিয়া নৌকাযোগে প্রেরণ করিতেন; বন্ধুকে কোনও অভাব অনুভব করিতে দিতেন না।"[২৬]

বিদ্যাসাগর কেবল একজন পাদরী সাহেবকেই ঠাট্টা করেননি। সময়মতো ব্রাহ্মকেও ঠাট্টা করেছেন, ব্রাহ্মণকেও ঠাট্টা করেছেন।

চাঁদমোহন মৈত্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে গেছেন শশিভূষণ বসু। সোজা পথে না গিয়ে একটু ঘুরে গেছেন।

চাঁদমোহন বিদ্যাসাগরকে বললেন—শশিভূষণ আমাকে বড়ো ঘুরিয়ে এনেছেন।

বিদ্যাসাগর শশিভূষণকে বললেন—সে কি গো, তুমি এই বুড়ো মানুষকে এত ঘুরিয়ে আনলে? হ্যাঁ গা বাপু! তুমি কি করো?

চাঁদমোহন শশিভূষণের পরিচয় দিলেন। বললেন—ইনি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের একজন প্রচারক।

বিদ্যাসাগর তখন শশিভূষণকে বললেন—বাপু! এ সংসারের পথেই যদি মানুষকে এভাবে ঘুরিয়ে আনতে পারো, তাহলে ধর্মের পথে মানুষকে কত যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে, তা কে জানে?[২৭]

শিবনাথ শাস্ত্রীর বাবার নাম হরানন্দ ভট্টাচার্য। বিদ্যাসাগরের বন্ধু। তিনি গোঁড়া ব্রাহ্মণ। কাশীবাসী হয়েছেন। মাঝে-মাঝে অবশ্যি কলকাতায় আসেন।

একবার কাশী থেকে এসে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। বিদ্যাসাগর বললেন—তুমি মরেছ নাকি?

হরানন্দ বললেন—কেন, আমি মরব কেন? ম'লে কি আসতাম?

—আমিও তো তাই বলি, না ম'লে কি আসতে? তা দ্যাখো, আমাকে যেন পেয়ে বসো না।

হরানন্দকে তামাক দেওয়া হয়েছে। তিনি তামাক খাচ্ছেন। খানিকক্ষণ বাদে বিদ্যাসাগর বললেন—তোমার শেষটা কাশীতে খেলে, মরবার বুঝি আর জায়গা জুটল না? তা গিয়েছ তো আবার এরকম সরে পড়ো কেন? জানো তো, কাশীবাস করে বাইরে ম'লে কী হয়?

—হ্যাঁ, তা তো জানি। তবু মাঝে-মাঝে দায়ে পড়ে আসতে হয়।

—শিগগির-শিগগির পালাও। না হলে, কাশীর এপারে-ওপারে ভিতরে-বাহিরে অনেক ফারাক। বলি, একটু গাঁজা-টাঁজা খেতে শিখেছ তো?

হরানন্দ অবাক হয়ে বললেন—কেন, গাঁজা খেয়ে কী হবে?

বিদ্যাসাগর ব্যাখ্যা করে বললেন—একটু অভ্যাস রেখো। কি জানো, কখন কী কাজে লাগে বলা তো যায় না। ধরো, যদি তোমার কাশীপ্রাপ্তি হয় তাহলে তো শিব হবে? শিব হলে তোমার নন্দীভৃঙ্গী যখন গাঁজার আলবোলা ধরবে তখন টানতে হবে তো? আগে থেকে অভ্যাস না রাখলে দম আটকে মরে যাবে আর তোমার এত সাধের শিবত্ব ফসকে যাবে।[২৮]

চন্দননগরে একজন অল্পবয়স্ক ভদ্রলোক ভাবলেন যে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন। এ-বিষয়ে মতামত নিতে এলেন বিদ্যাসাগরের কাছে।

উত্তরকালে মণিলাল সিংহ রায় লিখেছেন:

"একদিন ব্রিটিশ-অধিকৃত চন্দননগরের উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের অল্প-বয়স্ক দ্বিতীয় পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁহার সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবার বাসনা জানাইলেন ও এ বিষয়ে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিলেন।...

পণ্ডিত মহাশয় ছাড়িবার পাত্র নন দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে তাঁহার সংসার ত্যাগ করার ইচ্ছা কেন হইল ও পরিবারবর্গ কে কে তাহা জানিতে চাহিলেন। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার সংসারে ছিলেন তাঁহার পিতা, বিমাতা, স্ত্রী ও দুইটি শিশুসন্তান। বিমাতার প্ররোচনায় পিতার অসৎ ব্যবহারই তাঁহাকে সংসার ত্যাগে প্রণোদিত করিতেছিল। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় পণ্ডিত মহাশয়কে তাঁহার স্ত্রীর সতীত্বের বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল কি না ও শিশুসন্তান দুইটি তাঁহার ঔরসজাত কি না জিজ্ঞাসা করিলে তিনি একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন। পরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী অতি সাধ্বী রমণী, অতীব পতিপরায়ণা। ইহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, "তা হ'লে এই সাধ্বী অনুরক্তা স্ত্রী কি করেছেন, যার জন্যে তাঁকে এই শাস্তি দেওয়া হবে? তুমি কি বিবাহের সময় শপথ কর নি যে, তুমি তাঁকে আজীবন পালন করবে? শিশু-সন্তান দুইটিই বা কি দোষে পরিত্যক্ত হবে? এরকম কাজ কি অমার্জ্জনীয় অপরাধ ব'লে গণ্য হবে না?" এই বলিয়া তিনি পণ্ডিত মহাশয়কে গৃহে যাইয়া সকলের প্রতি, এমন কি বিমাতার প্রতিও তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতে নির্দ্দেশ দিলেন ও বলিলেন যে, এইরূপ কর্ত্তব্য পালন করিলে তিনি সংসারে সুখী হইবেন।"[২৯]

বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটনের শ্যামপ্কুর ব্রাঞ্চের হেডমাস্টার তখন মহেন্দ্রনাথ গ্প্ত। মহেন্দ্রনাথ পরমহংসদেবের ভক্ত হয়ে উঠলেন।

পরমহংসদেব ছেলেবেলা থেকেই বিদ্যাসাগরের দয়ার কথা শ্নে এসেছেন। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতেও প্রায়ই শোনেন বিদ্যাসাগরের বিদ্যার কথা, কর্ণার কথা। পরমহংসদেব একদিন মহেন্দ্রনাথকে বললেন—আমাকে বিদ্যাসাগরের কাছে নিয়ে যাবে? আমার বড়ো দেখবার সাধ।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে এসে বললেন। বিদ্যাসাগর খ্শি হয়ে এক শনিবারে চারটের সময় সংগে করে নিয়ে আসতে বলে দিলেন।

একবার মহেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলেন—কী রকম পরমহংস? তিনি কি গের্য়া কাপড় পরে থাকেন?

মহেন্দ্রনাথ বললেন—আজ্ঞে, না। তিনি এক অদ্ভুত প্র্ষ। লালপেড়ে কাপড় পরেন, জামা পরেন, বার্নিশ করা চটিজ্তো পরেন। রাসমণির কালীবাড়িতে একটি ঘরের মধ্যে থাকেন, সেই ঘরে তক্তপোষ পাতা আছে, বিছানা আছে, মশারি আছে। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছ্ জানেন না। দিনরাত ঈশ্বরের চিন্তা করেন।

৫-আগস্ট. ১৮৮২ সাল। শনিবার। চারটে বাজবার দেরি নেই।

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি থেকে পরমহংসদেব একখানা ঠিকাগাড়িতে উঠলেন। সংগে কয়েকজন ভক্ত—ভবনাথ, হাজরা, মহেন্দ্রনাথ। বাদ্ড়বাগানে যাচ্ছেন। বিদ্যাসাগরের বাড়িতে।

গাড়িতে গল্প করতে-করতে যাচ্ছেন পরমহংসদেব।

পোল পার হল গাড়ি। শ্যামবাজার এসে গেল। তারপর আমহার্স্ট স্ট্রিট। ভক্তেরা বললেন—এইবার বাদ্ড়বাগানের কাছে এসেছে।

বিদ্যাসাগরের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল গাড়ি।

ইংরেজ-পছন্দ দোতলা বাড়ি।* বাড়ির চারদিকে দেয়াল। পশ্চিমদিকে সদর দরজা। দরজার দক্ষিণ দিকে ফটক। পশ্চিমদিকের নিচের ঘর হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে হয়। বিদ্যাসাগর উপরে থাকেন।

গাড়ি থেকে নামলেন পরমহংসদেব। গায়ে একটি লংক্লথের জামা, পরনে লালপেড়ে কাপড়, পায়ে বার্নিশ করা চটিজ্তো। মহেন্দ্রনাথ পথ দেখিয়ে চললেন। উঠোনে ফ্লগাছ। উঠোন পার হয়ে আসতে-আসতে পরমহংসদেব জামার বোতামে হাত দিলেন। জামার বোতাম খোলা। মহেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলেন—জামার বোতাম খোলা রয়েছে, এতে কিছ্ দোষ হবে না?

মহেন্দ্রনাথ বললেন—আপনি ওর জন্য ভাববেন না। আপনার কিছ্তে দোষ হবে না। আপনার বোতাম দেবার দরকার নেই।

---

* প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, ১৯২৫ সালের ২১-এপ্রিল 'আনন্দবাজার পত্রিকা' মন্তব্য করেছে : "অধঃপতিত জাতির সব চেয়ে বড় দোষ অকৃতজ্ঞতা। গভীর দ্ঃখ ও লজ্জার কথা, বাঙগালীদের মধ্যে এই দোষ শোচনীয় আকারে দেখা দিয়াছে। বাঙগালী তাহার মহতের সম্মান করিতে জানে না, তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা বাঙগালীর বিন্দ্মাত্র নাই। বিদ্যাসাগর বাঙগলা ও বাঙগালীর কতখানি, তাহা বোধ হয় ন্তন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই; কেননা এখনও প্রতিবৎসর বিদ্যাসাগরের জন্য সভাসমিতি হইয়া থাকে; বড় বড় বক্তারা চীৎকার করিয়া সেই স্বগীয় মহাত্মার নানা গ্ণবর্ণনা করেন। কিন্তু সত্যই কি বিদ্যাসাগরের প্রতি বাঙগালীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা আছে? তাই যদি থাকিবে, তবে বিদ্যাসাগরের বসতবাটী দেনার দায়ে বিক্রয় হইয়া যায় কেন এবং বাঙগালী তাহা জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে রক্ষা করিতে পারে না কেন?"

বালককে বোঝালে যেমন নিশ্চিন্ত হয়, তেমনি নিশ্চিন্ত হলেন পরমহংসদেব।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে পরমহংসদেব ভক্তদের সঙ্গে একেবারে প্রথম ঘরটিতে ঢুকলেন।

বিদ্যাসাগর সেই ঘরে বসে আছেন। সামনে একটা লম্বা চারকোণা পালিশ-করা টেবিল, টেবিলের একপাশে একখানা বেঞ্চি, দু-পাশে কয়েকখানা চেয়ার। দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলেন বিদ্যাসাগর। পরমহংসদেবকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। অভ্যর্থনা করলেন।

বিদ্যাসাগরের পরনে থানধুতি, পায়ে চটিজুতো, গায়ে একটি হাতকাটা ফ্লানেলের জামা, গলায় পৈতে। মাথার চারদিক কামানো। বাঁধানো দাঁত।

বাঁ-হাতখানা টেবিলের উপর রেখে পরমহংসদেব একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন বিদ্যাসাগরের দিকে, ভাবে বিভোর হয়ে হাসতে লাগলেন। কয়েকবার বললেন—জল খাব, জল খাব।

ভাবাবেশে বেঞ্চির উপর বসলেন পরমহংসদেব।

ব্যস্ত হয়ে বিদ্যাসাগর একজনকে জল আনতে বললেন। মহেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলেন—কিছু খাবার আনলে ইনি খাবেন কি?

মহেন্দ্রনাথ বললেন—আজ্ঞে, আনুন না।

ব্যস্ত হয়ে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন বিদ্যাসাগর। কিছু মিঠাই নিয়ে এলেন। বললেন—এগুলো বর্ধমান থেকে এসেছে।

মিষ্টিমুখের পর পরমহংসদেব বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথা কইতে আরম্ভ করলেন। দেখতে-দেখতে লোকজনে ঘর ভর্তি হয়ে গেছে। কেউ বসেছেন, কেউ দাঁড়িয়ে আছেন।

পরমহংসদেব বিদ্যাসাগরকে বললেন—আজ সাগরে এসে মিশলাম। এতদিন খাল বিল হ্রদ নদী দেখেছি। এবার সাগর দেখছি।

বিদ্যাসাগর সহাস্যে বললেন—তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।

পরমহংসদেব বললেন—না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর! তুমি ক্ষীরসমুদ্র।

—তা বলতে পারেন বটে।

বিদ্যাসাগর বিদ্যাদান করেন, অন্নদান করেন। নামডাক কিম্বা পুণ্যের লোভে করেন না। ভালোই করেন। অন্তত পরমহংসদেব সেইরকমই বললেন। তারপর বললেন—আর সিদ্ধ তুমি তো আছই।

—সিদ্ধ কেমন করে আছি?

—আলু-পটল সিদ্ধ হলে তো নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া!

সিদ্ধ হলে আলু-পটল নরম হয় বটে, কিন্তু সব জিনিসই তো আর সিদ্ধ হলে নরম হয় না। সেই কথাই বললেন বিদ্যাসাগর—কলাইবাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়।

কথা শুনে সকলে হেসে উঠলেন।

পরমহংসদেব বললেন—তুমি তা নও গো।

কথার পর কথার মালা গেঁথে চললেন পরমহংসদেব। বিমুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন সকলে। বললেন—ব্রহ্ম যে কি মুখে বলা যায় না। সব জিনিস এঁটো হয়ে গেছে। মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে, তাই এঁটো হয়েছে।

কিন্তু ব্রহ্ম এঁটো হয়নি। ব্রহ্ম যে কি আজ পর্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারেনি।

—বা! এটি তো বেশ কথা!—বিদ্যাসাগর বললেন—আজ একটি নতুন কথা শিখলাম।

সেই নতুন কথাটিকে একটা উদাহরণ দিয়ে বিশদ করে দিলেন পরমহংস-দেব—এক বাপের দুটি ছেলে। ব্রহ্মবিদ্যা শেখবার জন্যে বাপ ছেলে দুটিকে গুরুগৃহে পাঠালেন। কয়েক বছর পর ওরা গুরুগৃহ থেকে ফিরে এল, এসে বাপকে প্রণাম করল। এদের ব্রহ্মজ্ঞান কেমন হয়েছে, বাপের পরখ করে দেখবার ইচ্ছে হল। বড় ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাপ! তুমি তো সব পড়েছ, ব্রহ্ম কেমন বলো দেখি।' বড়ো ছেলে শ্লোকের পর শ্লোক আউড়ে বোঝাতে লাগল, ব্রহ্ম এমন, ব্রহ্ম অমন, ব্রহ্ম তেমন। বাপ চুপ করে শুনে গেলেন। তারপর ছোটো ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন। সে মাথা নিচু করে চুপ করে রইল। বাপ তখন খুশি হয়ে ছোটো ছেলেকে বললেন, 'বাপু, তুমিই একটু বুঝেছ। ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না।'

সুন্দর-সুন্দর কথা বলতে লাগলেন পরমহংসদেব। জ্ঞানের কথা, ভক্তির কথা, ঈশ্বরের কথা। বললেন—ঈশ্বরের অপার ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য যদি না থাকত তো কে তাঁকে মানত? দ্যাখো না, এই জগৎ কি চমৎকার। কত রকম জিনিস—চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র। কত রকম জীব। বড়ো, ছোটো, ভালো, মন্দ। কারো বেশি শক্তি, কারো কম শক্তি।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—তিনি কি কাউকে বেশি শক্তি, কাউকে কম শক্তি দিয়েছেন?

পরমহংসদেব বললেন—তা দিয়েছেন বৈকি। সকল লোকের শক্তি কি সমান হতে পারে? কোনোখানে একটা প্রদীপ জ্বলছে, কোনোখানে একটা মশাল জ্বলছে। তিনি কাউকে বেশি শক্তি কাউকে কম শক্তি দিয়েছেন। আর তা না হলে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো? অন্যের চেয়ে তোমার দয়া তোমার বিদ্যা আছে, তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে।

আরো কত কথা বললেন পরমহংসদেব। গানও গাইলেন দু-একখানা।

এদিকে রাত প্রায় নটা বাজে। এবার পরমহংসদেবকে বিদায় নিতে হবে।

বিদায়ের আগে বিদ্যাসাগরকে বললেন—একবার বাগান দেখতে যাবেন, রাসমণির বাগান। ভারি চমৎকার জায়গা।

বিদ্যাসাগর বললেন—যাব বৈকি। আপনি এলেন আর আমি যাব না!

—আমার কাছে? ছি! ছি!

—সে কি! এমন কথা বললেন? আমায় বুঝিয়ে দিন।

—আমরা জেলেডিঙি। খাল বিল আবার বড়ো নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ, কি জানি যেতে গিয়ে চড়ায় পাছে লেগে যায়।

হাসিমুখে চুপ করে রইলেন বিদ্যাসাগর। পরমহংসদেব বললেন—তার মধ্যে এ-সময় জাহাজও যেতে পারে।

বিদ্যাসাগর সহাস্যে বললেন—হ্যাঁ, এটি বর্ষাকাল বটে।[০০]

কিন্তু, সেই বর্ষাকাল কেন, কোনোকালেই বিদ্যাসাগর পরমহংসদেবের কাছে যাননি।

পরমহংসদেব একদিন মহেন্দ্রনাথকে বলেছেন—বিদ্যাসাগর সত্য কথা কয় না কেন? বিদ্যাসাগর সেদিন বললে, এখানে আসবে; কিন্তু এল না।

কাশীতে একবার একজন ভদ্রলোক বিদ্যাসাগরের কাছে তাঁর ধর্মমত জানতে চাইলেন।

বিদ্যাসাগর বললেন—আমার মত কখনো কাউকে বলিনি। তবে একথা বলি, গঙ্গাস্নানে যদি আপনার শরীর পবিত্র হয়, শিবপূজায় যদি আপনার হৃদয় পবিত্র হয়, তাহলে তাই আপনার ধর্ম।

কাশীবাসী অনেক বাঙালী ব্রাহ্মণের উপর বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধা নেই। মারাঠী বেদপাঠী ব্রাহ্মণদের উপর বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধা আছে।

বিদ্যাসাগর বলেছেন :

"ইহাদের (মহারাষ্ট্রীয় বেদপাঠী ব্রাহ্মণদের) আচার ব্যবহার দেখিয়া আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিয়াছে, কিন্তু আমাদের বাঙ্গালা হইতে যেসকল বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কাশীবাস করিতেছেন তন্মধ্যে অনেকেই ভিক্ষুক ও অনেকেই দুষ্ক্রিয়াসক্ত, ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য ও মূর্খ...।"

কাশীতে কয়েকজন ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরকে বললেন—আপনার বাবার কাছে আমরা অনেক খেয়েছি। সময়ে-সময়ে অনেক টাকাকড়ি নিয়েছি, তৈজস-পত্র নিয়েছি। আপনার বাবা পরম ধার্মিক। পিতৃপুণ্যেই আপনি বিখ্যাত হয়েছেন। আপনি আমাদের পাঁচ-সাত হাজার টাকা দান করে নাম করুন।

বিদ্যাসাগর বললেন—আপনারা বাবার কাছে পেয়ে থাকেন, তাঁকে বলুন, তিনি যেমন দেন, তেমনি দেবেন।

ওঁরা বললেন—বড়োলোক কাশীদর্শনে এলে আমাদের অনেক টাকাকড়ি দিয়ে থাকেন। আপনি নামজাদা লোক, আপনাকে অবশ্যি দান করতে হবে।

বিদ্যাসাগর বললেন—আমি কাশীদর্শন করতে আসিনি, পিতৃদর্শনের জন্য এসেছি। আমি যদি আপনাদের মতো বামুনকে কাশীতে দান করে যাই, তাহলে আমি কলকাতায় ভদ্রলোকের কাছে মুখ দেখাতে পারব না। আপনারা যতরকম দুষ্কর্ম করতে হয় তা করে দেশ ছেড়ে এসে কাশীতে উঠেছেন। এখানে আছেন বলে আপনাদের যদি আমি ভক্তি-শ্রদ্ধা করে বিশ্বেশ্বর বলে মান্য করি, তাহলে আমার মতো নরাধম আর নেই।

সেই ব্রাহ্মণেরা বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কি তবে কাশীর বিশ্বেশ্বর মানেন না?

বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন—আমি আপনাদের কাশী মানি না। আপনাদের বিশ্বেশ্বর মানি না।

সেই ব্রাহ্মণেরা রাগ করে বললেন—আপনি তাহলে কী মানেন?

বিদ্যাসাগর বললেন—মাকে মানি, বাবাকে মানি। আমার বাবা আমার বিশ্বেশ্বর, আমার মা আমার অন্নপূর্ণা।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "অগ্রজ মহাশয় (বিদ্যাসাগর) শৈশবকাল হইতে কাল্পনিক দেবতার প্রতি কখনই ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিতেন না। জগতের মধ্যে কেবল হিন্দুগণ দেব দেবী প্রতিমার প্রতি যেরূপ হৃদয়ের সহিত ভক্তি প্রকাশ করেন, তিনি জনক জননীকে বাল্যকাল হইতে তদ্রূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা ও দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিতেন।"[৩১]

ভগবতী দেবী বড়ো মাছ কুটতে খুব ভালোবাসেন। কেবল কুটতে নয়, রাঁধতে, লোকজনকে খাওয়াতে। বড়ো মাছ পেলে সবকিছু ভুলে যান ভগবতী দেবী।

বড়ো মাছ সম্পর্কে ভগবতী দেবীর এই পরম দুর্বলতার কথা ঠাকুরদাস জানেন।

সব সংসারেই যা হয়ে থাকে, কখনো-কখনো ঠাকুরদাসের সঙ্গে ভগবতী দেবীর মনোমালিন্য হত। খুব রাগ করে ভগবতী দেবী হয়তো একা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতেন।

ঠাকুরদাস তখন বেরিয়ে পড়তেন। মস্ত একটা রুই কি কাতল মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। মাছটাকে জোরে আছাড় মেরে ফেলে দিয়ে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

বড়ো মাছের শব্দ শুনে ভগবতী দেবী আর স্থির থাকতে পারতেন না, চোখের জল মুছতে মুছতে দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেন, ছাই আর বঁটি নিয়ে মাছের দিকে এগোতেন।

ঠাকুরদাস তখন বলতেন—খবরদার, মাছে হাত দিও না বলছি।

ভগবতী দেবী সেকথা কানে নিতেন না।

ঠাকুরদাস বলতেন—আমার হুকুম না পেলে, আমার মাছে যে হাত দেবে, সে টেরটি পাবে।

ভগবতী দেবী মাছ নিয়ে নির্ভয়ে বসে পড়তেন, ঠাকুরদাস ক্ষণকাল অপেক্ষা করে অন্য কাজে চলে যেতেন, বাড়ির বৌয়েরা এই দৃশ্য দেখে ঘোমটার আড়ালে হাসাহাসি করত।[৩২]

পুকুরে স্নান করতে নেমেছেন ভগবতী দেবী, এমন সময় একদিন একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেখানে এসে উপস্থিত। পুকুরে স্নান করতে এসেছেন।

ব্রাহ্মণের হাতে একটি পুঁটলি। পুঁটলির ভেতর থেকে একখানা শুকনো কাপড় বের করলেন। পুঁটলিটা পুকুরের ধারে একটা ঝোপের মধ্যে রেখে দিলেন। তারপর ব্রাহ্মণ স্নান করতে নামলেন পুকুরে।

স্নানান্তে ব্রাহ্মণ শুকনো কাপড় পরলেন, গামছাখানা মাথায় দিয়ে সন্ধ্যাহ্নিক করতে করতে দ্রুতপায়ে চলে গেলেন। তাড়াতাড়িতে পুঁটলির কথা আর মনে নেই। পুঁটলি ঝোপের মধ্যে যেমন ছিল তেমনি পড়ে রইল।

স্নানান্তে উপরে উঠলেন ভগবতী দেবী, তাঁর চোখ পড়ল পুঁটলির উপরে। পুঁটলির মধ্যে কী আছে? ভগবতী দেবী খুলে দেখলেন—কয়েকখানা নতুন কাপড়, একজোড়া সোনার দুল আর চল্লিশটি টাকা।

আর কোনো উপায় না দেখে ভগবতী দেবী সমস্ত দিন পুকুরপাড়ে সেই পুঁটলি নিয়ে বসে রইলেন।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাঁদতে কাঁদতে এসে উপস্থিত। ভগবতী দেবীকে বললেন—মা, আমার সর্বনাশ হয়েছে। আমি কন্যাদায়গ্রস্ত। কাল আমার মেয়ের বিয়ে। দুপুরবেলা আমি এই পুকুরে স্নান করতে এসেছিলাম। আমার কাছে একটি পুঁটলি ছিল। ভিক্ষে করে যা কিছু যোগাড় করেছি, সব ওই পুঁটলির মধ্যে আছে। মা, এখন আমার উপায় কী?

—পুঁটলির ভেতরে আপনার কী কী জিনিস ছিল?

ব্রাহ্মণ সত্য উত্তর দিলেন।

—আপনি যে কন্যাদায়গ্রস্ত তা আমি আগেই জানতে পেরেছি। তা না হলে আপনার এমন ভুল হবে কেন?

তারপর পুঁটলিটি ব্রাহ্মণের হাতে দিলেন ভগবতী দেবী।

বললেন—আপনার সব জিনিস ঠিক আছে কিনা দেখুন। তখন থেকে

আমি এই পুঁটলি নিয়ে এখানে বসে আছি। যা হোক, আপনি আমাকে নিশ্চিন্ত করলেন।

আনন্দে ব্রাহ্মণের চোখে জল এসে গেল। তিনি বললেন—মা, তুমি আমার জাতকুল রক্ষা করলে। মা, আমি এখনো জলগ্রহণ করিনি। আমি অভীষ্ট দেবতার কাছে প্রার্থনা করি : তুমি যেন ধনেবংশে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করো।

এখন পর্যন্ত জলগ্রহণ করেননি, আহা। ব্রাহ্মণকে পরম সমাদরে বাড়িতে নিয়ে এলেন ভগবতী দেবী। তাঁর পরিচর্যা করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন—যে-টাকা আপনার যোগাড় হয়েছে তাতে কি আপনি কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পেতে পারবেন?

—না মা, আরো দশ-বিশ টাকা দরকার।

কুড়িটি টাকা ব্রাহ্মণের হাতে দিলেন ভগবতী দেবী। বললেন—গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ের এই কটি টাকা দয়া করে গ্রহণ করুন।[৩৩]

পাইকপাড়ার রাজবাড়িতে হডসন নামে একজন ছবি-আঁকিয়ে সাহেব এসেছেন। বিদ্যাসাগরের ওই রাজবাড়িতে যাওয়া-আসা আছে। হডসন সাহেবের খুব ইচ্ছা হল, বিদ্যাসাগরের একখানা ছবি আঁকেন। প্রথমে রাজি হননি বিদ্যাসাগর। হডসন সাহেব অনেক সাধ্য-সাধনা করলেন, অগত্যা বিদ্যাসাগর রাজি হলেন।

বিদ্যাসাগরের ছবি আঁকলেন হডসন সাহেব। সুন্দর ছবি হল। কিন্তু হডসন সাহেব টাকাকড়ি নিলেন না। বিদ্যাসাগর বিস্তর চেষ্টা করলেন, কিন্তু না, সাহেব এক পয়সাও নেবেন না।

১৮৫৬ সালের ২-সেপ্টেম্বর 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখেছে : "প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণকারি শ্রীযুক্ত হড্‌সন সাহেব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য কৃত পুস্তক যাহা বিধবা বিবাহ পক্ষে লিখিত হইয়াছে তাহার ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, অতএব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এক চিত্র মূর্ত্তি করিয়া তাঁহাকে উপঢৌকন দিয়াছেন, উপঢৌকন প্রদান কালীন কহিলেন "আমি তোমার পরিশ্রমের কৃতজ্ঞতা স্বীকার জন্য বিনামূল্যে এই উপঢৌকন দিলাম এবং শ্রীযুক্ত ডাক্তার টোনেয়ার সাহেবও পূর্ব্বোক্ত অনুবাদ পাঠ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট যাইয়া অশেষ প্রসংশাবাদে কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় হিন্দু জাতীয়া বিধবাদিগের পক্ষে যে মহদুপকার করিয়াছেন ইহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের উচিত হয় তাঁহাকে চিরস্মরণীয় কোন চিহ্ন প্রদান করেন, হিন্দু মহাশয়েরা ইহা করিবেন না কিন্তু যুব হিন্দুগণ যাঁহারা এই উপকার বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহারাও কি নিস্তব্ধ ভাবে থাকিবেন? আমরা এমত প্রত্যাশা করি না বিদ্যাসাগরের চিরস্মরণীয় চিহ্ন শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি হইবে, নিদানে ত্রীশ সহস্র টাকার ন্যূনে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে না কিন্তু তাঁহারা এক চিত্র মূর্ত্তি না করাইতে পারেন এমত নহে অতএব এক চিত্র মূর্ত্তি করিয়া সংস্কৃত কালেজে স্থাপন করা তাঁহারদিগের উচিত কর্ম্ম হইবে॥"

ভেবেচিন্তে বিদ্যাসাগর তাড়াতাড়ি মাকে কলকাতায় আনালেন। টাকা খরচ করে হডসন সাহেবকে দিয়ে ছবি করাবেন।

বিদ্যাসাগর মাকে বললেন—মা, পাকপাড়ার রাজবাড়িতে একজন খুব ভাল পটো সাহেব এসেছেন, তাঁকে দিয়ে তোমার একখানা ছবি তুলিয়ে রাখব।

মা বললেন—দূর, আমার আবার ছবি কী হবে, ছি-ছি।

বিদ্যাসাগর বললেন—ছবি কি তোমার জন্য? ছবি আমার জন্য। একখানা ছবি থাকলে, যখন যেখানে থাকি, প্রাণটা কেমন করলে একবার দেখব।

অগত্যা মা বললেন—তবে তোর যা ইচ্ছা তাই কর।

বিদ্যাসাগর তখন জিজ্ঞেস করলেন—সাহেবকে এখানে আনব? না, তুমি আমার সঙ্গে সেখানে যেতে পারবে?

মা বললেন—পটো সাহেব! না বাপু, আমি সাহেবের সামনে ছবি তোলাতে বসতে পারব না।

বিদ্যাসাগর বললেন—সাহেব খুব ভালো লোক। আমার একখানা ছবি এঁকেছে, তার দাম নেয়নি, আমাকে খুব ভালোবাসে। তাঁর সামনে বসতে দোষ নেই।

মা বললেন—তা তোর যা ইচ্ছা কর। তবে আমি অন্য কোথাও যেতে পারব না বাবা। যা করবি এখানে এনে কর।

বিদ্যাসাগর বললেন—সেখানে সব যোগাড় আছে। সে-আড্ডা ভেঙে এখানে আনতে গেলে হয়তো ছবি ভালো হবে না।

মা বললেন—তুই যখন ধরিছিস, তোকে এঁটে উঠতে পারব না। তা তোর যা ইচ্ছা করগে, গেলেও তোর সঙ্গে যাব তো। নিন্দা হলে লোকে তো আর আমার নিন্দা করবে না, তোরই নিন্দা করবে। বলবে, বিদ্যাসাগর মাকে পাকপাড়া রাজবাড়িতে ছবি তোলাতে নিয়ে গিয়েছে।*

দিনকয়েক যাতায়াত করে ছবি তৈরি করালেন বিদ্যাসাগর। ঘরে পছন্দমতো জায়গায় মা-বাবার ছবি সাজিয়ে রাখলেন। আমরণ বিদ্যাসাগর মা-বাবার ছবিকে প্রণাম করে তবে গিয়ে জলগ্রহণ করেছেন।[৩৪]

রবীন্দ্রনাথ, যতদূর জানা যায়, কখনো ভগবতী দেবীকে স্বচক্ষে দেখেননি, লিথোগ্রাফ-পটে প্রকাশিত তাঁর দেবীমূর্তি দেখেছেন। সেই প্রতিমূর্তি দেখে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন : "অধিকাংশ প্রতিমূর্তিই অধিকক্ষণ দেখিবার দরকার হয় না, তাহা যেন মুহূর্তকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। তাহা নিপুণ হইতে পারে, সুন্দর হইতে পারে, তথাপি তাহার মধ্যে চিত্তনিবেশের যথোচিত স্থান পাওয়া যায় না, চিত্রপটের উপরিতলেই দৃষ্টির প্রসর পর্যবসিত হইয়া যায়। কিন্তু ভগবতী দেবীর এই পবিত্র মুখশ্রীর গভীরতা এবং উদারতা বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও শেষ করিতে পারা যায় না। উন্নত ললাটে তাঁহার বুদ্ধির প্রসার, সুদূরদর্শী স্নেহবর্ষী আয়ত নেত্র, সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপূর্ণ চিবুক, এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সুসংযত সৌন্দর্য দর্শকের হৃদয়কে বহু দূরে এবং বহু ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়—এবং ইহাও বুঝিতে পারি, ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধনের জন্য কেন বিদ্যাসাগরকে এই মাতৃদেবী ব্যতীত কোনো পৌরাণিক দেবীপ্রতিমার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় নাই।"[৩৫]

১৮৬৮ সালের ২৬-মার্চ 'অমৃতবাজার পত্রিকা' লিখেছে : "পাঠকগণ!

---

* এই বিবরণ দাখিল করে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে এই বিবরণটী শুনিয়াছিলাম।" (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪০৩) কিন্তু এ-বিষয়ে মতান্তর আছে। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের মতে বিদ্যাসাগর ছবি তোলানোর জন্য মাকে পাকপাড়া রাজবাড়িতে নিয়ে যাননি। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন : "বিদ্যাসাগর মহাশয় ছবি তুলাইবার জন্য মাতাকে সঙ্গে করিয়া হডসেন সাহেবের বাটী গিয়াছিলেন।" (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস, পৃ. ৩৬)

আপনারা কি বিদ্যাসাগরের লাইব্রেরিতে কখন গিয়াছেন। সেই গৃহের উত্তর দিকে যে একটী স্ত্রীলোকের ছবি টাঙ্গান আছে সেইটি বিদ্যাসাগরের মাতার ছবি। এই রত্ন-গর্ভ-ধারিণীর বয়ঃক্রম এক্ষণে ৬০।৬১ বৎসর হইবেক, ইনি গৌরাঙ্গী, বার চৌদ্দ আনা মূল্যের ১ খান কস্তা পেড়ে সাটী পরা, অলঙ্কারের মধ্যে কেবল হস্তেতে শাঁখা আছে। কিন্তু যদি কোন চিত্রকর নির্দ্দোষিতা, লজ্জা ও হিন্দু সতির ছবি চিত্র করিতে ইচ্ছা করে, তবে ঐ পটের অবিকল নকল করিলে তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক সন্দেহ নাই।...”

জগদ্ধাত্রী পুজো হবে বীরসিংহে। বিদ্যাসাগরের বাবার ইচ্ছা, পুজোয় বাদ্যবাজনা ধুমধাম হয়। আর বিদ্যাসাগরের মায়ের ইচ্ছা, সেসব না করে কেবল গরীব-কাঙালীদের খাওয়ানো হয়।

কার ইচ্ছা বজায় থাকবে? কার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন বিদ্যাসাগর—মায়ের না বাবার?

বিদ্যাসাগর বললেন—দু-জনের কথাই থাকবে।

তাই হল। বাদ্যবাজনাও হল, গরীব-কাঙালীদেরও খাওয়ানো হল।

একবার বিদ্যাসাগর মাকে জিজ্ঞেস করলেন—বছরে একদিন ঘটা করে পুজো করে অযথা ছ-সাতশো টাকা খরচ করা ভালো? না, ওই টাকায় গ্রামের গরীব-দুঃখীদের মাসে-মাসে কিছু-কিছু সাহায্য করা ভালো?

মা বললেন—গ্রামের গরীব-দুঃখীরা প্রত্যেক দিন খেতে পেলে পুজো করার দরকার নেই।[৩৬]

ভগবতী দেবীর এই উক্তির সূত্রে রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে বলেছেন : “এ কথাটি সহজ কথা নহে। তাঁহার (ভগবতী দেবীর) নির্মল বুদ্ধি এবং উজ্জ্বল দয়া, প্রাচীন সংস্কারের মোহাবরণ যে এমন অনায়াসে বর্জন করিতে পারে, ইহা আমার নিকট বড়ো বিস্ময়কর বোধ হয়। লৌকিক প্রথার বন্ধন রমণীর কাছে যেমন দৃঢ়, এমন আর কার কাছে। অথচ কী আশ্চর্য, স্বাভাবিক চিত্ত-শক্তির দ্বারা তিনি জড়তাময় প্রথাভিত্তি ভেদ করিয়া নিত্যজ্যোতির্ময় অনন্ত বিশ্বধর্মাকাশের মধ্যে উত্তীর্ণ হইলেন। এ কথা তাঁহার কাছে এত সহজ বোধ হইল কী করিয়া যে, মনুষ্যের সেবাই যথার্থ দেবতার পুজা। তাহার কারণ, সকল সংহিতা অপেক্ষা প্রাচীনতম সংহিতা তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল।”[৩৭]

ভগবতী দেবী মূর্তিপুজার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। উত্তরকালে স্বয়ং বিদ্যাসাগর বলেছেন—আমার মা বলতেন, যে দেবতা আমি নিজ হাতে গড়লাম, সে আমাকে উদ্ধার করবে কেমন করে? বাঁশ, খড়, দাঁড়, মাটিতে ঠাকুর গড়ে পুজো করে কি ধর্ম হয়?*

---

* এই বিবরণের প্রতিবাদ করে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : “...জননী দেবী মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য দেবতার পুজা দিতেন; এবং বিদেশস্থ ছেলেদের উদ্দেশে শুভচণ্ডীর পুজা মানসিক করিতেন এবং পিতৃ মাতৃশ্রাদ্ধও করিতেন। তাঁহারই আগ্রহাতিশয়ে বাটীতে জগদ্ধাত্রী পুজা হইত, তিনি ভক্তিপূর্ব্বক পুজার আয়োজন করিতেন ও পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। এতদ্ভিন্ন কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থপর্য্যটনে যাইতেন।” (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস, পৃ. ৩৬-৩৭।)

তদুত্তরে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : “...আমি তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) নিজ মুখে ইহা শুনিয়াছি। তদীয় স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও (নারায়ণ বাবুর জ্যেষ্ঠ জামাতা) এই ভাবের কথা তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছেন।” (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৩৯৯।)

হ্যারিসন সাহেব সরকারী কাজে মেদিনীপুরে এসেছেন। অল্পবয়সী সাহেব। বিদ্যাসাগর তখন বীরসিংহে। মা বিদ্যাসাগরকে বললেন—তা ছেলেটিকে একবার আমাদের বাড়িতে আনবি না? তাকে একবার আমাদের বাড়িতে এনে কিছু খাওয়ালে ভালো হত।

বিদ্যাসাগর হ্যারিসন সাহেবকে মায়ের ইচ্ছার কথা জানালেন।

হ্যারিসন সাহেব বললেন—তিনি নিজে নেমন্তন্ন না করলে আমি যাব না।

বিদ্যাসাগরের মা হ্যারিসন সাহেবকে নেমন্তন্ন করে চিঠি লিখলেন। চিঠিখানা তুলে দিচ্ছি :

"শ্রীশ্রীহরিঃ—
শরণং

অশেষগুণাশ্রয়
শ্রীযুত এচ্ এল্ হেরিসন মহোদয়
পরম কল্যাণভাজনেষু

সস্নেহসম্ভাষণমাবেদনমিদম্

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট শুনিলাম, আপনি সত্বর কলিকাতা প্রতিগমন করিবেন। আমার নিতান্ত মানস, দয়া করিয়া তৎপূর্ব্বে একবার বীরসিংহের বাটীতে আগমন করেন, তাহা হইলে আমি যার পর নাই আহ্লাদিত হই। প্রার্থনা এই, আমার বাসনা পরিপূরণে বিমুখ হইবেন না। ইতি ২ ফাল্গুন ১২৭৫ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণ্যাঃ
শ্রীভগবতী দেব্যাঃ।"

হ্যারিসন সাহেব তারপর এলেন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে। সন্তান যেমন মাকে প্রণাম করে তেমনিভাবে, পুরোপুরি এ-দেশী নিয়মে, হ্যারিসন সাহেব প্রণাম করলেন বিদ্যাসাগরের মাকে।

হ্যারিসন সাহেবকে যত্ন করে খাওয়ালেন বিদ্যাসাগরের মা। সাহেব খাচ্ছেন, বিদ্যাসাগরের মা চেয়ারে বসে সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে লাগলেন। ব্রাহ্মণের ঘরের একজন বৃদ্ধা গৃহিণীর উদার হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে সাহেব আশ্চর্য হয়ে গেলেন।[৩৮]

ভগবতী দেবীর শাশুড়ি চরকায় সুতো কেটে কায়ক্লেশে সংসার চালিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের উপার্জন যখন বিপুল, তখনো ভগবতী দেবী সেকথা ভোলেননি। তখনো ভগবতী দেবী রাত দেড়টার পর একা-একা বসে নিয়মিত প্রায় দু-ঘণ্টা চরকায় সুতো কেটেছেন।

বীরসিংহের বাড়িতে বেড়াতে এসে হ্যারিসন সাহেব চরকাটা দেখতে পেলেন। তিনি শম্ভুচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন—এটা কী?

শম্ভুচন্দ্র সে-প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলেন না। হ্যারিসন সাহেবকে অন্য কথায় নিয়ে গেলেন।

হ্যারিসন সাহেব বিদায় নিয়ে যাওয়ার পর শম্ভুচন্দ্র রাগ করে চরকা ভেঙে ফেললেন। এই ঘটনায় এতদূর দুঃখিত হলেন ভগবতী দেবী যে একদিন

তিনি অন্নজল স্পর্শ করলেন না। শেষপর্যন্ত শম্ভুচন্দ্র চরকা বানিয়ে দিলেন, তারপর ভগবতী দেবী অন্নজল গ্রহণ করলেন।[৩৯]

সন্দেহ নেই, অত্যন্ত উদার স্বভাব বিদ্যাসাগরের মায়ের। মনে একবিন্দু কুসংস্কার নেই। গরীব-বড়লোক, পণ্ডিত-মূর্খ, মেয়ে-পুরুষ, হিন্দু-অহিন্দু—বিদ্যাসাগরের মায়ের কাছে সকলেই সমান।

যোগেন্দ্রনাথ আর মহালক্ষ্মীর সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী সেসময়ে চাঁপাতলার দীঘির পূর্বদিকের একটা বাড়িতে একত্র থাকেন। সপ্তাহে দু-তিনদিন আসেন বিদ্যাসাগর, দেখাশোনা করেন, দরকারমতো সাহায্য করেন।

পাশের বাড়িতে ছ-সাত বছরের একটি মেয়ে থাকে। মেয়েটি বিধবা। জাতে ছুতোর। মেয়েটির বাবা বেঁচে নেই।

সকাল-বিকাল এ-বাড়িতে আসে মেয়েটি। শিবনাথকে 'দাদা' বলে ডাকে। শিবনাথের গলা জড়িয়ে কোলে বসে থাকে।

সেদিন সকালবেলা। শিবনাথের গলা জড়িয়ে মেয়েটি কোলে বসে আছে, এমন সময় বিদ্যাসাগর এলেন। আগে এই মেয়েটিকে তিনি দেখেননি। এই প্রথম দেখলেন। দেখে বললেন—ও মেয়েটি কে হে? বাঃ, বেশ সুন্দর মেয়েটি তো।

শিবনাথ বললেন—ওটি পাশের বাড়ির একটি ছুতোরের মেয়ে। আমাকে 'দাদা' বলে, আমার কোলে বসতে ভালোবাসে। ওটি বিধবা।

বিদ্যাসাগর চমকে উঠলেন—বলো কি! এইটুকু মেয়ে বিধবা!

তারপর মেয়েটিকে ডাকলেন বিদ্যাসাগর—আয় মা, আমার কোলে আয়।

লজ্জায় যেতে চায় না মেয়েটি। শিবনাথ তখন মেয়েটিকে বিদ্যাসাগরের কোলে বসিয়ে দিলেন। বিদ্যাসাগর ওকে বুকে ধরে আদর করলেন। শিবনাথকে বললেন—মেয়েটিকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দাও। মাইনে আমি দেব।

বিদ্যাসাগরের কথামতো পরদিন বিকেলে মেয়েটি আর তার মা বিদ্যাসাগরের বাড়িতে এল। ছুতোরের মেয়ে বলে বিদ্যাসাগরের মা ওদের একবিন্দু অবজ্ঞা করেননি। মেয়েটিকে কোলে জড়িয়েছেন, কাছে বসে ওদের খাইয়েছেন, আসার সময় দু-জনকে কাপড় দিয়েছেন।[৪০]

বিবাহের পর কয়েকটি বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা বিদ্যাসাগরের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে।

বাড়ির নতুন বৌয়েরা ওদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশল না, একটু দূরে দূরে থাকার চেষ্টা করল। উপরন্তু, 'জাত গেছে' বলে ওদের ঠাট্টা করল। তাছাড়া আরো নানারকম ঠাট্টা।

এমন মর্মঘাতী ঠাট্টা যে ওই মেয়েরা কেঁদে ফেলল।

ভগবতী দেবী এসে ওদের হাত ধরে বললেন—মায়েরা, কেঁদো না, ওরা ছেলেমানুষ, তাতে পরের মেয়ে, তোমাদের সমাদর কি বুঝবে? ওদের কথায় কি দুঃখ করতে আছে?

ওদের নিয়ে একপাতে খেতে বসলেন ভগবতী দেবী। বললেন—দ্যাখো, এখন তো তোমরা বুঝতে পারলে যে তোমাদের জাত যায়নি? জাত গেলে কি তোমাদের সঙ্গে আমি একপাতে ভাত খেতাম?[৪১]

ভগবতী দেবীর ধারণা, বিধবাবিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের কোনো ভুল হয়নি, কোনো অন্যায় হয়নি। বিদ্যাসাগর যেসব বিধবার বিয়ে দিয়েছেন তাদের কারো-কারো সঙ্গে ভগবতী দেবী আহার করতেন।

নারায়ণচন্দ্র একদিন ঠাট্টা করে বললেন—ঠাকুরমা, তুমি যে এদের সঙ্গে বসে খাচ্ছ? এতে যে জাত যাবে।

ভগবতী দেবী উত্তর দিলেন—দোষ কী? ঈশ্বর বহুশাস্ত্র জানে; ঈশ্বর কি অন্যায় কাজ করতে পারে?[৪২]

রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলেছেন : "বঙ্গদেশের সৌভাগ্যক্রমে এই ভগবতী দেবী এক অসামান্যা রমণী ছিলেন।"[৪৩]

প্রিয়দর্শন হালদার লিখেছেন : "যে সকল বালক গৃহে ভোজন করিয়া বীরসিংহ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত, তাহাদের ভোজনান্তে উচ্ছিষ্ট অন্ন পাত্রে পরিত্যক্ত থাকিত। ভগবতী দেবী কন্যাদিগকে সেই সকল উচ্ছিষ্ট অন্ন যত্ন সহকারে রক্ষা করিতে বলিতেন। এবং পরিশেষে তিনি পরম সন্তোষপূর্ব্বক সেই সকল অন্ন ভোজন করিতেন। এইরূপে অনেকদিন ঐ উচ্ছিষ্ট অন্ন দ্বারাই তাঁহার উদরপূর্ত্তি হইত।"[৪৪]

বীরসিংহের বাড়ি একবার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বিদ্যাসাগর তারপর মাকে কলকাতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করলেন। মা বললেন—যেসব গরীবের ছেলে এখানে খেয়ে বীরসিংহ ইস্কুলে পড়ে, আমি এখান থেকে চলে গেলে তারা কী খেয়ে ইস্কুলে যাবে?

বিদ্যাসাগর একদিন ভগবতী দেবীকে জিজ্ঞেস করলেন—মা, তোমার কী কী গহনা পরবার ইচ্ছা হয়?

ভগবতী দেবী উত্তর দিলেন—বাবা, অনেকদিন থেকে আমার তিনখানি গহনা পরবার বড়ো ইচ্ছা আছে। গ্রামের ছেলেদের জন্য একটি দাতব্য বিদ্যালয় করে দাও, গ্রামের গরীব মানুষদের জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয় করে দাও, আর গ্রামের গরীবের ছেলেদের থাকা-খাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দাও। অনেকদিন থেকে আমার এই তিনখানি গহনার বড়ো ইচ্ছা।[৪৫]

মায়ের গহনার সাধ বিদ্যাসাগর অপূর্ণ রাখেননি।

বাড়ির জন্য ছ-খানা লেপ পাঠিয়েছেন বিদ্যাসাগর। ছ-খানাই গরীব-দুঃখীদের বিলিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগরের মা। বিদ্যাসাগরকে চিঠিতে লিখলেন : "ঈশ্বর! তোমার প্রেরিত লেপ কয়খানি শীতে বিপন্ন লোকদিগকে দিয়া ফেলিয়াছি, আমাদের ব্যবহারের জন্য লেপ পাঠাইয়া দিবে।"

যেমন মা, তেমনি ছেলে। উত্তরে বিদ্যাসাগর মাকে লিখলেন : "ঐরূপ ভাবাপন্ন লোকদিগকে ও বাড়ীর লোকদিগকে দিয়া তোমার নিজের জন্য একখানি লেপ রাখিতে হইলে, সর্ব্বসমেত কয়খানি লেপ পাঠাইব লিখিবে। তোমার পত্র পাইলে আবশ্যকমত লেপ পাঠাইব।"[৪৬]

দুপুরে বাড়ির সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলেও নিজে সহজে খেতে বসতেন না ভগবতী দেবী। যদি কোনো অতিথি এসে পড়ে, যদি কোনো উপোসী কাঙাল একমুঠো ভাতের জন্য দরজায় এসে দাঁড়ায়!

যতদূর সাধ্য, মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করার চেষ্টা করতেন ভগবতী দেবী। পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে বেড়াতেন, সকলের খোঁজ-খবর নিতেন। দুঃখীর জাত-বিচার করতেন না। অবাধে রুগ্ন হাড়ি-ডোমের ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করেছেন। সাগু-মিছরি সঙ্গে থাকত অনেক সময়, দরকার হলে নিজে রুগীর বাড়িতে গিয়ে পথ্য তৈরি করে দিয়ে এসেছেন।

হরিশ্চন্দ্র একজন হিন্দী কবি। বিদ্যাসাগরের বন্ধু। তিনি একদিন ভগবতী দেবীকে বললেন—বিদ্যাসাগরের মায়ের হাতে রূপোর খাড়ু!

ভগবতী দেবী উত্তর দিলেন—সোনা রুপোয় কী করে? উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় এই হাত রেঁধে হাজার হাজার লোককে খাইয়েছিল। তাই বিদ্যাসাগরের মায়ের হাতের শোভা।[৪৭]

ভগবতী দেবী গ্রামের গরীব চাষাভূষোদের টাকাকড়ি ধার দিতেন। যাদের কাছ থেকে সহজে ধারের টাকা আদায় হত না, ভগবতী দেবী স্বয়ং তাদের বাড়িতে টাকা আদায় করতে যেতেন। কখনো-কখনো খুব রাগ করে টাকা ফেরত চাইতেন, বলতেন—তোরা যদি টাকা না দিবি তো আমি আর কী করে টাকা ধার দেব?

ভগবতী দেবীর রাগ দেখে কেউ-কেউ তাঁকে নানা কথায় তুষ্ট করতে চেষ্টা করত; কেউ-কেউ দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলে দুঃখের কথা জানাত; কেউ-কেউ বিদ্যাসাগরের নাম করে ঈশ্বরের কাছে তাঁর মঙ্গল প্রার্থনা করত।

ভগবতী দেবীর সমস্ত রাগ জল হয়ে যেত। বলতেন—ভাল ভাল, যখন সুবিধে হবে, তখন দিস। আজ কিন্তু আমার বাড়িতে চারটি প্রসাদ পাস।

কৃষককন্যারা ভগবতী দেবীকে মুড়ি নারকেল বাতাসা প্রভৃতি জলখাবার দিলে তিনি আঁচলে বেঁধে নিয়ে আসতেন।

হাট থেকে মানুষজন বাড়ির সামনে দিয়ে যেত, ভগবতী দেবী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কারো শুকনো মুখ দেখলে বলতেন—আহা! আজ বুঝি তোর খাওয়া হয়নি? আয় আয়, আমার বাড়িতে খাবি আয়।[৪৮]

টাকা শোধ দিতে না পেরে কেউ যদি কেঁদে ফেলত তো ভগবতী দেবী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন—অবস্থা ভালো হয়, দিবি। না হয় না দিবি, তার জন্য কাঁদিস কেন?[৪৯]

অনেক মহিলার মধ্যেই দয়া দেখা যায়। কিন্তু ভগবতী দেবীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব আছে। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করে বলেছেন: "দয়াবৃত্তি আরও অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু ভগবতী দেবীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোনোপ্রকার সংকীর্ণ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না। সাধারণ লোকের দয়া দিয়াশলাই-শলাকার মতো কেবল বিশেষ-রূপ সংঘর্ষেই জ্বলিয়া উঠে এবং তাহা অভ্যাস ও লোকাচারের ক্ষুদ্র বাক্সের মধ্যেই বদ্ধ। কিন্তু ভগবতী দেবীর হৃদয়, সূর্যের ন্যায় আপনার বুদ্ধি-উজ্জ্বল দয়ারশ্মি স্বভাবতই চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিয়া দিত, শাস্ত্র বা প্রথা-সংঘর্ষের অপেক্ষা করিত না।"[৫০]

ভগবতী দেবী বলতেন—সংসারের পথ অতি সরল, লোকে বুদ্ধির দোষে কুটিল করে ফেলে। তুমি যা ফলভোগ করো, তার জন্য তুমিই দায়ী। তুমি দিবারাত্রি নিজে তোমার যত অনিষ্ট করো, আর কারো কাছে কখনো তত অনিষ্টের আশঙ্কা করো না।[৫১]

কাশীতে কলেরা হল ভগবতী দেবীর। অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। ঠাকুরদাস বললেন—তোমায় আমি আর কী আশীর্বাদ করব, তুমি পুণ্যবতী স্ত্রী, আপনার পুণ্যে আপনিই আগে চললে, তোমারই জিত হল।

ঠাকুরদাসের কাছে পদধূলি চাইতে-চাইতে এবং অন্য সকলকে আশীর্বাদ করতে-করতে ভগবতী দেবী, ১৮৭১ সালের ১২-এপ্রিল, ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন।

বিদ্যাসাগর তখন কাশীতে ছিলেন না। মায়ের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন বিদ্যাসাগর। মায়ের মৃত্যুকালে কাছে থেকে সেবা করতে

পারেননি, বিদ্যাসাগরের পক্ষে এ-দ্ঃখ নিতান্ত অল্প নয়। মাতৃহীন বালকের মতো বিদ্যাসাগর সবসময় কাঁদেন।

বিদ্যাসাগর কাশীপুরে গঙ্গাতীরে মাতৃশ্রাদ্ধ করলেন। মাতৃশোকে এক-বছর বিদ্যাসাগর স্বহস্তে নিরামিষ রান্না করে একবেলা খেয়েছেন; নিতান্ত অসুস্থ হলে রান্নায় দিনময়ীর সাহায্য নিয়েছেন। মাতৃশোকে একবছর বিদ্যা-সাগর খালি পায়ে হেঁটেছেন, ছাতা ব্যবহার করেননি, নরম বিছানায় শোননি। দীনদুঃখীর মতো কায়ক্লেশে দিনযাপন করেছেন। দীর্ঘকাল অত্যন্ত বিমর্ষ-ভাবে নির্জনে বাস করেছেন। মায়ের গুণাবলী ধ্যান করেছেন।[৫২]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন : "সন ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে জননী-দেবীর একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধোপলক্ষে মহারাষ্ট্রীয় বেদপাঠী ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয়; নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরা সমাগত হইলে কৃতীকে স্বয়ং ব্রাহ্মণদিগের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিবার প্রথা থাকায় আমি ঐ কার্য্য সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, দাদা (বিদ্যাসাগর) ইহা দেখিয়া বলিলেন তুমি একাই কি একার্য্য নিষ্পন্ন করিবে? আমি কি কেহ নই। এই বলিয়া দাদা ঐ সকল ব্রাহ্মণদের পা ধোয়াইয়া দিতে লাগিলেন। এবং ঐ সকল ব্রাহ্মণদের মধ্যে ২।৪ জনের পায়ে ঘা থাকা প্রযুক্ত তাহাতে পুঁজ নির্গত হইতেছিল, তাহা দেখিয়াও তিনি কিছুমাত্র ঘৃণাবোধ করেন নাই। অপরাপর দর্শকগণ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, এরূপ মাতৃভক্তি অপর কোন সম্ভ্রান্ত লোকের দৃষ্ট হয় না।"[৫৩]

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : "জননীর লোকান্তর গমনের দীর্ঘকাল পরেও প্রসঙ্গক্রমে যখন একবার তাঁহার পরমারাধ্যা গুণময়ী মাতার গুণের উল্লেখ করিতে হইয়াছিল, তখন তিনি (বিদ্যাসাগর) নিতান্ত অসুস্থ; তাঁহাকে অসুস্থশরীরে শিশুর ন্যায় কাতর ক্রন্দনে অভিভূত হইতে দেখিয়া, আমি বলিয়াছিলাম, "আপনাকে এত কষ্ট দিব জানিলে, আমি এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতাম না।" গুণবান পুত্র অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন, "তুমি আমায় কষ্ট দিলে কোথায়? তুমি ত আমার বন্ধুর কার্য্য করিলে, তোমার প্রয়োজন সাধনেও ত এখন আমার মায়ের কথা মনে পড়িল, মায়ের নামে দুফোঁটা চক্ষের জল পড়িল, এও ভাল; এতই দুর্দ্দশা যে, সর্ব্বদা সকল সময়ে পিতা-মাতাকে স্মরণ করিতে পারি না।"[৫৪]

বিহারীলাল সরকার লিখেছেন :

"মা" নামে বিদ্যাসাগর মন্ত্রমুগ্ধ হইতেন। "মা"ই যে তাঁহার জীবনের সাধন-মন্ত্র ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গানবাজনায় বড় সখ ছিল না। তবে কেহ কখন "মা" "মা" বলিয়া গান গাহিলে, তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। গায়ককে তিনি যেন বুকের কলিজার ভিতর পুরিয়া রাখিতেন। একজন অন্ধ মুসলমান ভিক্ষুক, বেহালা বাজাইয়া শ্যামা সঙ্গীত গাহিত। সে সঙ্গীতে 'মা' 'মা'—ধ্বনি থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে ডাকাইয়া প্রায়ই তাহার গান শুনিতেন। গান শুনিতে শুনিতে তিনি অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিতেন না। এই মুসলমান-ভিক্ষুক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সময় সময় যথেষ্ট সাহায্য পাইত। একবার ইহার ঘর পুড়িয়া গিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাকে গৃহ-নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয় দিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বৈবাহিক (কনিষ্ঠা কন্যার শ্বশুর) জগদ্দুর্লভ

চট্টোপাধ্যায় ভাল গাহিতে পারিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে প্রায়ই বাড়ীতে আহ্বান করিয়া তাঁহার গান শুনিতেন; অন্য গান শুনিতেন না; কেবল যে গানে "মা" "মা" থাকিত, সেই গানই শুনিতেন। গানে সখ্ ছিল না; কিন্তু মাতৃনামপূর্ণ গানে প্রাণ মাতিয়া উঠিত। মাতৃ-ভক্তের এমনই প্রাণ বটে।"[৫৫]

মায়ের কথা উঠলেই বিদ্যাসাগর বলতেন—আমি যদি আমার মায়ের গুণের একশোভাগের একভাগও পেতাম, তাহলে কৃতার্থ হতাম। আমি যে এমন মায়ের সন্তান এই আমার গৌরব।[৫৬]

ঠাকুরদাস তখন কাশীবাসী। কাশীতে এলে বিদ্যাসাগর প্রায়ই নিজে দশাশ্বমেধের ঘাটে বাজার করতে যেতেন। সেজন্য অনেকে বলতেন—চাকর দিয়ে যে-কাজ করানো যায় সে-কাজ নিজে করতে আপনার লজ্জা বোধ হয় না? এরকম দেখে আমাদের লজ্জা বোধ হয়।

বিদ্যাসাগর উত্তর দিয়েছেন—তবে আপনারা পথে আমার সঙ্গে দেখা করবেন না। বাবার জন্য বাজার করে আমি পরম সুখ পাই। যারা পারেন না তারা চাকর দিয়েই এসব কাজ করিয়ে থাকেন। বিষয়কর্মে লিপ্ত না থাকলে আমি সবসময় এখানে থেকে বাবার চরণসেবা করে চরিতার্থ হতাম।[৫৭]

গ্রামের মধ্যে বিধবাবিবাহের যাঁরা বিরোধী সুযোগ পেলে এককালে তাঁরা ঠাকুরদাসের উপর দৌরাত্ম্য করতে কুণ্ঠিত হননি। কথায়-কথায় বিদ্যাসাগরের মুখে একদিন ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল সেকথা শুনলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল তখন জাহানাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

বীরসিংহে এসে সেবার ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল ঠাকুরদাসের সঙ্গে দেখা করে বললেন—বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে শুনেছি, গ্রামের লোক আপনার উপর বড়ো অত্যাচার করে, তাদের নাম আমাকে বলতে হবে।

ঠাকুরদাস সহাস্যে বললেন—সে কলকাতায় থাকে, কার মুখে কী শুনেছে, তার কথার উপর নির্ভর করে এখানকার কাউকে কিছু বলো না। আমার সঙ্গে সকলের বেশ সদ্ভাব আছে।

তারপর এদিকে ঠাকুরদাস গ্রামের লোকজনকে গোপনে খবর দিলেন—হাকিম বিধবাবিবাহবিরোধী পক্ষের লোকজনের দৌরাত্ম্যের কথা কোথা থেকে শুনে এসে আমার কাছে নাম চাইছেন। আমি কারো নাম করিনি, বরং বলেছি আমার সঙ্গে সকলের বেশ সদ্ভাব আছে। তোমরা হাকিমের সামনে একেকবার আমার সঙ্গে দেখা করে যেও, তাহলেই আর কোনো গোলমাল থাকবে না।

সর্বদেশে সর্বকালে এমন চরিত্রের মানুষ দুর্লভ।[৫৮]

১৮৬৭ সালের ২৫-এপ্রিল প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ কাশীতে লোকান্তরিত হলেন।

পাকা বেতের একটি উৎকৃষ্ট ছড়ি প্রেমচন্দ্রের অতি আদরের জিনিস। প্রেমচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় পুত্র হরেকৃষ্ণ ছড়িখানা দিতে গেলেন ঠাকুরদাসকে।

ঠাকুরদাস ছড়িখানা নিলেন না। বললেন—তর্কবাগীশ কাব্যরসিক বিলাসী বাবু পণ্ডিত ছিলেন; এই ছড়িটি তাঁর হাতেই বেশ মানাত; আমি সাদাসিদে লোক এই ছড়ি হাতে করলে পাছে বিলাসী হয়ে পড়ি মনে এই ভয়।[৫৯]

বাঙলা ১২৮২ সালের ১৪-চৈত্র কাশীতে ঠাকুরদাসের একবার ভেদ হয়ে

নাড়ি দমে গেল। টেলিগ্রামে খবর পেয়ে বিদ্যাসাগর কাশীতে চলে এলেন। ১৮৭৬ সালের ১২-এপ্রিল সূর্যাস্তসময়ে ঠাকুরদাস লোকান্তরিত হলেন।

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন :

"পিতার মৃত্যু দেখিয়া দাদা (বিদ্যাসাগর) রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে বিস্তর আত্মীয় বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ছিলেন। দাদা জাঁকজমক ভাল বাসেন নাই। উপস্থিত ভদ্রলোক সমূহকে বিদায় দিলেন এবং প্রকাশ্য ভাবে বলিলেন আমাদের পিতা আমরাই বহন করিয়া লইয়া যাইব অন্য ভদ্রলোকদিগকে কেন ক্লেশ দিব বলিয়া, তিন সহোদর ও কনিষ্ঠের শ্বশুর প্রতাপচন্দ্র কাঞ্জিলাল মহাশয় বহন করিয়া লইয়া যাই। পুরোহিত ও ভৃত্য ফুরসতকে সমভিব্যাহারে লওয়া হইয়াছিল। মণিকর্ণিকার ঘাটে দাহাদিকার্য্য সমাধা করিয়া স্নান তর্পণ সমাপনান্তে বাসায় প্রত্যাগমন করা হয়। বাসায় উপস্থিত হইয়া দাদা ছেলেমানুষের মত রোদন করিতে লাগিলেন দেখিয়া, অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় নীতিজ্ঞ ও পণ্ডিত লোক হইয়া বৃদ্ধ পিতার জন্য এত শোকাভিভূত কেন?

২রা বৈশাখ প্রাতঃকাল হইতে দাদার ভেদ বমী হইতে লাগিল। অত্যন্ত দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন দেখিয়া, আমরা ভীত হইয়া বলিলাম, অদ্য কাশী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাইব বলায় প্রথমতঃ অগ্রজ মহাশয় শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাধা করিয়া কলিকাতা যাইবেন, প্রকাশ করিলেন, কলিকাতা না যাইবার কারণ এই যে ইতি পূর্ব্বে পিতৃদেব এক উইল প্রস্তুত করিয়া তাহা অগ্রজের হস্তে সমর্পণ করেন। তাঁহার উইলের মর্ম্ম এই যে, আমার অন্তিম সময়ে জ্যেষ্ঠপুত্র নিকটে থাকিবেন ও দাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া কাশীতেই আদ্যশ্রাদ্ধ করিবে এবং আমি যে সকল মহারাষ্ট্রীয় বেদজ্ঞ ও অন্যান্য হিন্দুস্তানী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতাম, তাহাদিগকে ভোজন করাইবে। জ্যেষ্ঠ স্বয়ং গয়া যাইয়া গয়াকৃত্য করিবেন, ইত্যাদি কারণেই কলিকাতা যাইতে প্রথমতঃ সম্মত ছিলেন না। পরে আমি ঐ সকল ব্রাহ্মণকে আনাইয়া বলিলাম দাদার পীড়া হইতেছে অতএব দাদাকে অদ্যই কলিকাতা লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি, মহাশয়দের এ বিষয়ে মত কি প্রকাশ করিয়া বলুন। অগ্রজের অবস্থা অবলোকন করিয়া তাঁহারা সকলেই দাদাকে কলিকাতা যাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং বলিলেন পরে সুস্থ হইয়া একবার আসিয়া ব্রাহ্মণ ভোজনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবেন এ অবস্থায় কোন ঔষধ সেবন করিবেন না কলিকাতা যাইয়া তাঁহার অশ্রুবিন্দু নিবারণ হয় নাই।

দশাহে যথা শাস্ত্র ঔর্দ্ধদৈহিক কৃত্য সমাধা করেন। পরে এক সময়ে কাশী আগমন করিয়া পিতার আদেশ প্রতি পালন করিতে বিস্মৃত হন নাই, পরে উইল অনুসারে কাশীতে কার্য্য সমাধা করিয়া পিতৃভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।"[৬০]

ঠাকুরদাসের মৃত্যুর দিনকয়েক পরের কথা। বিদ্যাসাগর তখন পিতৃশোকে অত্যন্ত কাতর।

সংস্কৃতশাস্ত্র বিষয়ে কী একটা বিতর্কে ছোটোলাটের বিদ্যাসাগরের সাহায্য প্রয়োজন হল। খবর পেয়ে বিদ্যাসাগর ছোটোলাটকে জানিয়ে দিলেন—অল্প কয়েকদিন পিতৃহীন হয়ে আমি অতি দীনভাবে দিনযাপন করছি, আমার মনের অবস্থা ও বেশভূষা কোথাও যাবার যোগ্য নয়। যদি আপনাদের অপমান বোধ

না হয়, তবে নিতান্ত প্রয়োজন হলে, আমি খালি গায়ে বেলভেডিয়ারে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি।

ছোটোলাট জানালেন—আপনি যেমন আছেন তেমনি আসবেন। আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই।

খালিপায়ে খালিগায়ে বিদ্যাসাগর ছোটোলাটের সঙ্গে দেখা করে কাজ মিটিয়ে এলেন।[৬১]

চকদীঘির সিংহরায়-পরিবারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বহুকালের ঘনিষ্ঠতা। বিশেষ করে সারদাপ্রসাদ আর ছক্কনলাল সিংহরায়ের সঙ্গে। মাঝে-মাঝে কিছু-দিন বিদ্যাসাগর সিংহরায়দের চকদীঘির বাড়িতে গিয়েও থেকেছেন। বিদ্যা-সাগরের কথায় সিংহরায়-পরিবার চকদীঘিতে স্থাপন করেছে একটি ইংরেজি-সংস্কৃত হাইস্কুল এবং একটি হাসপাতাল।

একবার বিদ্যাসাগর ঠিক করলেন, দিনকয়েক চন্দননগরে থেকে হাওয়া-বদল করে যাবেন। চন্দননগরে গিয়ে থাকবেন ঘোষবাবুদের এক বাগানবাড়িতে, নাম 'মেজরের কুঠি'। আসার কয়েকদিন আগে বাড়ি দেখে গেলেন।

ওই 'মেজরের কুঠি'র খুব কাছে গঙ্গার ধারে একটা বাড়িতে তখন থাকেন ছক্কনলাল সিংহরায়। খবর পেয়ে ছক্কনলালের বাড়িতে এলেন বিদ্যাসাগর।

ছক্কনলালের একটি ছেলের নাম মণিলাল। রজনীলালের মেজদাদা মণিলাল।

মণিলালের তখন খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। রজনীলাল এসে বলল—মেজদাদা, বিদ্যাসাগর মশায় এসেছেন। বাবা তোমায় ডাকছেন।

দু-ভাই তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল।

বিদ্যাসাগর বসে আছেন। পরনে ধুতি, সাদা মেরজাই, সুতি চাদর, পায়ে চটি। রজনীলালের সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়ে গেছে। এবার ছক্কনলাল মণিলালের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মণিলাল বিদ্যাসাগরের পায়ের ধুলো নিল। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বিদ্যাসাগরের মুখের দিকে।

বিদ্যাসাগর সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন—অমন করে কী দেখা হচ্ছে?

মণিলাল বলল—যাঁর কথা এতদিন কত শুনেছি, আজ নিজের চোখে তাঁকে প্রথম দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, তাই দেখছি।

মণিলালের বয়স তখন বাইশ বছর।

যা হোক, সেদিন 'মেজরের কুঠি' দেখে আবার কলকাতা চলে গেলেন বিদ্যাসাগর। ছক্কনলাল নিজেদের গাড়িতে করে বিদ্যাসাগরকে স্টেশনে দিয়ে এলেন।

দিনকয়েক বাদে আবার চন্দননগরে এলেন বিদ্যাসাগর। সঙ্গে এসেছে তিন দৌহিত্র—সুরেশ, যতীশ আর লাট।

ছক্কনলাল বিদ্যাসাগরকে ডাকতেন—খুড়োমশায়। আর বিদ্যাসাগর ছক্কনলালকে ডাকতেন—খুড়ো। ছক্কনলালের স্ত্রীকে ডাকতেন—খুড়ী। ছক্কনলালের ছেলেরা বিদ্যাসাগরকে ডাকত—দাদামশায়।

প্রত্যেকদিন সকালে ছক্কনলাল যান 'মেজরের কুঠি'তে, বিদ্যাসাগরের কাছে। সেখানে বসে দুজনে নানারকম কথাবার্তা হয়। কথাবার্তার মধ্যেই ছক্কন-লালের বাড়ি থেকে চা আসে।

বিকেলবেলা নিজেদের গাড়িতে বেড়াতে বেরোন ছক্কনলাল। প্রত্যেক বিকেলে 'মেজরের কুঠি'র সামনে গিয়ে উঁচুগলায় বিদ্যাসাগরকে ডাকেন—খুড়োমশায়।

বিদ্যাসাগর সাড়া দিয়ে ওঠেন—যাই খুড়ো।

দু-জনে একসঙ্গে বেড়াতে যান। সন্ধ্যার আগে ফিরে আসেন।

সুরেশকে 'কুমারসম্ভব' পড়াচ্ছেন একদিন বিদ্যাসাগর। মণিলাল খুব মন দিয়ে শুনছে। বিদ্যাসাগরের চোখ এড়াল না। বিদ্যাসাগর মণিলালকে জিজ্ঞেস করলেন—তুই সংস্কৃত জানিস?

মণিলাল বলল—দাদামশায়, আমি ফার্স্টক্লাশের ছেলে, কেমন করে বলি যে আমি সংস্কৃত জানি? তবে আপনিই আমাদের স্কুল করিয়েছেন, আপনি তো জানেন যে আমাদের স্কুলে সংস্কৃত বিশেষভাবে পড়ানো হয়। আমি তা সাধ্যমতো শেখার চেষ্টা করি, এই পর্যন্ত বলতে পারি।

উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হলেন বিদ্যাসাগর। সুরেশের সঙ্গে মণিলালকেও ছাত্র করে নিলেন। নতুন ছাত্রের কাছ থেকে বিদ্যাসাগর কোনো মাইনে নেবেন না?

বিদ্যাসাগর গম্ভীর হয়ে মণিলালকে জিজ্ঞেস করলেন—আমায় কী মাইনে দিবি?

মণিলাল বলল—আমিই তো আপনার।

বিদ্যাসাগর তবু গম্ভীর। বললেন—শুধু ওসব ফাঁকা কথায় হবে না।

মণিলাল বলল—আপনিই বলুন। যদি তা আমার অসাধ্য হয় তো জানব যে আমিই কেবল আপনার দয়া থেকে বঞ্চিত হব।

বিদ্যাসাগর বললেন—আচ্ছা, একদিন অন্তর তোদের বাগানের একটি করে বেল তোকে পড়ানোর পারিশ্রমিক ধার্য করলাম। সেদিন খুড়ীকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে তোদের গাছে অজস্র বড়ো বড়ো ভালো বেল হয়েছে দেখে এসেছি।

সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হয়ে গেল মণিলাল।

বিদ্যাসাগরের কাছে 'কুমারসম্ভব' পড়ে যাচ্ছে মণিলাল। এবং কথামতো বিদ্যাসাগরকে বেল সরবরাহ করে যাচ্ছে।

হঠাৎ একদিন মালী এসে মণিলালকে বলল—বিদ্যাসাগর মশায় বেল ফেরত দিয়েছেন। আর না বলা পর্যন্ত বেল নিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন।

মনে-মনে ক্ষুণ্ণ হল মণিলাল।

সেদিনও বই নিয়ে গেল মণিলাল, সুরেশের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সামনে বসল, কিন্তু মণিলাল বই খুলল না।

বিদ্যাসাগর বললেন—হল কি? বই খোল।

মণিলাল বলল—আমি আপনার কাছে এমনই পড়ব কেন?

আসল কারণ বুঝতে পারলেন বিদ্যাসাগর। সহাস্যে বললেন—পরশু খুড়োর সঙ্গে ঠাকুরবাবুদের চাঁপদানীর বাগানে গিয়েছিলাম। সেখানে এক-গাছ খুব সুন্দর বেল হয়েছে দেখে প্রশংসা করায় তোমার বাবা সেই বেল এক ঝুড়ি আমায় দিয়েছে, তাই মালীকে আর এখন বেল দিতে বারণ করেছি।

মণিলাল বলল—বেশ, তাহলে আপনার খুড়োকেই পড়াবেন।

অগত্যা ছক্কনলালের দেওয়া সমস্ত বেল তক্ষুনি ছক্কনলালকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর। মণিলালকে আবার আগের মতো বেল সরবরাহ করে যেতে বললেন।

সমস্ত বেল ফেরত পেয়ে ছক্কনলালও নিশ্চয় অবাক হয়েছেন। পরে তিনি বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞেস করলেন—খুড়োমশায়, কেন বেল ফিরিয়ে দিয়েছেন?

বিদ্যাসাগর বললেন—আর সেকথায় কাজ নেই বাবা। তোমার মধ্যম পাণ্ডব খাপ্পা হয়েছেন। বলেন কিনা, যাঁর কাছ থেকে বেল নিয়েছেন তাঁকে পড়ান গে। শেষে কি তোমাকে পড়াতে গিয়ে এই বয়সে চাবুক খাব? তাই তোমার বেল ফেরত দিয়েছি।[৬২]

খুব ভোরে চন্দননগরের গঙ্গাতীরের রাস্তাটির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দ্রুতগতিতে হেঁটে আসতেন বিদ্যাসাগর। বাড়ি ফেরার পথে মণিলালের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। মণিলাল বিদ্যাসাগরের বাড়িতেই যাচ্ছে।

একদিন সকালবেলা রাস্তায় একটা কাণ্ড হল। কে একজন ভদ্রলোক মণিলালকে জিজ্ঞেস করলেন—এখানে বিদ্যাসাগর কোথায় থাকেন?

লোকের জ্বালায় বিদ্যাসাগর অস্থির, মণিলাল ভাবল, এই ভদ্রলোককে ভাগিয়ে দেওয়া যাক। মণিলাল ভদ্রলোককে বলল—বিদ্যাসাগর চন্দননগরে নেই। কলকাতায় গেছেন।

সেইমুহূর্তে বিদ্যাসাগর উপস্থিত। মণিলালের কথা তিনি শুনতে পেয়েছেন। ভদ্রলোককে বিদ্যাসাগর বললেন—ও জানে না আমি কাল রাত্রে ফিরেছি।

ভদ্রলোককে সাদরে বাড়িতে নিয়ে গেলেন বিদ্যাসাগর।

পরে বিদ্যাসাগর মণিলালকে জিজ্ঞেস করলেন—তুই মিথ্যে বলে ঐ লোকটাকে ভাগিয়ে দিচ্ছিলি কেন?

মণিলাল বলল—আপনি যে কেবল নাকে কাঁদেন যে, আর পারি না, লোকের জ্বালায় যাই কোথায়?

বিদ্যাসাগর বললেন—আর অমন করে লোক ভাগাসনি।

মণিলাল বলল—ভালো, এবার থেকে লোক ডেকে এনে দেব।

বিদ্যাসাগর বিচলিত হয়ে বললেন—ভাই রে, যতদিন বেঁচে থাকি যথাসাধ্য পরের জন্য যা পারি করবার চেষ্টা করব।[৬৩]

১২৯৮ সনের ১৪-জ্যৈষ্ঠ বিদ্যাসাগর চন্দননগরে বসে আপন শরীর বিষয়ে লিখেছেন : "আমার অবস্থা ক্রমে মন্দ হইতেছে। একদিনের জন্যও সুস্থ নহি।"[৬৪]

১৮৯১ সালের মাঝামাঝি এক রবিবারে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শুনলেন, বিদ্যাসাগর হাওয়া-বদলির জন্য ফরাসডাঙায় এসেছেন। একেবারে গঙ্গার পাড়ে একটা বাড়িতে আছেন।

এত কাছে যখন আছেন, হরপ্রসাদের সাধ হল, বিদ্যাসাগরকে একদিন নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। একখানা নৌকো করে ফরাসডাঙার দিকে চললেন হরপ্রসাদ।

আতপুরে একটা কাজ আছে। সেই কাজ সেরে ফরাসডাঙায় গেলেন হরপ্রসাদ।

ফরাসডাঙায় বিদ্যাসাগরের বাড়ির সামনে গঙ্গার চড়ায় বিস্তর ইট পড়ে আছে। রাস্তা নেই, সেই ইটের উপর দিয়ে খুব কষ্টে যেতে হবে।

নৌকো থেকে নেমে হরপ্রসাদ দেখলেন, সামনের বাড়িতে বারান্দায় বিদ্যা-

সাগর দাঁড়িয়ে আছেন। বিদ্যাসাগর সব দেখতে পেয়েছেন—হরপ্রসাদ নৌকো থেকে নেমেছে, ইটের উপর দিয়ে কষ্ট করে আসছে।

কম্পাউন্ডের ভেতর ঢুকে পড়লেন হরপ্রসাদ। উপর থেকে বিদ্যাসাগর বললেন—ঘরের ভেতর ঢোক না, সিঁড়ি আছে।

উপরে উঠে গেলেন হরপ্রসাদ। বিদ্যাসাগর দাঁড়িয়ে আছেন। আর টেবিলের কাছে চেয়ারে বসে আছেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগরের কলেজে চাকরি চাইতে এসেছেন আশুতোষ।

আশুতোষকে বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটন কলেজে নিতে রাজি হলেন। দুশো টাকা মাইনে দেবেন। কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেল, উঠবার জন্য ব্যস্ত হলেন আশুতোষ।

বিদ্যাসাগর বললেন—তা হবে না। কিছু খেয়ে যেতে হবে।

পিছনের হলঘরে ঢুকলেন বিদ্যাসাগর। পাঁচ-সাতটি কাঁচের আলমারি সেখানে। প্রত্যেক তাকে ভিন্ন-ভিন্ন রকমের আম।

আশুতোষকে একখানা আসনে বসালেন বিদ্যাসাগর। আশুতোষের সামনে একখানা রেকাবী দিলেন। তারপর নিজে ছুরি দিয়ে আম কাটতে বসলেন। একবার এ-আমের এক চাকলা দেন, আরেকবার ও-আমের এক চাকলা দেন। পাঁচ-সাত রকমের আম খাওয়ালেন আশুতোষকে।

আশুতোষ চলে গেলেন।*

তারপর বিদ্যাসাগর হরপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করলেন—তুই এখানে কোথায় এসেছিলি?

—আপনি এত কাছে আছেন, তাই মনে করেছি, যদি আপনার পায়ের ধুলো আমার বাড়িতে পড়ে।

বিদ্যাসাগর বললেন—কিন্তু তুই যে এদিক দিয়ে এলি?

---

* ইনি 'বাঙলার বাঘ' আখ্যায় সম্মানিত স্বনামধন্য স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নন। এই আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনি ১৮৬৮ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়েছেন, ইনিই প্রথম প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার। এই আশুতোষ সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন: "একজন অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ কেমন করিয়া বহিয়া যায়, আশুবাবু তাহার একজন নিদর্শন। উঁনি যেখানেই গিয়াছেন, সেখানেই লোকে উঁহার বিদ্যার সুখ্যাতি করে, কিন্তু স্বভাবের নিন্দা করে।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ, ভূমিকা, কলকাতা, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৫।)

'বাঙলার বাঘ' আখ্যায় সম্মানিত স্বনামধন্য স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়েছেন ১৮৮৬ সালে। ইনিও বিদ্যাসাগরের সংস্পর্শে এসেছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন: "১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ১০ বৎসর বয়স্ক আশুতোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রথম দর্শন করেন। ইহার অল্পদিন পরে তিনি প্রতিভাবান বালক আশুতোষকে একখানি 'রবিন্‌সন্ ক্রুসো' উপহার দেন।" (দীনেশচন্দ্র সেন: আশুতোষ-স্মৃতিকথা কলকাতা, ১৯৩৬, পৃ. ৫৪।) উক্ত 'রবিন্‌সন্ ক্রুসো'খানা বর্তমানে স্যর আশুতোষের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে রক্ষিত আছে।

আশুতোষের পিতা গঙ্গাপ্রসাদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয় ছিল। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বালক আশুতোষ একবার পশ্চিমাঞ্চলে গেছেন, সেখান থেকে ফিরতি-পথে মোগলসরাই স্টেশনে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে প্রথম দেখা। বালক আশুতোষের দু-একটি কথাবার্তা শুনে বিদ্যাসাগর সন্তুষ্ট হয়েছেন। কিছুদিন বাদে গঙ্গাপ্রসাদের সঙ্গে বালক আশুতোষ কলকাতায় থ্যাকার-স্পিংকের দোকানে গেছেন, সেখানে আবার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা; সেখানেই বিদ্যাসাগর বালক আশুতোষকে একখানা 'রবিন্‌সন্ ক্রুসো' উপহার দিয়েছেন। এই বিবরণ আমি স্যর আশুতোষের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছি।

কিছুই বিদ্যাসাগরের চোখ এড়ায়নি।

হরপ্রসাদ বললেন—আপনার এখানে আসব বলেই বেরিয়েছিলাম, পথে একটা কথা মনে পড়ল বলে আতপুরে মুখুজ্যেদের ইটখোলায় গিয়েছিলাম। তা আপনি যেতে পারবেন কি? গেলে আমরা কৃতার্থ হব।

বিদ্যাসাগর বললেন—কেন? তুই আমাকে ঘটা করে খাওয়াবি নাকি?

—সে-ভাগ্য কি আমার হবে?

বিদ্যাসাগর বললেন—তাই তো আমি বলছিলাম। আমি কি খাই তা জানিস? বেলশুঁঠোর সঙ্গে বার্লি সেদ্ধ করে তাই একটু-একটু খাই। তবে যে এই আম দেখছিস, ও আমার জন্য নয়। যে নিজে কিছু খেতে পারে না, অন্যকে খাইয়েই তার তৃপ্তি। তাই তো আশুকে অত করে নিজের হাতে আম খাওয়াচ্ছিলাম। যা হোক, তুই এসেছিস, ভালোই হয়েছে। কিন্তু আমি তোকে জিজ্ঞেস করব না, তোর বাড়ির কে কেমন আছে। হয়তো তুই বলবি—অমুক মারা গিয়েছে, অমুক ব্যামোয় ভুগছে—এসব কথা শুনতে আর আমার ইচ্ছে হয় না। আমার বড়ো কষ্ট হয়।

হরপ্রসাদ বললেন—ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের ওখানকার সব সংবাদই ভালো।

তারপর বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—বাড়িতে পায়ের ধুলোর কথা বলছিলি, তোরা নতুন বাড়ি করেছিস নাকি?

—একটু কুঁড়ে বেঁধেছি বৈকি।

—আমি গেলে আমায় কী খাওয়াতিস?

—বাড়ির মেয়েরা পাক করে কী খাওয়াত, তা জানি না। আমাদের দেশের দুটো ভালো জিনিস আছে, আমি মনে করেছিলাম, তাই খাওয়াব।

—কী কী?

—নৈহাটীর গজা আর রসমুণ্ডি।

—আচ্ছা, তা তবে আনিস।

—আপনি যখন 'আনিস' বললেন, তখন শুভস্য শীঘ্রং—আমি আসছে রোববারেই নিয়ে আসব।

আরো অনেকক্ষণ বসে রইলেন হরপ্রসাদ। অনেক কথাবার্তা হল। সন্ধ্যা নাগাদ হরপ্রসাদ এসে নৌকোয় উঠলেন, বাড়ি এসেই রসমুণ্ডি আর গজার ফরমাস দিলেন।

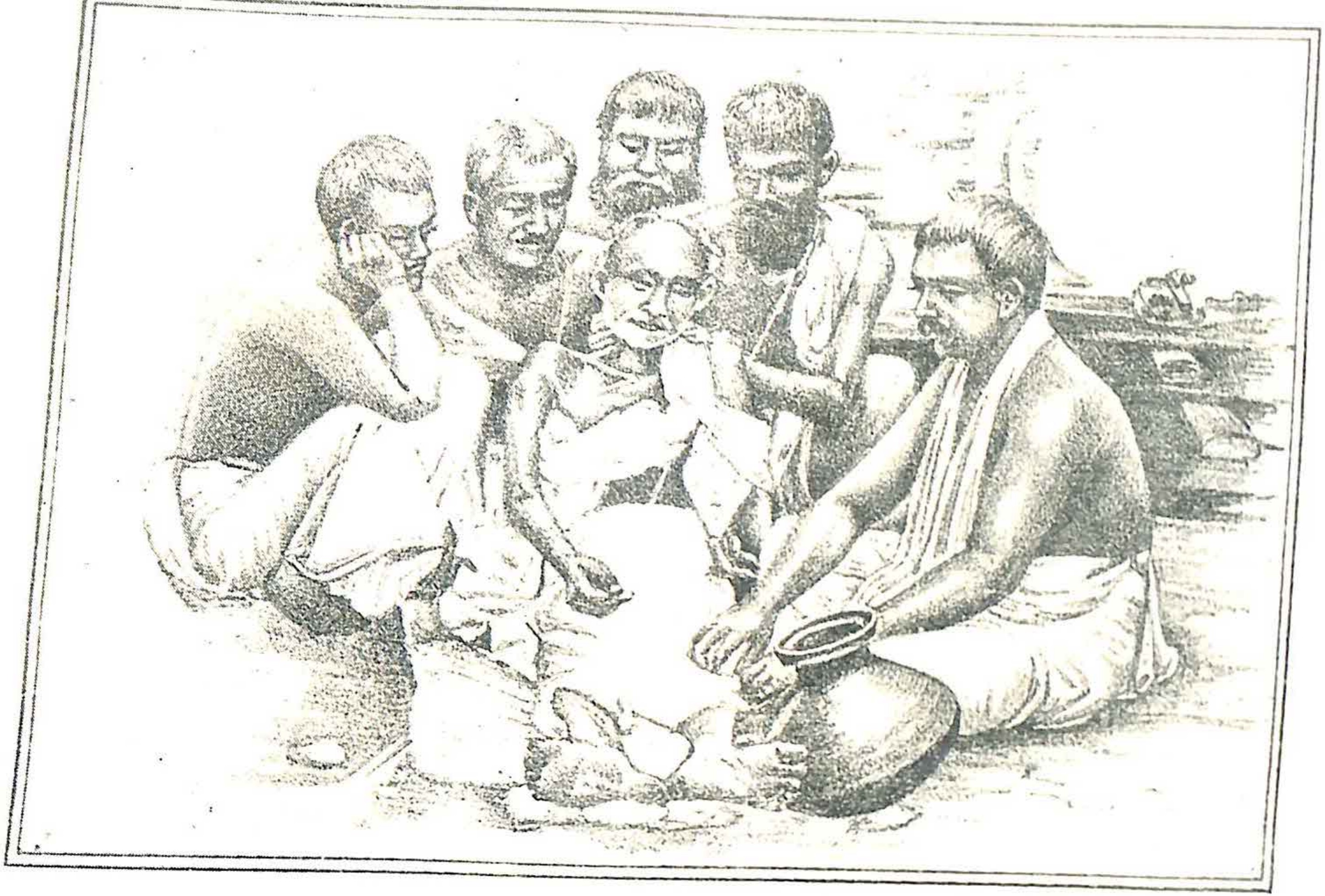
রসমুণ্ডি আর গজা নিয়ে পরের রবিবারেই আবার নৌকো করে ফরাস-ডাঙায় গেলেন হরপ্রসাদ। কিন্তু বিদ্যাসাগর তখন আর ফরাসডাঙায় নেই, কলকাতায় চলে গেছেন।[৬৫]

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন :

"...আর ফরেশডাঙগায় অবস্থিতি করা উচিত নয় এই বিবেচনায় (বিদ্যাসাগর) গত জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসার উদ্যোগ পাইতে লাগিলেন। এই সময় আলোপ্যাথি ডাক্তার ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক মহাশয়েরা বলিলেন অহিফেনের মাত্রা এত অধিক পরিমাণে থাকিলে, আমাদের চিকিৎসায় উপকার দর্শিবে না, এই কথায় ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে কলিকাতার অন্তর্গত কলুটোলা হইতে সেক আব্দুললেতীব হকিমকে আফিং পরিত্যাগ করাইবার জন্য আনাইলেন। ১৮ই আষাঢ় হইতে উক্ত হকিমের চিকিৎসা আরম্ভ হইল।

তাঁহার ব্যবস্থায় পীড়ার উপশম হইতে লাগিল কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে দুই দিন পরে হিক্কা প্রভৃতি উদয় হইয়া ২০শে আষাঢ় কম্পের সহিত জ্বরের উদয় হইল। ২১শে আষাঢ় জ্বরের হ্রাস হইল বটে কিন্তু হিক্কা প্রবল হইয়া হস্ত পদ শীতল হইল, তথাপি উক্ত হিক্কা নিবারণ জন্য অপর ঔষধ ব্যবহার করিলেন না। ঐ দিবসেই হকিমের ঔষধে হিক্কা নিবারণ হয়। হকিমের ঔষধে অহিফেন ভিন্ন অপর মাদক দ্রব্য নিবন্ধন দুই তিন দিন প্রলাপ হয়। এই সময়ে সমাগত ব্যক্তিদিগকে সাবেক অভ্যাস অনুসারে সমধিক সমাদর করিতে লাগিলেন এবং ঐ প্রলাপ সময়ে নিজের কালেজ ও স্কুলগুলি সম্বন্ধে নানাবিধ কথা কহিতে লাগিলেন। ২৩শে আষাঢ় পুনরায় হিক্কা বেদনা প্রভৃতি পীড়ার লক্ষণগুলি প্রবল হইতে লাগিল এবং ঐ সময় লেবা রোগের আরম্ভ হইয়াছে, দেখিয়া সুতরাং হকিমের চিকিৎসা বন্ধ হইল। ক্লোরোডাইন সেবন করায় বেদনা ও হিক্কার হ্রাস হইল। উক্ত হকিম সাহেব উদারচরিত ভদ্রলোক, আন্তরিক যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। ২৪শে আষাঢ় ডাক্তার হীরালাল বাবু ও বাবু অমূল্যচরণ বসু পরীক্ষা করিয়া ২৫শে আষাঢ় পরামর্শ জন্য ডাক্তার ম্যাকোনেল সাহেবকে আনাইলেন। উক্ত সাহেব পরীক্ষা করিয়া অসাধ্য বিবেচনায় বার্চ্চ সাহেবের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে বলিয়া তাঁহাকে আনাইবার উপদেশ দেন, কিন্তু ম্যাকোনেল সাহেব এই পীড়া এলোপ্যাথি চিকিৎসায় অসাধ্য বলায় পর দিন বেলা ৯টার সময় ডাক্তার শাল্‌জার সাহেব আসিয়া ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ষ্টমাকে ক্যান্‌সার হয় নাই, কেবল পাকস্থলীতে টিউমার হইয়াছে কিন্তু উহা মারাত্মক নহে, তবে এই যে লেবা উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই ইহাঁর পক্ষে মারাত্মক হইবার সম্ভাবনা। ইহা ৪।৫ দিনের মধ্যে উপশম হইলে হইতে পারে কিন্তু ইহা অপেক্ষা পণ্ডিতের বয়োবার্দ্ধক্য, শারীরিক দৌর্ব্বল্য এবং জীর্ণ-শীর্ণতা এই তিন কারণেই পীড়া উপশমের সম্ভাবনা অতি অল্প। এই বলায় তাঁহাকে বিদায় দিয়া বৈকালে ম্যাকোনেল ও ডাক্তার বার্চ্চ উভয়ে আসিয়া ও পরীক্ষা করিয়া অসাধ্য বলায় ডাক্তার হীরালাল বাবু ও অমূল্য বাবুর এলোপ্যাথিক চিকিৎসা নির্ব্বন্ধ খণ্ডন করিয়া শাল্‌জার সাহেব দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। শাল্‌জার সাহেবের চিকিৎসায় বেদনা হিক্কা লেবা প্রভৃতি লক্ষণগুলির হ্রাস হইতে লাগিল, কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধ পীড়ার উদয় হইল। হিক্কার লক্ষণ পুনরায় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে অম্লপিত্ত কমিতে লাগিল। ডাক্তার শাল্‌জার সাহেব প্রত্যহ ৩।৪ বার আসিতে লাগিলেন। কোন দিবস কিছু কমে কোন দিবস বৃদ্ধি হয়। হিক্কা বন্ধ না হওয়ায় রজনীগন্ধ ফুল বাটিয়া সেবন করান হয়, তাহাতে যদিও হিক্কার অনেক হ্রাস হইয়াছিল, কিন্তু ঐ দিবসেই স্বল্প জ্বরের উদয় হয়। দিনে দিনে অল্পে অল্পে জ্বর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রজনীগন্ধ ফুলের হিক্কা সম্বন্ধে আর কোনও ক্ষমতা রহিল না। মুখমণ্ডল প্রভৃতির ও জীবর্নের শ্রী কমিয়া আসিতে লাগিল।

ডাক্তার শাল্‌জার নিরাশ হইলেন এবং বলিলেন, তোমরা অপরের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পার এবং আবশ্যক হইলে আমিও বন্ধুভাবে ও চিকিৎসকভাবে প্রত্যহ আসিতে ও দেখিতে পারি, তদ্বিষয়ে আমার মনে কিছুমাত্র আপত্তি বা অসন্তোষ নাই। পর দিবস ৭ই শ্রাবণ বৈকালে, দাদা পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে যে ঔষধ ব্যবহার করিতেন, সেই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ৯ই শ্রাবণ রাত্রিতে সামান্য পুরাতন মল নির্গত হয় ও ১০।১১ই শ্রাবণ তাঁহাকে সকলে



শ্মশানে বিদ্যাসাগরের মরদেহ

আজি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন! আজি বাঙ্গালার সাধ বাসনা ফুরাইল, বাঙ্গালির জাতি-গৌরব ফুরাইল, বুঝি ব্রাহ্মণ বংশের সৌভাগ্য-গর্ব্বও ফুরাইয়া আসিল—আজি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় এসকল পরিত্যাগ করিয়াছেন! আজি বঙ্গজননী নয়নের মণি, আঁচলের নিধি হারাইয়া ফেলিয়াছেন! আজি আমরা সকলেই পিতৃহীন হইয়াছি! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সন্তান সন্ততিগণের সহিত আজি আমরা সমগ্র বঙ্গবাসী পিতৃহীন হইয়াছি! বিদ্যাসাগর মহাশয় কাহারও নিজের সম্পত্তি নহে; জল, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্যের মত আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সকলের জিনিস। যে মূর্খ, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই; যে দরিদ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই; যে রমণী সপত্নীযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই; যে বালিকা বৈধব্য-আগুনে পুড়িতেছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই; যে প্রাপ্তবয়স্কা বিধবা অন্ন বস্ত্রের জন্যে লালায়িত, শিশু সন্তান পালনে অক্ষমা, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই; এক কথায় বলিতে গেলে যাহার হৃদয়ে একটুকু ব্যথা আছে, যাহার একটুকু অভাব আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই; এই হিসাবে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়কে "আমার" "আমার" বলিতে পারি। তাই, সকলের জিনিস বলিয়া—সকলের নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া আমরা সকলেই আজি পিতৃহীন, বন্ধুহীন ও আরামের স্থান হীন হইয়াছি! আজি পৃথিবী! শোন, আকাশ শোন, মানুষ শোন, দেবতা শোন, সকলেই আজি এই শোক-সন্তপ্ত প্রাণের কাতরোচ্ছ্বাস শোন, সকলেই আজি আমাদের সর্ব্বনাশের কথা শোন, আজি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে এ জনমের মত ফাঁকি দিয়াছেন!! এই কয়টী কথার মধ্যে আমাদের কি দারুণ সর্ব্বনাশ ভরা রহিয়াছে, কি অসহ শোক তাপ ঢালা রহিয়াছে, যাহার হৃদয় আছে তিনি তাহা হৃদয়ে অনুভব করুন্। এ নিদারুণ কথা, এ হৃদয়ময় বেদনা কহিতে পারি এমন ভাষা আজিও হয় নাই।—যদি হইয়া থাকে আমরা শিখিতে পারি নাই।

ওই জাহ্নবী বক্ষে ধূ ধূ করিয়া চিতার আগুন জ্বলিতেছে! ওই আগুনে বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ হইতেছে, বাঙ্গালির "পিরামিড" ভস্মসাৎ হইতেছে! ওই ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, ওই আগুনে বাঙ্গালার সম্মান গৌরব পুড়িয়া ছাই হইতেছে! ওই জ্বলন্ত আগুনে বাঙ্গালির প্রধান অহঙ্কার প্রধান গর্ব্ব পুড়িয়া যাইতেছে! ওই চিতার আগুনে আজি কত কি ফুরাইল! সহস্র সহস্র বক্ষ শ্মশান হইল! কত কাঙ্গাল গরিব একত্রে মাতা পিতা হারা হইল! কত হৃদয় আজি আশা ভরসা হারা হইল! শ্রাবণের মেঘ স্তম্ভিত হইয়া দেখিতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত হইয়া দেখিতেছে, আজি চিহ্ন ফুরাইয়া আসিতেছে, ইহার মত সর্ব্বনাশের কথা আর কি আছে, তাহা আমরা জানি না! যে দেহ পরের জন্যে, জগতের জন্যে, ধর্ম্মের জন্যে, ন্যায়ের জন্যে, অবিশ্রান্ত ভাবে অবিচলিত উৎসাহে এই প্রাচীন বয়সে যুবকের খাটুনি খাটিয়াছে, আজি সেই দেহ—আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, পুণ্যময় দেব-দেহ চিতার ভস্ম হইতেছে! এই ভস্ম হৃদয়ে লইয়া মা জাহ্নবীও অধিকতর পবিত্রতা লাভ করিতেছেন! আর আত্মা? সে অক্ষয় অমরাত্মা স্বর্গে গিয়াছে। যেখানে মহর্ষি ব্যাস, পরাশর, রাজর্ষি জনক প্রভৃতি দেবতাগণ বিরাজিত আছেন, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেইখানে গিয়াছেন। বিশ্বজননীর স্নেহময় কোলে আমাদের সেই পরিশ্রান্ত দেবতা ঘুমাইতে গিয়াছেন। আজি ঈশ্বরে "ঈশ্বর" বিলীন হইয়াছে! একবার প্রাণ ভরিয়া সকলে হরি হরি বল!

নরনারী, ইংরাজ বাঙ্গালি, বড় ছোট, চেতন অচেতন, জগৎ স্বর্গ, সকলে একত্রে প্রাণ খুলিয়া, গলায় গলা মিশাইয়া হরি হরি বল। আমাদের পিতা, শিক্ষক, বন্ধু, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় আজি অনন্ত সাগরে মিলিত হইতেছেন, আজ একবার মনের মত করিয়া হরি হরি বলি! আমরা সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে সহস্র ঋণী—যে বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগখানিও পাড়তেছে, সেও বিদ্যাসাগরের নিকটে বিক্রীত—তাঁহারই হাতে গড়া পুতুল, এস সকলে একবার হরি হরি বলি!!

এ চিতার আগুন নিভিবে ও দেহের শেষ চিহ্ন ফুরাইবে; কিন্তু বিধবা রমণীর বুকের আগুনের মত ভারতের বুকের স্তরে স্তরে এই শোকের আগুন জ্বলিতে থাকিবে। আজি যে ময়ূরাসন, যে রাজাসন শূন্য হইল, সেখানে বসিবার রাজা—মহারাজা—সম্রাট্ বুঝি আর মিলিবে না! এ অমূল্য রত্ন এ দেবদুর্ল্লভ রত্ন হারাইয়া ভারতের—জগতের বলিলেও ক্ষতি হয় না,—যে নিদারুণ অভাব হইল, বুঝি সহস্র বৎসরেও সে অভাব পূর্ণ হইবে না! বিদ্যা-সাগর মহাশয় ভারতবাসী বলিয়া ভারতবর্ষ ধন্য, বাঙ্গালি বলিয়া বাঙ্গালি জাতি ধন্য, ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব বলিয়া ব্রাহ্মণ কুল ধন্য, "আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়" বলিয়া মানবসমাজে দাঁড়াইতে পারি, এজন্য আমাদের এ অপদার্থ জীবনও বুঝি ধন্য—সেই ব্যাস, নারদ, মনু, অত্রি ব্যতীত আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আসনে বসিবার মত দেবতা কোথায়?

তবে যাও, বঙ্গবাসী, হরি হরি বলিতে বলিতে ঘরে ফিরিয়া যাও। বাঙ্গালা দেশের, ভারতবর্ষের, জগৎ সংসারের উজ্জ্বলতম রত্ন কলিকাতার নিমতলার ঘাটে বিসর্জ্জন দিয়া হরি হরি বলিয়া দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা কর, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অমর কীর্ত্তি মা'র বুকে অঙ্কিত কর। সকলের উপরে—যার ক্ষমতা থাকে, হরি হরি বলিয়া আত্মগঠন কর, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শূন্য স্থান পূর্ণ কর! মানব জীবন সফল কর। মানবত্ব, দেবত্ব মিশ্রিত কর!

তা এখন একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, বলি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় কি মরিবার ছেলে? যিনি কোটী কোটী মৃত্যু পদ-দলিত করিয়া চলেন, তাঁহার কি মৃত্যু হইতে পারে? না, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় মরিতে জানেন না। অনেক রকম জানেন—মানুষ কেমন করিয়া দেবতা হয় তাহা জানেন, স্বাবলম্বনের বলে গরিবের ছেলে কেমন করিয়া রাজাধিরাজ হইতে পারে তাহা জানেন, মরজগৎকে কেমন করিয়া স্বর্গ করিতে হয় তাহা জানেন, জগতের প্রত্যেক নরনারীকে কেমন করিয়া "আপনার জন" করিতে হয় তাহা জানেন, পরের ভিতরে নিজের অস্তিত্ব কেমন করিয়া মিশাইতে হয় তাহা জানেন, এই বিশ্ব জগৎ কি করিয়া এক বাঁধনে বাঁধিতে হয় তাহা জানেন,—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত দেবতা হইতে হইলে যাহা কিছু জানিতে হয় সবই জানেন, কেবল মরিতে জানেন না। দেবতার মৃত্যু নাই, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃত্যুঞ্জয়।

কে বলিল আজি আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় এ জগতে নাই? পৃথিবী চূর্ণ হইয়া যায় যাউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় না থাকিলে আমাদের আর থাকিল কি? আজি তো কলিকাতা সহরের সকল স্থানেই বিদ্যাসাগর মহাশয় রহিয়াছেন। আজি তো কলিকাতার প্রতি শিরা ধমনীতে, প্রতি অণু পরমাণুতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্রোত ছুটিতেছে। আজি তো কলিকাতা মহানগরী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহা প্রাণে অণুপ্রাণিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে! লোকে যত বিশ্বাস করিতে চাহিতেছে বিদ্যাসাগর মহাশয় এ জগতে নাই, তিনি ততই যেন অসংখ্য

মূর্ত্তি ধরিয়া ভয়ার্ত্তকে অভয় দিতেছেন, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিতেছেন, সকল ব্যথিতের ব্যথা হাত দিয়া—সেই স্নেহমাখা হাত দিয়া মুছিয়া দিতেছেন! তাই বলিতেছি, রামা মরিতে জানে, শঙ্করা মরিতে জানে, তাহাদের মত শত সহস্র প্রাণী নিত্যই মরিয়া থাকে, বুঝি কত বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যাবাগীশেরাও মরিতে পারেন, কিন্তু আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় কোনও দিন মরিতে জানেন না। আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়—আমাদের গরিবের দাঁড়াইবার অবলম্বন, দীন-হীনের প্রতিপালক, অনাথের ভরসা, সত্য ন্যায়ের অবতার, করুণার পূর্ণ আদর্শ, জগতের দেবদুর্ল্লভ রত্ন, আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয়, যিনি চিরদিন সমভাবে আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্যই খাটিয়াছেন, যিনি মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্তেও আমাদের মঙ্গল চিন্তা করিয়াছেন, যিনি অসহনীয় অকৃতজ্ঞতা, পৈশাচিক কৃতঘ্নতা, অনায়াসে পদ-দলিত করিয়াছেন, আমাদের সেই বিদ্যা-সাগর মহাশয় আমাদিগকে ছাড়িয়া কখনও যাইতে পারেন না!! আজি মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া অমর হইয়াছে। আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃত্যুঞ্জয় হইয়া আমাদের নিকটে বিরাজ করিতেছেন। তবে আর কি,

"চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনং
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তি র্যস্য সজীবতি।"[৬৯]

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর তিন বছর বাদে, ১৩০২ সালের ১৩-শ্রাবণ অপরাহ্নে, বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থসভার সাম্বৎসরিক অধিবেশনে, রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলেছেন : "বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে—বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফল দান করিতেন; কিন্তু আমাদের শতসহস্র ক্ষণজীবী সভা-সমিতির ঝিল্লীঝংকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষুধিত-পীড়িত অনাথ-অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্তমান নাই—কিন্তু তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালিজাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিষ্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া, সূক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া, সরল সবল অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব।"[৭০]

প্রমাণপঞ্জী

এক

১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪০৯-১০।
২। সরোজনাথ মুখোপাধ্যায় : শরৎকুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ, পৃ. ৩৯-৪২।
৩। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫১৪-১৫।
৪। রজনীকান্ত গুপ্ত : প্রতিভা, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২৭-২৮।
৫। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ : রামেন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা, ১৩৫৬), পৃ. ১৮৯-৯০।
৬। নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত : বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা, ১২৯৮), পৃ. ৩০৫।
৭। ক্ষুদিরাম বসু : বিদ্যাসাগর-স্মৃতি, 'পঞ্চপুষ্প', আষাঢ়, ১৩৩৬, পৃ. ২৯৩।
৮। রজনীকান্ত গুপ্ত : প্রতিভা, নবম সংস্করণ, পৃ. ২২-২৩।
৯। শিবনাথ শাস্ত্রী : প্রবন্ধাবলি। প্রথম খণ্ড। (কলকাতা, ১৯০৪), পৃ. ১৬-১৭।
১০। Sivanath Sastri: Men I have seen (Calcutta, 1919), pp. 24-25.
১১। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩৪৭-৪৮।
১২। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : শ্রুতি-স্মৃতি, প্রথম ভাগ (কলকাতা, ১৩৩৪), পৃ. ২৫-২৬।
১৩। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫১০-১৩।
১৪। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫১৯-২০।
১৫। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩৭২।
১৬। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৭১-৭২।
১৭। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ১৭৭।
১৮। Surendranath Banerjea: A Nation in Making (Calcutta, 1963), p. 7.
১৯। Sister Nivedita: Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda, Third Edition, p. 35.
২০। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : 'ধর্মের কলে'র পাদটীকা, 'ভারতী', আষাঢ়, ১৩০৮, পৃ. ২৩১।
২১। The Vidyasagar College Magazine, September, 1925, পৃ. ২১।
২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত : কবিতাসংগ্রহ। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব। (কলকাতা, ১৮৮৫), পৃ. ৭৭।
২৩। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : সভাপতির অভিভাষণ, 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ষষ্ঠ ভাগ, বঙ্গাব্দ ১৩০৬, পৃ. ১০২-০৩।
২৪। শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য : বিদ্যাসাগর-প্রবন্ধ (কলকাতা, ১৩০৫), পৃ. ৯২-৯৩।
২৫। ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ, 'নবোদয়', বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা, প্রথম বর্ষ (১৩৬২), পৃ. ৭৭।

২৬। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৪০।
২৭। নবকৃষ্ণ ঘোষ : প্যারীচরণ সরকার, (কলকাতা, ১৯০২), পৃ. ৫-৬।
২৮। নবকৃষ্ণ ঘোষ : প্যারীচরণ সরকার (কলকাতা, ১৯০২), পৃ. ১৭৭-৭৮।
২৯। নবকৃষ্ণ ঘোষ : প্যারীচরণ সরকার (কলকাতা, ১৯০২), পৃ. ২৮৪।
৩০। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪১০-১২।
৩১। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ১৬১-৬২।
৩২। শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য : প্রয়াস, নব সংস্করণ (কলকাতা, ১৯১০), পৃ. ৩৯-৪১।
৩৩। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫১৫।
৩৪। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ : নবীনচন্দ্র-রচনাবলী—আমার জীবন, প্রথম খণ্ড (কলকাতা, ১৯৫৯), পৃ. ১৩১-৩৫।
৩৫। নবীনচন্দ্র সেন : পলাশির যুদ্ধ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ (কলকাতা, ১৯৬০), পৃ. ২।
৩৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসাগরচরিত (কলকাতা, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫), পৃ. ৪১।
৩৭। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় : নববার্ষিকী (কলকাতা, ১৮৭৭), পৃ. ২০১।
৩৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসাগরচরিত (কলকাতা, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫), পৃ. ৩০।
৩৯। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৯২-৯৩।
৪০। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, 'মানসী ও মর্মবাণী', আষাঢ়, ১৩৩৬, পৃ. ৫১৪।
৪১। শিবনাথ শাস্ত্রী : প্রবন্ধাবলি। প্রথম খণ্ড (কলকাতা, ১৯০৪), পৃ. ৮-৯।
৪২। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), পৃ. ৪৮-৪৯।
৪৩। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ২২৪-২৫।
৪৪। শশিভূষণ বসু : বিদ্যাসাগর-স্মৃতি, 'প্রবাসী', শ্রাবণ, ১৩৪৩, পৃ. ৫৪৮।
৪৫। শ্রীনিবাস সেন মজুমদার : বিদ্যাসাগর বর্ষস্মৃতি, The Vidyasagar College Magazine, September, 1926, পৃ. ২২-২৩।
৪৬। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩২৪-২৫।
৪৭। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫৩৩-৩৪।
৪৮। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪০৭-০৮।
৪৯। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ৫১।
৫০। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫০৪।
৫১। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : শ্রুতি-স্মৃতি, প্রথম ভাগ (কলকাতা, ১৩৩৪), পৃ. ৯৩।
৫২। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ১৭৬।
৫৩। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫০২।
৫৪। ক্ষুদিরাম বসু : বিদ্যাসাগর-স্মৃতি, 'পঞ্চ-পুষ্প', আষাঢ়, ১৩৩৬, পৃ. ২৯৩।
৫৫। ভুবনকৃষ্ণ মিত্র : জীবতত্ত্ব, 'জন্মভূমি', ফাল্গুন, ১৩০৮, পৃ. ২৫০-৫১।
৫৬। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় : জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি (কলকাতা, ১৯১৯), পৃ. ১৮২।
৫৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনস্মৃতি (কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৬২), পৃ. ৬২।
৫৮। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ১৯৩।
৫৯। শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য : প্রয়াস, নব সংস্করণ (কলকাতা, ১৯১০), পৃ. ৭-৮।
৬০। যতীন্দ্রমোহন ঘোষ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কতিপয় অপ্রকাশিত গল্প, 'বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা', আশ্বিন, ১৩৬১, পৃ. ৭০।

৬১। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ২৩১-৩২।
৬২। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : সমিত্র সারদারঞ্জন ও বিদ্যাসাগর কলেজ, The Vidyasagar College Magazine, March, 1926, পৃ. ১০৩-০৪।
৬৩। সন্তোষকুমার ঘোষ : বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ, 'বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা', বৈশাখ, ১৩৪১, পৃ. ৫৬।
৬৪। শশিভূষণ বসু : বিদ্যাসাগর-স্মৃতি, 'প্রবাসী', শ্রাবণ, ১৩৪৩, পৃ. ৫৪৭-৪৮।
৬৫। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৭।
৬৬। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : বঙ্গের রত্নমালা (কলকাতা, ১৩১৭), পৃ. ১২৯।
৬৭। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় : সদালাপ, দ্বিতীয় খণ্ড (চুঁচুড়া, ১৩২৩), পৃ. ১৫৫-৫৬।
৬৮। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : শ্রুতি-স্মৃতি, প্রথম ভাগ (কলকাতা, ১৩৩৪) পৃ. ২২।
৬৯। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ২৩৩-৩৬।
৭০। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী : শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ, তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ৫৬-৫৭।
৭১। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ১৯৮-৯৯।
৭২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসাগরচরিত (কলকাতা, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫), পৃ. ৩৯-৪০।
৭৩। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ১৮৫-৮৭।
৭৪। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), পৃ. ১৩৭-৩৮।
৭৫। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ১১৬-১৭।
৭৬। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫২০।
৭৭। শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য : বিদ্যাসাগর-প্রবন্ধ (কলকাতা, ১৩০৫), পৃ. ৮৭।
৭৮। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : শ্রুতি-স্মৃতি, প্রথম ভাগ (কলকাতা, ১৩৩৪), পৃ. ৯৭-৯৮।
৭৯। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : বঙ্গের রত্নমালা (কলকাতা, ১৩১৭), পৃ. ৮৫-৮৬।
৮০। যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় : আমার দেখা লোক, 'প্রবাসী', শ্রাবণ, ১৩৪২, পৃ. ৪৬১-৬৩।
৮১। যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় : আমার দেখা লোক, 'প্রবাসী', শ্রাবণ, ১৩৪২, পৃ. ৪৬৩।
৮২। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বঙ্কিম-জীবনী, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩৮১।
৮৩। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সঙ্কলিত : বঙ্কিম-প্রসঙ্গ (কলকাতা, ১৯২১), পৃ. ৩১৯।
৮৪। তারকনাথ বিশ্বাস : গ্রন্থাবলী, তৃতীয় খণ্ড (কলকাতা, ১৩২৬), পৃ. ২৬৭।
৮৫। শিবনাথ শাস্ত্রী : আত্মচরিত, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৯২-৯৩।
৮৬। শিবনাথ শাস্ত্রী : প্রবন্ধাবলি। প্রথম খণ্ড (কলকাতা, ১৯০৪), পৃ. ২১।
৮৭। শিবনাথ শাস্ত্রী : আত্মচরিত, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৩৮-৪০।
৮৮। শিবনাথ শাস্ত্রী : প্রবন্ধাবলি। প্রথম খণ্ড (কলকাতা, ১৯০৪), পৃ. ৬।
৮৯। শিবনাথ শাস্ত্রী : পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'সখা', অক্টোবর, ১৮৮৫, পৃ. ১৫৮।
৯০। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ : রামেন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা, ১৩৫৬), পৃ. ১৮৫।
৯১। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৬৯।
৯২। 'ভারতবর্ষ', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮, পৃ. ৯৯০-৯১।
৯৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসাগরচরিত (কলকাতা, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫), পৃ. ৬২।

৯৪। ক্ষুদিরাম বসু : বিদ্যাসাগর-স্মৃতি, 'পঞ্চ-পুষ্প', আষাঢ়, ১৩৩৬, পৃ. ২৯৫।
৯৫। শিবনাথ শাস্ত্রী : প্রবন্ধাবলি। প্রথম খণ্ড (কলকাতা, ১৯০৪), পৃ. ১০-১৫।
৯৬। ক্ষুদিরাম বসু : বিদ্যাসাগর-স্মৃতি, 'পঞ্চ-পুষ্প', আষাঢ়, ১৩৩৬, পৃ. ২৯৩।
৯৭। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫১৯।
৯৮। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৭৪।
৯৯। ক্ষুদিরাম বসু : বিদ্যাসাগর-স্মৃতি, 'পঞ্চ-পুষ্প', আষাঢ়, ১৩৩৬, পৃ. ২৯৩।
১০০। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৭৩।
১০১। Subal Chandra Mitra: Isvar Chandra Vidyasagar, second edition, p. 96.
১০২। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৩৮৮-৮৯।
১০৩। ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ, 'নবোদয়', বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা, প্রথম বর্ষ (১৩৬২), পৃ. ৭৫-৭৬।
১০৪। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৩৮৯-৯০।
১০৫। রমেশচন্দ্র দত্ত : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'নব্যভারত', ভাদ্র, ১২৯৮, পৃ. ২৪৮।
১০৬। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : শ্রুতি-স্মৃতি, প্রথম ভাগ (কলকাতা, ১৩৩৪), পৃ. ২৪-২৫।
১০৭। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৭২-৭৩।
১০৮। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ২২৩।
১০৯। The Hindoo Patriot: 26 September, 1861.
১১০। Nagendranath Gupta: Seven Noble Lives (Bombay, 1950), pp. 11-12.
১১১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৬১।
১১২। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), পৃ. ৮৬-৮৭।
১১৩। শিবনাথ শাস্ত্রী : প্রবন্ধাবলি। প্রথম খণ্ড (কলকাতা, ১৯০৪), পৃ. ৫।
১১৪। Walter Scott Seton-Karr: Grant of Rothiemurchus (London, 1899), p. 20.
১১৫। C. E. Buckland: Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. II, second edition, pp. 1033-34.

দুই

১। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত : বিদ্যাসাগর চরিত স্বরচিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ১৬।
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসাগরচরিত (কলকাতা, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫), পৃ. ১৮-১৯।
৩। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত : বিদ্যাসাগর চরিত স্বরচিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ২০-২৮।
৪। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ১১।
৫। লালমোহন বিদ্যানিধি : বিদ্যাসাগর, 'সাহিত্য-সংহিতা', কার্তিক-পৌষ, ১৩২৬, পৃ. ১৫৬।

তিন

১। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত : বিদ্যাসাগর চরিত স্বরচিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ২৯।
২। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ১৫।
৩। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ১৬।
৪। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ১৭।
৫। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত : বিদ্যাসাগর চরিত স্বরচিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৫০।
৬। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ১৮।
৭। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত : বিদ্যাসাগর চরিত স্বরচিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৪০।
৮। Parliamentary Papers, H. C. Reports from Committees, 1852-53, Vol. XXXII, p. 48.
৯। The First Report of the Calcutta School-Book Society (Calcutta, 1818), pp. V-VI.
১০। The First Report of the Calcutta School-Book Society (Calcutta, 1818), p. 24.
১১। The First Report of the Calcutta School-Book Society (Calcutta, 1818), p. 29.
১২। যোগেশচন্দ্র বাগল : বাংলার জনশিক্ষা (কলকাতা, ১৯৪৯), পৃ. ১৫-১৬।
১৩। Report of the Calcutta School Society: 13th April, 1819—January, 1833 (Manuscripts): বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে রক্ষিত (090371.06 Cal).
১৪। William Adam: Reports on the State of Education in Bengal (University of Calcutta, 1941), p. 13.
১৫। H. Sharp: Selections from Educational Records, Part I (Calcutta, 1920), p. 79.
১৬। Copy book of letters received and issued by the General Committee of Public Instruction, 1823-24, pp. 40-42 (দ্রষ্টব্য—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭০-৭১।)
১৭। Minutes and Proceedings of the General Committee of Public Instruction, 1823-41, Volume No. 5, pp. 45-48.
১৮। J. Kerr: A Review of Public Instruction in the Bengal Presidency, from 1835 to 1851, Part II (Calcutta, 1852), pp. 48-49.

চার

১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫৭।
২। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৩০।

৩। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫৬।
৪। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), পৃ. ১৩৯-৪০।
৫। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৩৭।
৬। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৩৮।
৭। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : শ্লোকমঞ্জরী (কলকাতা, ১৮৯০), বিজ্ঞাপন, পৃ. ৷৹
৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : শ্লোকমঞ্জরী (কলকাতা, ১৮৯০), বিজ্ঞাপন, পৃ. ৷৹
৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-১৮, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ১২।
১০। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ২৫।
১১। লালমোহন বিদ্যানিধি : বিদ্যাসাগর, 'সাহিত্য-সংহিতা', কার্তিক-পৌষ, ১৩২৬, পৃ. ১৫৮।
১২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-১৮, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ১২-১৩।
১৩। লালমোহন বিদ্যানিধি : বিদ্যাসাগর, 'সাহিত্য-সংহিতা', কার্তিক-পৌষ, ১৩২৬, পৃ. ১৫৮-৫৯।
১৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-১৮, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ১৩।
১৫। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৩১।
১৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-১৮, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ১৩।
১৭। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ২৯।
১৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-১৮, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ১৩।
১৯। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৩৩-৩৪।
২০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-১৮, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ১৩-১৪।
২১। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৩৪-৩৫।
২২। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন : সেকালের সংস্কৃত কলেজ, 'প্রবাসী', ভাদ্র, ১৩৩২, পৃ. ৬৪৯।
২৩। রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় : °প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিতাবলী, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৯১-৯২।
২৪। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৩৯-৪০।
২৫। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫৮-৬০।
২৬। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৩৬।
২৭। ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা : সংস্কৃত রচনা (কলকাতা, ১২৯৬), পৃ. ১-৩।
২৮। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৪২।
২৯। ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা : সংস্কৃত রচনা (কলকাতা, ১২৯৬), পৃ. ৯-১০।
৩০। ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা : সংস্কৃত রচনা (কলকাতা, ১২৯৬), পৃ. ১০-১১।
৩১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : ভূগোলখগোলবর্ণনম (কলকাতা, ১৮৯৩), পৃ. ৫-৭।
৩২। লালমোহন বিদ্যানিধি : বিদ্যাসাগর, 'সাহিত্য-সংহিতা', কার্তিক-পৌষ, ১৩২৬, পৃ. ১৬৬-৬৯।
৩৩। ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা : সংস্কৃত রচনা (কলকাতা, ১২৯৬), পৃ. ৪-৬।

৩৪। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৪৪-৪৫।
৩৫। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৪৫-৪৬।
৩৬। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৩৬।
৩৭। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৩৮।
৩৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-১৮, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ১৭।
৩৯। ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা : সংস্কৃত রচনা (কলকাতা, ১২৯৬), পৃ. ৬-৮।
৪০। ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা : সংস্কৃত রচনা (কলকাতা, ১২৯৬), পৃ. ১৩-১৫।
৪১। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৪৮।
৪২। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ১২।
৪৩। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৩২।
৪৪। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৩৮৫-৮৬।
৪৫। লালমোহন বিদ্যানিধি : বিদ্যাসাগর, 'সাহিত্য-সংহিতা', কার্তিক-পৌষ, ১৩২৬, পৃ. ১৬৩-৬৪।
৪৬। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৭৬-৭৭।
৪৭। শ্রীম : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, তৃতীয় ভাগ (কলকাতা, ১৩৬০), পৃ. ৫।

পাঁচ

১। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৭৪।
২। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১১০।
৩। রাজনারায়ণ বসু : আত্মচরিত, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৬১-৬২।
৪। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০) পৃ. ১৩৬-৩৭।
৫। ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা : সংস্কৃত রচনা (কলকাতা, ১২৯৬), পৃ. ১২।
৬। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৬১-৬২।
৭। ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা : সংস্কৃত রচনা (কলকাতা, ১২৯৬), পৃ. ১২-১৩।
৮। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ১১।
৯। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৪৬।
১০। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৪৬-৪৭।
১১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ১৬৩-৬৪।
১২। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ১৬৪।
১৩। শ্রীসুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ২৩।
১৪। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ১৬৪।
১৫। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৬২-৬৩।
১৬। শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দ্বিপ্রহর (কলকাতা, ১৯৬৪), পৃ. ১৮৪।
১৭। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১২৬।
১৮। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৫৬-৫৮।

১৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (কলকাতা, ১৩৫৫), পৃ. ৪৭-৪৯।
২০। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৬৮।
২১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৯৩-৯৪।
২২। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৭৩-৭৪।
২৩। General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1846-47, p. 41.
২৪। Files For Letters Received (1844-47), Sanskrit College.
২৫। Files For Letters Received (1844-47), Sanskrit College.
২৬। Files For Letters Received (1844-47), Sanskrit College.
২৭। Files For Letters Received (1844-47), Sanskrit College.
২৮। Files For Letters Received (1844-47), Sanskrit College.
২৯। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৭৪।
৩০। শ্রীশিশিরকুমার দাশ : বাংলায় যতিচিহ্ন ১৮০১-১৮৫০, 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', কার্তিক-পৌষ, ১৩৭০, পৃ. ১৫১-৫২।

ছয়

১। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৮১-৮২।
২। General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, from 1st Oct. 1849 to 30th Sept. 1850, pp. 65-66.
৩। Education Department Consultation, 29 January 1851, No. 4.
৪। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৩৬-৩৭।
৫। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৩৭-৩৮।
৬। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), পৃ. ১৪০।
৭। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ১০৩-০৪।
৮। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন : সেকালের সংস্কৃত কলেজ, 'প্রবাসী', ভাদ্র, ১৩৩২, পৃ. ৬৪৭।
৯। প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর : প্রাচীন কবিতা, 'সাহিত্য-সংহিতা', জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩, পৃ. ৭৭।
১০। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন : সেকালের সংস্কৃত কলেজ, 'প্রবাসী', ভাদ্র, ১৩৩২, পৃ. ৬৪৫।
১১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ১১৭-১৮।
১২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ (কলকাতা, ১৩৩৮), ভূমিকা, পৃ. ১৯।
১৩। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২১৪।
১৪। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন : সেকালের সংস্কৃত কলেজ, 'প্রবাসী', ভাদ্র, ১৩৩২, পৃ. ৬৪৭।
১৫। Education Department Consultation, 15 April 1852, No. 3.
১৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-১৮, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ৩১।
১৭। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত : বিদ্যাসাগর-রচনাসম্ভার (কলকাতা, ১৯৫৭), পৃ. ।৶০ ।

১৮। Copies of Correspondence between the Council of Education and the Principal of the Sanskrit College, Benares, 1853, pp. 45-47. [Education (State Archives) Department, Govt. of West Bengal].

১৯। ডঃ গোপিকামোহন ভট্টাচার্য : কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা, ১৯৬১), পৃ. ৬-৭।

২০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসাগরচরিত (কলকাতা, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫), পৃ. ৭০।

২১। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন : সেকালের সংস্কৃত কলেজ, 'প্রবাসী', ভাদ্র, ১৩৩২, পৃ. ৬৫২।

২২। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ১১৪-১৬।

২৩। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, General Department, June 1860, No. 80.

সাত

১। H. Sharp: Selections from Educational Records, Part I (Calcutta, 1920), pp. 24-25.

২। Charles Lushington: The History, Design, and present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions, founded by the British in Calcutta and its vicinity (Calcutta, 1824), pp. 151-52.

৩। J. C. Marshman: The Life and times of Carey, Marshman and Ward, Vol. II (London, 1859), pp. 121-22.

৪। The Fifth Report of the Calcutta School Society (Calcutta, 1829), p. 13.

৫। যোগেশচন্দ্র বাগল : বাংলার জনশিক্ষা (কলকাতা, ১৯৪৯), পৃ. ২৭।

৬। William Adam: Reports on the State of Education in Bengal (University of Calcutta, 1941), p. 11.

৭। P. C. Mittra: Education in Bengal, 'National Magazine', January, 1908, pp. 12-13.

৮। The Asiatic Journal and Monthly Register for British and Foreign India, China, and Australia, Vol. VIII—New Series, May-August, 1832: Asiatic Intelligence—Calcutta, May, 1832, p. 19.

৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫৪।

১০। William Adam: Reports on the State of Education in Bengal (University of Calcutta, 1941), pp. 400-01.

১১। J. A. Richey: Selections from Educational Records, Part II (Calcutta, 1922), p. 65.

১২। General Report on Public Instruction in the Lower Provin-

ces of the Bengal Presidency, from 27th January to 30th April 1855, pp. 51-52.

১৩। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', শ্রাবণ, ১৭৭০ শক, পৃ. ৬৪-৭২।

১৪। Herbert Alick Stark: Vernacular Education in Bengal from 1813 to 1912 (Calcutta, 1916), p. 61.

আট

১। Education Department Consultation, 10 May 1855, No. 71.

২। Education Department Consultation, 10 May 1855, No. 73.

৩। Education Department Consultation, 10 May 1855, No. 74.

৪। Sricharan Chakravarti: Life of Pandit Isvarchandra Vidyasagara (Calcutta, 1896), p. 46.

৫। General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, from 27th January to 30th April, 1855, p. 53.

৬। Education Department Consultation, 24 January 1856, No. 82; Education Department consultation, 13 March 1856, No. 79.

৭। General Report on Public Instruction in the Lower provinces of the Bengal Presidency, for 1855-56, Appendix A, pp. 55-56.

৮। General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1857-58, Appendix A, pp. 178-80.

৯। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন: বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ১৭১-৭২।

১০। বিহারীলাল সরকার: বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩৯৫-৯৬।

১১। Appendices to General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1858-59, ii-84-85.

১২। 'ভারতবর্ষ', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮, পৃ. ৯৯২।

নয়

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ: রামমোহন-গ্রন্থাবলী-৩, পৃ. ৪৬।

২। প্যারীচাঁদ মিত্র: আধ্যাত্মিকা (কলকাতা, ১৮৮০), p. i.

৩। Charles Lushington: The History, Design, and present state of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions, founded by the British in Calcutta and its vicinity (Calcutta, 1824), pp. 185-91.

৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৭।
৫। John Bull, May 23, 1826.
৬। Priscilla Chapman: Hindoo Female Education (London, 1839), pp. 92-93.
৭। The Calcutta Christian Observer, February, 1840, p. 101.
৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৬।
৯। William Adam: Reports on the State of Education in Bengal (University of Calcutta, 1941), p. 68.
১০। নবকৃষ্ণ ঘোষ : প্যারীচরণ সরকার (কলকাতা, ১৯০২), পৃ. ৬৪।
১১। J. A. Richey: Selections from Educational Records, Part II (Calcutta, 1922), p. 56.
১২। শিবনাথ শাস্ত্রী : মহাত্মা বেথুন ও বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা, 'প্রবাসী', ভাদ্র, ১৩১১, পৃ. ২৪৬।
১৩। রাজনারায়ণ বসু : আত্মচরিত, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩৯।
১৪। The Bengal Harkaru and India Gazette, November 9, 1850, p. 527.
১৫। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (কলকাতা, ১৯০৪), পৃ. ১৯৬।
১৬। মহানির্বাণ তন্ত্র : অষ্টম উল্লাস, শ্লোক ৪৭।
১৭। Bethune School and College Centenary Volume, p. 20.
১৮। শিবনাথ শাস্ত্রী : মহাত্মা বেথুন ও বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা, 'প্রবাসী', ভাদ্র, ১৩১১, পৃ. ২৪৬।
১৯। Education Department Consultation, 4 September 1856, No. 166.
২০। সম্বাদ ভাস্কর : ১৩-জানুয়ারি, ১৮৫৭ সাল, পৃ. ৪৬৩।
২১। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, July 1864, No. 17, p. 18.
২২। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ১২৪-২৫।
২৩। Sister Nivedita: Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda, Third Edition, pp. 35-36.
২৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসাগরচরিত (কলকাতা, ১৩ শ্রাবণ ১৩০২), পৃ. ৪৯-৫০।
২৫। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), পৃ. ২২৬।

দশ

১। Education Department Consultation, 22 October 1857, No. 72.
২। Education Department Consultation, 5 August 1858, No. 16.
৩। Education Department Consultation, 5 August 1858, No. 15.

৪। General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1857-58, Vol. I, pp. 179-80.
৫। Education Department Consultation, 5 August 1858, No. 14.
৬। Education Department Consultation, 5 August 1858, No. 17.
৭। Education Department Consultation, 2 December 1858, No. 4.
৮। Education Department Consultation, 2 December 1858, No. 3.
৯। Subal Chandra Mitra: Isvar Chandra Vidyasagar, Second edition, p. 136.
১০। Subal Chandra Mitra: Isvar Chandra Vidyasagar, Second edition, p. 137.
১১। Subal Chandra Mitra: Isvar Chandra Vidyasagar, Second edition, p. 138.
১২। Education Department Consultation, 13 September 1858, No. 14.
১৩। Education Department Consultation, 13 September 1858, No. 13.
১৪। Subal Chandra Mitra: Isvar Chandra Vidyasagar, second edition, p. 140.
১৫। Subal Chandra Mitra: Isvar Chandra Vidyasagar, second edition, p. 141.
১৬। Subal Chandra Mitra: Isvar Chandra Vidyasagar, second edition, p. 142.
১৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ (কলকাতা, ১৩৩৮), ভূমিকা, পৃ. ৪।
১৮। Subal Chandra Mitra: Isvar Chandra Vidyasagar, second edition, p. 143.
১৯। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, Appendix-A, p. viii.
২০। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, Appendix-A, pp. viii-ix.
২১। বিহারীলাল সরকার: বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩০৫।
২২। Ram Gopal Sanyal: Reminiscences and Anecdotes of Great Men of India, Part I (Calcutta, 1895), p. 30.
২৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: বিদ্যাসাগরচরিত (কলকাতা, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫), পৃ. ৩২-৩৩।
২৪। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন: বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ১৩১-৩২।
২৫। বিহারীলাল সরকার: বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩০৭।
২৬। বিহারীলাল সরকার: বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩০৭-০৮।
২৭। বিপিনবিহারী গুপ্ত: পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), পৃ. ৮৭।
২৮। বিহারীলাল সরকার: বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৭৫।

২৯। শিবনাথ শাস্ত্রী : প্রবন্ধাবলি। প্রথম খণ্ড (কলকাতা, ১৯০৪), পৃ. ১৫।
৩০। রজনীকান্ত গুপ্ত : প্রতিভা, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ১৪-১৫।
৩১। শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য : বিদ্যাসাগর-প্রবন্ধ (কলকাতা, ১৩০৫), পৃ. ৪৮-৫৪।
৩২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসাগরচরিত (কলকাতা, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫), পৃ. ৩০-৩১।
৩৩। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, 'মানসী ও মর্মবাণী', আশ্বিন, ১৩৩৩, পৃ. ১০৪।

এগারো

১। Education Department Consultation, 2 December 1858, No. 6.
২। Education Department Cousultation, 20 January 1859, No. 9.
৩। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, July 1862, Nos. 7 & 8.
৪। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, June, 1862, Nos. 141 & 142.
৫। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, July 1862, Nos. 5 & 6.
৬। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, July 1862, Nos. 3 & 4.
৭। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, July 1862, Nos. 15 & 16.
৮। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, July 1862, Nos. 17 & 18.
৯। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, July 1862, Nos. 36 & 37.
১০। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, September 1862, No. 71.
১১। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, September 1862, No. 72.
১২। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, September 1862, No. 73.
১৩। Subal Chandra Mitra: Isvar Chandra Vidyasagar, second edition, p. 173.
১৪। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, December 1862, No. 60.
১৫। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, April 1863, No. 25.
১৬। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, April 1863, No. 26.
১৭। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, April 1863, No. 29.

১৮। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, April 1863, Nos. 74-77.
১৯। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, July 1863, No. 167.
২০। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, July 1864, No. 15.
২১। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, July 1864, No. 18.
২২। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, August 1865, No. 58.
২৩। Subal Chandra Mitra: Isvar Chandra Vidyasagar, second edition, p. 190.
২৪। Subal Chandra Mitra: Isvar Chandra Vidyasagar, second edition, pp. 191-92.
২৫। Mary Carpenter: Six Months in India, Vol. I, (London, 1868), pp. 239-40.
২৬। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২০৭।
২৭। Subal Chandra Mitra: Isvar Chandra Vidyasagar, second edition, pp. 192-93.
২৮। Education Department Consultation, March 1868, No. A. 9.
২৯। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, October 1871, No. 4.
৩০। কৈলাসবাসিনী দেবী : হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা (কলকাতা, ১৮৬৩), পৃ. ৬৫।
৩১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২১৪।
৩২। Subal Chandra Mitra: Isvar Chandra Vidyasagar, second edition, p. 170.
৩৩। Proceedings of the Board of Revenue, L.R. II, April-June, 1864, Nos. 31 and 32.
৩৪। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Revenue Department, March 1865, No. 61.
৩৫। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Revenue Department, March 1866, No. 72.
৩৬। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৩৩-৩৪।
৩৭। Letter No. F. 3-61/67-R. 2 dated 3 February 1968 from Shri Sourin Roy, Dy. Director, National Archives of India, New Delhi, to Arabinda Guha.
৩৮। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৩৮১।
৩৯। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৩৮২।
৪০। Subal Chandra Mitra: Isvar Chandra Vidyasagar, second edition, p. 264.
৪১। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত : ইউরোপে বিদ্যাসাগরের কথা, 'দেশ', ২৫-ডিসেম্বর, ১৯৫৪, পৃ. ৫২৯-৩০।

৪২। শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য : প্রয়াস, নব সংস্করণ (কলকাতা, ১৯১০), পৃ. ৩০।
৪৩। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫৩৭।
৪৪। শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য : প্রয়াস, নব সংস্করণ (কলকাতা, ১৯১০), পৃ. ২৯।

বারো

১। রসিকলাল গুপ্ত : মহারাজ রাজবল্লভ সেন, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৯২-৯৫।
২। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৫৭।
৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৯৮-৯৯।
৪। নরেন্দ্রনাথ লাহা : সুবর্ণবণিক কথা ও কীর্তি, প্রথম খণ্ড, (কলকাতা, ১৯৪০), পৃ. ২৬।
৫। মন্মথনাথ ঘোষ : কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র (কলকাতা, ১৯২৬), পৃ. ১০৫-০৬।
৬। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৪৯।
৭। শিবনাথ শাস্ত্রী : পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'সখা', অক্টোবর, ১৮৮৫, পৃ. ১৫৭।
৮। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২২৭-২৮।
৯। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৫০।
১০। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : মা ও ছেলে, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৭৩-৭৫।
১১। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ২৪-২৫।
১২। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, 'মানসী ও মর্মবাণী', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬, পৃ. ৩৮৭-৯০।
১৩। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ১১১-১২।
১৪। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৫১-৫৪।
১৫। কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণঃ : বিনয়পত্রিকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৯-৩০।
১৬। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত : °দাশরথি রায় পাঁচালী, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ৬২৮-২৯।
১৭। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৯০-৯১।
১৮। রামগতি ন্যায়রত্ন : বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৯৮-৯৯।
১৯। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৬৬।
২০। কুমুদনাথ মল্লিক : নদীয়া-কাহিনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৭৯।
২১। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), পৃ. ৯১।
২২। Legislative paper of Act XV 1856, Vol. I+II (National Archives of India), p. 5.
২৩। রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় : °প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিতাবলী, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১০৭-০৮।

তেরো

১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২৬৫।
২। মন্মথনাথ ঘোষ : কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র (কলকাতা, ১৯২৬), পৃ. ১০৮-০৯।
৩। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৮৪-৮৬।
৪। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৮৯-৯০।
৫। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২৭০।
৬। রাজনারায়ণ বসু : আত্মচরিত, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৯৮-৯৯।
৭। যোগীন্দ্রনাথ বসু : অক্ষয়কুমার দত্ত, 'প্রবাসী', ফাল্গুন, ১৩১১, পৃ. ৫৭৭।
৮। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২৭৫-৭৬।
৯। রাজনারায়ণ বসু : আত্মচরিত, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৯৯-১০০।
১০। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, 'মানসী ও মর্মবাণী', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩, পৃ. ৩৮৭।
১১। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ১২৬।
১২। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৬৯।
১৩। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : শ্রুতি-স্মৃতি, প্রথম ভাগ (কলকাতা, ১৩৩৪), পৃ. ২৫।
১৪। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩৩৫।
১৫। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২৮৫।
১৬। নবকৃষ্ণ ঘোষ : প্যারীচরণ সরকার (কলকাতা, ১৯০২), পৃ. ২১৪-১৫।
১৭। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংকরণ, পৃ. ২৯০।
১৮। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২৯১-৯২।
১৯। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২৯৩।
২০। The Hindoo Patriot: 1 July, 1867.
২১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২৮৪।
২২। শিবনাথ শাস্ত্রী : প্রবন্ধাবলি। প্রথম খণ্ড। (কলকাতা, ১৯০৪), পৃ. ২১।
২৩। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, Appendix D, p. xix.
২৪। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, Appendix D, pp. xx-xxi.
২৫। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ৭৩।
২৬। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ২৯।
২৭। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ২০৯-১০।
২৮। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২৯৮-৯৯।

চোদ্দ

১। মন্মথনাথ ঘোষ : কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র, (কলকাতা, ১৯২৬), পৃ. ১০৭।
২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার (কলকাতা, ১৮৭১), বিজ্ঞাপন, পৃ. ১।
৩। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal during May 1866, General Department, No. 72.
৪। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal during May 1866, General Department, No. 72.

৫। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার (কলকাতা, ১৮৭১), বিজ্ঞাপন, পৃ. ২।
৬। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal during May 1866, General Department, No. 76.
৭। Proceedings of the Government of India, Home Department, Legislative, December 1863, No. 5.
৮। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal during May 1866, General Department, No. 74.
৯। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার (কলকাতা, ১৮৭১), বিজ্ঞাপন, পৃ. ২-৩।
১০। Proceedings of the Government of India, Home Department, Legislative, December 1863, No. 6.
১১। Proceedings of the Government of India, Home Department, Legislative, December 1863, No. 7.
১২। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal during May 1866, General Department, No. 73.
১৩। Proceedings of the Government of India, Home Department, Legislative, August 1866, No. 10.
১৪। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ১৪৯-৫৪।
১৫। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার (কলকাতা, ১৮৭১), পৃ. ৪৮।
১৬। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত : বিদ্যাসাগর চরিত স্বরচিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৩১।
১৭। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, General Department, May 1866, No. 75.
১৮। Proceedings of the Government of India, Home Department, Legislative, August 1866, No. 13.
১৯। Ram Gopal Sanyal: Reminiscences and Anecdotes of Great Men of India, Vol. II (Calcutta, 1895), p. 60.
২০। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, General Department, January 1867, No. 3.
২১। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal during August 1866, General Department, Nos. 38 & 39.
২২। Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal during September 1866, General Department, No. 31.
২৩। Proceedings of the Government of India, Home Department, Legislative, March 1867, p. 107.
২৪। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ২১৪।
২৫। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৩১৫-১৬।
২৬। সোমপ্রকাশ : ২৮-আগস্ট, ১৮৭১, পৃ. ৬৪৬-৪৭।
২৭। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার। দ্বিতীয় পুস্তক। (কলকাতা, ১৮৭৩), পৃ. ৩।

২৮। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, 'মানসী ও মর্মবাণী', আশ্বিন, ১৩৩৩, পৃ. ১০২-০৪।
২৯। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৫০-৫২।
৩০। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৭৪।
৩১। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৭৭-৭৯।
৩২। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৯৯-১০০।
৩৩। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৩২৮-২৯।
৩৪। R. W. Frazer: A Literary History of India (London, 1920), p. 413.

পনেরো

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-১৮, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ১১৬-১৭।
২। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), পৃ. ২১৩-১৪।
৩। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত : বিদ্যাসাগর-রচনাসম্ভার (কলকাতা, ১৯৫৭), পৃ. ১৵৹
৪। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য : আবার অতি অল্প হইল (কলকাতা, ১৮৮৪), পৃ. ৩৩-৩৪।
৫। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য : আবার অতি অল্প হইল (কলকাতা, ১৮৮৪), পৃ. ৫০।
৬। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য : ব্রজবিলাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৮-৪৯।
৭। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য : ব্রজবিলাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫৫-৫৬।
৮। কস্যচিৎ উপযুক্তভাইপোসহচরস্য : রত্নপরীক্ষা (কলকাতা, ১৮৮৬), পৃ. ১৫-১৬।
৯। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য : অতি অল্প হইল, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪।
১০। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য : আবার অতি অল্প হইল (কলকাতা, ১৮৮৪), পৃ. ৩৩।
১১। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য : ব্রজবিলাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, 'বিজ্ঞাপন', পৃ. ৪-৫।
১২। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য : ব্রজবিলাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩।
১৩। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য : ব্রজবিলাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, 'বিজ্ঞাপন', পৃ. ৬-৭।
১৪। কস্যচিৎ উপযুক্তভাইপোসহচরস্য : রত্নপরীক্ষা (কলকাতা, ১৮৮৬), 'বিজ্ঞাপন', পৃ. ৫।
১৫। কস্যচিৎ উপযুক্তভাইপোসহচরস্য : রত্নপরীক্ষা (কলকাতা, ১৮৮৬), পৃ. ২৯-৩০।
১৬। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোসহচরস্য : রত্নপরীক্ষা (কলকাতা, ১৮৮৬), পৃ. ৭৬-৮০।
১৭। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোসহচরস্য : রত্নপরীক্ষা (কলকাতা, ১৮৮৬), পৃ. ৮০-৮৪।

১৮। বিপিনবিহারী গ্‌্প্ত : প্‌রাতন প্রস্‌গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), প্‌. ২১৪।
১৯। দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী : স্মৃতি-রেখা (কলকাতা, ১৩৪০), প্‌. ১৪৮-৪৯।
২০। ক্ষ্‌দিরাম বস্‌ : বিদ্যাসাগর-স্মৃতি, 'পঞ্চ-প্‌ষ্প', আষাঢ়, ১৩৩৬, প্‌. ২৮৯-৯০।
২১। বিপিনবিহারী গ্‌্প্ত : প্‌রাতন প্রস্‌গ, দ্বিতীয় পর্যায় (কলকাতা, ১৩৩০), প্‌. ৭৫।
২২। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর-প্রস্‌গ (কলকাতা, ১৩৩৮) ভূমিকা, প্‌. ২১।
২৩। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, প্‌. ৪৩১।
২৪। বিপিনবিহারী গ্‌্প্ত : প্‌রাতন প্রস্‌গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), প্‌. ৪৯।
২৫। Subal Chandra Mitra: Isvar Chandra Vidyasagar, second edition, p. 90.
২৬। বিপিনবিহারী গ্‌্প্ত : প্‌রাতন প্রস্‌গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), প্‌. ৫২।
২৭। পরিমল গোস্বামী : স্মৃতিচিত্রণ (কলকাতা, ১৯৫৮), প্‌. ১০৫।
২৮। বিপিনবিহারী গ্‌্প্ত : প্‌রাতন প্রস্‌গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), প্‌. ২২০-২১।
২৯। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, প্‌. ৪৩৫-৩৬।
৩০। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : শ্র্‌তি-স্মৃতি, প্রথম ভাগ (কলকাতা, ১৩৩৪), প্‌. ২৬।
৩১। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : শ্র্‌তি-স্মৃতি, প্রথম ভাগ (কলকাতা, ১৩৩৪), প্‌. ৯৩-৯৪।
৩২। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, প্‌. ৪৭৮।
৩৩। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতন্‌ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (কলকাতা, ১৯০৪), প্‌. ২০১-০২।
৩৪। বিপিনবিহারী গ্‌্প্ত : প্‌রাতন প্রস্‌গ, দ্বিতীয় পর্যায় (কলকাতা, ১৩৩০), প্‌. ৩৫-৩৬।
৩৫। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : বঙ্গের রত্নমালা, দ্বিতীয় ভাগ (কলকাতা, ১৩১৯), প্‌. ১০৩-০৬।
৩৬। বিপিনবিহারী গ্‌্প্ত : প্‌রাতন প্রস্‌গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), প্‌. ৪৭-৪৮।
৩৭। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, প্‌. ৫৫৬-৫৭।
৩৮। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : শ্র্‌তি-স্মৃতি, প্রথম ভাগ (কলকাতা, ১৩৩৪), প্‌. ৯৪।
৩৯। বিপিনবিহারী গ্‌্প্ত : প্‌রাতন প্রস্‌গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), প্‌. ২১৫।
৪০। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, প্‌. ৩৯৯।
৪১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর-প্রস্‌গ (কলকাতা, ১৩৩৮), ভূমিকা, প্‌. ১৩-১৬।
৪২। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, প্‌. ৪৭০-৭১।
৪৩। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, প্‌. ৪৭০।
৪৪। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, প্‌. ৪৭৮।
৪৫। বিপিনবিহারী গ্‌্প্ত : প্‌রাতন প্রস্‌গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), প্‌. ২১৬।

৪৬। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫১৫-১৭।
৪৭। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : শ্রুতি-স্মৃতি, প্রথম ভাগ (কলকাতা, ১৩৩৪), পৃ. ১৪।
৪৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস (কলকাতা, ১২৯৫), পৃ. ৬-৮।

ষোলো

১। শিবনাথ শাস্ত্রী : প্রবন্ধাবলি। প্রথম খণ্ড। (কলকাতা, ১৯০৪), পৃ. ৯।
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসাগরচরিত (কলকাতা, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫), পৃ. ৭৩-৭৪।
৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ (কলকাতা, ১৩৩৮), ভূমিকা, পৃ. ১৩-১৮।
৪। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, Appendix C, pp. xv-xvi.
৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসাগরচরিত (কলকাতা, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫), পৃ. ৪৪-৪৫।
৬। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ১৩৭।
৭। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৩৭০-৭১।
৮। সরযূবালা দেবী : বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন, 'ব্রহ্মবিদ্যা', ভাদ্র, ১৩২৭, পৃ. ২৩৬।
৯। যোগেন্দ্রনাথ শর্মা : বীর-পূজা, 'নব্যভারত', ভাদ্র, ১২৯৮, পৃ. ২৬২।
১০। সতীনাথ রায় : স্মৃতি-কথা, Centenary Souvenir, 1859-1959, Vidyasagar College, পৃ. ১।
১১। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : সমিত্র সারদারঞ্জন ও বিদ্যাসাগর কলেজ, The Vidyasagar College Magazine, March 1926, পৃ. ১০২।
১২। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৫৪-৫৫।
১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসাগরচরিত (কলকাতা, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫) পৃ. ৩৬।
১৪। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৩৭১।
১৫। Nagendranath Gupta: Seven Noble Lives (Bombay, 1950), pp. 25-26.
১৬। ব্রজমোহন দাশ সম্পাদিত : জলধর-কথা (কলকাতা, ১৩৪১), পৃ. ১২৫-২৯।
১৭। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : শ্রুতি-স্মৃতি, প্রথম ভাগ (কলকাতা, ১৩৩৪), পৃ. ৯২।
১৮। দীনেশচন্দ্র সেন : ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য (কলকাতা, ১৩২৯), পৃ. ২৩০-৩৩।
১৯। The Vidyasagar College Magazine, September 1925, পৃ. ২০।
২০। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : সমিত্র সারদারঞ্জন ও বিদ্যাসাগর কলেজ, The Vidyasagar College Magazine, March 1926, পৃ. ৯৬।
২১। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : সমিত্র সারদারঞ্জন ও বিদ্যাসাগর কলেজ, The Vidyasagar College Magazine, March 1926, পৃ. ১০৬।
২২। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : সমিত্র সারদারঞ্জন ও বিদ্যাসাগর কলেজ, The Vidyasagar College Magazine, March 1926, পৃ. ৯৮।
২৩। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : সমিত্র সারদারঞ্জন ও বিদ্যাসাগর কলেজ, The Vidyasagar College Magazine, March 1926, পৃ. ৯৭।
২৪। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : সমিত্র সারদারঞ্জন ও বিদ্যাসাগর কলেজ, The Vidyasagar College Magazine, March 1926, পৃ. ১০২।

২৫। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : সমিত্র সারদারঞ্জন ও বিদ্যাসাগর কলেজ, The Vidyasagar College Magazine, March 1926, পৃ. ৯৭।
২৬। যতীন্দ্রমোহন ঘোষ : পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কতিপয় অপ্রকাশিত গল্প, 'বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা', আশ্বিন, ১৩৬০, পৃ. ৩১।
২৭। সরযূবালা দেবী : বিচিত্র স্বপ্ন দর্শন, 'ব্রহ্মবিদ্যা', ভাদ্র, ১৩২৭, পৃ. ২৩৫।
২৮। যতীন্দ্রমোহন ঘোষ : পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কতিপয় অপ্রকাশিত গল্প, 'বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা', আশ্বিন, ১৩৬০, পৃ. ৩১।
২৯। যতীন্দ্রমোহন ঘোষ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কতিপয় অপ্রকাশিত গল্প, 'বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা', আশ্বিন, ১৩৬১, পৃ. ৬৮-৬৯।
৩০। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : সমিত্র সারদারঞ্জন ও বিদ্যাসাগর কলেজ, The Vidyasagar College Magazine, March 1926, পৃ. ৯৮।
৩১। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩৬৬-৬৭।
৩২। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২১৩-১৪।
৩৩। শরৎকুমার মিত্র : পূর্বস্মৃতি, 'বসুধারা', কার্তিক, ১৩৬৬, পৃ. ১২৮-২৯।
৩৪। প্রমথনাথ বসু : স্বামী বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড (কলকাতা, ১৯১৯), পৃ. ৫১-৫২।
৩৫। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩৬৫।
৩৬। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩৬৬।
৩৭। সুবিমল রায় : ছোট ছোট ঘটনা, 'সন্দেশ', সেপ্টেম্বর, ১৯৬১, পৃ. ২৮৯।
৩৮। Nagendranath Gupta: Seven Noble Lives (Bombay, 1950), pp. 26-27.
৩৯। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : শ্রুতি-স্মৃতি, প্রথম ভাগ (কলকাতা, ১৩৩৪), পৃ. ৯৮।
৪০। Upendra Chandra Banerjee: Reminiscences, Speeches and Writings of Sir Gooroo Dass Banerjee (Calcutta, 1927), p 383.
৪১। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি : বঙ্কিম-প্রসঙ্গ (কলকাতা, ১৯২১), পৃ. ৩১৯-২০।
৪২। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্যায় (কলকাতা, ১৩৩০), পৃ. ১৭৩।
৪৩। বিপিনচন্দ্র পাল : সত্তর বৎসর (কলকাতা, ১৯৬২), পৃ. ১৮৫।
৪৪। ক্ষুদিরাম বসু : বিদ্যাসাগর-স্মৃতি, 'পঞ্চ-পুষ্প', আষাঢ়, ১৩৩৬, পৃ. ২৯২।
৪৫। শশিভূষণ বসু : বিদ্যাসাগর-স্মৃতি, 'প্রবাসী', শ্রাবণ, ১৩৪৩, পৃ. ৫৪৯।
৪৬। শরৎকুমার লাহিড়ী : বিদ্যাসাগর-কথা, 'প্রবাসী', ভাদ্র, ১৩১৭, পৃ. ৪১২-১৪।
৪৭। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : সমিত্র সারদারঞ্জন ও বিদ্যাসাগর কলেজ, The Vidyasagar College Magazine, March 1926, পৃ. ১১০-১১।

সতেরো

১। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), পৃ. ৭৮।
২। যোগীন্দ্রনাথ বসু : মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ৫৫৫-৫৬।
৩। নগেন্দ্রনাথ সোম : মধু-স্মৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৬৫১-৫২।
৪। নগেন্দ্রনাথ সোম : মধু-স্মৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩১৪-১৫।

৫। নগেন্দ্রনাথ সোম : মধু-স্মৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩১৭-১৮।
৬। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৮৬-৮৭।
৭। নগেন্দ্রনাথ সোম : মধু-স্মৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩৩৫।
৮। ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত : মাইকেল ও বিদ্যাসাগর, 'দেশ', ২৮ জানুয়ারি ১৯৫৬, পৃ. ৯৬৮।
৯। নগেন্দ্রনাথ সোম : মধু-স্মৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩৭৬।
১০। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩৪২-৪৩।
১১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৮৯।
১২। গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : মাইকেল ও বিদ্যাসাগর, 'ভারতবর্ষ', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮, পৃ. ৯৭০-৭১। (দ্রষ্টব্য—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : মধুসূদন দত্ত, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-২৩, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৮৭।)
১৩। Subal Chandra Mitra: Isvar Chandra Vidyasagar, second edition, p. 163.
১৪। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন : সেকালের সংস্কৃত কলেজ, 'প্রবাসী', ভাদ্র, ১৩৩২, পৃ. ৬৪৭।
১৫। P. C. Mozoomdar: The Life and Teachings of Keshub Chunder Sen, third edition, p. 76.
১৬। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্যায় (কলকাতা, ১৩৩০), পৃ. ১৩১।
১৭। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত : বিদ্যাসাগর-রচনাসম্ভার (কলকাতা, ১৯৫৭), পৃ. ৯।
১৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসাগরচরিত (কলকাতা, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫), পৃ. ৮৩।
১৯। নগেন্দ্রনাথ সোম : মধু-স্মৃতি, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৬০৮-০৯।
২০। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৮৯।

আঠারো

১। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ১৬৩-৬৫।
২। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ১৮৭-৮৮।
৩। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪২৩।
৪। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৩৪-৩৫।
৫। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ২১৮।
৬। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৪৭-৪৮।
৭। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ২২৬-২৭।
৮। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ৪০।
৯। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪০৪-০৫।
১০। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ৫৯।
১১। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ২০৩।
১২। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ৫৭-৫৮।
১৩। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ২৮।
১৪। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪২১।
১৫। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকতা, ১৮৯৫), পৃ. ৫৮।

১৬। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪১২।
১৭। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ৫৭।
১৮। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪১৬।
১৯। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ৬৯।
২০। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪১৩-১৪।
২১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪১৪-১৫।
২২। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪১৬।
২৩। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪২৯-৩০।
২৪। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪১৬-১৭।
২৫। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪১৮-১৯।
২৬। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৫০।
২৭। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪২১।
২৮। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫১৪-১৫।
২৯। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪২২-২৬।
৩০। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৩৩।
৩১। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫১৪।
৩২। ক্ষুদিরাম বসু : বিদ্যাসাগর-স্মৃতি, 'পঞ্চপুষ্প', আষাঢ়, ১৩৩৬, পৃ. ২৯৫।
৩৩। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ২৩৯-৪০।
৩৪। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৩২-৩৪।
৩৫। 'মাসিক বসুমতী' : আষাঢ়, ১৩৭৩, পৃ. ৪০০-০১।
৩৬। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫১৭।
৩৭। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৫০।

ঊনিশ

১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৫৭।
২। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩১৩-১৪।
৩। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য : আবার অতি অল্প হইল (কলকাতা, ১৮৮৪), পৃ. ৪-৫।
৪। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৫৯।
৫। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য : আবার অতি অল্প হইল (কলকাতা, ১৮৮৪), পৃ. ৬।
৬। ক্ষুদিরাম বসু : বিদ্যাসাগর-স্মৃতি, 'পঞ্চ-পুষ্প', আষাঢ়, ১৩৩৬, পৃ. ২৯৪।
৭। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : ভ্রান্তিবিলাস, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫০-৫১। 'ভ্রান্তিবিলাস' বিদেশী রচনা অবলম্বনে লিখিত, কিন্তু আলোচ্য অংশে বিদ্যাসাগর মূল রচনাকে অনেকখানি অতিক্রম করেছেন।
৮। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫১৮।
৯। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ পৃ. ৩৯৯।
১০। C. E. Buckland: Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. II, second edition, p. 1035.

১১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-১৮, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ১২৮।
১২। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ১৬০-৬১।
১৩। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫০৭-১০।
১৪। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৩৭৪।
১৫। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), পৃ. ২২১।
১৬। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫১৮।
১৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসাগরচরিত (কলকাতা, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫), পৃ. ৭৪-৭৫।
১৮। 'সাহিত্য', জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬, পৃ. ১৪৬।
১৯। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫৫৫-৫৬।
২০। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : স্মৃতি-স্মৃতি, প্রথম ভাগ (কলকাতা, ১৩৩৪), পৃ. ২৩-২৪।
২১। ক্ষুদিরাম বসু : বিদ্যাসাগর-স্মৃতি, 'পঞ্চ-পুষ্প', আষাঢ়, ১৩৩৬, পৃ. ২৯৪।
২২। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), পৃ. ২২১-২২।
২৩। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : স্মৃতি-স্মৃতি, প্রথম ভাগ (কলকাতা, ১৩৩৪), পৃ. ২৩।
২৪। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৯৯।
২৫। ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, 'মানসী', ভাদ্র, ১৩১৮, পৃ. ৪১৯।
২৬। নগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত : বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা, ১২৯৮), পৃ. ৩০৫।
২৭। ক্ষুদিরাম বসু : বিদ্যাসাগর-স্মৃতি, 'পঞ্চ-পুষ্প', আষাঢ়, ১৩৩৬, পৃ. ২৯৪।
২৮। রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার থেকে প্রকাশিত ও বিতরিত : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (কলকাতা, ১২৯৮), পৃ. ৮-১০।
২৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ (কলকাতা, ১৩৩৮), ভূমিকা, পৃ. ৯-১২।
৩০। শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য : প্রয়াস, নব সংস্করণ (কলকাতা, ১৯১০), পৃ. ৪৬-৪৭।

কুড়ি

১। K. P. Chattopadhyay: Vidyasagar—In homage to his Memory, 'Centenary Souvenir, 1859-1959, Vidyasagar College', pp. 8-9.
২। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ৭৬-৮২।
৩। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ৮৫।
৪-৬৩। বিদ্যাসাগরের ষষ্ঠ সহোদর ঈশানচন্দ্রের পুত্র ডাঃ পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
৬৪। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ৬২-৬৩।
৬৫। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ৩৫।
৬৬। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ৪৩।
৬৭। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ৪৪।
৬৮। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ৪৫।

৬৯। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ৪৫-৪৬।
৭০। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ৪৭-৪৮।
৭১। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ৪৮-৪৯।
৭২। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ৬০।
৭৩। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ৬০।
৭৪। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ৬১।
৭৫। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ৬১।
৭৬। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ৬২।
৭৭। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ৬৩।
৭৮। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : ভ্রমনিরাস (কলকাতা, ১৮৯৫), পৃ. ৬৪।
৭৯-৮১। বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
৮২-৮৪। বিদ্যাসাগরের ষষ্ঠ সহোদর ঈশানচন্দ্রের পুত্র ডাঃ পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
৮৫। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪২৬-২৭।
৮৬। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪২৮-২৯।
৮৭। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪২৯।
৮৮। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৩০।
৮৯। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
৯০। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪২৭।
৯১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪২৭-২৮।
৯২। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৩১।
৯৩। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৩০-৩১।
৯৪-১০১। Report of the Regional Records Survey Committee for West Bengal (1959-60).
১০২। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৫৭-৫৮।
১০৩। 'অনুশীলন', ফাল্গুন, ১৩০১ সন, পৃ. ২৩৩।
১০৪। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২৭৬-৭৭।
১০৫। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৬৩।
১০৬। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫৩০।
১০৭। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৬৪-৬৫।
১০৮। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৬৫।
১০৯। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪০৪-০৫।
১১০। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৫৬-৫৭।
১১১। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপ্রকাশিত ও বিধবাবিবাহের প্রথম পাতি, 'নব্যভারত', কার্তিক, ১৩১৪, পৃ. ৩৭৩-৭৪।
১১২। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২১৪-১৫।
১১৩। মণিলাল সিংহ রায় : স্মৃতি-পূজা (কলকাতা, ১৯৫০), পৃ. ১৬।
১১৪। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২৮৫-৮৬।
১১৫। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫১৩।
১১৬। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৩৪৭।
১১৭। শ্রীসুকুমার সেন : বিদ্যাসাগরের 'অপূর্ব্ব ইতিহাস', 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৬৭ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, ১৩৬৭, পৃ. ১৬৫।

১১৮। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৩৮-৩৯।
১১৯। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৬৬-৬৭।
১২০। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৯৮।
১২১। 'সোমপ্রকাশ' : ১৩ ভাদ্র, ১২৭৮ (২৮ আগস্ট, ১৮৭১), পৃ. ৬৪৩-৪৪।

একুশ

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসাগরচরিত (কলকাতা, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫), পৃ. ৮২।
২। Suniti Kumar Chatterji: The Origin and Development of the Bengali Language, Part I (Calcutta, 1926), 'Introduction', pp. 105-09.
৩। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ব্রিটিশ-মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজ-পত্র, 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', সন ১৩২৯, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১১২।
৪। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ব্রিটিশ-মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজ-পত্র, 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', সন ১৩২৯, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১২১।
৫। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত : ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ (কলকাতা, ১৯৩৭), পৃ. ৫৩।
৬। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত : ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ (কলকাতা, ১৯৩৭), 'প্রস্তাবক', পৃ. ২৷৶৹
৭। সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত : কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা-১২ (কলকাতা, ১৩৪৬), পৃ. ২৯৩।
৮। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন : পাদ্রি মনোএল্-দা-আসসুম্প্সাম্-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ (কলকাতা, ১৯৩১), 'প্রবেশক', পৃ. ১৷৹
৯। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন : পাদ্রি মনোএল্-দা-আসসুম্প্সাম্-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ (কলকাতা, ১৯৩১), 'প্রবেশক', পৃ. ৸৶৹
১০। সজনীকান্ত দাস : বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস (কলকাতা, ১৩৬৯), পৃ. ৩২।
১১। Sushil Kumar De: Bengali Literature in the Nineteenth Century, second edition, p. 141.
১২। Ramcomul Sen: A Dictionary in English and Bengalee, Vol. I (Calcutta, 1834), 'Preface', p. 14.
১৩। প্রমথ চৌধুরী : প্রবন্ধসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড (কলকাতা, ১৯৫২), পৃ. ৭৬।
১৪। J. C. Marshman: The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward, Vol. I (London, 1859), p. 180.
১৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩, চতুর্থ মুদ্রণ, পৃ. ৩৬।
১৬। John Gilchrist: The Oriental Fabulist (Calcutta, 1803), pp. 17-18.
১৭। Eustace Carey: Memoir of William Carey, D. D. (London, 1836), p. 596.
১৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : রামমোহন রায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা-১৬, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ৭১।

১৯। প্রমথ চৌধুরী : প্রবন্ধসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড (কলকাতা, ১৯৫২), পৃ. ৩২৪।
২০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাময়িক-পত্র (কলকাতা, ১৩৪৬), 'নিবেদন'।
২১। Sisirkumar Das: Early Bengali Prose (Calcutta, 1966), p. 169.
২২। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৭৩।
২৩। দীনবন্ধু মিত্র : নীলদর্পণ (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫১), পৃ. ২১।

বাইশ

১। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), পৃ. ১৩৫।
২। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৭৭-৭৮।
৩। শ্রীসুকুমার সেন : বিচিত্র নিবন্ধ (কলকাতা, ১৯৬১), পৃ. ২৩৩।
৪। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৮৬-৮৭।
৫। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), পৃ. ৪৯-৫০।
৬। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য : আবার অতি অল্প হইল (কলকাতা, ১৮৮৪), পৃ. ৫৭।
৭। কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : সমিত্র সারদারঞ্জন ও বিদ্যাসাগর কলেজ, The Vidyasagar College Magazine, March, 1926, পৃ. ১০৪-০৫।
৮। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১২০-২১।
৯। শ্রীসুকুমার সেন : বিচিত্র নিবন্ধ (কলকাতা, ১৯৬১), পৃ. ২৩২।
১০। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন : সেকালের সংস্কৃত কলেজ, 'প্রবাসী', ভাদ্র, ১৩৩২, পৃ. ৬৫০।
১১। রামগতি ন্যায়রত্ন : বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৯৭।
১২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : শ্লোকমঞ্জরী (কলকাতা, ১৮৯০) 'বিজ্ঞাপন', পৃ. ৶০-।০
১৩। রাজনারায়ণ বসু : বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা (কলকাতা, ১৮৭৮), পৃ. ২৬।
১৪। রামগতি ন্যায়রত্ন : বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৫৮।
১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসাগরচরিত (কলকাতা, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫), পৃ. ৮-৯।
১৬। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস : বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী, সাহিত্য (কলকাতা, ১৩৪৪), ভূমিকা, ।৵০-॥০
১৭। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস : বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী, সাহিত্য (কলকাতা, ১৩৪৪), ভূমিকা, ।৵০
১৮। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫৩৯।
১৯। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : °ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাহিত্য', বৈশাখ, ১৩১৮, পৃ. ৬৫।
২০। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ২৪।
২১। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), পৃ. ৫০।

২২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : ভ্রান্তিবিলাস, তৃতীয় সংস্করণ, 'বিজ্ঞাপন', পৃ. ৩।
২৩। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৭০।
২৪। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়: বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ১৭৯।
২৫। নবকৃষ্ণ ঘোষ : প্যারীচরণ সরকার (কলকাতা, ১৯০২), পৃ. ৮৩-৮৪।
২৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসাগরচরিত (কলকাতা, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫), পৃ. ২৬-২৮।
২৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনস্মৃতি (কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৬২), পৃ. ৩।
২৮। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর, 'ভারতী', অগ্রহায়ণ, ১৩০২, পৃ. ৪১৯-২০।
২৯। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : শ্রুতি-স্মৃতি, প্রথম ভাগ (কলকাতা, ১৩৩৪), পৃ. ৯৫-৯৬।
৩০। স্বামী নির্লেপানন্দ : স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন (কলকাতা, ১৩৭৪), পৃ. ১৯।
৩১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পুনর্মুদ্রিত প্রথম সংস্করণ (কলকাতা, ১৯৬৩), পৃ. ৪০৫।
৩২। The Complete Works of Sister Nivedita, Vol. I (Calcutta, 1967), p. 378.

তেইশ

১। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২০৮।
২। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ১৮৮।
৩। আশুতোষ ধর : স্বর্গীয় পণ্ডিত কালীময় ঘটকের জীবনী (কলকাতা, ১৯০১), পৃ. ৭-৮।
৪। কালীপ্রসন্ন সিংহ : মহাভারত, তৃতীয় খণ্ড (কলকাতা, ১৩৩২), 'অষ্টাদশ পর্ব্ব অনুবাদের উপসংহার', পৃ. ১-২।
৫। গৌরহরি সেন : সার গুরুদাসের জীবন-স্মৃতি, 'মানসী', অগ্রহায়ণ, ১৩২০, পৃ. ১০৬৮।
৬। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), পৃ. ৮০।
৭। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), পৃ. ৭৯।
৮। রামগতি ন্যায়রত্ন : বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৯৮।
৯। R. W. Frazer: A Literary History of India (London, 1920), p. 412.
১০। J. F. Blumhardt: A Supplementary Catalogue of Bengali Books in the Library of the British Museum (London, 1910), p. 104.
১১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ (কলকাতা, ১৩৩৮), ভূমিকা, পৃ. ২০-২১।
১২। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ১৮৫।
১৩। লুপ্তরত্নোদ্ধার বা °প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলী (কলকাতা, ১৩২০), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত ভূমিকা, পৃ. ৵০

১৪। আনন্দবাজার পত্রিকা : রবিবাসরীয় আলোচনী, ১৩-নভেম্বর, ১৯৬০।

১৫। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪১৪-১৫।

১৬। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪১৩-১৪।

১৭। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : ভ্রান্তিবিলাস, 'বিজ্ঞাপন'।

১৮। রামগতি ন্যায়রত্ন : বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ২০০।

১৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসাগরচরিত (কলকাতা, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫), পৃ. ৮২-৮৩।

২০। ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা : বেতাল পঞ্চবিংশতি, দশম সংস্করণ, 'বিজ্ঞাপন'।

২১। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৭১-৭২।

২২। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন : সেকালের সংস্কৃত কলেজ, 'প্রবাসী', আশ্বিন, ১৩৩২, পৃ. ৮৯০।

২৩। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, 'আর্যাবর্ত', মাঘ ১৩২০, পৃ. ৯০৯।

২৪। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন : সেকালের সংস্কৃত কলেজ, 'প্রবাসী', আশ্বিন, ১৩৩২, পৃ. ৮৯১।

২৫। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ : কবিবর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও তদ্-গ্রন্থসমালোচনা (কলকাতা, সম্বৎ ১৯২৮), পৃ. ৩১-৩২।

২৬। শিবনাথ শাস্ত্রী : আত্মচরিত, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১২০-২১।

২৭। শ্রীসুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ২৪-২৫।

২৮। শ্রীসুকুমার সেন : বিদ্যাসাগরের 'অপূর্ব' ইতিহাস', 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৬৭ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, ১৩৬৭, পৃ. ১৬১।

২৯। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), পৃ. ৫০-৫১।

৩০। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, 'আর্য্যাবর্ত্ত', মাঘ, ১৩২০, পৃ. ৯০৯।

৩১। চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ১৮৬-৮৭।

৩২। দেবকুমার বসু সম্পাদিত : বিদ্যাসাগর রচনাবলী, প্রথম খণ্ড (কলকাতা, ১৯৬৬), ভূমিকা, পৃ. ৩৫।

৩৩। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৮০।

৩৪। কর্নেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর : ত্রিপুরায় বঙ্গভাষা, 'রবি', আশ্বিন, ১৩৩৪ ত্রিপুরাব্দ, পৃ. ১২০।

চব্বিশ

১। 'সাধনা', অগ্রহায়ণ, ১২৯৮, পৃ. ৯২।

২। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত : বিদ্যাসাগর-রচনাসম্ভার (কলকাতা, ১৯৫৭), পৃ. ৯।

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসাগরচরিত (কলকাতা, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫), পৃ. ৮৩-৮৪।

৪। রাজনারায়ণ বসু : বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা (কলকাতা, ১৮৭৮), পৃ. ২৫-২৬।

৫। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস : অক্ষয়-চরিত (কলকাতা, ১২৯৪), পৃ. ২১।

৬। নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস : অক্ষয়-চরিত (কলকাতা, ১২৯৪), পৃ. ২১-২৩।

৭। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী (কলকাতা, ১৯০৯), পৃ. ১১।

৮। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৮২।

৯। Sivanath Sastri: Men I have Seen (Calcutta, 1919), pp. 29-31.

১০। রামগোপাল সান্যাল : কৃষ্ণদাস পালের জীবনী (কলকাতা, ১৮৯০), পৃ. ২৭-৩০।
১১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ (কলকাতা, ১৩৩৮), ভূমিকা, পৃ. ৪।
১২। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : শ্রুতি-স্মৃতি, প্রথম ভাগ (কলকাতা, ১৩৩৪), পৃ. ৯২।
১৩। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪১৯।
১৪। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস (কলকাতা, ১২৯৫), পৃ. ১২।
১৫। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : শ্রুতি-স্মৃতি, প্রথম ভাগ (কলকাতা, ১৩৩৪), পৃ. ৯৯।
১৬। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : শ্রুতি-স্মৃতি, প্রথম ভাগ (কলকাতা, ১৩৩৪), পৃ. ৯৬-৯৭।
১৭। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন : সেকালের সংস্কৃত কলেজ, 'প্রবাসী', আশ্বিন, ১৩৩২, পৃ. ৮৯৬।
১৮। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন : গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবনচরিত (কলকাতা, ১৯০৯), পৃ. ৩৭-৩৮।
১৯। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন : গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবনচরিত (কলকাতা, ১৯০৯), পৃ. ৪৮-৫০।
২০। হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন : গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবনচরিত (কলকাতা, ১৯০৯), পৃ. ৫৫।
২১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ১৮৯-৯০।
২২। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ১৯০।

পঁচিশ

১। শ্রীম : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ (কলকাতা, ১৩৬০), পৃ. ৩৮৫-৮৬।
২। শ্রীম : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ (কলকাতা, ১৩৬০), পৃ. ৩৮৬।
৩। শিবনাথ শাস্ত্রী : প্রবন্ধাবলি। প্রথম খণ্ড। (কলকাতা, ১৯০৪), পৃ. ৮।
৪। শ্রীম : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পঞ্চম ভাগ (কলকাতা, ১৩৬১), পৃ. ৩৫-৩৬।
৫। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, 'আর্য্যাবর্ত্ত', মাঘ, ১৩২০, পৃ. ৯০৭।
৬। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫৪০-৪১।
৭। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫৩৯।
৮। শ্রীম : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ (কলকাতা, ১৩৬০), পৃ. ৩৮৫।
৯। শশিভূষণ বসু : বিদ্যাসাগর-স্মৃতি, 'প্রবাসী', শ্রাবণ, ১৩৪৩, পৃ. ৫৪৮-৪৯।
১০। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), পৃ. ২২৮।
১১। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্যায় (কলকাতা, ১৩৩০), পৃ. ১৯৮-৯৯।
১২। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১২৭।
১৩। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ২৪১।
১৪। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫৪২-৪৩।
১৫। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত : বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী, শিক্ষা ও বিবিধ (কলকাতা, ১৩৪৬), পৃ. ১৬০।
১৬। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫৩৪।
১৭। রমেশচন্দ্র দত্ত : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'নব্যভারত', ভাদ্র, ১২৯৮, পৃ. ২৪৭।
১৮। বিপিনবিহারী গুপ্ত : পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (কলকাতা, ১৩২০), পৃ. ২২৯।

১৯। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ : রামেন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা, ১৩৫৬), পৃ. ১৯১।
২০। শশিভূষণ বসু : বিদ্যাসাগর-স্মৃতি, 'প্রবাসী', শ্রাবণ, ১৩৪৩, পৃ. ৫৪৯।
২১। ক্ষুদিরাম বসু : বিদ্যাসাগর-স্মৃতি, 'পঞ্চপুষ্প', আষাঢ়, ১৩৩৬, পৃ. ২৯৫।
২২। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৩১০-১১।
২৩। ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ, 'নবোদয়', বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা, প্রথম বর্ষ (১৩৬২), পৃ. ৭৭-৭৮।
২৪। Sivanath Sastri: Men I have seen (Calcutta, 1919), pp. 27-29.
২৫। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৩৯।
২৬। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৯৭।
২৭। শশিভূষণ বসু : বিদ্যাসাগর-স্মৃতি, 'প্রবাসী', শ্রাবণ, ১৩৪৩, পৃ. ৫৪৮।
২৮। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৬৯-৭০।
২৯। মণিলাল সিংহ রায় : স্মৃতি-পূজা (কলকাতা, ১৯৫০), পৃ. ৮-১০।
৩০। শ্রীম : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, তৃতীয় ভাগ (কলকাতা, ১৩৬০) পৃ. ১-২৪।
৩১। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ৩৪।
৩২। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৩৯২।
৩৩। প্রিয়দর্শন হালদার : বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবী, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৪১-৪৩।
৩৪। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৩৯৮-৯৯।
৩৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসাগরচরিত (কলকাতা, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫), পৃ. ২১-২২।
৩৬। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ১৯৭।
৩৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসাগরচরিত (কলকাতা, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫), পৃ. ২৩।
৩৮। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৩৯৫-৯৬।
৩৯। প্রিয়দর্শন হালদার : বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবী, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৭৫-৭৬।
৪০। শিবনাথ শাস্ত্রী : আত্মচরিত, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৪১-৪২।
৪১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : মা ও ছেলে, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৭৫-৭৬।
৪২। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৯১।
৪৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসাগরচরিত (কলকাতা, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫), পৃ. ২১।
৪৪। প্রিয়দর্শন হালদার : বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবী, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৫১।
৪৫। প্রিয়দর্শন হালদার : বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবী, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১১২-১৩।
৪৬। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৩৯৪-৯৫।
৪৭। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৬২।
৪৮। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৩৮-৩৯।
৪৯। প্রিয়দর্শন হালদার : বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবী, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৩৭।
৫০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসাগরচরিত (কলকাতা, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫), পৃ. ২২-২৩।
৫১। প্রিয়দর্শন হালদার : বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবী, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৪১।
৫২। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৩৭।
৫৩। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ২২৩।
৫৪। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৩৭-৩৮।

৫৫। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২০৭-০৮।
৫৬। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : মা ও ছেলে, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৭৭।
৫৭। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ২২২-২৩।
৫৮। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৪২-৪৩।
৫৯। রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় : প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিতাবলী, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১১৪।
৬০। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ২২৯-৩০।
৬১। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫২৮।
৬২। মণিলাল সিংহ রায় : স্মৃতি-পূজা (কলকাতা, ১৯৫০), পৃ. ২-৭।
৬৩। মণিলাল সিংহ রায় : স্মৃতি-পূজা (কলকাতা, ১৯৫০), পৃ. ১০-১১।
৬৪। মণিলাল সিংহ রায় : স্মৃতি-পূজা (কলকাতা, ১৯৫০), পৃ. ১৬।
৬৫। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ (কলকাতা, ১৩৩৮), ভূমিকা, পৃ. ২২-২৫।
৬৬। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ২৪৭-৫০।
৬৭। বিহারীলাল সরকার : বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৫২৮-২৯।
৬৮। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী : শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ, তৃতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ৫৫।
৬৯। বামাবোধিনী কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত : স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিয়োগে শোকোচ্ছ্বাস (কলকাতা, ১৮৯১), পৃ. ১-৪।
৭০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসাগরচরিত (কলকাতা, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬৫), পৃ. ৫১।

পরিশিষ্ট

১

বিদ্যাসাগর, ১৮৪৭ সালের ৩-মে, পদত্যাগের কারণ সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্তকে একখানা চিঠিতে সবিস্তারে জানিয়েছেন :

"To

Baboo Russomoy Dutt,

Secretary to the Sanscrit College.

Sir,

Agreeably to your instructions dated 21 April, I now beg to submit my reasons for tendering the resignation of my appointment.

I studied the Sanscrit Language and Literature in the Government Sanscrit College and there imbibed my respect and zeal for these subjects. Impelled by these feelings and without any other strong motive, I applied for this appointment. I had hopes that I might be enabled to remove the impediments which I knew existed to the pursuit of effectual study and that I might be instrumental in introducing new and efficient methods but finding my hopes of being useful frustrated and that there were circumstances of disgrace superadded I thought it high time to resign. I now proceed to state in detail the principal reasons for this step.

I was well aware of the causes which had construed to render the scholarship examination of 1845 so unsatisfactory and on my appointment in April 1846, I found all these causes existing in full vigour. There was no rule or method for securing the course of reading necessary for the Junior Scholarships. One of the subjects is *Grammar* but the students of the Cavya and Alankara classes (in the Junior Department) were almost without exception utterly unfit to stand the most superficial Examination on that subject. Again, Arithmetic is another of the subject: but the scheme then existing did not admit any of the Junior Department to the Jyotish class, of course they failed in Arithmetic. The students of the Senior Department only were directed to study Jyotish; this branch formed no part of their examination. Consequently with very few exceptions they paid no attention to this study. The badness of such an arrangement is self-evident. Again for Junior scholarship, it is necessary to make *translations* from Sanscrit into Vernacular and vice versa. But there were no proper arrangements for that constant and regular practice in these branches which is so absolutely requisite and Books fitted for the purpose were also entirely wanting. Again Cavya is another subject, but the late Professor, about for two years previously to his death which occurred in May 1846, was quite unable from bodily infirmity to do justice to his class. He used to instruct three or four of his senior scholars and leave to them the duty of instructing the rest and the person whom he occasionally gave as a substitute (Surbanando Nyayabagish) sometimes for long periods was very deficient in the necessary qualifications. When I joined, the class was devided

into 10 sections reading different lessons and such had been the state of things for a considerable period. These irregularities were no doubt the cause why the scholarship examination of the Junior class for 1845 was so unsatisfactory.

The students of the senior class have always been through the efforts of the Professors well trained in the two branches which form the subjects of their immediate study viz. *Smriti* and *Nyaya*; but in the other subjects for a senior scholarship viz. General Literature, Essays, and Translations, they were generally with a few exceptions found deficient owing to the want of an arrangement for regular practice in these points. In short, from the above and other similar reasons the instructions given fell for short of the objects proposed. Therefore the necessity of a complete revision of the system struck me forcibly on my first joining my appointment, but as it only wanted five months to the annual examination I determined then to confine my efforts to those points alone which were most immediately concerned. I consequently commenced daily to give to the Senior Department Bengali Papers to be translated into Sanscrit. In the Cavya and Alankara classes of the Junior Department I advised all the students to revise daily a fixed portion of grammar and by threatening to degrade in to the grammar class those who were found deficient at examinations taken by me every fortnight, I induced them to pay so much attention to this subject as in a great degree to remove the deficiency in this respect as was apparent at the next examination. And as regards Jyotish I represented to you the state of thing and with your sanction directed the students of the Cavya & Alankara classes to attend at fixed times the instructions of the Jyotish Pundit thereby providing in some degree against the deficiency in this respect. The 10 sections of the Cavya class were also with your sanction rearranged and reduced to three sections. The appointment of well qualified and diligent professor to this class about that time finally removed all the impediments to effecting study which had previously existed. In addition to all these two months previous to the examination I put a stop by authority to all new lessons and caused all the students of the Institution to employ themselves solely in revising their former studies. In those two months the Cavya and Alankara classes went entirely through the two text books of general Literature in the Junior Scholarship examination viz. "Roghu Vansha and Kumara Sambhava" and at the same time labored indefatigally at Translations, Arithmetic and Grammar. The Bengalee Books necessary for practising translation, I borrowed to the amount of about 50 copies from the College of Fort William and other sources and lent to the students. In all my efforts I was warmly supported by the able and zealous professors of these two classes and I felt confident that the next examination would show a marked improvement in the Junior Department. In the Senior Department the chief efforts were directed to remedy the deficiency of the students in the higher books of Poetry. A number of works were revised and to meet the want of Books I was again obliged to apply for copies of Magha and Bharavy to the College of Fort William and other sources before referred to. The deficiency on this point was thus in a great degree provided for, but for want of leisure so much attention could not be paid to composi-

tion and translation. Thus from the day of my appointment I devoted all my energies to the object producing a marked improvement by the next examination and I had hoped that if such should prove to be the result that I should be thought deserving of approbation by my superiors. The Examination proved satisfactory and the Examiner reported favourably and I naturally looked for the praise, I thought I had deserved; but from your letter No. 239 dated 4th January 1847 to the address of the Secretary of the Council of Education forwarding the Draft of your General Report, it is clear that you were not satisfied with the degree of commendation bestowed by the Examiner and in fact you considered his laudatory remarks on the progress of the students as altogether unfounded. My just hopes of commendation were thus at once quashed; but I can boldly affirm and I appeal to all the professors and students that the means and efforts which I employed in the four or five months which preceded the Examination of 1846 and the zeal and diligence with which these were seconded by the other parties concerned have never been equalled since the scholarships were first instituted and this I will also venture to assert that if the former system had not undergone such serious alterations the Examination of 1846 would certainly have proved worse than that of 1845.

I cannot expect to meet your approval of my conduct from your personal observation as your other heavy duties seldom allow of your visiting the College. I can therefore look only to the report of the Examiner but this resource has been also cut off by the bad spirit in which you have received the fabourable sentiments of that officer. It cannot however be denied that the method of instruction has in the course of the last year been greatly changed for the better and that I have spared no exertions on my part in effecting this object. Every Pundit and student can bear testimony to these points. It must be inferred that the state of the college as to instruction before my arrival and the changes introduced by me must both have been hidden from your knowledge. I would submit if a person receiving such a return for his disinterested exertions had not just cause to be dissatisfied and if he can be expected again to take so much trouble upon himself.

I now advert to a second subject in which my well meant endeavours have been similarly rewarded with disappointment. On my joining the college when I made provision for meeting the most pressing necessity of preparing the students for appearing with credit at the approaching examination, I cherished designs of a more lasting character. I knew that a thorough and consistent rearrangement of the whole system of study was necessary to develop and keep in permanent activity the resources of the Institution. Accordingly during the months of April, May and June, I watched and revolved in my mind the working of the whole system and when I was obliged by sickness to go home on leave for 3 weeks in July I took advantage of that leisure to commit my ideas and conclusions to writing. On my return I consulted four or five Pundits on the subject and obtained their entire approval of my Plan. It was also approved of by Major Marshall who recommended me to transmit it to you for submission to the Council of Education. Thus encouraged I put the plan in an official form into your hands requesting

you to bring the matter at once before the authorities so that during the 3 weeks vacation then commencing from Doorga Poojah the matter might be taken into consideration and the new scheme if approved of by the Council might be adopted when the College re-opened. You read the whole and observed there was no necessity to submit it to the Council as you could yourself adopt the new arrangements. After the vacation when I had often urged you to put in force the provisions of my new Plan you one day remarked that you felt at liberty to adopt the changes recommended on the subject of the Grammar classes but you were not empowered to carry into effect the other proposals without the permission of the Council. On a subsequent day you came to the College with my plan in your hand and observed to me it would not be advisable to make any change without consulting the Council and that you would apply for their sanction to the new scheme as far as it regarded the Grammar classes. I suggested that as an application was to be made to the Council it might as well embrace the whole Plan to which you replied that it was no use sending up so many subjects for consideration as they would not be attended to, not even read,—the members would take fright at such a voluminous document and it would therefore be better to bring it forward in separate portions. After all this the only report made by you on the subject was one dated 16th October 1846 embracing only the Grammar classes and even as regards them you omitted all mention of 3 class Books recommended by me which form a prominent feature of the scheme and in fact without which one of the classes must be crippled and almost useless. Thus out of all my suggestions one only was submitted by you to the Council and that even in a mutilated form. All my other proposals have been treated as totally unworthy of consideration but I nevertheless feel confident that each of them is calculated in no way to injure the college but on the contrary to promote its efficiency. Nay, I am enabled to say on the coinciding Judgement of others highly qualified to give an opinion that if my scheme or some other very similar be not substituted for the present defective system, the Institution will not fully answer its two purposes namely of imparting Sanscrit Literature primarily and of teaching English secondarily. At any rate it is highly unsatisfactory to find my endeavours and labours frustrated without any due consideration of their merits.

There is another circumstance connected with this Report of mine justly calculated I think to cause me much dissatisfaction.

Major Marshall at the close of his report on the Scholarship examination recommended to the Council to adopt the suggestions made by me which have been so often alluded to. On this in the Annual Report of the Sanscrit College for 1845-46 at page 6 you remark: "The report referred to by Major Marshall was prepared by direction of and mostly from data furnished by the Secretary to the College by whom the chief recommendations contained in it which accorded with his expressed views have already been submitted to and approved of by the Council of Education and are contained in the introductory portion of this Report". Now I respectfully deny ever having received from you any data for the Preparation of that report and the only thing in the shape of direction I can

remember was your instruction to devise a plan for reducing the number of sections in each class and introducing Gone and Abidhan into the Grammar Classes. As to my 'chief recommendations' having been 'submitted to and approved of by the Council' that is briefly answered by referring to what has been shown before, namely that out of the numerous subjects referred to in my long report only part of one has been thought by you worthy to be laid before superior authority.

From the length to which this paper has extended I must bring to a close, but I shall always be ready to meet any proper enquiry into the subjects mentioned. I think I have brought forward sufficient to show that my labours have not met and are not likely to meet with due appreciation and this is the ground of my resignation.

I studied 12 years and 5 months in the Sanscrit College with some distinction. I was the next 5 years Head Pundit of the College of Fort William during which period my time was also wholly devoted to Sanscrit studies and my assistance was every year required by Major Marshall for preparing questions for the Sanscrit College Scholarship Examinations and for Examining the Replies given in In giving up that appointment for my present one, I was elevated by the hope that I was entering on a sphere where my acquirements in Sanscrit Literature added to my long experience in the affairs of the Sanscrit College would prove of great benefit but as I have already stated I consider my expectation have been frustrated.

One point affecting the credit and comfort of the College I had almost omitted. I allude to the privilege assumed by the Principal of the Hindu College to take occasionally a portion of the stools and desks of the Sanscrit College for the accommodation of his own students at particular Examination for 3 or 4 days together. Some of our students are obliged to sit on the ground and it must be remembered the rooms are not matted. This irregularity has been frequently reported to you and although you have frequently promised to take efficient steps for putting a stop to such unjust interference yet you do not appear to have taken any such steps either because you approve of such conduct or because you are not impressed with the inconvenience and unseemliness of our half of a class sitting on the bare ground whilst the other half sit on stools. Such a disregard of the comfort of the students and of the rights of the institution is to me highly distasteful.

I have thus stated some of the principal reasons for tendering my resignation. The assigning of such reasons in detail did not appear to me to be at all necessary; but in compliance with your especial request I have frankly submitted them.

I trust therefore that allowances will kindly be made for any expressions which may carry an appearance of undue freedom.

I have the honor to be
Sir
Your most obedient servant
Iswar Chandra Sharma.
Assistant Secy. Sanscrit College."*

Sanscrit College,
3rd May 1847.

* Files For Letters Received (1844-47), Sanskrit College.

২

১৮৫০ সালের ১৬-ডিসেম্বর কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সেক্রেটারিকে লেখা বিদ্যাসাগরের একখানা চিঠি এবং তৎসহ প্রেরিত বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত রিপোর্ট উদ্ধার করি :

"To F. J. MOUAT, Esq., M.D.,
Secretary to the Council of Education.

SIR,

I have the honour to submit, for the information of the Council of Education, a report on the Sanscrit College, drawn up agreeably to the instructions conveyed in your letter No. 3538, dated the 5th instant.

I beg leave to remark that it has long been in my contemplation to submit a report of the nature now furnished, but circumstances deferred me from such a step. I am now, however, happy to have an opportunity of carrying out my wishes, as a matter of duty, under the sanction of the council.

SANSCRIT COLLEGE,
The 16th December 1850.

I have, etc.,
ISVAR CHANDRA SHURMA,
Professor of Sahitya in the
Sanscrit College.

REPORT

Grammar Department.—Under the present system this department consists of five classes. The works studied are Mugdhabodha, Dhátupátha, Amarakosha and Bhatti Kávya; the fifth class studying 17 pages of Mugdhabodha; the fourth class 42 pages of the same work; the third class 100 pages; the second class the remaining 90 pages of the same book, together with Dhátupátha; and the first class a few books of Bhatti Kávya and a certain portion of Amarakosha. Four years is the prescribed period for continuing in this department; but five years are necessary to enable a student to pass through the five grades. For want of a better system the advantage gained is very little compared with the length of time spent by students in this department.

Mugdhabodha is a very short compendium of grammar. The author Vopadeva seems to have had brevity simply in view. Having had this for his object, he has, consequently, made his work extremely difficult. The Sanscrit is in itself a very difficult language, and to begin its study with a difficult grammar seems, in my opinion, not to be a well chosen plan. Experience shews what difficulties one has to surmount when studying his grammar in this style. Young lads who begin to study Sanscrit, on account of the extreme difficulty of the Grammar Mugdhabodha, only learn by rote what their instructors say, without being able of themselves to understand the contents of the work they read. Thus 5 years pass in the study of grammar alone, without getting any essential introduction to the language itself. It seems to be an astounding fact that one should be studying a language for 5 years and scarcely understand a bit of it. Moreover, the Mugdhabodha, with all its voluminous commentaries, which last, however, are not read in the college, is an

imperfect grammar. So, under the present system, the first 5 years of a student of the Sanscrit College, is almost lost to useless purposes. After all his toil and trouble, his acquirements in grammar are very imperfect. Again, Dhátupátha, another of the works studied in this department, is a collection of Sanscrit roots in verse. Amarakosha, the third work of study, is a dictionary also in verse. These two works when mastered, I admit, are of some assistance to the study of literary works. But the advantage gained is not at all commensurate to the time and labour required to get them by heart. Besides, almost all the standard Sanscrit poetical works, which is the main part of Sanscrit literature, being accompanied by excellent commentaries by Mallinátha, supersede altogether the use of the study of the abovenamed two works, Dhátupátha and Amarakosha. I beg leave to say that this commentator is not like his brethren who 'blanch the obscure places and discourse upon the plain'. Under the above considerations, I do not think it a good plan to spend the first 5 years of studying in the Sanscrit College in reading Mugdhabodha, Dhátupátha and Amarakosha. Bhatti Kávya, the fourth and last work of study in this department, is a poem, the theme of which is Rama and his adventures. This work was purposely written to exemplify the rules of grammar. It is not altogether ill-adapted for the grammar department.

After all these considerations, I beg leave to propose the following remodelled system of study for the grammar department. Should the council be pleased to adopt the suggestion, I do think, in my humble opinion, that in 4 years, the time prescribed now for grammar study, the students shall have a thorough knowledge of grammar, and tolerable proficiency in literature besides, and they will not experience that difficulty in the Sahitya class which they do now, being made all at once, just after finishing an imperfect grammar, to begin with the standard works, without having had an insight into the language.

The system I would propose is this: The boys instead of beginning the grammar at once in the Sanscrit language, should learn some of the most fundamental rules dressed in the easiest Bengali; then they should go on with two or three Sanscrit 'Readers'—to be compiled. These 'Readers' should consist of easy selections from the Hitopœdesha, Panchatantra, Ramayana, Mahabharata and from other works suited for the purpose. This will take the students some two years. After this they should begin with Siddhanta Kaumudi, Bhattoji Dikhshita, the study of which they should continue to the highest class of the grammar department. Of all the Sanscrit grammars this is decidedly the best and the highest authority on the subject. It is at once complete and simple. Along with Siddhanta Kaumudi the students should also study Raghu Vansha and selections from Bhatti Kávya, Dasakumara Charita, &c., &c. I beg leave also to propose that instead of five classes there should be four, and the fifth be considered as a section of the fourth, both studying the same books, and the promotions from both the classes being to the third. By this arrangement a year will be conveniently saved, and the period for the grammar department instead of being five shall be four years.

2. *Sahitya or General Literature.*—The students coming from the

grammar department have to study in this class for 2 years. Whilst here, they read the following works:—

(1) Raghu Vansha.
(2) Kumar Sambhava.
(3) Meghaduta.
(4) Kiratarjuniya.
(5) Shishupalabadha.
(6) Naisadha Charita.
(7) Shakuntala.
(8) Vikramoriashi.
(9) Ratnavali.
(10) Mudrarakshosa.
(11) Uttara Charita.
(12) Dasakumara Charita.
(13) Kadambari.

They also practise translation from Bengali into Sanscrit and *vice versa*, and attend the mathematical class.

The first 6 of the 13 books above mentioned are the standard poetical works; the seventh, eighth, ninth, tenth and eleventh are dramas; the last two are prose compositions. Raghu Vansha is an historical poem in 19 books. Its theme is the adventures of Rama, those of his four immediate ancestors, and the adventures of his descendants down to Agnirarna. Kumar Sambhava, from the name, would appear to be a poem all celebrating the birth of Kartikeya, the Mars of the Hindus. But the 7 books that are extant embrace a certain portion of the intended theme. The poem, as it stands, describes the birth of Parvati, the mother of Kartikeya, the burning of Kamadeva, the god of love, by Shiva, the Tapasya (austerities) of Parvati and her marriage with Shiva. Meghaduta is a poem in 118 slokas. A Yaksha or demi-god, having excited the wrath of his master Kuvera, the god of wealth was doomed, by the curse of the master deity, to remain in a state of separation, away from his beloved wife, in a distant land, for the full length of one year. The lover in his distressed condition addresses a cloud, to bear his message to his wife at Alaka, the capital of Kuvera. The Shakuntala and Vikramorvashi are dramas; the first has for its subject the story of Shakuntala, the adopted daughter of a sage named Kanwa, and Dushmanta, a king; the plot of the second is the story of Pururava, a king, and Urvashi, a nymph. All these are very excellent productions. They are by the immortal Kalidasa. Every one of them bears the stamp of his great genius. Shishupalabadha, Kiratarjuniya, and Naisadha Charita are epic poems, the first by Magha in 20 books, and the second by Bharavi in 17 books, the third by Shriharsha in 22 books. The death of Shishupala by the hand of Krishna, his cousin, is the theme of Magha's poem. The Kiratarjuniya contains the tapasya of Arjuna, his combat with Shiva in the disguise of a kirata or barbarian, and finally his acquisition of certain weapons as regards from Shiva, who was pleased with his military prowess. The adventures of Nalaraja form the subject matter of Naisadha Charita. The first-mentioned two works possess all the attributes of good epics, only now and then there are some very tedious passages. The 7th, 8th, 9th, 10th and 11th books of Shishupalabadha, though the finest specimens of poetry, and the 7th, 8th, 9th and 10th books of Kiratarjuniya have in many places very obscene passages. Naisadha Charita from the beginning to the end is bombastic and hyperbolical. Its style is neither elegant nor chaste; there are occasional

bursts, however, of fine passages. Uttara Charita, by Bhavabhuti, is a drama, embracing the latter part of the career of Rama. Ratnavali is also a drama. Dhavaka is its author. He was paid by Rajah Shriharsha to write this work along with another, and attribute its authorship to him. The story of Rajah Udayana and Ratnavali is the plot of this drama. These two works are excellent in every respect. Mudrarakshasa, by Vishakhadatta, may be called a political drama. In its contents we find that Chanakya, the Prime Minister of Chandragupta, the Sandracottus of the Greeks, is applying his diplomatic skill to consolidate the newly acquired empire of his master, by baffling all the efforts of Rakshasa, the royal Prime Minister of the subverted Nanda family, to subvert in turn the new dynasty. This also is a good piece of composition. Dasakumara Charita and Kadambari are in prose. In the first a certain number of friends are relating to each other the history of their travels. The style is pure and chaste. There are, however, some objectionable passages. Dandi is its author. Kadambari is a novel, or rather an epic poem in prose. It is in 2 parts. The first part is a masterpiece of Sanscrit composition. The author, Vanabhatta, did not live to complete his admirable work. His son wrote the second part. The production of the son is far inferior to that of the father.

Having laid all this before the Council, I beg leave to state there is not much alteration required in the purely literary studies of this class. With regard to mathematical studies I will speak hereafter, when I report on the Jyotisha class. The change I would propose is this: Raghu Vansha, as I have proposed in my report of the grammar department, should be transferred to the first grammar class, and the Dashakumara Charita, instead of being read entire here, be studied in selections in one of the grammar classes, and that Shishupalabadha, Kiratarjuniya, and Naisadha Charita, having many objectionable passages, as stated before, instead of being read entire, be studied in selections. The first part only of Kadambari should be read. All the other works should be read entire. In addition to this I beg leave to propose that two other works, Vira Charita and Santishataka, be studied in this class. The former is the first part of that drama of which Uttara Charita is the second, being in no way inferior to it. The Santishataka is an excellent didactic poem. The students should practise translating as before. They should also write essays in Sanscrit and Bengali.

3. *Alankara or Rhetoric Class.*—After Sahitya the students come to this class and continue in it for two years. They read in this class the following works on rhetoric:—

(1) Sahitya Darpana.
(2) Kavya Prakasha.
(3) Kavya Darshan.
(4) Rasagangadhara.

They also read those poetical works which from want of time they cannot go on with in the Sahitya class. Besides this, they have for their exercise, translations and compositions. They also attend the mathematical class.

With regard to this class I beg leave to propose the following change. The text-books should be Kavya Prakasha and Dasharupaka. Generally Sahitya Darpana is the work read; but I prefer Kavya Prakasha and

Dasharupaka on the following grounds. Kavya Prakasha is a much more profound work than Sahitya Darpana, and is acknowledged to be the highest authority on the subject. The best commentators, such as Mallinatha, quote this work for their authority. The Sahitya Darpana only dilates in very diffuse style what the Kavya Prakasha contains in essence. Kavya Prakasha, however, speaks nothing of dramatical compositions. Dasharupaka treats of that portion of rhetoric. Besides this is the highest authority in its own department. Kavya Prakasha and Dasharupaka could be read in less time than Sahitya Darpana. So the formal two have every claim to be preferred to the latter, and after reading the two first, to read the last also would be waste of time. The purely literary works, should my suggestions regarding the studies of the grammar and Sahitya departments be adopted, will not require to be studied as class books in this (rhetoric) class. The hours that will thus be saved from the immediate objects of the class should be devoted to the study of mathematics and other works, of which I will make mention afterwards.

4. *Jyotisha or Mathematical Class.*—The students of the Sahitya and Alankar classes attend this class and study Lilavati and Vijaganita. Lilavati is a treatise on arithmetic and mensuration by Bhaskaracharya. Vijaganita is a treatise on Algebra by the same author. Both of these works are very meagre. They are in a great measure without any method, and do not contain all that is contained in similar English books. From a curious taste they have been rendered needlessly difficult. The rules and questions are all in verse. On account of this the students take so great a length of time as four years to study these two books. The examples are too few.

Great changes are required in this branch of study. For the present complete treatises on Arithmetic, Algebra and Geometry should be compiled from the best English works on those subjects. After studying these, the students will be able to read Lilavati and Vijaganita with great facility. The higher branches of Mathematics should be attempted to be translated afterwards, and when ready should be adapted as class books. I would now propose that a popular treatise on Astronomy, such as Herchel's, be compiled in Bengali, and be read in the mathematical class. These works might have been studied in English; but their appearance in Bengali will be of great use also in the Vernacular schools. Besides the Sahitya and Alankara students, the students of the Smriti and Nyaya classes should attend the lectures of the Professor of Mathematics.

Here the junior department of the Sanscrit College is considered to terminate.

I beg leave to propose that the study of Bengali books, treating on useful and entertaining subjects, be introduced in the classes of the Junior department. The works should treat of such subjects as the following:—

For the Fourth Grammar Class.—Pretty stories about animals.

For the Third Grammar Class.—Rudiments of knowledge, as in Chambers's Educational Course.

For the Second Grammar Class.—Moral Class Book, as in Chambers.

For the First Grammar Class.—Miscellaneous subjects, such as Art of Printing, Loadstone, Navigation, Earthquake, Pyramids, Chinese Wall, Honey Bee, etc.

For the Sahitya Class.—Biography, as in Chambers, and miscellaneous reading on useful and entertaining subjects, selected and translated from Telemachus, Rasselas, Mahabharata, etc.

For the Alankara Class.—Essays on Moral, political, and Literary Subjects, and a popular treatise on the Elements of Natural Philosophy.

Should the Council be pleased to intuoduce these Bengali books, the students of the Sanscrit College will, with little difficulty, acquire great proficiency in Bengali, and, through the medium of that language, derive useful information, and thereby have their views expanded before they commence their English studies.

Of the abovementioned Bengali works, the biography is already published; rudiments of knowledge and moral class book are in the press, and almost all the other works are in the course of preparation. The adoption of these books will entail on the council no expense whatsoever.

I beg also to state that the preparation and the publication of the rudiments of Sanscrit grammar in Bengali and that of Sanscrit selections shall need no pecuniary assistance of the council.

The preparation of the works for the Mathematical class, namely, Arithmetic, Algebra, Geometry and a popular treatise on Astronomy, suitable for the use of the Sanscrit College, will need the patronage of the council of Education when the state of the education funds will admit of this being afforded.

5. *Smriti or Law Class.*—After the Alankara the students come to this class, and continue in it for three years. The works read are—

(1) Manusanhita.
(2) Mitakshara, 2nd Section.
(3) Vivada Chintamani.
(4) Dayabhaga.
(5) Dattaka Mimansa.
(6) Dattaka Chandrika.
(7) Ashtavinshati Tattwas.

The institute of Manu is the highest authority on the subject of Hindu Law. It treats of social, moral, political, religious and economical laws. It is in a manner an index of Hindu society in ancient times. Mitakshara, by Vijnaneshawara, is a commentary on Yajnavalkya's Code. The second section treats of civil and criminal laws, the former including the law of inheritance. Mitakshara is acknowledged to be the highest authority in the North-Western Provinces. Vivada Chintamani, by Vachaspati Mishra, is a compilation of civil and criminal laws. This work is the authority in the Province of Bihar. Dayabhaga, by Jimutavahana, is a treatise on inheritance. This work is the authority in Bengal. Dattaka Mimansa and Dattaka Chandrika are treatises on the adoption of children and their civil rights. The Mimansa is the authority in the North-Western Provinces and the Chandrika in Bengal. The Ashtavinshati Tattwas are by Raghunandana. With the exception of the Daya and Vyavahara Tattaws, the former on the law of inheritance, the latter on the court procedure, the other 26 Tattwas are treatises on the forms of the religious ceremonies.

With regard to this class I beg leave to observe that the study of the 28 Tattwas ought to be discontinued. Though they are of use to the Brahmans as a class of priests, they are not at all fitted for an academical course. The other works should be allowed to keep their place. Their study makes one conversant with the Hindu law of every part of India.

6. *Nyaya Class.*—The Nyaya system of philosophy principally treats of Logic and Metaphysics, and occasionally touches upon subjects relating to chemistry, Optics, Mechanics, etc. The same description applies more or less to the other systems, excepting Mimansa and Patanjala, which treat of religious ceremonies and abstract contemplation of the deity respectively. The years of study in this class are four, the works studied are the following:—

(1) Bhasaparichchheda.
(2) Siddhanta Muktavali.
(3) Nyayasuttras with Vritti or Commentary.
(4) Kusumanjali.
(5) Anumana Chintamani and Didhiti.
(6) Shabdashaktiprakashika.
(7) Paribhasha.
(8) Tattwa Kaumudi.
(9) Khandana.
(10) Tattwa Vireka.

Bhasaparichchheda, by Vishwanatha Panchanana, is an elementary treatise on all the departments of Nyaya. Siddhanta Muktavali is a commentary on the Bhasaparichchheda by the author himself. Nyaya Sutras are by Goutama, the founder of this school of philosophy. Kusumanjali treats of the existence of the deity and that of a future state. The line of argumentation on the whole is similar to what is to be found in modern European works on the same subject. The author is Udayanacharya. Anumana Chintamani is a work of the modern school of Nyaya Philosophy, on deduction, by Gangeshopadhyaya. His reasoning is similar to that of the schoolmen of the middle ages of Europe. This treatise is what Bacon would call a "cobweb of learning." In the study of this work insurmountable difficulties are to be met with. Anumana Didhiti is its commentary, by Raghunath Shiromani. He is the dictator in the modern Nyaya School of Philosophy. Shabdashaktiprakashika, by Jagadisha, is a treatise on the import of words. Paribhasa, by Dharmaraja, is a short treatise on the Vedantic doctrines. Tattwa Kaumudi, by Vachaspati Mishra, is a short but comprehensive treatise on the Sankhya system of philosophy. Khandana is by Shriharsha. The object of the author in this work is to refute all the then existing systems of philosophy, and to establish his favourite, the Vedantic. This work is of high repute. The author has handled the subject in the most abstruse style, and has actually made it what they call "muddy metaphysics." Tattwa Viveka, by Udayanacharya, aims at refuting the Bouddha or atheistical doctrine and proving the necessity of a maker of the universe. The style of this work has the opposite faults of being abstruse and diffuse.

After the above observations, I beg leave to suggest that this class, instead of being called the Nyaya or Logic class, be called the Darshana or Philosophy Class, and that the study of Anumana Chintamani and Didhiti, Khandana and Tattwa Viveka be discontinued, and in their place be studied the following works on the other systems of philosophy, excluding the Mimansa or rule of religious ceremonies:—

(1) Sankhyapravachana.
(2) Patanjala Sutra.
(3) Panchadashi.
(4) Sarvadarsana Sangraha.

The period of study in the Sanscrit College is 15 years. One is expected to have a perfect knowledge of Sanscrit learning in so long a period. But no one may be considered to have such knowledge who is not familiar with all the systems of philosophy prevalent in India. True it is that the most part of the Hindu systems of Philosophy do not tally with the advanced ideas of modern times, yet it is undeniable that to a good Sanscrit scholar their knowledge is absolutely required. Should the Council be pleased to adopt the suggestions that I will submit in the succeeding part of my report regarding the English department, by the time that the students come to the Darshana or Philosophy class, their acquirements in English will enable them to study the modern Philosophy of Europe. Thus they shall have an ample opportunity of comparing the systems of Philosophy of their own, with the new Philosophy of the western world. Young men thus educated will be better able to expose the errors of ancient Hindu Philosophy than if they were to derive their knowledge of Philosophy simply from European sources. One of the principal reasons why I have ventured to suggest the study of all the prevalent systems of Philosophy in India, is that the student will clearly see that the propounders of different systems have attacked each other, and have pointed out each other's errors and fallacies. Thus he will be able to judge for himself. His knowledge of European Philosophy shall be to him an invaluable guide to the understanding of the merits of the different systems.

7. *English Department.*—The present mode in which this very useful department is conducted is very unsatisfactory. There is no rule as to what students are expected to study English, but it is entirely left to their own option. They commence the study when they please, leave it off at their own option, and commence again when it suits their purpose. Many students on being attached to the grammar classes, at their first admission, immediately commence English, but from the difficulty of the first principles of both languages, the greater part being unable to carry on both at once, some after a short time neglect their English and others the Sanscrit. It is the case with many to retire from the English class just before the examinations. The very same students come again to be admitted at the beginning of the next session. There is another circumstance which causes great confusion, which is that one English class is constituted of students of various Sanscrit classes. Take, for instance, the components of the third and fourth classes. The third class consists of 13 boys, 4 of whom belong to the Smriti class, 1 to the

Nyaya, 1 to the Alankara, 3 to the third Grammar class, and 4 to the fourth Grammar class. The fourth class consists of 33 boys, 2 of whom belong to the Alankara class, 5 to the Sahitya, 2 to the first Grammar class, 6 to the second, 10 to the third, 6 to the fourth, and 2 to the fifth Grammar class. From the circumstance of students of various Sanscrit classes coming to attend the English class, it becomes altogether a difficult affair to secure regular attendance in the latter. Again, the study of English being optional, some portions only of each Sanscrit class are students in the English department. Such students, particularly those from the lower classes, cannot go on with their Sanscrit studies with that degree of attention which the non-English reading students can. But the studies of the class being the same with all, the progress in both the languages is greatly impeded.

The English department, if continued to be conducted in this irregular style, is not expected to be productive of any satisfactory results. After the creation of the English department in this institution a similar irregular mode of conducting it rendered it useless, which caused its abolition by the late General Committee of Public Instruction. If better arrangements be not made, the present English department will also become useless.

Under the above considerations, I beg leave to suggest the following arrangement which I am persuaded, if steadily pursued will be productive of beneficial results. The arrangement I would propose is as follows:—

The students should not be allowed to commence English till they have acquired some proficiency in the Sanscrit language: the pupils of the same Sanscrit class shall go on with the same English studies: the study of English instead of being optional be compulsory; should there be any one very unwilling to be taught in English, he be given to understand that he will not be allowed to commence English at any subsequent stage of his Sanscrit study, as to create for him alone a separate class is altogether out of the question.

Under the proposed system of Sanscrit study, the students of the Sahitya class, it is assumed, will be well acquainted with the Sanscrit language. Therefore I beg leave to propose that the study of English be commenced in the Alankara class. In that case the students will be able to devote to the study of English nearly double the time they do now; and their minds, having received culture, they will not have to begin with such trite subjects as young beginners are obliged to commence with. From the Alankara class to the last year of study in the college is some 7 or 8 years and a diligent student in the course of that period will have ample opportunity of making himself familiar with English language and literature.

8. *Fifth Grammar Class.*—Another very important circumstance I beg to bring to the notice of the council. The fifth Grammar Professor, Pundit Kasinath Tarkapanchanana, is not quite equal to discharge the duties of his class. He is an old Pundit and seems to be in his dotage. He is altogether unacquainted with that discipline which is absolutely required for so young a class as his. Being an old man, he will not bear to be directed, as is usual with all Pundits of his age.

From all these circumstances his class is the most irregular of all. Therefore, I beg leave to propose that he be placed in charge of the library with his present salary, rupees 40 a month, and the present librarian, Pundit Girish Chundra Vidyaratna, a very distinguished ex-student of the institution, be appointed to the chair of the fifth Grammar Professor with his present salary rupees 30 a month, to be raised to rupees 40 when a favourable opportunity offers.

9. *Promotions.*—With regard to the promotion of boys from one class to another, the present practice of the College is to keep them in each class for the allotted number of years, and send them at the expiration of the time to the higher class, without any consideration as to the degree of their acquirements.

Under this arrangement it so happens that a student, notwithstanding he may have finished his course in the class, is not allowed to join the higher one if he has not finished his allotted years, whilst another, let him be how deficient soever in the studies of the class, is promoted to the higher class, simply if he has merely completed the prescribed time. Therefore I beg leave to propose that promotions take place on the princi ple of merit, not years: only with this limitation, that no one will be allowed to remain in the college beyond the period prescribed by the scholarship rules. I am persuaded that under this arrangement all students above mediocrity will finish their collegiate course of study in less than the time now prescribed.

10. *Discipline.*—The laxity of general discipline in the institution at present is notorious. It is highly desirable that strict and steady attention should be paid to ensure regularity of attendance, to put a stop to students constantly leaving their classes on trival preferences, and to prevent needless noise, talking and general confusion. There is no inherent cause whatever why the discipline in this College should not be equal to that which obtains in any English institution. The same methods require only to be enacted and enforced.

In conclusion, I beg leave to observe, that the changes now proposed by me in the system of the college are the results of a long and anxious consideration of the subject. They are extensive—but I have endeavoured to select only those which are absolutely necessary for the efficiency of the institution, and which are quite practicable. Should the Council be pleased to adopt these suggestions, I have sanguine hopes that the happy and speedy results, under an efficient and steady supervision, will be, that the college will become a seat of pure and profound Sanscrit learning, and at the same time a nursery of improved vernacular literature, and of teachers thoroughly qualified to disseminate that literature amongst the masses of their fellow-countrymen."*

* General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, from 1st October 1850 to 30th September 1851, pp. 34-43.
(দ্রষ্টব্য—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, পৃ. ৭২-৮৩।)

৩

১৮৫১ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত 'ঋজুপাঠ, তৃতীয় ভাগে'র 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

"ঋজুপাঠের তৃতীয় ভাগ হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, ভট্টিকাব্য, ঋতুসংহার ও বেণীসংহার এই কয়েক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইল। এই সকল গ্রন্থের যে যে স্থান উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাদের কোন কোন ভাগ এক বারেই পরিত্যক্ত ও কোন কোন ভাগ কিয়দংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

হিতোপদেশকর্ত্তা গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, পঞ্চতন্ত্র ও অন্য এক গ্রন্থ হইতে আপন গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন। বাস্তবিক, হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রের প্রতিরূপস্বরূপ। পঞ্চতন্ত্রের গুণ ও দোষের অধিকাংশই হিতোপদেশে লক্ষিত হয়। বিশেষ এই, পঞ্চতন্ত্র অপেক্ষা হিতোপদেশের রচনা কিঞ্চিৎ গাঢ় এবং প্রস্তুত বিষয়ের বৈশদ্য অথবা দৃঢ়ীকরণ বাসনায়, নানা প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে প্রমাণ, দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ স্বরূপ উত্তম উত্তম শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তার সম্যক্ সহৃদয়তার অসদ্ভাবপ্রযুক্ত, অনেক স্থলেই উদ্ধৃত শ্লোক সকল অসংলগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। তত্তৎ স্থলে প্রকৃত বিষয়ের সহিত ঐ সকল শ্লোকের কোন সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। হিতোপদেশকর্ত্তা বালকদিগের নীতিশিক্ষার্থে এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন (১)। কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক একটি আদিরসঘটিত অতি অশ্লীল উপাখ্যান আছে। অতএব, আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে বালকদিগের নিমিত্ত নীতিপুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া, কি প্রকারে গ্রন্থকর্ত্তার ঐরূপ অশ্লীল উপাখ্যান সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্তি হইল। কোন্ ব্যক্তি হিতোপদেশ রচনা করিয়াছেন, আমরা তাহা অবগত নহি। অনেকে বিষ্ণুশর্ম্মাকে হিতোপদেশকর্ত্তা বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই। হিতোপদেশ চারি অংশে বিভক্ত; মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ, সন্ধি। তন্মধ্যে মিত্রলাভ-প্রকরণমাত্র এই পুস্তকে পরিগৃহীত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণ অতি প্রাঞ্জল ও পরিষ্কৃত গ্রন্থ; পাঠমাত্রেই অর্থপ্রতীতি হয়। পুরাণের যে পাঁচ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, (২) বিষ্ণুপুরাণ সেই পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত। এই পুরাণ অন্যান্য যাবতীয় পুরাণ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। অন্যান্য পুরাণের ন্যায়, ইহাতে অপ্রাকরণিক কথা নাই। সকল পুরাণ অপেক্ষা বিষ্ণুপুরাণের রচনা প্রাচীন বোধ হয়। যাবতীয় পুরাণ বেদব্যাসপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু পুরাণ সকলের রচনা পরস্পর এত বিভিন্ন যে এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া বোধ হয় না। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ পাঠ করিলে, এই তিন গ্রন্থ এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত বলিয়া প্রতীতি হওয়া দুষ্কর। বিষ্ণুপুরাণ সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট বটে; কিন্তু ইহাতে বালকদিগের পাঠোপযোগী বিষয় অধিক নাই। যে কয়েক স্থান প্রকৃত বিষয়ের উপযোগী বোধ হইয়াছিল, তাহা পরিগৃহীত হইয়াছে।

মহাভারত বেদব্যাসবিরচিত বলিয়া কিংবদন্তী আছে, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির সহিত মহাভারতের রচনার এত বিভিন্নতা যে যিনি বিষ্ণুপুরাণ, কিংবা ভাগবত, অথবা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার রচিত বোধ হয় না। মহাভারত পুরাণমধ্যে পরিগণিত নহে। ইহাকে ইতিহাস কহে। ইহাতে পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণে সৃষ্টি, প্রলয়, মন্বন্তর, নানা রাজবংশ এবং নানাবংশীয় নরপতিগণের চরিত কীর্ত্তন থাকে। মহাভারতে এক নির্দ্দিষ্ট রাজবংশের চরিত বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। কিন্তু ইহাতে, আনুষঙ্গিক, নানা পৌরাণিক বিষয়ও সঙ্কলিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের রচনা যেরূপ প্রাঞ্জল ও পরিষ্কৃত, মহাভারতের সেরূপ নয়। আবৃত্তিমাত্র সকল স্থলের অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। অনেক স্থল এরূপ দুরূহ অথবা অস্পষ্ট যে কোন ক্রমেই অর্থপ্রতীতি হয় না। মহাভারতে নীতিগর্ভ ও হিতোপদেশঘটিত প্রস্তাব অনেক আছে। তন্মধ্যে আদি ও বন পর্ব্ব হইতে কয়েকটি পরিগৃহীত হইয়াছে। তদ্ব্যতিরিক্ত

---

(১) কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে।
হিতোপদেশ।

২। সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

ইহাতে এত উৎকৃষ্ট প্রস্তাব আছে যে সমস্ত উদ্ধৃত করিলে, একখানি বৃহৎ পুস্তক প্রস্তুত হইতে পারে।

ভট্টিকাব্যে রামের চরিত বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্য দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থকর্ত্তা স্বরচিত কাব্যের শেষে আপনার একপ্রকার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু নামনির্দেশ করেন নাই। প্রামাণিক টীকাকার জয়মঙ্গল কহেন, এই কাব্য বলভীনগরনিবাসী ভট্টিনামক কবির রচিত। এবং ভট্টিকাব্য নাম দ্বারাও, ইহাই সম্যক্ প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু অধুনাতন টীকাকার ভরতমল্লিক, আপন মতের প্রতিপোষক প্রমাণপ্রদর্শন ব্যতিরেকেই, ভট্টিকাব্যকে ভর্ত্তৃহরিপ্রণীত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরি, ও এই কাব্যের রচয়িতা, উভয়েই অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ ছিলেন; বোধ হয়, এই সাদৃশ্য দর্শনেই ভরতমল্লিকের এই ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ইহা বিবেচনা করা উচিত ছিল যে যেরূপ জনশ্রুতি আছে, তদনুসারে ভর্ত্তৃহরি স্বয়ং রাজা ছিলেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং রাজা হন তিনি, অমুক রাজার রাজধানীতে থাকিয়া আমি এই গ্রন্থ করিলাম, আপন গ্রন্থে কদাচ এরূপ নির্দেশ করেন না (৩)। ভট্টিকাব্যের রচনা স্থানে স্থানে অতি সুন্দর; বিশেষতঃ, দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভে যে শরদ্বর্ণনা আছে, তাহা এমন মনোহর যে তদ্দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তার অসামান্য কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ব্যাকরণের উদাহরণপ্রদর্শন গ্রন্থকর্ত্তার যেরূপ উদ্দেশ্য, কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করা তাদৃশ উদ্দেশ্য ছিল না। এই নিমিত্ত ভট্টিকাব্যের অধিকাংশই অত্যন্ত নীরস ও অত্যন্ত কর্কশ। ফলতঃ, ভট্টিকাব্য কোন মতেই উৎকৃষ্ট কাব্যমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। এই কাব্যের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গ মাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে।

ঋতুসংহার অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের রসময়ী লেখনীর মুখ হইতে বহির্গত। এই উৎকৃষ্ট কাব্য ছয় সর্গে বিভক্ত। এক এক সর্গে যথাক্রমে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হিম, শিশির, বসন্ত ছয় ঋতু বর্ণিত হইয়াছে। যে স্বভাবোক্তি কাব্যের প্রধান অলঙ্কার, ঋতুসংহার প্রায় আদ্যোপান্ত তাহাতে অলঙ্কৃত। কিন্তু রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি কতিপয় অলঙ্কার এতদ্দেশীয় লোকের অধিক প্রিয়; স্বভাবোক্তির চমৎকারিত্ব তাঁহাদের তাদৃশ মনোরম বোধ হয় না। এই নিমিত্ত, অনেকেই ঋতুসংহারকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলেন না। কেহ কেহ এই উৎকৃষ্ট কাব্যকে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রোমোর্ব্বশী এই সকল সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্যের রচয়িতা কালিদাসের প্রণীত বলিয়া অঙ্গীকার করিতে সম্মত নহেন। ঋতুসংহার, রঘুবংশাদি হইতে অনেক অংশে ন্যূন বটে। কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকাতে রঘুবংশাদির এত আদর ও এত গৌরব, কুসংস্কারবিবর্জ্জিত ও সহৃদয়পদবীতে অধিরূঢ় হইয়া অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে, ঋতুসংহারে সেই সমস্ত গুণের সমুদয় লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। ঋতুসংহারে যেমন অনেক অসাধারণ গুণ আছে, তেমনই এক অসাধারণ দোষও আছে। ঋতুসংহারের অধিকাংশই আদিরসঘটিত। বিশেষতঃ হিম, শিশির, বসন্ত বর্ণনা আদিরসে এত পরিপূর্ণ, যে ঐ তিন সর্গ কোন ক্রমেই বালকদিগের পাঠযোগ্য নহে। এই নিমিত্ত গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ বর্ণনা মাত্র এই পুস্তকে পরিগৃহীত হইল। এই তিন সর্গেরও আদিরসঘটিত শ্লোক সকল পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বেণীসংহার নাটক ভট্টনারায়ণ বিরচিত। এরূপ কিংবদন্তী আছে, আদিশূর রাজা কান্যকুব্জ হইতে গৌড়দেশে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন ভট্টনারায়ণ তাঁহাদের একজন। এই নাটক নাটকের সমুদয় লক্ষণাক্রান্ত। সাহিত্যদর্পণে নাটকপরিচ্ছেদে নাটকসংক্রান্ত বিষয়ের উদাহরণ প্রদর্শনার্থে বেণীসংহার হইতে যত উদ্ধৃত হইয়াছে, অন্য কোন নাটক হইতে তত নহে। কিন্তু এই নাটকের রচনা প্রাচীন কবিদিগের রচনার ন্যায় চমৎকারিণী ও মনোহারিণী নহে। ভট্টনারায়ণ নাটকের নিয়ম যত প্রতিপালন করিয়াছেন, কবিত্বশক্তি তত প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। বেণীসংহার, নাটকের সমুদয়লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও, কাব্যাংশে শকুন্তলা, রত্নাবলী, উত্তরচরিত প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক ন্যূন। নাটকে সংস্কৃত ভিন্ন প্রাকৃত, পৈশাচী, রাক্ষসী প্রভৃতি অনেক ভাষা থাকে। সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ না হইলে, সে সকল ভাষা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় না। এই নিমিত্ত, বেণীসংহারের যে অংশে ঐ সকল ভাষার সংস্রব নাই, তাহাই ঋজুপাঠের তৃতীয় ভাগে উদ্ধৃত করা গিয়াছে।"

৩। কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলাভ্যাং
শ্রীধরসূনুনরেন্দ্রপালিতায়াম্।
কীর্ত্তিরতো ভবতাং নৃপস্য তস্য
ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্॥
২২ সর্গ ৩৫ শ্লোক।

৪

১৮৫২ সালের জানুআরিতে প্রকাশিত স্বসম্পাদিত হিন্দী 'বৈতাল-পচ্চীসী'র ভূমিকায় বিদ্যাসাগর, ১৮৫২ সালের ১৫-জানুআরি, লিখেছেন :

"The Bytal Pacheesee is a Collection of Legendary Stories relating to that celebrated character in Hindu Annals Rájá Vikramáditya. The work contains no traces of art or genius in its composition; but on the contrary exhibits those clumsy attempts at the wonderful, sometimes bordering on childishness, which are so general in the Legends of a dark age. It is, however, very popular among the great mass of the people of this country and expresses accurately their ideas and feelings on many subjects. This fact, and the circumstance of the Hindee version being highly idiomatic and correct in its style, render this work an excellent Text book for students of the Hindee language.

The Original of these tales is to be found in the Kathásaritságara, an ancient and voluminous collection of Tales and Legends in Sanskrit verse, by Somadeva Bhatta, under the title of Betálapanchavinsatika. There exists also, under the same title, a Sanskrit prose version.

In the reign of Muhammad Sháha, Súrat Kabíshwar, by order of Rájá Jye Singh, translated the work from Sanskrit into Braj Bhákhá. This version was translated, by direction of Dr. Gilchrist, in the time of Marquis Wellesley, into Hindoostanee by Muzhar Ali Khan, whose poeti-
cal name was Vilá, aided by Lallu Lál Kab, the elegant writer of Prem-
ságar, both Moonshees of the College of Fort William. This transla-
tion, of which the present is a new edition, was printed in 1805, having
been revised, according to the instructions of Captain James Mouat, by
Tárineecharan Mitra, the learned Head Moonshee of the above Institu-
tion.

A Bengali version of this translation was made by the Editor of
the present edition, in the year 1847, by directions of Major G. T.
Marshall, Secretary to the college of fort William, and was adopted, under
the title of Betálpanchabinshati, as a Text book for the Students of that
college. A poetical version in Bengali also exists and seems to have been
taken from the Original Sanskrit.

In bringing out the edition now presented to the public, the Original
Text of 1805 and the Agra Edition of 1843, have been carefully colla-
ted. The former has been generally adhered to; but the latter, though
sometimes inferior in accuracy, has been occasionally followed in instan-
ces where it appeared judiciously modernised in its style of expression
and orthography. The correct Sanskrit forms of the proper names, as
far as they can be traced, have been inserted in the places where they
occur, at the foot of the page. Some do not admit of Sanskrit equiva-
lents; and it is evident that the Translators were not particular in this
point, and adopted popular epithets at their own pleasure."

৫

বিদ্যাসাগর, ১৮৫২ সালের ১২-এপ্রিল, সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা রচনা করেছেন :

"'NOTES' ON THE SANSCRIT COLLEGE

The creation of an enlightened Bengali Literature should be the first object of those who are entrusted with the superintendence of Education in Bengal.

2. Such a Literature cannot be formed by the exertions of those who are not competent to collect the materials from European sources and to dress them in elegant, expressive, idiomatic Bengali.

3. An elegant, expressive and idiomatic Bengali style cannot be at the command of those who are not good Sanscrit Scholars. Hence the necessity of making Sanscrit Scholars well versed in the English language and literature.

4. Experience proves that mere English scholars are altogether incapable of expressing their ideas in elegant and idiomatic Bengali. They are so much anglicised that it seems at present almost impossible for them, even if they make sanscrit their afterstudy, to express their ideas in an idiomatic and elegant Bengali style.

5. It is very clear then that if the students of the Sanscrit College be made familiar with English Literature, they will prove the best and ablest contributors to an enlightened Bengali Literature.

6. Our next question is what sort of Instruction in the Sanscrit College is necessary for the purpose?

7. The students of the Sanscrit College should be thoroughly instructed in Grammar and Literature—the latter including poems, dramas and prose works.

8. In Rhetoric, they should be instructed in two or three capital works, such as Kavyaprakasha, Dasharupaka and two or three chapters of Sahityadarpana.

9. The study of these that is, Grammar, Literature and Rhetoric will enable the student to acquire a complete mastery of the Sanscrit Language.

10. In Law they should study the following works: The Institutes of Manu, Metakshara Sec. II Vivada Chintamani, Dayabhaga Duttakamimansa, and Duttakachundrika. The study of these is sufficient to make one conversant with the Hindu Laws current in almost every part of India.

11. In mathematics, Lilavati and Vijaganita are the text books. Lilavati treats of arithmetic and mensuration and Vijganita of Algebra. These two works are very meagre and from a curious perversion of Ingenuity and obsessed of a right sense of real value and object of such studies, the author has made them so difficult by putting the rules and questions all in verse that the students cannot go through them in less than three or four years. The examples are very few. The fact is, the study of Sanscrit-mathematics is not only nearly useless in itself, but it interferes largely with other studies and engrosses a great deal

of time and labor which might be employed in far more useful pursuits.

12. Hence the study of mathematics in Sanscrit should be discontinued.

13. It is not to be understood from this that I undervalue a knowledge of Mathematics as an essential element of a complete education. Far from it. I wish to substitute the pursuit of it in English, whence in less than half the time now given to it an intelligent student will acquire more than double the amount of sound information that he could obtain by the most perfect acquaintance of all that exists in the Sanscrit language in the subject.

14. There are six prominent schools in Hindu Philosophy namely Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Patanjala, Vedanta and Mimansa. The Nyaya system of Philosophy principally treats of Logic and Metaphysics and occasionally touches upon subjects of Chemistry, Optics, Mechanics etc. The same description applies more or less to the other systems excepting Mimansha and Patanjala which treat, the former of religious ceremonies, and the latter of abstract contemplation of the Deity.

15. As to the utility of the study of these in a college course I should quote the words of My report dated the 16th, December 1850.

16. "True it is that the most part of the Hindu systems of Philosophy do not tally with the advanced ideas of modern times, yet it is undeniable that to a good Sanscrit scholar their knowledge is absolutely required. By the time that the students come to the Darshana or Philosophy class their acquirements in English will enable them to study the modern Philosophy of Europe. Thus they shall have an ampler opportunity of comparing the systems of Philosophy of their own, with the new Philosophy of Western World. Youngmen thus educated will be better able to expose the errors of ancient Hindu Philosophy than if they were to derive their knowledge of Philosophy simply from European sources. One of the principal reasons why I have ventured to suggest the study of all the prevalent systems of Philosophy in India is that the student will clearly see that the propounders of different systems have attacked each other and have pointed out each others errors and fallacies. Thus he will be able to judge for himself. His knowledge of European Philosophy shall be to him an invaluable guide to the understanding of the merits of the different systems.'

17. Another advantage is, that students so prepared, wishing to transfer the philosophy of the West into a native dress will possess a stock of technical words already in some degree familiar to intelligent natives.

18. A profound knowledge of these is not required. It will suffice if the students go through these words. In Nyaya, Aphorisms of Gotama, and Kusumanjali; in Vaisheshika, Aphorisms of Kanada; in Sankhya, Aphorisms of Kapila and Tuttwa Koumudi; in Patanjala, Aphorisms of Patanjala; in Vedanta the Vedantasara and the I & II Books of the Aphorisms of Vyasa; in Mimansa, Aphorism of *Jaimini*. In addition to these the students should read the Sarvadarshana Sangraha being review of all the systems of Philosophy prevalent in India. The study of these works will make one familiar with Hindu Philosophy without much loss of time.

19. The students of the Sanscrit College, while they are in the Grammar and Literature classes should direct their attention principally to Sanscrit studies, devoting two thirds of the time to the Sanscrit and one third to the English. When they are in the Rhetoric, Law and Philosophy classes their chief attention should be directed to English devoting two thirds of the time to this important branch of Education.

20. At present the following are the subjects for the Senior Scholarship Examinations in the Sanscrit College; Literature, Rhetoric, Mathematics, Law or Philosophy, Sanscrit Prose Essay, Sanscrit Poetical Essay and Bengali Essay. These should be thus modified, Literature and Rhetoric should form our subject. Mathematics in Sanscrit and Sanscrit Essays should be dispensed with, and in their stead three branches in English namely, History, Mathematics and Natural Philosophy should form each a subject of Senior Scholarship Examination in the Sanscrit College. Moral and Mental Philosophy Logic and Political Economy should form also subjects of the same examination being in turn selected every succeeding year.

21. The English Department consisting of two teachers is quite inadequate to fulfil the object in contemplation. Moreover the present teachers are not sufficiently familiar with Mathematics and Natural Philosophy. I am fully convinced that they are not the class of teachers which the necessities of the Sanscrit College absolutely requires. They would do well if transferred to other Institutions where they will not be required to teach more than the elementary portions of an educational course.

22. This Department should therefore be remodelled and made to consist of four efficient teachers with salaries of Rupees 100, 90, 60 and 50 respectively. With these remunerations the services of good scholars may be secured. This arrangement requires 300 Rupees per mensem for the English Department.

23. By the discontinuance of the Sanscrit Mathematical class and the transfer of the two present teachers there will be a saving of 250 Rupees per month; the remaining 50 Rupees should be supplied from the funds appropriated to the Institution which are Rupees 24,000 per annum, and out of which only 19,000 and some odd hundreds are at present expended.

24. But if the state of Education funds would not at present in anyway admit of this additional expense, the demand may be supplied in other ways. There are at present two writers who copy manuscripts, one in Bengali and one in Nagree, each receiving 16 Rupees per mensem. The manuscripts which they copy are quite useless. Manuscripts are generally very incorrect, and every time they are copied, the mistakes and omissions get at least doubled. Thus manuscripts copied by mere copyists become almost unintelligible. Besides, the two writers employed in the Sanscrit College, can copy in one month little more than 5 or 6 rupees work, while they draw 32 rupees per mensem.

Their services therefore should be dispensed with and this 32 rupees will be saved. There is a Junior Scholarship of 8 rupees per month allotted to the English Department. If history and other branches alluded to before be added to the Senior Scholarship Examination, there

will be no use of alloting a separate scholarship for the English Department and the 8 rupees thus saved together with the 32 rupees saved by dispensing with the services of the two writers raises the amount to rupees 40 per month. So only 10 rupees will be required to be paid from the appropriated funds.

25. When I joined the Institution at the end of 1850 the views which I entertained respecting the course of studies to be adopted in the Sanscrit College I submitted to the Council of Education in my report on the Institution. Since that time experience has made me modify my views on some few points. This will explain why these notes disagree in a few particulars with my report.

26. It appears to me that unless the Sanskrit College be remodelled according to the principles now stated there exists no prospect of material improvement or of fully carrying out the objects of the Institution.

Sd/- Eshwar Chunder Sarma.
12th April, 1852.

The accompanying paper has been drawn up by the Principal of the Sanscrit College at my request.

It is the result of several consultations I have held with the Principal and I lay it before the Council as deserving, in my humble judgement, of very careful consideration.

Sd/- F. J. Halliday,
30th June, 1852."*

৬

১৮৫৩ সালের মাঝামাঝি কাশীর সরকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ জে. আর. ব্যালাণ্টাইন, কাউন্সিল-অফ-এডুকেশনের আমন্ত্রণে, কলকাতার সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করতে এলেন। কলকাতার সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে ব্যালাণ্টাইন কাউন্সিল-অফ-এডুকেশনের সেক্রেটারিকে একখানা চিঠি লিখেছেন :

"Sir,

I have the honor to forward for submission to the Council of Education, the following observations suggested by the visit which I have paid to the Calcutta Sanscrit College, by invitation of the council, and under the sanction of the Government of the North West Provinces.

2. From my personal intercourse with the accomplished Principal Pandit Eswar Chunder Vidyasagar, I have derived the gratification I was led to anticipate both by his reputation and by his report on the college, on which the Council sometime ago did me the honour to request my opinion.

3. With the arrangement of the classes in the Sanscrit College, and with the apparent zeal both of teachers and pupils, I have been much pleased. The course of studies (if the appliances of the institution suffice for its being completely carried out), is very full, especially in

* Files For Letters Received (1844-47), Sanskrit College.

the English division of the course. On some points of detail, in regard to the selection of class-books, I may have occasion to offer remarks in the sequel. Leaving out of consideration here various topics on which I shall hope to have opportunities of consulting with Pandit Ishwarchandra by letter, I address myself to the question which I conceive the council to have proposed to me, *viz.*, is there anything in the working of the Calcutta Sanskrit College, or of the Benares Sanskrit College, which might be advantageously adopted by the one from the other? To reply briefly, I think there is, in both—although in consequence of the difference of local circumstances, the two institutions may still judiciously be left to differ in several respects. The bed of Procrustes is not the type of administrative wisdom, and uniformity is dearly purchased when purchased by the sacrifice of more serious interests.

4. A noticeable source of distinction between the two institutions is the fact that the Benares Sanskrit College contains no Bengalis, while the Calcutta College contains nothing else.* The Bengalis who are students of Sanskrit College, participating in the general desire for the acquisition of English, which they see in those around them, may advantageously be introduced to the study of English at that point in the course which Pandit Ishwarchandra has fixed upon. It does not follow that the same arrangement would work well at Benares. To supply instruction to him who craves it and to force instruction on him who does not seek it, are very different things. At the same time I quite approve of its being compulsory, as it is now in the Sanskrit College, to begin English at the stated date, whether the pupils feel inclined to it or not, this arrangement being rendered indispensable by the system of class teaching, the introduction of which into the Calcutta Sanskrit College, has been effected by its present Principal. On the advantage of the class system, in enabling the same teacher to take charge of a very much greater number of pupils, it is unnecessary to dwell. Of the difficulties in the way of adopting the system, to the same extent, at Benares, this is not the occasion to speak. It may suffice here to remark that the Bengali boys are in general more pliant than those of the Upper Provinces, and that Calcutta is so far inoculated with Anglican feeling, consciously or unconsciously, that an argument from Calcutta to the Upper Provinces is very apt to mislead. This holds also conversely and therefore, I would offer any suggestion, for the imitation of either college by the other, under this express proviso, that regard be had to the different circumstances of the two places.

5. Holding, then generally, that the Sanscrit course, in the Calcutta Sanscrit College, is a good one and also (with a complete staff of teachers) the English course, I yet desiderate sufficient provision for obviating the danger that the two courses may end in persuading the

* To prevent misconception here (a misconception which has been sometimes turned to mischievous account) it may be observed that it is the Sanskrit College of Benares that is spoken of, and not the English school associated with it under the same roof. The English school is indeed mainly recruited by Bengalis, but the application of a Bengali for admission into the Sanskrit College of Benares is a thing scarcely known.

learner that 'truth is double.' This danger is no chimerical one. To take an example: I am acquainted with Brahmins who, being well-versed in Sanscrit literature and also familiar with English, are aware that the European theory of logic is correct, and also the Hindu theory, while at the same time, they cannot grasp the identity of the two in such a way as to be able to represent the processes of the one in the language of the other. If this be the case with the very best of those who have studied both Sanscrit and English independently, it is not likely that the case will be different with the general run of pupils similarly trained. One reason why this is to be regretted, is that men so educated cannot satisfactorily communicate to their educated fellow-countrymen who are unacquainted with English much of that valuable knowledge which they themselves have gained through the English. They cannot show that our English sciences are really developments and expansions of truths, the germs of which the Sanscrit systems contain, and therefore, to the mind of their hearers those valued germs appear to be ignored by, or opposed to, English science, when they might easily be shown to be involved in it. It is unnecessary to dwell upon this consideration, because the very constitution of the present Sanskrit College, with its English course and its Sanskrit course, implies the understanding that it is desirable to train up a body of men qualified to understand both the learned of India and the learned of Europe, and to interpret between the two, removing unnecessary prejudice by pointing out real agreement where there was seeming discordance and conciliating acceptance for the advancing science of Europe by showing that European science recognizes all those elementary truths that had been reached by Hindu speculation.

6. With the view of determining what points in the Hindu system corresponded with points in European science, some years ago I took up the system called the *Nyaya*, and (in a work now partly printed in Sanscrit and English, under the title of a "Synopsis of Sciences") I showed the points, in that comprehensive system, from which our various sciences branch out. Some portions of this work I have read and discussed with Pandit Ishwarchandra, in company with one of my co-adjucators, Pandit Vethala Shastri of the Benares College. Pandit Ishwarchandra promises to introduce it to the notice of his classes, and to communicate to me by letter any doubts or difficulties that may arise in the course of the study, so that the crudenesses incidental to a first attempt of such a kind may be gradually eliminated in due time. The next volume will commence with the theory of Inductive Investigation. In dealing with this important branch I hope to enjoy the advantage of Ishwarchandra's co-operation. I observe that he places in his list Mill's great work on the subject. As introductory to the perusal of that work I have prepared an abstract of it, which I have traced, to some extent, the correspondence between its technical terminology and that of the *Nyaya* system in its treatment of the same topics. This abstract (printed by order of Government N.-W.P.) being from its price etc., more suitable for a class-book than the entire work, I propose its adoption into the course. At the annual examinations, I should be glad to supply questions, on this and other works here suggested, the replies to which

might not only furnish evidence as to the progress of the pupils, but might be so contrived as to lead to a still more complete determination of the way in which the mind of the native literate might be best conciliated to Baconian speculations.

7. Besides the *Nyaya* system, there are two other systems taught in the college, *viz.*, the *Sankhya* and the *Vedanta*. A text-book of each of the three has been printed, with English version and notes, for the use of the Benares College. This might with equal advantage be read in the Sanscrit College here, and the criticism both of the pupils and of the teachers might here also lead to a more complete determination of the precise relation between the philosophical nomenclature of India and of Europe. As there is much in the two systems last-named that finds its counterpart in the speculations of Bishop Berkeley, I have reprinted Berkeley's *Inquiry*, with a commentary indicative of these correspondences. I should like that the acuteness of the Calcutta Sanscrit College should be brought to bear upon this exposition also. Where speculation, in countries so widely separated as India and Europe, has arrived at similar or identical conclusions, the conviction of the fact should naturally tend to beget mutual respect, and mutual respect must naturally tend to facilitate the reception, by the less advanced nation, of the science and philosophy of the more advanced one.

8. In offering these remarks and suggestions, I have had in view almost exclusively the desireableness of bridging the charm between the Sanscrit and the English—between the learning of India and the science of England; because the endeavour to bridge the charm is what peculiarize the measures introduced, within the last few years, into the Benares College, and it was this peculiarity (if I mistake not) that attracted the attention of the council. Pandit Ishwarchandra is perfectly competent to work the same system, and to aid me in improving it. As the Sanscrit College at present stands, there is a good Sanscrit course, and a good English course, but the pupil is left to determine for himself whether the principles inculcated in these correspond to one another, or altogether conflict, or correspond partly and if so how far. The pupil, left to determine this for himself, does not, as we have seen, determine it satisfactorily at all, and therefore (not in the way of substitution for any part of the established course, but as an additional feature necessary to the completion of the design) I have suggested the employment of the treatises above-mentioned.

9. If the general principles of this report obtain the approval of the council, as I have reason to believe they have the concurrence of the intelligent Ishwarchandra, I shall co-operate with him most gladly in the endeavour to complete the arrangements for such a course of Anglo-Sanscrit education as shall raise up successive bands of men qualified thoroughly to interpret the mind of Europe to that of India; for this is indeed the great end of such an institution as we may hope for in the Sanscrit College."*

* Copies of correspondence between the Council of Education and the Principal of the Sanskrit College, Benares, 1853, pp. 1-12 [Education (State Archives) Department, Government of West Bengal].

১৮৫৩ সালের ২৯-আগস্ট কাউন্সিল-অফ-এডুকেশন ব্যালান্টাইনের রিপোর্টটি বিদ্যাসাগরের কাছে পাঠিয়ে দিল। বিদ্যাসাগর তদুত্তরে আপন বক্তব্য, ১৮৫৩ সালের ৭-সেপ্টেম্বর, সবিস্তারে জানিয়েছেন :

"I have the honor to acknowledge the receipt of your letter No. 1494 dated 29th ultimo enclosing Report on this Institution from Dr. Ballantyne Principal of the Government College Benares and requesting me to report upon the same.

2. In reply I beg leave to state that I am very happy to observe that all the measures lately introduced into this institution have met with the entire approbation of a man of Dr. Ballantyne's talents and abilities.

3. With regard to the adoption of class-books recommended by Dr. Ballantyne, I regret to say I cannot agree with him on all points. He appears to recommend the adoption of his abstract of Mill's Logic in substitution of the original. Under the present state of things the study of Mill's work in the Sanscrit College is, I am of opinion, indispensable. Dr. Ballantyne's principal reason for recommending the abstract seems to be the high price of Mill's work. Our students are now in the habit of purchasing standard works at high prices. So we need not be deferred from the adoption of this great work on that consideration. Dr. Ballantyne's abstract might be read, to quote his own words, 'as introductory to the perusal of that work.' But the great author himself, in his preface, strongly recommends Archbishop Whatley's treatise on Logic as the best introduction to his work. I, therefore, leave the matter to the decision of the council. Dr. Ballantyne also recommends to adopt as class-books three text-books of each of the three systems of philosophy,—Vedanta, Nyaya, and Sankhya—printed with the English versions and notes. Of these the *Vedantasara*, text-book on Vedanta, is already a class-book here, and its version in English might be read with advantage. The two other text-books recommended by him, the *Tarkasangraha*, the text-book on Nyaya, and the *Tattwasamasa*, that on the Sankhya, are very poor treatises in their own departments. We have better treatises in our curriculum. With regard to Bishop Berkeley's *Inquiry*, I beg to remark that the introduction of it as a class-book would beget more mischief than advantage. For certain reasons, which it is needless to state here, we are obliged to continue the teaching of the Vedanta and Sankhya in the Sanscrit College. That the Vedanta and Sankhya are false systems of philosophy is no more a matter of dispute. These systems, false as they are, command unbound reverence from the Hindus. Whilst teaching these in the Sanscrit course, we should oppose them by sound philosophy in the English course to counteract their influence. Bishop Berkeley's *Inquiry*, which has arrived at similar or identical conclusions with the Vedanta or Sankhya and which is no more considered in Europe as a sound system of philosophy, will not serve that purpose. On the contrary, when, by the perusal of that book, the Hindu students of Sanscrit will find that the theories advanced by the Sankhya and Vedanta systems are corroborated by a philosopher of Europe, their reverence for these two systems may increase instead of being diminished. Under these circumstances, I

regret I cannot agree with Dr. Ballantyne in recommending the adoption of Bishop Berkeley's work as a class-book.

4. I also beg leave to state that I cannot quite agree with Dr. Ballantyne when he admits that both the Sanscrit and English courses in the Calcutta Sanscrit College are good and yet desiderates 'sufficient provision for obviating the danger that the two courses may end in persuading the learner that 'truth is double.' 'This danger,' says Dr. Ballantyne, 'is no chimerical one.' 'To take an example,' he continues, 'I am acquainted with Brahmans who being well-versed in Sanscrit literature and also familiar with English, are aware that the European theory of logic is correct, and also the Hindu theory, while at the same time they cannot grasp the identity of the two in such a way as to be able to represent the processes of the one in the language of the other.' I believe, the danger that Dr. Ballantyne apprehends is not so inevitable in the case of an individual who has intelligently studied both English and Sanscrit sciences and literatures. Truth is truth if properly perceived. To believe that 'truth is double' is but the effect of an imperfect perception of truth itself—an effect which I am sure to see removed by the improved courses of studies we have adopted at this institution. It must be considered as a singular circumstance if an intelligent student cannot perceive identity of truths where there is real identity. Suppose students read logic or any other department of science or philosophy both in Sanscrit and English. If they be found to assert, 'that the European theory of logic is correct and also the Hindu theory, while at the same time, they cannot grasp the identity of the two in such a way as to be able to represent the processes of the one in the language of the other', the hearer is naturally led to conclude that either they cquld not comprehend the subject with sufficient clearness, or that their familiarity with the language, in which they are found unable to express themselves, is not sufficient. It must be confessed, however, that there are many passages in Hindu philosophy which cannot be rendered into English with ease and sufficient intelligibility only because there is nothing substantial in them.

5. I further beg leave to state that I regret I cannot but differ a little from Dr. Ballantyne when he observes 'that the very constitution of the present Sanscrit College with its English course and its Sanscrit course implies the understanding that it is desirable to train up a body of men qualified to understand both the learned of India and the learned of Europe and to interpret between the two, removing unnecessary prejudice by pointing out real agreement where there was seeming discordance, and conciliating acceptance for the advancing science of Europe by shewing that European science recognizes all those elementary truths that had been reached by Hindu speculation.' It is not possible in all cases, I fear, that we shall be able to shew real agreement between European science and Hindu Shastras. Even if we take it for granted that we shall be able to point out agreement between the two, it appears to me to be a hopeless task to conciliate the learned of India to the acceptance of the advancing science of Europe. They are a body of men whose longstanding prejudices are unshakable. Any idea when brought to their notice either in the form of a new or in-

the form of the expansion of truths, the germs of which their Shastras contain, they will not accept. It is but natural they would obstinately adhere to their old prejudices. To characterize them as a class I can do no better than quote the words of Omar. When Amru, the Arab General the conqueror of Alexandria wrote to Omar about the disposal of the Alexandrian library, the Caliph replied 'The contents of those books are in conformity with the Quran or they are not. If they are, the Quran is sufficient without them; if they are not, they are pernicious. Let them, therefore, be destroyed.' The bigotry of the learned of India, I am ashamed to state, is not in the least inferior to that of the Arab. They believe that their shastras have all emanated from omniscient Rishis and, therefore, they cannot but be infallible. When in the way of discussion or in the course of conversation any new truth advanced by European science is presented before them, they laugh and ridicule. Lately a feeling is manifesting among the learned of this part of India, especially in Calcutta and its neighbourhood, that when they hear of a scientific truth, the germs of which may be traced out in their Shastras, instead of shewing any regard for that truth, they triumph and the superstitious regard for their own Shastras is redoubled. From these considerations, I regret to say that I cannot persuade myself to believe that there is any hope of reconciling the learned of India to the reception of new scientific truths. Dr. Ballantyne's views may be successfully carried out in the North-West Provinces where his experience has made him arrive at his conclusions with regard to the learned of India.

6. But in Bengal the case is very different. His remarks that 'regard be had to the different circumstances of the two places' and that 'the bed of Procrustes is not the type of administrative wisdom' are very judicious. The local circumstances of this part of India compel us to pursue a different course for the dissemination of sound knowledge. I have with care and attention observed the state of things here, and my impression is, that we should not at all interfere with the learned of the country. We do not require to get them reconciled because we do not require their assistance in any shape. We need not fear the opposition of a body declining in their reputation. Their voice is gradually becoming more and more feeble. There is little chance of their regaining their former ascendancy. To whatever part of Bengal is the influence of education extending, there the learned of the country are losing their ground. The natives of Bengal appear to be very eager to receive the benefit of education. The establishment of colleges and schools in different parts of the country has taught us what we can do, without attempting to reconcile the learned of the country. What we require is to extend the benefit of education to the mass of the people. Let us establish a number of vernacular schools, let us prepare a series of vernacular class-books on useful and instructive subjects, let us raise up a band of men qualified to undertake the responsible duty of teachers and the object is accomplished. The qualification of these teachers should be of this nature. They should be perfect masters of their own language, possess a considerable amount of useful information and be free from the prejudices of their country. To raise up

such a useful class of men is the object I have proposed to myself and to the accomplishment of which the whole energy of *our* Sanscrit College should be directed. That the students of our Sanscrit College, when they shall have finished their college course will prove themselves men of this stamp we have every reason to hope. Nor is this hope an illusive one. That the students of the Sanscrit College will be perfect masters of the Bengali language is beyond any possible doubt. If the contemplated new organization of the English Department be sanctioned, there is every possibility of their being able to attain considerable proficiency in the English language and literature and thereby acquire a considerable amount of useful information. It is very gratifying to observe that they have lately begun to think in such a way as to promise that hereafter every qualified student will be found free from all the prejudices of his countrymen. As a specimen of what may be expected from the Sanscrit College here, I beg leave to enclose herein an English translation of a Bengali Essay of the past session by a senior student of this institution who has still about three years to finish his collegiate course and has yet made but little progress in the English language and literature.

7. In conclusion I beg most respectfully to state that if I may be so fortunate as to be permitted to carry out the system introduced, I can assure the council with great confidence that the Sanscrit College will become a seat of pure and profound Sanscrit learning and at the same time a nursery of improved vernacular literature, and of teachers thoroughly qualified to disseminate that literature amongst the masses of their fellow countrymen.

8. The Report of Dr. Ballantyne in original which accompanied your communication is returned herewith."*

৭

১৮৫৩ সালের ১৬-জুলাই বিদ্যাসাগর কাউন্সিল-অফ-এডুকেশনকে লিখেছেন :

"I have the honour to state for the information of the council, that the last Junior class now contains 58 pupils and that further admission into it has become quite impracticable. Applications for admission are constantly received. To meet this demand it is necessary to form an additional Junior Sanscrit class which will require an outlay of not less than Rs. 30 per mensem, for the services of a competent teacher. Should this proposition be sanctioned, the Sanscrit instructive establishment will be complete and there will be no necessity of any further extension in this department.

I beg leave to embrace this opportunity of again bringing to the notice of the Council the necessity of strengthening the English Department of this college. Under present circumstances, five teachers are

* Copies of correspondence between the Council of Education and the Principal of the Sanskrit College, Benares, 1853, pp. 13-29 [Education (State Archives) Department, Government of West Bengal].

absolutely required for the efficiency of this department, which will require an outlay of Rs. 360 per month, as noted in the margin.

1 Professor of Literature	...	Rs.	100
1 Professor of Mathematics	...	„	100
1 First Junior Master	...	„	80
1 Second do	...	„	50
1 Third do	...	„	30
		Rs.	360

The salary of the three present English teachers, together with that of the Professor of Sanscrit Mathematics whose services will be dispensed with, amounts to Rs. 282 per mensem ; so that, on this account, Rs. 78 a month are required to be paid from the funds assigned to the institution.

This amount, added to the Rs. 30 required for the services of a Junior Sanskrit teacher, will entail an additional expenditure of Company's Rs. 108 per month, or Company's Rs. 1,296 per annum. The total disbursements of the year 1852-53 have been Rs. 19,496-1-6 and the proposed additional charge will bring up the annual expenditure to Company's Rs. 20,792-1-6, being Rs. 3,207-14-6 under the annual assignment of Company's Rs. 24,000.

There appears to be some misapprehension in regard to this annual grant of Company's Rs. 24,000, and I am anxious therefore to enter an explanation on the subject.

It would appear, from your letter No. 526 dated the 22nd March 1850 to the late secretary of this institution that the Council were under the impression that the sum of only Company's Rs. 17,694 per annum had been appropriated to the maintenance of the Sanskrit College. On this point I beg most respectfully to draw the attention of the Council to the following facts.

In 1824 when the college was founded the Government made a separate grant of Rs. 24,000 per annum for the maintenance of the institution.

The Resolution of the Government of India, dated the 7th March 1835, ordered the abolition of the stipendiary system, the discontinuance of the printing of Oriental Works and the employment of the savings therefrom in imparting to the native population a knowledge of English literature and science through the medium of the English language. It must be confessed that by this resolution all funds came to be considered as one and there ceased to be for a time any separate fund for any particular institution.

When in 1839 the question relating to the appropriation of funds assigned to particular institutions came before Lord Auckland, the then Governor-General of India, in his celebrated Minute on Native Education dated Delhi the 24th of November 1839, His Lordship, after taking a review of money estimates and of local wants, arrived at the conclusion that the funds assigned to each Oriental seminary should be restored to, and employed exclusively for the purposes of that seminary.

His Lordship observes: 'I see no advantage to be gained in this case by a close contest for strict constructions, and having taken a review of money estimates and of local wants, I am satisfied that it will be best to abstract nothing from other useful objects, while I see at the same time nothing but good to be derived from the employment of the funds which have been assigned to each Oriental seminary, exclusively on instruction in, or in connection with, that seminary. I would also give a decided preference within these institutions, to the promotion in the first instance of perfect efficiency in oriental instruction, and only after that object shall have been properly secured in proportion to the demand for it, would I assign the funds to the creation or support of English classes. At the same time, I would supply to the General Committee of Public Instruction from the revenues of the State any deficiency that this resolution might cause in the general income at their disposal. And if they should already have partially used for other objects, the savings arising from the seminaries supported by special funds, I would in recalling such savings, protect the General Committee from loss on that account.' (See Appendix page vi of the Report of the General Committee for the year 1839-40).

On receipt of Lord Auckland's Minute, the late General Committee of Public Instruction, in their monetary statement concerning the Sanskrit College, noted in the margin, distinctly stated that the allowance of the Sanskrit College was Rs. 2,000 per mensem, when they reported to Government on the state of colleges and schools under their control and on the measures which they considered requisite and expedient for the promotion of efficient education by means of these institutions in accordance with the principles and sentiments recorded in Lord Auckland's Minute (see the letter of the General Committee No. 1035, dated the 30th October 1840 in the Appendix No. II to the above Report).

	Present	Proposed
Allowance Rs. 2,000		
Secretary	100	100
Asst. Secretary	50	50
9 Pandits	637-5-4	720
Natural Philosophy Teacher ...	80	90
Establishment	142-10-8	154
Stipends	290-10-8	0
Prizes	100	12
Books and contingencies	20	20
Scholarships	0	328

The Honourable the Court of Directors, in their Despatch No. 1 of 1841 dated the 20th January 1841, confirmed the views of Lord Auckland regarding the restoration and appropriation of funds assigned to each Oriental seminary. The Hon'ble Court observe: '3. In reference not only to the desire which has been manifested by numerous and respectable bodies of both Muhammadans and Hindus, but also to more general considerations, it is our firm conviction that the funds assigned to each native college or Oriental seminary, should be em-

ployed exclusively on instruction in, or in connection with that college or seminary, giving a decided preference within those institutions to the promotion, in the first instance, of perfect efficiency in Oriental instruction.'

'5. We are aware that the opinions which we have now expressed, favourable on the one hand to the application of the funds belonging to the native colleges or seminaries, for Oriental instruction in the first instance, and on the other hand to the diffusion of European instruction, involve an increase of expense to the State. To this we are prepared to submit, concurring as we must do, in the opinion which our Governor-General has expressed of the insufficiency of the funds hitherto allotted to the purposes of public instruction in India. You have, therefore, our authority to make up any deficiency in the income now at the disposal of the General Committee which may be occasioned by restoring the allowances of several Oriental Colleges to the purposes for which they were originally made.' (See pages cli & cliii of the Appendix No. IV to the above Report).

That the assigned allowance of the Sanskrit College amounting to Rs. 24,000 per annum has not been subsequently curtailed to a less amount appears from the fact that the Accountant General every year credits Rs. 24,000 on account of the Sanskrit College and after debiting its annual expenditure amounting to Company's Rs. 19,000 and some odd hundreds, credits the surplus in favour of the council.

With due deference and submission I would beg leave to observe that from the facts stated above, it is clear that the allowance assigned to the Sanskrit College amounts to Rs. 24,000 per annum; that this amount ought to be exclusively employed to the purposes of the Sanskrit College so long as the community may desire to avail themselves of the advantages afforded by this institution; and that after provision shall have been properly made for imparting Sanskrit learning in proportion to the demand for it, the funds ought to be assigned to the creation or support of English classes.

I further beg leave to remark that it nowhere appears that the Rs. 17,694, alluded to in your letter mentioned before, is the only grant apportioned to the maintenance of the Sanskrit College. In 1840, Rs. 17,694 were sanctioned by the Government of India as the then required annul expenditure of the institution. It cannot be inferred from this, that this sanctioned annual expenditure was fixed upon by Government as the maximum allowance of the Sanskrit College. In that same letter of Government which sanctions the annual expenditure of Rs. 17,694 mention is distinctly made that the funds assigned to each Oriental seminary should be exclusively employed to the purposes of that seminary (see pp. cxxxvii & cxliii of the Appendix No. III to the above Report).

In conclusion, I beg leave to observe that under these circumstances the Sanskrit College appears to be fully entitled to have an additional Junior Sanskrit class, there being great demand for Sanskrit learning, as appears from the number of candidates for admission, and as well as to a further outlay for placing its English classes on an efficient

footing as long as the expenditure does not exceed the allowance assigned to the institution.

I further beg leave to observe that if an extended and improved system of vernacular education in Bengal be carried out, and the Sanskrit College be regarded in the light of a Normal school to meet the increased demand for higher order of Bengali teachers that will arise, it will be unable to meet this demand without a considerable extension of its present classes."°

৮

১৮৫৩ সালের ৫-অক্টোবর বিদ্যাসাগর কাউন্সিল-অফ-এডুকেশনের ডঃ ময়েটকে একখানা আধা-সরকারী চিঠি লিখেছেন। চিঠিখানা উদ্ধার করি :

"My dear Sir,

After the most attentive consideration of the orders of the Council in reference to Dr. Ballantyne's report on the Sanskrit College, I feel compelled to inform you that those orders, if carried out in their integrity, will involve a degree of interference with the scheme of study lately adopted by me with the sanction of the council, that will not only make my position in the college somewhat unpleasant but will tend, I am convinced, to impair the usefulness of the institution itself.

In the hurry and bustle of closing the college and of preparing to go home I am unable to write officially on the subject. But before I leave Calcutta I am anxious to state to you briefly some of the more important objections to the carrying out of Dr. Ballantyne's plan which have occurred to me.

For the present at least I am unwilling to mix up with the discussion of an important matter any question of a personal character in being forced to adopt a plan of study which I cannot approve of or in being obliged to communicate to a fellow Principal in the same position in the service with myself on the progress of my classes,—conditions which I suspect few educated Englishmen will be found to submit to. Waiving such personal considerations I will come at once to the real question at issue.

Dr. Ballantyne's suggestions seem to me to be based upon the assertion that without their adoption the danger of the Anglo-Sanskrit scholar being a follower of 'double-truth' cannot be avoided. I will not pretend to question the Doctor's experience among his learned friends at Benares. But of this I am certain that not a single instance can be pointed out in Bengal of any sensible man who has studied English as well as Sanskrit being persuaded that 'truth is double.'

Leave me to teach Sanskrit for the leading purpose of thoroughly mastering the vernacular and let me superadd to it the acquisition of sound knowledge through the medium of the English and you may rest assured that before a few years are over I shall be enabled, if

° Education Department consultation, 22 September 1853, No. 44.

supported and encouraged by the council, to furnish you with a body of young men who will be better qualified by their writings and teaching to disseminate widely among the people sound information than it has hitherto been possible to accomplish through the instrumentality of the educated eleves of any of your colleges whether English or oriental. To enable me to carry out this great—this darling object of my wishes I *must* (excuse the strong word) to a considerable extent be left unfettered. So far as I can approve of Dr. Ballantyne's abstracts and treatises—such for instance as his excellent edition of the *Novum Organum* in English, I will avail myself of them most readily and cheerfully. But if compelled to adopt all his compilations without any reference to my own humble judgment as to their utility and value or to their adaptation to the peculiar wants of the institution over which I have the honour to preside 'my occupation is gone.' Such a system would break in upon and interrupt my own plan of instruction and in spite of my sense of duty as a servant of the council the responsibility which I now keenly feel will be assuredly weakened if not destroyed.

I hope these hints, somewhat ramblingly and hastily thrown out, will receive the kind and indulgent consideration of the council, so as to induce them to modify their Resolution of the 14th ultimo so far as not to make the course of study in the Sanskrit College a compulsory one.

If required I shall be happy to send in an official and consequently a more formal letter on the subject after the termination of the holidays."*

৯

১৮৫৪ সালের ৩-জুলাই বিদ্যাসাগর বাঙলার ছোটোলাটের প্রাইভেট সেক্রেটারি ক্যাপ্টেন এইচ. সি. জেমসকে একখানা চিঠি লিখেছেন :

"Agreeably to the instructions of the Honorable the Lieutenant Governor of Bengal verbally communicated to me by his Honor, I visited, from the 21st of May to 11th June last, several places in the District of Hoogly for the purpose of selecting suitable villages and towns for establishing the contemplated vernacular schools, and beg leave to request the favor of your submitting to His Honor the following report.

2. On the 21st May last I visited Sheakhala, 21 miles distant from Calcutta and situated on the Sulkea Road. This place is the abode of about a thousand families and has in its close vicinity several villages. When the object of my visiting the place was known, the principal inhabitants of this place, as well as of the surrounding villages assembled and waited upon me to express their eager desire to have a Government Vernacular School at Sheakhala. I asked them if they were pre-

* Copies of correspondence between the Council of Education and the Principal of Sanskrit College, Benares, 1853, pp. 49-52 [Education (State Archives) Department, Government of West Bengal].

pared, in case Government established a vernacular school there, to give over to Government a piece of land suitable for erecting a school house upon it, and erect a school-house at a cost of about three hundred rupees. Several Brahmins shewed me their Lakhiraj lands and told me that any of these lands and as much as may be required for the purpose they will most willingly make over to Government. But as they are generally poor their circumstances would not enable them to erect a school-house at a cost of three hundred rupees which is in fact an enormous amount to them. From all that I observed, I have not the least doubt that vernacular education would be highly appreciated at Sheakhala and the villages around.

3. On the day following I visited Radhanagar and Krishnagar, villages about 40 miles west of Calcutta. These two villages in close contact of each other contain about a thousand families and are surrounded by many villages. From conversation with several principal inhabitants it appeared to me to be very clear that vernacular education will be highly appreciated here. A piece of land suitable for erecting a school-house the inhabitants are ready to make over to Government. But as they are generally poor they are unable to erect a suitable school-house at their own expenses.

4. On the 24th May last Kheerpoy, a town containing above three thousand families and about 60 miles west of Calcutta was visited by me. The principal inhabitants, with whom I conversed on the subject of the contemplated vernacular schools, appeared to me to be very eager to have one in their town. Kheerpoy, I am of opinion, fully deserves to be the seat of a new vernacular school. If a school be established here, the inhabitants are willing to make over a piece of land to Government for erecting the school-house, but being generally poor they are unable to meet the expenses of raising a suitable school-house.

5. Next I intended to visit Chandrakona, a very populous town and already the seat of a Government Vernacular School and 8 miles distant from Kheerpoy. But I was informed that the school was at the time closed for a month or so, the teachers being absent on leave. Instead of visiting the place I made enquiries regarding the state of the school etc. and the following information I picked up from creditable quarters.

Chandrakona is in the Zemindary of Babu Joykissen Mukherji who is generally said to be the founder of the school and the Seminary is known as Joykissen's School.

The school contains no more than 50 pupils. The teacher Babu Lakhan Pal is an ex-student of the Baraset Government School, and is but an imperfect Bengali scholar.

Of 50 pupils 35 regularly read English and nominally a little of Bengali. These pupils pay to the master fees varying from 4 to 8 annas. They attend the school only for the purpose of reading English. The remaining 15 only may be properly said to be the pupils of this vernacular school. They pay the usual fee of one anna as fixed by Government.

The inhabitants of this town care very little for educating their children.

Of the 35 pupils that resort to this school many come from distant villages.

6. From these facts Chandrakona does not appear to me at all to be fit for establishing an experimental vernacular school.

7. On the 27th May last Sreepoor and Kamarpookoor were visited. These two villages and two or three villages in close contact with them, contain about two thousand families. The distance of Sreepoor from Calcutta is about 60 miles and it is situated on the Sulkea Road, west of Jehanabad about 8 miles. Sreepoor and Kamarpookoor are in the Zemindary of Babu Dharmadas Laha who is also an inhabitant of Kamarpookoor. I paid a visit to Babu Dharmadas and conversed with him on the subject of my visit. Babu Dharmadas and the principal inhabitants of the place who were present there expressed their great eagerness to have a Government Vernacular School. Babu Dharmadas is prepared to erect a suitable school house at his own expense and make it over to Government, if a vernacular school be established at Sreepoor or Kamarpookoor. He also shewed me two of his Catchery houses any one of which he is willing to make over, if that will serve the purposes of the school. He appeared to me to have taken great interest on the subject of my visit. Sreepoor appears to be a very fit place for an experimental vernacular school.

8. Next I visited Ramjeebanpoor on the 30th May last. This town contains about two thousand families and is south of Sreepoor about 6 miles and north of Kheerpoy about the same distance. This is a fit place for having a Government vernacular school. But if Kheerpoy and Sreepoor be selected for the purpose of establishing schools the establishment of a vernacular school here might be withheld, being too near those two places.

9. On the 4th June last, I visited Mayapoor about 40 miles from Calcutta on the Sulkea Road. Like Chandrakona this place is in the Zemindary of Babu Joykissen Mukherji and has a Government Vernacular School which is after his name called Joykissen's School, he being supposed to be the founder of the institution. Though Mayapoor and its contiguous villages are very populous fiftythree names only are in the Register of the school. Of these 20 only were present when I visited the school. The pupils read English and Bengali but like Chandrakona, here they do not pay separate fees for reading English. They pay each the usual fee of one anna a month. From what I observed a vernacular school would not be prosperous here. I asked the pupils how would they like if the study of English were discontinued in the school and the vernacular portion of the study be better regulated. They said in that case their parents would not send them to the school. In fact Mayapoor does not appear to me to be at all fit for an experimental vernacular school.

10. On the 5th June last I visited Moloypoor 4 miles north of Mayapoor. Moloypoor and Keshabpoor are in close contact of each other and contain above twelve hundred families. All classes of people here appeared to me to be very eager to have a Government Vernacular

school. It was a very interesting scene when I visited this place. It appears to me to be highly desirable to establish a vernacular school here.

11. Last of all on the 10th and 11th of June last, I visited Pantihal, a place about 16 miles west of Howrah. Pantihal and several villages in close contact with it contain about three thousand families. The principal inhabitants, with whom I conversed on the subject of vernacular school, expressed their eager desire to have one at Pantihal. They are prepared to erect a school-house and make it over to Government with the piece of land on which it would be erected. Pantihal fully deserves to have a vernacular school established there.

12. The vacation of the Sanscrit College drawing to a close I was obliged to return to Calcutta and could not inspect any more places in the Hoogly district, nor could I go through my tour through Bardwan, Nuddea, and 24 Purgunnas. In the Hoogly district Goopteeparah, Somrah and Balagur about 16 miles north of Hoogly require to be visited and from the information I have picked up concerning these places, it is desirable that a vernacular school be established in any one of these three villages. In Baichee, about 24 miles west of Hoogly on the Great Trunk Road there already exists a Government Vernacular School which I am told is in a tolerably flourishing condition. Boichee is a very populous village. A new vernacular school might therefore be established there in place of the old.

13. I have enquired about fit places for establishing vernacular schools in the districts of Nuddea, Bardwan, and 24 Purgunnas. In Nuddea and Bardwan fit places may be selected from among the following villages:—

In Nuddea:—Cachraparah; Sootargachee; Goburganga; Chhawghariah; Santipoor; Billagram; Metilee; Debagram; Miherpoor; Maheshpoor.

In Bardwan:—Culnah; Satgachee; Poorvasthalee; Amadpoor; Jowgang and Kulingang; Koochoot; Khanda-ghose; Indesh; Sadipoor; Khanda; Bonepash; Sonamookhee; Cutwa; Dewanganga.

14. In 24 Purgunnahs there are only two places where vernacular education will be properly appreciated, Majilpoor and Pooro Majilpoor, about 30 miles south of Calcutta has already a Government vernacular school in a tolerably prosperous condition. Pooro about 24 miles east of Baraset deserves to be the seat of a vernacular school.

15. In conclusion I beg leave to state that immediately after the order is passed for the establishment of schools, arrangements might be made in those places that I have visited for opening the schools without waiting for the erection of the school-houses which will at least require two or three months to be completed.

16. In accordance with the wish of His Honor verbally communicated to me I further beg leave to state that the expenses of my tour amounted to Rupees 51-8-3 Fifty one eight annas and three pie."*

* Education Department Consultation, 19 October 1854, No. 118.

১০

বাঙলাশিক্ষা সম্পর্কে চিঠি :

"No. 525.

From

The Under-Secretary to the
Government of Bengal,

To

The Under-Secretary to the
Government of India,
Home Department.

Dated Fort William, the 16th November 1854.

GENERAL EDUCATION

SIR,

With reference to the letter from your office noted in the margin, I am directed to inform you, that on receipt of that letter, the Government of Bengal put itself in communication with the Council of Education, with a view to determining the best mode of establishing and extending a sound system of vernacular Education in these Provinces.

No. 749, dated 4th Nov. 1853.

Vide Pro. 24th Nov. 1853. Nos. 126-128.

2. The Council of Education gave their careful attention to the subject and have recently reported the result to Government.

3. The Lieutenant-Governor was at that time a Member of the Council of Education, and in that capacity he stated his views of the course proper to be taken, in a Minute, which it seems best, since it still expresses the Lieutenant-Governor's opinions, to set out at length in this place.

The Lieutenant Governor wrote as follows:—

Vernacualr Education

"(1.) I have very carefully considered this matter, and shall proceed now to state very briefly what steps should, in my opinion, be taken to give effect to the determination of the Most Noble the Governor General in Council, as expressed in the enclosure to Mr. Beadon's letter to the Council of Education, dated 19th November last.

"(2.) In the province of Bengal we have a vast number of indigenous Schools. I have carefully inquired about them from several well-informed persons, Native and European, and I am assured that these Schools are universally in a very low and unsatisfactory condition, the office of School-master having, in almost all cases, devalued upon persons very unfit for the business.

"(3.) Our object should be, if possible, and as far as possible, to improve these Schools, and we cannot do better than follow the excellent example of the late Lieutenant-Governor of the North-Western Provinces,

and establish a system of Model Schools as an example to the indigenous Schools, and a regular plan of visitation by which the indigenous School-masters may gradually be stimulated to improve up to the models set before them. By degrees this system may be extended over the whole of Bengal; but as in the North-Western Provinces, I think it will be wise to begin with a manageable extent of Districts, say four or five Zillahs in the neighbourhood of Calcutta and the Zillahs of Behar.

"(4.) If the plan takes root in these Districts, and the Schools produce their expected result in the improvement of indigenous Education now prevalent, it will spread almost spontaneously to neighbouring Zillahs, and each successive extension will be easier and more economical than the earlier attempts.

"(5.) I append a memorandum* on the subject, drawn up by the energetic and able Principal of the Sanscrit College, who, as is well known, has long been Zealous in the cause of Vernacular Education, and has done much to promote it, both by his improved system in the Sanscrit College and by elementary works which he has published for the use of Schools.

"(6.) I approve generally of the plan which is contained in the Principal's memorandum, and would wish to see it carried into effect.

"(7.) According to this plan, the monthly expense of say 20 Schools, distributed over four Zillahs, and allowing for rewards and a rather more liberal allowance to the Head Superintendent that the Principal has proposed for himself, would be about Rupees 21,000 per annum, or Rupees 5,250 for each Zillah. Mr. Thomason's first plan allowed Rupees 4,500 to each Zillah annually; but in Mr. Thomason's plan a large extra expense was incurred for European superintendence, with which, in Bengal, I should for the present be willing to dispense. I am aware that Native superintendence is not often to be depended upon without European overlooking; but Pundit Ishwar Chunder Surma is an uncommon man, who has shown great energy and zeal in this matter, and I should be well pleased to let him try an experiment, in the result of which he is greatly interested, and which I really think will succeed in his hands. My estimate accordingly provides for an allowance to him for this duty of Rupees 200 a month, including travelling charges. This, in addition to the Rupees 300 he draws as Principal, will be a fair remuneration. He has asked for none.

"(8.) It would be the duty of the Superintendent and his Staff to visit all Vernacular Schools within their limits, which might be open to their inspection, and to aid and encourage them in every possible way. There is a method of doing this, which has been found successful by a zealous Missionary, and which, together with other methods, might be employed by the Superintendent. It is to supplying books to a promising indigenous School-master, and give him a small pecuniary reward for every boy in his School capable, after a time, of reading and understanding these books, upon condition of being allowed to introduce a superior class of Teachers into the School, as soon as it shall become

* This memorandum accompanies this letter.

fit for it. By these means a number of indigenous Schools may possibly be greatly improved at a small comparative expense.

"(9.) Something must be allowed for this, and similar attempts in the financial estimate, but it is impossible to say how much.

"(10.) Mr. Long, the Missionary, of whom I spoke, has found the expense not to exceed Rupees 75 per mensem for three Schools of 100 boys each, after introducing a greatly improved, though still simple system of tuition, or Rupees 25 for each School, which is reasonable enough.

"(11.) It would also be the business of the Superintendent and his Staff to encourage and assist Zemindars and other persons in the interior to establish village Schools at their own expense, and to supply them with proper Masters and books.

"(12.) If these measures were adopted, and if at the same time direct encouragement were given to Vernacular Education, by a regular system of preferring for even the lowest offices under Government persons able to read and write, there can be no doubt that a great impulse would be given to the desire for Education which already exists in Bengal; and by a judicious encouragement and dissemination of approved Vernacular books through the Schools, and occasionally by the establishment of Libraries in fit places, a powerful impression might, in a reasonable time, be made on the Native mind.

"(13.) It is the opinion of the Principal of the Sanscrit College, and of others whom I have consulted on the subject, that although admission to the Government Model Vernacular Schools ought at first, and for some time, to be gratuitous, they are certain, at no distant time, to be self-supporting, as all the indigenous Schools now are. Hence the extension of the plan now proposed will not involve a proportionate expense, and though I think it safe (agreeing with our President on that point) to following Mr. Thomason's example in beginning with a few Zillahs at first, I should be prepared to extend it as soon as ever we had been able to feel our way with certainty. There is a second method, by which I should propose experimentally to further the spread of sound Vernacular Education.

"(14.) I append to this Minute a letter from the Rev. Mr. Long, in which he sets forth what he is doing in the way of Vernacular Education in the Zillah of the 24-Pergunnahs, and ask for a Grant in aid.

"(15.) Mr. Long teaches, or proposes to teach, in his Schools, History, Biography and Geography, with especial reference to Bengal and India; Arithmetic, Writing by dictation, Natural History, Grammar and Etymology. He makes use of the indigenous Schools as a foundation to work upon, and he aims at their improvement. He asks for a Grant of Rupees 25 a month, and thinks that this would enable him to double the number of his Schools. He has at present three. He says further, that in visiting indigenous Schools, he is frequently in want of means to give improved books, or pecuniary rewards, and thus to encourage and stimulate improvement. For this he asks further for Rupees 15 per mensem. Total Rupees 40 per mensem. This is a small Grant for such a promise of result. He agrees gladly to have his Schools at all times inspected by Government officers.

"(16.) Now I believe that Mr. Long has in this case set an example

which will be followed by many Missionaries. Their Schools are numerous and may be made still more so.

"(17.) It is notorious that the Missionary Vernacular Schools have succeeded where ones have failed, and with proper inspection, we can be sure of their good working. I think that the time has come when we may wisely use the services of these laborious, zealous, and earnest men. I would recommend that Mr. Long's request be granted by the Government, and that the same be done, within reasonable limits, as to other similar request, that may be made. Nor would I confine this part of the plan to Missionary Vernacular Schools. I would aid similarly other approved Vernacular Schools that might come forward for the purpose. And I think it probable that in this manner we may, in many parts of Bengal, assist the spread of Vernacular Education more rapidly and more economically than by any other means, and perhaps more effectively.

"(18.) I should propose to use the services of our Native Superintendent as an Inspector and Examiner in such cases of Grants in aid.

"(19.) If the plan succeeded as I should expect, we might extend our system over Bengal at a much smaller expense than has been estimated for the commencement of the undertaking; but it is obvious that as the system was extended, we should require a larger Staff of superintendence, and the time will then I think have arrived for placing the whole business in Bengal and Behar, and the rest of the Lower Provinces, under a European officer, as has been done in the North-Western Provinces.

"(20.) I have no information which enables me at present to propose a distinct plan for Behar, yet the Zillahs of the Behar Province ought not to be left uncared for. They are proverbially in a state of darkness and very different from Bengal, where indigenous Schools abound.

"(21.) For the present I should advise that a capable Civil Officer should be selected, acquainted with the Behar Province, and that to him should be committed the duty of organizing a system of Model Schools and indigenous School—encouragement similar to that which in the hands of Mr. Reid proved so successful in the neighbouring zillahs of the North-Western Provinces.

"(22.) The same Officer might be made use of in giving and superintending Grants in aid in the Behar zillahs. There are eight zillahs in that Province, equal to the number with which the experiment was commenced in the North-Western Provinces. I should not estimate the expense as likely to exceed that allowed for the same number of zillahs under Mr. Thomason, *viz.*, Rupees 36,000 per annum, exclusive, as in the North-Western Provinces, of the salary of the Superintendent, which I suppose would be, if a Covenanted Officer were selected, Rupees 1,000 per mensem. This estimate is also exclusive of Grants in aid of existing Schools.

"(23.) The eight zillahs of Behar would thus be provided for, as were the same number in the North-Western Provinces, at an expense of say Rupees 50,000 per annum. Four zillahs in the Lower Provinces would for the present cost Rupees 21,000 and Grants in aid might be

degrees make up a total of a lakh of Rupees. As we advance, the Schools would cost less, but the superintendence might cost much more.

"(24.) Putting it at the same rate as the North-Western Provinces, and Behar, the whole annual ultimate expense of Model Schools and superintendence, besides Grants in aid in the Lower Provinces, would not equal two lakhs of Rupees. But this estimate allows nothing for the gradual introduction of the paying system, by which (if the Government were to use its patronage to the encouragement of the scheme) it is certain that a large part of the expense would be covered. It allows nothing also for the operation of grants in aid, by which, I am convinced, our expenses would be very greatly reduced, the same effect being produced in every School where it is employed at less than half the cost.

"(25.) On the whole I would recommend that we should propose to Government an annual expenditure of Rupees 50,000 in Behar and Rupees 21,000 in Bengal. We cannot say how much will be required for Grant in aid. But we might ask for a discretionary authority to comply with applications, reporting monthly, or if necessary weekly, the amount so granted.

"(26.) In like manner we should intimate that an expenditure will be required for Vernacular School-houses and for books, and the encouragement of Vernacular literature for the use of Schools, of which we cannot estimate the amount, but which we propose to ask for as required, and to extend on permission obtained.

"(27.) This will leave a large margin for gradual extension, and for Vernacular Education in the Non-Regulation Provinces, regarding which much has already been done in Assam, but on which we are not now, I think, prepared to make any recommendation.

"(28.) I have said nothing about Normal Schools for the Education of School-masters. At present very good School-masters are being trained for us in the Sanscrit College, which is becoming, in the hands of the Principal, a sort of Normal School for Bengal; but the question of a Normal School for Behar will eventually call for consideration.

"(29.) I think it would be wise that the experiment now to be made should be conducted at first by the direct agency of Government, and that we should advise the Government to take it into its own hands."

4. In order that the Most Noble the Governor General in Council may be aware of the opinions of the Members of the Council of Education on this proposition, copies of their Minutes are herewith submitted.

5. After giving them every attention, the Lieutenant-Governor remains of opinion that the plan he has proposed is the best for the purpose, and as such he directs me to submit it for the consideration and orders of the Most Noble the Governor General in Council.

I have the honor to be, &c.,

(Signed) HODGSON PRATT,

Under-Secy. to the Govt. of Bengal.

Notes on Vernacular Education.

1. Vernacular Education on an extensive scale, and on an efficient footing, is highly desirable, for it is by this means alone that the condition of the mass of the people can be ameliorated.

2. Mere reading and writing, and a little of Arithmetic, should not comprise the whole of this Education; Geography, History, Biography, Arithmetic, Geometry, Natural Philosophy, Moral Philosophy, Political Economy, and Physiology should be taught to render it complete.

3. The elementary works already published, and fit for adoption as class-books, are the following:—

1st. Shishushikha, in 5 parts. The first three parts teach Alphabet, Spelling, and Reading; the fourth is a little treatise on the Rudiments of Knowledge; the fifth, a free translation of the Moral Class Book of "Chambers's Educational Course."

2nd. Pashwabali, or Natural History of Animals.

3rd. History of Bengal, free translation of Marshman's work.

4th. Charupath, or Lessons on useful and entertaining subjects.

5th. Jeebuncharita, a free translation of the Lives of Copernicus, Galileo, Newton, Sir William Herschel, Grotius, Linnoeus, Duval, Sir William Jones, and Thomas Jenkins, in "Chambers's Exemplary Biography."

4. Treatises on Arithmetic, Geometry, Natural Philosophy are in the course of preparation. Treatises on Geography, Political Economy, and Physiology, and the Historical Works and a series of Biographies will have to be compiled. For the present, the Histories of India, Greece, Rome and England will suffice.

5. One Teacher for each school will not be sufficient. Two each at least will be required. Every school will very likely contain from three to five classes, which for one teacher to manage efficiently is impracticable.

6. The salary of Pundits should be at least Rupees 30, 25, 20 per month, qualification and other circumstances being taken into consideration. When all the books enumerated above shall be ready for adoption, every school should have a Head Pandit at Rupees 50 a month.

7 Arrangement should be made for the teachers receiving their salaries regularly every month, in their own Stations, without being required to quit their posts.

8. Four Zilas for the present should be selected for operation, namely, Hughli, Nadia, Bardwan, and Midnapur. There should be 25 schools for the present, to be distributed as expediency suggests. These should be established in towns and villages not in the vicinity of English colleges and schools. In the neighbourhood of English colleges and schools, Vernacular education is not properly appreciated.

9. The success of Vernacular education greatly depends on an active and efficient supervision, as well as the amount of encouragement given to the successful pupils. With Natives in general, the acquisition of knowledge, for the sake of knowledge itself, has not as yet become a motive. It is therefore necessary, that Lord Hardinge's Resolution, which has so long been in abeyance, should be strictly enforced.

10. The following plan of superintendence appears to be much less expensive and far more efficient than any other could possibly be.

11. Two Native Superintendents, each on a salary of Rs. 150 a month, including their travelling charges, to be employed, one for Midnapur and Hughli, the other for Nadia and Bardwan. They are frequently

to visit the schools, examine the classes, and rectify the mode of teaching.

12. The Principal of the Sanskrit College to be nominated, the Ex-officio Head Superintendent with no other additional allowance than his travelling charges, which at the most will not exceed Rs. 300 per annum. He is to visit the schools once a year, and to report to the authorities, with whom will rest the management of Vernacular Schools.

13. The preparation and adoption of class-books, and the selection of teachers to be entrusted to the Head superintendent.

14. The Sanskrit College, besides being a seat of general education, to be also considered as the Normal School, for the training of Vernacular teachers.

15. Thus the training of teachers, preparation and adoption of class-books, selection of teachers and general superintendence will be united in one office. This circumstance will remove many inconveniences.

16. An Assistant Head Superintendent to be appointed with Rs. 100 a month. His duty will be to assist the Principal of the Sanskrit College in training up the teachers and preparation of class-books, and to officiate for him while visiting the Vernacular schools.

17. The Patshalas, or indigenous schools under Gurumohashoys, such as they are now, are very worthless institutions. Being in the hands of teachers, generally incompetent for the task they undertake, these schools require much improvement. It will be the duty of the Superintendents to inspect these schools and give the teachers as much instruction as they can as to the mode of teaching. It will also form part of the duty of the Superintendents to watch opportunities to introduce, as far as practicable, the class-books above-mentioned. In fact, the Superintendents will take every care to make these schools, as far as possible, useful institutions.

18. Those schools founded by Natives, or Missionaries, which are in the hands of competent teachers, of course deserve attention and encouragement. The Superintendents will be required to visit such schools and to report on their respective claims to encouragement.

19. The Superintendents will also be required to consider it as part of their duty to persuade the inhabitants of towns and villages, within their respective beats, to establish schools upon the model of Government schools.

The 7th February 1854

(Signed) Ishwar Chunder Surma."*

*Selections from the Records of the Bengal Government, No. XXII, pp. 65-74.

১১

"From
The Assistant Inspector of Schools
South Bengal

To
W. Gordon Young Esq.
Director of Public Instruction
Fort William, 2nd July 1855.

Sir,

I have the honor to represent that under present circumstances it is very difficult to get a good number of competent vernacular teachers. To supply this want the establishment of a Normal School or class has become absolutely necessary. I beg therefore most respectfully to submit the following plan for such an Institution for your favorable consideration and sanction.

I would propose that two masters, one at 150 Rupees and the other at 50 Rupees per month be employed for the present to undertake the task of training up the teachers for our new vernacular schools.

I have lately with the co-operation of my assistant examined upwards of 200 candidates for teacherships in the new vernacular schools,—out of which number 92 only have been found to be eligible for the situation of teachers. Of this last number, however very few only are qualified to undertake the duties of teachers immediately,—the remainder require previous training. I would therefore beg to propose that these form the Normal class and that they be attached to it for six months, which period in my humble opinion, will be quite sufficient to make them fully competent for the post of teachers.

As most of these men do not belong to Calcutta, and as they are not in circumstances well enough to afford for their living here, I would recommend that a stipend of 5 rupees per month be allowed to 60 of the best of them while they remain in the Normal class. To ensure their continuance in the class and subsequent service in the vernacular schools I beg to suggest that they be required to subscribe to a covenant containing the following conditions—

Ist. That they shall continue in the Normal class for such period as may be necessary for their training.

2nd. That when appointed as teachers they shall serve Government for at least three years.

3rd. That they shall accept situations of not less than Rupees 15 a month to which they may be posted within certain districts to be named in the covenant.

4th. That in default of the fulfilment of any of the above conditions, they shall each of them pay a fine of fifty Rupees.

I would further propose that the Normal class or classes be established in connection with the Patshala, as in that institution, they shall not only have the benefit of observing the mode of teaching and the management of the classes thereof, but by being made occasionally to

teach them, they shall acquire a practical knowledge of the art of teaching.

For the post of Head Master of the Normal classes, I would recommend Babu Okkhoy coomar Dutt, the well known editor of the Tatwa bodhinee Patrika. He is one of the very few of the best Bengali writers of the time. His knowledge of the English language is very respectable and he is well informed in the elements of general knowledge, and well acquainted with the art of teaching. On the whole I do not think that we can secure the services of a better man for the post. For the second mastership I would propose Pundit Modhoosoodun Bachaspati. He is a distinguished ex-student of the Sanscrit College, an able and elegant Bengali writer, well acquainted with the art of teaching, and in my opinion in every respect qualified to fill the post for which he is recommended.

The above arrangements are intended to meet for the present all requirements for teachers in the vernacular schools and should immediately be carried into effect. There is one difficulty however which, I beg here to bring to your notice. It is the want of accommodation for the Normal classes in the Building now occupied by the Patshala. This building is scarcely sufficient for the purposes of that school and can by no means accommodate the additional classes. Arrangements for room should therefore be so made that the classes may be opened as soon as their establishment is sanctioned.

I have etc.
Eshwar Chunder Surma
Asstt. Inspector of Schools
South Bengal."*

১২

"From

The Assistant Inspector of Schools
South Bengal

To

W. Gordon Young Esq.
Director of Public Instruction.

Sir

Fort William the 8th October 1855.

With reference to your endorsement No. 1517 dated 15th ultimo, I have the honor to forward a Report of the measures taken by me towards carrying out the scheme of Vernacular Education in the Districts under my charge. In this Report, besides giving an abstract of my quarterly Report submitted to the Inspector on the 22nd August last, I have, as verbally desired by you, entered into an explanation of the circumstances under which our operations were delayed at the commencement. I have

* Education Department Consultation, 12 July 1855, No. 89.

also taken the liberty to offer a few remarks on certain points in the Inspector's Quarterly Report and letter forwarded under your endorsement under reference.

I have etc.
Eshur Chunder Shurma
Asstt. Inspector of Schools, South Bengal.

Report of the measures taken by the Assistant Inspector of Schools, South Bengal, towards carrying out the instructions regarding Vernacular Education conveyed in Secretary Grey's letter to the address of the Director of Public Instruction No. 115 dated the 20th April 1855.

On the 1st May 1855, I took charge of the office of Asistant Inspector of Schools. Previous to taking charge, I had submitted to the Director of Public Instruction a memorandum of the measures which I would adopt on being appointed to my new post. These measures were all sanctioned by that officer in his letter of the 26th April 1855, which authorized me to enter upon my duties, and forwarded for my guidance, the Minute of His Honor the Lieutenant-Governor when a member of the late Council of Education, together with other papers on Vernacular Education as noted in the Margin.

Letter from the Reverend Mr. Long to the Honorable Haliday of the 27th February 1854.

Letter from Secretary to the Government of Bengal to the Director of Public Instruction No. 115 dated the 20th April 1855.

2. Agreeably to my memorandum aforesaid, I first engaged myself in selecting my Sub-Inspectors, and having selected them, despatched them to the interior to inspect suitable towns and villages for the Model Schools. I was next engaged in examining a large number of candidates for teacherships in the new schools, out of whom I selected 92. Most of these men, however were found not competent to take immediate charge of schools. The establishment of a Normal School became therefore necessary to give them a previous training, and a plan for such an institution being submitted was sanctioned by Government, and the school duly opened by the middle of July.

3. By the middle of June the Sub-Inspectors returned from the interior and submitted their reports. I selected five villages in each district for the Model Schools. It appearing most expedient to open the schools first in the District of Nuddea, I submitted a report on the 25th to the Director (through the Inspector of Schools South Bengal) soliciting his sanction to the establishment of schools in that District, and to the commencement of operations from the first of July following for which I made the necessary arrangements. In this report I made no mention of the expenditure to be incurred on account of the schools, because I understand from the papers forwarded for my guidance that, that point had been settled. But the Director was of opinion that it was necessary to obtain the orders of Government upon the subject and therefore desired that my report should have reference to it. Accordingly, on the 28th, I sent in a second report, proposing the establishment of six

schools in each Zillah, and the appointment of three teachers to each school at a monthly cost of 70 Rupees.

4. His Honor had proposed in his Minute the establishment of five schools in each Zillah with two teachers to each school, at an expenditure, not exceeding as I understood fifty five Rupees per month. But as a fresh reference was to be made to Government upon the subject, as above stated, and as it appeared to me that the requirements of each district could not be well met by five schools. I proposed in my second report the establishment of six. I also took this opportunity to propose the appointment of three instead of two teachers to each school, as I had reason to believe that the latter number would not be sufficient. In this report I solicited sanction to the establishment of schools in all the four districts, because I thought it most convenient to obtain the orders of Government upon the subject at once, instead of submitting the point on four different occasions.

5. On the 30th June I waited upon the Director and found him very anxious for the immediate commencement of operations. I also understood from the conversation I had with him, that in anticipation of the sanction of Government I might adopt measures for opening the schools. Measures were accordingly taken by me to commence operations in Nuddea.

6. When at the beginning of July I again waited upon the Director in the hope of receiving final instructions, he shewed me a letter from the Inspector in which I found objections were taken by the latter officer to my report, in consequence of no mention having been made in it of the following points: Course of instruction, class books, Sale of books in the schools, Distance and direction of schools from Police Thannahs, Rules for attendance, Schooling fees etc. I explained to the Director that the first two points had not been mentioned by me, because they had been settled in His Honor's Minute, and the third, fourth and fifth points were admited by him to be too unimportant to retard our operations. With reference to the sixth, namely schooling fees, the Inspector had strongly urged that the system should be introduced from the opening of the schools, and in this view the Director appeared to agree. I represented to him that personally I also was strongly in favor of the fee system but that I did not think it expedient to introduce it into the new schools from the commencement, as its introduction, might to a certain extent, throw impediments to our success. It was on this consideration alone, that His Honor was pleased to suggest in his Minute, that admission into the new schools, should at the beginning and for some time be gratuitous. I further represented to him that in case fees were insisted upon I and my Sub-Inspectors would be placed in a very awkward position, as we had told the villagers in positive terms that the schools would be free at the commencement. The Director however, did not agree with me, and directed me to think over the matter again. Thus this important point remained unsettled, and operations were consequently postponed.

7. I have observed in paragraph 5 that measures had been taken by me to commence operations at the beginning of July. Teachers had accordingly been sent by me to some villages to await the opening of

the schools there. I was now obliged to recall them, but at Kancharaparah a school had been opened through a misunderstanding of my instructions before the teachers who had been sent there could be called back. When on my way to Bolagore I visited that village on the 6th July, to postpone the opening of the school that was to be established there, and heard that it had already been opened, I thought long on the propriety or otherwise of stopping it. But as I expected to receive the final orders within a few days, I came to the conclusion, that the one which has been opened might be allowed to go on. But unfortunately those orders directed me to strike out Kancharaparah from the list of villages for model schools, in consequence of representations made to the Director by certain Missionary Gentlemen that the new school would be prejudicial to the interests of an English school which they have at Ghoshparah, a village about 4 miles distant from Kancharaparah.

8. On the 6th July, as aforesaid I was obliged to go to the interior, agreeably to engagements which I had made with the inhabitants of Bholagore and Krishnagore Vernacular School Committee to visit those places to report upon the application of the former for a Model School, and of the latter for a grant-in-aid. I also went over to Boinchee to make certain enquiries regarding the vernacular school there.

9. I returned from the interior by the middle of July and on the 26th of that month, I submitted a third report upon the establishment of the model schools. In this report I explained at length the inexpediency of introducing schooling fees from the beginning.

10. I waited upon the Director on the 6th August and learned that final orders had that day been passed upon the subject of the schools, and I was referred to the Inspector for information regarding them. When I called upon that officer in the course of the day, he shewed me the orders in question, which authorized me to open model schools in five villages in each of the Zilas noted in the margin at a monthly cost of 50 Rupees per each school. The orders also required that the schools were to be opened on the understanding that the inhabitants of each village should build a suitable school house, and engage to keep it in repair, and that measures should be adopted to erect a gallery and attach a garden or play ground to each school house. The Inspector promised to send a copy of these orders for my guidance, but as the same was not received up to the 14th, I called his attention to the subject, and got a reply from him on the same day, embodying the purport of the orders.

Nuddea.
Hooghly.
Burdwan.
Midnapore.

11. The above orders threw fresh difficulties in my way. I had made arrangements with the inhabitants of sixteen out of the twenty villages where schools were to be established, for the erection of school houses only, without any reference to galleries and play-grounds, which I did not know would be required. With the inhabitants of the remaining four villages, who were generally not in easy circumstances, I had stipulated that a portion of the expenses for the school houses would be defrayed by Government. In making this latter arrangement, I was guided by His Honor's Minute from which it will be seen that His

Honor meditated the construction of these buildings at the expense of the State. I was personally directed by His Honor to the same effect when I was sent by him to the interior in May 1854.

12. Accordingly on the following day 15th August, I wrote to the Inspector representing that if the condition of galleries etc. was enforced, our operations could not immediately be commenced, because it would then be necessary to send the Sub-Inspectors again to the villages selected to sound the inhabitants as to whether they were prepared to meet the additional expenditure of galleries etc. and if not fresh villages will have to be selected, the inhabitants of which would act up to the conditions.

13. On the 16th I received a reply from that officer explaining that galleries etc. were not to be considered as conditions, but that it should be ascertained if the villagers were unwilling to give this additional aid. The letter also authorizes me to open schools in the sixteen villages, the inhabitants of which had agreed to erect school-houses, and stated that a reference had been made to the Director regarding the remaining four. On the next day, I received another letter from the Inspector conveying authority to me to open schools in all the twenty villages. The important question of schooling fees was also decided by the Director and I was directed by the Inspector in a letter dated 15th August to postpone the introduction of the same for a period of six months, after which it was not to be deferred, if possible.

Nuddea.
Hooghly.
Burdwan.
Midnapore.

14. Operations were accordingly commenced in the district of Nuddea, and on the 23rd August a school was established at Belgorea. Since then fifteen schools as per Margin have been opened up to this day.

15. After operations had commenced I received a letter from the Inspector on the 28th August enquiring whether any pledge had been given by me to the inhabitants of the four villages who were unable to defray the total cost of school houses, that schools would be established in them, and if otherwise, directing me to select other villages in their stead. It is true I had given no *positive* pledge at the beginning to the inhabitants of the villages in question but on receipt of the Inspector's letter of the 17th August authorizing me to open schools in all the twenty villages, I had assured them that schools would be established in their villages. The requisition of the 28th Idem, was therefore rather late. A school had already been opened at Jowgong one of the four villages on the 26th August, or two days before the receipt of the Inspector's last letter referred to. I may here mention however, that the people of two of the four villages have subsequently been induced by me to bear the entire expense of school houses.

16. I now beg to enter upon an account of the other measures adopted by me in connection with vernacular Education. In my memorandum sanctioned by the Director I had proposed that arrangements should be made to make the School Books as cheap as possible. To this subject I directed my attention, and have been able to compile two new books for beginners and to revise and make cheap editions of others. I am also compiling other class-books myself, and have engaged compe-

tent parties in the same task. I hope that at no distant period the following books would be ready for use.

Outlines of Geography.
Geography of India.
Biography.
Arithmetic.
Elements of Natural Philosophy.
Popular treatise on Physiology.
" " " Astronomy.
History of Greece.
" of Rome.
" of England.
" of India.
Rasselas.
Telemachus.
Aesops Fables.

17. I proceed now to offer a few observations on the remarks made by the Inspector in his Quarterly Report, dated 23rd August 1855 and in his letter to the address of the Director dated 13th September following regarding myself. In the former the Inspector states in the 3rd paragraph that I submitted a Report at the end of June for the establishment of Model schools, but the scheme being incomplete and information on certain important points wanting, I was requested to forward a revised Report after making the necessary enquiries, which I did after visits to the interior by myself and my Sub Inspectors. In respect to this paragraph, I beg to observe that in my Report I merely mentioned the names of the villages I had selected for the Model Schools and solicited sanction to their establishment with permission to use places which the villagers proposed to lend temporarily for our schools before the School Houses would be ready. I proposed no scheme of instruction whatever because I was directed to work out which was recommended by His Honor in his Minute and sanctioned by the Government of India. I do not see on what important points information was wanting, because to my understanding all important questions had been settled by His Honor in his Minute. There was one point only in which information was wanting, it is the distance and direction of the villages selected for our schools from the Police Thannah. But this point did not strike me as very important. It is true I went to the interior before I submitted my third Report, but as I have above explained, I did so in conformity with arrangements made for that purpose with the villages and not to gather information for my report as the Inspector supposes.

18. Again in the 3rd Paragraph of his letter to the Director of the 15th ultimo, the Inspector states that he has taken charge of the indigenous schools himself, because it appeared to him that I preferred that some one else should undertake that duty. I do not remember to have either written or said anything upon this subject, which led the Inspector to this conclusion. All that passed regarding it was that the Inspector in a conversation between us asked me one day whether I had any objection to his visiting the Pautshallahs under Gooro Mohasoys

near Goburdanga in Nuddea, to which I replied in the negative. As regards my not having directed my attention to the improvement of those schools from the beginning, I beg to refer to the 9th paragraph of my Memorandum in which it was proposed that I should commence the inspection of the Pautshallahs when the Model Schools were in a settled condition. The Memorandum was approved of by the Director and my attention was therefore entirely directed to the establishment of Model Schools.

19. I take the opportunity to mention the serious inconvenience to which I have been put for want of writer and contingent allowances. At present I am very frequently obliged to copy my letters statements etc. myself, the letters remaining unentered in the Letter Book. In the same manner I write my Bengallee letters to the several Sub Inspectors and Head Masters of the vernacular schools, but for want of hands no copies are kept of them and consequently no Bengallee records are preserved. As respects the contingent expenditure, I beg to state that in the beginning of May last, I had agreeably to verbal instructions from the Director purchased stationery to the amount of 45 Rupees the bill for which has not yet been passed and paid. There are other contingent charges I have to incur for which no provision has yet been made.

Eshur Chunder Shurma
Assistant Inspector of Schools
South Bengal"*

১৩

মডেল স্কুল সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের ১৮৫৬-৫৭ সালের একটি রিপোর্ট (Report for the quarter ending January 1857) থেকে অংশবিশেষ :

"The progress made by the pupils of the Model Schools is really surprising, considering that the oddest among them have not been established more than eighteen months. The pupils commenced with the Alphabet, and have gone through almost all the Class Books at present available; such as—

1. Bornoporichoy, or Spelling Book.
2. Rijupat, or Simple Lessons.
3. Kathamala, or Select Fables of Æsop.
4. Nitisar, or Moral Stories.
5. Bodhodoy, or Rudiments of Knowledge.
6. Pashawabali, or Animal Biography.
7. Charitabali, or Exemplary Biography.
8. Nitibodh, or Moral Class Book.
9. Bhugul Bibarun, or Geography.
10. Banglar Itihas, or History of Bengal.
11. Patiganit, or Arithmetic.

* Education Department Consultation, 1 November 1855, No. 51A.

12. Charupat, or Useful and Entertaining
Lessons on Miscellaneous Subjects.
13. Jeeban Charita, or Biography.

This course, it will be seen, includes Geography, History, Biography, Arithmetic, &c.

The first admission into our Schools were, for the most part, from the Indigenous Schools under the Gurumohashoys. At the commencement I was under an apprehension that trained up as the pupils were on the faulty system in use in those Schools, our system would be distasteful to them. I have, however, been agreeably surprised to find that, attracted by the novelty of our system, they have, by dint of great exertion and unwearied zeal, made so much progress in so short a time.

Some of the pupils of the Model Schools have entered the Calcutta and Hooghly Normal Schools, and others the Bengali Class of the Medical College. The admission of such pupils into the Normal Schools is certainly an advantage to those Institutions. They have been found to be surperior to outside candidates, owing to their having received a regular preparatory training in the Model Schools. I have consequently every reason to hope that these pupils will make better Teachers in a shorter space of time than their other class-fellows. The time, I think, has arrived when the system of pupil Teachers may be introduced. . . .

The list of books given above does not comprise the whole course intended for the Model Schools. Those that were ready for use have been introduced in them. Others are under active preparation. The complete course will include History, Biography, Geography, Arithmetic, Geometry, Elements of Natural Philosophy, Natural History, Moral Philosophy, and Political Economy. I am aware that this course would be considered by many persons as high for the pupils of Vernacular Schools. They think that the course of Instruction should be a very limited one.

This opinion appears to have been formed under an impression that the Students of those Schools are generally the children of the working classes, who cannot afford to keep them there for the period necessary to complete any extensive course. This impression is certainly erroneous. There are three different classes of pupils in the Vernacular Schools, *viz.*, the children of the higher, middling, and lower classes. The first class having means at command will generally withdraw their children from the Vernacular Schools after they have acquired a tolerable knowledge of Bengali and transfer them to English Schools or Colleges. The third class, from straitened circumstances, will, in many cases, not be able to keep their children in School for the whole time required to complete the course, and will generally withdraw them as soon as they are able to read and write and have learnt a little of Arithmetic and Mensuration. But the second class, whose children constitute the majority of the pupils in the Vernacular Schools, have the will to give them a tolerably complete Education, which, however, for want of means, they can never do in English. They must, therefore, continue their children in the Vernacular Schools to finish a complete course, and for this class of pupils the aforesaid course, in my humble opinion, seems to be absolutely necessary.

It has been stated, in the preceding para., that the children of the working classes form the minority in the Model Schools. Parties I know complain on this account, saying that the object of these Schools, which were opened more for the masses than for any other class, has not been attained. As far as I am aware, Government had no such object in view; the Schools were established for setting on foot a complete course of instruction in Bengali and thereby affording opportunities to the natives generally for imitation. Then again these Institutions are regulated on principles which will always act as a great drawback on the working classes. Here children are not only required to buy their slates, books, &c., but have to pay monthly Schooling Fees. Labor in this country is so cheap that the earnings of the working classes are scarcely sufficient for their maintenance. They cannot, therefore, be expected to incur extra charges for the education of their children. If those classes are to be educated, the Education must be imparted to them gratis so long as their condition is not bettered; otherwise, it is not reasonable to expect that those classes will reap any material advantage under the system in force in the Vernacular Schools. . . .

The success of Vernacular Education will depend materially upon the encouragement given in the way of providing the *Alumni* of those Institutions with offices under Government. People are eager to give their children an English Education, because they believe that such Education would ensure for them public employment, and that Education in any other language would be of no avail. This latter impression should be removed from their minds by providing Vernacular Students with suitable employment. They should, for instance, be nominated to lower posts in the Judicial or Revenue Departments, receiving promotion as they distinguish themselves by their abilities and experience. It may, I believe, be safely affirmed that Subordinate officers from this class would be more efficient as well as trustworthy than the class of men who at present fill those offices.

The inhabitants of nearly all the villages in which our Model Schools have been established continue to feel a lively interest in their welfare. People who were at first not favourably disposed towards them, have commenced to appreciate their usefulness, and are by no means behind their neighbours in their zeal for the welfare of those Institutions. For instance, in the District of Hooghly, Kissennagore is considered as the chief seat of Hindu learning next to Nuddea. The orthodox Pundits of that village had, on the opening of the Model School there, not only slighted that Institution, but spoke of it disparingly before others. The same men having witnessed the rapid progress made by the pupils of the School have begun to send their children to it. In the same way the inhabitants of the village of Seakhalla, in Hooghly, with the view to manufacture bricks for the School-house, have, in consequence of not being able to procure other fuel, cut down several aswattha trees, which, in the eyes of orthodox Hindus, are considered sacred, and the feeling of them an act of impiety. Again, in the village of Protappore, in Midnapore, the principal inhabitants are so anxious for the continuance of the School in that village, that they have agreed to defray from their own pockets any amount of Schooling Fees which

may remain unrealized at the close of the month, as well as purchase books for such of the students as cannot afford to do so in consequence of their inability to meet those charges. These Schools may also be said to have excited a desire in the inhabitants of the Mofussil for imitating them, and in consequence many aided Schools have been established. . . . ."*

১৪

স্বসম্পাদিত 'সর্বদর্শনসংগ্রহে'র ভূমিকায় বিদ্যাসাগর, ১৮৫৮ সালের ২০-জানুআরি, লিখেছেন :

"The Sarvadarsanasamgraha is a work by Madhavacharya, the well-known scholiast of the Vedas. It contains short notices of all the systems of Indian Philosophy, and as such is very valuable. It is natural to suppose that every Indian Sanskrit scholar would have possessed a copy of a treatise of so much importance. But it is somewhat singular that manuscripts of the work are very rare, and that the great majority of the learned of this country are probably not even aware of its existence. If not printed now, the Sarvadarsanasamgraha would, in all probability, share the common fate of many other valuable relics of Sanskrit learning. To preserve the work from destruction I proposed to the Asiatic Society of Bengal to edit the work for them if they would undertake to print it. My offer was kindly accepted, and the work, under their auspices, is printed and published.

When I first undertook to edit the work, I was under the impression that the task would be an easy one. There were two manuscripts in Calcutta, one in the Library of the Sanskrit College, and the other in that of the Asiatic Society. On first reading the book I thought that the former manuscript was sufficiently correct. But scrutinizing it with the care necessary for publication, I collated it with the copy in the Society's Library and found that without the aid of more manuscripts, the readings in several passages in which the two manuscripts differ, could not be reconciled. No other manuscripts were however procurable in Bengal; but by good fortune I procured three manuscripts from Benares. These were of essential service to me, and it was only after carefully collating them with the texts in Calcutta that I have been able to edit the work.

I feel it my duty here to express my great obligations to Mr. Edward Hall, late of the Benares College, through whose kind exertions the Benares manuscripts were received. Without his timely aid it would have been impossible for me to execute the task I had undertaken with the accuracy requisite. My obligations are also due to Professors Jayanarayana Tarkapanchanana and Taranatha Tarkavachaspati of the Sanskrit College for the material assistance that they afforded to me in the undertaking."

---

* General Report on Public Instruction in the lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1856-57, pp. 71-75.

১৫

"From Pundit Eshwar Chunder Surma, to W. Gordon Young, Esq., Director of Public Instruction,—(dated the 25th March 1859.)

I have the honor to state that the Edition of "Nitibodha" published under the advance system agreeably to the orders of Government, No. 637, dated the 30th March 1858, is exhausted, and it has become necessary to reprint the work in order to meet the growing demand for it. I have therefore the honor to request the favour of your obtaining the orders of Government for a fresh advance.

Five thousand copies of the work printed under the advance system having been disposed of in about eight months, I think it is necessary to reprint ten thousand copies for the new Edition. The total price at three annas per copy is Rupees (1,875) one thousand eight hundred and seventy five, and this sum exclusive of the commission at 25 per cent amounts to Rupee (1,406—4) one thousand four hundred and six and four annas which is required to be advanced by Government.

The copies of the above work remaining in store, as shown in the account sale for February last forwarded to you, have since been disposed of, and the sale proceeds will be duly remitted to the General Treasury and shown in subsequent account sales."*

১৬

"Note by Pundit Eshwar Chunder Surma on the Sanscrit College,—(dated the 17th April 1859.)

I have presented the three papers noted in the margin connected with the Sanscrit College with care and attention.

1 Report by Mr. Cowell.
1 Letter by Dr. Roer.
1 Minute by Mr. Woodrow.

Mr. Cowell's Report is an able and comprehensive one. It describes in detail and with fairness the working of the College. He justly ascribes the deficiency in the knowledge of Grammar on the part of some of the Junior Classes to the non-appearance of Part III. of Vyakarana Kaumudi or Outlines of Sanscrit Grammar compiled by myself. The work is ready, but it requires careful revision before being sent to the Press. This would certainly have been done ere long, but continued ill health prevented me from doing so. Now that I have comparatively improved, I hope to publish the work before the College opens after the present vacation.

Mr. Cowell recommends that the students of the college should go through a higher than the Entrance Course in English. This object was always in view, and to attain it, the English Department was remodelled. It is true that since the establishment of the University, the English students of the college have not been higher than the Entrance Course;

* Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, 7th April 1859, No. 23.

but previous to that event those studies were of a far higher standard. It is not difficult or impracticable to teach the B.A. Course in the Sanscrit College. With an increase to the teaching staff, the end would be easily attained. Perhaps one additional teacher on a salary of Rs. 150 per month, payable from the surplus schooling fees, would suffice for the present.

Mr. Cowell appears to take objection to the study of the Smriti and Vedanta in the College. I am sorry that I must differ from him on this point. These branches seem to me to be quite unexceptionable. In Smriti, the treatises in use teach only Civil Law, such as Law of inheritance, adoption, &c. The importance of such study is admitted on all hands and it is therefore unnecessary for me to dilate upon it. The Vedanta is one of the systems of Philosophy prevalent in India. It is of a metaphysical character, and I do not think there can be any reasonable objection to its use in the college. Both the branches, as at present taught, are free from objection on religious grounds. In my humble opinion, the discontinuance of these subjects would make the college course a very defective one.

I fully agree with Mr. Cowell, in his recommendation for the continuance of the college on its present footing. His arguments are weighty and fully sustain his position. The Sanscrit College is undoubtedly one of the most useful and important Institutions under Government.

Dr. Roer recommends the abolition of college and the appropriation of its funds to the introduction of the study of Sanscrit into Government English colleges and schools. He admits that the college is an useful Institution, but he thinks that the arrangement proposed by him would, if carried into effect, be more advantageous.

No one is a greater advocate than myself for the introduction of Sanscrit into English Colleges and Schools. But no one would be more strongly opposed to the abolition of the Sanscrit College and the substitution of this arrangement in its stead. Mr. Cowell justly observes that if Sanscrit is to be studied at all it should be studied thoroughly, and I very much doubt if it can ever be properly studied in English Colleges and Schools, especially when it is a fact that the attempt to teach even Bengali in a proper style has proved a failure in those Institutions. The result of the adoption of Dr. Roer's plan would be the extinction from this part of India of a language and literature, the preservation of which in their full integrity was one of the primary objects of the founders of the Sanscrit College.

Mr. Woodrow's Minute scarcely needs comment. On one point, however, I would say a word. He has formed an impression that there was no discipline in the college because it was under Native superintendence. The erroneousness of this impression is clearly proved in Mr. Cowell's Report, which notwithstanding its fulness makes no allusion whatever to this want.

On such an important point that gentleman could never have been silent if any reasonable ground for complaint existed on that account."*

---

* Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, Fort William, 28th April 1859, No. 11.

১৭

"From Baboo Eshwur Chundra Sharma, to Rivers Thompson, Esq., Junior Secretary to the Government of Bengal,—(dated the 29th September 1859.)

Sir,

I have the honor to acknowledge the receipt of your Predecessor's circular letter No. 288, dated the 17th June last, relative to the practicability of promoting really cheap Schools for the masses in Bengal, and in reply to state that, in my humble opinion, it seems almost impracticable, in the present circumstances of the country, to introduce any system of education with such limited expenditure as is contemplated by Government, *viz.* Rupees 5 to 7 a month for each School. Men, who are qualified to teach mere reading, writing and a little of Arithmetic with any degree of success, however great their attachment to their Native villages may be, cannot be induced to accept service on such low remuneration. I am not aware of the qualifications of the man instanced by Mr. Harrison in his report, but I feel certain that his reluctance to accept the post offered to him proceeded from other causes than his particular attachment to his village; for I understand that he has subsequently accepted a post, out of his own village, of smaller emoluments than that at first offered to him.

I have no precise information about the system pursued in the Hulkabundee Schools in the North-Western Provinces. But presuming that that system has been adopted in the Behar Schools, I would beg to observe that in many respects it is similar to that prevailing in the indigenous Schools of Bengal. The course of instruction in the Behar Schools is, I understand, limited to letter writing, and Zemindar and Shopkeeper's accounts, and the only difference between them and the Bengal Schools is, that a few printed books of an improved character are nominally used in the former. If the object of Government be to promote such a system of education in Bengal, a small monthly pay to the Goroomohashoys, the introduction of a few printed books in their Schools, and placing those Schools under Government inspection would easily secure that object. But I must remark that such education, insignificant as it would be, will not extend to the masses, if by that word is meant the labouring classes; for even now, both in Behar and in Bengal, few, if any, from these classes are to be found among the pupils of those schools.

This state of things is to be ascribed to the condition of the labouring classes. It is generally so low that they cannot afford to incur any charge on account of the education of their children. Neither can they continue their boys in School, after the latter have attained that age when they become fit for any sort of work, which would secure some kind of remuneration however trifling it may be. They think, and perhaps rightly, that if this children learnt a little of reading and writing, it will not better their condition, and therefore they feel no inducement whatever in sending them to School. It is too much to expect that they would educate their children merely for the sake of

knowledge, when even the higher classes do not yet properly appreciate the benefits of education. Under such circumstances it is needless to attempt the education of the labouring classes. But should it be in the contemplation of Government to try the experiment it must be prepared for giving education free of all charges. It may be mentioned here, that experiments have been made by private individuals, the results of which have not however been satisfactory.

An impression appears to have gained ground, both here and in England, that enough has been done for the education of the higher classes and that attention should now be directed towards the education of the masses. This impression has evidently been caused by the too favorable character of the Reports and Minutes on education. An enquiry into the matter will however show a very different state of things.

As the best, if not the only practicable means of promoting education in Bengal, the Government should, in my humble opinion, confine itself to the education of the higher classes on a comprehensive scale. By educating one boy in a proper style the Government does more towards the real education of the people, than by teaching a hundred children mere reading, writing and a little of Arithmetic. To educate a whole people is certainly very desirable, but this is a task which, it is doubtful, whether any Government can undertake or fulfil. It may be remarked that, notwithstanding the high state of civilization in England, the masses there are no better than their brethren in this country on the point of education."*

১৮

"From Baboo Eshwar Chundra Shurma, Principal of the Sanskrit College and Superintendent Calcutta Normal School, to Rivers Thompson, Esq., Junior Secretary to the Government of Bengal,—(dated the 16th April 1860.)

Sir,

I have the honor to forward, for submission to His Honor the Lieutenant-Governor of Bengal, copies of correspondence which has passed between myself and Messrs. Molloy and Dallas, Attorneys at Law, and the Director of Public Instruction, relative to a claim made against me by Fida Hossain Khan, for damages said to have been done to Premises No. 131, Bowbazar Street, hired by me while principal of the Sanskrit College, for the accommodation of the Government Normal School and the Government Pautshalla. As the proper party for the settlement of the claim is Mr. Woodrow, to whom I made over charge of those Institutions, I have to request that you will be good enough to move His Honor to order the adoption of the requisite measures for relieving me from the trouble into which I have been unnecessarily thrown.

---

* Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, October 1860, No. 53.

From Messrs. Molloy and Dallas, Attorneys at Law, to Baboo Eshwar Chundra Shurma, Principal of the Sanskrit College and Superintendent Calcutta Normal School,—(dated the 7th January 1860.)

Sir,

We are instructed by Fida Hossain Khan to call upon you for payment of Rupees 700, being the estimated amount of damage done to his house No. 131, Bowbazar, during your occupation of it for a Pautshalla.

We are further requested to intimate that unless payment is forthwith made, legal proceedings will be instituted to enforce payment.

From Baboo Eshwar Chundra Shurma, Principal of the Sanskrit College and Superintendent Calcutta Normal School, to Messrs. Molloy and Dallas, Attorneys at Law,—(dated the 10th January 1860.)

Gentlemen,

With reference to your letter of the 7th instant, I beg to acquaint you that it is now more than a year that I resigned my offices of Principal of the Sanskrit College and Superintendent of the Calcutta Normal School, and made over charge of the latter Institution and the Government Pautshalla, for the accommodation of which I rented on behalf of Government the house No. 131, Bowbazar Street, belonging to Fida Hossain Khan, to Mr. Henry Woodrow, Inspector of Schools, East Bengal, with whom you will be pleased to communicate on the subject of your claim.

From Messrs. Molloy and Dallas, Attorneys at Law, to Baboo Eshwar Chundra Shurma, Principal of the Sanskrit College and Superintendent Calcutta Normal School,—(dated the 12th January 1860.)

Dear Sir,

With reference to your letter of 10th instant, we beg to say that our client leased the house No. 131, Bowbazar to you, and therefore holds you responsible for all the damages done to it.

From Baboo Eshwar Chundra Shurma, Principal of the Sanskrit College and Superintendent Calcutta Normal School, to Messrs. Molloy and Dallas, Attorneys at Law,—(dated the 16th January 1860.)

Gentlemen,

In reply to your letter of the 12th instant, I beg to remark that under the lease in question the Government of Bengal is liable to make good any damage your client may have sustained. You will observe by reference to the Agreement of the 10th of July 1857, that I executed it not as a private individual but as a Government officer, on the part of Government, and for the accommodation of the Government Schools.

Besides, your client has all along received rent from Government under such circumstances, I am unable to understand how, in opposition to all rule and practice, any responsibility should be attached to me for the damages after the cessation of my connection with Government.

I have forwarded copies of the correspondence, which has passed between us, to the Director of Public Instruction, to whom, in the absence of Mr. Woodrow from Calcutta, I beg to refer you on the subject. A copy of my letter is annexed for reference.

Copy of Agreement.

I hereby agree, on the part of Government, to rent of Fida Hossain Khan, all that upper-roomed house No. 131, Bowbazar Street in Calcutta, with the out-offices, for the accommodation of the Pautshalla and the Calcutta Normal School, for the term of (2) two years from the 1st of August next, for the sum of Company's Rupees (140) one hundred and forty monthly, which I agree to pay him on the 15th of each and every month, commencing from the 15th September next, and if I make alterations or additions thereto, I agree to make the same at my own expenses, such alterations and additions to be made with the consent of the said Fida Hossain Khan. Dated this the 10th July 1857.

Eshwar Chundra Shurma,
Principal Sanskrit College,
and Superintendent Calcutta Normal School.

I agree to the above terms and to keep the house in tenantable repairs.

Fida Hossain Khan.

Witnesses.
Gopal Chunder Bose,
And some other names in Persian Character.

From Baboo Eshwar Chundra Shurma, Principal of the Sanskrit College and Superintendent Calcutta Normal School, to W. Gordon Young, Esq., Director of Public Instruction,—(dated the 16th January 1860.)

Sir,

I have the honor to forward copies of the correspondence, which has passed between myself and Messrs. Molloy and Dallas, Attorneys at Law, on behalf of Fida Hossain Khan, the proprietor of house No. 131, Bowbazar, rented by me during my incumbency as Principal of the Sanskrit College and Superintendent of the Calcutta Normal School, for the accommodation of the Pautshalla and the Calcutta Normal School, and to request that you will be good enough to adopt the necessary measures for the settlement of the claim made by the proprietor for damages done to his house during its occupancy by those Institutions.

I have been obliged to trouble you because Mr. Woodrow is not in Calcutta, and the Attorneys of the proprietor are urgent in their demand for payment.

From W. Gordon Young, Esq., Director of Public Instruction, to Pundit Eshwar Chundra Shurma,—(No. 43, dated the 1st February 1860.)

Sir,

I have the honor to acknowledge the receipt this day (on my return from a tour in the Mofussil) of your letter dated 16th ultimo, on the subject of a claim made upon you on account of damage said to have been done to a house rented by you for the Normal School.

2. I do not think you have done right in referring Messrs Molloy and Dallas to this office, as I am not in a position to judge whether the claim in question is a rightful one or no. You are the person best qualified, perhaps I might say, the only person qualified, to form a correct opinion on this point; and I would therefore suggest that (if you have not already done so) it would be well if you were now to take the necessary steps for ascertaining how the claim should be dealt with. For this purpose I need hardly say, you will have no difficulty in obtaining any needful information by communicating with Mr. Woodrow or in his absence with the Superintendent of the School. Should it then appear necessary that Government or the Law Officers of Government should move in the matter, you may make a report accordingly to this office.

3. The question will probably depend upon whether the damage done to the house was or was not greater than the owner might have reasonably expected when he let the house to you.

From Messrs. Molloy and Dallas, Attorney's at Law, to Baboo Eshwar Chundra Shurma,—(dated the 5th April 1860.)

Sir,

With reference to our letters to you and your replies thereto, regarding our client Fida Hossain Khan's claim for the damage done to his house No. 131, Bowbazar, we are informed by Mr. W. Gordon Young that on the 1st February last he mentioned the steps to be taken in regard to the claim in question. We trust therefore that you are now prepared to settle the claim.

From Messrs. Molloy and Dallas, Attorney's at Law, to Baboo Eshwar Chundra Shurma,—(dated the 12th April 1860.)

Sir,

We beg to call your attention to our letter of the 5th instant. Unless an immediate arrangement is made to settle our client's claim, we shall proceed against you to compel you to do so.

From Rivers Thompson, Esq., Junior Secretary to the Government of Bengal, to the Inspector of Schools, East Bengal. Fort William, the 26th April 1860.

Sir,

I am directed by the Lieutenant-Governor to forward the accompanying copy of a letter, and of its enclosure, from Pundit Eshwar Chunder Shurma, relative to a claim made by Messrs. Molloy and Dallas for damages done to a house, No. 131, Bow Bazar, which was hired by

the Pundit, whilst he was Principal of the Sanskrit College, for the accommodation of the Government Normal School and the Government Pautshalla. I am to request that you will be so good as to inform the Attorneys that you and not the Pundit are the proper person to apply on the subject.

I have the honor to be,
Sir,
Your most obedient Servant,

Junior Secretary to the Government of Bengal."°

১৯

বিদ্যাসাগর, ১৮৬৫ সালের ২৯-জুলাই, বেথুন স্কুল সম্পর্কে (বিদ্যাসাগর তখন বেথুন স্কুল কমিটির অনারারি সেক্রেটারি) গবর্নমেণ্টের কাছে একটি রিপোর্ট দাখিল করেছেন :

"I have the honor, by direction of the Bethune School Committee, to submit the following report on the Institution ending 30th April 1865: —

2. *Number of pupils.*—The number of pupils on the Rolls on that date was 108, divided into seven classes, and the average daily attendance during the Session was 72.

3. *Admissions and Withdrawals.*—There were 45 admissions and 37 withdrawals; the majority of the Pupils were taken away in consequence of marriage.

4. *Progress and course of Study.*—The progress made by the Pupils during the session has been very satisfactory. The course of study consisted of Reading, Writing, Arithmetic, Geography, and the Histories of Bengal and India. Lessons were also given on common objects and things, besides Needle Work and Sewing.

5. *Revision of Establishment.*—In consequence of the resignation of Miss Goulding, the Head Mistress, the entire Establishment was revised with the sanction of Government. The salary of that post was reduced from Rupees 200 to Rupees 150; the saving being appropriated to the entertainment of additional Teachers and to granting increases to some of the existing staff. The appointment has been conferred on Miss Pigot. The Committee take this opportunity to bring to the favourable notice of Government the valuable services rendered by Miss Goulding to the Institution during her long incumbency, and the lively interest which she always took in its welfare and management.

6. *Committee of Management.*—There have been no changes in the Committee during the Session. The usual monthly Meetings have not been regularly held as heretofore, in consequence chiefly of the absence of any particularly important business to be performed, as well as on account of the great inconvenience to which the Hon'ble President as well as other Members are generally put when compelled to attend the monthly Meetings. The only business ordinarily transacted at such Meetings was the mere admission of Pupils, but this is precisely the

° Proceedings of the Government of Bengal in the Education Department, June, 1860, Nos. 9-11.

kind of work which can be best and easiest transacted by the Secretary in direct communication with the President. It seems unnecessary to summon all the Members to meet merely to admit half a dozen little girls to the School.

7. *Annual Examination.*—The Annual Examination was conducted by the Members of the Committee. The Examination of the First Class was partly oral and partly in writing. Their performances in the History of Bengal were creditable. They were also required to write short essays on the advantages of Learning. In this part of their ordeal they also acquitted themselves creditably. The Committee would beg to suggest that some of their productions might be printed in the Education Report, so that the public might form an idea therefrom of the progress-making in the Institution.

8. *Distribution of Prizes.*—The distribution of prizes and presents took place in the School premises in March last. Lady Lawrence was pleased to preside on the occasion, and His Excellency the Governor General, His Honor the Lieutenant-Governor, the President of the School, and several other European Ladies and Gentlemen, together with a large number of the Native Gentry, honored the Meeting with their presence.

9. *Special Prizes.*—In addition to the prizes allowed from the Funds of the School, the following Ladies and Gentlemen were pleased to award prizes to the most distinguished Pupils:—

The Hon'ble Mrs. Beadon, a pair of gold earrings. Rajah Protap Chunder Sing, two gold necklaces. The Hon'ble Shumbhoonath Pundit, a pair of gold bangles. Iswara Chundra Vidyasagara, a gold necklace.

	Rs.	As.	P.
Government Grant ...	7,407	0	0
Bethune Testimonial Fund ...	93	8	6
Total ...	7,500	8	6

10. *Receipts and Disbursements.*—The annual expenditure amounted to Rupees 7,478-15-3, which being set against the Receipts as per margin, leaves an unexpended balance of Rupees 21-9-3.

11. In conclusion, the Committee desire to express their opinion that there is no diminution in the estimation in which this School is held by the Native Community. The number of Pupils has increased during the Session, and the small decline in the average attendence is chiefly owing to the Smallpox epidemic raging last year. Applications for admissions came in as before, and the parents and guardians continue to take the same interest in the Institution."*

---

* Proceedings of the Lieutenant-Governor of Bengal, Education Department, August, 1865, No. 58, pp. 35-36.

২০

জার্মানির শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার কেন্দ্র Deutscher Akademischer Austanschdienst নামক পরিষদের পত্রিকা Zeitschrift der Deutschen morgenlandischen Gesellschaft-এর ১৮৬৫ সালের উনবিংশ খণ্ডে (পৃ. ৬৪২-৪৭) Brockhaus (ব্রোকহাউস) বিদ্যাসাগর সম্পর্কে জর্মন ভাষায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির নাম : Die Werke Des Iswarachandra Vidyasagara (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকৃতি)। উক্ত প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশের বঙ্গানুবাদ :

"বৃহত্তম ক্ষেত্রে সর্ববিধ জ্ঞান বিকীর্ণ করার মাধ্যম হিসেবে ভারতীয় লোকভাষাগুলির গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য। সংস্কৃত আজ একটি মৃত অথবা ম্রিয়মাণ সংস্কৃতির ভাষা। প্রতীচী থেকে ভারতবর্ষে প্রসারিত সজীব চিন্তাধারা অঙ্গীকার করে নেওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। অথচ ঐসব ধ্যানধারণা ভারতবর্ষের অধুনা স্তিমিত আত্মিক জীবনধারাকে প্রাণিত ও মঞ্জরিত করতে পারে। সংস্কৃত ভাষা বেশ কয়েক শতক ধরেই বিদগ্ধজনের ভাষায় পর্যবসিত হয়েছে। তাকে আর লোকভাষিত বলা চলে না। ফলত লোকায়তিক ভাষাগুলি দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে এসেছে যদিও এতদিন প্রধানত সনাতন রীতিতে রচিত ও প্রত্ন সংস্কৃতির আদর্শে বিন্যস্ত কাব্য। গদ্যে প্রায় কিছুই লেখা হয়নি বলা চলে। শুধুমাত্র প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনবাহী পত্রধারা ও তথ্য দলিলগুলি এর ব্যতিক্রম। আর তাদের গদ্য রুক্ষ, ব্যাকরণ অনিয়মী। মিশনারীদের কল্যাণ কর্মের সৌজন্যেই আজ ভারতীয় লোকায়তিক ভাষাগুলির গদ্য অত্যুন্নত ও ভাব বিনিময়ের পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য বাহন হয়ে উঠেছে। ভারতবাসীরা এই কাজটির সুফল সম্ভাবনা উপলব্ধি করে তাঁদের প্রয়াসকে বৃহত্তর সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

বিশেষত উত্তর ভারতের তিনটি ভাষা অসংখ্য পরিশীলিত গদ্যের বাহন হয়ে উঠতে পেরেছে। এরা হল হিন্দুস্থানী, মারাঠী ও বাঙলা। সম্ভবত শেষোক্ত ভাষাটি একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অঞ্চলের ভাষা। কিন্তু অন্যূন তিন কোটি মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। সুতরাং বাঙালী লেখকেরা একটি বিরাট পাঠকমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে লিখে থাকেন। বাঙলা-দেশের লেখকদের মধ্যে যাঁরা স্মরণযোগ্য সাহিত্য কর্মের সাহায্যে দেশবাসীর শিক্ষামান উন্নত করবার চেষ্টা করেছেন এবং সেই মহৎ উদ্দেশ্যে নিজেদের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্বাগ্রণী। জার্মান প্রাচ্য সংস্থা তাঁর মহামূল্য কৃতি-কথা মনে রেখে এই বিদগ্ধ মানুষটিকে উল্লিখিত সংস্থার সদস্যপদে সম্মানিত করেছেন। বিনিময়ে তিনি তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন এবং আমাদের সংস্থার গ্রন্থাগারে তাঁর সমগ্র রচনাবলী দান করেছেন। বাইশটি ছোটবড়ো খণ্ডে ছড়ানো তাঁর ষোলটি রচনা বাংলা ভাষায় নিবন্ধ হয়েছে। এখানে একটি সংস্কৃত পাঠসংকলন ও একটি ইংরেজি বর্ণপরিচয় অবশ্য উল্লেখ্য। তাঁর এই উল্লেখযোগ্য বইগুলির একাধিক সংস্করণ হয়েছে এবং তা প্রমাণ করে কী অপরিমাণ সূক্ষ্ম রুচিরার সঙ্গে লেখক এই বিষয়গুলির নির্বাচন করেছেন এবং কীভাবে জনসাধারণ তা শিক্ষণের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাঁর ব্যাপক পাঠকবৃত্তের এটি একটি প্রমাণ।

তাঁর গ্রন্থরাজির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা ও তাদের পরিচয় দান এখানে নিষ্প্রয়োজন হবে না। সেইসব বই দিয়েই এই তালিকাটি আরম্ভ হতে পারে—যেগুলি চিরায়ত সংস্কৃত ভাষা শেখানোর জন্য রচিত হয়েছিল এবং সেগুলি ধ্রুপদী ভারত সাহিত্যের স্মরণীয় স্মৃতি সাক্ষ্যগুলিকে পরিচিত স্মৃতি সাক্ষ্যগুলির সঙ্গে সবার পরিচয় সাধন করতে চেয়েছিল।*

(ক) ব্যাকরণ কৌমুদী সংস্কৃত ভাষার একটি সর্বাঙ্গীণ ব্যাকরণ। য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে রচিত এই গ্রন্থের তিনটি সুবিভক্ত অংশ আছে।

(খ) কালিদাসের শকুন্তলা—উপন্যাস আকারে এর পুনর্বিন্যাস। 'Lambs' Tales of Shakshpeare' দ্বারা অনুপ্রাণিত। (১)

---

* [অনুবাদকের বক্তব্য : এখানে লেখক বিদ্যাসাগরের যাবতীয় গ্রন্থের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণী দিয়েছেন। প্রসঙ্গত তাঁর দু একটি বই সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়ণ প্রদত্ত হল।]

(১) [সেক্সপীয়ারের নাট্যগুচ্ছের ভূমিকাপ্রতিম এই গ্রন্থের একটি অনুবাদ আমাদের বিদগ্ধ দেশবাসী ডঃ রোয়ার "মহাকবি সেক্ষপীর প্রণীত নাটকের মর্মানুরূপ (কোলকাতা ১৮৫৩) Lambs' Tales কতিপয় আখ্যায়িকা ডঃ এডওয়ার্ড রোয়ার সাহেব কর্তৃক অনুবাদিত

(গ) বর্ণপরিচয়—বাংলা ভাষায় ABC তথা য়ুরোপীয় শিল্পাদর্শে রচিত জনপ্রিয় ও শিশুপাঠ্য বর্ণপরিচিতি।
(ঘ) জীবনচরিত— Chamber's Educationist Course অনুসরণে।
(ঙ) Marriage of Hindu Widows দ্বিতীয় সংস্করণ (কোলকাতা, ১৮৬৪), লেখক আমাদের ইতিমধ্যেই তৃতীয় সংস্করণ পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁর শত্রুরা অত্যন্ত ঘৃণ্য ধরণের কলকাতার ইংরেজি দৈনিকে এই মুখপত্রটি সম্পর্কে বিদ্বেষ উদ্গীরণ করেছেন। ফলত লেখক তাঁর রচনা ইংরেজি ভাষায় নিবন্ধ করতে মনস্থ করেছেন।

এই ইস্তাহারধর্মী পুস্তিকা রচয়িতার অসামান্য মনীষা নিয়ে পাঠক চিত্তে অভিঘাত সৃষ্টি করে। যাবতীয় প্রাপ্য আইন সংক্রান্ত এবং অন্যান্য উৎস-গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত সূত্রগুলি এখানে বিশ্বস্ত ভঙ্গিতে অনূদিত এবং বিদগ্ধ প্রণালীতে ব্যাখ্যাত হয়েছে। লেখক যেন একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণের প্রস্থানভূমি গ্রহণ করেছেন এবং স্পষ্টতই এই মর্মে জানিয়েছেন যে, শাস্ত্রে যদি পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ থাকে তাহলে তিনি পুনর্বিবাহের বিরুদ্ধতা করতে প্রস্তুত আছেন, সুখী বিধবাদের চমৎকার অবস্থা সম্পর্কে তাঁর মনে যতই সহানুভূতির উদ্রেক হোক না কেন কিন্তু তিনি প্রমাণ দাখিল করে দেখিয়েছেন প্রকৃতপক্ষে সেটি সত্য নয় এবং ইতিপূর্বে অবৈজ্ঞানিক ভঙ্গিতে প্রাসঙ্গিক অংশগুলি ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক অংশগুলির অপ্রামাণ্যতা প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে তিনি ধর্মশাস্ত্রকে দুটি প্রধান বর্গে বিভক্ত করেছেন যার মধ্যে এই বিশ্বের আদি সত্যযুগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু অন্যটি বর্তমান অধ্যায় কলিযুগ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হতে পারে। আমাদের আধুনিক জীবনের সমস্যার নিরসনের উদ্দেশ্যে শেষোক্ত অংশগুলির কাছ থেকে সূত্র নেওয়া যেতে পারে। সত্যযুগের নিয়মাবলীর কোন সংগঠনী শক্তি এযুগে নেই।

আমরা অবশ্য এই যুক্তি প্রণালী মেনে নিতে পারছি না। কিন্তু ভারতীয় মনস্বিতা যে মনুষ্যত্বের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত সেটি লক্ষ্য করে আমরা অভিভূত হয়েছি। এইতো এখানে একজন মানুষকে পেলাম যিনি গভীরভাবে ও সমগ্রভাবে তাঁর দেশবাসীর মহত্তম মূল্যবোধের জন্য নিয়োজিত, যিনি সমানুপাতে জ্ঞান ও উষ্ণ মানব-সংবেদন উদ্ঘাটন করেছেন এই মর্মে আশ্বস্ত হয়ে আমরা তাঁকে আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছি। তিনি যেন তাঁর দেশবাসীর সমুৎকর্ষের জন্য দীর্ঘকাল বেঁচে থাকেন।"*

২১

দেবোত্তর সম্পত্তি হস্তান্তর বিষয়ে আইন প্রণয়নের প্রশ্ন উঠেছে। এ-বিষয়ে গবর্নমেন্ট বিদ্যাসাগরের মতামত চেয়েছে। বিদ্যাসাগর, ১৮৬৬ সালের ৬-আগস্ট, একখানা চিঠিতে আপন মতামত জানিয়েছেন। চিঠিখানা সম্পূর্ণ উদ্ধার করি :

"To

R. B. Chapman Esquire.

Secretary to the Board of Revenue.

Sir,

With reference to the correspondence forwarded to me under docket No. 656B. dated 13th ultimo, I beg to state that there do not appear to

---

হইয়া" নামে প্রকাশিত হয়েছে। ডঃ র‍্যোর ল্যামের সংকলন থেকে এই নটি বৃত্তান্ত নির্বাচিত করেছেন : ঝড়বৃত্তান্ত (Tempest), নিদাঘ নিশীথ স্বপ্ন বিবরণ (Midsummer nights' dream), শিশির রহস্য (Winter's tale), আকর গোলযোগ (Much ado about nothing), তোমাদের যথেচ্ছা (As You Like It), ভিনিস নগরীর বণিক (Merchant of Venice), লিয়ার রাজা (King Lear), ম্যাকবেথ, হেমলেট]

* বিদ্যাসাগর বিষয়ক এই সমকালীন প্রবন্ধটির নির্বাচিত অংশের অনুবাদ করেছেন গেয়র্গ লেশনার ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত।

be any texts in the Books on Hindu Law which either permit or prohibit the alienation of *Devatra* property. But the general practice of the country does not sanction the disposition of such property in any shape. In fact, when Endowments of this description are made by Hindus, they make them with the sole object of securing the property endowed from any sort of alienation, and attach conditions accordingly. Trustees are consequently prohibited from disposing of the property. Though no distinct ruling on the point is traceable in any of the Text Books, no alienation can be permitted in accordance with the principles of Hindu Law. According to that Law, alienation cannot take place except with the *express consent* of the owner, and as in the case of *Devatra* property the Idol, to which it is consecrated, is the owner, it cannot be disposed of except with its consent, which as a matter of course, can neither be given nor extorted. Hence, *Devatra* property has become inalienable.

2. I am fully aware of the difficulties which may occasionally be felt by trustees in the execution of the trusts in connection with Religious Establishments. Circumstances may arise, which may compel them to incur liabilities, which the fixed income of the Trust will never enable them to meet; because, in many cases, the endowers appropriate the income in such a way as to leave little or no margin for any extraordinary or unforeseen expenditure connected with the endowments, such as repairs of temples, payment of Government Revenue in cases when it is not realized from the Ryots in consequence of draught, inundation or other causes &c. It cannot be expected that Trustees will meet this expenditure from their own funds or from subscriptions. Some provision must therefore be made by Law for the purpose, and on this consideration, I see no objection to section I of the Bill No. 8 of 1866, if it be so worded as to express distinctly that the funds raised by the disposition of the property are to be appropriated solely to meet extraordinary or unavoidable expenditure connected with Religious Endowments. Disposal of Devatra property for such purposes would not, in my humble opinion, be inconsistent with the principle of Hindu Law. The chief object of all endowments is to guard against misappropriation, and as the extra expenditure referred to is solely and entirely required for Devatra purposes, it can, on no account, be considered in the light of misappropriation. Nay, if the Idol could be made to speak, it would certainly not only have given its consent, but would have also insisted on the disposition of its property under such contingencies.

3. Alienation being allowable only under the circumstances above set forth, Section II of the Bill appears to me to be objectionable, as it confers undue powers on Trustees, and prescribes that it is not necessary for purchases or mortgages of Devatra property to enquire into the necessity or expediency of the sale or mortgage or to see that no more than is absolutely required is raised. With such unlimited powers on the part of Trustees, and freedom from all responsibility on that of the purchasers or mortgagees, the property may probably be liable to misappropriation against which it is absolutely necessary to guard. I believe that the Law in regard to the disposition of other Trusts enjoins upon purchasers or mortgagees to make reasonable enquiries about the immediate necessity for the alienation. The benefit to be conferred or the

danger to be averted by alienating a portion of the Trust property must be the criterion by which the validity of such alienation is to be judged of. With such provisions in cases of other Trusts, it is not clear why similar conditions should not be attached to transfers of Devatra Trusts. I would therefore take the liberty to suggest that section II may be so modified as to guard against any possible chance of misappropriation. With such modifications, the Bill would, I believe, be opposed neither to the spirit of Hindu Law nor to the general feelings of the Hindu Community on the subject.

I have the honor to be
Sir
Your most obedt. servant
Issurchandra Sarma."*

Calcutta
The 6th August
1866.

২২

"REPORT OF THE COMMITTEE APPOINTED IN 1866 BY THE GOVERNMENT OF BENGAL TO REPORT ON THE NECESSITY OF LEGISLATING ON THE SUBJECT OF POLYGAMY AMONG THE HINDUS.

From C. HOBHOUSE, Esq., and others,
To The Secretary to Govt. of Bengal.

Dated the 7th February, 1867.

We have the honour to acknowledge the receipt of your letters Nos. 1647 to 1651 T, dated Darjeeling, 22nd August, 1866, to our respective addresses, and we beg to submit the following reply:—

We understand that the Hon'ble the Maharajah of Burdwan, and some 21,000 other Hindu inhabitants of Lower Bengal, prayed for an enactment to prevent the abuses attending the practice of polygamy amongst the Hindus in Lower Bengal; that His Honor the Lieutenant-Governor was in favour of the measure of bringing the said practice strictly within the limits of ancient Hindu Law; that, on the other hand, His Excellency the Governor-General in Council was of opinion that the Hindu inhabitants of Lower Bengal were not prepared, either for the suppression of the system of polygamy, or yet for that strict limitation of it which His Honor the Lieutenant-Governor of Bengal recommended, but desired only a remedy for the special abuses practised by the sect of Koolin Brahmins; that His Excellency would therefore be prepared to take into consideration any deliberate measure which His Honor the Lieutenant-Governor might in consultation with some of the ablest of the leading native gentlemen in Bengal, think fit to recommend for the suppression of the special abuses above named, provided that such measure had not, on the one hand, the effect of restricting the general

* Subal Chandra Mitra: Isvar Chandra Vidyasagar, Second edition, pp. 197-98.

liberty now possessed by all Hindus to take more than one wife, and that it did not, on the other hand, give the express sanction of English Legislation to the system of polygamy, and that to us has been committed the duty of reporting on the best means of giving practical effect to the wishes of His Excellency the Governor-General in Council, and of framing and submitting a Draft Bill for that purpose.

In order that it may be seen exactly what we understand that system to be, for which we are instructed to suggest a remedy, we think it necessary, briefly, to trace the history of Koolinism back; to state how it arose and what it was, and what we believe it to be, and what in the main are declared to be those evils to which it has given rise, and which it perpetuates.

In the Institutes of Manu, we do not find any distribution of the sect of the Brahmins into distinct denominational classes, but we find it declared that certain Brahmins were by conduct and acquirements entitled to higher respect than other Brahmins whose conduct was not so strict, and whose learning was not so great, and this declaration may possibly have laid the foundation of that distribution of the Brahmins into denominational classes which subsequently was made.

It was not until the time of the Hindu King Bullal Sen, who reigned some 284 years before the Mahomedan conquest, or about 877 A.D., that any distribution into denominational classes took place. This distribution was confined to the descendants of those Brahmins who had migrated from Kanouj into Bengal on the invitation of the Rajah Adisur, and it is stated that the cause of this distribution was the fact that the sect of Brahmins generally had fallen off in knowledge and in practice of the strict Hindu Shastras.

There were two chief divisions of Koolins, *viz.* the Barendros of what was then known as the geographical division of Barendrobhoom, and the Rarhis of Burdwan and other places.

The Koolins of Barendrbhoom were divided into two classes:—

1st—Koolins; and

2ndly—Kaps;

but as it is not amongst the Barendro Koolins that any abuse of the system of polygamy exists, we shall not further refer to these Koolins.

The Rarhi Koolins were also divided into two classes, viz.:

1st—The Koolins;

2nd—The Shrotryos;

and subsequently to these classes was added a third, the Bhongshojo, the origin of which is somewhat obscure.

The Koolin class was an order of merit, and was composed of those Brahmins who had the nine qualifications—

1st—Of observance of Brahmin duties;

2nd—Of meekness;

3rd—Of learning;

4th—Of good report;

5th—Of a disposition to visit holy places;

6th—Of devotion;

7th—Of the preservation of the custom of marriages and intermarriages amongst equals only;

8th—Of asceticism; and
9th—Of liberality.

The Shrotryo was composed of those Brahmins who were supposed to have eight only of the nine qualifications of the Koolins.

When the above classes were first created, a peculiar Code of Laws, the bulk of which has in process of time swelled, and which is called by the Koolins the Kooleena Shastras, was laid down for the guidance of the Koolins.

If it were possible, it would be superfluous to trace the history of the Koolins from the time above mentioned up to the present time; it is sufficient that we should now state, not in its numerous ramifications and complications, but in its main features only, what we believe to be the present condition of the Koolin class or of Koolins and Koolinism as best known by these terms. We are speaking of the Rarhi division of Brahmins, and we believe we are right in stating that the chief distinctive classes amongst them at the present day are four in number, and are these, *viz.*:—

The Koolins, of first class.
Bhongo Koolins, or second class.
Bhongshojo Koolins, or third class.
Shrotryo Brahmins, or fourth class.

The first class is composed of persons who are supposed to possess the nine qualifications of the order of merit, and who, at any rate, are presumed never to have forfeited their title to that order by inter-marriages out of their own class.

These men, it is said, usually marry two wives,—one out of their own class, and one out of the class of the Shrotryos, and they take a consideration from the bride on the occasion of all inter-marriages with the Shrotryos, and also of all inter-marriages amongst themselves, except in cases where there is an exchange of daughters.

The second class is composed of Koolins of the first class, who have fallen from this latter class by inter-marriages with daughters of families in the third class.

This second class is again subdivided into—
1st—Swakrito Bhongo Koolins;
2nd—Bhongo Koolins of the second generation;
3rd—Bhongo Koolins of the third generation;
4th—Bhongo Koolins of the fourth generation.

The male members of the first and second subdivisions of this second class contract an unlimited number of marriages during the life-time of the first wife, and except in cases of exchange, whether these marriages are contracted with Koolin women of their own class, or with the daughters of parents in the inferior classes, a consideration is given by the parents or family of the bride to the bridegroom.

In the fifth generation after the first act by which a Koolin of the first class has fallen into the second class, i.e. has become a Bhongo Koolin, he falls into the third class, i.e. he becomes Bhongshojo, and the fourth class, the Shrotryo, is composed of persons who have never been Koolins at all.

It will be most convenient here to state that the marriages most sought after are marriages with Bhongo Koolins of the first and second subdivisional classes, i.e. the Swakrito and the Bhongo Koolin of the second generation, and that the daughters of the class Bhongo Koolins generally are not permitted without degradation to marry beneath their class.

We will now describe some of the main customs in the matter of marriage, which, on the authority of the statements made in petitions to the Legislative Council, and in some instances within the knowledge of more than one of the native gentlemen on our Committee, obtain amongst the Bhongo Koolins, and we will state what are declared in the papers to be the evil results of some of those customs.

1st—In addition to the presents usually given amongst all classes of Hindoos on the occasion of marriage, a Bhongo Koolin always, except when he gives his daughter to a brother Bhongo, and takes in exchange that brother Bhongo's daughter, exacts a consideration for marriage from the family of the bride.

2nd—A present is often given in addition on the occasion of any visit made to the house of the father-in-law.

3rd—If the daughters of the first and second subdivisional classes of Bhongo Koolins cannot be given in marriage to husbands of their own classes, they must remain unmarried.

4th—The number of wives, including those of the same class, is said to be often as many as 15, 20, 40, 50 and 80.

5th—Polygamy is said to be resorted to as a sole means of subsistence to many Bhongo Koolins.

6th—Marriage, it is said, is contracted quite in old age, and the husband often never sees his wife, or only at the best visits her once in every three or four years or so.

7th—As many as three and four marriages have been known to have been contracted in one day.

8th—Sometimes all a man's daughters and his unmarried sisters are given in marriage to one and the same individual.

9th—It is so difficult to find husbands in the proper class for Koolin women that numbers, it is said, remain unmarried.

10th—The married or unmarried daughters and the wives of Koolins are said to live in the utmost misery; and it is alleged that crimes of the most heinous nature, adultery, abortion and infanticide, and that prostitution are the common result of the system of Bhongo Koolin marriages generally.

11th—Cases are cited of men who have married 82, 72, 65, 60 and 42 wives, and have had 18, 32, 41, 25 and 32 sons, and 26, 27, 25, 15 and 16 daughters.

12th—Lists have been adduced of families in the Burdwan and Hooghly districts alone, showing the existence of a plurality of wives on the above scale, and in numerous cases.

13th—The principle on which Koolinism was perpetuated, viz. that of preventing inter-marriages between certain classes, is violated.

14th—Families, it is said, are ruined, in order to provide the large sums requisite to give a consideration on the occasion of their daughters'

marriages, or are unable to marry their daughters at all for want of means to procure such consideration.

15th—Marriages are, it is said, contracted simply in order to this consideration, and the husbands do not even care to enquire what becomes of their wives, and have never even had any intention of fulfilling any one of the marriage duties.

16th—The crimes that are said to result from the Koolin system of marriage are said to be habitually concealed by the actors in them and by their neighbours, and this so as to baffle the efforts of the Police at discovery.

17th—No provision is made for the maintenance of one wife before marriage with an unlimited number of others.

The above are said to be some of the customs and are declared to be some of the evils said to result from the system of polygamy as practised by the sect of Bhongo Koolins, and the evils may thus be briefly summed up:—

1st, The practical deprivation of the indulgence of natural ties and desires in the female sex in a legitimate manner; 2nd, the virtual, sometimes the actual, desertion of the wife by her natural and legal protector, the husband; 3rd, the encouragement of the practice of celibacy amongst the female sex; 4th, the non-maintenance of the wife by the husband; 5th, the supersession or abandonment of the wife at the mere pleasure of the husband; 6th, the formation of the contract of marriage for money considerations simply; 7th, the denial of nuptial intercourse except upon special monetary consideration given; 8th, the ruin, in a property point of view, of families; 9th, the contraction of the marriage tie avowedly without any intention even on the part of the husband of fulfilling any one of the duties of that tie; 10th, the binding down the female sex to all the obligations of the marriage state whilst yet withholding from that sex every one of the advantages of the state; 11th, prostitution; and lastly, the encouragement of the actual crimes of adultery, abortion, and infanticide and of the habit and practice of the concealment of such crimes.

The customs detailed above, as obtaining amongst Bhongo Koolins in the matter of marriage, have, on the whole, we think, been accurately detailed. The evils said to result from these customs are, we have reason to believe, greatly exaggerated, and the abuse of the permission to take a plurality of wives is, we believe, on the decrease; yet we do not doubt but that great evils exist, and those evils divide themselves naturally into two classes: first, that class which is contrary to religion and morality, and second, that which is contrary to established law.

We think that the following extracts, containing a brief view of the Hindu system of religion and morality as applied to the marriage state, will show that the system of polygamy, to whatever extent it is abused by the Bhongo Koolins, is opposed to the ordinances of the Hindu code of religion and morality:—

Brahmins are to shun the allurements of sensual gratification. Indulgence in sensual pleasure incurs certain guilt; abstinence from it heavenly bliss. Neither the Vedas, nor liberality, nor sacrifices, nor strict observances, nor pious austerities ever procure felicity for the man

contaminated by sensuality. The husband is to approach his wife in due season; he is to honour and adorn her; when he honours her, the deities are pleased; when he dishonours her, religious acts are fruitless; a wife unless guilty of deadly sin, must not be deserted; the husband who does not approach his wife in due season is reprehensible; he is one person with her, and she cannot by desertion be separated from him; once a wife is given in marriage and the step is irrevocable; only after a wife has treated a husband with aversion for a whole year can he cease to cohabit with her; immorality, drinking spirituous liquors, affliction with an incurable or loathsome disease, mischievousness, waste of property, barrenness after eight years' cohabitation, death of all children after ten years of cohabitation, the production of only female children after eleven years of cohabitation, and speaking unkindly are the sole grounds for supersession of a wife; desertion of a blameless wife is penal; subtraction of conjugal rights is denounced with heavy penalties; supersession of the wife is justifiable on grounds which regard the temper, conduct or health of the wife, and is tolerated on other grounds; where neither justified nor tolerated, it is illegal; abandonment of a blameless and efficient wife, without cause given or without her consent, is illegal; the principles peculiar to the Brahmin forms of marriage are those of equal consent and disinterested motives; immemorial custom, regulating marriage in general and in its different forms, and the relations of husband or wife, is to be observed, and non-observance leads to forfeiture of the fruits of the Vedas.

Manu, Chapter I, 109, 110 to 115.
" " III, 45, 55 to 57.
" " VIII, 389.
" " IX, 4, 45 to 47, 77, 80, 81.
Strange, Chapter II, pp. 46, 47, 48, 52 to 54.
Macnaghten, Vol. I, 58, 60.

The above texts clearly seem to us to indicate the Bhongo Koolins to what extent they marry out of motives of sensuality only, or do not cohabit with, or abandon without any cause or supersede or neglect, or do not maintain their wives, or disregard the sanctity of the marriage tie generally, act contrary to the plainest injunctions of the Hindoo Shastras.

To the extent that the system of inter-marriages amongst the Bhongo Koolins encourages celibacy amongst women, and exacts a consideration for the contract of marriage; it is questionable whether there is any practice which is at variance with the letter at least of the Hindoo Shastras.

In the matter of celibacy, the whole tenor of the Hindoo system of marriage does certainly advocate the marriage of women even before they have arrived at puberty; penalties are prescribed for those fathers and families who neglect to marry their daughters before they have arrived at puberty, and daughters had formerly even the privilege of giving themselves in marriage in case of protracted neglect on the part of others to give them in marriage, yet on the other hand, perpetual celibacy is inculcated rather than the act of giving the daughter in

marriage "to a bridegroom void of excellent qualities".—Manu, Chapter IX, Section 89.

And again on this subject—a father is prohibited from receiving any gratuity, however small, for giving his daughter in marriage, on the principle that he who through avarice takes such a gratuity is a seller of his offspring.—Manu, Chapter III, Section 51.

The case, however, that we have to contemplate is that of a father who gives, not one who takes, a gratuity in order to the marriage of his daughter, and who is not actuated by avarice, but by what the Hindoo Law declares to be the laudable desire of marrying his daughter early in life, and to a Brahmin of excellent qualities, and there is no text that we know of that prohibits a person from taking a consideration on the occasion of marriage.

The utmost that can be said against the taking of this consideration is that it is contrary to the principle on which the four first forms of marriage, which are peculiar to the Brahmins, are based, viz. that both parties to the marriage should be actuated by disinterested motives.—Macnaghten, Vol. I, paragraphs 59, 60.

Looking at the subject generally, however, there cannot be a doubt but that the system of polygamy as practised by the Bhongo Koolins is opposed to the strict ordinances of the Hindoo Shastras, and it is also said to be productive of the special offences against the law which we have named, and we are instructed, if we can, subject to the restrictions imposed upon us by His Excellency the Governor-General in Council, to suggest a legislative measure by which the system may be suppressed.

The root of the evil is in that custom by which Bhongo Koolins of the inferior grades and Bhongshojo Koolins eagerly offer, and Bhongo Koolins of the higher grades as eagerly accept, valuable considerations for the marriage of a woman of the former classes to a man of the latter class.

A law could, of course, be passed, rendering such contracts illegal under penalties on both the contracting parties.

But in the first place it is not clear that the latter of Hindoo Law is not rather in favour of, than against such contracts; and in the second place, in a case such as this, where both parties are interested to conclude the contract in question, it is evident that either the provisions of any law prohibiting such contracts would be evaded, or that violations of any such law would be effectually concealed.

And evasion of such a law is all the more easy under that part of the Hindoo system of religion and morals which inculcates acceptance by the Brahmin sect of gifts from the virtuous, if they themselves are poor, and this as one of the means of subsistence.—Manu, Chapter X, Sections 75, 76.

Systems of registration of marriages, of fines increasing in amount for every marriage after the first, of certificates of all marriages after the first, to be taken out in the Civil Courts, and such like schemes have been suggested and have suggested themselves to us; but in all these schemes, even if they were not otherwise objectionable, there would, it seems to us, be an element which would, indirectly at least, affect that

"general liberty which is now possessed by all Hindoos to take more than one wife" with which we are instructed not to interfere.

The scheme which has at first sight seemed most feasible is that of framing a Declaratory Law, setting forth what the law is on the subject of polygamy, and prohibiting any infraction of it under penalties.

Such a Declaratory Law would certainly "regulate polygamy amongst the Hindoo inhabitants of Lower Bengal generally", and we are not quite certain, therefore, that, in proposing such a law, we should not be transgressing that part of our instructions which forbids us to "give the express sanction of English legislation to the Hindoo system" of polygamy; but for the sake of considering the subject, we will suppose that we are not prohibited from proposing a Declaratory Law.

No such a law must, in our judgments, clearly be declaratory of what the Hindoo system of polygamy is, and nothing more and nothing less; if it be more or less, then it ceases to be simply declaratory, and becomes inactive.

The following is that which, after consultation of the best authorities, we find to be the law which, strictly taken, should regulate the practice of polygamy amongst the Hindoos.

We find that, according to one of the ordinances of Manu, a Brahmin is enjoined to marry one wife, and this a woman of his own caste; but that, if he be so inclined, he is permitted to marry more than one wife, during the life-time of his first wife, and he is recommended to select a second, a third, and a fourth wife in the order of the classes, viz. out of the Kshatrya, the Vaisya, and the Sudra classes respectively and consecutively.—Manu, Chapter III, Sections 12, 13.

This was an ordinance of the time of Manu, but we are now in the iron age of the Hindoo system, and so a Brahmin is now forbidden to marry any but a woman of his own caste.

It is contended, however, by the advocates of polygamy that the permission to marry a plurality of wives, which formerly extended to women of all the four classes, is to be construed, not so as to abolish polygamy altogether, but simply so as to confine it to inter-marriages amongst the various classes.

To this opinion Strange so far seems to incline, in that he states that it does not appear how many wives a Hindoo is competent to have at one and the same time (Chapter II, p. 56); and in Section 204, Chapter VIII, Manu, there is a case in which it is evidently contemplated that a man may be the husband of two persons of the same caste at one and at the same time, though, in this instance, the permission was evidently only accorded under circumstances of an exceptional nature; and again, in Section 161, Chapter IV, there is a general maxim, a maxim allowing the widest margin conceivable, to the effect that any act, though it be not prescribed, and if it be not prohibited, is lawful provided that it gratifies the mind of him who performs it.

Macnaghten, on the other hand, points out the illogical nature of the deduction made from the texts quoted, and states that action taken in the matter of marriages from this deduction is considered by the Pundits to be reprehensible.—Volume I, pp. 58, 59.

In our view the texts 12, 13, Chapter III, Manu, relied on, must

be held to be obsolete and inapplicable. Those texts refer to an era in the Hindoo system in which it was permitted to a Brahmin to marry out of his own sect and thus prescribed the order, and put no restraint upon the circumstances under which he might contract such marriages; but we are now presumed to be living in a purer era, when marriages of this looser kind, which were before permitted, are now prohibited, and the logical deduction seems to us to be that those texts, which had for their main object the regulation of such marriages, have, with the marriages themselves, become obsolete.

We turn, therefore, to those other authorities which seem to us to declare most definitely the Hindoo system of polygamy.

Immemorial custom, which is defined to be good usages long established, is declared to regulate the laws concerning marriages, and the relationship of husband and wife.—Manu, Chapter I, Sections 112, 115, and Chapter II, Section 18.

A Brahmin who has not violated the rules of his order, who has read certain portions of the Vedas, who has obtained the consent of his spiritual guide, and who has performed certain ceremonial ablutions, may then espouse a wife of the same class as himself, who is endowed with certain excellencies, and not marked by certain defects.—Manu, Chapter III, Sections 2 and 4, and 7 to 11.

On the decease of the wife, the husband may, after performance of sacrifice and the funeral rites, marry again.—Manu, Chapter V, Section 168.

If a wife drinks spirituous liquors, if she acts immorally, if she shows aversion to her husband, if she be afflicted with any loathsome or incurable disease, if she be mischievous, if she wastes her husband's property, if she be afflicted with a blemish of which the husband was not aware when he married her, if she have been given in marriage fraudulently, if before marriage she have been unchaste, if, after seven years of married life, she has remained barren, if, in the tenth year of marriage, her children be all dead, if, after ten years of marriage, she has produced only daughters, and if she has spoken unkindly to her husband, she may in some of those contingencies, be altogether abandoned, and in all superseded by her husband.—Manu, Chapter IX, Sections 72, 77, 80, 81.

But the wife who is beloved and virtuous, though she be afflicted with disease, may yet not be superseded by another wife without her own consent.—Manu, Chapter IX, Section 82.

These causes are accepted by Strange as those which lead to separation (Chapter II, p. 47), and he remarks upon the latitude which they give to the will and caprice of the husband, whenever there is in him the disposition to take advantage of the letter of the law.

And further on, he points out that, where supersession of the wife is not justifiable nor permissible, under, we would suppose, any one of the above contingencies, there it is illegal; and he defines illegal supersession to be the abandoning, with a view to another wife, a blameless and efficient wife who has given neither cause nor consent.—Pp. 52 to 54, Chapter II.

If we have rightly quoted, and if Mr. Justice Strange has rightly interpreted the law, then in any Bill declaratory of law, we should have

to propose to give the sanction of English legislation to supersession of a wife on grounds the most trivial and inadequate, to say that she might be superseded, because she was found blemished (perhaps within the meaning of Sections 7 to 11, Manu, Chapter III) or was mischievous (whatever that may mean), or had spoken unkindly, or was barren (and who is to say where the fault of barrenness lies, for if it is with the husband, then under Section 79, Chapter IX, Manu, there is no supersession), or for many other causes more or less ridiculous, or incapable of proof.

On these considerations, we find that it is not in our power to suggest the enactment of any Declaratory Law, neither can we think of any legislative measure that, under the restricted instructions given for our guidance, will suffice for the suppression of the abuses of the system of polygamy as practised by the Koolin Brahmins, and we beg to report to that effect.

C. P. HOBHOUSE.
H. T. PRINSEP.
SUTTO CHURN GHOSAL.
ISHWAR CHANDRA SURMA.
RAMANAUTH TAGORE.
JOYKISSEN MOOKERJEE.
DEGUMBER MITTER.

While subscribing to the report generally, we deem it due to record our opinion separately on the following points:—

1. —It is stated in page 6, Clause 4, that among other evils, of Koolin polygamy the "number of wives is often as many as 15, 20, and 80." Whatever might have been the case in times gone by we can distinctly state that it is not so now. The rapid spread of education and enlightened ideas as well as the growth of a healthy public opinion on social matters among the people of Bengal, has so sensibly affected this custom that the marrying of more than one wife, except in cases of absolute necessity, has come to be looked upon with general reprobation. Even among Bhongo Koolins of the 1st and 2nd class, the number of wives nowadays seldom exceeds four or five except in very rare instances, but there is ample reason to believe that this class of people will settle into a monogamous habit like the other classes of the community, as education will become more general among them and the force of social opinion be more widely felt.

2.—From the report it will appear that polygamy, as an institution, is confined to a certain class of Rarhi Koolins called Bhongo of the 1st and 2nd order, and that at present the practice even amongst them obtains in a much more mitigated form than a few years before. We need not notice that the number comprised in that class forms but a fraction of the population of Bengal; the catalogue of crimes, therefore, given in page 6 of the report, even if their correctness were unimpeached, must, it can be easily imagined, be infinitesimally small, so far as the same are traceable to polygamy as their immediate cause. However

much we deprecate polygamy and lament its abuse, we cannot still conceal from ourselves the fact that the evils which are plausibly enough inferred as inseparably associated with it are not wholly ascribable to it. They are seen to exist in full force even where polygamy is not known or is considered a crime, and would appear to be simply the natural consequence of an imperfect knowledge of social laws not confined to India alone. A legislative enactment, however stringent and rigidly enforced, might be effectual in diverting those evils from their original course, but it is quite powerless to stop the source from which they take their rise.

3.—Our countrymen are already awakened to a proper sense of the duties which they owe to themselves and to their offsprings, to be swayed by those considerations which rendered polygamy at one time an unavoidable necessity. We are accordingly of opinion that this question may, without injury to public morals, be left for settlement to the good sense and judgment of the people. The Government cannot directly interfere with it without producing serious harm in diverse ways. All that it can and ought to do is to assist in the spread of that enlightenment which has already so much advanced the desired reform.

Some explanation is due from Baboo Joykissen Mookerjee, who had signed the petition, praying for a law for restricting the practice of polygamy. He desires to say that he has always been against this custom, and that when the movement was initiated about ten years ago, he was strongly in favour of it from a belief that the evils flowing from it would not be rooted out without the force of law, and when it was revived last year, he also gave his adhesion. But he is now satisfied by enquiries instituted by himself, as well as from representations made to him by others, that a remarkable change in the opinion of his countrymen has, within the last few years, taken place on this subject, that with others signs of social progress not the least is that which marks with strong disapprobation the old custom of taking a plurality of wives as a means of a man's subsistence, and that it would consequently be in accord with the true interests of morality as well as of the cause of improvement for the State to abstain from interfering in the matter.

RAMANAUTH TAGORE.
JOYKISSEN MOOKERJEE.
DEGUMBER MITTER.

CALCUTTA:
The 1st February, 1867.

I sign this report with the following reservations:—

I am of opinion that the evils alluded to in pages 434-5 are not "greatly exaggerated," and that the decrease of these evils is not sufficient to do away with the necessity of legislation.

I would translate the term "speaking unkindly" in page 438 to mean "habitually abusing", and the term "mischievous" to mean "exceedingly cruel."

I do not concur in the conclusion come to by the other gentlemen of the Committee. I am of opinion that a Declaratory Law might be

passed without interfering with that liberty which Hindoos now by law possess in the matter of marriage.

The 22nd January, 1867. ISHWAR CHANDRA SURMA.
(VIDYASAGAR.)"*

২৩

১৮৬৭ সালের ১-জুলাই 'দি হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখেছে :

"Just as we were going to press we received the following statement from Pundit Essur Chunder Vidyasaghur anent the recent move for raising funds to assist him in paying off the debt which he is alleged to have incurred on account of widow marriage. We have much pleasure in giving it a prominent insertion:

"On my return to Calcutta from home after a protracted absence I have learnt with surprise that a proposition has been started to raise funds for the purpose of paying off the somewhat heavy debt, which I am said to have incurred in introducing the widow marriage reform. It has been noticed in several journals, both English and Vernacular, and as I hear forms a subject of common talk. The proposition has been prefaced with an account of my supposed liabilities.

I take the earliest opportunity to declare distinctly and emphatically that the proposition has emanated wholly without my knowledge, far less with my consent, that the liabilities which I have incurred far from coming to so large a figure as Rs. 45,000, as represented doubtless on imperfect information, amount to much less than half that sum, and that it has never been my intention to appeal to the public for the liquidation of this debt. It has always been repugnant to my principle to bring any sort of pressure upon any person for support, though I have never refused contributions, however small, offered voluntarily by friends of the cause.

Relying on the righteousness of the cause, on the support of a few earnest friends who have banded with me from the beginning, and on my own resources, however limited, I have hitherto gone on and hope to go on still. It is only due to the friends in question as well as to the other subscribers who have come forward of their own accord to add that with a few exceptions they have fulfilled their promise, and are still continuing their aid.

I observe that some surprise has been expressed in certain quarters at the expenditure of so large a sum as Rs. 82,000 on the marriage of 60 widows. I need hardly enter into details to explain this circumstance. Those who are acquainted with the constitution of Hindoo society cannot be unaware that even ordinarily large expenses are incurred for the maintenance of *dala* or party. Such *dalas* or parties are maintained in several villages in the Moffusil, when the remarriage of widows has

* Sir Herbert Risley: The People of India, Second Edition (London, 1915), pp. 431-40.

taken place, and it can be easily imagined that such a measure is attended with expense.

The first widow marriage took place in Calcutta, and it was deemed of paramount importance by the friends of the cause to celebrate it with some *eclat*, and what with presents to Pundits, Ghuttucks, and Koolins, &c., a very large number of whom had been invited and was present on that occasion, the cost of that marriage alone came to about Rupees ten thousand.

But this was not the only source of expenditure. The promoters of the movement in the Mofussil have labored under peculiar difficulties. They have had arrayed against them opposition in various ways. Both the Civil and Criminal Courts were put in motion to thwart their object. In some cases, physical force was also used and assaults and affrays were committed. As a matter of course redress was sought at the hands of the Courts of Justice, and the process I need hardly add, involved expense.

I have thought it proper to publish this statement solely and wholly in the interest of the cause. I do not care what people may think or say of me individually, but I should be extremely sorry to see anything done which, though originating with the best of motives, was calculated to harm the cause I have espoused. If the parties, who have set subscriptions on foot, had confined their efforts to the formation of a Widow Marriage Fund, and had not made allusion to my own liabilities, for meeting which, I need hardly repeat, I had not and have not the remotest idea of appealing to the public, I would not have felt it necessary to remonstrate against the agitation. But the national object for which I am laboring has been so much mixed up with me personally that I must protest against the move under notice, and request those gentlemen who have initiated it to desist in their efforts.

26th June, 1867.

ISSWAR CHUNDRA SARMAH

Hitherto we had abstained from noticing the proposition, as we could scarcely believe that it had the sanction of such a sensible man as the Pundit. His contradiction now removes all doubts on the point. The Venerable Pundit may well declare in the words of the old adage—"save me from my friends!"

২৪

১৮৬৭ সালের ১-অক্টোবর ছোটোলাটকে লেখা বিদ্যাসাগরের একখানা চিঠি :

My dear Sir,

"Calcutta, 1st October 1867.

Since we met last, I have made careful enquiries and have thought over the subject, but I regret to say that I see no reason to alter my opinion as regards the difficulty of practically carrying out Miss Carpenter's scheme of rearing a body of Native Female Teachers either in

connection with the Bethune School or independently such as may be acceptable to the bulk of the Hindu community and worthy of their confidence. Indeed, the more I think about it the more am I convinced that I cannot conscientiously advise the Government to take the direct responsibility of setting in motion a project which, in the present state of the native society and native feeling, I feel satisfied, will be attended with failure. You can easily conceive whether respectable Hindus will allow their grown up female relatives to follow the profession of tuition and necessarily break through the present seclusion, when they do not permit the young girls of ten or eleven years to quit the Zenana after they are married. The only persons, whose services may be available, are unprotected and helpless widows, and apart from the consideration whether morally they will be fit agents for educational purposes, I have no hesitation in saying that the very fact of their dispensing with the Zenana seclusion and offering themselves as public teachers will lay them open to suspicion and distrust and thus neutralize the beneficial action aimed at.

I think the Government cannot pursue a better course on this subject than what has been indicated in the India Government's letter lately published in the papers. The best test of popular feeling will be the application of the grant-in-aid principle. If the people are willing to carry out Miss Carpenter's idea, they should be assisted with liberal grants by Government. Although the great bulk of the Hindu community, so far as I can perceive, will not avail themselves of such assistance, still there are particular individuals who seem to be very sanguine on this subject and if they are sincere and earnest they will at any rate, it may be hoped, come forward and with Government aid, begin the experiment.

I am free to confess that I do not place much reliance in them; but they will have no right to complain under the rules announced by the Government of India.

I need hardly assure you that I fully appreciate the importance and desirableness of having female teachers for female learners; but if the social prejudice of my countrymen did not offer an insuperable bar, I would have been the first to second the proposition and lend my hearty co-operation towards its furtherance. But when I see that success is by no means certain and that the Government is likely to place itself in a false and disagreeable position, I cannot persuade myself to support the experiment.

As regards the Bethune School I entirely go with you that the results are not proportionate to the amount expended upon it, but at the same time I cannot recommend its abolition altogether. As a memento of the services to the cause of female enlightenment in India of the great philanthropist whose name the Institution bears, it has, I submit, a claim to the support of Government. In the next place, it is very desirable that there should be a well organized female school in the heart of the metropolis to serve as a model to sister institutions in the interior. The moral influence of the present institution in native society has been undoubtedly great. It has, in fact, paved the way to female education in surrounding districts and this, in my humble opinion, is no mean return

for the large sums which have been annually expended upon it. But I must say that there is great room for economy and improvement. The expenses, I think, can be reduced to nearly half the present amount without detriment to the efficiency of the Institution.

I intend to go to the North Western Provinces shortly for prolonged change for the benefit of my health and if you wish to know my views on the re-organization of the Bethune School, I shall be happy to await your return to Calcutta and confer with you on the subject.

I remain, My Dear Sir,
Yours Sincerely,
Isvar Chandra Sarma."*

২৫

১৮৬৯ সালে প্রকাশিত স্বসম্পাদিত 'মেঘদূতে'র 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "মেঘদূত ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অমৃতময়ী লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত। কালিদাস কীদৃশকবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। যাঁহারা কাব্যশাস্ত্রের রসাস্বাদে যথার্থ অধিকারী, সেই সহৃদয় মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন, কালিদাস কিরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক, সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ড কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। কোন দেশের কোন কবি, কালিদাসের ন্যায়, সর্ব্ব বিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ছিলেন না, এরূপ নির্দেশ করিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইতে হয় না।

২। কালিদাস যে অদ্ভুত কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন, স্বপ্রণীত কাব্যসমূহে সেই শক্তির সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তদীয় গ্রন্থপাঠে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রের হৃদয়-কন্দর অনির্বচনীয় আনন্দরসে উচ্ছলিত হইয়া উঠে। বর্ণনার চাতুর্য্য ও রচনার মাধুর্য্য বিষয়ে কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তদীয় বর্ণনা পাঠ করিয়া মোহিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। তদীয় রচনা সংস্কৃত রচনার আদর্শস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ, এরূপ রচনা ও এরূপ কবিত্বশক্তি এ উভয়ের একত্র সংঘটন অতি বিরল। এই নিমিত্তই, ভারতবর্ষীয় লোকেরা কালিদাসকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।

৩। অদ্বিতীয় গুণগ্রাহী নিরতিশয় বিদ্যোৎসাহী বিখ্যাতনামা বিক্রমাদিত্যের সভায় নয় জন অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা অদ্যাপি নবরত্ন নামে সচরাচর উল্লিখিত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে কালিদাস সর্ব্বপ্রধান রত্ন ছিলেন। চিরস্মরণীয় উজ্জয়িনীপতি যে শাক প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, উহার নাম সংবৎ। অদ্য সংবতের ১৯২৫ বৎসর অতিক্রান্ত হইল। সুতরাং কালিদাস ঊনবিংশতি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

৪। কুবেরের ভৃত্য এক যক্ষ, অত্যন্ত স্ত্রৈণতা বশতঃ আপন কর্ম্মে অবহেলা করাতে, তিনি তাহাকে এই শাপ দেন, তোমায় একাকী এক বৎসর কাল রামগিরিতে অবস্থিতি করিতে হইবেক। তদনুসারে সে, অলকা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া, রামগিরিতে আট মাস বাস করিয়া, স্বীয় প্রিয়ার অদর্শনদুঃখে উন্মত্তপ্রায় হয়। পরিশেষে, আষাঢ়ের প্রথম দিবসে, নভোমণ্ডলে অভিনব মেঘের আবির্ভাব দেখিয়া, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইল, আপন প্রিয়ার নিকট সংবাদ লইয়া যাইবার নিমিত্ত, মেঘকে সচেতন বোধে সম্বোধন করিয়া, তৎসমীপে দৌত্যভার-গ্রহণপ্রার্থনা জানাইল এবং রামগিরি হইতে আপন আলয় পর্য্যন্ত পদনির্দেশ করিয়া দিতে আরম্ভ করিল।

৫। কালিদাস, যক্ষের পথ নির্দেশ উপলক্ষে, এই খণ্ড কাব্যে নানা গিরি, নদী, গ্রাম, নগর, জনপদ, দেবালয়, রাজধানী, হিমালয়, কৈলাস, অলকা, যক্ষের আলয় ইত্যাদির, এবং পরিশেষে যক্ষপত্নীর বিরহাবস্থা প্রভৃতির বর্ণন করিয়াছেন। এই সমস্ত বর্ণনে এরূপ

* Subal Chandra Mitra: Isvar Chandra Vidyasagar, Second edition, pp. 192-93.

কবিত্বশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে যে যদি কালিদাস মেঘদূতব্যতিরিক্ত আর কোন কাব্য রচনা না করিতেন, তথাপি ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি বলিয়া সর্ব্বত্র অঙ্গীকৃত হইতেন।

৬। কতিপয় বৎসর অতীত হইল, কলিকাতা, বারাণসী ও মৃন্ময়ী নগরে মেঘদূত মল্লিনাথকৃতসঞ্জীবনীটীকাসহিত মুদ্রিত হইয়াছিল। ঐ তিনখানি ও কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কালেজের পুস্তকালয়স্থিত হস্তলিখিত একখানি, চারি পুস্তকের মেলন করিয়া এই পুস্তক মুদ্রিত হইল। সঞ্জীবনীর স্থানে স্থানে পাঠের এরূপ বৈকল্য ঘটিয়াছে যে যদিও সংশোধন-বিষয়ে যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নাই, তথাপি ঐ সকল স্থল প্রকৃত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। কতিপয় স্থল নিতান্ত অশুদ্ধ ও অসংলগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে।

৭। অনেকেই সংস্কৃত কাব্যের ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পাণ্ডিত্যপ্রকাশ ও সহৃদয়তাপ্রদর্শন বিষয়ে মল্লিনাথের সহিত কাহারও তুলনা হইতে পারে না। বস্তুতঃ, মল্লিনাথ কাব্যব্যাখ্যাবিষয়ে অদ্বিতীয়। কিন্তু তিনি অভ্রান্ত পুরুষ ছিলেন না। মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভ্রম ও প্রমাদ লক্ষিত হইয়া থাকে। মেঘদূতব্যাখ্যার যে যে স্থলে তাদৃশদোষস্পর্শ ঘটিয়াছে তাহা এই পুস্তকের শেষভাগে দর্শিত হইল।

৮। মল্লিনাথের সঞ্জীবনীর ন্যায় মালতী, সুবোধা, সঙ্গতা, মুক্তাবলী, সৌদামনী ও তাৎপর্য্যদীপিকা নামে মেঘদূতের আর ছয়খানি টীকা আছে। তন্মধ্যে মালতী কল্যাণমল্ল-প্রণীত, সুবোধা ভরতমল্লিকরচিত, সঙ্গতা হরগোবিন্দবাচস্পতিকৃত, মুক্তাবলী রামনাথ-তর্কালঙ্কারসম্বলিত, সৌদামনী মকরন্দভট্টাচার্য্যলিখিত, তাৎপর্য্যদীপিকা সনাতনগোস্বা-মিবিরচিত। এই ছয় টীকার মধ্যে মালতী ও সুবোধা অনেক অংশে প্রশংসনীয়; কিন্তু সঞ্জীবনী অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে নিকৃষ্ট।

৯। লিপিকরপ্রমাদ বা অন্যাদৃশ কারণ বশতঃ, মেঘদূতের অনেক স্থলে পাঠের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। ব্যাখ্যাকর্ত্তাদিগের মধ্যে যিনি যে স্থলে যে পাঠ অবলম্বন করিয়াছেন, তৎসমুদয় পাঠাদিবিবেকে সবিস্তর প্রদর্শিত হইল (১)। তন্মধ্যে মল্লিনাথের অবলম্বিত পাঠ অধিক স্থলেই সমীচীন; কিন্তু কোন কোন স্থলে অন্যান্য ব্যাখ্যাকর্ত্তাদিগের অনুমোদিত পাঠ সুসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তদ্ব্যতিরিক্ত, পুস্তকবিশেষে যে যে পাঠান্তর লক্ষিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ও তত্তৎস্থলে উদ্ধৃত হইল।

১০। পাঠবৈলক্ষণ্যের ন্যায়, মেঘদূতে শ্লোকসংখ্যারও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত কালেজের পুস্তকে ১১৬, কলিকাতামুদ্রিত পুস্তকে ১১৮, বারাণসীমুদ্রিত পুস্তকে ১২১, মৃন্ময়ীমুদ্রিত পুস্তকে ১২৫, শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদয়ে শ্লোক-সংখ্যা ১২৭। তন্মধ্যে ১১২টি শ্লোক সকল পুস্তকেই সন্নিবেশিত আছে, আর ১৫টি শ্লোকের মধ্যে কোন পুস্তকে কোন কোন শ্লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ সংখ্যা-বৈলক্ষণ্যের কারণ এই বোধ হয়, কোন কোন ব্যক্তি, ক্ষমতাপ্রদর্শনবাসনায়, দুই একটি শ্লোক রচনা করিয়া মেঘদূতে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই প্রক্ষেপক্রিয়া এক দেশে বা এক সময়ে সম্পন্ন হয় নাই; তত্প্রযুক্তই, সকল পুস্তকে সমস্ত প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না।

১১। ১২৭ শ্লোকের মধ্যে কোন্ কোন্ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত, তাহার নিরূপণ করা নিতান্ত দুরূহ নহে। কালিদাসের রচনার এরূপ অসাধারণ বৈচিত্র্য আছে যে সহৃদয় ব্যক্তিরা, কিঞ্চিৎ অভিনিবেশসহকারে মেঘদূত পাঠ করিলে, কোন্ কোন্ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত তাহা অনায়াসে নির্ণয় করিতে পারেন। সংস্কৃত কালেজের পুস্তকে একটি, কলিকাতামুদ্রিত পুস্তকে তিনটি, বারাণসীমুদ্রিত পুস্তকে ছয়টি, মৃন্ময়ীমুদ্রিত পুস্তকে সাতটি, শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ আছে। মেঘদূত পাঠ করিয়া আমার যেরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে, তদনুসারে ১১০টি শ্লোক কালিদাসপ্রণীত, অবশিষ্ট ১৭টি তদীয় লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত নহে।

---

(১) পাঠাদিবিবেক মুদ্রিত হইলে পর, সৌদামনী আমার হস্তে আইসে; এজন্য, পাঠ-ভেদাদিনির্দ্দেশস্থলে মকরন্দের নাম উল্লিখিত দৃষ্ট হইবেক না। আদ্যন্ত পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, সুবোধা, সঙ্গতা, মুক্তাবলী ও তাৎপর্য্যদীপিকার সহিত সৌদামনীর বড় বিভিন্নতা নাই। ভরতমল্লিকপ্রভৃতি যে স্থলে যেরূপ পাঠ ধরিয়াছেন ও যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মকরন্দও তত্তৎস্থলে প্রায়ই সেইরূপ পাঠ ধরিয়াছেন ও সেইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১২। প্রক্ষিপ্তবর্গের মধ্যে দুই তিনটি শ্লোক রচনা বা ভাবসঙ্কলন বিষয়ে নিতান্ত নিন্দনীয় নয়; কিন্তু অবশিষ্টগুলির এরূপ কোন গুণ নাই যে তাহারা, কালিদাসগ্রন্থে প্রবিষ্ট হইয়া, তৎপ্রণীত বলিয়া সহৃদয়সমাজে পরিগৃহীত হইতে পারে। উহারা যথাসম্ভব পৌনরুক্ত্য, দুরান্বয়, কষ্টকল্পনা, ন্যূনপদতা, অধিকপদতা, অস্ফুটার্থতা, ব্যর্থবিশেষণতা প্রভৃতি দোষে আঘ্রাত। আমার বোধে যে যে শ্লোক প্রক্ষিপ্ত, তাহা পাঠাদিবিবেকে প্রদর্শিত হইল।"

২৬

স্বসম্পাদিত 'উত্তরচরিতে'র 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর, ১৮৭০ সালের ১০-নভেম্বর, লিখেছেন :

"ভবভূতি ভারতবর্ষের এক অতি প্রধান কবি। কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ, ও বাণভট্টের পর তদীয় নামনির্দ্দেশ, বোধ হয়, অসংগত নহে। ভবভূতির সবিশেষ প্রশংসনীয় কতিপয় অসাধারণ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার গ্রন্থে অর্থের যেরূপ ঔদার্য্য ও গাম্ভীর্য্য আছে, অন্যান্য কবির গ্রন্থে প্রায় সেরূপ লক্ষিত হয় না। ভবভূতি ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্যান্য কবির কাব্যে গিরি, নদী, অরণ্য প্রভৃতির প্রকৃতরূপ বর্ণনা নিতান্ত বিরল। অন্যান্য কবিরা, অনাবশ্যক স্থলেও, আদিরস অবতীর্ণ করিয়াছেন; কিন্তু, ভবভূতি সে দোষে দূষিত নহেন। তিনি, অনাবশ্যক স্থলে, স্বীয় রচনাকে কদাচ আদিরসে কলুষিত করেন নাই; আবশ্যক স্থলেও, আদিরসবর্ণনাকালে, সবিশেষ সাবধান হইয়াছেন। ইঁহার যেমন অসাধারণ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই অসাধারণ দোষও লক্ষিত হইয়া থাকে। তদীয় কাব্যের অনেক স্থলে, অনায়াসে অর্থগ্রহ হওয়া দুর্ঘট; এবং, মধ্যে মধ্যে, সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে, এমন দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা আছে, যে তদ্দ্বারা অর্থবোধ ও রসগ্রহ বিষয়ে, বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিয়া উঠে। নাটকে, কথোপকথন-স্থলে, সেরূপ দীর্ঘসমাস অবলম্বন নিরতিশয় দোষাবহ, তাহার সন্দেহ নাই।

২। বীরচরিত, উত্তরচরিত, মালতীমাধব, এই তিন খানি নাটক ভবভূতিপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। বীরচরিতে, বিবাহ অবধি রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত, রামচরিত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বীররসাশ্রিত নাটক। এই নাটকে ভবভূতির কবিত্বশক্তি বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু, যে সকল গুণ থাকিলে, নাটক প্রশংসনীয় হয়, তৎসমুদয় অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয় না। তথাপি, রামচরিতের এই অংশ অবলম্বন পূর্ব্বক, অন্যান্য কবিরা যে সকল নাটকের রচনা করিয়াছেন, বীরচরিত তৎসর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই।

৩। উত্তরচরিত রামের রাজ্যাভিষেকের উত্তরকালীন বৃত্তান্ত অবলম্বন পূর্ব্বক রচিত। রামচরিতের এই অংশ বাল্মীকিরামায়ণের উত্তরকাণ্ডে নিবদ্ধ আছে। কিন্তু, উত্তরচরিতে, অশ্বমেধীয় অশ্বনিরোধ উপলক্ষে, অশ্বরক্ষক রামসৈন্যের সহিত লবের যে যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে, রামায়ণে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। এই বৃত্তান্ত পদ্মপুরাণপাতালখণ্ড রামাশ্বমেধপ্রকরণ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। উত্তরচরিত করুণরসাশ্রিত নাটক। এই নাটক কারুণ্য, মাধুর্য্য, ও অর্থগাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। রচনা মধুর ও প্রগাঢ়। করুণরসবিষয়ে, ভবভূতির উত্তরচরিত সংস্কৃতভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য। এই নাটকের পাঠকালে, অনেক স্থলে, মোহিত হইতে ও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে হয়।

৪। মালতীমাধব আদিরসাশ্রিত নাটক। ভবভূতি, এই নাটকে, স্বীয় অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির ও অসাধারণ রচনাশক্তির একশেষ প্রদর্শিত করিয়াছেন; এবং প্রস্তাবনাতে, গর্ব্বিত বাক্যে, নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "যে কেহ আমার এই নাটকে অবজ্ঞাপ্রদর্শন করে, তাহারাই তাহার কারণ জানে; তাহাদের নিমিত্ত আমার এ যত্ন নয়। আমার কাব্যের ভাবগ্রহণসমর্থক কোনও ব্যক্তি কালে উৎপন্ন হইতে পারেন, অথবা কোথাও বিদ্যমান আছেন; কারণ, কালের অবধি নাই, এবং পৃথিবী বহুবিস্তীর্ণা" (১)। কিন্তু ভবভূতি, নাটকের উৎকর্ষসম্পাদনার্থে,

(১) যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥

যেরূপ প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং প্রস্তাবনাতে যেরূপ অহঙ্কারপ্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার মালতীমাধব নাটকাংশে তত উৎকৃষ্ট হয় নাই। এই গ্রন্থে রচনার বিলক্ষণ চাতুর্য্য ও মাধুর্য্য আছে, এবং অর্থেরও অসাধারণ গাম্ভীর্য্য আছে। সহৃদয় লোকে, মালতীমাধব-পাঠ করিয়া, ভবভূতির কবিত্বশক্তি ও রচনাশক্তির মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিবেন; কিন্তু ইহাকে অত্যুৎকৃষ্ট নাটক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে সম্মত হইবেন না। বোধ হয়, ভবভূতি, স্বপ্রণীত নাটকত্রয়ের মধ্যে, মালতীমাধবকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই উত্তরচরিতকে ভবভূতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন। অর্থবোধের দুরূহতা ও দীর্ঘসমাসঘটিত বাক্যবিন্যাস প্রভৃতি ভবভূতির যে সমস্ত দোষ আছে, তৎসমুদয় মালতীমাধবে, সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পরিমাণে, উপলব্ধ হইয়া থাকে।

৫। এই তিন নাটক ভিন্ন, ভবভূতি আর কোনও গ্রন্থের রচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না। তিনি কোন সময়ের লোক, তাহারও নিরূপণ করা সহজ নহে। কেহ কেহ অনুমান করেন, তিনি, সহস্র বৎসরের কিছু পূর্ব্বে, ভূমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বীরচরিতের ও মালতীমাধবের প্রস্তাবনাতে, সূত্রধারমুখে তিনি আপনার যে পরিচয়প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার বিষয়ে তদতিরিক্ত আর কিছু জানিবার উপায় নাই। সে পরিচয় এই—বিদর্ভদেশের অন্তঃপাতী পদ্মপুর নগর তাঁহার জন্মভূমি, পিতার নাম নীলকণ্ঠ, পিতামহের নাম গোপাল, মাতার নাম জাতুকর্ণী; তিনি কাশ্যপগোত্রে জন্ম পরিগ্রহ করেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা, বেদবিদ্যা ও বেদোদিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা, বিলক্ষণ লব্ধপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

৬। কিছু দিন পূর্ব্বে, আমি, উত্তরচরিতের সংস্করণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু, কোনও বিশিষ্ট হেতু বশতঃ, তৎকালে তাহা হইতে বিরত হই। অনন্তর, এই নাটক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপুস্তক স্থিরীকৃত হইলে, অনেকে, ইহার নূতন সংস্করণ প্রচারিত করিবার নিমিত্ত, অনুরোধ করেন। তদনুসারে, এই সংস্করণ প্রচারিত হইল। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, রাজকীয় শিক্ষাসমাজের আদেশে ও অর্থব্যয়ে, উত্তরচরিত সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। কলিকাতাস্থ সংস্কৃতবিদ্যালয়ের সাহিত্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যাপক পূজ্যপাদ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট তদীয় অগ্রজ রঘূত্তম শিরোমণি মহাশয়ের হস্তলিখিত যে পুস্তক ছিল, প্রথমমুদ্রিত পুস্তক ঐ পুস্তকের প্রতিকৃতি। আট বৎসর অতীত হইল, উল্লিখিত বিদ্যালয়ের তদানীন্তন অধ্যক্ষ সংস্কৃতবিদ্যানুরাগী শ্রীযুত ই. বি. কাউএল মহোদয়ের উদ্যোগে ও অর্থ ব্যয়ে, ঐ বিদ্যালয়ের অলঙ্কারশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পূজ্যপাদ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়, প্রথমমুদ্রিত পুস্তক ও হস্তলিখিত অপর পুস্তকদ্বয় অবলম্বন করিয়া, সংক্ষিপ্ত টীকা সহিত, এই নাটক দ্বিতীয় বার মুদ্রিত করেন। তত্রত্য বিজ্ঞাপনে নির্দ্দিষ্ট আছে, ঐ হস্তলিখিত পুস্তকদ্বয়ের একখানি বারাণসী হইতে সংগৃহীত, দ্বিতীয় খানি বিজয়নগর হইতে অধিগত। উল্লিখিত মুদ্রিত পুস্তকদ্বয় ও অপর দুই খানি হস্তলিখিত পুস্তক অবলম্বন পূর্ব্বক, এই সংস্করণ সম্পাদিত হইল। শেষোক্ত পুস্তকদ্বয়ের এক খানি, বহু দিন অবধি, আমার নিকটে আছে; দ্বিতীয় খানি বারাণসীস্থ সংস্কৃতবিদ্যালয় হইতে আনীত। আমার নিকটস্থ হস্তলিখিত পুস্তক খানি অতি প্রাচীন। পুস্তকের শেষে লেখকের রচিত একটি শ্লোক আছে, তদনুসারে, উহা ১৩৩০ শকে লিখিত; সুতরাং, এক্ষণে উহার বয়ঃক্রম ৪৬২ বৎসর(২)। বারাণসীপুস্তক অনেক স্থলে খণ্ডিত, তাহাতে চতুর্থ অঙ্কের প্রায় অর্দ্ধাংশ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্কের সমগ্র, এবং প্রথম ও সপ্তম অঙ্কের কিয়দংশ নাই। এই পুস্তক প্রাচীন বটে; কিন্তু কোন সময়ে লিখিত, তাহার কোনও নিদর্শন নাই।

৭। উত্তরচরিতে পাঠের বিলক্ষণ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। উল্লিখিত পুস্তকচতুষ্টয়ের মেলন করিয়া, পাঠসংশোধন বিষয়ে সবিশেষ যত্ন করিয়াছি; কিন্তু কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। এই চারি পুস্তকের, অনেক স্থলে, পরস্পর পাঠের বিস্তর বিভিন্নতা আছে। তত্তৎ স্থলে, আমার বিবেচনায়, যে পাঠ প্রশস্ত বোধ হইয়াছে, তাহাই মূলে সন্নিবেশিত করিয়াছি। কিন্তু, কেবল আমার বিবেচনার উপর নির্ভর না করিয়া, পাঠকগণ স্বয়ং বিবেচনা করিবার অবসর পাইবেন, এজন্য, পাঠভেদস্থলে, চারি পুস্তকের পাঠ নিম্নে পৃথক পৃথক প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ ১ সংখ্যায়,

---

(২) উত্তরচরিতং শাকে ত্বরিতং লিলেখ শূন্যাগ্নিবেদেন্দৌ।
শ্রীলাচার্য্যশিরোমণিরনিশং যত্নেন সংশোধ্য॥

দ্বিতীয় মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ ২ সংখ্যায়, আমার নিকটস্থ পুস্তকের পাঠ ৩ সংখ্যায়, বারাণসীপুস্তকের পাঠ ৪ সংখ্যায় অঙ্কিত হইয়াছে। অধিকাংশস্থলে, আমার নিকটস্থ পুস্তকের পাঠ প্রশস্ত বোধে অবলম্বন করিয়াছি। আক্ষেপের বিষয় এই, অত্যন্ত জীর্ণ ও কীটদষ্ট হওয়াতে, পুস্তকের অনেক স্থল এক কালে বিলুপ্ত হইয়াছে। স্থলবিশেষে, কোনও পুস্তকের পাঠই প্রকৃত পাঠ বলিয়া বোধ হয় নাই। ঐ সকল পাঠ লিপিকরপ্রমাদ-দূষিত, এই বিবেচনায়, পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে স্থলে নিম্নপ্রদর্শিত কোনও পাঠ মূলে পরিগৃহীত হয় নাই, তথায়, পাঠ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, বোধ করিতে হইবেক। কোনও কোনও স্থলে, ব্যাখ্যায় এই পরিবর্ত্তনের উল্লেখ আছে।

৮। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে, দুরূহ স্থলের ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দর্শনে, এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য-লাভ করিয়াছি। বারাণসীবাসী রঙ্গনাথদীক্ষিতের পুত্র নারায়ণভট্ট, ১৬৮৬ সংবতে (৩), অপেক্ষিতব্যাখ্যান নামে উত্তরচরিতের টীকারচনা করিয়াছিলেন; কলিকাতাস্থ সংস্কৃত-বিদ্যালয়ে ঐ টীকার এক খানি পুস্তক আছে। নারায়ণের টীকা অতি সংক্ষেপে সঙ্কলিত; অনেক দুরূহ স্থল এক কালে উপেক্ষিত হইয়াছে; যে সকল দুরূহ স্থলের ব্যাখ্যা লিখিত আছে, তাহাও সর্ব্বত্র সুসঙ্গত বোধ হয় না। তথাপি ঐ টীকা হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি, তাহার সন্দেহ নাই। আমার বিবেচনায়, যে সকল স্থল দুরূহ বোধ হইয়াছে, তাহারই ব্যাখ্যা লিখিয়াছি। যে সকল বিদ্যালয়ে উত্তরচরিতের এই সংস্করণ ব্যবহৃত হইবেক, তত্রত্য অধ্যাপক মহাশয়দিগের নিকট প্রার্থনা এই, তাঁহারা যদি কোনও দুরূহ স্থল উপেক্ষিত হইয়াছে, বোধ করেন, দয়া করিয়া আমায় জানাইলে, সাতিশয় উপকৃত হইব; আর, যে সকল ব্যাখ্যা অবিস্পষ্ট, অসংলগ্ন, বা ভ্রমাত্মক বোধ হইবেক, তাহাও জানাইলে, সবিশেষ অনুগৃহীত বোধ করিব।"

২৭

১৮৭১ সালের জুনমাসে প্রকাশিত স্বসম্পাদিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলমে'র 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যাসাগর লিখেছেন :

"অভিজ্ঞানশকুন্তল ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অমৃতময়ী লেখনীর মুখ হইতে বিনিঃসৃত। কালিদাস কীদৃশ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা অসাধ্য। যাঁহারা কাব্যশাস্ত্রের রসাস্বাদে যথার্থ অধিকারী, সেই সহৃদয় মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন, কালিদাস, কিরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া, ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। কোনও দেশের কোনও কবি, কালিদাসের ন্যায়, সকল বিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ছিলেন না, এরূপ নির্দ্দেশ করিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইতে হয় না।

২। কালিদাস যে অদ্ভুত কবিত্বশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, স্বপ্রণীত কাব্যসমূহে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয়প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তদীয়গ্রন্থপাঠে, সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রের হৃদয়কন্দর অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে উচ্ছলিত হইয়া উঠে। বর্ণনার চাতুর্য্য ও রচনার মাধুর্য্য বিষয়ে, কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তদীয় বর্ণনা পাঠ করিলে, মোহিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। তদীয় রচনা সংস্কৃতরচনার আদর্শস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ, এরূপ অলৌকিক কবিত্ব-শক্তি, এরূপ অলৌকিক রচনাশক্তি, এ উভয়ের একত্র সংঘটন অতি বিরল। এই নিমিত্তই, ভারতবর্ষীয় লোকে, একবাক্য হইয়া, কালিদাসকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন।

---

(৩) বারাণসীনিয়তবাসপবিত্রমূর্ত্তেঃ শ্রীরঙ্গনাথবিদুষো বিহিতাধ্বরস্য।
শ্রীবালকৃষ্ণ ইতি যঃ প্রথিতস্তনুজস্তস্যাগ্রজেন রুচিরা বিবৃতির্ব্যধায়ি॥
ঋতুগজরসচন্দ্রে বিক্রমার্কস্য শাকে
গতবতি শুভমাসে কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে।
প্রতিপদি পরিপূর্ণাকারি জিজ্ঞাসুতুষ্ট্যৈ
বিবৃতিরিয়মুমেশাধিষ্ঠিতায়াং নগর্য্যাম্॥

৩। অদ্বিতীয় গুণগ্রাহী, নিরতিশয় বিদ্যোৎসাহী, বিখ্যাতনামা বিক্রমাদিত্যের সভায়, নয় জন অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা অদ্যাপি নবরত্ন নামে সচরাচর উল্লিখিত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে কালিদাস সর্ব্বপ্রধান রত্ন ছিলেন। চিরস্মরণীয় উজ্জয়িনীপতি যে শাক প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম সংবৎ। সংবতের ১৯২৭ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। সুতরাং, কালিদাস, ঊনবিংশতি শত বৎসর পূর্ব্বে, প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

৪। অভিজ্ঞানশকুন্তল কালিদাসের সর্ব্বপ্রধান কাব্য এবং সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক। এই অপূর্ব্ব নাটকের, আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত, সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ইহাতে হস্তিনাপুরের অধিপতি রাজা দুষ্যন্তের, এবং মহর্ষি কণ্বের পালিত তনয়া শকুন্তলার, বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতের আদিপর্ব্বে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার যে উপাখ্যান আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া, কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলের রচনা করিয়াছেন। উভয়বিধ উপাখ্যান দৃষ্টিগোচর করিলে, বুঝিতে পারা যায়, কালিদাস মহাভারতীয় উপাখ্যানে কি অদ্ভুত কৌশল ও অলৌকিক চমৎকারিত্ব সমাবেশিত করিয়াছেন। ফলতঃ, অভিজ্ঞানশকুন্তলে কালিদাসের চমৎকারিণী কল্পনাশক্তি ও চিত্তহারিণী রচনাশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই নাটক পাঠ করিলে, সংস্কৃতজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তির অন্তঃকরণে নিঃসংশয় এই প্রতীতি জন্মে, মানুষের ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না। বস্তুতঃ, কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল অলৌকিক পদার্থ। ধন্য কালিদাস! ধন্য অভিজ্ঞানশকুন্তল! প্রলয়ের পূর্ব্বে, তোমাদের বিলয়ের আশঙ্কা নাই। ধন্য বিক্রমাদিত্য! এই কালিদাস তোমার বয়স্য ও সভাসদ ছিলেন; এই অভিজ্ঞানশকুন্তল, তোমার পরিতোষার্থে, সর্ব্ব প্রথম, উজ্জয়িনীর রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইয়াছিল।

৫। দ্বাত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল, কলিকাতাস্থ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অলঙ্কারশাস্ত্রাধ্যাপক পূজ্যপাদ প্রেমচন্দ্রতর্কবাগীশ মহাশয়, এ দেশে, সর্ব্বপ্রথম, এই নাটক মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তৎপরে, বিংশতি বৎসর অতীত হইলে, উক্ত বিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ উদারচরিত শ্রীযুত ই, বি, কাউএল মহোদয়ের উদ্যোগে ও অর্থব্যয়ে, তর্কবাগীশ মহাশয়, সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহিত, দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচারিত করেন। অনন্তর, দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইল, পূর্ব্বস্থলীনিবাসী শ্রীযুত কৃষ্ণনাথন্যায়পঞ্চানন মহাশয়, আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যা সহিত, এক উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রচারিত করিয়াছেন। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় সুপণ্ডিত ও কাব্য-শাস্ত্রে বিলক্ষণ প্রবীণ। তদীয় যত্নে ও পরিশ্রমে, এই নাটকের অনুশীলন বিষয়ে সবিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে।

৬। শেষোক্ত উপাদেয় সংস্করণদ্বয় বিদ্যমান থাকিতে, নূতন সংস্করণে প্রবৃত্ত হইবার কারণ এই যে, অভিজ্ঞানশকুন্তল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপুস্তক স্থিরীকৃত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা আদেশ করিয়াছেন, ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে এই নাটকের যেরূপ পুস্তক প্রচলিত আছে, পরীক্ষাদানার্থীরা সেই পুস্তক পাঠ করিবেন। পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয়, অথবা, মাননীয় ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়, গৌড়দেশপ্রচলিত পুস্তকের সংস্করণ করিয়াছেন। গৌড়দেশে প্রচলিত ও উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত, উভয়-বিধ পুস্তকে পাঠের পরস্পর এত বিভিন্নতা ঘটিয়াছে যে, একবিধ পুস্তক পাঠ করিলে, অপরবিধপুস্তকপাঠের প্রয়োজন সম্যক সম্পন্ন হয় না। সুতরাং, বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত, উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের প্রচলিত পুস্তকের সংস্করণ নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে।

৭। অষ্টাদশ বৎসর অতীত হইল, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুত মনিয়র উইলিয়ম্স মহোদয় ইংলণ্ডদেশে উক্তবিধ পুস্তকের অত্যুৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রচারিত করিয়াছেন। এই সংস্করণ প্রায় যাবতীয় দুরূহ স্থলের ইংগরেজীভাষায় লিখিত ব্যাখ্যা-মালায় অলঙ্কৃত। সংস্করণকার্য্যে উক্ত মহোদয়ের যথোচিত যত্ন, সবিশেষ পরিশ্রম, ও সাতিশয় সহৃদয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে। অত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাদানার্থীদিগের যেরূপ পুস্তকের প্রয়োজন, এই সংস্করণ সর্ব্বাংশে সেই রূপে সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু, তদীয় পুস্তক এতদ্দেশীয় বিদ্যার্থীদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে সুলভ নহে; সুতরাং, তদ্বারা এ দেশে উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের প্রচলিত পুস্তকের অসদ্ভাব পরিহৃত হইতেছে না। সেই অসদ্ভাবের পরিহারবাসনায়, এই সংস্করণ প্রচারিত হইল।

৮। এ দেশে উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের প্রচলিত পুস্তকের প্রচার নাই। উক্তবিধ পুস্তকের প্রেরণের নিমিত্ত, আমি বারাণসীনিবাসী এক আত্মীয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম। এই প্রার্থনা ফলবতী হয় নাই। এ বিষয়ে অন্যান্য চেষ্টা করিয়াও, কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।

ফলতঃ, পুস্তকপ্রাপ্তি বিষয়ে প্রথমতঃ বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটিয়াছিল। পরে, আমি, কার্য্যবশতঃ, গত ফাল্গুনমাসে, বারাণসীধামে গিয়াছিলাম। ঐ সময়ে উক্ত নগরীর অধিবাসী শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্রের সহিত আমার আলাপ হয়। এই মহোদয়, দয়া করিয়া, স্বীয় পুস্তকালয় হইতে, আমায় তিন খানি মূল, এক খানি টীকা, ও তিন খানি প্রাকৃতবিকৃতি দিয়াছিলেন। অনন্তর, কলিকাতাস্থ সংস্কৃতবিদ্যালয়ের তাৎকালিক অধ্যক্ষ, শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর উদ্যোগে, বারাণসীসংস্কৃতবিদ্যালয় হইতেও, দুই খানি মূল আমার হস্তগত হয়। এই পাঁচ খানি মূল, এক খানি টীকা, ও তিন খানি প্রাকৃতবিকৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক, অভিজ্ঞানশকুন্তলের সংস্করণকার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।

৯। উল্লিখিত নয় পুস্তকে, স্থলে স্থলে, পাঠের বিভিন্নতা আছে। পাঠভেদস্থলে, আমার বিবেচনায়, যে পাঠ প্রশস্ত বোধ হইয়াছে, তাহাই মূলে সন্নিবেশিত করিয়াছি। কিন্তু, কেবল আমার মীমাংসার উপর নির্ভর না করিয়া, পাঠকগণ স্বয়ং বিবেচনা করিতে পারিবেন, এজন্য, সেই সেই স্থলে, সকল পুস্তকের পাঠ নিম্নে প্রদর্শিত হইয়াছে। বাবু হরিশ্চন্দ্রের দত্ত তিন খানি মূলের মধ্যে, দুই খানি সমগ্র; তন্মধ্যে এক খানি নূতন, দ্বিতীয় খানি পুরাতন; নূতন পুস্তকের পাঠ ১ সংখ্যায়, পুরাতন পুস্তকের পাঠ ২ সংখ্যায়, অঙ্কিত হইয়াছে; তৃতীয় পুস্তক আদিমধ্যখণ্ডিত; এই পুস্তকের পাঠ ৩ সংখ্যায় অঙ্কিত হইয়াছে। বারাণসীবিদ্যালয়ের দুই পুস্তকই অন্তখণ্ডিত; তন্মধ্যে যে পুস্তক খানি অতি অল্প অংশে খণ্ডিত, তাহার পাঠ ৪ সংখ্যায় অঙ্কিত, অপর খানির পাঠ ৫ সংখ্যায় অঙ্কিত, হইয়াছে। টীকার অনুযায়ী পাঠ ৬ সংখ্যায় অঙ্কিত হইয়াছে। প্রাকৃতবিকৃতির মধ্যে, এক খানি সমগ্র, অপর দুই খানি খণ্ডিত; সমগ্র পুস্তকের অনুযায়ী পাঠ ৭ সংখ্যায়, খণ্ডিত দ্বিতয়ের মধ্যে প্রাচীনতর পুস্তকের অনুযায়ী পাঠ ৮ সংখ্যায়, অপর পুস্তকের অনুযায়ী পাঠ ৯ সংখ্যায়, অঙ্কিত হইয়াছে।

১০। আমি উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের প্রচলিত পুস্তকের সংস্করণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; এজন্য, আদ্যোপান্ত, উল্লিখিত পুস্তক সমুদয়ের সম্পূর্ণ অনুসরণ করিয়াছি। তবে, যে যে স্থলে, সেই সেই পুস্তকের অনুযায়ী পাঠ কোনও রূপে সংলগ্ন হয় না, এরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে, কেবল তাদৃশ কতিপয় স্থলে, অগত্যা, গৌড়দেশপ্রচলিত পুস্তকের অনুযায়ী পাঠ অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত, স্থলবিশেষে, কোনও কোনও পাঠ, লিপিকরপ্রমাদদূষিত বিবেচনা করিয়া, কিঞ্চিৎ অংশে পরিবর্ত্তিত করিয়াছি। এইরূপে পরিবর্ত্তিত পাঠ সকল স্বতন্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

১১। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে, দুরূহ স্থলের ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে। বাবু হরিশ্চন্দ্রের নিকট হইতে যে টীকা খানি পাইয়াছিলাম, তাহা হইতে যথেষ্ট আনুকূল্যলাভ করিয়াছি। এই টীকা রাঘবভট্টপ্রণীত; নাম অর্থদ্যোতনিকা। টীকা দর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, রাঘবভট্ট সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে সবিশেষ প্রবীণ ছিলেন। আমার বিবেচনায়, যে সকল স্থলের ব্যাখ্যা লেখা আবশ্যক বোধ হইয়াছে, সে সমুদয়ের ব্যাখ্যা লিখিয়াছি। যে সকল বিদ্যালয়ে অভিজ্ঞানশকুন্তলের এই সংস্করণ ব্যবহৃত হইবেক, তত্রত্য অধ্যাপক মহাশয়দের নিকট প্রার্থনা এই, যদি কোনও দুরূহ স্থল উপেক্ষিত হইয়াছে, বোধ করেন, দয়া করিয়া আমায় জানাইলে, অতিশয় উপকৃত হইব। আর, যদি কোনও ব্যাখ্যা অবিস্পষ্ট, অসংলগ্ন, বা ভ্রমাত্মক বোধ হয়, তাহাও জানাইলে, সবিশেষ অনুগৃহীত বোধ করিব।

১২। স্থলে স্থলে, নাটকীয় ব্যক্তিগণের উক্তিবিরামে, কবিবাক্যে তদীয় ক্রিয়ায় যে সমস্ত নির্দ্দেশ আছে, গৌড়দেশপ্রচলিত পুস্তকে সেই সকল ক্রিয়ানির্দ্দেশবাক্যের আদিতে ইতিশব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা, **ইতি শরসন্ধানং নাটয়তি, ইতি বিলোকয়ন্ স্থিতঃ, ইতি কলসভাবর্জয়তি** ইত্যাদি। কিন্তু, যে সকল পুস্তক অনুসারে, এই সংস্করণ সম্পন্ন হইয়াছে, উহাদের অধিকাংশ স্থলেই তাদৃশ ইতিশব্দের যোগ লক্ষিত হয় না। ফলতঃ, ঐরূপ ইতিশব্দের যোজনা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। এজন্য, এই সংস্করণে উল্লিখিত ক্রিয়ানির্দ্দেশবাক্যে ইতিশব্দ যোজিত হয় নাই।

১৩। এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক, বারাণসীনিবাসী শ্রীযুত বাবু হরিশ্চন্দ্রের আনুকূল্য না পাইলে, আমি, কোনও ক্রমে, অভিজ্ঞানশকুন্তলের সংস্করণকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম না। আমার অভিজ্ঞানশকুন্তল পুস্তকের প্রয়োজন হইয়াছে, ইহা অবগত হইবামাত্র, এই সৌম্যমূর্ত্তি, অমায়িক, নিরহঙ্কার, বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী মহোদয়, যেরূপ

সৌজন্য ও উৎসাহ সহকারে, আমার হস্তে পুস্তক বিন্যস্ত করিয়াছিলেন, তাহা আমি, কস্মিন্ কালেও, বিস্মৃত হইতে পারিব না।"

২৮

১৮৭২ সালের গোড়ার দিকে সংস্কৃত কলেজ থেকে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ বিলুপ্ত করে দেবার প্রস্তাব হল। এ-বিষয়ে গবর্নমেণ্ট বিদ্যাসাগরের পরামর্শ চেয়েছে। বিদ্যাসাগর ওই প্রস্তাবে সায় দিতে পারলেন না। বিদ্যাসাগরের বিবেচনায় কেবলমাত্র স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য একজন অধ্যাপক প্রয়োজন।

কিন্তু বিদ্যাসাগরের পরামর্শ গবর্নমেণ্ট শোনেনি। সংস্কৃত কলেজে কেবলমাত্র স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য কোনো অধ্যাপক রইলেন না, দর্শনশাস্ত্র ও অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপকের উপর স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনার ভার অর্পিত হল।

১৮৭২ সালের ২২-মের 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত হল :

". . . The Lieutenant-Governor having, as you are aware, at an early stage of the discussion, expressed his willingness to consider this matter with reference to the wishes of many members of the Hindu Community, has had interviews with Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar and the Principal of the College (Prasanna Kumar Sarvadhikari) and has taken opportunity of otherwise discussing the matter. He finds the suggestions of the gentlemen whom he has named, and of other competent persons, to be so moderate and reasonable that he has much pleasure in being able substantially to comply with their wishes pending further trial of the arrangements now to be made. . ."*

অনেকের ধারণা হল, সংস্কৃত কলেজ থেকে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ বিলুপ্ত করে দেবার প্রস্তাব বিদ্যাসাগর সমর্থন করেছেন। অনেকেই বিদ্যাসাগরের নামে তখন অন্যায় অভিযোগ করেছেন।

উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করে বিদ্যাসাগর অবশ্য শেষপর্যন্ত এই অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন।

১৮৭২ সালের ১০-জুন 'Pundit Iswara Chandra Vidyasagara and the Lieutenant Governor' শিরোনাম দিয়ে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখেছে :

"We have much pleasure in giving a prominent insertion to the following correspondence:

TO THE EDITOR OF THE HINDOO PATRIOT

DEAR SIR,—As considerable misapprehension prevails among my countrymen as to the opinion I expressed to His Honor the Lieutenant-Governor, when he did me the honor of consulting me regarding the Sanscrit College, particularly in reference to the constitution of the chair of Hindu Law, I deem it due to lay before the public through the medium of your paper the accompanying correspondence, which I hope will remove the erroneous impression entertained on the subject. I am always reluctant to rush into print, but when I find myself actually abused and looked upon as the individual, who has advised the Lieutenant Governor the arrangement about the chair of Hindu Law, which is unhappily

* C. Bernard, offg. Secretary to the Govt. of Bengal, to the D.P.I., dated 17 May 1872.—Education Department Consultation June 1872, Nos. A. 16-28.

regarded as a piece of down-right jobbery, I cannot in justice to myself refrain from letting the public know the part I have taken in this business. I need hardly add that I am compelled to resort to this step by the equivocal terms used in the letter of Mr. Secretary Bernard to the Director of Public Instruction on the subject. I however feel much indebted to His Honor for completely exonerating me in the last letter of His Private Secretary to my address.

The 8th June 1872.

Yours faithfully,
ISWARA CHANDRA SARMA.

To

Calcutta 23rd May 1872

H. LUTTMAN JOHNSON ESQ.
Private Secretary to His Honor the
Lieutenant Governor of Bengal.

MY DEAR SIR,—Adverting to the Government order on the reorganization of the Sanskrit College, published in the last *Calcutta Gazette* I find that reference has been made to me and the Principal of the Sanskrit College, as the persons among others with whom His Honor the Lieutenant Governor was pleased to discuss the subject, and that His Honor considers their suggestions "to be so moderate and reasonable that he has much pleasure in being able substantially to comply with their wishes pending further trial of the arrangements now to be made." These arrangements are that the First Arts classes should be revived and that the Professorship of Hindu Law should be merged in that of Rhetoric and Philosophy by giving an increase of Rs. 50 to the present incumbent for this additional duty.

As I was asked by you under instructions of His Honor to consult the leading members of the Hindu community, who take interest in Sanskrit studies, before meeting His Honor, and as it might lead to an impression that the above suggestions emanated from me, I think it my duty to remind His Honor that so far as the proposed arrangement for instruction in Hindoo Law is concerned, it did not come from me. Indeed, I told His Honor distinctly that the importance of the subject demanded a separate chair, and I still entertain the same opinion. Hindu Law as His Honor is aware, is a vast subject it forms the life-study of a man. It is true that there may be versatile persons, who may combine a thorough knowledge of Sanskrit Literature with a profound acquaintance with Hindu Law, but such versatility is rare. To merge the chair of Hindoo Law in other chairs is to give it a secondary rank, and to reduce its practical usefulness, for a Professor who will teach it at his leisure moments as it were cannot be expected to devote that attention to it, which the vastness of the subject demands. I find it stated in the Government letter that according to the Principal of the College "Smriti or Hindu Law is now taught in a most satisfactory manner by the Professor in addition to some other duties." From my experience of the working of the College as ex-Principal I cannot however persuade myself

to subscribe to this opinion. Perhaps His Honor would form a clear idea of the anomaly of the proposed arrangement, if he would consider the effect of calling upon a Professor of Literature, Philosophy or Mathematics, in the Presidency College, who may have attended Law Lectures, but who has not made law his special study to fill the Chair of Law in addition to his other duties. I have no doubt that the legal profession would scout such an idea, and yet this is exactly the arrangement proposed for giving instruction in Hindoo Law in the Sanskrit College. I have high respect for the attainments and scholarship of Pundit Mahesh Chundra, but I fear that the union of so many duties in his hands will not only result in a falling-off in the study of law but also of those branches, which he is pre-eminently qualified to teach. His Honor observes, "it was and is intended that the teaching of Hindu law shall be fully maintained," but as I have endeavoured to show above His Honor's intention will be but ill-fulfilled by the arrangement proposed. I would therefore earnestly and respecfully solicit His Honor to reconsider this part of his recent orders. The saving which the absorption of the chair effects is so small viz., Rs. 100 a month that I earnestly trust that His Honor will see the propriety of making this concession to the Hindu community, particularly as His Honor has shown a commendable spirit of moderation and conciliation in these orders.

As it might be inferred from the tenor of the Government letter referred to that I have advised His Honor the proposed arrangement for filling the Chair of Hindoo Law, and as I am consequently liable to be misunderstood by the Hindu Community, whose feeling is very strong on the subject of the Chair of Hindoo Law, I would respectfully request that in justice to me His Honor may be pleased to take such means as His Honor may think fit to remove the erroneous impression, which his too general allusion to my suggestions regarding the reorganization of the Sanskrit College is calculated to produce on the public mind.

I remain &c.
ISWARA CHANDRA SARMA

Belvedere Alipore, the 25th May 1872.

MY DEAR PUNDIT,—I have laid your letter of the 23rd current about the recent orders for the reorganization of the Sanscrit College before His Honor the Lieutenant Governor. His Honor has no doubt that you are correct in saying that you did not individually recommend the absorption of the Profesorship of Hindoo Law. His Honor desires me to assure you that he proposes to make Hindoo Law the primary and not a mere secondary object of one of the chairs. He has every reason for believing that Pundit Mohesh Chunder is at least as qualified for the duty of teaching Hindoo Law as any other gentleman, whom he could have selected to succeed the late Professor, and he has the distinct assurance of the Principal that the Pundit is teaching the subject in the most satisfactory manner. Upon the whole, therefore, His Honor thinks that he has been well advised in the orders which he has passed.

He must try the present experiment sufficiently before he can consent to make another change.

I remain,
DEAR SIR,
Your's faithfully,
H. LUTTMAN JOHNSON,
Private Secretary.

We are exceedingly glad that Pundit Iswarachundra has exonerated himself from the charge, very generally brought against him by his countrymen, of betraying their interests in advising the Lieutenant Governor the new arrangement for the study of Hindu law in the Sanscrit College. From what we knew of the strong common sense and unflinching independence of the venerable Pundit we could scarcely believe that he was a party to what, as he says, is "unhappily regarded as a piece of down-right jobbery," but the terms in which the letter of Mr. Bernard was couched could suggest no other inference. The Hindu community we repeat are not at all satisfied with the amalgamation of the chair of Hindu law with those of Rhetoric and Philosophy, and we sincerely and earnestly hope that His Honor the Lieutenant Governor will reconsider the subject."

২৯

জন মার্ডক লিখেছেন:

"Bidyasagar, no doubt, is the Addison of Bengal; but his style is rather high for children. Indeed, a simpler style for adults is gaining ground. . . .

The writer regards questions about the best mode of teaching the alphabet and more style as very subordinate matters. The weighty points are the religious and moral teaching. Let the Bengali Reading Books so extensively used in Mission Schools, be tested in these respects.

The writer, in an appeal, addressed to Missionaries in Bengal, made the following quotations and remarks:—

The first extract is from Bidyasagar's Primer, Part I p. 25:—

"Nobin, yesterday you abused Bhubon when going home. You are young. You do not know that it is not good to abuse any one. If you abuse any person, I will tell everybody, and no one will speak to you."

The following is a translation of the first reading lesson in Part II:—

"1. Do not speak bad words to any one at any time. To speak bad words is a great fault. Whoever speaks bad words no one will wish to see him.

2. While you are young, learn your lessons with your whole mind. Every one will like you if you learn to read and write. No one will like him who is negligent in learning to read and write. Never be negligent in learning to read and write.

3. Always speak the truth. Every one likes him, who speaks the

truth. Nobody likes him who tells lies. Every one dislikes him. Do not therefore tell a lie at any time.

4. Learn your lesson every day. Do not say, I will prepare it to-morrow. Whatever you postpone, you will not be able to learn.

5. Do not be disobedient to your father and mother at any time. Always do whatever they bid you; do not act otherwise. They will not love you unless you listen to them.

6. Boys without sense play all day long, and do not pay attention to reading and writing. On these accounts they are always in trouble. Whoever learns his lessons diligently will always be happy."

The above two books may be regarded as original, peculiarly expressing the sentiments of the author. In the 67 pages which they contain, there does not seem to be a single allusion to God or a future state. Some sentences, it is true, would seem to recognize what Lord Stanley called "the eternal principles of justice;" but the grand argument against telling lies and using bad words is, that a boy will be disliked by others if he does. What low miserable morality to be taught in a Christian school! On the same principle, a Hindu should not become a Christian, for his relatives and neighbours would dislike him if he did. Missionaries, above all other men, are bound not to teach such a doctrine in their schools.

The *C. M. Intelligencer* thus comments upon the above remarks:—

"He takes exception at some of those (books) which are in use mainly as far as we can see, because the morality taught in some passages is 'low and miserable,' adducing some passages as specimens; partly also because the authors are not Christians and are irreligious men. Now it is perfectly true that higher motives might be assigned in some of the cases which he has instanced. For instance, when a boy reads, 'Learn your lesson every day; do not say, I will prepare it to-morrow; whatever you postpone you will not be able to learn;' it would be easy from the Bible, and even without the Bible, to urge the duty more effectively. But in an elementary Reading-book it seems somewhat unnecessary to insist upon such a defect."

The writer quoted a whole lesson to show the general character of the books. The phrase what "low miserable morality" must be understood in the connection in which it occurs. Instead of being too strong, the reverse is the case. It may rather be characterised as an ATHEISTIC MORALITY. This is the most fitting epithet to be applied to moral teaching which *ignores God and a future state*. The readers can judge whether this is a "defect" which "it seems somewhat unnecessary to insist upon."

It has been stated that an author's views can best be known from his original compositions. Some indications are also afforded by the manner in which he omits passages in books which he translates. The Bengali author of the Primers also wrote the book next read—Bodhodoy As already mentioned, it is based on "The Rudiments of Knowledge", published by Messrs. Chambers. The original does not contain the name of Christ except in explanation of A. D. There is, however, the following reference to the Bible:—

"The Bible is the word of God, which has been given to us for our

instruction; and if we read and study it with a humble heart, we shall learn what have been the works of the great Creator, and how kind He has been to the children of men."

The above is *omitted* in the Bengali. The original contains the following:—

"It is our duty to love God and to pray to him, and thank him for all his mercies."

This also has been *omitted*. The original contains the following:—

"When a body is dead, all its life is gone. It cannot see or feel, or move; it is an inanimate object, and is so unpleasing to look upon, that it is buried in the ground, where it rots into dust, and is no more seen on earth. *But although the bodies of mankind die and are buried, they have SOULS which live for ever, and which are given up to God who gave them.*"

The passage in italics, referring to a future state, has been *omitted*. The translation merely states that the body is buried or burned on the funeral pile. The original contains the following:—

"Mankind are called *rational* or *reasoning beings*, in consequence of having minds to reflect on what they see and do. They are also called *responsible* or *accountable beings*, because they have souls, which are accountable to God for actions done during life. But none of the lower animals are rational or accountable beings. They have not souls to be accountable, nor minds capable of thinking. They do not know right from wrong. When a beast dies it perishes for ever."

The above clearly points out the distinction between men and brutes. The latter perish for ever at death; the former have souls and are responsible beings. The whole passage has been omitted.

But the translator besides omitting passages has in one important instance altered the original. The English edition has the following:—

"By exercising or making use of all our senses, and remembering to the best of our ability what we see and what we hear, we gain *experience*, and are better able to take care of ourselves. Thus, the senses are of very great use to us. They are like roads or avenues, by which knowledge reaches the mind; and without them, we should be in a state of total ignorance."

The Bengali version of the above was thus translated by a native who knew nothing whatever of the object for which it was wanted. The general heading is "The Senses":—

"The above five senses are the avenues of our knowledge, by which we can get all sorts of knowledge, and without which we should be ignorant of every thing. By the exercise of those senses we gain experience, and experience produces the power of judgment of what is right and wrong, of what is good and bad. Therefore the senses are very advantageous to us."

The above taken in connection with the passages previously omitted, seems to teach *rank Materialism.*

It has been asserted that it is "misleading" to characterize such books as "Secularist." The author is described as "the well known Hindu reformer." But this is no proof to the contrary. His reforms are purely social. So far as the writer is aware, he has kept himself entirely

aloof from the Brahmo Somaj movement. Robert Owen, the Secularist, was also a reformer in his way.

The writer described the above books, not simply as *prepared* by a Secularist, but as *Secularist*. He did so because the author deliberately *struck out the injunction to worship God; because his moral teaching has no reference to God's will, but simply to what people around would think or do; because he omitted all passages teaching the immortality of the soul, the responsibility of man, and the difference between him and the brutes that perish.* If it is "misleading" to describe such books as "Secularist", the writer confesses that he does not know the meaning of the term. It is very lamentable that such books should have been prepared by the most distinguished writer in Bengali, formerly Principal of a Government College, and that they should be those which have by far the largest circulation throughout the country.

It is earnestly hoped that soon such books will be excluded from Mission Schools. . ."*

৩০

"To

H. F. Blanford Esqr.

Honorary Secretary to the Trustees,

Indian Museum.

Sir,

Having had occasion to visit the library of the Asiatic Society of Bengal, I called on the 28th January last, and as I wore native shoes, I was not admitted, unless I would leave my shoes behind. I felt so much affronted that I came back without an expostulation.

Whilst I was in the compound, I saw the native visitors, wearing native shoes, were made not only to uncover their feet, but also to carry their shoes with their own hands, though there were some upcountry people moving about in the museum-rooms with their shoes on.

* * * *

Besides, if persons so wearing shoes of the English pattern, though coming on foot, could be admitted with shoes on, I could not make out why persons of the same status in life and under similar circumstances should not be admitted, simply because they happened to wear native shoes.

* * * *

I have &c.

Isvar Chandra Sarma,

5-2-74."†

---

* John Murdoch: Education as a Missionary Agency in India (Madras, 1872), pp. 32-36.

† Subal Chandra Mitra: Isvar Chandra Vidyasagar, second edition, p. 237.

৩১

"To

The Sheriff of Calcutta.

Sir,

We the undersigned inhabitants of Calcutta and its suburbs, request you will be so good as to convene a public meeting, at the Town Hall, on an Early date, to take into consideration the measures to be adopted for perpetuating the memory of the late Honorable Justice Dwarka Nath Mitter.

We have the honor to be,

Calcutta,
May, 1874

Sir
Your most obedient servants
(বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য বহুজনের স্বাক্ষর)"*

৩২

১৮৭৪ সালের ২-জুলাই 'ইংলিশম্যান' লিখেছে :

"We understand that the Great Shoe Question has again come to the front, and is occupying the attention of no less distinguished a body than the Council of the Asiatic Society of Bengal. Pandit Isvara Chandra Vidyasagara, a native gentleman of learning, modesty, and merit, who has rendered inestimable services to his fellow country-men, and whose reputation extends far beyond the bounds of Asia, complains that he is not allowed to enter the rooms of the Society with his shoes—native shoes—on and the Council does not know precisely how to act in the manner. We can see but one course sufficiently dignified for the successors of Jones and Colebroke—namely, to abstain from laying down or in the remotest degree countenancing a petty regulation which will fetter the usefulness of the Society, discourage the resort to it of eminent persons of the Pandit's stamp and render it the laughing-stock of Europe. A learned society is the last body in the world that should revive obsolete class distinctions, and if, as in duty bound, it seeks to counterbalance an oppressive rule on one side, by making an oppressive rule on the other, we shall hear of many an unseemly *fracas* between the servants of the Society and scientific gentlemen who insist on the right of entering the room with their hats on,—a practice which is more unseemly, because more conspicuous, than the practice of wearing shoes."

৩৩

১৮৭৪ সালের ৬-জুলাই 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখেছে :

"The Great Shoe question has turned up in quite an unexpected quarter, we mean in the rooms of the Asiatic Society. . .

* মূল পত্রখানা বর্তমানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রক্ষিত আছে।

The facts of the case we believe are these. About three or four months ago one day Pundit Iswar Chunder Vidyasagar accompanied by a native friend from the North West went to the Indian Museum located in the Asiatic Society's building, and was asked by the porters to leave his shoes at the portico, or rather to take off his shoes and keep them in his own hand if he wanted to go in. To this he did not of course consent, and on return home wrote a letter to the Trustees of the Museum enquiring as to whether they had passed any rule of the kind, and observing that if such a rule has been passed, it would deter respectable native gentlemen, who wore shoes of the native pattern, from visiting the institution. He also wrote to the Council of the Asiatic Society that if the Museum authorities enforced such a rule, it would discourage respectable Pundits, who like him wore native shoes, from visiting the Society's Library, inasmuch as both the institutions were located in the same building. The Museum Trustees replied that they had not passed any such rule on the subject, but did not say whether they would pass any order for the discontinuance of the practice. They also seemed to doubt whether the complaint applied to their servants. The Council of the Asiatic Society went further, and wrote to the Pundit in reply that native gentlemen ought to know the Indian etiquette in the matter. The Pundit we learn has sent rejoinders to both. To the Trustees of the Museum he has written to say that it was the servants of the Museum, as he had distinctly stated in his first letter, who has required him to take off the shoes. To the Council of the Asiatic Society he has explained that the Indian custom is not to take off the shoes as a mark of respect, that the Indians do not leave their shoes behind in visiting each other if they are seated in rooms furnished with chairs, but that they do so when they sit on the farash or carpet for their own comfort and convenience. The question is accordingly pending before the Trustees of the Museum and the Council of the Asiatic Society.

We are really surprised that the above question should be raised in institutions, where above all others no invidious race distinction should be made. The Museum is a place of public resort like a park or a public garden, and would a European gentleman think of taking off his hat at such a place, and if not why should a native be required to put off his shoes there. As for the Asiatic Society it is the last place where this badge of social degradation should be insisted upon. There men of all classes and creeds cultivate science on a common ground, and that is not a place for raising social questions on which it is notorious the natives are keenly and justly sensitive. This shoe question had at one time assumed by no means a pleasant political character, and the highest authority in the land wisely decided that it should not be allowed to interfere with the social relations of the people with their rulers. It is said that the Government order does apply to "native shoes." We do not understand what occult meaning is there in this distinction. If the leaving the shoes behind is a mark of respect, then it matters little whether the shoes are of European or Native pattern, but if there is a mysterious respect attached to the leather, then it is immaterial as to what form the leather may take. We hope the Council of the Asiatic

Society and the Trustees of the Museum will have the good sense not to make native gentlemen feel that to enter their rooms is to court insult."

৩৪

"তালতলা নিবাসী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী জগদম্বা দেবী পত্নী, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এই পাঁচ পুত্র রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। তিনি বসতীবাটী ও রায়তী জায়গা এই দুই সম্পত্তি রাখিয়া যান। তাঁহার পত্নী ও পুত্রগণ তদীয় সম্পত্তির বিভাগ ও পরস্পর দেনা পাওনা পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্য আমার উপর ভারার্পণ করেন তদনুসারে আমি সকল বিষয়ের সবিশেষ তদন্ত করিয়া নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করিয়া দিলাম।

দুর্গাচরণ বাবুর চতুর্থ পুত্র মহেন্দ্রনাথ ঋণগ্রস্ত হন, এবং ঋণ পরিশোধে অশক্ত হওয়াতে বসতীবাটীতে ও রায়তী জায়গাতে তাঁহার যে অংশ থাকে, তাহা তাঁহার ঋণদায়ে বিক্রীত হয়। দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঐ অংশ কিনিয়া রাখেন মহেন্দ্রনাথের অংশ কিনিবার জন্য তাঁহাদিগকে ১০০৫০৲ দশ হাজার পঞ্চাশ টাকা ঋণ করিতে হয়। বাটী ও জায়গায় টাক্স দিবার জন্যও সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে ১২০০৲ বারশত টাকা ঋণ করিতে হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন দুর্গাচরণবাবুর মাতার শ্রাদ্ধের জন্য ৫০০৲ পাঁচশত টাকা ঋণ করিতে হয়। এই সমস্ত ঋণের পরিশোধের উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে তাঁহাদিগকে রায়তী জায়গার অধিকাংশ ৪০০০০৲ চল্লিশ হাজার টাকায় বিক্রয় করিতে হইয়াছে। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ঋণের পরিশোধে শুদ ও খরচা সমেত ১৯০৪০।৫ উনিশ হাজার চল্লিশ টাকা চারি আনা এক পাই ব্যয়িত হইয়া ২০৯৫৯৷৷৶১৫ বিশ হাজার নয়শত উনষাটি টাকা এগার আনা তিন পাই অবশিষ্ট থাকে। বিক্রীত রায়তী জায়গার মধ্যে কিয়দংশ মহেশচন্দ্র কুমারের নামে ছিল। ইহাতে মহেন্দ্রনাথের যে অংশ থাকে, তাহা তদীয় বসতীবাটী প্রভৃতির অংশ বিক্রয় কালে বিক্রীত হয় নাই। সুতরাং ঐ অংশে তাঁহার স্বত্ব বিদ্যমান ছিল। এজন্য ঐ অংশের দরুণ তিনি ১৫৮৩৲ পনরশত তিরাশি টাকা পাইবেন। তাহা বাদে মজুদ ১৯৩৭৬৷৷৶১৫ উনিশ হাজার তিনশত ছিয়াত্তর টাকা এগার আনা তিন পাই।

এক্ষণে উপস্থিত বিষয়ের মধ্যে প্রথম, বসতীবাটী, মূল্য ১৭৪৭০৸৶১৫ সতর হাজার চারিশত সত্তর টাকা পনর আনা তিন পাই। দ্বিতীয়, বিক্রীতাবশিষ্ট ৩৯ উনচল্লিশ কাঠা রায়তী জায়গা, মূল্য ১১৭০০৲ এগার হাজার সাতশত টাকা। তৃতীয়, ঋণ পরিশোধ ও মহেন্দ্রনাথের অংশ বাদে মজুদ ১৯৩৭৬৷৷৶১৫ উনিশ হাজার তিনশত ছিয়াত্তর টাকা এগার আনা তিন পাই। একুনে ৪৮৫৪৭৷৷৶১০ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশত সাতচল্লিশ টাকা এগার আনা দুই পাই। ইহা সমান পাঁচ অংশে বিভক্ত হইবেক। জগদম্বা দেবী, দেবেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ, জিতেন্দ্রনাথ প্রত্যেকে এক এক অংশে ৯৭০৯৲ নয় হাজার সাত শত নয় টাকা পাইবেন।

ইতিপূর্ব্বে বসতীবাটী যথাসম্ভব পাঁচজনকে অংশ করিয়া দিয়াছি। আমার প্রার্থনামতে শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি মিত্র ইন্‌জিনিয়ার প্রত্যেক অংশের মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। তন্মধ্যে (A) চিহ্নিত অংশের মূল্য ৩৯৩৭।/১০ তিন হাজার নয়শত সাঁইত্রিশ টাকা পাঁচ আনা দুই পাই। এই অংশ সুরেন্দ্রনাথ লইয়াছেন। (B) চিহ্নিত অংশের মূল্য ৩৫৩৯৷৷১৫ তিন হাজার পাঁচশত উনচল্লিশ টাকা আট আনা তিন পাই। এই অংশ জিতেন্দ্রনাথ লইয়াছেন। (C) চিহ্নিত অংশের মূল্য ৫১৪৪।৶০ পাঁচ হাজার একশত চুয়াল্লিশ টাকা সাত আনা। এই অংশ দেবেন্দ্রনাথ লইয়াছেন। (D) চিহ্নিত অংশের মূল্য ৪০১৯৷৷৶০ চারি হাজার উনিশ টাকা এগার আনা। এই অংশ উপেন্দ্রনাথ লইয়াছেন। (DI) চিহ্নিত অংশের মূল্য ৮৩২৸৶ আট শত বত্রিশ টাকা পনর আনা। এই অংশ জগদম্বা দেবী লইয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ বাটীর অংশের দরুণ ৩৯৩৭।/১০ তিন হাজার নয়শত সাঁইত্রিশ টাকা পাঁচ আনা দুই পাই পাইয়াছেন। তাহা বাদে তাঁহার পাওনা ৫৭৬৯৷৷৴১০ পাঁচ হাজার সাতশত উনসত্তর টাকা দশ আনা দুই পাই হয়। কিন্তু জায়গা বিক্রীর দরুণ মজুদ টাকা হইতে ১৪০৫৪।৶১০ চৌদ্দ হাজার চুয়ান্ন টাকা ছয় আনা দুই পাই তাঁহার ঋণ পরিশোধে দেওয়া

হইয়াছে। তাঁহার পাওনা বাদ দিয়া ৮২৮৪৸০ আট হাজার দুইশত চুরাশি টাকা বারআনা সকলের নিকট তাঁহার দেনা হইতেছে। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার পাওনার যে ফর্দ্দ দিয়াছেন, তদনুসারে সকলের নিকট তাঁহার পাওনা ১৩৭০, তেরশত সত্তর টাকা। এই পাওনা বাদ দিয়া সকলের নিকট তাঁহার দেনা ৬৯১২, ছয় হাজার নয়শত বার টাকা হইতেছে। সুতরাং প্রত্যেকের নিকট তাঁহার দেনা ১৭২৮, সতরশত আটাইশ টাকা।

সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রী দুই দফায় জগদম্বা দেবীকে যে সকল অলঙ্কার দিয়াছিলেন, তাহার এক ফর্দ্দ দিয়াছেন। তাহাতে দৃষ্ট হইতেছে দেবেন্দ্রনাথের সাহায্যের জন্য তিনি ২০ বিশ ভরির বাউটী ও ৬ ছয় ভরির নারিকেলফুল দেন। ঐ ফর্দ্দে তিনি সোনার দর ১৬, ষোল টাকা বলিয়া লিখিয়া দিয়াছেন। তদনুসারে সুরেন্দ্রনাথের নিকট দেবেন্দ্রনাথের ৪১৬ চারি-শত ষোল টাকা দেনা হইতেছে। এই দেনা বাদ দিয়া সুরেন্দ্রনাথের নিকট দেবেন্দ্রনাথের পাওনা ১৩১২, তেরশত বার টাকা।

সুরেন্দ্রনাথের ফর্দ্দে নির্দ্দিষ্ট আছে তিনি মোকর্দ্দমার খরচের জন্য জিতেন্দ্রনাথকে ২০০ দুইশত টাকা দিয়াছিলেন, ঐ ২০০, দুইশত টাকা বাদ দিয়া সুরেন্দ্রনাথের নিকট জিতেন্দ্রনাথের পাওনা ১৫২৮, পনরশত আটাইশ টাকা।

এতদ্ভিন্ন সুরেন্দ্রনাথ কহেন, উপেন্দ্রনাথের নিকট তাঁহার ১০০০, এক হাজার টাকা পাওনা আছে। তিনি নিজে এই টাকার বিষয় সবিশেষ অবগত নহেন। এবং তাঁহার পাওনার যে ফর্দ্দ দিয়াছেন তাহাতে এই হাজার টাকার উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার স্ত্রীর কথা প্রমাণ এই টাকা পাওনা বলিয়া দাবী করেন। তাঁহার স্ত্রী কহেন তাঁহার মাতার নিকট হইতে উপেন্দ্রনাথ হাজার টাকার কাগজ আনেন। ঐ কাগজ উপেন্দ্রনাথের নিকটে আছে। উপেন্দ্র-নাথ কহেন, ঐ কাগজ আনিয়া বিক্রয় করিয়া তিনি সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রীর হস্তে টাকা দিয়াছেন। এ বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রথমে আমার নিকট স্পষ্টবাক্যে বলেন, উপেন্দ্রনাথ কখনই তাঁহাকে ঐ টাকা দেন নাই। অনন্তর একদিন তিনি নিজে এইকথার উত্থাপন করিয়া আমার নিকট স্পষ্টবাক্যে বলিলেন, তাঁহার মাতার নিকট হইতে উপেন্দ্রনাথ যে কাগজ আনেন, তাহা বিক্রয় করিয়া তাঁহাকে টাকা দিয়া ছিলেন কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় তাঁহার নিকট হইতে ঐ টাকা লইয়াছেন। প্রথমতঃ উপেন্দ্রনাথ কখনই তাঁহাকে টাকা দেন নাই বলিয়া স্পষ্টবাক্যে টাকাপ্রাপ্তির বিষয় একেবারেই—অস্বীকার, তৎপরে, উপেন্দ্রনাথ টাকা দিয়াছিলেন, কিন্তু পুনরায় লইয়াছেন, স্পষ্টবাক্যে এই নির্দ্দেশ পরস্পর নিতান্ত বিরুদ্ধ হইতেছে যাহা হউক, সবিশেষ অনুধাবন করিয়া উপেন্দ্রনাথের নিকট সুরেন্দ্রনাথের এই টাকা পাওনা বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মিল না।

এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক, সুরেন্দ্রনাথ কহেন তাঁহার মাতা ও ভ্রাতাদিগের নিকট তাঁহার যে দেনা হইয়াছে তাহা দিতে হইবেক না। তাহর কারণ এই দর্শান, একান্নবর্ত্তী অবস্থায় তাঁহার এই দেনা হইয়াছিল। একান্নবর্ত্তী অবস্থায় দেনা করিলে সে দেনা দিতে হয় না একথা কতদূর সংগত বলিতে পারি না। কিন্তু যেরূপ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে আমার বিবেচনায় একান্নবর্ত্তী অবস্থায় তাঁহার এ দেনা হয় নাই। তাঁহার মেমরেণ্ডম বুকে দৃষ্ট হইতেছে সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৮ সালের জুলাই মাসে ভ্রাতাদের সহিত পৃথগন্ন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ১৮৮০ সালের ২৪এ ফেব্রুয়ারী তাঁহার ঋণ পরিশোধের জন্য টাকা দিয়াছেন সুতরাং এই সময় হইতেই ভ্রাতাদের নিকট তাঁহার এই দেনা হইতেছে। অতএব তাঁহার এই দেনা একান্নবর্ত্তী অবস্থায় হইয়াছে একথা বলা যাইতে পারে না। অংশমত যিনি যাহা পাইয়াছেন ও যাহা পাইবেন তাহা নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে :

জগদম্বা দেবী—

বাটীর অংশ দরুণ	— ৮৩২৸৶০
সুরেন্দ্রনাথের নিকট প্রাপ্ত	— ৩৪২৷৹
সুরেন্দ্রের নিকট প্রাপ্য	— ১৭২৮,
(জমী ১০ কাঠা) উহার মূল্য	— ৩০০০,
নগদ টাকা	— ৩৮০৫৷৵৹
	৯৭০৯,

দেবেন্দ্রনাথ—

বাটীর অংশের দরুণ	— ৫১৪৪।√০
সুরেন্দ্রের নিকট প্রাপ্ত	— ৩৪২॥০
ঐ	— ৪১৬৲
সুরেন্দ্রের নিকট প্রাপ্ত	— ১০১২৲
(জমী ৭ কাঠা) উহার মূল্য	— ২১০০৲
নগদ টাকা	— ০৯৪/০
	৯৭০৯৲

উপেন্দ্রনাথ—

বাটীর অংশ দরুণ	— ৪০১৬॥√০
সুরেন্দ্রের নিকট প্রাপ্য	— ৩৪২॥০
সুরেন্দ্রের নিকট প্রাপ্য	— ১৭২৮৲
(জমী ১২ কাঠা) উহার মূল্য	— ৩৬০০৲
নগদ টাকা	— ২১৸/০
	৯৭০৯৲

জিতেন্দ্রনাথ—

বাটীর অংশ দরুণ	— ৩৫৩৯॥১৫
সুরেন্দ্রের নিকট প্রাপ্ত	— ৩৪২॥০
ঐ	— ২০০৲
সুরেন্দ্রের নিকট প্রাপ্য	— ১৫২৮৲
(জমী ১০ কাঠা) উহার মূল্য	— ৩০০০৲
নগদ টাকা	— ১০৯৮৸√৫
	৯৭০৯৲

যৎকালে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়, সেসময়ে সুরেন্দ্রনাথ সিবিল শর্ব্বিশে প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহার্থে দুর্গাচরণ বাবু সময়ে সময়ে টাকা পাঠাইতেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে সুরেন্দ্রনাথের নিকট টাকা পাঠাইবার যখন কোনও উপায় ছিল না তখন তাঁহার মাতা জগদম্বা দেবী আপন স্ত্রীধন হইতে ১১ দফায় সুরেন্দ্রনাথকে ২১৫৯ দুই হাজার একশত উনষাটি টাকা পাঠাইয়া দেন। ইনি এই টাকা না পাঠাইলে সুরেন্দ্রনাথের ইংলণ্ডে থাকিয়া অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করা কোনও মতে ঘটিত না। সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে উইল করিয়াছেন তাহাতে এই দেনার উল্লেখ করিয়া একজিকিটারদিগকে তাহা পরিশোধ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। কিন্তু কত টাকা দেনা তাহা নিজে নির্দ্ধারিত না করিয়া এক্জিকিটারদিগের উপর তাহা স্থির করিবার ভার দেওয়া আছে। আমি সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা অবধারিত জানিতে পারিয়াছি জগদম্বা দেবী পূর্ব্বোক্ত ২১৫৯ টাকা পাঠাইয়া দেন, সুতরাং এ হিসাবে সুরেন্দ্রনাথের নিকট জগদম্বা দেবীর পাওনা ২১৫৯ টাকা হইতেছে।

ইহার পরেও আর দুইবার সুরেন্দ্রনাথের নিকট টাকা পাঠাইতে হইয়াছিল। কিন্তু তখন জগদম্বা দেবীর হস্তে আর টাকা ছিল না। উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া অবশেষে তিনি নিজের, কন্যা শিবসুন্দরীর, এবং সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রীর অলঙ্কার এবং অন্যান্য দ্রব্য বন্ধক রাখিয়া সুরেন্দ্রনাথের নিকট একবার ৮০০ আটশত, একবার ২৫০ আড়াইশত, দুই দফায় ১০৫০ টাকা পাঠাইয়া ছিলেন। এই টাকা পরিশোধ না হওয়াতে উত্তমর্ণেরা বন্ধকী অলঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্য বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করিয়াছেন। এইরূপে যাঁহার যে অলঙ্কার ও দ্রব্য বিক্রীত হইয়াছে উহার মূল্য সুরেন্দ্রনাথের নিকট তাঁহাদের পাওনা হইতেছে।

যিনি যে অলঙ্কার ও দ্রব্য দিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে :—৮০০ আটশত টাকা পাঠাইবার জন্য :—

জগদম্বা দেবী

চন্দ্রহার	১৭ ভরি	১৬ টাকায় দর সোনা ...	২৭২৲
গোপহার	৪ ভরি	ঐ	৬৪৲
মল	৮০ ভরি	রূপার	৮০৲
			৪১৬৲

শিবসুন্দরী

তাবিজ	৬ ভরি	১৬ টাকায় দর সোনা ...	৯৬৲
গোপহার	ঐ	ঐ	৯৬৲
মুড়কি মাদুলী	২ ভরি	ঐ	৩২৲
মল	৪০ ভরি	রূপার	৪০৲
			২৬৪৲

সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রী

পৈঁছা	১০ ভরি	১৬ টাকায় দর সোনা ...	১৬০৲
মুড়কিমাদুলী	৫ ভরি	ঐ	৮০৲
তাবিজ	১০ ভরি	ঐ	১৬০৲
জশম	৭ ভরি	ঐ	১১২৲
চিক	৬ ভরি	ঐ	৯৬৲
পাচনর	৫ ভরি	ঐ	৮০৲
চৌদানি	ঐ	ঐ	৮০৲
কাজরানা	ঐ	ঐ	৮০৲
ফুলঝুমকা	৩ ভরি	ঐ	৪৮৲
চন্দ্রহার ২ ছড়া ...	৬০ ভরি	রূপার	৬০৲
মল	৮০ ভরি	রূপার	৮০৲
			১০৩৬৲

২৫০ আড়াই শত টাকা পাঠাইবার জন্য

জগদম্বা দেবীর কঙ্কণ ... ... ১৫০৲

দেবেন্দ্রনাথের

থাল	৪০ ভরি	রূপার	৪০৲
বাটী	১০ ভরি	ঐ	১০৲
ঘটী	১০ ভরি	ঐ	১০৲
			৬০৲

উপেন্দ্রনাথের

থাল	৩০ ভরি	রূপার	৩০৲
বাটী	১০ ভরি	ঐ	১০৲
রেকাবি	১০ ভরি	ঐ	১০৲
			৫০৲

এই সকল দ্রব্য পর্য্যাপ্ত না হওয়াতে সরকারী রূপার বাটী ও গুড়গুড়ী ঐ সঙ্গে বন্ধক দিতে হইয়াছিল। এক্ষণে এ হিসাবে সুরেন্দ্রনাথের নিকট—

জগদম্বা দেবীর পাওনা	...	...	... ৫৬৬৲
শিবসুন্দরীর পাওনা	...	...	... ২৬৪৲
দেবেন্দ্রনাথের পাওনা	...	...	... ৬০৲
উপেন্দ্রনাথের পাওনা	...	...	... ৫০৲

এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক, এই অলঙ্কার প্রভৃতি এক্ষণে উপস্থিত নাই; সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে উহাদের মূল্য নির্দ্ধারিত করিবার উপায় নাই। এই জন্য যিনি যে ওজন ও দর লিখিয়া দিয়াছেন তাহাই অবলম্বিত হইয়াছে।

কলিকাতা
১৬ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩ সাল

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।"*

৩৫

১৮৯২ সালের ২০-আগস্ট 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখেছে :

"ORIGINAL CIVIL JURISDICTION.

THE VIDYASAGAR WILL CASE.—The case brought by Babu Peary Mohun Banerjee, grandson of the late Pandit Vidyasagar, against the latter's son, Babu Narain Chunder Banerji, and Babu Kherode Nath Sing, Executor of the estate of the late Pandit, came on for hearing yesterday for settlement of issues.

Messrs Pugh, appeared on behalf of the plantiff, Mr. Swinhoe for the executor, and Messrs Hill and Chowdhuri for the principal defendant, Babu Narain Chunder Banerji.

The plaintiff asked for the construction of his grand-father's Will, submitting that he was the heir and not his father, the defendant, who had been disinherited by the testator, Pandit Issur Chander Vidyasagar. The effect of the clauses in the Will which related to this question is that the testator left the whole of his estate to executors who were to pay off his debts and after the debts had been cleared, they were to make over the property to those who would then remain as his heirs, and should there be minors, the executors were to remain in possessions until they should attain majority. The testator then went on to say that his son Narain Chander Banerji being very self-willed, he had cut off all relationship with him and that even if he, the said son, was alive at the time, the debts should be paid off, and then they who would be the heirs, if his son were dead, were to be received as the heirs of the testator. This Will was executed in 1875, and the testator died last year. The testator became reconciled to his son, before his death and intended

* Calcutta High Court suit No. 351 of 1883 (ordinary original Civil Jurisdiction)—এই দলিলটি বর্তমানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রক্ষিত আছে।

to alter his Will, but he died before he had done so. The defendant, Narain Chander Banerji, contended that the Will so far as it related to his disinheritance, was bad in law.

Mr. Pugh submitted that there was a gift in prescuit to the heirs of the Pandit excluding his son, and in support of his contention he cited I.L.R. 16, p. 166.

His Lordship after hearing the argument of Counsel, held that the Will was bad, so far as it related to the disinheritance of the son, and that in consequence, the son came in as the heir of the deceased, and that neither the grandson, the plaintiff, nor any one else had any right in the properties belonging to the testator."

নির্ঘণ্ট